হিমালয়

(পঞ্চম খণ্ড)

শঙ্কু মহারাজ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

হিমালয় : পঞ্চম খণ্ড
প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৯৭

প্রচ্ছদপট :
কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তিস্তা
অঙ্কন :
মণি সেন
(শিল্পীর কন্যা শ্রীমতী নীলিমা রায়ের সৌজন্যে)
বিন্যাস : পূর্ণেন্দু রায়

HIMALAYA VOL. V
by
Sanku Maharaj
A collection of travelogues on Himalayas.
Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.,
10 Shyama Charan Dey Street, Kolkata-700 073

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
হইতে পি. দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত ও মানসী প্রেস, ৭৩ শিশির ভাদুড়ী সরণী,
কলকাতা-৭০০ ০০৬ হইতে প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা

অরুণকুমার বসু

ভৌগোলিক পরিচয়ে পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশ। অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক বিশ্বায়নে হয়তো পৃথিবী কোনো-একদিন এক-মহাদেশে পরিণত হবে। আপাতত মহাদেশ-বিভাজন রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক দিক থেকে। আর সেই বিচারেই পৃথিবীর ষষ্ঠ মহাদেশরূপে চিহ্নিত ও ঘোষিত হোক হিমালয়। হিমালয়কে এশিয়া ও ইউরোপের পার্বত্য-বিভাজক রেখা না ধরে স্বতন্ত্র মহাদেশরূপে গ্রহণ করা একটি আবশ্যিক বুদ্ধিগ্রাহ্য প্রস্তাব। এই হিমালয় জয় করার জন্য, আগ্রাসনের জন্য, অধিকারের জন্য, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসেছে কতকাল কত মানুষের ধারা। হিমালয় তবুও রয়ে গেছে অজিত-অজেয়, অপরাহত মহিমায় সমুন্নত। তার কোলে উপনিবিষ্ট হয়েছে শতশত বৎসর ধরে কত ধর্ম বর্ণ ও সম্প্রদায়ের মানুষ। জনশ্রুতি আছে যিশু খ্রিষ্ট নাকি হিমালয়ে এসেছিলেন। বৈদিক ঋষিদের তপঃসিদ্ধির লীলাভূমি, বৌদ্ধধর্মের প্রস্থানভূমি, কনফুসিয়াসের প্রচারভূমি, তন্ত্রের গুহাভূমি, পৃথিবীর আরও বহু পার্বত্য উপজাতির ধর্মাচরণভূমি হিমালয় কোনো বিশ্বাসের সঙ্গে বিরোধ ঘটায়নি। কোনো অতিথিকে ফিরিয়ে দেয়নি। সমগ্র হিমালয় কোনোদিন কোনো সাম্রাজ্যবাদীর করদ রাজ্যে পরিণত হয়নি। এই হিমালয় থেকে উৎসারিত জলধারাই এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলকে বারি জুগিয়ে চলেছে। পৃথিবীর বৃহত্তম বনভূমি, উচ্চতম গিরিশৃঙ্গ, শীতলতম ও দীর্ঘতম হিমবাহ, বিপুলতম খনিজসম্পদ নিয়ে অটলমহিমায় সমাসীন এই বিপুল ভূধর অবশ্যই বিশ্বের মহাদেশ, বিশ্বমহাকাব্যের প্রথম পার্থ।

হিমালয়-সাম্রাজ্যের সুদুর উত্তরভাগে কাশ্মীর রাজ্যের ভূসীমান্তে অতি দুরধিগম পার্বত্যগুহা অমরনাথ বৎসরে একবার ভক্তসমাগমে ও দর্শনার্থী কোলাহলে গমগম করে ওঠে। যানবাহনের সুবিধাবৃদ্ধি ও পথঘাটের সুব্যবস্থার কারণে পথদুশ্চরতা আজ অনেকটাই কমে গেছে। তবু বর্তমানে অন্যধরনের দুর্গমতা যুক্ত হয়েছে এই তীর্থপথে। তা হল সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের আশঙ্কা। তবু সেই অগমবন্ধুর ভয়ালসুন্দরের প্রতি মানুষের আগ্রহ হ্রাস পায়নি। বছরের পর বছর যাত্রীসংখ্যা অজস্র বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভ্রমণের সুযোগ-সুবিধা বাড়ছে। কিন্তু তবুও আরও তো কত অজস্রতর যাত্রীর অবস্থা ভ্রমণের অনুকূল নয়। কক্ষে যাদের রুদ্ধ দুয়ার সেইসব গৃহান্তরীণদের কাছে ভ্রমণসাহিত্যই একমাত্র সম্বল। পথ যাঁদের কাছে প্রাচীর-ঘেরা, তীর্থস্থান যাঁদের কাছে নিমন্ত্রণের রাঙা চিঠি মেলে ধরে না, তাঁরাই আসেন প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল, উমাপ্রসাদ

মুখোপাধ্যায় বা শঙ্কু মহারাজের কাছে। শফর-সংগঠকদের গাইডবুক এঁরা কেউই প্রস্তুত করেননি। শঙ্কু মহারাজের 'অমরতীর্থ অমরনাথ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৮-এ, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দে। আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগের সে বই পড়ে এখন কেউ অমরনাথ যাওয়ার ছক তৈরি করবেন না। এই বইতে পার্বত্য দূরত্বের পরিমাপ লেখা হয়েছে মাইলের অঙ্কে, পথের হিসেব পায়ে-চলার শ্রমে। এই বইয়ের সপ্তম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৩৯৪ বঙ্গাব্দে, অর্থাৎ তখনও গ্রন্থটির জনপ্রিয়তা অব্যাহত। ১৯৮৮ সালে অমরনাথ যাত্রার জনপ্রতি যে খরচ এর পরিশিষ্টে দেওয়া হয়েছে, সেই পরিমাণ মুদ্রা সম্বল করে নিশ্চয় এখন কেউ অমরনাথ যাত্রা করেন না। বিস্ময়বিস্ফার হিমালয়ের ভীষণমধুর রূপ যাঁরা স্বচক্ষে দেখেননি, তাঁরাই বারবার এই বইয়ের পৃষ্ঠায় চোখ মেলে ধরবেন। এই গ্রন্থের ১৩৯৫ বঙ্গাব্দের সংস্করণের চতুর্থ প্রচ্ছদে বইটির পরিচিতিরূপে লেখা হয়েছিল : "শঙ্কু মহারাজের সাহিত্যসাধনার সর্বোত্তম সৃষ্টি হিমালয় ভ্রমণকাহিনী। কারণ ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন হিমালয়-প্রেমিক ও পর্বতারোহী। প্রকৃতপক্ষে হিমালয়ের কথা দিয়েই তিনি তাঁর সাহিত্যসাধনা শুরু করেছেন। 'অমরতীর্থ অমরনাথ' লেখকের দ্বাদশ ভ্রমণকাহিনী। মহাতপা ভৃগুমুনি বলেছেন, অমরনাথজীর সুধালিঙ্গ দর্শন করলে মানুষ অমরত্ব লাভ করবে আর ওই গুহাতীর্থের নাম হবে অমরনাথ। লেখক সেই সুপ্রাচীন তীর্থের কথা ও কাহিনীকে নূতন উপচারে উপহার দিয়েছেন এই 'অমরতীর্থ অমরনাথ' গ্রন্থে। আমাদের বিশ্বাস অমরনাথের উপরে এমন প্রাঞ্জল ও প্রামাণ্য ভ্রমণকাহিনী ইতিপূর্বে আর প্রকাশিত হয়নি। যাঁরা অমরনাথ গিয়েছেন এবং যাঁরা যাননি, তাঁদের সবার জন্যই এই গ্রন্থ। শঙ্কু মহারাজের ভ্রমণকাহিনী পাঠ করা আর ভ্রমণ করা একই কথা।"

প্রকাশক লিখিত এর প্রতিটি বাক্যের সঙ্গে বর্তমান ভূমিকাকার তাঁর কণ্ঠ-সমর্থন ঘোষণা করছেন।

ভারতীয় পর্বতারোহণের প্রায় দ্বাপরযুগে গাড়োয়াল-হিমালয়ের ২১২৬৪ ফিট উঁচু দুরারোহ দুর্জয় নীলগিরি-শিখরারোহণের রুদ্ধশ্বাস কাহিনী 'নীল দুর্গম' যুগান্তরে ধারাবাহিক প্রকাশকালে ও গ্রন্থাকারে প্রকাশের পরে বিপুল পাঠক-সমাদর ও সমুগ্ধপ্রশংসা অর্জন করেছিল। সে আকর্ষণ সম্ভবত আজও স্তিমিত হয়নি। এ শুধুই ভ্রমণকথা নয়। এর আষ্টেপৃষ্ঠে আরও পাই ভারতীয় পর্বতারোহণের ইতিকথা, যা নাকি আজও স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে বাংলায় সংকলিত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ পথের প্রান্তে তীর্থ খোঁজার চেয়ে পথের দুধারে দেবালয় দেখে তাতেই মোহিত হতে চেয়েছিলেন। যথার্থ ভ্রমণসাহিত্যের সংজ্ঞাই বোধহয় তাই। নইলে যাত্রাপথের আনন্দগান বাজবে কেমন করে। বজ্রনাদ যেমন ধ্বনিমাত্র নয়, তার সঙ্গে মনের কাছে তা মেলে ধরে নিশীথের ঘন অন্ধকার, অবিরল বর্ষণ, ভয়ার্ত প্রকৃতি, মূক বনস্পতির ছায়াবৃত স্তব্ধতা; তেমনি নীলগিরি নামটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে একটি গিরিশৃঙ্গই উদ্ভাসিত হয় না। তৎসহ ভেসে ওঠে গাড়োয়ালের মনোমোহনগহন ভূপ্রকৃতি, বর্ণাঢ্য পার্বত্য জনজীবন, অগণিত শৃঙ্গ ও কুণ্ড, কত মন্দির গুহা চৈত্য গুম্ফা ঝরণা হিমবাহ পাকদণ্ডি তুষারঝড়, হয়তো বা তুষারমানবের রহস্যময়

পদশব্দ। এ-সব কিছু ছাপিয়ে এক অলৌকিক অপরূপের সামনে স্তব্ধ হয় মন যার নাম নন্দনকানন। সেই পুষ্পরহস্যের আকর্ষণে বিদেশিনী কুসুমবিজ্ঞানী মার্গারেট লেগী ছুটে গেছিলেন সেখানে, আর ফিরে আসেননি। ফুল্লকুসুমিত নন্দাবতীর মৃদ্‌গর্ভে শায়িত আছে তাঁর নিথর দেহ উদ্ভিদলক্ষ্মীর অন্তঃপুরে।

'গঙ্গা-যমুনার দেশে' ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় যখন 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা'-র লেখককে বাঙালি পাঠক নিশ্চিতভাবে চিনে নিয়েছিলেন। তিন দশক যাবত বইটির পাঠক-সমাদর অক্ষুণ্ণই আছে, ভ্রমণসাহিত্য হিসেবেই শুধু নয়, একটি অজানা ইতিহাস হওয়ার গৌরবেরও। 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা' তখন কাহিনীচিত্রে রূপায়িত হতে চলেছে। লেখকও চলেছেন সেই চিত্রপরিচালক কলাকুশলী শিল্পীদলের সঙ্গে সেই অকুস্থলে। স্টুডিও-র চত্বরে কৃত্রিম সেট তৈরি করে ভ্রমণকাহিনীর পুরিয়ায় ভেজাল পুরে দেওয়ার চেষ্টা হয়নি সেদিন। ফলে যাত্রাপথের কাহিনীর সঙ্গে চিত্রগ্রহণপর্বের কাহিনী যুক্ত হয়ে কৌতূহলের স্তর পুরুষ্ট হয়ে উঠেছে। চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সে যুগটা ছিল প্রায় সেকেলে। পুরনো যন্ত্রপাতি, বিশাল ভারী ক্যামেরা, ভারবাহী জেনারেটার, কুলি ও মালপত্রের বিরাট দল যেন যুদ্ধযাত্রায় চলেছে। এই চিত্রগ্রহণ উপলক্ষেই যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী মন্দিরে নাকি প্রথম বিদ্যুতের আলো জ্বলেছিল। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এত উঁচুতে বাংলায় এর আগে কোনো চিত্রগ্রহণ হয়নি, সে তথ্যের ঐতিহাসিক মূল্যও আজ কম নয়।

ভ্রমণসাহিত্য শব্দ-অভিধাটি ব্যবহারজীর্ণ হতে চলেছে ভ্রমণের নামে প্রচারিত বিশেষ এক ধরনের ট্রাভেল-গাইডবুকের কৃপায়। বাঙালির ভ্রমণস্পৃহা প্রবাদবিদিত। আর সেই ভ্রমণার্থীদের পথসংকেত থেকে শুরু করে যাবতীয় যাত্রাঘটিত তথ্য সরবরাহ করাই বিশেষ একশ্রেণীর গ্রন্থের উদ্দেশ্য-বিধেয় হয়ে উঠেছে। ফলে স্থূল বিচারে টুরিস্ট গাইডবুকের সমার্থক হয়ে উঠেছে ভ্রমণসাহিত্য। কিন্তু যাঁরা ভ্রমণের কাগজে পথসঙ্গী চান না, ঘরে বসে পর্যটকের চোখ দিয়ে না-দেখা না-জানা বিশ্বের কল্পপথিক হতে চান, তাঁদের কাছে ভ্রমণসাহিত্যের আবেদন কখনও ফুরোবে না। প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দেখা সেই সন্ন্যাসী হিমালয়, অন্নদাশঙ্কর রায়ের দেখা সেই দ্রুতধাবমান লন্ডন, সৈয়দ মুজতবা আলীর দেখা সেই খোশমেজাজি বিলাসী প্যারি আজ আর কোথাও নেই। পরিবর্তমান দুনিয়া তাদের চেহারা আকণ্ঠ বদলে দিয়েছে। তবু জলধর সেন থেকে প্রবোধকুমার সান্যালের ভ্রমণসাহিত্য কি আজ অপাংক্তেয় হয়ে গেছে?

বাংলা ভ্রমণলেখ সাহিত্য-সাধনায় শঙ্কু মহারাজ নামটি নিজগুণে সম্ভ্রান্ত উচ্চাসন দখল করে নিয়েছেন। তাঁর ভ্রমণচারিতা ও আলাপচারিতা তাঁর প্রথম জনপ্রিয় গ্রন্থের মতোই একদিকে বিগলিত-করুণা অন্যদিকে জাহ্নবী-যমুনা অর্থাৎ তথ্যে ফটোনিপুণ, তত্ত্বে সত্যসুন্দর। তাঁর পরিব্রাজকতা পথে-প্রান্তরে মরু-পর্বতে নদী-সমুদ্রে প্রসারিত।

'বিপুলা' এ পৃথিবীর কতটুকু জানি এই আর্ষবাক্য অমোঘ সত্য হলেও দীর্ঘদিন দীর্ঘপথশ্রমে কত অজানাকে তিনি জানিয়ে চলেছেন। দেশ-বিদেশ এশিয়া-ইউরোপ ভারত-বাংলাদেশ যেখানেই তাঁর শফর সেখানেই তিনি মধুকর। তাঁর সেই ভিক্ষালব্ধ ধন আবার পাঠককুলের ভোগে লাগে।

তবু এই ভ্রমণবৃত্তান্তের বৃহত্তম অংশ জুড়ে আছে হিমালয়। একথা তাঁর পাঠকমাত্রেরই জানা আছে যে, শঙ্কু মহারাজের হিমালয়-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর ভ্রমণবিষয়ক রচনাবলীর মধ্যে সর্বাধিক স্থান দখল করে আছে। তাঁর মোট ষোলোটি হিমালয়-ভ্রমণী-র চোদ্দটি নিয়ে তাঁর হিমালয়-সংকলনের পাঁচটি খণ্ড এযাবত প্রকাশিত। বাংলা সাহিত্যের ভ্রমণবার্তায় হয়তো এটাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসংবাদ। পূর্ববর্তী চারটি খণ্ডে হিমালয়ের কোন কোন অঞ্চল আখ্যান স্থান পেয়েছে পাঠকরা তার পরিচয় পেয়েছেন। সদ্য-প্রকাশিত পঞ্চম খণ্ডের অন্তর্ভূক্ত 'অমরতীর্থ অমরনাথ', 'নীল দুর্গম' ও 'গঙ্গা-যমুনার দেশে' পাঠকবর্গের হাতে সমর্পণ করে ভূমিকাকার হিসেবে আমার নিবেদন সমাপ্ত করলাম।

অমরতীর্থ-অমরনাথ

অমরতীর্থেব অমরযাত্রী
শ্রীকালিদাস রায় গোষ্ঠীপতি
ও
শ্রীমতী সুজাতা রায় গোষ্ঠীপতিব
স্মৃতিব উদ্দেশে—

তীর্থের দেবতা ডাক না দিলে তীর্থদর্শন হয় না।

এ সত্যটি জীবনে আমি বার বার প্রত্যক্ষ করেছি। সমস্ত আয়োজন শেষ করার পরেও যাত্রা শুরু করতে পারি নি। আবার প্রায় বিনা প্রস্তুতিতে পথে নেমে পড়েছি, তীর্থদর্শন করে নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরেছি।

এবারের এই অমরনাথ যাত্রার কথাই ধরা যাক। বাষট্টি সালে কাশ্মীরে বেড়াতে এসেছিলাম। প্রায় মাসখানেক কাটিয়েছি ভূস্বর্গে। দিন সাতেক পহেলগাঁয়ে থেকেছি কিন্তু অমরতীর্থ-অমরনাথ দর্শন করতে পারি নি।

তারপর থেকে প্রায় প্রতিবছর হিমালয়ে এসেছি। কিন্তু অমৃতময়-অমরনাথে যাওয়া হয় নি আমার। সুযোগ এসেছিল এবারেও। মাত্র মাস দুয়েক আগের কথা। আমারই পরামর্শে অমরনাথ যাত্রার আয়োজন হল। কিন্তু শেষ মুহূর্তে এমন একটা বাধা এল যে আমি তাদের সঙ্গী হতে পারলাম না। ভাবলাম অমিত-অমরনাথকে দর্শন করা অদৃষ্টে নেই আমার।

কিন্তু মাত্র দিন দশেক আগে, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ ফকিরবাবু, কুণ্ডু ট্র্যাভেলস-এর মালিক ফকির কুণ্ডু, ফোন করে বসলেন—১২ই আগস্ট অমরনাথ যাত্রা করছি। এবারে ভাদ্র মাসে যাত্রা পড়েছে। পথে বৃষ্টি কম হবে। এমন সুযোগ পাবেন না। চলুন, দর্শন করে আসবেন।

কথায় কথায় সেদিন তাঁকে বিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেছি। বলেছি—অমিয়-অমরনাথকে দর্শন করা আমার অদৃষ্টে নেই।

গম্ভীর স্বরে ফকিরবাবু বলে উঠেছেন—এবারে বাবা অমরনাথ ডাক দিয়েছেন আপনাকে।

চমকে উঠেছি! আমার মন বলছে—ফকিরবাবু হয়তো ঠিকই বলেছেন। নইলে আমি তো কখনও তাঁর কাছে অনাদি-অমরনাথকে দর্শন করার ইচ্ছা প্রকাশ করি নি। বহুদিন দেখাও হয় নি তাঁর সঙ্গে। তবু তিনি এভাবে হঠাৎ আমাকে অমবনাথ যাত্রায় যাবার আমন্ত্রণ জানাবেন কেন?

অতএব কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই ফকিরবাবুকে সেদিন সম্মতি জানিয়ে দিয়েছি।

বাধা কিন্তু এবারেও এসেছে। সম্মতি জানাবার তিনদিন পরে আমার 'ফুড পয়জন হল। দু'দিন বাড়িতে বিশ্রাম নিতে বাধ্য হলাম। সবচেয়ে বড় বাধা এল তারপরে, রওনা হবার মাত্র দু'দিন আগে। সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে দেখি গৌতমের খুব জ্বর। সারারাত তার শিয়রে বসে থাকতে হল। গৌতম আমার একমাত্র বংশধর। সুতরাং যথাসাধ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। জ্বর কমেছে কিন্তু ছেড়ে যায় নি। শেষ পর্যন্ত তাকে শয্যাশায়ী রেখেই রওনা হয়েছি অমরনাথের পথে। কারও নিষেধ শুনি নি। কেন যেন বার বার মনে

হচ্ছে—এবারে বাবা ডাক দিয়েছেন আমাকে।

বাধা? হ্যাঁ, তীর্থদেবতা ডাক দিলেও তীর্থযাত্রায় বাধা আসতে পারে। তীর্থের দেবতা বাধার ভেতর দিয়ে তীর্থযাত্রীর আন্তরিকতা পরীক্ষা করেন। গৌতমের আকস্মিক অসুখ আমার প্রতি অমরনাথের সেই পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়। এবং এবারে আমাকে কৃতকার্য হতেই হবে।

অমিত-অমরনাথকে অবলম্বন করে এ যাত্রা আয়োজিত হলেও আমার সহযাত্রীরা শুধু অমরনাথ দর্শনের জন্য ঘর ছাড়েন নি। তাঁরা 'কুণ্ডু ট্র্যাভেলস'-এর যাত্রী। তাঁদের পুণ্যসঞ্চয়ের প্রভূত আয়োজন করেছেন ফকির কুণ্ডু। তাই আমরা কাশী হরিদ্বার ঋষিকেশ ও অমৃতসর দেখে আজ সকালে জম্মু-তাওয়াই এসেছি। ফেরার পথে সাতদিন শ্রীনগরে থেকে কাশ্মীরের যাবতীয় দ্রষ্টব্যস্থল দেখব। তারপরে জ্বালামুখী ও দিল্লী হয়ে কলকাতা ফিরব।

কিন্তু আমার এ কাহিনী অমরতীর্থ অমরনাথ যাত্রা নিয়ে। কাজেই কাশী হরিদ্বার ও অমৃতসরের কথা থাক, অমরনাথ যাত্রার কথা থেকেই শুরু করা যাক।

আজকের যাত্রা শুরু হয়েছে জম্মু-তাওয়াই রেলস্টেশনের ট্যুরিস্ট্ প্ল্যাটফর্ম থেকে। যাত্রী বেশি বলে এবারে ফকিরবাবু আর 'ট্যুরিস্ট্-কোচ' আনেন নি, একখানি 'থ্রিটায়ার বগি' এনেছেন। তাহলেও রেলের ভাষায় আমরা ট্যুরিস্ট্। অতএব স্টেশন কর্তৃপক্ষ আমাদের বগিখানিও ট্যুরিস্ট্ প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসেছেন।

কাশ্মীর ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় 'ট্যুরিস্ট্ স্পট্'। জম্মু-তাওয়াই রেলস্টেশন কাশ্মীরের প্রধান প্রবেশ তোরণ। তাই কর্তৃপক্ষ এই বিশেষ ট্যুরিস্ট্ প্ল্যাটফর্মটি নির্মাণ করেছেন।

প্ল্যাটফর্মটি নির্মিত হয়েছে স্টেশনের শেষ প্রান্তে, বড় রাস্তার পাশে। বড় রাস্তা থেকে একটি মোটরপথ নিয়ে যাওয়া হয়েছে প্ল্যাটফর্মে। বাস ও ট্রাক অনায়াসে উঠে যায় প্রশস্ত প্ল্যাটফর্মের ওপরে। ফলে ট্যুরিস্টদের কুলিভাড়া ও সময় বেঁচে যায়। ভারতের সমস্ত তীর্থ ও দর্শনীয় স্থানের রেলস্টেশনে এমনি প্ল্যাটফর্ম থাকা উচিত। কিন্তু দুঃখের কথা ভারতের অধিকাংশই বড় বড় রেলস্টেশনে আলাদা ট্যুরিস্ট্ প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত নেই।

যাক্‌গে, যাত্রার কথায় ফিরে আসা যাক। আজ খুব সকালে আমরা জম্মু-তাওয়াই এসেছি। কিছুক্ষণ আগে বাস ছেড়েছে স্টেশন থেকে। বাষট্টি সালে যখন প্রথম কাশ্মীর এসেছিলাম, তখন পাঠানকোট ছিল রেলপথের প্রান্তসীমা। সেখান থেকে দু-রকমের সরকারী ট্যুরিস্ট্ বাস ছাড়ত। একটি একদিনে ও একটি দেড়দিনে শ্রীনগর পৌঁছত। একদিনের বাস খুব সকালে পাঠানকোট থেকে রওনা হয়ে রাত দুপুরে শ্রীনগরে যেত। দেড়দিনের বাসযাত্রীদের পথের কোন ডাকবাংলোয় রাত্রিবাস করতে হত।

পাঠানকোট থেকে জম্মু রেলপথে ষাট মাইলের মতো। একে তো রেলগাড়ি এতটা পথ এগিয়ে এসেছে, তার ওপরে এখন পথও অনেক ভাল হয়েছে। ফলে এখন সব 'বাস' একদিনে শ্রীনগর কিংবা পহেলগাঁও যায়। তবে সকাল-সকাল রওনা হওয়া চাই। যেটি আমরা পেরে উঠি নি।

কুণ্ডু ট্র্যাভেলস্ এবার নাকি শ' আড়াই পুণ্যার্থীকে অমরনাথ দর্শন করাবেন। তাঁদের মধ্যে মাত্র পঁচাত্তর জন আজ আমরা ফকিরবাবুর সঙ্গে এসেছি। বাকিরা পরে

আসছেন। আমরা যাঁরা আজ এলাম, তাঁরাও কিন্তু একদিনে যাত্রায় যাচ্ছি না। আমি প্রথম দলে, তাই সোজা পহেলগাঁও চলেছি। যাঁরা দ্বিতীয় দলে যাবেন, তাঁরা চলে গেলেন শ্রীনগর। দিন সাতেক বাদে তাঁরা পহেলগাঁও আসবেন। ওঁদের একখানি বাস, আমাদের দু'খানি।

ফকিরবাবু ও মিসেস ঝরনা মণ্ডল অর্থাৎ কুণ্ডু ট্র্যাভেল্‌স-এর কর্তৃপক্ষ রয়েছেন আমাদের বাসে। সুতরাং আমাদের বাস ছেড়েছে সবার শেষে। একে তো অন্য দু'খানি বাস রওনা করে দিয়ে ফকিরবাবু গাড়িতে উঠেছেন, তার ওপরে আমাদের পায়লট স্টেশন থেকে গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন বাস-ডিপোতে। সেখানে গাড়িকে তেল-জল খাইয়ে নিজে জলখাবার খেয়ে নিয়েছেন।

অবশেষে অমরনাথজীর ফটোর সামনে ধূপ জ্বালিয়ে বাবা অমরনাথের জয়ধ্বনি দিয়ে পায়লট যখন বাস ছেড়েছেন, বেলা তখন দশটা বেজে গিয়েছে।

পথে বাটোটে আমাদের দুপুরের খাবার ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে অন্তত ঘণ্টাখানেক সময় লেগে যাবে। কাজেই রাত দশটার আগে পহেলগাঁও পৌঁছব বলে মনে হচ্ছে না।

জম্মু শহর ছাড়িয়ে এসেছি। এখনও তেমন চড়াই-উৎরাই আরম্ভ হয় নি। উধমপুর পর্যন্ত এই রকম চলবে, তারপরে শুরু হবে প্রকৃত পাহাড়ী পথ। উধমপুর বেশ বড় শহর। জম্মু থেকে দূরত্ব ৪২ মাইল উচ্চতা ২৩৪৮ ফুট। তার মানে ৪২ মাইলে আমাদের মাত্র ১৩৪৮ ফুট ওপরে উঠতে হবে। জম্মুর উচ্চতা ১০০০ ফুট। *

এটি একালে সমতল ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর উপত্যকায় আসার প্রধান পথ হলেও সেকালের জনপ্রিয় পথ নয়। জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য কোন্‌পথে কাশ্মীর এসেছিলেন জানা নেই আমার, তবে মোগল সম্রাটরা এপথে কাশ্মীর আসতেন না। স্বামী বিবেকানন্দও এপথে অমরনাথ আসেন নি।

স্বামীজী অমরনাথ এসেছিলেন রাওয়ালপিণ্ডি-বারমূলা-শ্রীনগর পথে। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব পযন্ত সেটিই ছিল কাশ্মীরে আসার প্রধান পথ। সেপথে আর কাশ্মীরে আসার অধিকার নেই আমাদের।

কেন নেই, সে প্রসঙ্গে না গিয়ে স্বামীজীর কথায় ফিরে আসা যাক। স্বামীজী অমরনাথ এসেছিলেন ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে। সেটি তাঁর দ্বিতীয়বার কাশ্মীর দর্শন। সেবারে স্বামীজীর সঙ্গে কয়েকজন গুরুভাই, পাশ্চাত্য অভ্যাগত এবং শিষ্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ভগিনী নিবেদিতা অন্যতমা।

বাস ছুটে চলেছে। আমি অমৃতময়-অমরনাথ-পথে এগিয়ে চলেছি। প্রায় আশি বছর আগে স্বামীজী অমরনাথ দর্শন করেছিলেন। তিনি তার আগের বছরও শরৎকালে কাশ্মীরে এসেছিলেন। সেবারে লোকমাতা নিবেদিতা তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। কিন্তু নিবেদিতার রচনা থেকেই আমরা সেবারের একটি সুন্দর ঘটনা জানতে পারি।

বাসে বসে বসে সেই কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম সেই পরমা সুশ্রী বর্ষীয়সী কাশ্মীরী ভদ্রমহিলার কথা। শ্রীনগরের পথে এগিয়ে চলেছেন ভারতপথিক বিবেকানন্দ। পথশ্রমে ক্লান্ত ও তৃষ্ণার্ত স্বামীজী পথের পাশে একখানি বাড়ি দেখতে পেলেন।

---

*অদূর ভবিষ্যতে উধমপুর পর্যন্ত রেলগাড়িতেই যাওয়া যাবে।

দেখলেন বাড়ির সামনে এক সুশ্রী প্রৌঢ়া বসে রয়েছেন। স্বামীজী তাঁর কাছে গিয়ে একগ্লাস জল চাইলেন।

ভদ্রমহিলা সস্নেহে স্বামীজীকে বসতে বললেন। যত্ন সহকারে তাঁকে জল এনে দিলেন। জল খেয়ে ও বিশ্রাম করে বিবেকানন্দের ক্লান্তি দূর হল। পরিব্রাজক সন্ন্যাসী আবার উঠে দাঁড়ালেন। বিদায় বেলায় সেই মহীয়সী মহিলাকে জিজ্ঞেস করলেন—মা, আপনি কোন্ ধর্মাবলম্বী?

সগৌরবে জয়োল্লাসিত স্বরে ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন—ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! প্রভুর কৃপায় আমি মুসলমানী।

উত্তর শুনে ভারি খুশী হয়েছিলেন বিবেকানন্দ। তিনি মাঝেমাঝেই ভক্তদের কাছে সেই ভদ্রমহিলার কথা বলতেন। নিবেদিতাকেও বলেছিলেন তাঁর কথা।

পরের বছর অর্থাৎ অমরনাথ দর্শনে যাবার পথেও স্বামীজী সবাইকে নিয়ে সেই ভদ্রমহিলার বাড়িতে বিশ্রাম নিয়েছিলেন। সেদিন সেই মুসলমান পরিবারের সবাই মিলে স্বামীজী ও তাঁর সঙ্গীদের প্রিয়জনের মতো অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। *

বাস এগিয়ে চলেছে। ছাড়িয়ে এসেছি উধমপুর। শুরু হয়েছে আঁকাবাঁকা চড়াই পথ। এমনি পথ চলবে আপার মুণ্ডা পর্যন্ত। তার আগে অতিক্রম করব বানিহাল টানেল। পৌঁছব কাশ্মীর উপত্যকায়।...

হ্যাঁ, ভূস্বর্গ কাশ্মীরে। অমরলোক-অমরনাথ ভূস্বর্গের অনিন্দ্যসুন্দর মোক্ষক্ষেত্র। আমরা সেই তীর্থযাত্রায় শামিল হয়েছি। কিন্তু যাত্রার কথা পরে হবে। প্রকৃত যাত্রা তো শুরু হবে পরশু সকালে, পহেলগাঁও থেকে। আজ বরং যাত্রীদের কথা হোক। যাত্রী মানে আমার সহযাত্রী। যাঁরা এই বাসে আমার সঙ্গে পহেলগাঁও চলেছেন।

প্রথমেই বলতে হবে করুণকৃষ্ণের কথা। কলেজের লেকচারার ডঃ করুণকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী। বয়সে যুবক, অবিবাহিত। কিন্তু আচারআচরণে প্রবীণ সাত্ত্বিক। ত্রি-সন্ধ্যা জপ-তপ করে। অসাধারণ স্মরণশক্তির অধিকারী।

বহুদিন থেকেই তার ইচ্ছে ছিল, একবার আমার সঙ্গে হিমালয়ে আসে। তাই এবারে সে সানন্দে সঙ্গী হয়েছে।

আমার আরেকজন বন্ধুও সঙ্গে চলেছে। তার নাম অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়। পেশায় ইঞ্জিনিয়ার, নেশা ভ্রমণ। সস্ত্রীক প্রায় সারা পৃথিবী ভ্রমণ করেছে। স্ত্রী শ্রীমতী ইনা ইংরেজীর অধ্যাপিকা ও সুলেখিকা—স্টেট্সম্যানে নিয়মিত ফিচার লেখে। এবারে অবশ্য সে সঙ্গে আসে নি। ছেলেমেয়েদের স্কুল চলছে, তাই আসতে পারে নি।

ওদের দুটি মেয়ে ও একটি ছেলে। বড় মেয়ে পিয়া ক্লাস এইটে পড়ে। ইংরেজী কবিতা লিখে 'রোটারি ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেনস কম্‌পিটিশন' জিতেছে। ভারত উপমহাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি হয়ে তাঁদের খরচে য়ুরোপ বেড়িয়ে এসেছে।

ছেলে অশেষ ক্লাস ফাইভ ও ছোটমেয়ে পাঞ্চালী ক্লাস ওয়ানে পড়ে।

আগেই বলেছি অসীম অতিশয় ভ্রমণপিপাসু। কয়েকবছর আগে সে অমরনাথ

---

*Notes of some 'Wanderings with the Swami Vivekananda'—by Sister Nivedita.

দর্শন করে গিয়েছে। তবু আবার সঙ্গী হয়েছে আমার।

আমরা পাঁচজন বসেছি সবার পেছনে, বাসের লম্বা সীটটাতে। দুপাশে জানালার ধারে বসেছে ব্রহ্মচারী ও অসীম আর মাঝখানে আমরা তিনজন—ফকিরবাবু, মিসেস মণ্ডল এবং আমি।

আমাদের সামনে ডানদিকের সীটে বসেছেন মিস্টার ও মিসেস ভট্টাচার্য আর বাঁদিকের সীটে তুলতুল ও অশোক।

মিস্টার কালিপদ ভট্টাচার্যও ইঞ্জিনিয়ার। মধ্যবয়সী স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ। মিসেস কিঞ্চিৎ স্থূলকায়া কিন্তু বেশ চলাফেরা করতে পারেন। ভদ্রমহিলা খুবই গুণী। নানা রকমের সেলাই ও বোনার কাজ জানেন। তবে তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি যেমন মজার মানুষ, তেমনি স্নেহশীলা। প্রচুর ফল বিস্কুট চানাচুর লজেন্স ও আচার ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে বাসে উঠেছেন এবং সমানে বিলিয়ে চলেছেন।

এই বিলোবার ব্যাপারটাতে মিসেস মণ্ডলও পিছিয়ে পড়ছেন না। আমি তাঁর পাশেই বসেছি। সুতরাং সুখে ভ্রমণ করছি।

শ্রীমতী তুলতুল মিস্টার ভট্টাচার্যের ছোট মেয়ে। ওরা তিন ভাই-বোন। দিদি আভার বিয়ে হয়ে গিয়েছে, দিল্লীতে থাকে। দাদা কল্যাণও ইঞ্জিনিয়ার।

তুলতুল সবে কৈশোর অতিক্রম করেছে। আমাদের দলের একমাত্র তরুণী। সুশ্রী স্মার্ট এবং আধুনিকা। সে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ. ক্লাসের ছাত্রী। বাংলায় অনার্স নিয়ে পড়ছে। কবিতা লেখে, আবৃত্তি করতে ও গান গাইতে পারে। এর আগে সে আর কখনও কোন দুর্গম তীর্থে যায় নি।

তুলতুলের পাশে বসেছে অশোক সাহাচৌধুরী। অবিবাহিত যুবক। ছোট-খাটো কর্মঠ মানুষ। সর্বদা ফিটফাট থাকে। ভ্রমণ করতে খুবই ভালবাসে। কেদার-বদ্রী ও গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী দর্শন করেছে।

মিস্টার ভট্টাচার্যের সামনের সীটে বসেছে গৌরী ও সরকারদা। গৌরী আমার পূর্বপরিচিতা। গতবছর সে আমাদের সঙ্গে কেদার-বদ্রী গিয়েছিল। গৌরী দেখতে সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী, বয়সে যুবতী, পেশায় শিক্ষয়িত্রী। ধর্মপরায়ণা পরিব্রাজিকা। রেলে উঠে আমাকে পেয়ে সে ভারি খুশি। এবং তখুনি বলে ফেলেছে, "ফকিরবাবুর কাছে ঘোড়াভাড়া জমা দিলেও আপনি যখন যাত্রায় যাচ্ছেন, আমি আর ঘোড়ায় উঠছি নে। আমি আপনার সঙ্গে হেঁটে যাব শঙ্কুদা!

সরকারদাও বলেছেন তিনি হেঁটে যাবেন। অথচ তাঁর মেয়ে-জামাই ও ছেলেরা বারবার বলে দিয়েছেন ঘোড়া নিতে। কেনই বা বলবেন না, তাঁরা সকলেই কৃতী। তার ওপরে সরকারদা ভাল চাকরি করতেন, এখন অবসর যাপন করছেন। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর বয়স প্রায় পঁয়ষট্টি। তিনি আমাদের দলের প্রবীণতম সদস্য।

তাহলেও আমি কিন্তু সরকারদার প্রস্তাব অনুমোদন করেছি। কারণ বয়স হলেও তাঁর স্বাস্থ্য খুবই ভাল। দীর্ঘদেহী সুপুরুষ। মানুষটিও ভারি অমায়িক। গতবছর তিনি হেঁটে কেদারনাথ গিয়েছিলেন। অতএব আপত্তি করব কেন?

হেঁটে যাবার কথা বলেছেন পরিতোষবাবু এবং মামা। বলেছে ভাগনে, অশোক ও ডাক্তার এবং আরও অনেকে। অতএব সেকথা এখন থাক। আর হাঁটাপথ তো শুরু হবে

পরশু থেকে। তখন দেখা যাবে কে হেঁটে যায় আর কে ঘোড়-সওয়ার হয়?

সরকারদার পাশের সারিতে বসেছেন পরিতোষবাবু ও তাঁর স্ত্রী। পরিতোষ মুখোপাধ্যায়ের পেশা চাকরি, নেশা তন্ত্রসাধনা। তাঁর পরনে প্যান্ট-শার্ট কিন্তু মাথায় জটা। প্রতি সন্ধ্যায় রুদ্রাক্ষের মালা গলায় দিয়ে ধ্যানে বসেন। তাহলেও ভদ্রলোক বেশ মিশুকে মানুষ।

পরিতোষবাবু রোগা ও কালো কিন্তু তাঁর স্ত্রী বেশ ফর্সা। স্বাস্থ্যটিও মন্দ নয়, তবে একটু খাটো। ভারি শান্ত-শিষ্ট ও মধুর স্বভাব। তিনিও নিয়মিত সন্ধ্যা-আহ্নিক করেন। ছেলে-মেয়েদের বাড়িতে রেখে স্বামীর সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছেন। কি করবেন, তীর্থয গার নেশা যে বড়ই দুর্জয় নেশা।

পরিতোষবাবুর সামনে বসেছে মামা ও ভাগনে। মামা বিষ্ণুপদ পাল, ভাগনে সুনীল নন্দী। দুজনেই ভাল চাকুরে, দুজনেই অবিবাহিত। মামার বয়স পাঁচের কোঠায়। সুতরাং তার বিয়ের বয়স অতিক্রান্ত। কিন্তু ভাগনে সবে তিনের ঘরে পা দিয়েছে। তার বেলায় সেকথা খাটে না। কিন্তু সে ইতিমধ্যেই রামকৃষ্ণ মিশনের একজন উৎসাহী শিষ্য বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

মামা কিন্তু হাল ছেড়ে দেয় নি। ভাগনে সুদর্শন ও শিক্ষিত। ভাল চাকরি করে। তার যৌবন অতিক্রান্ত হয়নি। অতএব ভাগনের সংসারী হওয়া সম্পর্কে মামা খুবই আশাবাদী। সুযোগ পেলেই সে ভাগনের কাছে বিয়ে-না-করার অসুবিধেগুলোর বিষয়ে বিবৃতি দান করে। কিন্তু ভাগনের তাতে কোন চিত্তচাঞ্চল্য হতে দেখি নি এখনও। আমাব ধারণা মামা বৃথাই বাক্যব্যয় করে চলেছে। শৈশবে পিতৃহীন ভাগনে মামার কাছে মানুষ হয়েছে, মামার কাছেই আছে, সুতরাং সে মামার মতই হবে।

তবে ভাগনে কিন্তু মামার মতো সৌখীন নয়। মামা সব সময় ধবধবে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে। তার দাড়িকাটা এবং স্নান ও প্রসাধন পর্ব দেখার মতো। মানুষটি উদার এবং রসিক। ভাগনেকে ছেলের মতো ভালোবাসে। আর সুযোগ পেলেই সবার জন্য খরচ করে।

মামা-ভাগনের পাশের সীটে বসেছে ডাক্তার ও তার মা। ডাক্তার অসিত মুখোপাধ্যায়, উৎসাহী যুবক। এম.বি.বি.এস. পাস করে সবে ডাক্তারি শুরু করেছে। তার বাবা নেই। ছেলে মায়ের দু-চোখের মণি। তাই দুর্গম যাত্রায় মা পুত্রের সঙ্গী হয়েছেন।

কলকাতা থেকে আমাদের সঙ্গে আরও একজন ডাক্তার এসেছে। নাম দীপক ভৌমিক। জলপাইগুড়ির ছেলে। সেও অসিতের সহপাঠী এবং আর.জি.কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত। তার সাহিত্যপ্রীতি অসাধারণ। চমৎকার আবৃত্তি করে। দেখতে সুন্দর, স্বাস্থ্যটি ভাল, অমায়িক ব্যবহার। এককথায় হিমালয় পথের আদর্শ সঙ্গী। কিন্তু আমরা তার সঙ্গলাভে বঞ্চিত হলাম। কারণ সে শ্রীনগর যাত্রীদের বাসে চলে গিয়েছে। দ্বিতীয় দলের সঙ্গে অমরনাথ দর্শন করবে।

আমাদের ডাক্তারও সঙ্গী হিসেবে মন্দ নয়। বেশ ভাল ছেলে। ডাক্তারের মা-ও সুন্দর গল্প বলেন। ভারি ধর্মপ্রাণা। আর তাই ব্রহ্মচারী মানে করুণকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর খুবই মনের মিল হয়েছে। গাড়িতে ব্রহ্মচারী তাঁকে অনেক ধর্মকথা শুনিয়েছে।

ডাক্তারের বাঁ পাশের সীটে বসেছে বাসুদেব ও অপর্ণা। বাসুদেব মুখোপাধ্যায়

মেদিনীপুরের ব্যবসায়ী। ব.াসে যুবক কিন্তু একটু আয়েসী। তবে ভ্রমণ করতে খুবই ভালবাসে। তাই স্ত্রী এবং মেয়েদের বাড়িতে রেখে নিজে অমরনাথ চলেছে। আগামী মাসে নাকি আবার মণিমহেশ যাবে।

বাসুদেবের পাশে বসেছে অপর্ণা—শ্রীমতী অপর্ণা অধিকারী। কৃষ্ণনগরের মেয়ে। সেখানেই একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সংস্কৃত শিক্ষয়িত্রী। আর তাই বাসে উঠবার পরে অসীম তাকে ব্রহ্মচারীর পাশে বসতে বলেছিল। বলেছিল—জুনিয়র কালিদাস আর জুনিয়র গার্গী, জমবে ভাল। ক্লাস নিতে নিতে পহেলগাঁও পৌঁছে যাবেন।

অসীমের সে পরামর্শ মানতে পারে নি অপর্ণা। সে বলেছে—তা যে হয় না অসীমদা?

—কেন? অসীম প্রশ্ন করেছে।

অপর্ণা উত্তর দিয়েছে—উনি অধ্যাপক আর আমি স্কুল মাস্টার। আমি কেমন করে ওঁর পাশে বসব? তার চেয়ে এই রেডিওর দোকানদারের পাশে পাশে থাকি, ভবিষ্যতে বিনে পয়সায় রেডিও সারানো যাবে।

রেডিওর দোকানদার বলায় বাসুদেব কিন্তু রেগে যায় নি, বরং সে বোধ করি খুশিই হয়েছে। কারণ অপর্ণা যেমন হাসি-খুশি, তেমনি ভাল কীর্তন গায়। জমিয়ে রাখতে জুড়ি নেই তার। তাছাড়া সে রেগে যাবেই বা কেন। বাসুদেবের যে সত্যই টি.ভি. এবং রেডিওর দোকান আছে।

আমার চিন্তায় বাধা পড়ে। পাশেব থেকে ফকিরবাবু বলে ওঠেন, "আমরা কূদ এসে গেলাম। এর পরেই বাটোট।"

তিনি বোধহয় আমাদের একটু আশ্বস্ত করে তুলতে চাইছেন। কারণ বেলা দুটো বেজে গিয়েছে। মিসেস ভট্টাচার্য ও মিসেস মণ্ডলের ফল-ফলাদি বহুক্ষণ আগে নিঃশেষিত। মুখে কেউ কিছু না বললেও সবারই খুব খিদে পেয়েছে। ফকিরবাবু তাই আশ্বস্ত করলেন—এর পরেই বাটোট অর্থাৎ আমাদের খাবার জায়গা।

কূদ জম্মু-শ্রীনগর পথের তৃতীয় উচ্চতম স্থান। উচ্চতা ৫৭০০ ফুট। আমরা জম্মু থেকে ৬৬ মাইল ও উধমপুর থেকে ২৪ মাইল এসেছি। এখান থেকে বাটোট মাত্র ১২ মাইল। তাছাড়া উৎরাই পথ। আমরা এবারে নিচে নামতে শুরু করব। বাটোটের উচ্চতা ৫১১৬ ফুট। সুতরাং খাবার জায়গা সত্যি এসে গেল।

কূদের ভেতর দিয়ে বাস চলেছে। মনে পড়েছে সেই ১৯৬২ সালের কাশ্মীর ভ্রমণের কথা। সেবারে সকালে পাঠানকোট থেকে রওনা হয়ে সন্ধ্যার সময় আমাদের বাস কূদে পৌঁছেছিল। আমরা ডাক বাংলোয় রাত্রিবাস করেছিলাম। কূদ গ্রীষ্মকালীন স্বাস্থ্যাবাস। এখানে একটি চমৎকার ঝরনা আছে।

থাক্‌গে, আবার আগের ভাবনায় ফিরে আসা যাক। সহযাত্রীদের ভাবনা। অপর্ণার সামনে পায়লটের বাঁদিকে লম্বা সীটটাতে বসেছে কুণ্ডু ট্র্যাভেল্‌স-এর চারজন কর্মচারী, দুজনের নাম জানি—গোপাল ও মায়া। ফকিরবাবুদের দার্জিলিঙে একটি হোটেল আছে, নাম—হোটেল কুণ্ডুস। মিসেস মণ্ডল সেটি দেখাশোনা করেন। মায়া সেখানকার কর্মচারী। এখন বর্ষাকাল, দার্জিলিঙের বাজার মন্দা। তাই মিসেস মণ্ডল মায়াকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। ভালই করেছেন। তরুণী মায়া রোগা হলেও খুব খাটতে পারে। আর সে

যেমন সেবাপরায়ণা, তেমনি মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে।

মায়ার পাশে বসেছে গোপাল—ফকিরবাবুর বাবা, প্রথম ভারতীয় ট্যুর কন্ডাকটার ঁশ্রীপতি কুণ্ডুর হাতে তৈরি গোপাল চক্রবর্তী। তার কথা আমি শুনেছিলাম অনেক দিন, এবারে পরিচয় হল। সত্যি খুশি হয়েছি ওর সঙ্গে পরিচিত হয়ে। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও মধুর স্বভাব। অসাধারণ কর্মঠ যুবক। চেহারাটি সুন্দর। এই ক'দিনেই সবাইকে আপন করে নিয়েছে। আমার সহযাত্রীদের অনেকেই ইতিপূর্বে তার সঙ্গে কোথাও না কোথাও বেড়াতে গিয়েছেন। তাঁরা প্রায় সকলেই বয়স নির্বিশেষে তাকে গোপালদা বলে ডাকেন।

তাঁদেরই একজন হঠাৎ বলে উঠলেন, "এটি কি ভাল হচ্ছে গোপালদা?"

"কেন মাসিমা?" গোপাল অভিযোগটা বোধহয় বুঝতে পারে নি।

মাসিমা বললেন, "সেই সকাল থেকে এই বিকেল পর্যন্ত একেবারে চুপচাপ।"

"ও আপনি গান গাইতে বলছেন?" গোপাল যেন নিজের থেকেই ধরা দেয়।

মাসিমা খুশি হন। বলেন, "আর যে চুপচাপ বসে থাকতে ভাল লাগছে না।"

"আমি গাইতে পারি, তবে একটি শর্তে।"

"কী?" সমস্বরে অনেকেই বলে ওঠেন।

"যে ক'খানা শুনতে চান গাইব, কিন্তু তারপরে আপনাদেরও গাইতে হবে।"

সবাই নীরব। একটু বাদে তুলতুল বলে, "বেশ, আমরাও গাইব। আপনি আরম্ভ করুন।"

গোপাল শুরু করে—

'আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার।
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর—
তোমারে করি নমস্কার॥
আমরা দিয়ে তোমাব জয়ধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গণি
ওগো কর্ণধার।
এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী, দাও গো করি পার—
তোমারে করি নমস্কার॥'
'আমরা নিয়েছি দাঁড়, তুলেছি পাল, তুমি এখন ধরো গো হাল
ওগো কর্ণধার।
মোদের মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন, ভাবনা কী বা তার—
তোমারে করি নমস্কার।
আমরা সহায় খুঁজে পরের দ্বারে ফিরব না আর বারে বারে
ওগো কর্ণধার।
কেবল তুমিই আছ আমরা আছি এই জেনেছি সার—
তোমারে করি নমস্কার॥'

দুই

গোরাদা দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাংলোর সামনে। বাস থামতেই তিনি তাড়াতাড়ি এসে দরজা খুলে দিলেন।

গোরাদা মানে গোরা মিত্র। ফকিরবাবুর বন্ধু। ভবানীপুরের এক বনেদি পরিবারের ছেলে। অকৃতদার। তীর্থদর্শন ও সাধুসঙ্গতেই তাঁর সবচেয়ে বেশি আনন্দ। এবছর কুম্ভমেলায় তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়েছে। কৈশোর বয়স থেকেই তিনি কুম্ভমেলায় যাচ্ছেন। আনন্দময়ী মা তাঁকে খুব স্নেহ করেন।

যাত্রার আয়োজন করতে ফকিরবাবুকে সাহায্য করেন গোরাদা। কয়েকজন কর্মচারীকে নিয়ে তিনি তাই গতকাল সোজা চলে এসেছেন বাটোট। আমাদের খাবার ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

গাড়ি থেকে নামতেই গোরাদা আমার একখানি হাত ধরলেন। পথ থেকে পাঁচধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি বাংলোর চত্বরে—বাটোট ট্যুরিস্ট্ বাংলো। পথের পাশে একটু উঁচুতে অনেকটা জায়গা জুড়ে বাংলো। সামনে সবুজ 'লন'। মাঝে মাঝে মরশুমী ফুলের গাছ। নানা রঙের ফুল ফুটে আছে।

বেশ চকচকে রোদ উঠেছে। আগেই বলেছি বাটোটের উচ্চতা ৫১১৬ ফুট। রোদটা ভারি মিঠে লাগছে। আগের বাসের অধিকাংশ যাত্রীরা তাই বাংলোর বারান্দায় কিংবা ভেতরে না গিয়ে থালা নিয়ে চত্বরেই বসে গিয়েছেন।

হঠাৎ কানে আসে, "দাদা! এখানে চলে আসুন।"

তাকিয়ে দেখি অজিত ও তার স্ত্রী একটু দূরে বসে খাচ্ছে। পাশে গৌরীদা ও তাঁর মা, অবিনাশদা ও বৌদি এবং মিস্টার ও মিসেস বোস।

কাছে এসে বসতেই অজিত বলে, "দাদা ট্রেনে পাশাপাশি সীটে এলাম আর আমাদের আলাদা বাসে দিয়ে দিলে?"

সহাস্যে বলি, "কি করবেন বলুন..."

"না, কি করবেন নয়, বলুন কি করবে।" অজিত আমাকে প্রায় এক ধমক লাগায়।

তাড়াতাড়ি বলি, "আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, এখন থেকে তুমিই বলব তোমাকে।"

একবার থেমে পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে আসি। বলি, "কি করবে বলো, পঁচাত্তর জন যাত্রী এক ট্রেনে এসেছি, সবাই তো আর এক বাসে যেতে পারব না। একটা দিন বৈ তো নয়, রাতেই দেখা হবে। কাল থেকে তো আবার একসঙ্গে থাকা ও পথ-চলা।"

"ঠিকই বলেছেন দাদা। কিন্তু বাসে আমাদের বড্ড একা একা লাগছে। ট্রেনে যাদের সঙ্গে পাশাপাশি ছিলাম, তাঁরা প্রায় কেউ নেই। যাঁরা আছেন, তাঁদের সঙ্গে এখনও পরিচয় হয় নি ভাল করে।"

"তাছাড়া," অজিত থামতেই মিঃ বোস বলে ওঠেন, "আমরা আবার সাহেব-মেমদের পাল্লায় পড়েছি।"

"সাহেব-মেম!" আমি বিস্মিত। আমাদের সঙ্গে তো য়ুরোপ বা আমেরিকার কোন যাত্রী নেই। অতএব বোসবাবুর দিকে তাকাই।

হেসে ওঠেন মিসেস বোস। জিজ্ঞেস করেন, "বুঝতে পারলেন না তো?"

আমি মাথা নাড়ি।

বৌমা মানে অজিতের স্ত্রীও খিলখিল করে হেসে ওঠে। মিসেস বোস হাসি থামিয়ে বলেন, "বাংলোর বারান্দার দিকে তাকান, দেখতে পাবেন তাদের।"

তাড়াতাড়ি চোখ ফেরাই। দেখি সেই অতি আধুনিক তিনজোড়া যুবক-যুবতী খেতে বসেছে। এবারে বুঝতে পারি ব্যাপারটা। ওরা সবাই বাঙালী। কথাবার্তাও বাংলাতেই বলে, তবে পোশাক, প্রসাধন এবং চাল-চলনে সাহেবীয়ানা প্রকট। ওদের সাহেব-মেম বলা যেতে পারে। কিন্তু সেটা ওদের নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার। ট্রেনে তো ওরা কোন গোলমাল করে নি। তাহলে বোসবাবু একথা বলছেন কেন?

বোসবাবুর হয়ে বৌমা জবাব দেয়, "আপনি জানেন দাদা, কুণ্ডু ট্র্যাভেল্স থেকে বলে দিয়েছে বাসে কে কোন্ সীটে বসবে?"

"হ্যাঁ, জম্মু-তাওয়াই স্টেশনে প্রত্যেক বাসের ম্যানেজার লিস্ট দেখে বলে দিয়েছে কার কত নম্বর সীট।"

"ওরা তা মানে নি। বাস আসতেই হুড়মুড় করে বাসে উঠে সামনের দিকে নিজেদের ইচ্ছে মতো বসে পড়েছে। পরে তাই নিয়ে ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া করেছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাবার জন্য বাসে যখন আমরা 'কোরাস' গাইতে শুরু করলাম, তখন ওরা ভুরু কুঁচকে বসে রইল। ভাবখানা—গান গাওয়ার চেয়ে বড় অসভ্যতা এ সংসারে যেন আর কিছুই নেই। আর তাই ওরা আমাদের সঙ্গে খেতে বসেনি, বারান্দায় বসে খাচ্ছে।"

আমাদের খাবার আসে। আমি অজিতের পাশে বসে পড়ি। ব্রহ্মচারী ও অসীম আমার পাশে বসে। আমরা খেতে শুরু করি।

অবিনাশদা ও অজিতদের খাওয়া হয়ে যায়। ওরা আমাদের আগে এসেছে। ওদের দু'খানি 'বাস'ই আমাদের আগে ছাড়বে। কিন্তু অজিতের ইচ্ছে সে আমাদের বাসে যায়। বলে, "ফকিরবাবুকে গিয়ে বলি, তিনি আর মিসেস মণ্ডল আমাদের সীটে চলে যান, আমরা দু-জন আপনাদের বাসে যাই।"

ফকিরবাবু হয়তো প্রস্তাবটা মেনে নেবেন, কিন্তু অজিতের বাস বদলটা অনেকের কাছে সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়াবে। যাত্রার শুরুতেই এমনটি হওয়া উচিত নয়। তাই বলি, "আর মাত্র ছ-সাত ঘণ্টার ব্যাপার, তারপরেই তো আবার দেখা হচ্ছে। যাত্রার সময় একসঙ্গে চলা যাবে। আজ বরং আর কোন 'চেঞ্জ' করো না।

অজিত প্রতিবাদ করে না। তবে সে চুপ করে থাকে। বুঝতে পারছি কথাটা তার ঠিক মনের মতো হয়নি।

আমি নীরবে খেতে থাকি।

ওদের বাসের ম্যানেজাররা বাঁশি বাজাচ্ছে। তার মানে এখুনি বাস ছাড়বে। অজিত ও বৌমা উঠে দাঁড়ায়। বোসবাবুরা আগে উঠেছিলেন।

"আসি তাহলে, আবার দেখা হবে।" বোসবাবু বলেন।

আমি মাথা নাড়ি।

বোসবাবু আবার বলেন, "একটা কথা বলা হয় নি আপনাকে।"

"বেশ তো বলুন।" আমি বলি।

একটু ভেবে নিয়ে বোসবাবু বলেন, "আমার হিমালয়প্রীতির মূলে কিন্তু আপনি। আপনার বই পড়েই আমি প্রথম হিমালয় দর্শন করেছি। তাই গাড়িতে উঠে যখন জানতে পারলাম, আপনি আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন, তখুনি ঠিক করলাম, আপনার সঙ্গেই বাবা অমরনাথকে দর্শন করব। নইলে আমরা ছিলাম দ্বিতীয় দলে, আজ আমাদের শ্রীনগর চলে যাবার কথা। ফকিরবাবুকে বলে দল বদল করলাম। অথচ দুর্ভাগ্য দেখুন, আপনি রইলেন ভিন্ন বাসে।"

"একে দুর্ভাগ্য বলে ভাবছেন কেন?" সহাস্যে প্রতিবাদ করি। বলি, "আমরা তো একসঙ্গেই বাবা অমরনাথকে দর্শন করব।"

"অগত্যা!" হাসতে হাসতে মিসেস বোস মন্তব্য করেন।

ওদের বাস ছেড়ে দেয়। আমরা হাত নেড়ে বিদায় জানাই। আমাদের বাস ছাড়তে দেরি আছে এখনও। এই অবসরে বরং বাটোটের পথে একটু পায়চারি করে নেওয়া যাক। আমি ও অসীম বাংলোর চত্বর থেকে নেমে আসি পথে। ব্রহ্মচারী অসিতের মায়ের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করছে। সুতরাং তাকে 'ডিস্টার্ব' করা উচিত হবে না।

পীচঢালা মসৃণ ও প্রশস্ত পথ। জায়গাটি বেশ নির্জন। পথের পাশে সারি সারি গাছ—চমৎকার ছায়া বিছিয়েছে। কিন্তু ক্লান্ত পথিক নেই বললেই চলে। লোকালয় কিংবা দোকানপাট নেই যে। দুজন মহিলা কেবল কিছু আপেল নিয়ে বসেছেন। মোটেই ভাল আপেল নয়। কিন্তু আমার সহযাত্রীরা যে কাশ্মীর ভ্রমণে এসে প্রথম আপেল কেনার সুযোগ পেয়েছেন। সুতরাং তাঁরা ভরা পেটে আপেল খাচ্ছেন।

চন্দ্রভাগার তীরে বাটোট একটি স্বাস্থ্যকর স্থান। ডরমিটারি, এবং বাংলো এখানকার প্রধান আশ্রয়স্থল। এখান থেকে চন্দ্রভাগার তীর দিয়ে পথ চলে গিয়েছে ভাদরওয়া ও কিশ্‌তোয়ার।

বাংলোয় ফিরে দেখি, বাস ছাড়তে দেরি আছে। ফকিরবাবুর খাওয়া হয় নি এখনও। খাবেন কেমন করে? তাঁর যে অনেক কাজ! কাল একদল যাত্রী আসছেন। দিন-চারেক বাদে আসবেন আরেকদল। তাঁরাও পহেলগাঁও এবং শ্রীনগরের পথে এখানেই লাঞ্চ করবেন। ফকিরবাবুকে সব ব্যবস্থা করে যেতে হবে। অতএব তিনি গোরাদার সঙ্গে কন্‌ফারেন্স করছেন।

কন্‌ফারেন্স শেষ হয়। ফকিরবাবু খেতে বসেন। গোরাদাও খান নি। কিন্তু তিনি বসবেন সবার শেষে। তিনি যে আমাদের হোস্ট্। গৃহস্বামী তো নিমন্ত্রিতদের খাবার পরেই খেতে বসেন।

খাবার জন্য নয়, গোরাদারও একই আপসোস—একসঙ্গে কাশ্মীর এসেও আমার সঙ্গে অমরনাথ দর্শন করতে পারলেন না।

মনটা খারাপ হয়ে যায়। এবারে আমার যাত্রায় আসার পেছনে তাঁরও কিছু অবদান রয়েছে। কুণ্ডু-ট্র্যাভেল্স-এর অফিস থেকে তিনি আমাকে প্রায়ই ফোন করতেন। রওনা হবার আগের দিন যখন গৌতমের অসুখের কথা জানালাম তখন গোরাদা বলেছিলেন—যাঁর যাত্রায় যাচ্ছেন, তিনিই আপনার ছেলেকে দেখবেন। আপনি চলুন। কথাটা সেদিন বড় ভাল লেগেছিল।

ফকিরবাবু ভরসা দেন, "একসঙ্গে যাত্রায় না গেলেও যাত্রাপথে দেখা হবে

আপনাদের। আর আপনারা একই সঙ্গে শ্রীনগরে থাকবেন এবং কলকাতায় ফিরবেন।"

"অর্থাৎ দুধের সাধ ঘোল দিয়ে মেটাতে হবে, এই তো!" গোরাদা বলে উঠলেন।

গোরাদা দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাংলোর সামনে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন। আমরা বাসে বসে হাত নাড়ছি। বাস চলল এগিয়ে, গোরাদা গেলেন হারিয়ে।

জম্মুর পরে এতক্ষণ আমরা উত্তর-পূর্বে এসেছি। বাটোট থেকে পথের দিক পরিবর্তন ঘটল। এখন আমরা সোজা উত্তরে যাব। এইভাবে এগোবো বানিহাল পর্যন্ত। বানিহাল বাটোট থেকে ৪০ মাইল।

বানিহালের উচ্চতা ৫৫৮০ ফুট। তার মানে বানিহাল বাটোটের চেয়ে প্রায় পাঁচশ' ফুট বেশি উঁচু।

তাহলে এখন কিন্তু আমরা নেমে চলেছি। কূদের পর থেকে যে উৎরাই শুরু হয়েছে, তা শেষ হয় নি এখনও, বরং বেড়েছে।

বানিহাল নয়, আমরা এখন রামবান চলেছি। রামবান বাটোট থেকে ১৭ মাইল। রামবানের উচ্চতা ২২৫০ ফুট। তার মানে মাত্র ১৭ মাইলে আমাদের তিন হাজার তিনশ তিরিশ ফুট নেমে যেতে হবে। রামবানের পর থেকে শুরু হবে খাড়া চড়াই।

বাস এগিয়ে চলেছে। আমরা এগিয়ে চলেছি অমরতীর্থ-অমরনাথ পথে। আগামীকাল এসময় থাকব পহেলগাঁও। পরশু চন্দনবাড়ির পথে পদচারণা করছি। প্রায় দশমাস পরে আবার হিমালয়ের পথে। ভাবতেও ভাল লাগছে।

কিন্তু ভাবনা থামাতে হল। পাশের থেকে ফকিরবাবু প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা, অমরনাথ যাত্রার ওপরে ক'খানা বাংলা বই আছে?"

বিপদে পড়ে যাই। আমি সাহিত্যিক কিংবা সাহিত্য-সমালোচক নই। চট করে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন আমার পক্ষে। তবু একটু ভেবে নিয়ে বলি, "যতদূর মনে পড়ছে শুধু অমরনাথ যাত্রা নিয়ে খানতিনেক বাংলা বই পড়েছি।"

"আরেকখানি হবে আশা করছি?" মাঝখান থেকে মিসেস মণ্ডল প্রশ্ন করে বসেন।

মৃদু হেসে বলি, "এখুনি বলা শক্ত। তবে ভাল লাগলে লিখব, ভেবেছি।"

"তাহলে লিখতে হবে।" মিসেস মণ্ডলের কণ্ঠস্বরে গভীর আত্মপ্রত্যয়। "এপথ আপনার ভাল লাগবেই।"

কোন প্রতিবাদ করি না। চুপ করে থাকি।

ফকিরবাবু আবার জিজ্ঞেস করেন, "শুধু অমরনাথের ওপরে কি কি বই আছে।"

"দেবপ্রসাদ দাশগুপ্তের 'একই আকাশ ভুবন জুড়ে', শঙ্করপ্রসাদ রায়ের 'তুষারতীর্থ অমরনাথ' এবং দ্বিজেশ ভট্টাচার্যের 'অমরনাথের পথে পথে।' তবে আরও কয়েকখানি বাংলা বইতে আমরা অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে অমরনাথ যাত্রার বিশদ বিবরণ পাই।"

"যেমন?" এবারে মিসেস মণ্ডল প্রশ্ন করেন।

উত্তর দিই, "ভগিনী নিবেদিতার বইখানি, বাংলা অনুবাদে স্বামীজীর অমরনাথ দর্শনের কথা আছে। * আমরা অমরনাথের কথা পাই ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত বিশ্বকোষ প্রথমভাগে, স্বামী অভেদানন্দের 'কাশ্মীর ও তিব্বতে', প্রবোধকুমার সান্যালের 'দেবাতাত্মা

---

* 'স্বামীজীর সহিত হিমালয়ে।'

হিমালয়ে', স্বামী দিব্যাত্মানন্দের 'পুণ্যতীর্থ ভারতে' এবং 'রম্যাণিবীক্ষে।"

"এর মধ্যে কার বর্ণনাটি আপনার সবচেয়ে ভাল লেগেছে?"

"প্রবোধদা ও স্বামী অভেদানন্দের বর্ণনা।"

"প্রবোধবাবুর বই আমি পড়েছি, আপনি অভেদানন্দের কথা বলুন।"

একটু ভেবে নিয়ে বলতে থাকি, "স্বামী অভেদানন্দজী ১৯২১ সালের শেষ দিকে আমেরিকা থেকে বেলুড়ে ফিরে আসেন। পরের বছর জুলাই মাসেই তিনি হিমালয় ভ্রমণে বের হন এবং কাশ্মীর লাদাখ ও তিব্বত ভ্রমণ করে ১২ই ডিসেম্বর বেলুড়ে ফিরে যান।"

"তার মানে তিনি সেবারে এক নাগাড়ে পাঁচ মাস হিমালয়ে ঘুরেছেন?"

"হ্যাঁ। ভৈরব চৈতন্য নামে জনৈক ব্রহ্মচারী সেই পদপরিক্রমায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনিই অভেদানন্দের ডায়েরি ও অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্যে বইখানির প্রথম পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করেন। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের মে মাস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ-এর মুখপত্র 'বিশ্ববাণী'তে ভ্রমণকাহিনীটি ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। ১৯৪৩ সালে অভেদানন্দ প্রকাশিত কাহিনীটি সংশোধন করে 'পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ' নামে পুস্তক আকারে মুদ্রিত করেন। ২৩ বছর বাদে 'কাশ্মীর ও তিব্বতে' নাম দিয়ে বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এই বইখানি হিমালয়ের ওপরে রচিত বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের একখানি অমূল্য সম্পদ।'

আর কেউ কোন প্রশ্ন করে না। অতএব বাসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই। রামবানের রাস্তা দিয়ে বাস চলছে। রামবান বেশ বড় জায়গা। ডাকবাংলো আছে।

আমাদের সকলের গায়েই গরম পোশাক। অথচ রামবানের উচ্চতা মোটে ২২৫০ ফুট। ফলে বেশ গরম লাগছে।

কিন্তু সে কথা প্রথম বলে তুলতুল। সে গা থেকে কোট খুলে ফেলে বলে ওঠে, "বড্ড গরম লাগছে।"

"তাহলেও কোটটা গায়ে দিয়ে রাখো।" মিসেস মণ্ডল তুলতুলকে সাবধান করেন। বলেন, "এখুনি বাস আবার ওপরে উঠতে শুরু করবে, তখন ঠাণ্ডা লেগে যাবে।"

তুলতুল তাড়াতাড়ি কোট গায়ে দেয়।

মিসেস মণ্ডল ঠিকই বলেছেন। রামবান এ পথের নিম্নতম স্থান। এখন আমরা বানিহালের দিকে চলেছি। বানিহাল ৫৮৮০ ফুট। রামবান থেকে বানিহাল মাত্র ২৩ মাইল। তার মানে ২৩ মাইলে ৩৬৩০ ফুট ওপরে উঠতে হবে। শুধু তাই নয়, তারপরেও উঠতে হবে ওপরে। পৌঁছব শ্রীনগর বাসপথের উচ্চতম স্থান আপার-মুণ্ডায়। আপার-মুণ্ডা ৭২২৪ ফুট উঁচু।

"আচ্ছা, স্বামী অভেদানন্দ যখন অমরনাথে এসেছিলেন, তখনও কি পহেলগাঁও থেকেই মূলযাত্রা আরম্ভ হত?" মিসেস মণ্ডল আবার আমাকে পুরনো প্রসঙ্গে ফিরিয়ে আনতে চান।

ফিরে আসার দোষ কি? এখনও দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হবে। অতএব চুপচাপ বসে না থেকে সেকালের যাত্রা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক না, সময়টা সুন্দর কেটে যাবে। সুতরাং বলি, "অমরনাথজীর ছড়ি নিয়ে যে তীর্থযাত্রা, তা সেকালের মতো একালেও

শ্রীনগর থেকে শুরু হয়। তবে একালে যাত্রা বলতে আমরা যা বুঝি, তা প্রকৃতপক্ষে পহেলগাঁও থেকেই আরম্ভ হয়।”

“হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। ছড়ি তো থাকে শ্রীনগরে দশনামী আখড়াতে।” কথাটা মনে পড়ে মিসেস মণ্ডলের। তিনি যে প্রায় প্রতিবার যাত্রায় আসেন। মিসেস বলেন, “যাক্‌গে, স্বামী অভেদানন্দজী কিভাবে যাত্রায় এসেছিলেন, তাই বলুন।”

বলতে থাকি, “অভেদানন্দজী একখানি সরকারি মোটরে চড়ে ২রা অগাস্ট শ্রীনগর থেকে পহেলগাঁও যাত্রা করেছিলেন। আগেই দু’খানি সরকারি টাঙ্গায় করে তাঁর মালপত্র পহেলগাঁও রওনা করে দেওয়া হয়েছিল।”

“শ্রীনগর থেকে পহেলগাঁও মোটরপথে ৬০ মাইল। এখন এই পথটুকু যেতে যাত্রীদের মাত্র দু-তিন ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু তখন দিন তিনেক সময় লাগত। অথচ তখনও আইশমোকাম অর্থাৎ শ্রীনগর থেকে ৪০ মাইল মোটরপথ তৈরি হয়ে গিয়েছিল।”

“তাহলে অত সময় লাগত কেন?”

“কারণ তখনকার মোটরপথও ছিল ভয়ঙ্কর এবং দুর্গম। তাই খুব আস্তে আস্তে গাড়ি চালাতে হত।”

“তাছাড়া তখন তো এত শক্তিশালী মোটরগাড়িও ছিল না।” ফকিরবাবু মিসেস মণ্ডলকে মনে করিয়ে দেন।

মিসেস মাথা নাড়েন। তারপরে আমাকে জিজ্ঞেস করেন, “তখনও কি সরকার থেকে যাত্রার ব্যবস্থা করা হত?”

“হ্যাঁ, তখনও কাশ্মীর রাজ-সরকারের ধর্মার্থ বিভাগ ছিল। তাঁরাই যাত্রার সব ব্যবস্থা করতেন। প্রতিবছর রাজভাণ্ডার থেকে তাঁদের হাতে বারো হাজার করে টাকা দেওয়া হত। তাঁরা সেই টাকা দিয়ে রাস্তা ও সেতু তৈরি করতেন, দরিদ্র যাত্রী ও সাধুদের খাবার ও কম্বল দান করতেন। তাঁদের স্বেচ্ছাসেবকরা যাত্রীদের দুধ কাঠ কুলি ও ঘোড়া যোগাড় করে দিতেন! ছোট একটি বাজারও যাত্রার সঙ্গে যেত। সেবারে অর্থাৎ ১৯২২ সালে প্রায় পাঁচশ যাত্রী যাত্রায় গিয়েছিলেন।”

“মোটে পাঁচশ!” মিসেস মণ্ডল বিস্মিতা। বলেন, “এবারে তো অনুমান করা হচ্ছে, শুধু পূর্ণিমার যাত্রাতেই পঁচিশ হাজার যাত্রী হবে।”

“খুবই স্বাভাবিক।” মাঝখান থেকে অসীম বলে ওঠে, “দেশ এগিয়ে চলেছে।”

প্রবল হাস্যরোল।

হাসি থামলে আবার বলতে শুরু করি, “শ্রীনগর থেকে আইশমোকাম পর্যন্ত রাস্তা কিন্তু বেশ চওড়া ছিল। তবে কাঁচা রাস্তা, বৃষ্টি পড়লেই অগম্য হয়ে উঠত।

“আইশমোকাম জায়গাটি বেশ বড় ছিল। অভেদানন্দজীর প্রায় পঁচিশ বছর আগে স্বামীজী অমরনাথ এসেছিলেন। তখনও আইশমোকাম বেশ বড় জায়গা। স্বামীজী সদলবলে রাত্রিবাস করেছিলেন সেখানে।

“অভেদানন্দজী আইশমোকামে মোটর ছেড়ে দিয়ে ঝাম্পান বা ডাণ্ডিতে চড়ে পহেলগাঁও গিয়েছিলেন। আইশমোকাম থেকে পহেলগাঁও ১২ মাইল। তখন সেপথে মোটর চলতে পারত না, তবে মোটরপথ তৈরি হচ্ছিল। অভেদানন্দ সকালে

আইশমোকাম থেকে রওনা হয়ে সন্ধ্যার সময় পহেলগাঁও পৌছেছিলেন। অর্থাৎ শ্রীনগর থেকে মোটরে ও ঝাম্পানে ৬০ মাইল পথ যেতে তাঁর তিনদিন লেগেছিল।..."

"শঙ্কুদা দেখুন, দেখুন..."

তুলতুলের কথায় কথা থামিয়ে তাড়াতাড়ি সামনে তাকাই—বানিহাল গিরিবর্ত্ম। সত্যি সুন্দর।

কিছুক্ষণ আগে সন্ধে হয়েছে। আঁধার নেমে এসেছে পথ আর পাহাড়ের গায়ে, বন আর নদীর বুকে। বাসের আলো ছাড়া আর কোথাও কোন আলো ছিল না। আঁধারের যবনিকা ভেদ করে বাস এগিয়ে চলেছিল।

প্রায় ছ'হাজার ফুট উঁচু দিয়ে বাস চলেছে। শীত শীত করছিল বলে বাসের জানলা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কেউ চাদর মুড়ি দিয়ে গল্প করছিলাম আর কেউ বা ঝিমুচ্ছিলেন। শুধু তুলতুল বোধহয় তাকিয়েছিল সামনের উইন্ডস্ক্রিনের ভেতর দিয়ে, তাই সে প্রথম দেখতে পেয়েছে!

দেখতে পেয়েছে ঐ আলোর সুড়ঙ্গ। একটি নয়, পাশাপাশি দুটি সুড়ঙ্গ—বানিহাল গিরিবর্ত্ম। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। আমরা অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকি।

যাঁরা ঝিমোচ্ছিলেন, তাঁদের তন্দ্রা টুটে গিয়েছে। যাঁরা কাত হয়েছিলেন, তাঁরা সোজা হয়ে বসেছেন। আমরা যারা গল্প করছিলাম, তারা নীরব হয়েছি। নীরবে আলোর গুহাদুটিকে দেখছি।

গতবার দিনের আলোয় দেখেছিলাম এই বানিহাল নেহেরু টানেল। কিন্তু তখন এত ভাল লাগে নি। আজ রাতের আঁধারে দেখলাম তার প্রকৃত রূপ। অবশ্য এরূপ আলোর রূপ—বৈদ্যুতিক আলোর। ভাগ্যিস 'লোড-শেডিং' হয়নি।

১৯৫৬ সালে এই টানেল নির্মিত হয়েছে, তার আগে ৯০০০ ফুট উঁচু বানিহাল গিরিবর্ত্মের ওপর দিয়ে কাশ্মীরে আসতে হত। শীতকালে তুষারঝড় ও তুষারপাতের জন্য সে পথ হয়ে উঠত অগম্য। 'বানিহাল' শব্দের অর্থ তুষারঝড়। শীতের চারমাস ঐ গিরিবর্ত্মে তুষারঝড় লেগেই থাকে। ফলে তখন কাশ্মীর উপত্যকা ও লাদাখের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের কোন যোগাযোগ থাকত না। এই টানেল তৈরি হবার পর থেকে সেই অসুবিধে দূর হয়েছে। এখন কাশ্মীর আমাদের নিকটতর।

টানেলের ভেতরে সারি সারি আলো জ্বলছে। একপাশে পথচারীদের জন্য ফুটপাত। পাশে নর্দমা, কারণ গুহার গা বেয়ে অবিরত জল চুইয়ে পড়ছে। আধুনিক স্থাপত্যশিল্পের একটি অনবদ্য অবদান এই টানেল। সহযাত্রীরা তাই মুগ্ধ নেত্রে আলোর সুড়ঙ্গ দেখছেন।

পেরিয়ে এলাম বানিহাল টানেল, পৌঁছলাম কাশ্মীর উপত্যকায়। কিন্তু ভূস্বর্গের স্বর্গীয় রূপের সামান্যই দেখতে পাচ্ছি কাচের জানলার ভেতর দিয়ে। শুধু বলতে পারি মেটে জোছনা তাকে মোহময়ী করে তুলেছে।

তাছাড়া আমার অধিকাংশ সহযাত্রী বাসযাত্রার ধকলে রীতিমত ক্লান্ত। বানিহাল ছাড়াবার পরেই আবার তাঁরা সীটের ওপর মাথা এলিয়ে দিয়েছেন, চোখ বুজে তন্দ্রার আরাধনায় মনোনিবেশ করেছেন।

আমার হাসি পাচ্ছে, নিজেদের শারীরিক শক্তিহীনতার কথা ভেবে হাসি পাচ্ছে।

বিজ্ঞান আমাদের কি রকম শ্রমবিমুখ করে তুলেছে! আর তাই প্রকৃতির প্রতি আমাদের মমত্ববোধ হ্রাস পেয়েছে, বৈচিত্র্যের প্রতি আমাদের আগ্রহ গিয়েছে কমে।

জম্মু থেকে ডিলাক্স বাসে চড়ে এই পথটুকু আসতেই আমরা শ্রান্ত হয়ে পড়েছি! আর সেকালে, বিশেষ করে মোগল যুগে? সম্রাটরা তো আগ্রা কিংবা দিল্লী থেকে হাতি চড়ে নিয়মিত কাশ্মীরে আসতেন।

কাশ্মীরের অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে সম্রাট আকবর ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে কাশ্মীর অধিকার করেন। জাহাঙ্গীরের প্রিয়তম স্থান ছিল কাশ্মীর। তিনি বার বার কাশ্মীরে এসেছেন। এই কাশ্মীর থেকে ফেরার পথেই ১৬২৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন। এখানে এসেছেন শাজাহান। তাঁরাই নির্মাণ করেছেন মোগল উদ্যান—চশমা শাহী, নিশাত বাগ, শালিমার বাগ ও নাসীম বাগ। তৈরি করেছেন অচ্ছাবল ও ভেরীনাগ। প্রকৃতিকে কতখানি ভালবাসলে অত কষ্ট করে এত দূরে আসা যায়? সত্যই তাঁদের প্রকৃতিপ্রেম অতুলনীয়।

যাকগে, যেকথা ভাবছিলাম। গতবার বানিহাল গিরিবর্ত্ম পেরিয়ে এপারে এসে আমরা বাস থামিয়েছিলাম। দিনের আলোয় প্রথম ভূস্বর্গকে দেখেছিলাম। আমি মুগ্ধ আবেশে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়েছিলাম প্রকৃতির অপরূপ লীলানিকেতনের দিকে। দু'দিকে দিগন্তের কাছে পাহাড়ের আঁকাবাঁকা ধূসর রেখা। নীল আকাশের বুকে সাদা মেঘের লুকোচুরি খেলা। আর মাটিতে...। মাটিতে সবুজ, শুধু সবুজ-সমতল। আমাদের পথটি সেই সবুজের জগতে গিয়ে মিলেমিশে একাকার। সবুজ উপত্যকার বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে একটি রুপোলী নদী। অনেক দূর গিয়ে সে-ও সবুজের মাঝে গিয়েছে হারিয়ে।

আজ ভূস্বর্গের সেই অপরূপ রূপ আমি দেখতে পেলাম না দু'চোখ ভরে। রাতের আঁধার আজ আড়াল করে রেখেছে তাকে।

তাই পায়লট গাড়ি থামায় নি। গাড়ি এগিয়ে চলেছে। আরও ২৪ মাইল এগিয়ে আমরা পৌঁছব ভেরীনাগ পথের সঙ্গমে। সেখান থেকে কাশ্মীরের প্রাণধারা ঝিলমের উৎস ভেরীনাগ মাত্র ২ মাইল। যাতায়াতের পথে সব সরকারি ট্যুরিস্ট্ বাস যাত্রীদের ভেরীনাগ নিয়ে যায়!

"ফকিরকাকু, আমরা কি তাহলে ভেরীনাগ দেখছি না?" তুলতুল হঠাৎ প্রশ্ন করে। সে-ও বোধকরি আমার মতই ভেরীনাগের কথা ভাবছিল বসে বসে। আমি তো তবু একবার দেখেছি সেই মনোরম স্থান। কিন্তু তুলতুল এই প্রথম কাশ্মীরে এল।

ফকিরবাবু আশ্বস্ত করেন তাকে। বলেন, "দেখব বৈকি! তবে আজ নয় আজ যে রাত হয়ে গেল। ফেরার দিন তোমাদের ভেরীনাগ দেখিয়ে দেব।"

"সেদিন আবার রাত হবে না তো?" তুলতুল নিশ্চিন্ত হতে চাইছে।

এবারে মিসেস মণ্ডল জবাব দেন। মৃদু হেসে বলেন, "সেদিন তো সকালে শ্রীনগর থেকে রওনা হবে। দুপুরের আগেই পৌঁছে যাবে ভেরীনাগ।"

"মনে থাকে যেন।"

ফকিরবাবু ও মিসেস মণ্ডল সমস্বরে প্রতিশ্রুতি দেন, "নিশ্চয়ই থাকবে।"

আর সে প্রতিশ্রুতিতে শুধু তুলতুল নয়, সহযাত্রীরা প্রায় সকলেই পুলকিত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু ফেরার যে অনেক দেরি। সুতরাং সে ভাবনা এখন থাক।

ভেরীনাগ পথের সঙ্গম ছাড়িয়ে মাইল পাঁচেক এগিয়ে গেলে আপার-মুণ্ডা—জম্মু-শ্রীনগর পথের উচ্চতম স্থান, ৭২২৪ ফুট। আপার-মুণ্ডা স্বাস্থ্যকর স্থান। সেখানে একটি ডাকবাংলো আছে।

আপার-মুণ্ডা থেকে ১০ মাইল এগিয়ে আমরা পৌঁছব কাজিকুণ্ড্—একটি ছোট জনপদ। ডাকবাংলো আছে।

কাজিকুণ্ড্ থেকে আরও ১২ মাইল এগিয়ে খানাবল—জম্মু-শ্রীনগর-পহেলগাঁও পথের সঙ্গম। তার মানে সেখান থেকে আমাদের পথ যাবে বেঁকে! খানাবল থেকে শ্রীনগর ৩২ মাইল ও পহেলগাঁও ২৮ মাইল। খানাবল একটি সমৃদ্ধ শহর, উচ্চতা ৫২৩৬ ফুট। সেখান থেকে আরেকটি পথ গিয়েছে জেলাসদর অনন্তনাগে।

অমরনাথ থেকে শ্রীনগরে ফিরে একদিন যেতে হবে অনন্তনাগ। দেখতে হবে সেই অভিনব উদারতীর্থটিকে। একই ঝরনার তীরে পাশাপাশি তিনটি তীর্থ—একটি মন্দির, একটি গুরুদ্বার ও একটি মসজিদ। একই ঝরনার জলে পুণ্যস্নান করেন হিন্দু, শিখ ও মুসলমান ভক্তবৃন্দ। কাশ্মীরে যখন এসেছি, আমাকে আরেকবার যেতেই হবে সেই মহামানবের মিলনতীর্থে।

কিন্তু সে-ও তো ফেরার পথে। ফেরার এখনও অনেক দেরি। সুতরাং সেকথা আজ নয়। আজ পহেলগাঁও পথের কথা হোক—অমরতীর্থ-অমরনাথের পথ।

খানাবল থেকে পথের দিক পরিবর্তিত হবে। উত্তরের পথ ছেড়ে আমরা উত্তর-পুবের পথে এগিয়ে যাব। পথে পড়বে মার্তণ্ড মন্দির ও আইশমোকাম।

ঝরনাবিধৌত নতুন মার্তণ্ড মন্দিরটি ভারি সুন্দর। মার্তণ্ড একটি বর্ধিষ্ণু জনপদ। অমরনাথের পূজারীরা বাস করেন সেখানে। তার চেয়েও বড় কথা সেই জনপদের অনতিদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন মার্তণ্ড মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসে ডঃ এরিক ফন্ দানিকেন এসেছিলেন। সেখানে 'গাইগার কাউন্টার' যন্ত্র দিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন যে মন্দিরের উত্তরদ্বারে বাহান্ন মিটার দীর্ঘ ও দেড় মিটার প্রশস্ত জায়গা অসম্ভব রকম তেজস্ক্রিয়। জায়গাটি উত্তর দ্বারের বাইরে থেকে মন্দিরের বেদি পর্যন্ত প্রসারিত। বেদির নিচের অংশে তেজস্ক্রিয়তা সবচেয়ে তীব্র। তাঁর বক্তব্য আড়াই হাজার বছর আগে গ্রহান্তরের মানুষদের সেই মহাকাশযান ইজেকিয়েল-কে নিয়ে ওখানে অবতরণ করেছিল। *

মহাকাশযান অবতরণ করার পরে সেখানে তেজস্ক্রিয়তার অবশেষ ফেলে গেলে সেখানকার মাটি তেজস্ক্রিয় হবে কিন্তু সেই তেজস্ক্রিয়তা আড়াই হাজার বছর পরেও এত বেশি থাকতে পারে কি না এবং বেদিমূলেই বা তেজস্ক্রিয়তা তীব্রতম কেন—তা নিয়ে পণ্ডিত মহলে নানা আলোচনা চলেছে। আমি পণ্ডিত নই সুতরাং সে আলোচনার অধিকার আমার নেই। আমার শুধু ইচ্ছে, কাশ্মীরে যখন আবার এসেছি, তখন ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরটিকে দেখে যাব একবার।

কথাটা ফকিরবাবুকে বলতে তিনি সেই একই কথা বলেন, "ফেরার পথে শ্রীনগর

---

* ডঃ দানিকেনের 'দেবতারা কি গ্রহান্তরের মানুষ' ও 'আবির্ভাব' গ্রন্থ দু'খানি দ্রষ্টব্য।

থেকে ট্যাক্সি নিয়ে একদিন এসে দেখে যাবেন Martand ruins। গোপাল সব ব্যবস্থা করে দেবে।"

অতএব খুশি হই। কাচের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাই। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত কাশ্মীর উপত্যকাকে এখনও তেমনি মোহময়ী মনে হচ্ছে।

বাস এগিয়ে চলেছে পহেলগাঁওয়ের পথে—যে পহেলগাঁও থেকে শুরু হবে অমরতীর্থ-অমরনাথের পথ-পরিক্রমা।

তিন

সকালে জলখাবার খেয়ে নিয়েই আমরা বেরিয়ে পড়লাম নিউ পাইনভিউ হোটেল থেকে। আমরা মানে সরকারদা মামা-ভাগনে বাসুদেব অশোক অসীম ব্রহ্মচারী ও আমি। সঙ্গে কোন মহিলা নেই বলে ফকিরবাবু হোটেলের তিনতলায় একপ্রান্তে পাশাপাশি দু'খানি ঘর দিয়েছেন আমাদের। ঘরগুলো ভালই—সামনে প্রশস্ত বারান্দা, লাগোয়া বাথরুম। চারখানি করে খাট। ব্রহ্মচারী সরকারদা ও অসীমের সঙ্গে আমি একঘরে রয়েছি। পাশের ঘরে মামা-ভাগনে বাসুদেব ও অশোক।

গতকাল রাত এগারোটায় বাস পহেলগাঁও পৌঁছেছে। পহেলগাঁও ৭৫০০ ফুট উঁচু। কাজেই তখন বেশ জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। একে গভীর রাত, তার ওপরে শীত। সুতরাং কাল পহেলগাঁওয়ের সঙ্গে দেখা হয় নি বললেই চলে। ভালই হয়েছে। আজ সকালে সোনালি রোদের ওড়না মাথায় পহেলগাঁওয়ের সঙ্গে শুভদৃষ্টি হল।

হোটেল থেকে বাঁধানো উৎরাই পথ বেয়ে আমরা বাজারের দিকে চলেছি। পথের ডানদিকে ঘাসে-ছাওয়া সবুজ প্রান্তর। আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে পাশের পাহাড়ে মিশেছে। পাহাড়ে পাইনের সারি। এখানকার ফিকে-সবুজ ওখানে গিয়ে ঘন-সবুজ রয়েছে।

পথের বাঁদিকে বাড়ি-ঘর, হোটেল আর কটেজ। তারপরে প্রধান সড়ক, আরেক সারি বাড়ি-ঘর। অবশেষে লিডার—পহেলগাঁওয়ের প্রাণধারা নীলগঙ্গা। এই রমণীয় শৈলাবাসের আরেকনাম লিডার উপত্যকা।

লিডার নদীর মূল-ধারাটির জন্ম হয়েছে পহেলগাঁও থেকে ২২ মাইল দূরের কোলাহাই হিমবাহে। 'কোল্‌হা' শব্দের অর্থ নদী। পর্যটকরা অনেকেই এখানে এলে উৎসটি দেখে যান। তিন দিন সময় লাগে। খুব সকালে পলেহগাঁও থেকে যাত্রা করলে ৭ মাইল চড়াই ভেঙে দুপুরে ৮৯৫২ ফুট উঁচু আরু গ্রামে পৌঁছনো যায়। আরুতে খাওয়া সেরে আরও ৮ মাইল চড়াই পেরিয়ে লিডারওয়াট (৯৭২০)। সেখানে রাত্রিবাস করে পরদিন সকালে তাঁরা ৮ মাইল দুর্গম পথ অতিক্রম করে কোলাহাই (প্রায় ১১,০০০) যান। লিডারের অপরূপ উৎস দর্শন করে সন্ধের আগেই লিডারওয়াটে নেমে আসেন। পরদিন তাঁরা ফিরে আসেন পহেলগাঁও। অনেকে অবশ্য আরও একটা দিন লিডারওয়াটে থেকে ৩ মাইল দূরের তারসার হ্রদটি দেখে আসেন। ১২,৫৩০ ফুট উঁচু সেই নীলাভ হ্রদটির সৌন্দর্য অবিস্মরণীয়।

লিডার নামটি সম্পর্কে দুটি মত রয়েছে। কেউ বলেছেন—পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের অসংখ্য পাহাড়ী নদী এখানে এসে প্রথম সমতলে অবতরণ করেছে। কোলাহাই থেকে নিঃসৃত নদীটি তাদের নেতা— 'Leader'; তাই তাদের মিলিত ধারার নাম লিডার নদী।

আবার কেউ বলেছেন—পহেলগাঁও থেকে কয়েকমাইল দূরে মামলীশ্বব নামে একটি পাহাড়ী গ্রাম আছে। এই মামলীশ্বর নামটি এসেছে সংস্কৃত 'মা' অর্থাৎ 'না' শব্দ থেকে।

কথিত আছে একবার পুত্র গণপতিকে নিয়ে মহাদেব উপস্থিত হলেন সেই গ্রামে। জায়গাটি খুব ভাল লাগল তার। তিনি সেখানে এক গুহায় আসন পাতলেন। গণেশকে বললেন—কাউকে ঢুকতে দিবি না এখানে। কেউ এলে বলে দিবি, এখন দেখা হবে না।

কিন্তু মহেশ্বর হচ্ছেন ত্রিভুবনের রক্ষক ও সংহারক। তিনি অজ্ঞাতবাসে থাকলে যে সৃষ্টি রসাতলে যাবে।

নানা পরামর্শ ও আদেশের জন্য একে একে দেবতারা শিবের সাক্ষাৎপ্রার্থী হতে থাকলেন। পিতৃভক্ত গণেশ তাঁদের বাধা দিয়ে বললেন—মা, মাম্ম, নৈব নৈবচ। না, না, না।

অবশেষে স্বর্গবাজ ইন্দ্র এসে হাজির হলেন সেখানে। তিনিও শিবের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। কিন্তু লম্বোদরের সেই এক কথা। দেবরাজ সেকথা শুনবেন কেন? তিনি জোর করে ভেতরে যেতে চাইলেন। ফলে গণপতির সঙ্গে শচীপতির যুদ্ধ লেগে গেল। ভীষণ যুদ্ধ। দিনের পব দিন, রাতের পর রাত—যুদ্ধ চলতে থাকল।

কযেকদিন বাদে শ্রান্ত হলেন গণেশ। তাঁর খুব পিপাসা পেল। পাশেই বয়ে যাচ্ছে নদী। তৃষ্ণার্ত গণপতি এক চুমুকে নদীর সব জল খেয়ে ফেললেন।

বিশ্রামরত মহাদেব বুঝতে পারলেন একটা কিছু গোলমাল হয়েছে। তিনি তাড়াতাড়ি ত্রিশূল হাতে ছুটে এলেন বাইবে। যুদ্ধরত লম্বোদর ও পুরন্দরকে দেখতে পেলেন। তাড়াতাড়ি তিনি দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ থামালেন।

তারপরে নিরুপায় পিতা ত্রিশুল দিয়ে পুত্রের পেট ফুটো করে নদীকে মুক্ত করে দিলেন। লম্বোদরের উদর থেকে সৃষ্ট সেই নদীর নাম হল লম্বোদরী। লিডার শব্দটি লম্বোদরীর অপভ্রংশ।

পথ চলতে চলতে অশোকও বোধ হয় আমার মতই লিডারের কথা ভাবছিল। আর তাই হয়তো সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, "আচ্ছা শঙ্কুদা, লিডারের আরেক নাম তো নীলগঙ্গা?"

মাথা নেড়ে বলি, "হ্যাঁ।"

"নামটা কেন হয়েছে বলতে পারেন?"

"আমি পারি।" মামা মাঝখান থেকে বলে ওঠে।

"বেশ তো বলুন!" অশোক উৎসাহিত।

মামা প্রশ্ন করে, "তুমি তো জানো আমাদের চন্দনবাড়ি ও পিসু চড়াই হয়ে অমরনাথে যেতে হবে?"

"হ্যাঁ।" অশোক মাথা নাড়ে।

মামা বলতে থাকে, "সেই চন্দনবাড়ি ও পিসু ঘাটির মাঝখানে লিডারের তীরে তীর্থস্থানেশ্বর নামে একটি রমণীয় স্থান আছে। একবার হর-পার্বতী সেখানে মধুযামিনী যাপন করেছিলেন। মিলনকালে মহাদেব একদিন চুম্বনে চুম্বনে রাঙিয়ে দিলেন মহাদেবীর কপোল আর নীলাঞ্জনা দুটি আঁখি পল্লব।

"শিব শান্ত হবার পরে পার্বতী লিডারের স্বচ্ছ শীতল ধারায় তাঁর চুম্বনসিক্ত চোখের নীল কাজল ধুয়ে ফেললেন। স্ফটিকস্বচ্ছ স্রোতস্বিনী নীলাঞ্জনে নীলধারায় রূপান্তরিত হল। তার নাম হল নীলগঙ্গা। আজও তাই নীলগঙ্গা হর-পার্বতীর প্রেমগীতি গেয়ে চলেছে।"

কিন্তু নীলগঙ্গা এখান থেকে অনেকটা দূরে। তার কথা আর নয়। তার চেয়ে পথের কথা ভাবা যাক—পাইনবনে ছাওয়া পহেলগাঁওয়ের প্রাণজুড়ানো পথ।

পথের ওপরে অত ভিড় কেন ওখানে? শুধু মানুষের নয়, ঘোড়ার। ঘোড়ার সংখ্যাই বেশি। ব্যাপারটা কি?

জনৈক স্থানীয় পথচারীকে জিজ্ঞেস করি কথাটা। তিনি উত্তর দেন, "ট্যাক্স টোকেন দেওয়া হচ্ছে।"

ট্যাক্স-টোকেন! সে তো নিতে হয় গাড়ির জন্য! তাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি "মানুষ ও ঘোড়ার জন্য ট্যাক্স-টোকেন?"

"জী, হাঁ। হিমালয়ে মানুষ ঘোড়া ও গাড়ি একই কাজ করে—'দে আর মিডিয়াম্ অব্ ট্রান্সপোর্ট।' তাই যাত্রায় যাবার জন্য মানুষ ও ঘোড়াকে ট্যাক্স দিয়ে 'টোকেন' নিতে হচ্ছে।"

মানুষ ও ঘোড়ার জন্য একই ব্যবস্থা।

ঘোড়ার অফিস ছাড়িয়েই পথটি বাঁক নিয়েছে বাঁয়ে। এখন পথের দুধারেই বাড়ি-ঘর। বাড়ি মানে হোটেল। পহেলগাঁও পর্যটকদের শহর, এখানে নিবাস মানেই পান্থনিবাস।

প্রধান সড়ক পৌঁছনো গেল। বাঁদিকে পোস্টঅফিস, ডানদিকে বাসস্ট্যান্ড। আমরা বড় রাস্তা দিয়ে ডানদিকে এগিয়ে চলি। এই রাস্তাটাই পহেলগাঁওয়ের হৃদ্‌পিণ্ড। দুপাশে ঝক্‌ঝকে দোকান ব্যাঙ্ক অফিস হোটেল ও রেস্তোরাঁ। ফুটপাত হকার্স কর্নার। হকারদের কাছে অবশ্য যাত্রার জিনিসই বেশি—সোয়েটার বর্ষাতি জুতো কম্বল প্লাস্টিক-শীট হ্যাভারস্যাক লাঠি টুপি মোজা—সবই রয়েছে। কেবল কেনার জন্য নয়, ভাড়া নেবার ব্যবস্থাও আছে। জিনিসের দাম জমা দিলেই পাওয়া যাবে। ফিরে এসে ফেরত দিলে নির্দিষ্ট ভাড়া কেটে বাকি টাকা ফিরিয়ে দেবেন দোকানদার।

দোকান বসেছে বই মানচিত্র প্রসাদ ও পুজোর উপকরণের। পুজোর উপকরণ বলতে এক টুকরো লাল কাপড়ে বাঁধা একটি নারকেল এবং কিছু ফুল ও বেলপাতা। বেলপাতা অবশ্য বেলগাছের পাতা নয়। বেলগাছ জন্মায় না এ অঞ্চলে। অন্য একরকম পাতাকে এঁরা বেলপাতা বলছেন। বলছেন—এই বেলপাতা পেলেই নাকি বাবা অমরনাথ সন্তুষ্ট হন। হতে পারেন। কারণ দেবতাদের মধ্যে ভোলানাথ হচ্ছেন সবচেয়ে বেশি 'একমোডেটিভ'।

পথে বেশ ভিড়। পথচারীদের অধিকাংশ যাত্রী। প্রায় সকলেই কেনাকাটা করছেন। আমাদেরও কিছু কেনা-কাটা আছে। কিন্তু এখন নয়, বিকেলে বাজার করা যাবে। এখন দেখে নিই সব।

দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। আমাদের সামনে একজন যুবক ও দুটি যুবতী। তাদের গায়ে দামী প্যান্ট-কোট কিন্তু পায়ে জুতো নেই। কি জানি বোধহয় মন্দিরে যাচ্ছেন, তাই খালি পায়ে বেরিয়েছেন। কাজটা ভাল করেন নি। একে শিশিরসিক্ত শীতল

পথ, তার ওপরে অশ্বপুরীষে প্রলিপ্ত।

"দেখুন, দেখুন!"

বাসুদেবের কথায় সেদিকে তাকাতে হয়। সত্যই অভিনব। না, পাগল কিংবা ভিক্ষুক নয়। এমনকি ভারতবাসী পর্যন্ত নয়। জনৈকা মেমসাহেব। বয়সে যুবতী, দেখতে সুশ্রী। সঙ্গে যুবক সাহেব। যুবকের মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পিঠে রুকস্যাক্। দুজনেরই পরনে প্যান্ট-শার্ট। পায়ে হাওয়াই চপ্পল। যুবতী যুবকের হাত ধরে পথ চলেছে।

এ পর্যন্ত দেখবার কিছু ছিল না। এমন বহুজোড়া সাহেব-মেম আজ পহেলগাঁওয়ে এসেছে। তারা সবাই যাত্রায় যাবে। অমরনাথ শৈবতীর্থ। জাতি ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সমান অধিকার সেখানে।

আমরা ওদের, বিশেষ করে মেয়েটিকে দেখছি অন্য কারণে। কেউ বোধহয় তাকে একটুকরো চট দিয়েছে। টুকরোটির মাঝখানে খানিকটা কেটে তার ভেতর দিয়ে মাথা গলিয়ে সেটাকে জামার মতো গায়ে দিয়ে নিয়েছে সে। শুধু তাই নয়, একহাতে সাহেবের হাত ধরে অপর হাতে নিয়ে চলেছে একটা নেড়ীকুত্তার বাচ্চা। কোথায় যেন কুড়িয়ে পেয়েছে বাচ্চাটাকে। গলায় দড়ি বেঁধে সেটাকে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। এবং তার চটের জামা ও হাতের কুকুরই বাসুদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

শুধু আমরা নই, আরও অনেক পথচারী মেমসাহেবের পোশাক আর পোষ না-মানা কুকুরটাকে দেখছে। এবং তারা সবাই আমাদের মতো নীরব দর্শক নয়। কেউ-কেউ হাসি-ঠাট্টা করছে। মেমসাহেব অবশ্য নির্বিকার। বোধকরি সে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তের সেই উপদেশটি শুনে থাকবে—'লোকভয় ভক্তিপথের বিশেষ প্রতিবন্ধক।'

মূল-পথ থেকে একটি পথ বাঁদিকে লিডারের কাছে চলে গেল। এখানে শেষ হল বাজার, শুরু হল মেলা,—সাধুর মেলা। পথের ডানদিকে তারকাঁটার বেড় দেওয়া একটা পার্ক, বাঁদিকে ময়দান—একেবারে লিডারের বেলাভূমি পর্যন্ত প্রসারিত।

না, ময়দান নয়, কলোনী—তাঁবুর কলোনী। ছোট-বড়, সাদা ও রঙীন সারি সারি তাঁবু! এ দৃশ্য কিছু নতুন নয় এখানে। ভগিনী নিবেদিতা স্বামীজীর সঙ্গে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে এখানে এসেছিলেন। সেদিন তিনি এই একই দৃশ্য দেখে গিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'উপত্যকাটির নিম্নপ্রান্তে আমাদের ছাউনী পড়িল। তিনি (স্বামীজী) তাঁহার কন্যাকে (নিবেদিতা) আর্শীবাদ লাভে ধন্য হইবার জন্য ছাউনীর চারিধারে ঘুরাইয়া আনিলেন—প্রকৃতপক্ষে উহা ভিক্ষাবিতরণ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। আর, লোকে তাঁহাকে (স্বামীজীকে) ধনী ভাবিয়াই হউক, অথবা শক্তিমান বুঝিয়াই হউক, পরদিন আমাদের তাঁবুটি ছাউনীর পুরোভাগে একটি মনোহর পাহাড়ের উপর সরাইয়া নিয়াছিল।'

স্বামী অভেদানন্দ ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে যাত্রায় এসেছিলেন। এই তাঁবুর কলোনী সম্পর্কে তিনি বলেছেন—'নীলগঙ্গার তীরে ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু মাঠ আছে। তথায় চারিটি সমতল ভূমিখণ্ডে যাত্রীদের তাঁবু পড়িয়াছে।'

আগেই বলেছি, আমাদের এই পথের বাঁদিক থেকে শুরু করে লিডারের তীর অবধি তাঁবু পড়েছে। তবে পথের সংলগ্ন অংশে তাঁবুর সংখ্যা কম। কারণ পরপর কয়েকটি মন্দির রয়েছে এখানে।

তাছাড়া পথের পাশে মেলা বসেছে। দোকান-পাট নয়, সাধুর মেলা। সারা ভারত থেকে সন্ন্যাসীরা এসেছেন এখানে।

কেউ ত্রিপল কিংবা 'প্লাস্টিক শীটে'র অস্থায়ী ছাউনী করে নিয়েছেন, কেউ বা গাছের ছায়ায় আসন পেতেছেন। কেউ একা, কেউ শিষ্য-শিষ্যা পরিবৃত। তবে সবার সামনেই ধুনি জ্বলছে।

পহেলগাঁও আজ অমরনাথ যাত্রাপথের সঙ্গম। সারা ভারত থেকে যাত্রীরা সমবেত হয়েছেন এখানে। তাঁদের মধ্যে সন্ন্যাসীদের সংখ্যা মোটেই সামান্য নয়। সাধুরা এসেছেন নির্বাণী, নিরঞ্জনী ও জুনা প্রভৃতি আখড়া থেকে। এসেছেন শৃঙ্গেরী গোবর্ধন ও সারদা প্রভৃতি মঠ থেকে। এসেছেন রামেশ্বর, পুরুষোত্তম, দ্বারকা ও বদ্রীনাথ ধাম থেকে।

এসেছেন ভুরিবার, ভোগবার, কীটবায় ও আনঙ্গবার ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু। এসেছেন নানা বয়সের, নানা চেহারার ও নানা পোশাকের সন্ন্যাসী। দণ্ডীধারী, দিগম্বর, ব্রহ্মচারী, অবধূত ও অবধুতানী কেউ বাদ পড়েন নি। কাপালিক-ভৈরবী, বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী সবাই আছেন। আছেন উলঙ্গ নাগা সন্ন্যাসী থেকে নামাবলী গায়ে বাবাজী পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক পোশাকের সন্ন্যাসী।

কেউ নেংটি পরে ভস্ম মেখে বসে আছেন। কারও মাথায় জটা, কারও সাঁইবাবার মতো চুল, কারও বা মুণ্ডিত মস্তক। কেউ কম্বল গায়ে বাঘের ছালের ওপর বসে আছেন, কেউ বা গেরুয়া গায়ে গাঁজায় দম দিচ্ছেন। সমস্ত আখড়ার সব মঠের সব সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা আজ সমবেত হয়েছেন এখানে। এঁরা প্রত্যেকে যাত্রায় যাবেন। এঁরা সবাই আমার সহযাত্রী। আর তাই হয়তো অনেকেই পয়সা চাইছেন।

আমরা নির্বিকার চিত্তেই এগিয়ে চলেছিলাম। কিন্তু এবারে থামতে হল। জনৈক ভস্মমাখা মুণ্ডিতমস্তক দিগম্বর যুবক সন্ন্যাসী আমাদের পথ আগলে দাঁড়িয়েছেন। হাত বাড়িয়ে দিয়ে ভাঙা-ভাঙা-বাংলায় বলছেন, "এ বঙালীবাবু! সাধু-মহাত্মাকে কুছ দে দে। হামি ডায়মন্ডহারবারে থাকি, বাবা অমরনাথজীকা যাত্রায় যাচ্ছে। কুছ দে দে।"

আমার এবং মামার পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি, তাছাড়া আগেই বলেছি যাত্রীদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা রীতিমত উল্লেখযোগ্য। সুতরাং ডায়মন্ডহারবারবাসী সাধুজীর পক্ষে বুঝতে অসুবিধে হয় নি যে আমরা বাঙালী। আর তিনি যখন বাংলায় থাকেন, তখন বাঙালীর পথ আগলে দাঁড়াবার অধিকার তাঁর অবশ্যই আছে।

অতএব একটা টাকা তাঁর হাতে গুঁজে দিই। তিনি পথ ছেড়ে দেন, আমরা এগিয়ে চলি।

কিন্তু আবার থামতে হয়। না, এবারে আর কেউ পথ আগলে দাঁড়ায়নি, নিজেরাই থামতে বাধ্য হয়েছি। পথের পাশে গাছের তলায় প্লাস্টিকের শীট বিছিয়ে বসে আছে জনৈক লাল কাপড় পরা স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ যুবক সন্ন্যাসী। তাঁর গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ও সোনার হার, হাতে ঘড়ি। সামনে আগুন জ্বলছে, চক্চকে চিমটা ও কমণ্ডলু পড়ে আছে। প্রোথিত রয়েছে একখানি সিঁদুরমাখা ঝকঝকে ত্রিশূল।

সন্ন্যাসীর নয়ন নিমীলিত, তিনি পদ্মাসীন। তাঁর একপাশে একটি তরুণ ব্রহ্মচারী, আরেকপাশে জনৈকা শ্বেতাঙ্গিনী যুবতী। ব্রহ্মচারী গুরুজীর পা টিপছে। আর সুদর্শনা শ্বেতাঙ্গিনী ভৈরবী অর্ধনিমীলিত চোখে তার প্রার্থিত পুরুষের দিকে রয়েছে তাকিয়ে।

হঠাৎ বাংলায় বেশ জোরে জোরে বলে ওঠে অসীম, "মেয়েটা. মাইরি সত্যি সুন্দরী! স্বাস্থ্যখানা দেখেছেন?"

কথাটা মিথ্যে বলে নি সে, তবু আমরা তাকে সমর্থন করতে পারি না, সন্ন্যাসী চোখ মেলেছেন। তিনি কটমট করে অসীমের দিকে তাকিয়েছেন। সর্বনাশ হল দেখছি! আমেরিকা ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এ কি করল অসীম?

সে কিন্তু মোটেই বিচলিত হয় নি। সন্ন্যাসীর চোখে চোখ রেখেই আবার বলল, "সত্যি বলছি ঘোষদা, এমন ভৈরবী পেলে অনেকেই সংসার ছেড়ে কাপালিক হয়ে যেতে রাজি হবে।"

"চলে যাও এখান থেকে..." সন্ন্যাসী প্রায় লাফ মেরে উঠে দাঁড়িয়েছেন, মুহূর্তে ত্রিশূলটি হাতে নিয়ে আবার অসীমকে বললেন, "চলে যাও বলছি, I say clear out..."

আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। কিন্তু অসীম এখনও অবিচলিত। সে সহসা নত হয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে নমস্কার করে সন্ন্যাসীকে। তারপরে সবিনয়ে বলে, "আপনার আদেশ শিরোধার্য, আমরা চলে যাচ্ছি মহারাজ. কিছু মনে করবেন না। যা বলেছি, তা আমার মনের কথা নয়। আপনি বাঙালী কিনা, তা পরীক্ষা করার জন্যই কথাগুলো বলেছি। অনিচ্ছাকৃত অপরাধ মার্জনা করবেন।"

আমাদের সঙ্গে সন্ন্যাসীও হো হো শব্দে হেসে ওঠেন। তিনি ত্রিশূল রেখে দিয়ে আবার বসে পড়েন। তাঁর ভৈরবী রীতিমত বিস্মিতা।

হাসি থামলে অসীম আবার বাংলায় সন্ন্যাসীকে বলে, "বাবা সুবিধেমত মেমসাহেবকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেবেন, উনি খুশি হবেন। মেয়েরা নিজের রূপের প্রশংসা শুনলে খুশি হন, তা তিনি যে দেশেরই মেয়ে হোন।"

"তুই ভারি দুষ্টু!" সন্ন্যাসী সহাস্যে বলে ওঠেন।

আমরা তাঁকে নমস্কার করে এগিয়ে চলি।

কয়েক পা এগিয়ে বাঁদিকে বেশ বড় একটি তাঁবু। সামনে ফেস্টুন—

'DIVINE THE MAN
RAJAYOGA EXHIBITION'

"এখন নয়, পরে কোন সময় দেখা যাবে।" অসীম আমাদের থামতে দেয় না। সে এগিয়ে চলে, আমরা তাকে অনুসরণ করি।

কয়েকটি কিশোর-কিশোরী ইউনিফর্ম পরে পিঠে হ্যাভারস্যাক্ নিয়ে সারি বেঁধে কোথায় যেন চলেছে। মনে হচ্ছে ওরাও যাত্রায় যাবে।

কেন? কিসের আশায় এই বয়সে ওরা সেই কষ্টকর পরিক্রমার সামিল হতে চাইছে? শুধুই কি অ্যাডভেঞ্চারের মোহে? না, আরও কিছু?

এই কিশোর-কিশোরীদের দেখে আমার মনে পড়ছে ভারতীয় পর্বতারোহণের জনক মেজর এন. ডি. জয়ালের কথা। তিনি চোদ্দ বছর বয়সে এক সহপাঠীর সঙ্গে হেঁটে অমরনাথ দর্শন করেছিলেন। কে বলতে পারে, এদের মধ্য থেকে আরেকজন নান্দু জয়াল কিংবা সুজয়া গুহ তৈরি হবে না? *

লেখকের 'নীল-দুর্গম' ও 'লীলাভূমি-লাহুল' বই দু'খানি দ্রষ্টব্য।

গানের শব্দে ভাবনা থেমে যায়। থমকে দাঁড়াই। পথের পাশে চায়ের দোকানে ট্রানজিস্টারে বিবিধ-ভারতীর গান বাজছে।

বিবিধ-ভারতী তো এখন সারা ভারতের আনন্দ-সুর। কাজেই বিবিধ-ভারতীর গান শুনে থমকে দাঁড়াই নি। থমকে দাঁড়িয়েছি দোকানীকে দেখে। তাঁর পরনে গেরুয়া, মাথায় জটা, পা দু'খানি পাদুকাহীন। তীর্থপথে আর কখনও আমি কোন সাধুকে চায়ের দোকান খুলতে দেখি নি।

কিশোরকুমারের গান শুনতে শুনতে এগিয়ে চলি। মনে পড়ছে গৌতমের কথা। সে কিশোরকুমারের গান শুনতে বড়ই ভালবাসে। আসার সময় তাকে শয্যাশায়ী দেখে এসেছি। অসুস্থ ছেলেকে বাড়িতে ফেলে যাত্রায় বেরিয়েছি। তারপর থেকে আর তার কোন খবর পাই নি। অথচ কথা ছিল এখানকার ঠিকানায় ওর একটা খবর আসবে।

সময় যায় নি। আজও চিঠি আসতে পারে। তাছাড়া বাবা অমরনাথের কৃপায় গৌতম এতদিনে নিশ্চয়ই ভাল হয়ে গিয়েছে।

সামনে সাইনবোর্ড— 'GURUDWARA, Pahalgam' পাশেই একটু উঁচু খুঁটির সঙ্গে ঝাণ্ডা উড়ছে—শিখদের ধর্মীয় পতাকা।

আমরা তোরণ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকি। কয়েক পা এগিয়ে ডানদিকে গুরুদ্বার। কাঠ ও টিনের বাড়ি। সামনে বারান্দা, তারপরে একখানি প্রশস্ত হল-ঘর—মন্দির।

আমরা বারান্দা পেরিয়ে মন্দিরদ্বারে আসি। ভেতরে ঢুকতে পারি না। সারা ঘর জুড়ে ভক্তরা বসে রয়েছেন। জনৈক ভক্ত হারমনিয়াম বাজিয়ে ভজন গাইছেন। ধূপ ও ফুলের গন্ধে আমোদিত মন্দির। বাইরে কোলাহল কিন্তু ভেতরে একটা আশ্চর্য সুন্দর স্বর্গীয় পরিবেশ।

মন্দিরের মাঝখানে বেদির ওপরে গ্রন্থসাহেব। অজ্ঞানতা অধর্মের মূলকারণ। তাই প্রত্যেক ধর্মের অবতার ও মহাপুরুষগণ মানুষকে জ্ঞান আহরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। সকল ধর্মের ধর্মগ্রন্থ রয়েছে। কিন্তু শিখরা ছাড়া আর কেউ ধর্মগ্রন্থকে একমাত্র বিগ্রহ জ্ঞানে পূজা করেন বলে জানা নেই আমার। তাই শিখরা যখন রাজনীতির শিকার হয়ে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়েন, তখন মনে বড় কষ্ট পাই।

প্রণাম করে নেমে আসি গুরুদ্বার থেকে। সামনের প্রাঙ্গণে কয়েকটি তাঁবু। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যাত্রায় যাবার জন্য যে-সব শিখ তীর্থযাত্রী পহেলগাঁও এসেছেন, গুরুদ্বার কর্তৃপক্ষ তাঁদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন এখানে।

শুধু থাকা নয়, খাবার ব্যবস্থাও রয়েছে। একটা ত্রিপলের ছাউনীর নিচে বিরাট বিরাট উনুনে রান্না হচ্ছে। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি।

একজন বৃদ্ধ শিখ কাছে আসেন। মামা হিন্দীতে জিজ্ঞেস করেন, "মহোৎসব হবে নাকি?"

সর্দারজী সহাস্যে পালটা প্রশ্ন করেন, "আপনারা প্রসাদ পেতে চান কী?"

"পেলে তো ভালই হয়।" অসীম মামার হয়ে উত্তর দেয়।

সর্দারজী বলেন, "তাহলে চলে আসুন বেলা একটা নাগাদ।"

"ধন্যবাদ।"

সর্দারজীকে নমস্কার করে আমরা বেরিয়ে আসি গুরুদ্বার থেকে। রাস্তায় এসে

ব্রহ্মচারী বলে, "অসীমদা, আপনি নিশ্চয়ই ভাল অভিনয় করেন?"

"পণ্ডিত, তুমি দার্শনিক মানুষ।" অসীম গোড়া থেকেই ব্রহ্মচারীকে পণ্ডিত বলে ডাকছে। "তুমি এসব কী বুঝতে পারবে না।"

"সত্যি পারছি না দাদা!" ব্রহ্মচারী বলে, "আমরা কুণ্ডু ট্র্যাভেলস্-এর যাত্রী, নিউ পাইনভিউ হোটেলে রয়েছি। আমাদের পক্ষে এদের মহোৎসবের খবর নেওয়া নিতান্তই রসিকতা।"

"পণ্ডিত তুমি দার্শনিক মানুষ, তাই তোমার কাছে এটা অভিনয় অথবা রসিকতা বলে মনে হচ্ছে। আমি ওঁদের উদারতা যাচাই করার জন্য প্রসাদ পেতে চাইলাম।" একবার থামে অসীম। তারপরে আবার বলে, "তার চেয়ে বড় কথা, এখানে এসে শিখদের সংগঠনটি দেখে গেলে। ভেবে দেখো, কত বাঙালী আজ এখানে এসেছেন! তাঁরা অনেকেই খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করে উঠতে পারেন নি। যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের জলের মতো পয়সা খরচ করতে হচ্ছে। আর এইমাত্র দেখে এলে শিখরা সবাই এখানে আশ্রয় ও খাদ্য পাচ্ছেন। যাত্রাপথেও তাঁদের জন্য এমনি ব্যবস্থা থাকবে। ফলে কত কম খরচে, কত ভালভাবে শিখ ভক্তরা তীর্থযাত্রা শেষ করতে পারবেন। এই সংগঠন শক্তির জন্যই পাঞ্জাবে আজ উদ্বাস্তু সমস্যা বলে কিছু নেই। স্বাধীন হবার পরেও পাঞ্জাব দুবার বিভক্ত হয়েছে। তবু আজ পাঞ্জাব ভারতের সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী রাজ্য।"

অসীম থামতেই সরকারদা বলেন, "আমাদের দেশের সর্বত্রই কিন্তু তীর্থযাত্রার এটাই নিয়ম ছিল। এখন শুধু শিখ ও অন্যান্য কিছু সম্প্রদায়ের মাঝে পুরনো নিয়মটা টিকে আছে।"

ব্রহ্মচারী কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু সে বলতে পারে না। তার আগেই নজর পড়ে ওঁদের দিকে—বিবদমান সন্ন্যাসীদ্বয়ের দিকে। একজনের হাতে ত্রিশূল, আরেকজনের হাতে প্রকাণ্ড একটা চিমটা। তাঁরা কুৎসিত ভাষায় উভয়কে গালাগালি করছে এবং একে অপরকে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে।

অশোক আর ভাগনে ছুটে গিয়ে দুজনে দুজনকে ধরে ফেলে। আমরাও হাত লাগিয়ে ক্রুদ্ধ সন্ন্যাসীদের হাত থেকে ত্রিশূল ও চিমটা কেড়ে নিই। কয়েকজন সাধু এগিয়ে আসেন। তাঁরা ব্যাপারটার ফয়সালায় লেগে যান। অতএব এখনকার মতো মারামারিটা মুলতবী রইল।

জানি না সেটা ভবিষ্যতের জন্য জমা রইল কিনা? কারণ এঁরা একই সঙ্গে যাত্রায় যাবেন। পথে বিবাদের বহু সুযোগ পাবেন। কিন্তু বিবাদের মনোভাব নিয়ে যাত্রায় যোগ দিলে, সে যাত্রা তীর্থযাত্রা হবে কি?

যাক্ গে! ওঁদের ভাবনা ওঁরা ভাবুন। ভাগনে ও অশোক ছাড়া পেয়েছে। আমরা এগিয়ে চলি।

মনে মনে কিন্তু বিবদমান সন্ন্যাসীদের কথাই ভাবতে থাকি। লোভ মোহ এবং ক্রোধকে জয় না করতে পারলে নাকি সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। এঁরা তাহলে কি করে সন্ন্যাসী হলেন?'

অবশেষে অকুস্থলে পৌঁছনো গেল। যে তীর্থযাত্রাকে অবলম্বন করে আজ পহেলগাঁও উৎসব-মুখর, যাত্রার সেই ছড়ি রয়েছেন এখানে।

পথের বাঁদিকে তারকাঁটার বেড়া দিয়ে ঘেরা অনেকখানি জায়গা। কয়েকটি তাঁবুও পড়েছে সেখানে। তবে ছড়ি বিশ্রাম করছেন উন্মুক্ত মন্দিরে।

পথের পাশে সুসজ্জিত তোরণ। লেখা রয়েছে—

'CHHARI

SHREE SWAMI AMARNATHJI'S

RESTING PLACE, PAHALGAM'

আমরা ভেতরে ঢুকি। তোরণের ঠিক সোজাসুজি খানিকটা দূরে একটি বেশ বড় বাঁধানো বেদি, অনেকটা মঞ্চের মতো। মঞ্চের একদিকে সিঁড়ি, তিনদিকে লোহার রেলিং। ঠিক কেন্দ্রস্থলে লাল ও নীল রঙের বিরাট একটা প্লাস্টিকের ছাতা, তার নিচে একখানি ত্রিশূলের সঙ্গে দু-খানি ছড়ি—রূপার পাত দিয়ে মোড়া বড় লাঠি। এঁরাই অমরতীর্থ-অমরনাথ যাত্রার ছড়ি—হর পার্বতীর প্রতিনিধি।

ছড়ির সামনে ধূপ জ্বলছে। অনেকেই টাকা-পয়সা ফুল ও মালা প্রণামী দিচ্ছেন। সুগন্ধী ধূপ ও ফুলের গন্ধে চারদিক আমোদিত।

আমরা প্রণাম করি।

জনৈক তরুণ সন্ন্যাসী এগিয়ে আসেন সামনে। আমাদের বিস্মিত করে পরিষ্কার বাংলায় বলে ওঠেন, "আসুন, ওপরে আসুন।"

বিস্মিত হওয়া অবশ্য উচিত হয় নি আমার। সনাতন ধর্মের শাশ্বত-সূত্রে আজও আসমুদ্র-হিমাচল গ্রথিত। সুতরাং শ্রীনগর দশনামী আখড়ায় দু-একজন বাঙালী সন্ন্যাসী থাকতেই পারেন।

সন্ন্যাসী আবার তাগিদ দেন, "উঠে আসুন, ওপরে এসে বসুন।"

দ্বিধা ত্যাগ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি বেদির ওপরে। অমরনাথজীর পুণ্য-ছড়িকে পুনরায় প্রণাম করে একপাশে এসে বসি।

তরুণ সন্ন্যাসীও আমাদের পাশে বসেন। বিনা প্রস্তাবনায় পরিচয় দেন, "আমার নাম লোকেশ্বরানন্দ গিরি। ছোটবেলা থেকেই আমি দশনামী আখড়ায় আছি। শ্রীনগর বর্ষাচকে আমার আখড়া। বাবা অমরনাথজীর ছড়ি আমাদের আখড়াতেই থাকেন।"

"আচ্ছা স্বামীজী, এই ছড়ি কবেকার?" সন্ন্যাসী থামতেই বাসুদেব প্রশ্ন করে।

সন্ন্যাসী উত্তর দেন, "অনেকের মতে শ্রীরামচন্দ্রের আমলের, আবার অনেকে বলেন জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য এবং আচার্য মণ্ডন মিশ্র এই ছড়ি নিয়ে অমরনাথ যাত্রায় গিয়েছিলেন। ছড়ি যে-যুগেরই হয়ে থাক, ওপরের রূপার পাত কিন্তু বহুবার মেরামত করা হয়েছে। আর এ-ছড়ির প্রাচীনত্ব বুঝতে হলে আপনাদের পুরাকালের কাশ্মীর কাহিনী জানতে হবে।"

"একটু বলুন না মহারাজ!" মামা অনুরোধ করে।

সন্ন্যাসী শুরু করেন,"পুরাকালে কাশ্মীর উপত্যকা ছিল দানবের দেশ। মহামুনি কশ্যপ মহামায়ার তপস্যা করে তাঁকে বশীভূত করলেন। তাঁকে দিয়ে কশ্যপ এদেশের সমস্ত দানব ধ্বংস করালেন। বারামুলার কঠিন পাহাড় কেটে তিনি এ উপত্যকায় জল নিয়ে এলেন। সারা উপত্যকা সুজলা ও সুফলা হয়ে উঠল। দলে দলে মানুষ ছুটে এল এখানে। মহামুনি কশ্যপের নামানুসারে রমণীয় উপত্যকার নাম হল কাশ্যপমার—পরবর্তী

কালে কাশ্মীর। তিনি নাগরাজ তক্ষকের হাতে এদেশের শাসনভার অর্পণ করে ফিরে গেলেন অযোধ্যায়।"

"কিন্তু এ কাহিনীর সঙ্গে অমরনাথ যাত্রার সম্পর্ক কি মহারাজ?" সন্ন্যাসী থামতেই ভাগনে জিজ্ঞেস করে।

সন্ন্যাসী সহাস্যে উত্তর করেন, "আছে। কাশ্যপমারের নর-নারীরা দু-হাত ভরে অন্নপূর্ণা প্রকৃতির দান গ্রহণ করলেন। সুখ ও সমৃদ্ধিতে তাঁদের জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠল—যুগের পরে যুগ অতিবাহিত হতে থাকল।

"একদিন মহাতপা ভৃগুমুনি এসে উপস্থিত হলেন এই ভূ-স্বর্গে। এদেশের মানুষের কাছে তিনি প্রচার করলেন অমরনাথজীর তীর্থমাহাত্ম্য। মহামুনি ভৃগু শ্রাবণী শুক্লা চতুর্থীতে যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন। বললেন, দেবদণ্ড সামনে নিয়ে এই যাত্রা করতে হবে। শ্রাবণী পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে গুহাতীর্থে অমরনাথজীর সুধালিঙ্গ দর্শন করলে মানুষ অমরত্ব লাভ করবে। আর ঐ গুহাতীর্থের অপর নাম হবে অমরতীর্থ—অমরতীর্থ-অমরনাথ।"

একবার থামলেন সন্ন্যাসী। তারপরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আবার বলতে শুরু করলেন। "আমরা চিরকাল আত্মবিস্মৃত জাতি। স্বাভাবিকভাবেই কিছুকাল বাদে সবাই বিস্মৃত হয়েছিলেন অমরতীর্থের কথা। অবশেষে এলেন জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য। তৎকালীন কাশ্মীরের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত মণ্ডন মিশ্রকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করার পরে সর্বজ্ঞ শঙ্কর তাঁকে সঙ্গে নিয়ে অমরনাথ দর্শন করলেন।

"তিনিই আবার যাত্রার প্রচলন করেন।"

"সেই থেকে চলেছে। অর্থাৎ বর্তমান যাত্রার বয়স প্রায় বারো/তেরো শ' বছর। তবে মুসলমান আমলে যাত্রার জনপ্রিয়তা খুবই কমে গিয়েছিল। ১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে এই যাত্রায় নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন পণ্ডিত হরদাস টিকু। তিনি ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ ধনী। পণ্ডিত হরদাস তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয় দু-লক্ষ টাকা সেবারে যাত্রার জন্য ব্যয় করেছিলেন। পথ তৈরি ও পথের আশ্রয় এবং সন্ন্যাসী ও দরিদ্র যাত্রীদের খাদ্যের জন্য তিনি সেই টাকা খরচ করেন। আর তার ফলে এই যাত্রা এতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে কাশ্মীরের রাজসরকার পরের বছর থেকেই যাত্রার জন্য অর্থ মঞ্জুর শুরু করেন।"

"কিন্তু সে অর্থ তো খুবই সামান্য!" সন্ন্যাসী থামতেই আমি বলি।

সন্ন্যাসী প্রশ্ন করেন, "কি রকম?"

উত্তর দিই, "স্বামী অভেদানন্দ ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে অমরনাথ যাত্রায় এসেছিলেন। তিনি তাঁর 'কাশ্মীর ও তিব্বতে' বইতে লিখেছেন—তখন কাশ্মীর সরকার অমরনাথ যাত্রার সুবন্দোবস্ত করার জন্য ধর্মার্থ বিভাগের হাতে মাত্র বারো হাজার টাকা দিতেন।"

"তা হতে পারে।" সন্ন্যাসী বলেন। "এখন অবশ্য রাজ সরকার অনেক বেশি ব্যয় করেন।"

"তাদের আয়ও হয় প্রচুর। তাছাড়া যাত্রীরা প্রতিবছর এ রাজ্যে এসে অন্তত লাখ পঞ্চাশ টাকা খরচ করে যান।" অসীম মন্তব্য করে।

"তা হয়তো যান। এবং সে তুলনায় সরকার যাত্রার জন্য যা খরচ করেন, তা কিছুই নয়।" সন্ন্যাসী অসীমের উক্তি সমর্থন করেন।

"যাক্ গে সেকথা" মামা বলে, "মহারাজ আপনি একটু ছড়ি যাত্রার কথা বলুন।"

সন্ন্যাসী শুরু করেন, "প্রতিবছর শ্রাবণী শুক্লা চতুর্থীতে শ্রীনগরের দশনামী আখড়া থেকে ছড়িযাত্রা শুরু হয়। আগে যখন পহেলগাঁওয়ের মোটরপথ তৈরি হয় নি, তখন অধিকাংশ যাত্রী শ্রীনগরে সমবেত হতেন—সেখান থেকেই ছড়ি যাত্রার শামিল হতেন। সাধু ও দরিদ্র যাত্রীদের খাবার যোগাতেন কাশ্মীর সরকার।"

"আচ্ছা, কারা এখন এই ছড়ির অধিকারী?" অশোক জিজ্ঞেস করে।

সন্ন্যাসী জবাব দেন, "ছড়ির অধিকার নিয়ে যুগে যুগে বিবাদ হয়েছে। অনেক ঝগড়াঝাটির পরে সাব্যস্ত হয়েছে এই ছড়ি ধর্মার্থ সংস্থার মহান্তজীর। আপনারা তাঁকে দর্শন করতে পারেন।"

"কোথায়?" ব্রহ্মচারী প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

"ঐ যে ওখানে।" সন্ন্যাসী ইসারা করে পাশের তাঁবুটি দেখিয়ে দেন।

ব্রহ্মচারী পুলকিত। আর শুধু ব্রহ্মচারীর কথাই বা বলি কেন? হয়তো সবাই—এমনকি আমিও। কি করব? আমি যে ভারতবাসী, সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি মিশে আছে আমার রক্তে।

বোধকরি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার জন্যই অসীম বলে ওঠে, "শ্রীনগর থেকে আসার পথে ছড়িযাত্রা কোথায় কোথায় থামে?"

"পামপুর অনন্তনাগ মার্তণ্ড আইশমোকাম ও পহেলগাঁও। তার মানে আমরা পঞ্চমদিনে এখানে আসি। এখান থেকে যাত্রা করে চতুর্থদিন সকালে অমরনাথে পৌঁছই।"

"এখান থেকে অথবা পথের অন্যান্য চটি থেকে ছড়ি কখন বের হন?" এবারে

সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার জন্য ইদানিং স্বাধীনভাবে অমরনাথ যাত্রা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কয়েক বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার এই যাত্রা পরিচালনা করেছেন। তাই এখন যাত্রায় যেতে হলে জম্মু-কাশ্মীর সরকারের স্থানীয় অফিসে (কলকাতায় কাশ্মীর গভঃ আর্ট এম্পোরিয়াম) ফটো সহ দরখাস্ত করে এবং নির্দিষ্ট ফি জমা দিয়ে নাম রেজিস্ট্রি করতে হয়। ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়স্করাই ডাক্তারি পরীক্ষার রিপোর্ট সহ কেবল এই দরখাস্ত করতে পারেন।

রেজিস্ট্রেশনের কাগজপত্র নিয়ে নির্দিষ্ট দিনে আবেদনকারীদের জম্মু পৌঁছে সেখানকার ট্যুরিস্ট অফিসে হাজির হতে হয়। কর্তৃপক্ষ পহেলগাঁও, চন্দনবাড়ি শেষনাগ ও পঞ্চতরণীর শিবিরে যাত্রীদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা এবং যাত্রার দিন স্থির করে দেন।

নির্দিষ্ট দিনে যাত্রীরা পহেলগাঁও গিয়ে যাত্রায় অংশ নেন। শুধু আশ্রয় নয়। তীর্থপথে যাত্রীদের প্রকৃতপক্ষে খাবার খরচও বেঁচে যায়। সরকারি ক্যান্টিনে কিংবা বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠানের শিবিরে যাত্রীরা খাবার পেয়ে যান। অর্থাৎ বর্তমানে যাত্রা একটি 'গর্ভনমেন্ট সাবসিডাইজড্ কন্ডাক্টেড্ ট্যুর'। যাত্রার ফি এবং রেল ও বাসভাড়ার বাইরে সামান্যই খরচ হয়।

ফলে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতার ভয় সত্ত্বেও ইদানীং যাত্রীসংখ্যা খুবই বেড়ে গিয়েছে। এখন প্রায় লাখখানেক যাত্রী প্রতি বছর অমরতীর্থ অমরনাথ যাত্রায় অংশ নিচ্ছেন। তবে যাত্রা তার প্রাণময়তা হারিয়ে ফেলেছে এবং যাত্রীরা যাত্রার আনন্দ ও বেদনার সঙ্গে অপরিচিত রয়ে যাচ্ছেন।

বাসুদেব প্রশ্ন করেন।

সন্ন্যাসী বলেন, "খুব সকালে, শেষ রাতেও বলা যেতে পারে। ছড়ি যাত্রা করার পরে দু'ঘণ্টা যাত্রীদের যেতে দেওয়া হয় না। দু'ঘণ্টা পরে সাধারণ যাত্রীদের জন্য পথ খুলে দেওয়া হয়।"

"যাত্রার ঠিক আগে নিশ্চয়ই পুজো হয়?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"যাত্রা শেষ করে এখানে এসে ছড়ি কিভাবে শ্রীনগর যাবেন? আপনারা কি হেঁটে ফিরবেন?" অশোক প্রশ্ন রাখে।

সন্ন্যাসী উত্তর দেন, "না। এখানে ফিরে আসার পরে আমরা নীলগঙ্গায় ছড়ি স্নান করাব, তারপরে আবার বাবার পুজো হবে। পুজোর পরে একটা বড় বাক্সে ছড়ি রেখে বাক্স বন্ধ করে দেওয়া হবে। একবছর আর সে বাক্স খোলা হবে না। বন্ধ বাক্স ঐ গাড়িতে করে শ্রীনগর নিয়ে যাওয়া হবে।"

তাকিয়ে দেখি একটু দূরে একখানি ত্রিপল ঢাকা মোটরগাড়ি। তাহলে বাবা অমরনাথজীকেও শেষ পর্যন্ত গাড়ি কিনতে হয়েছে।

কি করবেন? যে যুগের যে নিয়ম। এ-যুগে যে গাড়ি না থাকলে কেউ মানতে চায় না।

চার

গিরিজীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেমে আসি নিচে। এগিয়ে চলি মহান্তজীর তাঁবুর দিকে। মহান্তজীর নাম শ্রীমৎ স্বামী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী।

ভয়ানক ভিড়। তাঁবুর ভেতর ও বাইরে দাঁড়াবার জায়গা নেই। তবু কোনমতে পথ করে নিয়ে একসময় আমরা মহান্তজীর পায়ের কাছে পৌঁছই, তাঁকে প্রণাম করি।

"যাত্রা সফল হোক।" ভাঙা বাংলায় মহান্তজী আশীর্বাদ করেন।

এর চেয়ে বড় প্রত্যাশা আজ আর কিছু নেই আমাদের। আমরা পুলকিত। সকৃতজ্ঞ চিত্তে সৌম্যদর্শন মধ্যবয়সী মহান্তকে পুনরায় প্রণাম করি। তারপরে আবার তেমনি ভিড় ঠেলে বেরিয়ে আসি তাঁবুর বাইরে।

বড় রাস্তায় এসে এগিয়ে চলি সামনে। এখনও যে শেষ হয় নি পহেলগাঁও পরিক্রমা।

কয়েক পা এগিয়ে মন্দির—পহেলগাঁওয়ের বৃহত্তম মন্দির। সামনে সাইনবোর্ড—

'SHRI GOURISHANKAR TEMPLE, PAHALGAM

Constructed by

DHARMARTH TRUST. JAMMU & KASHMIR

Opening Ceremony performed

by

The Sole Trustee

Maharaja Dr. Karan Singhji

On 9th July, 1962'

কাশ্মীরে হিন্দুর ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষায়, বিশেষ করে অমরনাথ যাত্রাকে জনপ্রিয় করে তুলবার প্রচেষ্টায় মহারাজা করণ সিংজীর অবদান অসামান্য। এবং অনেকের ধারণা এবারে সরকারি ব্যবস্থায় প্রচুর ত্রুটি দেখা যাবে কারণ করণ সিংজী সরকারে নেই।

কিন্তু সে-সব ভবিষ্যতের কথা। এখন মন্দির দেখতে এসেছি, মন্দির দেখা যাক।

তোরণ পেরিয়ে পাথরকুচির পথ। আমরা সেই পথে এগিয়ে চলি। পথের দুদিকে বাগান। বাগানের শেষে পথ শেষ হয়েছে আর সেখানেই মন্দির। কাঠ ও টিনের চাল, পাথরের দেওয়াল এবং উঁচু মেঝে। চারদিকে প্রশস্ত বারান্দা। মাঝখানে সুদৃশ্য গর্ভ-মন্দির।

আমরা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি বারান্দায়। কয়েকজন সাধু কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে ও বসে রয়েছেন। বেশ বহাল তবিয়তে আছেন। এরা বুদ্ধিমান তাই আগে-ভাগে এসে দেবালয়ে ঠাঁই পেতেছেন। পথের পাশের খোলা জায়গায় শীতের হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন কিন্তু লোকসান হয় নি তেমন। কারণ এখানেও প্রচুর ভক্ত আসছেন এবং তাঁরা অকৃপণ হাতে সাধু-মহাত্মাদের প্রণামী দিচ্ছেন।

গর্ভ-মন্দিরের দ্বারে এসে দাঁড়াই। ছোট কিন্তু ছিমছাম মন্দির। ভেতরে কষ্টিপাথরের বেদির ওপরে শ্বেতপাথরের লিঙ্গমূর্তি। ওপরে ঘণ্টা ও একটি তামায় কলসী ঝুলছে। ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়ছে শিবের মাথায়।

লিঙ্গমূর্তির পেছনে শ্বেতপাথরের হর-পার্বতী মূর্তি আর একখানি রাধাকৃষ্ণের ছবি। ভক্তরা ভেতরে ঢুকে শিবপজা করছেন। আমরা বাইরে দাঁড়িয়ে হর-পার্বতীকে ও রাধা-কৃষ্ণকে প্রণাম করি। বলি—আমাদের দুর্গমযাত্রাকে সুগম ও আনন্দময় করে তোলো।

ফিরে আসি পথে। আবার এগিয়ে চলি। কয়েক পা এগিয়েই বাঁদিকে আরেকটি রাস্তা লিডারের দিকে চলে গিয়েছে। মূল-পথ সামনে প্রসারিত। এই পথে গতকাল আমরা জম্মু তাওয়াই থেকে পহেলগাঁও এসেছি। বাঁদিকের পথটি লিডারের পুল পেরিয়ে চলে গিয়েছে চন্দনবাড়ি—যে পথে আগামীকাল শুরু হবে আমাদের পদযাত্রা।

আর তাই দুটি পথের সঙ্গমে টিনের ওপরে আঁকা রয়েছে প্রকাণ্ড একখানি মানচিত্র—পথ নির্দেশিকা। মানচিত্রে পহেলগাঁও থেকে অমরনাথের যাত্রাপথ দেখানো হয়েছে। কিছু মূল্যবান খবর রয়েছে।

ভাগনে মানচিত্রের ফটো নিচ্ছে। এই অবসরে মানচিত্র থেকে খবরগুলো টুকে নেওয়া যাক—

'Pahalgam 7500´

10 Miles Chandanwari 9000´

One Shelter Shed, One Rest House, Two Labour Sheds.

2 Miles Pissu Top 11,200´

Three Shelter Sheds.

3 " Zagipal 11,500´

Three Shelter Sheds.

3 " Sheshnag 12,200´

Two Rest Houses, Two Labour Sheds

3 Miles Mahagunas 14,500´

Four Shelter Sheds.

1 Mile Pushpathri 12,500´

Two Shelter Sheds.

4 Miles Panchtarani 11,500´

Five Shelter Sheds. Two Rest Houses.

2 " Santsigh Pari 13,500´

2 " Holy Cave'.

মানচিত্রের দিকে তাকিয়ে সরকারদা বলতে থাকেন, "প্রথমদিন আমরা পহেলগাঁও থেকে চন্দনবাড়ি যাব অর্থাৎ ১০ মাইল হাঁটব, দ্বিতীয়দিনে যাব শেষনাগ, সেদিন ৮ মাইল হাঁটতে হবে। তৃতীয়দিন..."

"তৃতীয়দিনেও ৮ মাইল হাঁটব। মহাগুণাস 'পাস' পেরিয়ে পঞ্চতরণী। আর চতুর্থদিন পৌঁছব অমরনাথ—পঞ্চতরণী থেকে ৪ মাইল।" ভাগনে যোগ করে।

অশোক বলে, "তাহলে পহেলগাঁও থেকে অমরনাথ গুহা ৩০ মাইল, যাবার সময় আমরা চতুর্থদিনে পৌঁছব সেখানে। ফেরার সময়?"

আমি বলি, "পঞ্চতরণী থেকে সকালে রওনা হয়ে গুহাতীর্থ দর্শন করে চতুর্থদিনেই আমরা নেমে আসব শেষনাগ, পঞ্চমদিনে ফিরে আসব পহেলগাঁও।"

"তার মানে চতুর্থদিন ১৬ মাইল ও পঞ্চমদিন ১৮ মাইল হাঁটতে হবে।" অসীম যোগ করে।

আমি মাথা নাড়ি।

মামা বলে, "এবার চলো ফেরা যাক। স্নান-খাওয়ার পরে আবার বাজারে আসতে হবে, কেনাকাটা রয়েছে।"

ঠিকই বলেছে মামা। অতএব ফিরে চলি। যেপথে এসেছি, সেই পথেই হোটেলে ফিরছি। সাধু আর ভক্ত, মন্দির আর দোকান দেখতে দেখতে পথ চলেছি। সংখ্যাহীন যাত্রীর প্রবাহে মিশে গিয়েছি আমি। আমি যে আজ অমরতীর্থ-অমরনাথ যাত্রার অংশ ছাড়া আর কিছু নয়।

যাত্রার কথা ভাবতে ভাবতেই চলেছি। সেই একই পথ। সেই অনাদি অতীত থেকে এই বর্তমান পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ ভক্তের পদরেণুরঞ্জিত পহেলগাঁওয়ের পথ। তাঁরা সবাই একদিন আমার মতো এইপথে পদচারণা করেছেন। আগামী যুগেও সংখ্যাতীত সন্ন্যাসী ও ভক্তের পদসঞ্চারে প্রতিবছর পুলকিত হবে এই পথ।

পুরাকালের কথা নয়, সেকালের কথাও থাক, একালের কথাই ভাবা যাক। এই পথে পদচারণা করেছেন বিবেকানন্দ ও নিবেদিতা, অভেদানন্দ প্রবোধদা (সান্যাল) ও সেজকা (উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়)। বিবেকানন্দ সেবারে পহেলগাঁও পৌঁছেছিলেন ২৯শে জুলাই (১৮৯৮), অভেদানন্দ ৩রা অগাস্ট (১৯২২), প্রবোধদা ২১শে অগাস্ট (১৯৫৩), আর আমি এসেছি ১৭ই অগাস্ট (১৯৭৭)। স্বামীজী এসেছিলেন আমার প্রায় আশি বছর আগে, অভেদানন্দ পঞ্চান্ন এবং প্রবোধদা চব্বিশ বছর আগে। এই সুদীর্ঘ সময়ে যেমন অমরনাথ যাত্রাপথের উন্নতি হয়েছে, তেমনি যাত্রার জনপ্রিয়তা বেড়েছে। আর সেই সঙ্গে

উন্নত হয়েছে পহেলগাঁও।

পহেলগাঁওয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ লিখেছেন, 'উপরে একটি সাহেবি ধরনের বড় দোকান, পোস্ট অফিস, বাজার এবং ডাকবাংলো আছে। বৎসরে ৮ মাস এই সহরটি খোলা থাকে। বাকি ৪ মাস বরফ পড়িয়া বন্ধ হইয়া যায়। তখন এইস্থানে কেহ থাকিতে পারে না।'

বলা বাহুল্য অভেদানন্দের এ বর্ণনার সঙ্গে আজকের পহেলগাঁওয়ের তেমন মিল নেই। বিগত পঞ্চান্ন বছরে পহেলগাঁওয়ে শত শত দোকান ও বড় বড় হোটেল নির্মিত হয়েছে। বরফ এখনও পড়ে কিন্তু সারাবছর পর্যটক আসেন এখানে এবং সাবাবছর দোকান-পাট ও হোটেল খোলা থাকে।

প্রবোধদা তাঁর 'দেবতাত্মা হিমালয়'-এর প্রথম খণ্ডে পহেলগাঁও প্রসঙ্গে লিখেছেন, "আমরা আছি লিডার উপত্যকার মধ্যকেন্দ্রে। স্বর্গলোক থেকে নেমে এসেছে গিরিনদীরা, এই পহেলগাঁওতে তাদের প্রথম অবতরণ, এখান থেকে তারা চললো সমগ্র কাশ্মীর উপত্যকায়।..."

'পহেলগাঁও দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটি নদীর সঙ্গমস্থলে। এক নদীপথের পাশে চলে গেছে শেষনাগের চড়াই, অন্য নদীপথে চলে গেছে লিডারবৎ ও কোলাহাই হিমবাহের দিকে।'

সাড়ে সাত হাজার ফুট উঁচু এই শহর। অবস্থান ৩৪°২´ অক্ষরেখা ও ৭৫°২৩´ দ্রাঘিমায়। ১৮৯০ সালে প্রকাশিত গেজেটীয়ারে পহেলগাঁওয়ের অবস্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে—'A considerable village most romantically situated at the north end of the Lidar valley, between the junction of the streams which flow through the two defiles at the head of the valley. Above the village is an orchard, the usual camping ground...

'The path leading to the cave of Amarnath and the Shisha Nag lies up the defile to the east keeping to the right bank Preslang, between 4 and 5 miles up, is the last village met with.'

"কোথায় গিয়েছিলেন?"

ভাবনা থেমে যায়। তাকিয়ে দেখি তুলতুল। তার সঙ্গে মিস্টার ও মিসেস ভট্টাচার্য, অজিত ও বৌমা এবং ডাক্তার।

'বাবা অমরনাথজীর ছড়ি দর্শন করে এলাম।' ব্রহ্মচারী তুলতুলের প্রশ্নের উত্তর দেয়।

"কোথায়?" এবারে বৌমা জিজ্ঞেস করে।

বাসুদেব বলে "ঐ তো, সামান্য দূর। এই রাস্তার ওপরেই বাঁদিকে।"

"অনেক সাধু-মহাত্মা এসেছেন। মন্দির ও গুরুদ্বার রয়েছে।" ব্রহ্মচারী যোগ করে।

"কিন্তু আমরা যে কেনা-কাটা করতে বেরিয়েছি?" তুলতুল জানায়।

"তাতে কি হয়েছে?" অশোক বলে, "এখন সোজা চলে যাও ওখানে। ফেরার পথে কেনা-কাটা সেরে হোটেলে ফিরবে।"

শুধু তুলতুল নয়, অশোকের প্রস্তাব ওদের সকলেরই পছন্দ হয়। ওরা এগিয়ে যায়,

আমরা ফিরে চলি হোটেলে।

চলতে চলতে হঠাৎ ভাগনে আমাকে বলে, "ঘোষদা, আপনি তো অভেদানন্দজীর 'কাশ্মীর ও তিব্বতে' পড়েছেন?"

আমি মাথা নাড়ি।

"দশনামী আখড়ার গিরিজী একালের ছড়িযাত্রার যে বর্ণনা দিলেন, তার সঙ্গে কিন্তু অভেদানন্দজীর বর্ণনা মোটামুটি মিলে গেল।"

"তাহলে তো গত পঞ্চান্ন বছর ধরে যাত্রার নিয়ম-কানুন একই রযে গিয়েছে?" ভাগনের কথা শুনে অসীম প্রশ্ন করে।

আমি উত্তর দিই, "হ্যাঁ, মোটামুটি একই নিয়ম টিকে আছে।"

"কি নিয়ম ঘোষদা?" মামা জিজ্ঞেস করে। মামা-ভাগনে দুজনেই আমাকে 'দাদা' বলে ডাকছে।

একটু ভেবে নিয়ে বলতে থাকি, "অভেদানন্দজী অমরনাথ যাত্রা সম্পর্কে লিখেছেন—'সকল যাত্রীকেই একসঙ্গে চলিতে হয়। 'ছড়ি'র আগে কেহ যাইতে পারে না।...'ছড়ি সকলের পূর্বে রাত্রি প্রায় ৩ ঘটিকার সময় যাত্রা করে, তাহার পিছনে পিছনে যাত্রীরা যখন ইচ্ছা যাইতে থাকে। একটি আশাসোঁটা ও অস্ত্রশস্ত্রসহ একদল সাধু পথ দেখাইয়া যাত্রীদিগকে লইয়া যান, ইহাদিগকেই 'ছড়ি' বলে। পূর্বে যে সকল সাধু এই তীর্থে বাস করিতেন, তাঁহারাই পথ দেখাইয়া যাত্রীদিগকে লইয়া যাইতেন, সেই কারণে এই তীর্থের এই প্রকার রীতি হইয়াছে।"

"আচ্ছা, বিশ্বকোষের বর্ণনা তো আরও পুরনো?" আমি থামতেই ভাগনে জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ।" ব্রহ্মচারী উত্তর দেয়। বলে, "নগেন্দ্রনাথ বসুর বিশ্বকোষের প্রথমভাগেই অমরনাথের কথা আছে। বইখানি প্রকাশিত হয়েছে ১২৯৩ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ একানব্বুই বছর আগে।"

"সে বইতে কি বলা হয়েছে অমরনাথ যাত্রা সম্পর্কে?" বাসুদেব প্রশ্ন করে।

অতএব শুরু করতে হয়, "বিশ্বকোষে বলা হয়েছে—'অমরনাথ কাশ্মীরের অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থবিশেষ। এখানে মহাদেবের যে স্বয়ম্ভূ তুষারলিঙ্গ আছে তাহার নাম অমরনাথ বা অমরেশ্বর।...এখানকার পর্বতমালা বারমাস তুষারে আবৃত। পথ দুর্গম; প্রাণিশূন্য, তৃণশূন্য; আবার সহস্র সহস্র প্রস্তরখণ্ড ও হিমশিলা পতনোন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। হাঁটিবার সময় যাত্রীরা একটু উচ্চস্বরে কথা কহিলে কিংবা জোরে পায়ের শব্দ করিলে তাহার প্রতিঘাতে সেই সকল শিলা খসিয়া আসিয়া মাথার উপরে পড়ে। এদিকে আবার ভাদ্রমাস, রাত্রি-দিন বৃষ্টি হইতে থাকে, কখন কখন বরফও পড়ে। এত বিঘ্ন বিপত্তি, তবু এই স্বয়ম্ভূলিঙ্গ দর্শন করিবার নিমিত্ত প্রতিবৎসর প্রায় দুই হাজার যাত্রী অমরনাথে গিয়া থাকেন'।..."

"দু-হাজার!" সবিস্ময়ে ভাগনে বলে ওঠে, "তার ছত্রিশ বছর পরে যে অভেদানন্দ লিখেছেন মাত্র পাঁচ শ' যাত্রী যাত্রায় গিয়েছিলেন।"

"কোন কারণে সেবারে হয়তো যাত্রী কম হয়েছিল।" আমি বলি।

ভাগনে আর কোন প্রশ্ন করে না।

আমি আবার শুরু করি, "বিশ্বকোষে আরও বলা হয়েছে—'পথ এত দুর্গম বলিয়া কাশ্মীরের মহারাজ যাত্রীদের বিশেষ সহায়তা করেন। এই মহাতীর্থ দর্শন করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষের অতি দূরতর স্থান হইতে যাত্রী আসে। তাহার মধ্যে ধনী দরিদ্র, যোগী সন্ন্যাসী, সকল সম্প্রদায়ের লোক দেখা যায়। দরিদ্র লোককে মহারাজ নিজে পাথেয় দিয়া থাকেন।

'পূর্ণিমার চৌদ্দ-পনের দিন পূর্বে শ্রীনগরের নিকট রামবাগে রাজ-ঝাণ্ডী উড়াইয়া দেওয়া হয়। এই পতাকা দেখিয়া যাত্রীরা ক্রমশ একত্রিত হইতে থাকে। তাহার পর পূর্ণিমার আটদিন থাকিতে সকলে শ্রীনগর হইতে যাত্রা করে। অনন্তনাগে রাজ-ছুটী পৌঁছিলে যাত্রীরা আর কেহ কোথাও থাকে না, সকলে আসিয়া একত্র মিলিত হয়। এখান হইতে অমরনাথ ২৮ ক্রোশ দূর; পাঁচ আড্ডা হইয়া তাহার পর তীর্থস্থানে পৌঁছিতে হয়। পথে কিছুই পাওয়া যায় না; যাত্রীরা অনন্তনাগ হইতে দ্রব্যসামগ্রী কিনিয়া লইয়া যায়।

'রাজপতাকা আগে আগে, পশ্চাতে যাত্রিগণ—প্রাণ হাতে করিয়া চলিতে থাকে। অমরনাথে যাত্রা করিয়া পথের মধ্যে সকলে একুশটি তীর্থস্থানে স্নান করে। যাত্রীরা প্রথমে বিতস্তা নদী পার হইয়া কশ্যপমুনির শ্রীর্য বা শ্রীস্নানে গিয়া পৌঁছে। এখানে কোন দেবমূর্তি নাই। কথিত আছে, এখানে কেহ স্নান করিলে শৌর্য ও শ্রীসম্পন্ন হন।"

ফিরে এলাম হোটেলে।

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকি। কিন্তু তিনতলায় যেতে পারি না। দোতলাতেই থমকে দাঁড়াতে হয়।

বারান্দায় ভীষণ চিৎকার ও চেঁচামেচি চলেছে। নারী-পুরুষের মিলিত কোলাহল—কলহ। হাতাহাতি হয়ে গিয়েছে কি না বলতে পারছি না। তবে এখনও উভয়পক্ষে যে পরিমাণ গালাগালি ও হাত-পা নাড়া চলছে, তাতে যে-কোন মুহূর্তে ঘুষোঘুষি শুরু হয়ে যেতে পারে।

শুরু হতে পারছে না। কারণ মিসেস মণ্ডল, ফকিরবাবু এবং হোটেল ম্যানেজার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাঝেমাঝেই একে-ওকে ধরে ফেলছেন। উভয়পক্ষকে শান্ত করবার জন্য তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কি করবেন? কলহরত যুবক-যুবতীরা যে সকলেই তাঁদের প্যাসেঞ্জার।

এ ধরনের গোলমালের মধ্যে না যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। তবু কাছে না এসে পারি না। এরা যে সবাই আমার সহযাত্রী। আগামীকাল সকালে আমার সঙ্গে দুর-দুর্গম গুহাতীর্থের পথে যাত্রা করবে। আশ্চর্য! অমরতীর্থ দর্শনের জন্য কলকাতা থেকে পহেলগাঁও এসে এরা মারামারি করছে!

হোটেলের কর্মচারীরাই বা কি ভাবছে? আর তাই বোধহয় ম্যানেজার একতলার কাউন্টার ছেড়ে এই দোতলার বারান্দায় উঠে এসেছেন। ফকিরবাবু ও মিসেস মণ্ডলের সঙ্গে একযোগে মারামারি থামাবার চেষ্টা করছেন। কারণ তিনিও বাঙালী।

কিন্তু কলহের কারণ কি? একদলে দেখতে পাচ্ছি সেই তিনজোড়া বাঙালী সাহেব-মেম, আরেকদলে দুটি যুবক। এরা তো রেলে কাছাকাছি 'বার্থ'-এ ছিল। কাল

জম্মু থেকে একই 'বাসে' এসেছে। হোটেলেও পাশাপাশি ঘরে বাস করছে। তাহলে কি যুবক দুটি মেমসাহেবদের কিছু বলেছে? কিংবা কোন নারীঘটিত ব্যাপার?

মিসেস মণ্ডল আমাকে একপাশে ডেকে এনে কানে কানে বলেন, "না, না, সে-সব কিছু নয়। ঐ সোফাদুটোয় বসে ওঁরা গল্প করছিলেন। কথায়-কথায় ঝগড়া, তা থেকেই মারামারি।"

"ইস্যুটা কি?" অসীম জিজ্ঞেস করে।

মিসেস মণ্ডল মৃদু হাসেন। বলেন, "অভিনব।"

"কি? ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান?"

"না।"

"কংগ্রেস, সি পি (এম)?"

"না।" মিসেস মণ্ডল আবার একটু হাসেন। বলেন, "সাউথ-ক্যালকাটা বনাম নর্থ-ক্যালকাটা।"

সত্যই অভিনব, রীতিমত বিচিত্র বিষয় নিয়ে কলহ। তাও আবার দুর্গম তীর্থ-পরিক্রমার প্রাক্কালে!

যাক্ গে, যার যেমন অভিরুচি। এর মধ্যে নাক গলানো নিরর্থক। তাছাড়া স্নান-খাওয়া করা দরকার! খিদে পেয়ে গিয়েছে।

আমরা সিঁড়ি বেয়ে তিনতলায় উঠতে থাকি।

এড়িয়ে যেতে চাইছি, কিন্তু মনের কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাই না—অপরাধী মন। একটা তীব্র অপরাধ বোধ আমার মনকে বার বার আচ্ছন্ন করে তুলতে চাইছে।

আমি বাঙালী। ভারতের সবচেয়ে বৈচিত্র্যপ্রিয় মানুষ আমরা। পর্বতারোহণ থেকে তীর্থ-দর্শন পর্যন্ত আমরা সর্বত্র সংখ্যায় ভারী। অমরনাথ যাত্রার জন্যও যাঁরা আজ এখানে এসেছেন, তাঁদেরও অধিকাংশ বাঙালী।

কিন্তু এর পরেও কি সংখ্যাধিক্যের উদাহরণ পেশ করে আমার গর্ববোধ করার কিছু আছে? আগামীকাল সকালে আমরা যাত্রা করব গুহাতীর্থ অমরনাথের পথে। আচার্য শঙ্কর থেকে স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত যুগাবতারগণ যেপথের ধূলি গায়ে মেখেছেন। ভূস্বর্গ কাশ্মীরের সবচেয়ে সুন্দর জনপদে এসেও আমরা কত সামান্য কারণে কি রকম ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছি? হিমালয়ের এমন শান্তসমাহিত স্বর্গীয় রূপ আমাদের মানসিকতার কোন পরিবর্তন করতে পারল না! তাহলে আমরা কেন চলেছি সেই অমরতীর্থে—স্বামীজী যেখানে ইচ্ছা-মৃত্যু লাভ করেছিলেন?

পাঁচ

খেয়ে নিয়ে একটু গড়াগড়ি দিচ্ছিলাম। বিশ্রামের এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। আগামীকাল এসময় আমরা নিশ্চয়ই চড়াই ভাঙছি।

কিন্তু 'আরাম হারাম হ্যায়' কথাটা কি মিথ্যা হতে পারে? কেউ দরজা ধাক্কাচ্ছে।

কে আবার এল জ্বালাতন করতে? অনিচ্ছা সত্ত্বেও দরজা খুলতে হয়। কুণ্ডু-ট্র্যাভেলস্-এর অনুপম দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"কি ব্যাপার?"

"আপনাকে একবার নিচে যেতে হবে।"

এই রে, সেরেছে! নিশ্চয়ই সেই ঝগড়ার জের এখনও মেটে নি। হয়তো বা 'সাউথ-ক্যালকাটা' দল আমাকে সাক্ষী মেনে থাকবে। খুবই স্বাভাবিক, আমি চব্বিশ-পরগণার মানুষ হলেও দক্ষিণ-কলিকাতার প্রতিবেশী তো বটেই।

তবু অনুপমকে প্রশ্ন করি, "কেন বলুন তো?"

"মিস ভট্টাচার্যের মা হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মিস ভট্টাচার্য আপনাকে একবার ডাকছেন।"

"মিস ভট্টাচার্য?" আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

"আজ্ঞে মিস তুলতুল ভট্টাচার্য।"

"সেকি মোটামাসি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন!" অসীম বিছানায় উঠে বসে। অসীম তুলতুলের মাকে মোটামাসি বলে ডাকছে। এবং সদাহাস্যময়ী মাসি সে ডাকে সাড়া দিচ্ছেন।

অশোক বলে, "এই তো কিছুক্ষণ আগে তাঁকে বাজারে যেতে দেখলাম।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, বাজার থেকে ফেরার পথেই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।" অনুপম জানায়।

ব্রহ্মচারী, অশোক ও অসীমকে নিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে আসি নিচে। ওদের ঘরের সামনে বেশ ভিড়। আমাদের দেখতে পেয়ে তুলতুল হাত নেড়ে ভেতবে ডাকে। সে মায়ের শিয়রে বসে আছে।

আমরা ভেতরে আসি। মিসেস ভট্টাচার্যের জ্ঞান ফিরে এসেছে, তবে এখনও খুবই দুর্বল। চোখ বুজে শুয়ে আছেন। আমাদের সহযাত্রী প্রবীণ ডাক্তাব কে. সি. ভট্টাচার্য পরীক্ষা করছেন তাঁকে।

ডাক্তার ও রোগী দুজনেই ভট্টাচার্য। অসিত ও তুলতুলের বাবা তাঁব পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন।

পরীক্ষার পবে ডাক্তার ভট্টাচার্য বেরিয়ে এলেন বাইরে। অসিতেব সঙ্গে পরামর্শ করে প্রেসক্রিপশান লিখলেন। তারপবে সেখানি মিঃ ভট্টাচার্যের হাতে দিয়ে বললেন, "ভয়ের কিছু নেই। Journey এবং Ir-regularity-র জন্য Indigestion হয়েছে। Abdominal discomfort-এর জন্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। এই ওষুধগুলো এনে খাইয়ে দিন। পেটটা একটু হালকা হয়ে গেলেই সুস্থ হয়ে উঠবেন।"

"কাল যাত্রায় যেতে পারবেন কি?" তুলতুল জিজ্ঞেস করে ডাক্তারবাবুকে। সে কখন বাইরে বেরিয়ে এসেছে খেয়াল করি নি।

ডাক্তারবাবু সহাস্যে বলেন, "মা, না যেতে পারলে কি আর করবে? বাবা মাকে নিয়ে এখানে থাকবেন। তুমি আমাদের সঙ্গে যাত্রায় যাবে। মা ও বাবার নামে অমরনাথের পুজো দেবে। মেয়ের পুণ্যে মায়ের পুণ্য হবে।"

"তা হয় না জেঠু!" তুলতুল ডাক্তার ভট্টাচার্যকে বলে, "মা-বাবা না গেলে আমিও অমরনাথ যাব না।"

"আপনার মেয়ে তো দেখছি ভারি লক্ষ্মী ভট্চাজসাহেব!" ডাক্তার ভট্টাচার্য তুলতুলের বাবাকে বলেন। তারপরে তুলতুলের দিকে তাকিয়ে আবার বলেন, "না মা,

মাকে নিয়েই তুমি কাল যাত্রায় যেতে পারবে। ওষুধগুলো এনে খাইয়ে দাও, মা আজ রাতেই সুস্থ হয়ে উঠবেন।"

বাবার হাত থেকে প্রেসক্রিপশানখানি হাতে নিয়ে তুলতুল বলে, "টাকা দাও, ওষুধ নিয়ে আসছি।"

"তুমি যাবে কেন?" পাশের থেকে অশোক বলে ওঠে।

"তাতে কি হয়েছে?" তুলতুল অশোকের দিকে তাকিয়ে একটু হাসে।

"না না।" অশোক প্রতিবাদ করে, "আমরা এতগুলো লোক থাকতে, তুমি যাবে মাসিমার জন্য ওষুধ আনতে!" সে তুলতুলের হাত থেকে প্রেসক্রিপশানখানি নিয়ে নেয়। তারপরে অজিতকে বলে, "চলুন, মাসিমার ওষুধটা নিয়ে আসি।"

"চলুন।" অজিত অশোকের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করে।

মিঃ ভট্টাচার্য বলে ওঠেন, "টাকা নিয়ে যান।" তিনি পকেটে হাত দেন।

অশোক থামে না। চলতে চলতে একখানি হাত উঁচু করে বলে ওঠে, "আমার সঙ্গে টাকা আছে।"

ওরা সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে যায়।

মিঃ ভট্টাচার্য ঘরে গিয়ে মিসেসের পাশে বসেন।

তুলতুল অসিতকে জিজ্ঞেস করে, "ডাক্তার জেঠু যা বললেন, তা কি ঠিক? না আপনারা আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন?"

অসিত বোধহয় বুঝতে পারে না তার কথা। সে তাকিয়ে থাকে তুলতুলের মুখের দিকে!

তুলতুল বুঝতে পাবে ব্যাপারটা। বলে, "মা কাল সকালের আগে সুস্থ হয়ে উঠবে তো? আমরা কি কাল যাত্রায় যেতে পারব?"

"নিশ্চয়ই!" অসিতের স্বরে ডাক্তারের আত্মপ্রত্যয়। সে যোগ করে, "মাসিমার তেমন কিছুই হয় নি।"

তুলতুল আশ্বস্ত হয়। সে উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে ওঠে, "আমি তাহলে গোছগাছ করে নিই?"

অসিত আবার বলে, "নিশ্চয়ই।" তারপরেই তার মনে পড়ে কথাটা। ডাক্তার পরামর্শ দেয়, "কিন্তু মাসিমাকে 'ডিস্টার্ব' কোরো না। ওঁর আজ রাতটা ভাল করে ঘুমানো দরকার, ঘুমের ওষুধ দেয়া হচ্ছে।"

অশোক ও অজিত ফিরে আসে। অসিত ওষুধগুলো তুলতুলকে বুঝিয়ে দেয়। আমরা উঠে আসি ওপরে। মামারাও আমাদের ঘরে, সরকারদার সঙ্গে গল্প করছিল। আমরা ঘরে ঢুকতেই ওরা কথা থামায়। ভাগনে জিজ্ঞেস করে, "তুলতুলের মা কেমন আছেন?"

সব বলি ওদের।

একটু বাদে চা আসে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে মামা বলে, "ঘোষদা, এবারে চল বেরিয়ে পড়া যাক। কেনা-কাটা বাকি রয়েছে।"

"কিনবেন না ভাড়া করবেন?" সরকারদা জিজ্ঞেস করেন, "এখানে নাকি জুতো-জামা-লাঠি থেকে শুরু করে কম্বল বাসনপত্র ও তাঁবু—সবই ভাড়া পাওয়া যায়।"

"হ্যাঁ।" ভাগনে মাথা নাড়ে। বলে, "চলুন দোকানে গিয়ে ঠিক করা যাবে। তাছাড়া লিডারের তীরে গিয়ে বসতে হবে কিছুক্ষণ।"

আবার বেরিয়ে পড়েছি পথে। সেই এক পথ দিয়ে একই দিকে হেঁটে চলেছি। পহেলগাঁওয়ে মূল-পথ এই একটি, সব পথ এসে এই পথে মিশেছে। এই পথের পাশেই বাজার পোস্ট-অফিস থানা ও বড় বড় হোটেল, এক কথায় পহেলগাঁও সদর।

বাজারের দিকেই চলেছি। কেনাকাটা রয়েছে। তবু এখন আমরা বাজারে থামব না। বাজার ছাড়িয়ে, ময়দান পেরিয়ে লিডারের তীরে গিয়ে বসব।

পহেলগাঁও লিডার উপত্যকার মধ্যমণি। এ উপত্যকাকে বলা হয় কাশ্মীর উপত্যকার একটি প্রিয়তম পার্শ্ব-উপত্যকা'— 'a favourite side-valley'.

এই উপত্যকার বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত পর্বতারোহী ও হিমালয় বিশারদ স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ড তাঁর 'Kashmir' বইতে বলেছেন— 'It is not of such wild rocky grandeur as the Sind valley, but has milder beauties of its own, charming woodland walks, and in summer a wealth of roses pink & white, jasmine, forget-me-nots, a handsome spiraea, strawberry, honeysuckle etc. By the side of the road runs the cool, foaming Lidar stream, and everywhere are villages hidden amongst masses of chenar walnut and mulberry.

স্যার ফ্রান্সিস প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে পহেলগাঁও এসেছিলেন। বলা বাহুল্য তখন পহেলগাঁও কয়েকখানি মাত্র বাড়ি-ঘর নিয়ে এক গণ্ডগ্রাম। হোটেল ছিল না বললেই চলে। অথচ তখনও গ্রীষ্মকালে ঘোড়ায় চড়ে কিংবা হেঁটে প্রায় প্রতিদিন পর্যটকরা এখানে আসতেন। তাঁরা তাঁবু ফেলে লিডারের তীরে রাত্রিবাস করতেন আর সারাদিন পহেলগাঁওয়ের পথে পথে পদচারণা করতেন।

সে আমলে য়ুরোপীয় পর্যটকদের কাছে কাশ্মীরে প্রিয়তম স্থান ছিল গুলমার্গ। কিন্তু স্যার ফ্রান্সিস সেকালের পহেলগাঁও সম্পর্কে লিখেছেন— 'I fancy life here is dull compared with life at Gulmarg, but for those who wish to vegetate and lead and absolutely quiet existence. Pahalgam is admirably suited... The camping ground is in a wood of blue pines, and the fresh, clear, pine scented air is refreshing after the stuffy main valley in midsummer.'

স্যার ফ্রান্সিসের মন্তব্য যে মিথ্যে নয় তার প্রমাণ আমরা পাই মাত্র বছর তিরিশ পরে (১৯৩৩) প্রকাশিত 'New Guide to Kashmir' নামে একখানি বইতে। লেখক শ্রী আর. সি. অরোরা এই বইতে পহেলগাঁও প্রসঙ্গে লিখেছেন— 'Its climate is invigorating and in the opinion of many, it is considered to be the best in the whole of Kashmir.'

বলা বাহুল্য তাঁর এই মতটি ভারতীয় পর্যটকদের কাছে একালেও সত্য। আর তার কারণ পহেলগাঁওয়ে গুলমার্গের চেয়ে শীত অনেক কম। ভারতীয় পর্যটকদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে ১৯৩৩ সালের আগেই এখানে বেশ কিছু বাড়িঘর, দোকানপাট ও হোটেল গড়ে উঠেছিল।

১৯৪৫ সালে রাজ্যসরকার কর্তৃক প্রকাশিত 'Handbook of Jammu &

Kashmir State' বইতে পহেলগাঁও সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'in the heart of the finest side valley of Kashmir, the Lidar valley...It attracts an increasing number of visitors every summer.'

তখন এখানে ডাক ও তারঘর, দাতব্য চিকিৎসালয়, থানা ও তহশিল অফিস সবই হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ স্যার ফ্রান্সিসের আগমনের বছর চল্লিশের মধ্যেই গণ্ডগ্রাম পহেলগাঁও একটি জনপ্রিয় জনপদে পরিণত হয়েছিল। এবং আজ পহেলগাঁও নিঃসন্দেহে কাশ্মীরে পর্যটকদের প্রিয়তম স্থান।

কিন্তু কেবল অবস্থান কিংবা জলবায়ুর জন্যই পহেলগাঁওয়ের জনপ্রিয়তা নয়। এর অন্যতম কারণ পহেলগাঁও তিনটি বৈচিত্র্যময় যাত্রাপথের সঙ্গম। এখান থেকে যাওয়া যায় কোলাহাই, বাইসুর‍্যান-ট্যানান এবং অমরনাথ।

অমরনাথের কথা এখন থাক। লিডারের প্রধান উৎস কোলাহাই হিমবাহের কথা আগেই বলেছি। কাজেই বাইসুর‍্যান ও ট্যানানের কথা ভাবা যাক্। গুলমার্গের মতো পাইনবনে বেষ্টিত চমৎকার একটি মালভূমি বাইসুর‍্যান। পহেলগাঁও থেকে মাত্র ৩ মাইল! ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া যায়। সকালে আমার কয়েকজন সহযাত্রী ঘুরে এসেছেন।

বাইসুর‍্যান থেকে আরও ৩ মাইল এগিয়ে ট্যানান। প্রথম ৩ মাইলের মতো সহজ রাস্তা নয়, সংকীর্ণ এবং খাড়া চড়াই পথ। পথ-প্রদর্শক ছাড়া যাওয়া ঠিক নয়, পথ ভুল হবার সম্ভাবনা। ট্যানানের কাছে দুটি অনিন্দ্যসুন্দর হ্রদ রয়েছে। আর সেখান থেকে কোলাহাই হিমবাহের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর।

ভাবনা থামাতে হল। আমরা আবার মূলপথে এসেছি। পথ তো নয়, যেন মেলা বসেছে। যাত্রীরা সমানে কেনাকাটা করছেন। আমিও এই সংখ্যাতিত তীর্থযাত্রীদের একজন। আমাকেও কেনাকাটা করতে হবে। কিন্তু এখন আমরা লিডারের তীরে চলেছি। ফেরার পথে বাজার করব। অতএব ভিড় ঠেলে এগিয়ে চলি।

পহেলগাঁওয়ের প্রাণ-প্রবাহ লিডার। লিডার উপত্যকা শুরু হয়েছে জেলাসদব অনন্তনাগ থেকে। এটি কাশ্মীরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্ত। পহেলগাঁও উপত্যকার মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত। এখান থেকে অনন্তনাগ ২২ মাইলের মতো।

লিডারের দুটি ধারার সঙ্গমে অবস্থিত পহেলগাঁও, ধারা দুটি এসেছে কোলাহাই ও শেষনাগ থেকে। অনেকে প্রথমটিকে লিডার ও দ্বিতীয়টিকে শেষনাগ নদী বলেন। আমরা অবশ্য দুটিকেই লিডার তথা নীলগঙ্গা বলব। কারণ দুয়ের মিলিত ধারার নামও লিডার।

পহেলগাঁও থেকে লিডার উপত্যকা তির্যকভাবে দুদিকে প্রসারিত—লিডার ওয়াট এবং অমরনাথের দিকে। অনন্তনাগের কাছে লিডার প্রায় ৩/৪ মাইল প্রশস্ত। এখানে কম, ওপরে আরও কম—শেষদিকে মাত্র কয়েকশ' ফুট চওড়া।

উপত্যকার দু-পাশেই পাহাড়ের প্রাচীর। নিচের দিকে ক্ষেত-খামার, এখানে পাহাড়ের গায়ে ঘাস এবং ঘনবন, শেষদিকে শুধু পাথর আর বরফ। চাষাবাদ ভালই হয় এ উপত্যকায় কিন্তু ক্ষেতের সীমা পহেলগাঁওয়ের ওপরে আর বড়জোর মাইল তিনেক। প্রখ্যাত পর্যটক ও সমীক্ষক Jacquement নাকি এ উপত্যকায় খনিজ-তামা পেয়েছিলেন।

আমরা পৌঁছে গিয়েছি নীলগঙ্গার বেলাভূমিতে। মোটামুটি সমতল। শুধু এখানে-

ওখানে দু-একখানি করে বড় বড় পাথর রয়েছে পড়ে। তারই কয়েকখানির ওপরে বসে পড়ি আমরা। বসে বসে লিডারকে দেখি। টলমলে নীলাভ জল। ধাপে ধাপে নেমে আসছে, নাচতে নাচতে নামছে। নদীগর্ভের পাথরে পাথরে প্রতিহত হয়ে মাঝে মাঝে ফেনার কুণ্ডলী সৃষ্টি করছে—যেন মুক্তো ছড়িয়ে দিচ্ছে। এই নদীব কথা মনে রেখেই বোধহয় বিবেকানন্দ একদিন লিখেছিলেন, 'The river is pure that flows, the monk is pure that goes'...চরৈবেতি...

নীলগঙ্গা এখানে খুবই খরস্রোতা, দুর্বার বেগে বয়ে চলেছে। জলও বেশ ঠাণ্ডা। অথচ তারই মাঝে স্নান করছেন কয়েকজন যাত্রী। কি করবেন? সবাই তো আর আমাদের মতো হোটেলে ঘর নিতে পারেন নি। অধিকাংশ যাত্রী রয়েছেন তাঁবুতে। তাঁদের কাছে জল বলতে এই লিডার।

"ঘোষদা একটু লিডারের কথা বলুন না!"

ভাগনের কথায় আমার ভাবনায় ছেদ পড়ে। আমি লিডারের দিক থেকে ভাগনের দিকে মুখ ফেরাই।

ভাগনে আবার বলে, "একটু লিডারের কথা বলুন না ঘোষদা!"

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। সুতরাং শুরু করি, "উত্তব এবং উত্তর-পূর্ব দিক থেকে দুটি পাহাড়ী নদী এসে এই ৩৪° অক্ষরেখা ও ৭৫°২২ দ্রাঘিমায় অবস্থিত পহেলগাঁওয়ের পাদদেশে মিলিত হয়েছে। পাহাড়ী নদী দু'টির উৎস কোলাহাই হিমবাহ এবং শেষনাগ। কিন্তু পহেলগাঁওকেই লিডারের প্রকৃত জন্মস্থান বলা উচিত, যেমন গঙ্গার জন্মস্থান দেবপ্রয়াগ।"

"আচ্ছা ঘোযদা, আমি অনেক পাহাড়ী নদী দেখেছি। কিন্তু এই লিডারের জলকে যেন একটু বেশি সাদা মনে হচ্ছে!" মামা মুখ খোলে এবাবে।

উত্তর দিই, "তুমি ঠিকই বলছ মামা! আর এর কারণ কি জানো?"

"কী?"

"পাশের পাহাড়ের বরফগলা জলে সৃষ্ট হচ্ছে শেযনাগ। সেখান থেকে সৃষ্ট লিডার চন্দনবাড়ি হয়ে এখানে এসেছে। অনেকে বলেন, শেষনাগের অনতিদূরে জাম্‌তিনাগ নামে একটি হ্রদ রয়েছে। সেই হ্রদ থেকেও একটি ধারা এসে শেষনাগে পড়েছে। সেই ধারাটি এই বিচিত্র সাদা রংটি বহন করে লিডারের জলকে এমন সাদা করে দেয়।"

"শেষনাগের তীরে তো আমাদের তাঁবু পড়বে।" অশোক বলে, 'তাহলে সেই সাদা ধারাটিকে দেখা যাবে।"

"দেখা যাবে কিন্তু বোঝা যাবে না, কারণ আমবা থাকব অনেক উঁচুতে।" অসীম অশোককে বুঝিয়ে দেয়।

বাসুদেব বলে, "আপনি লিডারের কথা বলুন ঘোষদা!"

আবার শুরু করি, "পহেলগাঁওয়ের দক্ষিণ প্রান্তে এসে দুটি ধারা মিলিত হয়েছে। খরস্রোতা নদী দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এর পরেও বহুদূর পর্যন্ত নদীগর্ভ এমনি বড় বড় পাথরে বোঝাই, সুতরাং নদী নাব্য নয়।"

"কিন্তু ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন, তাঁরা নৌকোয় করে শ্রীনগরে ফিরে গিয়েছিলেন?" ব্রহ্মচারী জিজ্ঞেস করে।

"স্বামীজী সম্ভবত অনন্তনাগ থেকে নৌকোয় উঠেছিলেন।" আমি উত্তর দিই। বলতে থাকি, "খরস্রোতা লিডার অনন্তনাগের উত্তরে পৌঁছে পূর্ণ করেছে তার পথ-পরিক্রমা, মিলিত হয়েছে ঝিলমের সঙ্গে। নীলগঙ্গা নীলকণ্ঠের পাদোদক পৌঁছে দিয়েছে ঝিলমেব স্রোতে—মর্ত্যলোক স্বর্গবারিতে সিঞ্চিত হয়েছে।"

গোধূলি ঘনিয়ে এসেছে। ওপারের পাহাড়ে সন্ধ্যার যবনিকা এসেছে নেমে। এখুনি এপারেও নেমে আসবে আঁধার। তারপবে আকাশে চাঁদ উঠবে! নীলগঙ্গা রূপান্তরিত হবে রুপোলীধাবায় আর পহেলগাঁওকে মনে হবে স্বপ্নের জগৎ।

মনে পড়েছে ভগিনী নিবেদিতার লেখা পঙ্‌ক্তি কয়টি। স্বামীজীর সঙ্গে অমরনাথ দর্শন করে পরদিন এমনি সময়ে তাঁরা পহেলগাঁও ফিরে এসেছিলেন। হযতো এমনি কোন জায়গায় বসে তাঁরা দীর্ঘ ও দুর্গম পদযাত্রার ক্লান্তি দূর করছিলেন আর—

'...We sat on, with the great moon overhead, and the towering snows, and rushing river, and the mountain-pines. And the Swamı talked of Sıva, and the Cave and the great verge of vision.'

বাজার সেরে ফিরে এলাম হোটেলে। গেটের মুখে দেখা হল গোপালের সঙ্গে। সে বোধহয় কারও প্রতীক্ষায় রয়েছে। তাকে একটু গম্ভীর মনে হচ্ছে। ব্যাপার কি? সদাহাস্যময় গোপাল এমন গম্ভীর কেন?

আমরা কাছে আসতেই গোপাল বলে, "শঙ্কুদা, ন'দা আপনাকে একবার ডাকছেন।"

ন'দা মানে ফকিরবাবু। আমি গোপালের দিকে তাকাই। সে আবার বলে, "ন'দা নিচে তাঁর ঘরেই রয়েছেন।"

হাতের জিনিসগুলো ব্রহ্মচারীকে দিয়ে বলি, "তোমরা ঘরে যাও, আমি ফকিরবাবুর সঙ্গে দেখা করে ওপরে আসছি।"

ওরা ওপরে চলে যায়। আমিও ফকিরবাবুর ঘরের দিকে এগোতে থাকি। গোপাল আমার সঙ্গী হয়।

কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন ফকিরবাবু ও মিসেস মণ্ডল। আমি ঘরে ঢুকতেই তাঁরা কেন যেন হঠাৎ নীরব হয়ে গেলেন। সবাই বারবার আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। ব্যাপার কি?

"বসুন।" মিসেস মণ্ডল আমাকে বলেন।

সামনের একখানি খালি চেয়ারে বসে পড়ি তাড়াতাড়ি। কিন্তু কেউ আর কোন কথা বলছে না। একটা অস্বস্তিকর নীরবতা।

"আপনি ডেকেছেন আমাকে?" আমি নিজেই নীরবতা অবসান করতে চাই। ফকিরবাবুর দিকে তাকাই।

তিনি মাথা নাড়েন। কিন্তু মুখে কিছুই বলেন না। শুধু মিসেস মণ্ডলের দিকে একবার তাকান।

মিসেস ক্ষীণকণ্ঠে বলেন, "আপনার একটা টেলিগ্রাম এসেছে।"

"টেলিগ্রাম!" চমকে উঠি। "কোথায়?" আমি প্রায় চিৎকার করে জিজ্ঞেস করি।

"এই যে।" ফকিরবাবু কথা বলেন এতক্ষণে। তিনি পকেট থেকে বের করে টেলিগ্রামটা আমার হাতে দেন।

খামটা ছেঁড়া। ফকিরবাবুই ছিঁড়েছেন বোধহয়। তাড়াতাড়ি টেলিগ্রামটি বের করি। লেখা রয়েছে— 'Goutam unimproved (.) Developing epileptic symptoms (.) Your presence is not essential but preferable—Dasarathi.'

এ তো টেলিগ্রাম নয়, এ যে শক্তিশেল। সবার নিষেধ উপেক্ষা করে আমি ওকে শয্যাশায়ী রেখেই রওনা হয়ে এসেছি। ভেবেছি ওর আকস্মিক অসুখ আমার প্রতি অমরনাথজীর পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কিন্তু এ কি খবর পাঠালে দাশরথি? বাড়ির লোক টেলিগ্রাম করলে, তবু ভাবা যেত ভয় পেয়ে করেছে। কিন্তু বন্ধু দাশরথি সরকার বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ পর্বতারোহী। সে লিখেছে— 'Developing epileptic symptoms' অর্থাৎ গৌতমের মৃগীরোগের লক্ষণ দেখা দিয়েছে আর তাই আমার উপস্থিতি 'essential' না হলেও 'preferable.'

বাবা অমরনাথ! আমাকে তুমি আবার এ কী কঠিন পরীক্ষায় ফেললে? বাষট্টি সালে সাতদিন পহেলগাঁওয়ে কাটিয়েও তোমাকে দর্শন করতে পারি নি। দু-মাস আগে সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবার পরেও আসতে পারি নি। এবারেও কি তোমার ইচ্ছে, আমি পহেলগাঁও থেকে ফিরে যাই?

না না, এ তোমার পরীক্ষা। আমার আগ্রহ, আমার আন্তরিকতা যাচাই করছ তুমি! একমাত্র বংশধরকে অসুস্থ রেখে ঘর ছাড়া হয়তো উচিত নয়। কিন্তু ঠাকুর, আমি তো প্রমোদ-ভ্রমণে আসি নি, আমি যে তোমার যাত্রায় এসেছি। তোমাকে দেখব বলে তাকে ফেলে এসেছি। তোমার ভরসাতেই তাকে অসুস্থ রেখে চলে এসেছি। তুমি যে সর্বনিয়ন্তা, তুমি তো তাকে অনায়াসে ভাল করে তুলতে পারো!

তুমি নিশ্চয়ই আমাকে পরীক্ষা করছ ঠাকুর! ভেবেছ আমি মায়াবদ্ধ জীব, একমাত্র বংশধরের মায়ায় প্রাণের ঠাকুরকে ফেলে পালিয়ে যাব!

তা হবে না ঠাকুর! এবারে আর তোমার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হব না। আমি তোমার কাছেই যাব।

হে দেবাদিদেব অমরনাথ! তুমি তো শুধু রুদ্রনাথ নও—তুমি শিব, তুমি শঙ্কর, তুমি মৃত্যুঞ্জয়। তুমি শুধু সংহারক নও, তুমি রক্ষক। তুমি শুভ এবং মঙ্গল। তুমি পরম করুণাময়।

তাই তোমার ভরসাতেই আমি ঘর ছেড়েছি, তোমার ভরসাতেই আমি আগামীকালের যাত্রায় যাব। তবে যাবার আগে আমার গৌতমের ভাল মন্দের সমস্ত দায়িত্ব আমি তোমার ওপরেই ন্যস্ত করলাম। তুমি তাকে দেখো, আমি তোমার কাছে আসছি।

টেলিগ্রাম হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াই। এতক্ষণ ওঁরাও সবাই চুপ করেছিলেন। এবারে ফকিরবাবু কথা বলেন, "কি করবেন?"

"কি আর করব?" উত্তর দিই, "আমরা কি-ই বা করতে পারি? যাঁর ইচ্ছেতে গৌতমের অসুখ হয়েছে, তাঁর ইচ্ছেতেই আমি যাত্রায় এসেছি। সুতরাং তাঁর ওপরেই

নির্ভর করতে হবে।”

“আপনি তাহলে যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে!” ওঁরা সবিস্ময়ে বলেন।

“নিশ্চয়ই। কারণ যাঁর যাত্রায় যাচ্ছি, তিনিই আমার গৌতমকে ভাল করে তুলবেন।”

ছয়

সকালে ঘুম ভাঙতেই প্রথম মনে পড়ল—সেই শুভদিন সমাগত। বহুবছরের প্রতীক্ষার অবসান হবে আজ। আজ আমি সত্যই যাত্রা করছি অমরতীর্থ অমরনাথের পথে।

চা খেয়েই যাত্রার আয়োজনে লেগে যাই। সহযাত্রীরা খুশি হয়ে ওঠে। এতক্ষণে যেন ওরা আমার যাত্রা করা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। ওরা বোধহয় ভেবেছিল শেষপর্যন্ত আমি না-ও যেতে পারি।

অপ্রয়োজনীয় মালপত্র আলাদা করে দিতে হল। এগুলো এখানেই থাকবে। প্রয়োজনীয় মালপত্র যাবে ঘোড়ার পিঠে। আমার মালপত্র কম। সেটুকু হ্যাভারস্যাকে ভরে নিয়েছি। বিছানাটা শুধু ফকিরবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আমার বিছানা বলতে অবশ্য এয়ার-ম্যাট্রেস এবং স্লিপিং ব্যাগ।

একটু বাদে ফকিরবাবু ডেকে পাঠালেন আমাকে। নিচে এসে দেখি হোটেলের পেছনে ‘লন্‌-’এ পর্বতপ্রমাণ মালপত্রের মাঝে বসে রয়েছেন ভদ্রলোক। পাশে সারি সারি ঘোড়া। ঘোড়াওয়ালারা মালপত্র ওজন করে ঘোড়ার পিঠে চাপাচ্ছে আর ফকিরবাবু ও মিসেস মণ্ডল সেগুলো খাতায় লিখে রাখছেন। ওজন অনুযায়ী যাত্রীদের ভাড়া দিতে হবে যে।

ফকিরবাবু আমাকে বললেন, “আপনার মালের ভাড়া লাগবে না।”

“কেন বলুন তো?”

মিসেস মণ্ডল উত্তর দেন, “আমাদের নিয়ম হল, যাঁর মালের ওজন সবচেয়ে কম হবে, তাঁর কাছ থেকে আমরা ভাড়া নিই না। এবারে আপনি সেই ‘প্রাইজ’টা পেলেন।”

“এবারে কেন”, হাসতে হাসতে ফকিরবাবু বললেন, “এই রকম বিছানা আনলে আপনি প্রতিবার প্রাইজ পাবেন।”

সহাস্যে বলি, “এ কৃতিত্ব আমার নয়, যাঁরা এয়ার-ম্যাট্রেস ও স্লিপিং-ব্যাগ আবিষ্কার করেছেন, এ কৃতিত্ব তাঁদের।”

“শঙ্কুদা!”

তাকিয়ে দেখি কখন তুলতুল এসে আমার পাশে দাঁড়িয়েছে। সে একেবারে তৈরি হয়ে এসেছে। তার পরনে প্যান্ট্‌ ও স্পোর্টস শার্ট, পায়ে হান্টার শু, চোখে ‘গো-গো গগল্‌স, মাথায় টুপি, কাঁধে ওয়াটার বট্‌ল, এক হাতে ফুলহাতার সোয়েটার ও রেন্‌কোট, আরেক হাতে লাঠি। লাঠির বদলে আইস এক্‌স ও পিঠে একটা রুক্‌স্যাক হলেই পুরো মাউন্টেনিয়ার।

আমার কাছে এগিয়ে আসে সে। বলে, “আমি কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছি শঙ্কুদা, গৌতম একেবারে ভাল হয়ে গিয়েছে।”

কথাটা ভাল লাগে আমার। মাত্র ক’দিনের পরিচয়। সম্পর্ক বলতে সহযাত্রী। তবু

আমার ভাবনায় আকুল হয়ে স্বপ্ন দেখেছ সে।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারার আগেই তুলতুল আবার বলে, "সত্যি বলছি শঙ্কুদা, আমি স্বপ্ন দেখেছি, সে নিজেই তার ভাল হয়ে যাবার খবর দিয়েছে আপনাকে।"

"ব্যস্", মিসেস মণ্ডল বলে ওঠেন, "তুলতুল ব্রাহ্মণকন্যা, ওর স্বপ্ন মানে ব্রহ্মস্বপ্ন, মিথ্যে হবার নয়।"

"আমার স্বপ্ন কিন্তু সত্যই দারুণ ঠিক হয়, মাকে জিজ্ঞেস করবেন।" বেচারি তুলতুল নিজের হয়ে ওকালতি করে।

তাই তাড়াতাড়ি বলি, "বাবা অমরনাথের কৃপায় আর তোমাদের শুভেচ্ছায় সে এতদিনে ভাল হয়ে উঠেছে, এই ভরসাতেই তো আমি তোমাদের সঙ্গী হচ্ছি তুলতুল! কিন্তু তার কথা থাক, তোমার মা কেমন আছেন বলো?'

"ভাল।" সানন্দে বলে ওঠে সে। "মা একেবারে ভাল হয়ে উঠছে। তার ডাণ্ডি এসে গেছে। একটু বাদেই রওনা হচ্ছে।"

"মা রওনা হয়ে যাবার পরে তুমি গৌরীকে নিয়ে গেটের সামনে থেকো, আমি ওদের সবাইকে নিয়ে সেখানে আসছি।"

তুলতুল মাথা নাড়ে। আমি আবার সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকি।

ঘরে ফিরে আসতেই ওরা ঘিরে ধরে আমাকে। উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে অশোক প্রশ্ন করে, "কি খবর?"

খবর! আমি বুঝতে পারি না প্রশ্নটা।

"ফকিরবাবু ডেকে পাঠিয়েছিলেন!" ব্রহ্মচারী বলে।

"আবার কোন টেলিগ্রাম এল নাকি?" অসীম যোগ করে।

এবার ওদের উৎকণ্ঠার কারণ বুঝতে পারি। এরা আমার আত্মীয় নয়, শুধুই সহযাত্রী। কিন্তু রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও আজ এরা আমার সবচেয়ে বড় আপনজন। আমরা যে একই দুর্গমতীর্থ পথের পথিক, আনন্দ ও বেদনার সমান অংশীদার। তাই আমার গৌতমের জন্য ওদের উৎকণ্ঠার অন্ত নেই।

আমি ওদের উৎকণ্ঠা দূর করি। ফকিরবাবুর ডেকে পাঠাবার কারণ বলি। তুলতুলের স্বপ্ন দেখার মতই মামা আমাকে আশ্বাস দেয়, "আমারও মন বলছে, বাবা অমরনাথের কৃপায় গৌতম এতদিনে ভাল হয়ে উঠেছে।"

সে বিশ্বাস আমারও আছে। কিন্তু বিশ্বাস-অবিশ্বাসের আলোচনা আর নয়। দুর্গম না হলেও, দীর্ঘপথ, ১০ মাইল পাহাড়ী পথ পাড়ি দিতে হবে আজ। পদযাত্রার প্রথম দিন। এখুনি ব্রেক-ফাস্ট সেরে রওনা হওয়া দরকার।

হ্যাভারস্যাক কাঁধে নিয়ে নেমে আসি নিচে। গেটের সামনে এসে দাঁড়াই। সহযাত্রীরা অনেকেই এসে গিয়েছেন। কারও ঘোড়া এসে গেছে, কেউ বা ঘোড়ার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমাদের মধ্যে কেবল বাসুদেব ঘোড়া নিয়েছে।

আমরা সাতজন ছাড়া আর ঘোড়া নেয়নি অসিত ও পরিতোষবাবু। তুলতুল ও গৌরী ঘোড়ায় চড়বে না কিন্তু তারা ঘোড়া নিয়েছে। গৌরীর ঘোড়া আসেনি। ঘোড়ায় না চড়লেও ঘোড়ার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ঘোড়াওয়ালাকে বলে দিতে হবে সঙ্গে সঙ্গে থাকতে।

অতএব আমাদেরও প্রতীক্ষা করতে হয়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সহযাত্রীদের দেখি। তাঁরা অশ্বারোহী হবার অপেক্ষায় রয়েছেন। বলা বাহুল্য নির্ভয়ে নয়। একে আমার অধিকাংশ সহযাত্রী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, তার ওপরে তাঁরা জীবনে কখনও ঘোড়ায় চড়েননি। সুতরাং শোচনীয় পরিস্থিতি। সত্যি উপভোগ করবার মতো।

নীরব দর্শক হবার ছেলে অসীম নয়। জনৈকা প্রবীণা সর্বদা নাইলন শাড়ি পরেন বলে অসীম কয়েকদিন ধরেই তাঁকে 'নাইলন-মাসি' বলে ডাকছে আর ভদ্রমহিলাও সে-ডাকে সাড়া দিচ্ছেন। তাঁকে দেখতে পেয়েই অসীম বলে ওঠে, "সে কি! আজও আপনি নাইলন শাড়ি পরে নিয়েছেন?"

"তাহলে কি পারব?" মাসি সহাস্যে প্রশ্ন করে।

অসীম সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, "কেন তুলতুল যেমন প্যান্ট-শার্ট পরেছে।"

"কি যে বলো তুমি?" মাসি কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করেন।

অসীম প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে, "ঠিক আছে, ঐ শাড়িতেই চলবে। তবে এই সুযোগে ঘোড়ায় চড়াটা ভাল করে প্র্যাক্‌টিস করে নিন। তাহলে আর কলকাতায় ফিরে ট্রাম-বাসের ঝামেলা সইতে হবে না।"

"মানে?" মাসি বুঝতে পারেন না।

ওর বক্তব্য আমরাও অনুমান করতে পারছি না। অসীম উত্তর দেয়, "কলকাতায় ফিরে একটা ঘোড়া কিনে নেবেন, তাতে চড়েই টালা-টালিগঞ্জ করতে পারবেন।"

আমরা হো হো করে হেসে উঠি। মাসিমাও বাদ যান না।

হাসি থামলে অসীম আবার বলে, "তুলতুল আর গৌরীদি কি বোকামিটাই করলে।"

"কেন?" ওরা দুজনেই প্রশ্ন করে।

"ভাড়া দিয়েও ঘোড়ায় চড়লে না।"

"তাতে বোকামি কেন হল?" তুলতুল জিজ্ঞেস করে।

অসীম জবাব দেয়, "কলকাতায় ফিরে গিয়ে নাইলন-মাসির মতো তোমাদের আর ঘোড়া কেনা হল না।"

আবার সমবেত হাস্যরোল।

ফকিরবাবু আগেই বলে দিয়েছেন—পথে যে যেমন পারবেন, পথ চলবেন কিন্তু এখন সবাই একসঙ্গে যাত্রা করবেন।

সহযাত্রীরা সবাই তৈরি হয়ে আসেন নি এখনও। আমরা তাই হোটেলের সামনে রয়েছি দাঁড়িয়ে। আমরা যাত্রী, যাত্রাকাল সমাগত। আমরা শুভযাত্রার প্রতীক্ষায় রয়েছি।

আমি আজ সত্যই যাত্রা করছি অমরতীর্থ অমরনাথের পথে। আমার বহু বছরের বাসনা পূর্ণ হতে চলেছে। বহু বাধা ও বিপত্তি উপেক্ষা করে আমি আজ এই যাত্রাপথের দ্বারে এসে দাঁড়াতে পেরেছি।

জানি না আমার যাত্রা সফল হবে কি না? জানি না আমি অমরতীর্থে পৌঁছব কি না? জানি না আমি সেই স্বয়ম্ভু তুষারলিঙ্গকে দর্শন করতে পারব কি না?

শুধু জানি আমি আজ গুহাতীর্থের যাত্রী, হিমালয় পথের পথিক। যাত্রার সাফল্য আমার হাতে নয়, সে দায়িত্ব তীর্থদেবতার। যিনি আমাকে ডেকে এনেছেন, তিনিই

আমায় পৌঁছে দেবেন সেই অমরতীর্থে। আমি পথিক, আমি শুধু পথ চলব।

সুতরাং সাফল্যের কথা ভাবছি না। আমি ভাবছি যাত্রার কথা, কিছুক্ষণ বাদে আমি যে যাত্রায় শামিল হব, যুগাতীত কাল ধরে কত অসংখ্য যাত্রী সেই যাত্রায় যোগদানের জন্য প্রতিবছর আমারই মতো এসে দাঁড়িয়েছেন এখানে—এই পহেলগাঁওয়ের পথে। আমারই মতো তাঁরা যাত্রা করেছেন অমরতীর্থে। অনেকে পৌঁছতে পারেন নি। কেউ ফিরে এসেছেন, কেউ বা ফিরতে পারেন নি—বাবা অমরনাথের পদতলে রয়ে গিয়েছেন চিরকালের মতো।

তাঁদের সবার কথা জানা নেই আমার। আমি শুধু শুনেছি যুগের পর যুগ ধরে তাঁরা এসেছেন, তাঁরা আসছেন, তাঁরা আসবেন। এসেছেন মহাতপা মহামুনি ভৃগু, এসেছেন প্রজাপালক শ্রীরামচন্দ্র, এসেছেন যুগাবতার শঙ্করাচার্য। এসেছেন স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী অভেদানন্দ, স্বামী দিব্যাত্মানন্দ। এসেছেন বাংলাসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিব্রাজক প্রবোধকুমার সান্যাল।

বিবেকানন্দ অমরনাথ দর্শন করেছেন ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে, অভেদানন্দ ১৯২২ ও প্রবোধদা ১৯৫৩ সাল। স্বামীজী এসেছেন ৭৯ বছর আগে। অভেদানন্দ ৫৫ বছর ও প্রবোধদা ২৪ বছর আগে। আর আজ এই ১৯৭৭ সালের ১৯শে আগস্ট আমি পহেলগাঁও থেকে অমরনাথ যাত্রা করছি।

আমার কথা পরে হবে, আগে তাঁদের কথা ভেবে নিই। পহেলগাঁও থেকে স্বামীজীর যাত্রা প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'Notes of some Wanderings with Swami Vivekananda' বইতে বলেছেন—'৩০শে জুলাই। প্রাতে ছয়টার সময় আমরা প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া যাত্রা করিলাম। কখন ছাউনীটি উঠিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহা আমরা অনুমান করিতে পারিলাম না। কারণ আমরা যখন খুব প্রত্যূষে জলযোগ করি তখনই অতি অল্পসংখ্যক যাত্রী বা তাঁবু অবশিষ্ট ছিল। কল্য যে স্থানে সহস্র লোক এবং তাঁহাদের পট্টানিবাস বিদ্যমান ছিল, সেখানে গতপ্রাণ অগ্নিসমূহের ভস্মরাশি মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে।' নিবেদিতার নিজের ভাষায় 'The ashes of dead fires were all that marked the place where yesterday had been a thousand people and their canvas homes.'

স্বামী অভেদানন্দ পহেলগাঁও থেকে যাত্রা করেন ৪ঠা আগস্ট। ১৯২২। তিনি যাত্রা প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'কয়েকদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হওয়াতে এই অঞ্চলের পার্বত্য পথগুলি অত্যন্ত পিচ্ছিল হইয়া গিয়াছে। সেইজন্য "ধমার্থ বিভাগ" ঢোল পিটাইয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দিলেন—"রাস্তা পিচ্ছিল, চড়াই সাবধানে অতিক্রম করিবে, উৎরাতেই কেহ ঘোড়ার পিঠে থাকিবে না। বৃহৎ বোঝা ও তাঁবুর লম্বা খোঁচা কেহ ঘোড়ার পিঠে চাপাইবেন না।" যাত্রীরা ঠিকমতো আদেশ পালন করিতেছে কিনা দেখিবার জন্য পথের মোড়ে মোড়ে তাঁহারা পাহারারও বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

প্রবোধদা পহেলগাঁও থেকে যাত্রা করেছিলেন ১৯৫৩ সালের ২১শে আগস্ট। প্রবোধদা লিখেছেন—'এযাত্রায় সকলের আগে গেছে প্রথম অমরনাথের পূজারীর দল, তারা প্রথম অভিযাত্রী, গেছে পায়ে হেঁটে। তাঁদের সঙ্গে আছে শ্রীঅমরনাথের আটাসোঁটা আর রাজছত্র, আছে পূজার উপকরণাদি শঙ্খ-ঘণ্টা। এরা প্রতি বছরই সকল যাত্রীর আগে

গিয়ে গুহায় পৌঁছায়।'...

'শান্ত পাহাড়ী ঘোড়া অনেকটা তাঁর নিজের ইচ্ছায় ধীরে ধীবে আমাদেরকে নিয়ে চললো উত্তরপথে। মাঝে মাঝে কোনো কোনো বাঁকে দেখতে পাচ্ছি সুদীর্ঘ পথে শ্রেণীবদ্ধ ঘোড়ার ক্যারাভান। পহেলগাঁও ছাড়ালেই লিডার নদীর নড়বড়ে সাঁকো পাওয়া যায়, তারপরেই সরকারি টোল আপিস। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাই, দরিদ্র অশ্বরক্ষীদের কাছে থেকে এখানে অবস্থার অতিরিক্ত ট্যাক্স আদায় করা হয়।'

সাত

"বাবা অমরনাথজীকি?"

"জয়।"

শুরু হল যাত্রা—পরমপ্রার্থিত পদযাত্রা। 'নিউ পাইনভিউ' হোটেলের গেট পেরিয়ে আমরা নেমে আসি পথে।

সেই পথ। পরিচিত পহেলগাঁওযের পরিচিত পথ। গতকাল বারবার যে-পথে পদচাবণা করেছি, সেই পথ দিযেই চললাম এগিয়ে। আমরা দশজন পদাতিক রয়েছি সবার শেষে! অশ্বারোহীরা টগ্‌বগ্‌ করে আগে আগে চলেছে। পথটা প্রায় মিছিলে পরিণত। যতদূর দেখা যাচ্ছে শুধু মানুষ আর মানুষ, ঘোড়া আর ঘোড়া।

আমরা পদাতিক হলেও আমাদের সঙ্গে দুটি ঘোড়া রয়েছে। ভাগ্যবান ঘোডা। গৌবী ও তুলতুল তাদের পিঠে ওঠেনি। তাবা হেলে-দুলে আগে আগে চলেছে।

রমণীয় পহেলগাঁও। অনন্তনাগ জেলাব একটি তহশিল। সাতটি তহশিল আছে এই জেলায়। অমরনাথ পহেলগাঁও তহশিলের অন্তর্ভূক্ত। এই তহশিলের আযতন ১২১ ৮ বর্গ কিলোমিটার! জনসংখ্যা মাত্র ৪০,৬৯২ জন।

কিন্তু তহশিলের কথা থাক, পহেলগাঁও শহরের কথাই ভাবা যাক। পহেলগাঁও শহরের আয়তন ২০.৭ বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ মাত্র ২০৭২ হেক্টব। ছোট ও বড় মিলিয়ে মোট ৩৪০ খানি বাড়ি আছে এই শহরে। স্থায়ী জনসংখ্যা মাত্র ২৩৩৫ জন। তাঁদের মধ্যে ১০৩৮ জন মহিলা এবং ১২৯৭ জন পুরুষ। এঁরা ৩৯০টি পরিবারে বিভক্ত। শহরে মাত্র ২২১ জন পুরুষ ও ৪ জন মহিলা লিখতে ও পড়তে পারেন।

রমণীয় পহেলগাঁও। এবারে মাত্র একটি দিন কাটিয়েছি তার বুকে। এরই মধ্যে কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছে। বিদায় বেলায় মনটা তাই ভারী হয়ে উঠেছে।

কিন্তু আমরা তো আবার ফিরে আসব তার কাছে। তবু মন মানে না। বিরহ মানেই বিষাদ।

তাহলেও মনকে বিষাদমুক্ত করতে হবে। বিষাদগ্রস্ত মন নিয়ে পাহাড়ী পথ পাড়ি দেওয়া যায় না। তাই পথের পাশে দোকান-পাটের দিকে তাকাই। অন্যমনস্ক হয়ে উঠতে চাই।

বাজার ছাড়িয়ে এসেছি। পেরিয়ে এলাম ময়দান। পৌঁছলাম লিডারের তীরে। লিডারের তীরে তীরে পথ চলে পায়ে পায়ে পৌঁছতে হবে অমরতীর্থ অমরনাথে।

অনেকে অবশ্য নদীর এ অংশটাকে শেষনাগ নদী বলেন। তাঁদের মতে কোলাহাই

থেকে সৃষ্ট ধারাটি শুধু লিডার। এটি তার উপনদী। আমি কিন্তু তাঁদের সঙ্গে একমত নই। আমার কাছে এটিও লিডার বা নীলগঙ্গা। নীলগঙ্গার বাম তীর দিয়ে সারি বেঁধে পথ চলেছি। আমরা এখন অমরতীর্থের পথ চলেছি।

সবার আগে মামা ও ভাগনে। তাদের পেছনে সরকারদা ও পরিতোষবাবু। তার স্ত্রী ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে গিয়েছেন। পরিতোষবাবুদের পেছনে ব্রহ্মচারী ও অশোক। তাদের পরে তুলতুল ও গৌরী। সবার শেষে আমি এবং অসীম। লাঠি হাতে অক্লেশে এগিয়ে চলেছি।

সামনে ও পেছনে যতদূর দেখা যাচ্ছে শুধু সারি সারি যাত্রী—অশ্বারোহী অথবা পদাতিক। অশ্বারোহীর সংখ্যাই বেশি। বিগত বিশ বছরে হিমালয়ের বিভিন্ন দুর্গম তীর্থপথ পরিক্রমা করেছি। কিন্তু কোথাও এত অশ্বারোহী দেখিনি। অথচ পাহাড়ী পথে ঘোড়ায় চড়া যেমন কষ্টকর, তেমনি বিপজ্জনক। প্রতি মুহূর্তে পড়ে যাবার ভয়। আর তার ফলে চারদিকে নজর দেবার অবকাশ থাকে না। দেবতাত্মা হিমালয়ের অপরূপ রূপ অদেখা থেকে যায়।

হঠাৎ ভাগনে পথ চলা থামায়। পেছনে ফিরে হাসতে হাসতে বলে, "তুলতুল ও গৌরীদির ঘোড়াওয়ালারা কিছুতেই বুঝতে পারছে না, ঘোড়া ভাড়া নিয়েও কেন মেমসাবরা হেঁটে যাচ্ছেন। এমন কাণ্ড তারা আর কখনও দেখেনি।"

"কাল সকালেই বুঝতে পারবে।" অসীম মন্তব্য করে।

"মানে?" তুলতুল বলে ওঠে।

"কাল সকালে উঠে যখন দেখবে পা ব্যথা হয়েছে, তখন সুড়সুড় করে গিয়ে ঘোড়ায় চেপে বসবে।"

"আমাদের সম্পর্কে এত poor idea আপনার?" গৌরী জিজ্ঞেস করে।

কিন্তু অসীম উত্তর দেবার আগেই তুলতুল গম্ভীরস্বরে তাকে বলে, "আপনি আজ কোন প্রতিবাদ করবেন না গৌরীদি, আমরা কাল সকালেই অসীমদাকে একথার জবাব দেব।" সে গট্‌মট্‌ করে এগিয়ে চলে।

বেশিদূর এগোতে পারে না। প্রকৃতি যে পথের পাশে রূপের পসরা নিয়ে বসে রয়েছে। সেই রূপসুধা পান না করে কার সাধ্য তাড়াতাড়ি পথ চলে।

শহর ছাড়িয়ে এসেছি। পথটা একটু উঁচুতে উঠে আবার নেমে এল নিচে। সেখানেই রামজীর মন্দির।

মন্দির দর্শন করে সোজা উত্তরে এগিয়ে চললাম। আমাদের বাঁদিকে নদী, ডাইনে বন-জঙ্গল। বনের মাঝে-মাঝে বাড়ি-ঘর। পথের পাশে ছোট উঠান কিংবা শাক-সব্‌জির বাগান। তারপরে কাঠ ও টিনের ঘর—ছবির মতো সুন্দর। আমাদের কথাবার্তা ও পায়ের শব্দে সাড়া পেয়ে জীর্ণ পোশাকপরা কিন্তু ফুলের মতো সুন্দর কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছুটে আসে বাইরে। হাত বাড়িয়ে করুণ স্বরে বলতে থাকে—বাবুজি, শেঠজি, সাব।

দু-চারটি করে পয়সা দিই, দু-একটি করে লজেন্স দিই। ওরা খুশি হয়ে সেলাম করে।

কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, অসম থেকে গুজরাত, যেখানেই গিয়েছি এই অভুক্ত

ছেলে-মেয়ের দল এসে এমনি আমার পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। দু-চারটি পয়সা দিতেই তারা এমনি খুশি হয়ে নমস্কার করেছে। এদের কাছে হিন্দু-মুসলমান বৌদ্ধ-খ্রীস্টান শব্দগুলো অর্থহীন। এরা শাসকদের দল বদলের সংবাদ রাখে না। হয়তো বা স্বাধীন ও পরাধীনের পার্থক্যও বোঝে না।

পথটি বাঁয়ে বাঁক নিল। আমরা উৎরাই পথ বেয়ে নেমে এলাম লিডারের বেলাভূমিতে। কাঠের প্রশস্ত পুল পেরিয়ে নদীর অপর তীরে এলাম। এখন নীলগঙ্গা আমাদের ডাইনে। আমরা চড়াই ভেঙে ওপরে উঠছি।

একটু বাদেই চড়াই শেষ হল। প্রায় সমতল একটি সংকীর্ণ অধিত্যকা। তারই ওপর দিয়ে পথ প্রসারিত। ওপারে নদীর গায়ে খাড়া পাহাড়। এপারে পাহাড় অনেকটা দূরে সরে গিয়েছে।

এখানে কয়েকখানি কাঠ পাথর ও টিনের ঘর রয়েছে। তাব একখানিতে চুঙ্গি অফিস। ঘোড়া ও ডাণ্ডিওয়ালাদের পরচা পরীক্ষা করা হচ্ছে। সুতরাং অশ্বারোহীদের নামতে হয়েছে মাটিতে। ঘোড়ার সঙ্গে তাঁরাও দাঁড়িয়ে রয়েছেন পথের পাশে। আমাদের ঘোড়া দুটি লাইনে দাঁড়ায়। আমরা শালবল্লীর গেট পেরিয়ে এপারে আসি।

বাকি ঘরগুলো সবই দোকান। দরজি মুদি ও মনোহারী দোকান। চাল ডাল, আটা তেল, নুন, বিড়ি, দেশলাই থেকে কাপড় পর্যন্ত সবই পাওয়া যাচ্ছে। গুটিদুয়েক চায়ের দোকানও আছে।

আমার কিন্তু বসলাম না, সোজা পথ ধরে উত্তর-পূর্বে এগিয়ে চললাম।

কয়েক পা এগিয়েই ছোটকাঠের পুল। বাঁ পাশের পাহাড় থেকে একটা ঝরনা এসে নীলগঙ্গায় পড়েছে। তারই ওপরে পুল।

পুল পেরিয়েই পথের ধারে একখানি সাইনবোর্ড—

"Holy Cave 29 miles
Chandanwari 9"

"তার মানে আমরা এক মাইল এলাম।" তুলতুল বলে।

"হ্যাঁ।" অসীম যোগ করে, "আরও ঊনত্রিশ মাইল হাঁটতে হবে!"

"হাঁটব।" তুলতুল বেপরোয়া কণ্ঠে বলে। আর তারপরেই বোধহয় তার মনে পড়ে কথাটা। সে বলে ওঠে, "আপনার ভুল হল অসীমদা!"

"কি রকম?"

"ঊনত্রিশ মাইল যেতে আর তিরিশ মাইল ফিরতে, তার মানে আরও ঊনষাট মাইল হাঁটতে হবে। হাঁটব।"

পরাজিত অসীম চুপ করে থাকে।

"আজকালকার মেয়ে অসীমদা, কথায় পেরে উঠবেন না।"

"তোমার ছাত্রীরাও বোধহয় তোমাকে এমনি কথায় হারিয়ে দেয়?"

"হামেসা।"

ব্রহ্মচারীর স্বীকারোক্তি শুনে সবাই হেসে উঠি।

পথ বেশ প্রশস্ত। এখন চন্দনবাড়ি পর্যন্ত জীপ ও ট্রাক চলাচল করছে। পথটি পাকা হয়নি বলে বাস চলছে না। দু-এক বছর বাদে তীর্থযাত্রীদের আর এ পথটুকু হাঁটতে হবে

না। চন্দনবাড়ি থেকেই তাঁদের পদযাত্রা শুরু হবে। অর্থাৎ যাতায়াতে বিশ মাইল পথ কমে যাবে। এখনও অবশ্য অনেকে বিশেষ ব্যবস্থা করে মালের ট্রাক কিংবা সরকারি জীপে চড়ে চন্দনবাড়ি চলে যান।

আগে হাঁটা পথে পহেলগাঁও থেকে চন্দনবাড়ির দূরত্ব ছিল আট মাইল। আর্থার নেভে নামে জনৈক ডাক্তার এই শতাব্দীর প্রথম দশকে মেডিক্যাল মিশন নিয়ে কাশ্মীরে এসেছিলেন। তিনি কিন্তু লিখেছেন পহেলগাঁও থেকে চন্দনবাড়ি নয় মাইল।

ডাঃ নেভে ডাক্তারি করতে এসে কাশ্মীর হিমালয়ে প্রচুর পদপরিক্রমা করেছেন এবং পর্যটক ও পর্বতারোহীদের জন্য একখানি চমৎকার 'গাইড বুক' সম্পাদনা করেছেন। বইখানির নাম, 'The Tourist Guide to Kashmir, Ladakh Skardo & ...'. সেই বইতে তিনি এই পথ ও চন্দনবাড়ির বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন— 'The pilgrim route goes up the east branch ...The scenery gets even wilder. At one place there is a fine cascade...The road is rough, but practicable for laden ponies. The encampment is on a broad, grassy meadow surrounded by pine trees and overhung by huge crags.

সেকালে দূরত্ব যা-ই হয়ে থাক, একালে পহেলগাঁও থেকে চন্দনবাড়ি দশ মাইল। অর্থাৎ মোটরপথ হয়ে দূরত্ব বেড়ে গিয়েছে কিন্তু যাত্রীরা এখনও হাঁটা থেকে রেহাই পাননি।

তবে তাতে তাঁদের তেমন ক্ষতি হয় নি। কারণ এমন সুন্দর পথে পদচারণা পথিকের পরম সৌভাগ্য। বাঁয়ে গাছে ছাওয়া সবুজ পাহাড়, ডাইনে সোনালি মকাই আর লাল রামদানার ক্ষেত। তারপরে নীলধারার মতো আঁকাবাঁকা নীলগঙ্গা; সুনীল ফেনিল উচ্ছ্বসিতা লিডার। নাচতে নাচতে নিচে চলেছে। তার কলগানে চারিদিক মুখর করে রেখেছে।

বাঁদিকের পাহাড় আস্তে আস্তে পথ থেকে ওপরে উঠে গিয়েছে। তার বুক জুড়ে বনের বিস্তার—পাইনের সারি। পাইনগাছের গায়ে গায়ে জড়িয়ে রয়েছে নানা জাতের ফার্ন আর পথের পাশে ফুটে আছে অসংখ্য রঙীন বনফুল—"প্রাইমুলা", "ক্রেনস্ বিল," "জেনিশিয়ান" প্রভৃতি জানা-অজানা ফুল।

মাঝে মাঝে গুর্জরদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী এবং শিশু সবাই আছে ওদের দলে। গরু, ঘোড়া ও ভেড়ার পাল নিয়ে চলেছে ওরা। কোথায় যাচ্ছে কে জানে? হয়তো নিজেরাও জানে না। ওরা যে যাযাবর। সব সময় ভাবে—"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে!"

আর তারই ফলে আমরা হারিয়ে যাওয়া অমরনাথকে আবার খুঁজে পেয়েছি। এদেরই মতো একজন যাযাবর গুর্জর ছিলেন আক্রামবাট মল্লিক। পহেলগাঁও তহশিলের বটকোট গাঁয়ের মানুষ তিনি। ভেড়া চড়াতে গিয়েছিলেন ঐ অঞ্চলে। একদিন একটা ভেড়া গেল হারিয়ে। ভেড়া খুঁজতে খুঁজতে আক্রামবাট গিয়ে উপস্থিত হলেন গুহাতীর্থে।

মেষপালক তাঁর হারিয়ে যাওয়া মেষটিকে খুঁজে পেয়েছিলেন কি না জানা নেই আমার, শুধু জানি তিনি হারিয়ে যাওয়া অমরতীর্থকে খুঁজে পেয়েছিলেন, দর্শন করেছিলেন, স্বয়ম্ভু তুষারলিঙ্গ।

স্বামীজীও মোটামুটিভাবে এই কাহিনী সমর্থন করেছেন। এই সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন—'he who (Vivekananda) suggested that the first discovery of the place had been by a party of shepherds, who had wandered far in search of their flocks one summer day, and had entered the cave to find themselves, before the unmelting ice, in the presence of Lord Himself.'

আক্রামবাট মল্লিক সম্ভবত সেই মেষপালকদের নেতা ছিলেন। আর তাই তাঁর বংশধরগণ আজও ভক্তবৃন্দের অর্ঘ্যের অংশ পেয়ে যাচ্ছেন। পুণ্যার্থীরা অমরনাথের উদ্দেশে যে অর্থ বস্ত্র এবং ফল-মূল ও মিষ্টি নিবেদন করেন, তা তিনভাগ করা হয়? একভাগ পান ছড়ির মহান্ত মহারাজ, একভাগ মার্তণ্ডের পাণ্ডা অর্থাৎ অমরনাথের পূজারীরা, আরেক ভাগ আক্রামবাটের বংশধরগণ। মুসলমান হয়েও তাঁরা পুরুষানুক্রমে হিন্দু পুণ্যার্থীদের অর্ঘ্য পেয়ে যাচ্ছেন। আর তাই মল্লিকরা পহেলগাঁওয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী পরিবার।

আক্রামবাট কবে গুহাতীর্থ আবিষ্কার করেছেন, তার তারিখ জানা নেই আমার। আমি শুধু জানি সেটি নিতান্তই একালের কথা। কারণ আধুনিক যুগেই আমরা অমরনাথকে হারিয়ে ফেলেছিলাম।

অমরনাথ সুপ্রাচীন তীর্থ। সেকালে সবাই জানতেন এই গুহাতীর্থের কথা। যাত্রারও প্রচলন ছিল। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ কাশ্মীর ও হিমাচলের শ্রেষ্ঠ ইতিহাস রাজতরঙ্গিনী। কাশ্মীররাজ জয়সিংহের রাজত্বকালে মহাকবি কল্হন এই গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করে ১১৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইতিহাসকে শ্লোকবদ্ধ করেন। পরবর্তী অংশ অর্থাৎ ১৪৫৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্তের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন কবি জোনরাজ। তাঁর শিষ্য কবি শ্রীবর রচনা করেন পরবর্তী অংশ অর্থাৎ ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস। তার মানে রাজতরঙ্গিনী দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতকের কাব্য-ইতিহাস।

রাজতরঙ্গিনী থেকে জানা যায় প্রায় তিন হাজার বছর আগে রামদেব নামে কাশ্মীরে এক রাজা ছিলেন। তিনি শুকদেব নামে এক লম্পট বাজপুরুষকে গুহাতীর্থ অমবনাথে বন্দী করে রেখেছিলেন। তারপরে তাঁকে নীলগঙ্গায় ফেলে দিয়ে মেরে ফেলা হয়।

রাজতরঙ্গিনীর আরেক জায়গায় বলা হয়েছে খ্রীস্টপূর্ব ৩৪ থেকে ১৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মহারাজা সৈদিমতি কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। তিনি অমরনাথের যাত্রায় অংশ নিয়ে তুষারলিঙ্গ দর্শন করেছিলেন।

এ তো গেল প্রাচীন যুগের কথা, এবারে মধ্যযুগের কথা ভাবা যাক। ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট আকবর কাশ্মীর অধিকার করেন। তাঁর সভাসদ ঐতিহাসিক ও সুপণ্ডিত আবুল ফজল (খ্রীঃ ১৫৫১-১৬০২) 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে অমরনাথের তুষারলিঙ্গ ও যাত্রা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। তার মানে সপ্তদশ কি অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন সময়ে আমরা অমরতীর্থকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। অষ্টাদশ কি উনবিংশ শতাব্দীতে আক্রামবাট আবার গুহাতীর্থকে খুঁজে পেয়েছেন। এবং তার অনতিকাল পরেই (১৮১৯ খ্রীঃ) পণ্ডিত হরিদাস টিকু এই যাত্রাকে জনপ্রিয় করে তোলেন।

কিন্তু গুহাতীর্থের কথা এখন আর নয়। তীর্থ কিংবা তীর্থদেবতার কথা না ভেবে তীর্থপথকে দেখা যাক। জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য ও স্বামী বিবেকানন্দের পদরেণুরঞ্জিত পথে *পদচারণা করছি আমি। আমি ধন্য, ধন্য আমার জীবন।*

বাঁদিকের পাহাড় সরে গিয়েছে খানিকটা। ঘাসে ছাওয়া বনময় সবুজ পাহাড়। পাহাড়ের পাদদেশে মকাই ক্ষেত। ডানদিকে অনেকটা নিচু দিয়ে বয়ে চলেছে নীলগঙ্গা। সব সময় দেখা যাচ্ছে না, ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে লুকিয়ে পড়ছে মাঝে-মাঝে। কিন্তু নিজেকে গোপন করতে পারছে না কারণ তার কলগান কানে আসছে অবিরত।

আরেকটি গ্রামে আসা গেল। ছোট গ্রাম—পথের ধারে দুটি দোকান ও গুটিকয়েক বাড়ি। কয়েকটি ছেলে-মেয়ে তেমনি পথের ধারে দাঁড়িয়ে পয়সা চাইছে, তেমনি দু-চারটি করে পয়সা দিতেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে। সবাই বলেন—কাশ্মীর বড়লোকদের জায়গা। কথাটা মোটেই মিথ্যে নয়। প্রতিবছর পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটকরা কাশ্মীরে এসে কয়েক কোটি টাকা খরচ করে যান। তার ওপরে ভারত সরকার বহু বছর ধরে কাশ্মীরের উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত উদারহস্তে সাহায্য করে চলেছেন। অথচ দরিদ্র কাশ্মীরীদের অবস্থা একই রয়ে গেল। আশি বছর আগে স্বামীজী যখন এই পথ দিয়ে অমরনাথ গিয়েছেন, তখন তাঁর কাছে ছেলে-মেয়েরা যেমন পয়সা চেয়েছে, আজ আমার কাছেও তেমনি চাইছে। 'সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে।'

চিন্তায় ছেদ পড়ে। গৌরীর ঘোড়াওয়ালা জানায়—এটি পথের শেষ গ্রাম।

"তার মানে আমরা পহেলগাঁও থেকে তিনমাইল এসেছি?"

সে মাথা নাড়ে।

গৌরী বলে, "আরও সাত মাইল হাঁটতে হবে আজ?

"হ্যাঁ।" অসিত উত্তর দেয়।

ঠিক কথা ডাক্তার অসিতও হেঁটে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে সে যোগ দিয়েছে আমাদের সঙ্গে। তার মানে আমরা এখন এগারোজন।

"পথ কিন্তু মোটেই খারাপ নয়।" তুলতুল মন্তব্য করে।

খুশি হই। হিমালয়ের দুর্গমপথে এই তার প্রথম পদপরিক্রমা। সুতরাং তার মন্তব্য মূল্যবান।

"খারাপ তো দূরের কথা, বেশ সহজ এবং নিরাপদ পথ।" গৌরী যোগ করে।

"কাল টের পাবেন কেমন পথ—পিসু চড়াই পেরোতে হবে।" অসীম যথারীতি ওদের ভয় দেখায়। বলে, "আজ তো মোটরপথ দিয়ে হেঁটে চলেছেন।"

কথাটা গৌরীকে বললেও অসীমের আসল লক্ষ্য তুলতুল। কিন্তু সে কিছুই বলে না। সে সামনের দিকে তাকিয়ে পথ চলেছে। কি যেন দেখছে মনোযোগ দিয়ে।

হঠাৎ তুলতুল ডাক্তারকে বলে, "বাইনোকুলারটা চোখে লাগিয়ে দেখুন তো অসিতদা! সামনে কে হেঁটে হেঁটে চলেছে। অনেকটা আমার বাবার মতো মনে হচ্ছে।"

কিন্তু তিনি হেঁটে যাবেন কেন? মিঃ ভট্টাচার্য তো ঘোড়া নিয়েছেন! না, না, তুলতুলের অনুমান সত্য নয়।

অসিত অন্যকথা বলে। চোখ থেকে বাইনোকুলার নামিয়ে সেটি তুলতুলের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, "আমার তো মনে হচ্ছে মেসোমশাই, তুমি একবার দেখো তো।"

বাইনোকুলার চোখে লাগিয়েই তুলতুল চেঁচিয়ে ওঠে, "হ্যাঁ, আমার বাবা। কিন্তু বাবার ঘোড়া কোথায় গেল?"

সত্যই ব্যাপারটা বিস্ময়কর।

তুলতুলের ঘোড়াওয়ালাকে বুঝিয়ে দিই ব্যাপারটা। তারপরে বলি, "তুমি ঘোড়ায় চড়ে তাড়াতাড়ি ঐ সাহেবের কাছে চলে যাও, তাঁকে একটু থামতে বলো। আমরা আসছি।"

সে জোর কদমে এগিয়ে যায়, আমরাও জোরে জোরে পা চালাই। কয়েক মিনিট বাদেই আমরা মিঃ ভট্টাচার্যের কাছে পৌঁছই। তিনিও খুশি হলেন আমাদের পেয়ে। তারপরে জানালেন, "আমার ঘোড়াওয়ালা নাকি কাল সন্ধ্যার সময় পহেলগাঁও পৌঁছেছে, তখন অফিস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আর 'ট্যাক্স টোকেন' করাতে পারেনি। আজ তো অফিস খোলার আগেই রওনা হতে হয়েছে। তাই চুঙ্গি অফিসের একটু আগে আমাকে ঘোড়া থেকে নামিয়ে দিয়েছে। বলেছে, আপনি আস্তে আস্তে হাঁটুন, আমি ঘোড়া নিয়ে সামনের পাহাড়টা পেরিয়ে আপনার কাছে আসছি।"

"কিন্তু সে তো অনেকক্ষণ আগের কথা?" আমি জিজ্ঞেস করি।

মিঃ ভট্টাচার্য মাথা নাড়েন।

"তার মানে তুমি তো প্রায় আড়াই মাইল পথ হেঁটেছ?" মেয়েব স্বরে অভিযোগ!

বাবা অপরাধীর স্বরে বলে, "কিন্তু আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না।"

"না, না, তোমার পায়ে ব্যথা। তুমি আমার ঘোড়ায় উঠে বসো।" একবার থামে তুলতুল। তারপরে ঘোড়াওয়ালাকে বলে, "এই সাব্‌কো ঠিক্‌সে লে যাও।"

বাবা মেয়ের কথা অমান্য করতে পারেন না। তিনি ঘোড়ায় উঠতে যান আর ঠিক তখুনি তুলতুলের ঘোড়াওয়ালা বলে ওঠে, "সাব্, আপকা ঘোড়া আগিয়া।"

"কিধর?" আমরা সমস্বরে বলে উঠি।

ঘোড়াওয়ালা ইসারা করে। তাকিয়ে দেখি সত্যি সামনের পাহাড়েব পাকদণ্ডি বেয়ে একটা ঘোড়াকে নামিয়ে আনছে একজন লোক।

তুলতুল আবার দূরবীন চোখে দেয়। বলে, "হ্যাঁ, বাবা! তোমার ঘোড়াওয়ালাই আসছে।"

অতএব আমরা দাঁড়িয়ে থাকি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকি ঘোড়াওয়ালার কথা। ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্য লোকটাকে না জানি কত মাইল চড়াই-উৎরাই করতে হল?

কিন্তু এছাড়া সে কি-ই বা করতে পারে। একে তো ওদের আয়ের তুলনায় ট্যাক্স বেশি। তার ওপরে আগে ট্যাক্স টোকেন না করাবার জন্য নিশ্চয়ই অনেক খেসারত দিতে হত। অপরাধ বন্ধ করবার জন্য যে আইন, সেই আইন অনেক সময় অপরাধ বাড়িয়ে তোলে।

মনে পড়ছে প্রবোধদার মন্তব্য। তিনি লিখেছেন, 'অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাই, দরিদ্র অশ্বরক্ষীদের কাছ থেকে এখানে অবস্থার অতিরিক্ত ট্যাক্স আদায় করা হয়।"

প্রবোধদা অমরনাথ এসেছিলেন ১৯৫৩ সালে, তার মানে চব্বিশ বছর আগে। তারপরে নীলগঙ্গা দিয়ে বহুজল বয়ে গিয়েছে। কিন্তু দরিদ্র ঘোড়াওয়ালাদের ওপরে জুলুম

কিছুমাত্র হ্রাস পায় নি। অথচ ইতিমধ্যে আমরা নাকি অনেকখানি গরিবী হটিয়ে সমাজতন্ত্রের খুবই কাছাকাছি এসে গিয়েছি!

ঘোড়া দেখেই খোঁড়া হলেন মিঃ ভট্টাচার্য। তিনি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ঘোড়ায় উঠলেন। একবার পেছন ফিরে হাত নাড়লেন। বিদায় নিলেন আমাদের কাছ থেকে। তারপরেই টগ্‌বগ্‌ করে এগিয়ে চললেন জোর কদমে।

আমরাও শুরু করি পথ চলা। মেয়ের দুশ্চিন্তার অবসান হয়। সে চলার বেগ দেয় বাড়িয়ে।

তুলতুল নয়, আমি ভেবে চলি তার বাবার ঘোড়াওয়ালার কথা। কর ফাঁকি দেবার জন্য লোকটি কি প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছে। অথচ সে ঠগ নয়। এরা দরিদ্র ও অশিক্ষিত কিন্তু অসৎ নয়। অসৎ হতে পারলে এরা আর দরিদ্র থাকত না। তবু আজ তাকে অসৎ হতে হয়েছে।

সরকারকে কর দেওয়া দেশবাসীর কর্তব্য। আবার দেশের মানুষের অন্নসংস্থান করাও সরকারের কর্তব্য। দুর্ভাগ্যের কথা সরকার সে কর্তব্য পালন না করেও কর আদায় করে চলেছেন। এবং করের বোঝা চাপাবার সময় দেশের মানুষের ক্ষমতা বিচার করছেন না। ফলে কর ফাঁকি দেবার প্রবণতা প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে। সৎ মানুষ অসৎ হয়ে পড়ছে।

এই ঘোড়াওয়ালাদের অধিকাংশই ভূমিহীন কৃষক। চাষ ও ফসলকাটার সময় দিনমজুরী ও বাকি সময় মাল পরিবহনের কাজ করে এরা সংসার প্রতিপালন করে। পহেলগাঁওয়ে ঘোড়াওয়ালাদের মরশুম সাত মাস। কিন্তু সে কেবল কাছাকাছি গাঁয়ের ঘোড়াওয়ালাদের জন্য। দূর গাঁয়ের ঘোড়াওয়ালারা কেবল অমরনাথ যাত্রার সময় পহেলগাঁওয়ে আসে। যাত্রার সময় তারা বড়জোর বারতিনেক যাত্রী বহন করতে পারে। এই বাড়তি রোজগারটুকু তাদের সংবৎসরের শ্রেষ্ঠ সম্বল। মহাজনের দেনা মেটাবার একমাত্র উপায়। দুঃখের কথা কর্তৃপক্ষ সেই রোজগারে অন্যায়ভাবে ভাগ বসান। সাধ্যের অতিরিক্ত কর আদায় করেন। ফলে সুযোগ পেলেই তারা কর ফাঁকি দিতে চায়।

"ওটা কি শঙ্কুদা?"

তুলতুলের কথায় আমার ভাবনা থেমে যায়। ঝরনার ধারে ছোট ঘরটি দেখিয়ে সে প্রশ্নটা করেছে।

করতেই পারে। সে যে হিমালয়ের দুর্গমপথ প্রথম পদচারণা করছে।

"পানি-চাক্কি।" আমার আগেই উত্তর দেয় ভাগনে। বলে, "ঝরনার স্রোতের সাহায্যে পাথরের যাঁতা ঘুরিয়ে গম ও রামদানা প্রভৃতি পিষে আটা তৈরি করা হয়।"

"আমি একটু দেখব।" তুলতুল আবদার করে।

"বেশ তো যাও না, দেখে এসো।" আমি বলি।

অশোক ও অসিত তুলতুলকে নিয়ে যায় ছোট ঘরটিতে। ব্রহ্মচারীও সঙ্গী হয় ওদের।

একটু বাদে ওরা ফিরে আসে। আমরা আবার পথচলা শুরু করি।

"দেখুন দেখুন কি সুন্দর, অনেকটা গঙ্গোত্রীর পথে ধরালীতে ভাগীরথীর বেলাভূমির মতো, তাই না শঙ্কুদা?" গৌরী প্রশ্ন করে আমাকে। সে ইশারায় নীলগঙ্গার

সাদা বেলাভূমি দেখায়।

পথের পাশে ঝোপঝাড়ে বোঝাই গভীর খাদ। খাদের শেষে, অনেকটা নিচে নীলগঙ্গা। সাদা পাথর ও বালির নদীখাতের ওপর দিয়ে এঁকেবেঁকে বয়ে যাচ্ছে একটি নীলধারা। সত্যি সুন্দর। আমরাও দেখি, দু'চোখ ভরে দেখি।

কিছুক্ষণ আগে একটু গরম লাগছিল। কিন্তু এখন ছায়াশীতল পথ, বেশ জোরে বাতাস বইছে। পথ চলতে ভাল লাগছে।

বিচিত্র প্রকৃতি। একটু বাদেই বন শেষ হয়ে গেল। একেবারে ন্যাড়া একটা পাহাড়ের ওপর দিয়ে পথ চলেছি। কিন্তু গরম লাগছে না, কারণ ইতিমধ্যে একখানি কালো মেঘ এসে আকাশ ঢেকে ফেলেছে। রোদ মিলিয়ে গিয়েছে। বৃষ্টি নামবে নাকি?

ভাবতে ভাবতেই শুরু হল বর্ষণ। হিমালয়ের বৃষ্টি এমনি হঠাৎ এসে পড়ে। রেন-কোট গায়ে দিয়ে নিই। এখানে কোন গাছপালা নেই। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলি।

বেশ খানিকটা হেঁটে আসার পরে কয়েকটি পাইন গাছের দেখা পেলাম। তাদের তলায় দাঁড়ানো গেল। জল পড়েছে, মাথা বাঁচছে না তবু দাঁড়িয়ে থাকি।

"এ ভদ্রমহিলা তো আমাদের সঙ্গে এসেছেন।"

তুলতুলের কথা শুনে পথের দিকে তাকাই। হ্যাঁ, এক বৃদ্ধা বিধবা অতি কষ্টে এগিয়ে আসছেন। ইস্, বৃষ্টিতে ভিজে একেবারে চুপ্‌সে গিয়েছেন। সারা গায়ে কাদায় লেপালেপি। বোধহয় বেশ কয়েকবার আছাড় খেয়েছেন।

গৌরী সমর্থন করে তুলতুলকে। সাথে বলে, "হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গেই এসেছেন। কিন্তু উনি ঘোড়া নেন নি কেন? ওঁর অবস্থা তো খারাপ নয়!"

ভদ্রমহিলা লাঠিতে ভর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন। পথ চলতে খুব কষ্ট হচ্ছে তাঁর। হবেই তা, একে বৃষ্টি তার ওপরে কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথ।

সামনে আসতেই তাঁকে কাছে ডাকি। তিনি গাছতলায় এসে মাটিতে বসে পড়েন। শীতে ঠকঠক করে কাঁপছেন।

আমার হ্যাভারস্যাক থেকে গামছা বের করে দিই। বলি, "গা মুছে ফেলুন।"

মামা বলে, "আমার ব্যাগে একখানি গরম চাদর আছে। দেব নাকি ঘোষদা?"

"চাদরটা ভিজে যাবে, তবু দাও।"

মামার হাত থেকে চাদরখানি নিয়ে গৌরী বলে, "শঙ্কুদা, আপনারা একটু বাঁকের ওপাশে গিয়ে দাঁড়ান, আমরা ওঁর জামা-কাপড় পালটে দিই।"

গৌরী তার ঘোড়াওয়ালার কাছ থেকে থলিটা চেয়ে নেয়। আমরা কয়েক পা এগিয়ে বাঁকের এপাশে একটা গাছের তলায় দাঁড়াই।

তুলতুল ডাক দেয়। ফিরে আসি আগের জায়গায়। শুকনো শাড়ি ও চাদরের কৃপায় ভদ্রমহিলার কাঁপুনি কমছে। বৃষ্টিও কমে আসছে। একটু বাদে রওনা হওয়া যাবে।

ভদ্রমহিলা অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন। এবার জিজ্ঞেস করি, "আপনার সঙ্গীরা কোথায়?"

"সবাই ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে গিয়েছেন।"

"আপনি ঘোড়া নেননি কেন?" পরিতোষবাবু প্রশ্ন করেন।

"ভেবেছিলাম হেঁটে গিয়ে বাবাকে দর্শন করব। একবার থামেন তিনি। তারপরে

ক্ষীণকণ্ঠে বলেন, "এখন বুঝতে পারছি পারব না।"

"তাহলে এক কাজ করুন।" তুলতুল বলে, "আমাদের সঙ্গে দুটো ঘোড়া রয়েছে, আপনি তার একটায় চড়ে চন্দনবাড়ি চলে যান।"

"না, মা!" ভদ্রমহিলা প্রায় কেঁদে ফেলেন। করুণ কণ্ঠে বলেন, "আজ প্রথম দিনের যাত্রাটা অন্তত আমাকে পায়ে হেঁটে শেষ করতে দাও! আর তো বেশি দূর নেই?"

"এখনও মাইল দুয়েক।" আমি তাঁকে মনে করিয়ে দিই।

"তা হোক গে," তিনি বলেন, "তোমাদের ঘোড়াওয়ালা আমার ভিজে জামা-কাপড়গুলো নিয়ে যাক্। বৃষ্টি কমে গিয়েছে, তোমরাও রওনা হও, আমি আস্তে আস্তে ঠিক পৌঁছে যাব।"

"কাজটা আপনি যত সহজ ভাবছেন, অত সহজ নয় মা! দু-মাইল পথ জলে-কাদায় দুর্গম হয়ে উঠেছে। আপনি একা হেঁটে যেতে পারবেন না।" পরিতোষবাবু কিঞ্চিৎ কর্কশ স্বরে বললেন কথাগুলো।

দু-হাত জোড় করেন ভদ্রমহিলা। সবিনয়ে বলে, "তাহলে তোমরা একজন একটু আমার সঙ্গে থাকো, একটা দিন অন্তত আমি পায়ে হেঁটে যাই। কাল থেকে ঘোড়া নেব, তোমরা দেখে নিয়ো।"

অগত্যা সঙ্গীদের বলি, "বৃষ্টি থেমে গেছে, বেলা তিনটে বাজে। তোমরা এগিয়ে যাও, সাবধানে যেয়ো। আমি ওনাকে নিয়ে আস্তে আস্তে আসছি।"

আট

মেঘলা আকাশ তাই আলো কম। নইলে সন্ধের অনেক আগেই আমরা পৌঁছে গিয়েছি চন্দনবাড়ি বা চন্দনওয়াড়ী। আবার অনেকে বলেন ট্যানিন (Tanin) অথবা চান্দাওয়াস (Chandawas)। আমরা চন্দনবাড়ি বলেই ডাকব একে। কারণ যে যে-নামেই ডাকুন, এটি তার সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম।

ছোট কিন্তু পরম রমণীয় উপত্যকা এই চন্দনবাড়ি। চারিদিকে সবুজ পাহাড়ের প্রাচীর। একপাশ দিয়ে বয়ে চলেছে লিডার। তারই তীরে সারি সারি তাঁবু পড়েছে যাত্রীদের!

পথের বাঁদিকের পাহাড় থেকে একটি পাহাড়ী নদী নেমে এসেছে সমতলে, মিলিত হয়েছে নীলগঙ্গার সঙ্গে। নদীটির নাম শুনছি জলজপট (JOLJPAT) তার ওপরে একটি পুল। এই পুলটি প্রকৃতপক্ষে চন্দনবাড়ির প্রবেশ তোরণ। আমরাও পুল পেরিয়ে চন্দনবাড়ির রমণীয় উপত্যকায় উপস্থিত হয়েছি।

পুল পেরিয়েই পথের বাঁদিকে বিশ্রাম-ভবন ও একাধিক সরকারি অফিস। একটু এগিয়ে ডানদিকে দোকানপাট, যাত্রীনিবাস ও মালবাহকদের বাসগৃহ।

যাত্রীর তুলনায় আশ্রম খুবই কম। তাই কন্ট্রাকটার সর্দারজীরা লিডারের তীরভূমিকে একটি তাঁবু নগরীতে রূপান্তরিত করেছেন। কয়েক বছর আগেও সবাইকে পহেলগাঁও থেকে ভাড়া করা তাঁবু বয়ে নিয়ে আসতে হত। এখনও অনেকে নিয়ে আসেন। কিন্তু না আনলেও তেমন ক্ষতি নেই। কারণ সর্দারজীরা যাত্রার অনেক আগের

থেকেই চন্দনবাড়ি, শেষনাগ ও পঞ্চতরণীতে স্থায়ী তাঁবু ফেলে রাখেন। ভাড়ার বিনিময়ে সেখানে আশ্রয় পাওয়া যায়। এমন কি বিছানাসহ খাটিয়া পেতেও অসুবিধে নেই কোন। ৯,০০০ ফুট উঁচু স্যাঁতসেঁতে উপত্যকায় ভূমিশয্যা কোনমতেই সুখকর নয়।

পথের বৃষ্টি পথেই থেমে গিয়েছিল। কিন্তু তারই মধ্যে পথ হয়ে উঠেছে অতিশয় দুর্গম। গৌরীর শাড়ি পরে ভদ্রমহিলার কাঁপুনি কিছু কমে গিয়েছিল। তাহলেও তিনি খুবই আস্তে আস্তে পথ চলেছেন। কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে আর জোরে চলা সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। ফলে আমি সকলের শেষে এখানে এসেছি।

তাহলেও সন্ধের অনেক আগেই পৌঁছে গিয়েছি চন্দনবাড়ি। ভদ্র-মহিলাকে তাঁর তাঁবুতে দিয়ে নিজের তাঁবুতে এসে দেখি খেয়ে-দেয়ে দিব্যি আড্ডা দিচ্ছে ওরা। আমাকে দেখতে পেয়েই আড্ডা থামিয়ে সোচ্চার স্বরে স্বাগত জানাল। অজিত ছুটে গিয়ে খাবার নিয়ে এল।

খাবার পরে পথে বেরিয়ে পড়া গেল। আমরা চন্দনবাড়ি দেখতে বেরিয়েছি। কাল সকালে সময় পাওয়া যাবে না। ৩৪°৫´ অক্ষরেখা ও ৭৫°২৬´ দ্রাঘিমায় অবস্থিত এই ত্রিভুজাকৃতি রমণীয় উপত্যকা। নীলগঙ্গা বিধৌত বনময় পাহাড়ে ঘেরা তৃণময় উপত্যকা। এখানে-ওখানে প্রচুর বনফুলের সমারোহ। স্বর্গে যাবার ছাড়পত্র পাব কি না জানা নেই আমার। কিন্তু প্রতিবার হিমালয়ে এসে নন্দনকাননের সৌন্দর্য দর্শন করে যাই। প্রথমদিন পদযাত্রার পরেই বেশ বুঝতে পারছি দেবতাত্মা হিমালয়ের কৃপায় এবারেও আমি সে সৌভাগ্য লাভে বঞ্চিত হব না।

কিন্তু একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। ইদানিং কালে বিশেষ করে ১৯৬২ সালের পর থেকে রাস্তাঘাট তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিক সভ্যতা হিমালয়ের গহন-গিরি-কন্দরে অনুপ্রবেশ করছে। সেখানে আমরা ধরাসুতে বাসপথের প্রান্তসীমা দেখেছি, সেখানে প্রায় দশ বছর আগে গঙ্গোত্রীতে বাস চলে গিয়েছে। অথচ আজও চন্দনবাড়িতে বাস এল না, এমনকি রাস্তা তৈরি হয়ে যাবার পরেও না।

বাস না গেলেও জনপদ গড়ে ওঠে, নাগরিক সভ্যতা এগিয়ে যায়। এখানে জল আছে, কাঠ আছে, জনবসতি নেই। ব্যাপারটা বিস্ময়কর!

যাক্‌গে সেকথা, তার চেয়ে চন্দনবাড়িকেই দেখা যাক। এখান থেকে অমরনাথ যাবার দুটি পথ। একটি শেষনাগ ও পঞ্চতরণী হয়ে, যেপথে এখন সবাই যান, সে পথে আমরা যাব। আরেকটি পথ আস্তান (Astan) মার্গ ও কাল হ্রদ (Lake of Death) হয়ে, যে পথে স্বামীজী ফিরে এসেছিলেন। আগে সকলে এই পথে ফিরে আসতেন, কারণ পথটি দুর্গম এবং বিপজ্জনক হলেও দর্শনের পরের দিনই পহেলগাঁও ফিরে আসা যেত। তখনকার দিনে শেষনাগ হয়ে তিনদিনের কমে ফেরা যেত না। কিন্তু এখন শেষনাগের পথ ভাল হয়ে গিয়েছে। এ পথেই দ্বিতীয় দিনে পহেলগাঁও ফেরা যায়। সুতরাং কেউ আর বড় একটা পথে ফেরেন না। সাধারণ যাত্রীদের যেতে দেওয়াও হয় না।

আজ ১৯শে অগাস্ট, আর স্বামীজী এখানে এসেছিলেন ৩০শে জুলাই, (১৮৯৮) প্রায় আশি বছর আগে। সেদিনও নাকি আজকের মতই বৃষ্টি হয়েছিল এখানে। ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন—'সমস্ত বৈকাল ধরিয়া বৃষ্টি হইয়াছে...দুই পশলা বৃষ্টির অবকাশটিতে আমি গাছপালা সংগ্রহের চেষ্টায় বাহির হইলাম এবং সাত আট রকমের

Myesotis দেখিতে পাইলাম; তাহাদের মধ্যে দুইটি আমার নিকট নূতন। তৎপরে আমি আমার ফার গাছটির ছায়ায় ফিরিয়া আসিলাম, উহা হইতে তখনও বারিকণা টপ টপ করিয়া পড়িতেছে।'

অভেদানন্দজী চন্দনবাড়িতে বরফ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি এসেছিলেন ৪ঠা আগস্ট (১৯২২)। কি জানি, পনেরোদিন আগে এলে আমরাও হয়ত এখানে বরফ দেখতে পেতাম। অবশ্য উচ্চহিমালয়ে যেমন তুষারপাতের কোন সময়-অসময় নেই, তেমনি বরফের স্থায়িত্ব নির্ভর করে বৃষ্টিপাত ও অন্যান্য প্রাকৃতিক অবস্থার ওপরে, যেটি বছর বছর পরিবর্তনশীল।

যাক্‌গে, যেকথা ভাবছিলাম। অভেদানন্দজী পঞ্চান্ন বছর আগে চন্দনবাড়ির যে বর্ণনা দিয়েছেন, তা মোটামুটিভাবে আজও মিলে যাচ্ছে। যেমন, 'যে স্থানটিতে যাত্রীদের তাঁবু পড়িয়াছে তাহা একটি বিস্তীর্ণ অধিত্যকা। এই স্থানের চারদিকেই পাহাড় এবং আখরোট, ভূর্জপত্র প্রভৃতির জঙ্গল । নিকটেই একটি পার্বত্য নদী পাথরের উপর আছাড় খাইয়া পড়িতেছে।' তবে তখন সরকারি তত্ত্বাবধায়ক তাঁদের বলেছিলেন, 'রাত্রে এইস্থানে বন্যজন্তুর ভয় আছে।' যেটি আর নেই এখন।

প্রবোধদা এসেছিলেন অভেদানন্দের একত্রিশ বছর বাদে। তিনিও কিন্তু বলেছেন, 'চন্দনবাড়ির অধিত্যকা হোলো একটুখানি অবকাশ মাত্র। চারদিকে পাহাড়ের অবরোধ মাঝখানে এইটুকু ফাঁক। সামনে কয়েকখানি লাল রংয়ের করোগেটের চালা, লোহার ফ্রেমে আঁটা। বছরে দু-একটি দিন এসে গরিব তীর্থযাত্রীরা ঠাণ্ডা ও বৃষ্টি বাঁচিয়ে এখানে আশ্রয় পায়, তারপর সমস্ত বছর শূন্য চালা হা হা করে। অত্যধিক তুষারপাতেব সময পাহাড়ী ভালুকরা এখানে এসে জায়গা নেয়, কিংবা উপত্যকার অন্যান্য জন্তু।'

সেদিন সন্ধের পরে আকাশ ছিল মেঘমুক্ত, তাই দ্বাদশীর চাঁদ উঠেছিল আকাশে। চাঁদের আলোয় চন্দনবাড়িকে চমৎকার দেখাচ্ছিল। প্রবোধদার প্রচণ্ড শীত লাগছিল। তবু প্রকৃতিপ্রেমিক পর্যটক প্রকৃতির রমণীয় রূপ দেখার জন্য সারারাত তাঁবুর পর্দা খুলে রেখেছিলেন।

কথায় কথায় কথাটা বলি সহযাত্রীদের। মামা মন্তব্য করে, "সৌন্দর্য মাথায় থাক ঘোষদা, আমরা পর্দা খুলে শুতে পারব না।"

কাজটা সত্যি সহজ নয়। একে তো একদিনে দেড় হাজার ফুট ওপরে উঠে এসেছি, তার ওপরে বৃষ্টি হয়ে গেছে এবং বেশ বাতাস বইছে। অথচ এ অবস্থায়ও প্রবোধদা তাঁবুর পর্দা ফেলতে পারেন নি। সত্যি সুন্দরের পূজারী তিনি। কি জানি, যাঁরা রূপ-সাগরে ডুব দিতে পেরেছেন, তাঁরাই হয়তো এমনি করেই অরূপরতন পেয়ে থাকেন।

আমরা সুন্দরের পূজারী নই, রূপ-সাগরে ডুব দেওয়া সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে, তবু এই বৃষ্টিভেজা চন্দনবাড়ির কর্দমাক্ত পথে পদচারণা করতে খারাপ লাগছে না।

হিমালয়ে অন্যান্য তীর্থপথের মতো এপথের বিশেষ করে চন্দনবাড়ির তেমন উন্নতি হয় নি। একদিকে ভালই হয়েছে, আজও চন্দনবাড়িতে চাঁদের আলো দেখতে পাওয়া যাবে। তবু আজ চন্দনবাড়ি গমগম করছে। পথের পাশে বেশ কয়েকটি দোকান বসেছে। যাত্রার যাবতীয় জিনিসপত্র এবং খাবারের দোকান। 'বঙালী-খানা'ও পাওয়া

যাচ্ছে এবং সেকথাটি দোকানীদের মুখপাত্রগণ চিৎকার করে ক্রমাগত ঘোষণা করে চলেছে। ভারতের যে-কোন তীর্থ কিংবা দর্শনীয় স্থানে বাঙালী যাত্রীর সংখ্যা সর্বাধিক। সুতরাং মুনাফার প্রয়োজনে ব্যবসায়ীদের বাঙালীর জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখতে হয়।

ফিরে এলাম কলোনীতে—তাঁবুর কলোনী। দুপাশে সারিসারি তাঁবু, মাঝখানে মাটির পথ—বর্ষণসিক্ত, কোথাও কোথাও কর্দমাক্ত। আমরা পঞ্চান্নজন আজ ফকিরবাবুর সঙ্গে যাত্রায় এসেছি, কুণ্ডু ট্র্যাভেলস্-এর জন বিশেক কর্মচারী এসেছেন আমাদের সঙ্গে। ষোলটি তাঁবু নিয়ে আমাদের উপনিবেশ। একেবারে শেষের তাঁবুটি হচ্ছে 'কিচেন টেন্ট্'। তার সামনেই একটি জলের কল। ঝরনা থেকে পাইপ দিয়ে জল নিয়ে আসা হয়েছে। অথচ বেশ কয়েকজন মহিলা সহযাত্রী জল ঘাঁটাঘাঁটি করছেন। অবাক হবার কিছু নেই। আমার অধিকাংশ সহযাত্রীর আদিনিবাস জলের দেশ, পূর্ববঙ্গ। ঢেঁকি শুনেছি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে।

তাহলেও মাসিমা ও পিসিমাদের সাবধান করি। বলি, "শীতের জায়গা, বরফগলা জল, ঠাণ্ডা লেগে যাবে—মুশকিলে পড়ে যাবেন।"

"অসুখ হয়ে পড়লে হয়তো আর অমরনাথ দর্শন হবে না।" অশোক যোগ করে।

আর যায় কোথায়? মাসিমারা ক্ষেপে যান। একজন জিজ্ঞেস করেন, "তাহলে তোমার খুব মজা হয়, তাই না?"

অসীম অপ্রস্তুত। সে নীরব থাকে।

কিন্তু এত সহজে ছেড়ে দেবার পাত্রী নন এঁরা। আরেকজন রাশভারী প্রৌঢ়া কর্কশ স্বরে অশোককে প্রশ্ন করে, "কথাটা কইতে তোমার লজ্জা লাগল না? এত কষ্ট কইবা যাত্রায় আইলাম আর তুমি কইতে আছো বাবারে দর্শন করতে পারমু না!"

কথাটা অশোক মোটেই সেভাবে বলে নি। সে তাঁদের ভালর জন্যই বলেছে। তাঁদের অমরনাথ যাত্রা বিফল করার কোন মতলব নেই তার।

তবু সে বৃদ্ধা কথার কোন জবাব দেয় না। নিঃশব্দে নতমস্তকে এগিয়ে চলে। অনেক সময় জয়ের চেয়ে পরাজয় বেশি বরণীয় হয়ে পড়ে। অশোক বুঝতে পেরেছে, ব্যাপারটা যে পর্যায়ে এসেছে, তাতে এখন এখান থেকে পালিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। আমরাও নিঃশব্দে তাকে অনুসরণ করি।

তাঁবুর কলোনী ছাড়িয়ে নেমে চলি লিডারের দিকে। ঝোপঝাড়ে বোঝাই একফালি ভূখণ্ড। এখানে-ওখানে বড় বড় পাথর পড়ে আছে। তারই ভেতরে দিয়ে পথ চলে আমরা নীলগঙ্গার তীরে এলাম। এপারে প্রায় সমতল উপত্যকা আর ওপারে খাড়া পাহাড়। সেই পাহাড়ের গা দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ। যে-পথ দিয়ে যুগাতীত কাল ধরে লক্ষ লক্ষ যাত্রী এসেছেন—গিয়েছেন অমরনাথ। আমিও তাঁদের মতো ঐ পথ দিয়ে এখানে এসেছি আবার তাঁদের মতোই ঐপথে ফিরে যাব ঘরে।

না, ঘরের কথা এখন নয়। গৌতম অসুস্থ, তবু আমি ঘরের কথা ভাবব না। আমি যে পথিক, ঘরের সব দায়িত্ব অমরনাথজীর ওপর সঁপে দিয়ে আমি অমরতীর্থে চলেছি। পথই পথিকের পরম আশ্রয়, যাত্রাই যাত্রীর শ্রেষ্ঠ সাধনা।

অতএব ওপারের কথা নয়, এপারের ভাবনা ভাবা যাক্। পাথরে পাথরে প্রতিহত হয়ে নাচতে নাচতে গাইতে গাইতে অবিরত বয়ে চলেছে ফেনিল নীলগঙ্গা। আমরা

কিছুক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার নাচ দেখি, গান শুনি। তারপরে এক সময় সারি বেঁধে বসে পড়ি নির্জন সৈকতে।

আর তখুনি দেখতে পাই ওকে—জনৈকা আমেরিকান যুবতী। একটা 'সস্‌প্যান' নিয়ে সে একাকিনী বসে আছে জলের ধারে। সস্‌প্যানটি জলে বসিয়ে তার ওপর একখানি পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে।

"কিছু করছে মেয়েটি?" জিজ্ঞেস করেন সরকারদা।

"বোধহয় বাসন ধুচ্ছে।"

"না না, বাসন ধুলে সস্‌প্যানের ওপর পাথর চাপিয়েছে কেন?" ভাগনে পালটা প্রশ্ন করে।

ব্রহ্মচারী বলে, "তাছাড়া উনি তো বসে আছেন চুপচাপ।"

"বোধহয় জপ করছে।" সঙ্গে সঙ্গে অসীম আবিষ্কার করে।

আমরা সবাই হেসে উঠি। ব্রহ্মচারী গম্ভীর।

হাসি থামার আগেই অসীম উঠে দাঁড়ায়। ভাগনেকে বলে, "চলো, আলাপ করে আসি মেয়েটির সঙ্গে।"

"চলুন।" ভাগনে অসীমকে অনুসরণ করে।

ওরা চলে যায়, আমরা বসে থাকি। দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই। অসীম আমেরিকা ফেরৎ। মেয়েদের সঙ্গে বিশেষ করে আমেরিকান মেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমাবার কায়দা-কানুন জানা আছে তার। আমরা চুপচাপ বসে দেখতে থাকি!

মেয়েটির পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে দুজনে। অসীম কি যেন বলছে মেয়েটিকে। ভাগনেও হাত নেড়ে দেখিয়ে দিচ্ছে সস্‌প্যানটা। মেয়েটি মুচকি হাসছে, কথা বলছে। কিছুই শোনা যাচ্ছে না এখান থেকে। যাবে কেমন করে? নীলগঙ্গার বিরামহীন কলগানে যে সবার সব কথা যাচ্ছে হারিয়ে।

মেয়েটি বোধহয় বসতে বলছে ওদের। ওরা দুজনে মেয়েটির দুপাশে বসে পড়ল।

"বেশ যাহোক, আমাদের না নিয়েই চলে গেলেন।"

চমকে পেছনে তাকাই। তুলতুল, গৌরী ও বৌমা, মানে অজিতের স্ত্রী। খুঁজে খুঁজে চলে এসেছেন এখানে। কথাটা জিজ্ঞেস করেছে তুলতুল। প্রাণ বাঁচাতে অজিত তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "না, মানে এখানে আসব বলে তো আসি নি..."

"এই এসে পড়েছ আর কি।" বৌমা অজিতের মুখের কথা কেড়ে নেয়।

অজিত শব্দহীন।

তুলতুল ও গৌরী মুচকি হাসছে।

সরকারদা বলেন, "দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বসো।"

"বসব বলেই তো এলাম।" গৌরী বলে। ওরা তিনজন বসে পড়ে।

বেচারি অজিত। সে এখনও উদাস নয়নে নীলগঙ্গার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

বোধকরি অজিতের মান রাখতেই বাসুদেব বলে, "আমরা ইচ্ছে করেই আপনাদের নিয়ে আসি নি।"

"কারণ?" বৌমা গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করে।

"সন্ধের সময় মেয়েদের আসতে নেই এখানে।"

"চন্দনবাড়ির বাঘ বুঝি খেতে এসে রুদ্রপ্রয়াগের সেই লেপার্ডটার মতো শুধু মেয়েদের ধরে নিয়ে যায়?" গৌরী বাসুদেবকে প্রশ্ন করে।

"না, মানে..." বাসুদেব বিচলিত।

তুলতুল যোগ করে, "তাছাড়া চন্দনবাড়ির বাঘ বুঝি মেমসাহেবদের গায়ে হাত দেয় না?"

বাসুদেব নির্বাক। কি বলবে, সে বোধহয় বুঝতে পারছে না।

তবে তার কপাল ভাল। অসীমরা উঠে দাঁড়িয়েছে। তারা এদিকে আসছে।

ওরা ফিরে আসে। অসীম বলে, "মেয়েটি রান্না করছে।"

'রান্না!' আমরা বিস্মিত। "এই তুষারশীতল জলে রান্না করছে কি? রান্না তো হয় উষ্ণকুণ্ডে, মণিকরণ ও যমুনোত্রী প্রভৃতি তীর্থে।"

"গরম নয়, ঠাণ্ডা রান্না।" ভাগনে কথা বলে এবারে।

"কি রকম?"

অসীম উত্তর দেয়, "মেয়েটি ঐ সস্‌প্যানে পুডিং তৈরি করে নিয়ে এসেছে। সস্‌প্যানটি হিমশীতল জলে রেখে দিয়েছে, যাতে তাড়াতাড়ি জমে যায়।"

"তার মানে উনি লিডারকে 'ফ্রিজ' বানিয়েছেন?" তুলতুল জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ, ইচ্ছে করলে তুমিও বানাতে পারো।" অসীম সহাস্যে বলে।

"কেমন করে?" তুলতুল বুঝতে পারে না।

"কিছুক্ষণ এই জলে দাঁড়িয়ে থাকো, দেখবে তুমিও জমে গিয়েছ।"

আবার হাস্যরোল।

গোধূলি ঘনিয়ে আসছে। আঁধারের পরশ লেগেছে চন্দনবাড়ির মেঘমুক্ত নীল আকাশে, যেখানে কিছুক্ষণ পরেই চাঁদের জয়যাত্রা হবে শুরু। তারপবে সারারাত ধরে চাঁদের আলোয় হাসতে থাকবে নীলগঙ্গা।

গতকালও এমনি সময় আমরা পহেলগাঁওয়ে নীলগঙ্গার বেলাভূমিতে বসেছিলাম, বসে বসে ভাবছিলাম আজকের কথা। আগামীকালও এসময় বসে থাকব নীলগঙ্গার উৎসে--শেষনাগে। আর পরশু?

পরশু এসময় আমরা থাকব পঞ্চতরণীতে। তার পরদিন?

তার পরদিনই পৌঁছব অমরতীর্থে, দর্শন করব পরমারাধ্য অমরনাথকে। তাঁর কাছে সবার সঙ্গে গৌতমের কুশল কামনা করব। শুরু হবে ফেরার পালা। একইভাবে এই নীলগঙ্গার পাশে পাশে পথ চলে ফিরে আসব এখানে, এখান থেকে পহেলগাঁও। পূর্ণ হবে অমরতীর্থ অমরনাথের পদপরিক্রমা।

কিন্তু তখনও অমৃতময়ী নীলগঙ্গা রইবে আমার সঙ্গে। পহেলগাঁওয়ে সেদিন সন্ধ্যায় আমি আবার এমনি তার পাশে গিয়ে বসব। তাকে বলব—এবারের মতো তুমি বিদায় দাও আমাকে। আমি আবার আসব ফিরে, ফিরে আসব তোমার কাছে।

নয়

শেষরাতেই শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। শেষনাগ রওনা হবার আয়োজন। তাই হয়। হিমালয়ের পথে সকালে শুরু করতে হয় পদযাত্রা। উচ্চ-হিমালয়ে সাধারণত দুপুরের পরেই আবহাওয়া খারাপ হয়ে যায়, ছুটে আসে মেঘ আর বাতাস, আরম্ভ হয় ঝড়-বৃষ্টি। গতকাল রওনা হতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, বিকেলে বৃষ্টির কবলে পড়েছিলাম।

অতএব অন্ধকার থাকতেই আজ আমাদের শিবিরে কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে—শুরু হয়েছে প্রস্তুতি। কাজ তো কম নয়—প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন, জিনিসপত্র গোছানো, খাওয়া ও পোশাক পরা। এই শেষের কাজটা করতেই তো আধঘণ্টা লেগে যাবে। গেঞ্জি, ভেস্ট, শার্ট, দুটো সোয়েটার, মাফ্‌লার, বালাক্লাভা, ড্রয়ার প্যান্ট, দু জোড়া মোজা ও হান্টার-শু। এখানে আধ-ঘণ্টায় হয়ে যাবে। ওপরে আরও বেশি লাগবে। কারণ শীত বাড়বে, অক্সিজেন কমবে—অল্পতেই হাঁপিয়ে উঠব।

ব্রেক্-ফাস্ট করে বিদায় নিলাম সবার কাছ থেকে। ফকিরবাবু বলেন, "আপনারা এগোন, আমি ঘোড়ায় আসছি। পথে দেখা হবে।"

"আজ আমাদের প্ল্যান হল পথে অন্তত দশজন অশ্বারোহীকে পদাতিকে পরিণত করব।" গম্ভীর স্বরে তুলতুল বলে।

সবাই হেসে উঠি ওর কথা শুনে। হাসতে হাসতেই ফকিরবাবু বলেন, "দশজনের একজন তো পেয়ে গেলে?"

"একজন নয়, দুজন।" মাঝখান থেকে মিসেস মণ্ডল বলে ওঠেন। তিনি তুলতুলকে বলেন, "আমিও তোমাদের পথে ধরে নেবো। তারপরে হেঁটে যাব তোমাদের সঙ্গে। তার মানে তুমি দুজন পেয়ে গেলে।"

"না", তুলতুল জবাব দেয়। "আপনারা হেঁটে যাবেন, খুব ভাল কথা। কিন্তু আপনারা এর আগে অনেকবার অমরনাথ গিয়েছেন। যাঁরা কোনদিন যাননি, এমন দশজন যাত্রীকে ঘোড়া থেকে নামাব আজ।"

"বাবা অমরনাথ তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।" সহাস্যে মিসেস মণ্ডল হাত জোড় করেন।

আমরা ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে চলি।

সহযাত্রীরা কেউ কেউ রওনা হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশই এখনও তৈরি হয়ে উঠতে পারেননি। যাঁরা ঘোড়ায় যাবেন, তাঁদের এত সকালে রওনা হবার দরকার নেই। এখনও যে আটটা বাজেনি, মিনিট পাঁচেক বাকি আছে। আমরা পদাতিক বলেই বেরিয়ে পড়েছি পথে।

কাল বিকেলের সেই বৃদ্ধাকে আজ ঘোড়া ঠিক করে দিয়েছেন ফকিরবাবু। সবার মতো আমাদেরও ধারণা ছিল, পহেলগাঁও থেকে ঘোড়া না নিলে পথে আর ঘোড়া পাওয়া যাবে না। কিন্তু এখানে দেখছি অনেক ঘোড়া রয়েছে, ভাড়াও কিছু কম। একজন দোকানী বলেছেন—শেষনাগে তো বটেই, প্রয়োজনে পঞ্চতরণীতেও ঘোড়া পাওয়া যাবে।

তাঁবুর উপনিবেশ পেরিয়ে এলাম। লিডারের তীরে তীরে চড়াই পথ। বনময় পথ। ওপারে লিডারের কোল ঘেঁষে খাড়া সবুজ পাহাড়, এপারে পাহাড়টি আস্তে আস্তে ঢালু হয়ে পথে এসে মিশেছে। শান্ত-সুন্দর অপরূপ পথ। নদীর কলগান শুনতে শুনতে পাহাড়ের গা দিয়ে সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছি। পাহাড়ী পায়ে-চলা পথের তুলনায় পথ বেশ চওড়া। অন্তত জনচারেক মানুষ পাশাপাশি হাঁটতে পারে। কিন্তু পাশাপাশি পথ-চলার উপায় নেই। চলতে চাইলেই কানে আসছে 'হৌশ'। অর্থাৎ পেছনে কোন-না-কোন অশ্বারোহী এসে গিয়েছেন। তাঁর ঘোড়াওয়ালা আমাকে সাবধান করছে, পথ ছেড়ে দিতে বলছে।

আমাদের সামনে ও পেছনে সারি সারি ঘোড়া, হেলে দুলে পথ চলেছে। ঘোড়সওয়ারদের অবস্থা কিন্তু মোটেই সুবিধের নয়। একে তো চড়াই পথ বলে সর্বদা সামনের দিকে ঝুঁকে থাকতে হচ্ছে, নইলে ঘোড়ার পিঠ থেকে পেছনে গড়িয়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা। তারপরে আবার ঘোড়াগুলো কেবলই খাদের পাশ দিয়ে পথ চলতে চায়। নিচের দিকে তাকালেই যে মাথা ঘুরে যায়।

এঁরা কেউ অভিজ্ঞ অশ্বারোহী নন। অনেকেই জীবনে এই প্রথম ঘোড়ায় উঠেছেন। ফলে তাঁরা ভয়ে কাঠ হয়ে আছেন, ভরসা করে কোনদিকে তাকাতে পারছেন না চোখ মেলে। মনে ভয় থাকলে কি সুন্দরকে দেখতে পাওয়া যায়?

আমাদের কিন্তু এসব ঝামেলা নেই। চারদিক দেখতে দেখতে পথ চলেছি। পথের পাশে পাহাড়ের গায়ে সবুজের সমারোহ—দেবদারু, চীর, শিশম, রুদ্রাক্ষ, ভুজ ও আখরোটের বন আর নিচে নীলগঙ্গা। সাদা বেলাভূমির ওপরে আঁকাবাঁকা নীলধারা—শ্বেতপাথরের বুকে রঙিন আলপনা।

এরই কোনখানে সেই রমণীয় তীর্থস্থানেশ্বর—যেখানে হরপার্বতী মধুযামিনী যাপন করেছিলেন, পার্বতী তাঁর চুম্বনসিক্ত নীল-কাজল ধুয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু আমাদের সেখানে অবসর যাপনের অবকাশ নেই। অতএব এগিয়ে চলি।

"আমরাও আপনাদের সঙ্গে হেঁটে যাব।"

তাড়াতাড়ি পেছনে তাকাই। সহযাত্রী জ্যোতির্ময় লাহা। তার সঙ্গে মিঃ চ্যাটার্জীর ছেলে এবং আরেকটি যুবক। তারা ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে। সুপুরুষ যুবা জ্যোতির্ময়। লাগাম ঘোড়াওয়ালাদের হাতে দিয়ে এগিয়ে আসে আমাদের কাছে।

হিমালয়ের বহু জায়গায় সহিসরা নিজেদের 'ড্রাইভার' বলে পরিচয় দেয়। আর তাই বোধহয় ড্রাইভাররা নিজেদের 'পায়লট' বলতে শুরু করেছেন।

জ্যোতির্ময় আবার বলে, "আমরাও হেঁটে যাব।"

"বেশ তো, চলো আমাদের সঙ্গে।" পাকা পর্বতারোহীর মতো সরকারদা বলেন।

জ্যোতির্ময় আরও লজ্জা পায়। তার বয়স তিনের ঘরে আর সরকারদার ষাট পেরিয়ে গিয়েছে। সে সবিনয়ে স্বীকার করে, "আপনাকে আর তুলতুলকে দেখেই নেমে পড়লাম। আপনারা হেঁটে যাচ্ছেন, আর আমরা কিনা ঘোড়ায় উঠে বসেছি।"

"সরকারদার কথা বলুন, কিন্তু kindly example হিসেবে আমার নামটি put up করবেন না লাহাদা!" তুলতুল প্রতিবাদ করে, "যতই Scouting করে থাকুন, হিমালয়ের পথে আমার সঙ্গে হেঁটে পারতে হবে না।"

জ্যোতির্ময় এককালে খুবই 'স্কাউটিং' করেছে। তাছাড়া সে সুপুরুষ ও স্বাস্থ্যবান যুবা। সুতরাং তুলতুলের কথা শুনে সে মৃদু হাসে। তারপরে কৃত্রিম বিনয়ের সঙ্গে বলে, "তা তো বটেই। দু-দিন ধরে তুমি শঙ্কুদার ট্রেনিঙে রয়েছ, তুমি তো এখন একজন Full-fleged Lady-mountaineer, তোমার সঙ্গে আমি হেঁটে পারব কেমন করে। তবে একটা কথা ভুলে যেয়ো না, শঙ্কুদারও ভাল নাম জ্যোতির্ময়।"

সমবেত হাস্যরোল।

হাসি থামার পরেই দেখতে পাই ওঁকে। একজন প্রৌঢ় পথচারী। তাঁর একখানি পা নেই। পিঠে একটা পুটুলি নিয়ে ক্রাচ্-এ ভর দিয়ে একপায়ে পথ চলেছেন। আমাদের হাসি শুনে থমকে দাঁড়িয়েছেন।

হাসি থামলেই একহাত কপালে ঠেকিয়ে বলে উঠলে, "জয় বাবা অমরনাথ!"

"জয় অমরনাথ!" আমরা সাড়া দিই।"

ভদ্রলোক আবার চলা শুরু করলেন। আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন।

আমরাও পথ-চলা আরম্ভ করি।

জ্যোতির্ময় বলে, "সত্যি আমরা কত অক্ষম! একখানি পা নিয়েও এই বয়সে ভদ্রলোক যাত্রায় চলেছেন, 'আর আমরা ঘোড়ায় চড়ে বসেছি?'

কথাটা ঠিক বলেছে জ্যোতির্ময়। এদের একাগ্রতা, এদের নিষ্ঠা, এদের ভক্তি সত্যই অতুলনীয়। কিন্তু এ উপলব্ধি কেবল হিমালয়ের পথেই সম্ভব। সমতলের কোন মন্দির মসজিদ কিংবা গীর্জার সামনে দাঁড়িয়ে কোন খঞ্জ ভক্তকে দেখলে এ উপলব্ধি হত না আমাদের।

সেই কথাই বলতে যাচ্ছিলাম জ্যোতির্ময়কে। কিন্তু পারি না। তার আগেই তুলতুল বলে ওঠে, "দেখুন দেখুন, একজন অন্ধ আসছেন। উনি বোধহয় অমরনাথজীকে দর্শন করে এলেন।"

তাড়াতাড়ি সামনে তাকাই। হ্যাঁ, আমাদের অষ্টাদশী সহযাত্রী ঠিকই দেখেছে. জনৈক অন্ধ-বৃদ্ধ একজন বৃদ্ধার হাত ধরে ধীরে ধীরে নেমে আসছেন।

আস্তে আস্তে সামনে এলেন তাঁরা। শ্রান্ত অন্ধ আমাদের উপস্থিতি টের পান। একখানি হাত উঁচু করে বলে ওঠেন, "জয় বাবা অমরনাথ!"

"জয়!" আমরা সমস্বরে জয়ধ্বনি দিই।

তারপরেই ভাবি—কার জয়ধ্বনি করলাম? ভগবানের না ভক্তের? যে ভক্ত দৃষ্টিহীন হয়েও দুর্গম পথ পেরিয়ে ভগবানের কাছে গিয়েছেন। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর ইষ্টদেবতার দর্শন পেয়েছেন। দিব্যচোখে দেখেছেন তাঁর মনের মানুষকে, প্রাণের ঠাকুরকে—পরমারাধ্যকে।

আমরা একটা পাহাড়ের পাদদেশে এসে পৌঁছেছি। পথটা পাহাড়ের গায়ে গিয়ে মিশেছে। তারপরে পাহাড়টার গা বেয়ে এঁকে বেঁকে ওপরে উঠে গিয়েছে। ওপরের পথটা অনেকটা ইংরেজী 'Z' অক্ষরের মতো। তাহলে এই কি সেই পিসুর চড়াই?

"জী।" গৌরীর ঘোড়াওয়ালা উত্তর দেয়।

আবার পথের দিকে তাকাই। হ্যাঁ, পথটা চড়াই তো বটেই। কিন্তু চড়াইটাকে তেমন ভয়ঙ্কর কিংবা কষ্টকর মনে হচ্ছে না তো! হিমালয়ের প্রায় প্রত্যেক তীর্থে এমন

পথ আছে। জানকীবাঈ থেকে যমুনোত্রী, অথবা ধনছো থেকে মণিমহেশের পথ এর চেয়ে কম কষ্টকর কিংবা বিপজ্জনক নয়। বরং এ পথটি প্রশস্ততর।

এখান থেকে দেখাচ্ছেও ভারি সুন্দর। পাহাড়ের গা দিয়ে পথটি ধাপে ধাপে উঠে গিয়েছে। প্রতি ধাপে সারি সারি মানুষ। নানা রঙের পোশাক তাঁদের গায়ে। তাঁরা রঙে রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে সারা পথ। রঙের জোয়ার জেগেছে পথের ধাপে ধাপে। পথটি রূপান্তরিত হয়েছে একখানি রঙিন মালায়।

আর পাহাড়? সে তো ধ্যানমগ্ন ধূর্জটি। ভক্তের মালা গলায় পরে ভগবান রয়েছেন দাঁড়িয়ে। আমাদেরও কাছে ডাকছেন।

অবশেষে আমরাও সেই মালার সঙ্গে মিশে যাই। বহুজনের কাছ থেকে বহুভাবে শোনা পিসুর চড়াই বেয়ে ধীরে ধীরে উঠতে থাকি ওপরে। মনে পড়ছে স্বামীজীর অমরনাথ দর্শনের কাহিনী।

নিবেদিতা ও তাঁর সঙ্গীরা স্বামীজীর সঙ্গে এখানে পৌঁছবার ঠিক আগে খানিকটা তুষারাবৃত পথ পেয়েছিলেন। তার আগে নিবেদিতা আর কখনও তেমন কষ্টকর পথ অতিক্রম করেন নি। তাই স্বামীজী তাঁকে বলে বসলেন—তোমাকে খালি পায়ে এই পথটুকু পেরোতে হবে।

বলা বাহুল্য শিষ্যা গুরুর আদেশ পালন করেছিলেন।

কি কঠিন পরীক্ষা? কি বিস্ময়কর গুরুভক্তি।

নিবেদিতা পিসুর চড়াই সম্পর্কে লিখেছেন—'A tremendous climb of some thousands of feet...'

আমরা কিন্তু তার কিছুই বুঝতে পারছি না। প্রায় অক্লেশে ওপরে উঠছি। অবশ্য আমাদের অদৃষ্ট ভাল। গতকাল বিকেলের পর আর বৃষ্টি হয়নি। বৃষ্টি হলে এমন অনায়াসে পথ-চলা হয়ে উঠত না।

কিন্তু আমাদের কথা থাক। অভেদানন্দজীর কথা ভাবা যাক্। তাঁকেও এ চড়াই পেরোতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। তিনি বলেছেন, 'পিশু নামক একটি ১৫০০ ফিট উচ্চ পর্বত চড়াই করিতে সকলকেই যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল। "পিশু" শব্দে একপ্রকার উকুন বুঝায়, তাহা হইতে, অথবা 'পিসর' শব্দ হইতে এই পর্বতের এইপ্রকার নামকরণ হইয়াছে। "পিসর' কাশ্মীরী শব্দ, ইহার অর্থ পিচ্ছিল। ...ঘোড়া বা ঝাম্পান চড়িয়া কেহ এই পর্বতে আরোহণ করিতে সক্ষম নহে, কারণ পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল ও উর্ধ্বমুখী। সকলকেই পদব্রজে যাইতে হইল।'

প্রবোধদাও পিসুর দুর্নাম করেছেন। কি করবেন, তখন যে পিসু সত্যই ভয়ঙ্কর ছিল। প্রবোধদা লিখেছেন, 'আমার জীবনে এমন সঙ্কটসঙ্কুল চড়াই খুব কমই অতিক্রম করেছি। পথ অতিশয় পিছল, দুঃসাধ্য ও দুরতিক্রম্য। অবকাশ নেই, নড়বার জায়গা নেই, বড় বড় পাথর সমস্ত পথে ছড়ানো। মালপত্র ফেলে দিচ্ছে ঘোড়ারা। মহিলারা পড়ে যাচ্ছে ঘোড়ার পিঠ থেকে।'

আজ কিন্তু অশ্বারোহীরা প্রায় সকলেই ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন। তবে তাঁরা অনেকেই ভয়ে চারিদিকে তাকাতে পারছেন না। দেখতে পাচ্ছেন না কিছুই।

আমরা দেখছি। পথের ধারে রঙিন বনফুলের মেলা। অজস্র ফুল ফুটে আছে

পাহাড়ের গায়ে, খাদের ধারে আর পথের পাশে পাশে।

প্রবোধদাও ফুলের কথা বলেছেন। সেই সঙ্গে তিনি একটি মজার ঘটনা উল্লেখ করেছেন—পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু নাকি পিসুর কাছে পরাজিত হয়েছেন। প্রবোধদার ১৩/১৪ বছর আগে তার মানে ১৯৪০/৩৯ সালে শেখ মহম্মদ আবদুল্লা পণ্ডিতজী ও সীমান্তগান্ধীকে শেষনাগের স্বর্গীয় সৌন্দর্য দর্শন করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। পণ্ডিতজী পিসু পার হতে পারেন নি।

আগেই বলেছি, ইতিমধ্যে নীলগঙ্গা দিয়ে বহু জল বয়ে গিয়েছে। দুর্গম চড়াই সুগম হয়েছে। পণ্ডিতজী পারেননি কিন্তু আমরা আজ শেষনাগের স্বর্গীয় সৌন্দর্য দর্শন করতে পারব।

তুলতুল কিন্তু ভুলে যায়নি। তাই চলতে চলতে হঠাৎ বলে ওঠে, "গৌরীদি! টের পাচ্ছেন তো?"

"কি?" গৌরীর মনে নেই কথাটা। সে থমকে দাঁড়ায়।

তুলতুল মনে করিয়ে দেয়, "কেন কাল যে অসীমদা বললেন, আমরা আজ টের পাব কেমন পথ?'

কথাটা মনে পড়ে গৌরীর। কিন্তু সে কোন মন্তব্য করে না। মৃদু হেসে আবার পথ চলা শুরু করে।

এতক্ষণে কথা বলে অসীম, "এখনও তার সময় হয় নি, আরও কিছুক্ষণ বাদে টের পাবে। তাই বলছিলাম, ঘোড়াওয়ালাদের একটু সঙ্গে সঙ্গে থাকতে বলো।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন অসীমদা, ঘোড়ায় আমরা আর উঠছি নে। তার চেয়ে বরং একটা কাজ করা যাক।"

"কি?'

"আসুন 'ওয়াকিং রেস্' দেওয়া যাক।"

তুলতুলের প্রস্তাব শুনে সবাই হেসে উঠি।

হাসি থামলে আমি বলি, "তার আর দরকার নেই তুলতুল!"

"কেন?"

"এমনিতেই অসীম তোমার কাছে হেরে গিয়েছে। কারণ কি জানো?"

"কি?"

"তুমি যে একজন 'বর্‌ন মাউন্টেনীয়ার' কথাটি জানা ছিল না ওর।"

আবার হাস্যরোল।

হাসি থামলে তুলতুল বলে, "না, কষ্ট যে হচ্ছে না, তা বলছি না। তবে পিসু পার হতে যে কষ্টের কথা এতকাল শুনে এসেছি, তার তুলনায় এ কষ্ট কিছু নয়।"

"হ্যাঁ, তোমাদের কষ্ট লাঘবের জন্য কঠিন চড়াইকে যতটা সম্ভব সহজ করে তোলা হয়েছে। তার চেয়েও বড় কথা গতকাল বিকেলের পরে আর বৃষ্টি হয় নি।"

"হবে।" হঠাৎ অসীম বলে ওঠে।

"হবে না।" তুলতুল প্রতিবাদ করে। একটু থেমে আমাকে সাক্ষী মানে, "বলুন তো, বৃষ্টি হবে কিনা?"

আকাশের দিকে তাকাই। না, কোথাও বাদল-মেঘের চিহ্ন নেই। হিমালয়ের

আকাশকে অবশ্য বিশ্বাস নেই। যে-কোন মুহূর্তে জলভরা মেঘ ছুটে আসতে পারে। তবু তুলতুলকেই সমর্থন করতে হয়। অসীম যে ভয় দেখাচ্ছে ওকে। বলি, "বামুনের মেয়ের কথা কি মিথ্যে হতে পারে? বৃষ্টি হবে না।"

তুলতুল তালি বাজায়।

গম্ভীর স্বরে অসীম বলে, "ঘোষদা বোধহয় ভুলে গিয়েছেন, আমিও বামুনেব ছেলে?"

সহাস্যে বলি, "না। সেই সঙ্গে এটাও মনে হয়েছে তুমি বামুনের বাবা, সুতরাং মেয়ের কথাই সত্য হবে।"

হাসি-ঠাট্টায় পথশ্রম আরও কমে যাচ্ছে। আমরা অক্লেশে চড়াই ভাঙছি—কুখ্যাত পিসুর চডাই। সেই সঙ্গে করুণাময়ী প্রকৃতির কাছে মনে মনে বার বার আবেদন রাখছি, তুমি অকরুণ হয়ো না। কারণ পথ যতই ভাল করা হয়ে থাক, জল পড়লেই দুর্গম হয়ে উঠবে। এ অঞ্চলের পাহাড়ে যে পাথরের চেয়ে মাটির ভাগ বেশি।

বলা বাহুল্য চলার বেগ ক্রমেই কমছে। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে হচ্ছে।

সবাই সমান হাঁটতেও পারছে না। চলা থামলেই চন্দনবাড়ির দিকে তাকাচ্ছি। সেখানকার ঘন-সবুজ পাহাড়, ফিকে-সবুজ সমতল আর সাদা লিডারকে স্বপ্নের দেশ বলে মনে হচ্ছে এখান থেকে। তাহলেও দুঃখবোধ করছি না। আমার যে স্বপ্নের দেশ থেকে স্বপ্নতর দেশে চলেছি।

'Believe or not, you are more than 2 miles
above the M.S.L. (Mean Sea Level)

সাইনবোর্ডটার দিকে নজর পড়তেই উল্লসিত হয়ে উঠি। যথাসাধ্য জোরে জোবে পা ফেলে উঠে আসি ওপরে—চড়াই থেকে সমতলে, পাতাল থেকে স্বর্গে।

হাতের লাঠি আর পিঠের বোঝা ফেলে দিয়ে তাড়াতাড়ি বসে পড়ি মাটিতে। না, মাটি নয় গালিচা। মখমলের মতো নরম সবুজ ঘাসে ছাওয়া প্রায় সমতল প্রান্তর। চড়াই পথটা এসে শেষ হল এখানে। আরও দুটি সাইনবোর্ড রয়েছে আমাদের সামনে। একটিতে লেখা—

'Pissu Top, Ht. 11,200 ft.'

১০,৫৬০ ফুটে ২ মাইল। অতএব আমরা সমুদ্র-সমতা থেকে দু-মাইলেরও বেশি ওপরে উঠে এসেছি, কলকাতা থেকেও প্রায় তাই। ভাবলেও অবাক হতে হয়।

আরেকটি সাইনবোর্ডে এখান থেকে দূরত্ব লেখা রয়েছে—

'Srinagar	—	71 miles
Pahalgam	—	12 "
Seshnag	—	6 "
Holy cave	—	18 "

এখন বেলা দশটা। তার মানে চন্দনবাড়ি থেকে দু'ঘণ্টায় মাত্র দু'মাইল পথ এসেছি। আজ আরও ছ'মাইল হাঁটতে হবে। কিন্তু পথের যত উন্নতিই হয়ে থাক, গত দু-ঘণ্টায় আমরা পথের সবচেয়ে দুর্গম অংশটুকু পেরিয়ে এসেছি। দু-মাইলে দু-হাজার দু-শ' ফুট চড়াই ভেঙেছি। এবং শেষদিকে সবারই কিছু কষ্ট হয়েছে।

সব যাত্রীরাই তাই বসে পড়েন এখানে। তারপরে গরম চায়ের গ্লাসে ঠোঁট ঠেকিয়ে অসীমা প্রকৃতির সীমাহীন সৌন্দর্যসুধা পান করেন। আমরাও তাই করছি। এখানে তিনটি যাত্রীনিবাস আছে। আর আছে গুটিকয়েক চায়ের দোকান। তারই একটি থেকে মামা-ভাগনে চা নিয়ে এসেছে। চায়ের গ্লাসে ঠোঁট ঠেকিয়ে আমরাও চেয়ে চেয়ে চারিদিক দেখছি।

সবুজ সমতলপ্রায় প্রান্তরটি সামনের দিকে দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত। তীর্থ-পথটি তারই বুকের ওপর পড়ে আছে। এই পথ ধরে সারা প্রান্তরটি পেরোতে হবে আমাদের। তারপরে অর্থাৎ এক মাইল প্রায়-সমতল পথ পেরিয়ে পৌঁছব যোজিপাল। দূরত্ব এখান থেকে ৩ মাইল। উচ্চতা একই—১১,৫০০ ফুট।

কিন্তু পথের কথা পরে হবে, আগে প্রান্তরটিকে দেখে নিই। প্রান্তরটি দু-পাশের পাহাড়ে গিয়ে মিশেছে। ডানদিকের পাহাড়ের কোল দিয়ে বয়ে চলেছে নীলগঙ্গা। তারই তীরে তীরে পথ। আমরা যে তারই উৎসে চলেছি।

দুপাশের পাহাড়গুলো খুব উঁচু নয়, হয়তো হাজার-দু'হাজার ফুট উঁচু হবে এখান থেকে। গাছপালাহীন ন্যাড়া পাহাড়। প্রান্তরেও কোন বড় গাছ দেখছি না। আমরা যে ইতিমধ্যে গাছের সীমারেখার ওপরে উঠে এসেছি।

বড়গাছ দেখতে পাচ্ছি নিচে—পিসুর পাশে পাশে। কিন্তু আমরা যে পিসু পেরিয়ে এসেছি। পিসু পড়ে রয়েছে পেছনে। আমরা পথিক—হিমালয়ের পথিক। পথিককে পেছনে তাকাতে নেই।

প্রান্তরে বড় গাছ নেই কিন্তু ছোট ফুল আছে, এখানে-ওখানে ফুটে আছে নানা রকমের ফুল। বিচিত্র তাদের গড়ন, বিস্ময়কর তাদের রং। তারা বাতাসে দুলছে। দু-চোখ ভরে দেখছি। এমন পুষ্পিত সবুজ ও সুদীর্ঘ সমতল হিমালয়ের অন্তরলোকে বড় বেশি একটা দেখা যায় না। আমরা দেখি, শুধু দেখি।

দেখার শেষ নেই, কিন্তু বিশ্রামের শেষ আছে। সুতরাং অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়াতে হল। যাঁরা ঘোড়া কিংবা ডাণ্ডিতে চলেছেন, তাঁরাও বিশ্রাম করেছেন এখানে। তুলতুলের মা-বাবা, ডাক্তারের মা ও পরিতোষবাবুর স্ত্রী অপেক্ষা করেছিলেন আমাদের জন্য। দেখা হয়েছে, অজিতদের সঙ্গে, অপর্ণা ও বাসুদেবের সঙ্গে। দেখা হয়েছে ফকিরবাবু ও মিসেস মণ্ডলের সঙ্গে এবং আরও অনেক সহযাত্রীর সঙ্গে। তাঁরা সবাই রওনা হয়ে গিয়েছেন। এখনও ছ'মাইল পাহাড়ী পথ পাড়ি দিতে হবে। যোজিপাল ছাড়িয়ে পৌঁছতে হবে পাতালগ্রাড। তারপরে ব্রজলকোট, জাজিপারাও এবং কুট্রিঘাটি পেরিয়ে শেষনাগ। বেলা সাড়ে দশটা বাজে। অতএব আর বিশ্রাম নয়।

আবার শুরু হল পথচলা। এবারে আর সারি বেঁধে সামনে-পেছনে চলার দরকার নেই। বেশ প্রশস্ত প্রায়-সমতল পথ। আমরা ছোট-ছোট দলে পাশাপাশি পথ চলেছি। প্রথম দলে মামা-ভাগনে পরিতোষবাবু ও জ্যোতির্ময়রা। শেষ দলে সরকারদা অসীম ও আমি। মাঝের দলে ব্রহ্মচারী অসিত, অশোক, গৌরী ও তুলতুল। ব্রহ্মচারী ও গৌরী কবিতা আবৃত্তি করছে আর অসিত ও অশোক তুলতুলের ইংরেজী গান শুনছে।

ব্রহ্মচারীও কিন্তু ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করছে—ঠিক কবিতা নয় রবীন্দ্রনাথের গানের ইংরেজী অনুবাদ। তার স্বরচিত অনুবাদ।

এই অনুবাদের একটু ইতিহাস আছে। পি. এইচ-ডি. পাবার পরে ব্রহ্মচারী এখন ডি.লিট.-এর জন্য গবেষণা করছে। তার গবেষণার বিষয়বস্তু 'নাদব্রহ্ম'। অর্থাৎ সে গানের চর্চা করছে। আর এদেশে গানের চর্চা করতে হলে রবীন্দ্রসঙ্গীত অপরিহার্য। সে বেশ কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত ইংরেজীতে অনুবাদ করে ফেলেছে। এবং খাতাখানি নিয়ে এসেছে। জপের মালার সঙ্গে খাতাটি তার সব সময়ের সঙ্গী ঝোলাতেই রয়েছে। ব্রহ্মচারীর একান্ত ইচ্ছা তুষারলিঙ্গের সামনে দাঁড়িয়ে সে স্বরচিত কয়েকটি অনুবাদ অমরনাথজীকে শুনিয়ে আসবে। কারণ অমরনাথজী সর্বজ্ঞ, তিনি ইংরেজী জানেন।

ব্রহ্মচারীর যুক্তি অকাট্য। অমরনাথজী ইংরেজদের দেবতা না হলেও তিনি নিশ্চয়ই ইংরেজী জানেন। কিন্তু তিনি তো বাংলাও জানেন। বাংলা জানা কোন দেবতার সামনে রবীন্দ্রনাথের মূল-গান না গেয়ে, সেই গানের ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করার কি মানে থাকতে পারে, আমি এখনও বুঝে উঠতে পারি নি।

আমি না পারলেও ব্রহ্মচারী ইংরেজীতেই অমরনাথজীর গুণগান করবে। আর গৌরীর কাছে সে বোধহয় এখন তারই 'রিহার্সেল' দিয়ে নিচ্ছে। ভালই করছে—গৌরী শুধু ভক্তিমতী নয়, সে এম.এ. পাশ। তার পক্ষে ব্রহ্মচারীব বক্তব্য অনুধাবন করা সহজ হবে।

সোয়া এগারো হাজার ফুট উঁচুতে পদচারণা করছি। কিন্তু পায়ের নিচে নরম মাটি। শুধু এখানে নয়, এটি কাশ্মীর হিমালয়ের বৈশিষ্ট্য। কাশ্মীরে হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে পাথর কম, মাটি বেশি। আর তাই কাশ্মীর এত সবুজ, এমন সুন্দর।

শীতকালে এই সুবিশাল সবুজ প্রান্তর সাদা হয়ে যায়। পাশের পাহাড় থেকে তুষারপ্রবাহ নেমে আসে। তুষারপাতও হয় প্রচুর। তৃণাচ্ছাদিত অধিত্যকা তুষারাবৃত প্রান্তরে পরিণত হয়।

গ্রীষ্মকালে বরফ গলে। মাটি সজল হয়। মরে যাওয়া ঘাস ও ফুল আবার জন্ম নেয়। সাদা প্রান্তর রূপান্তরিত হয় সবুজ সমতলে। ফুল ফোটে, পথযাত্রী পাগল হয়। আমরাও তাই হয়েছি। ব্রহ্মচারীর ইংরেজী কবিতা আর তুলতুলের ইংরেজী গান সেই পাগলামীরই প্রকাশ। আমরা তেমন কথা বলছি না বটে কিন্তু কেবল দেখছি আর দেখছি—দেখছি সবুজ উপত্যকা, আকাশের নীলিমা আর পাশের পাহাড়। বিচিত্রবর্ণের পাহাড়। কোনটি কালো, কোনটি ধূসর, কোনটি বা লালচে। কোন-কোন পাহাড়ের গা থেকে তুষারের শেষচিহ্ন নিশ্চিহ্ন হয় নি এখনও। এখানে-ওখানে তুষার লেগে রয়েছে। কালোর মাঝে আলো হয়ে আছে।

নীলগঙ্গার তীরে তীরে পথ। পথের প্রকৃতি পালটেছে কিন্তু নীলগঙ্গা অপরিবর্তিত। সে আগের মতই উচ্ছ্বসিতা প্রাণধারা। স্বর্গবারি বহন করে মর্ত্যে নিয়ে চলেছে।

আরেকটি প্রান্তরে পৌঁছে গিয়েছি। এ জায়গাটির নামই যোজিপাল বা যাগিপাল। এখানেও 'পিসু টপ্'-এর মতো তিনটি যাত্রীনিবাস রয়েছে। যাত্রীনিবাস বলতে পাথর ও টিন দিয়ে তৈরি একখানি মাঝারী আকারের ঘর। আট-দশটি কম্বল পাশাপাশি পাতা যেতে পারে। একটি মাত্র দরজা, কাজেই ভেতরটা দিনেও অন্ধকার।

পিসু টপ্ কিংবা এখানে সাধারণত যাত্রীরা রাত্রিবাস করেন না। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোন কারণে কেউ যদি বায়ুযান কিংবা চন্দনবাড়ি না পৌঁছতে

পারেন, তখন তাঁরা যাতে বিপদে না পড়েন, তাই কর্তৃপক্ষ এই যাত্রীনিবাসগুলো নির্মাণ করেছেন। ভালই করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁরা যদি এগুলো একটু পরিষ্কার করিয়ে রাখবার ব্যবস্থা করেন, তাহলে বড়ই ভাল হয়। কারণ আমি একাধিক যাত্রীনিবাসে উঁকি মেরে দেখেছি, যাত্রীদের কৃপায় সেগুলো প্রায় ভাগাড়ে পরিণত।

আমরা চন্দনবাড়ি থেকে ৫ মাইল এসেছি। এখান থেকে একটি পায়েচলা পথ সোনাসর হ্রদের দিকে গিয়েছে। দূরত্ব এখান থেকে মাইল তিনেক। মাত্র আটশ' ফুট উঁচু একটি চড়াই পেরোলেই নাকি হ্রদটি দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের সে অবকাশ নেই। অতএব এগিয়ে চলি।

এখন সোনাসর যাওয়া সম্ভব নয় কিন্তু বাবা অমরনাথ কৃপা করলে আগামী বছর জানতে পারব সেখানের কথা। কলকাতার 'রক্স অ্যান্ড স্নোজ' ক্লাব আগামী বছর জুন মাসে ১৪,৫০০ ফুট উঁচু সোনাসর গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করবার জন্য এক পদযাত্রার আয়োজন করছেন। গিরিবর্ত্মটি হ্রদ থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। শম্ভুনাথ দাস সেই দুর্গম পদযাত্রার নেতৃত্ব করবে। শম্ভু অনেককেই নেমন্তন্ন কবে রেখেছে। এখন দেখা যাক, বাবা অমরনাথের কি ইচ্ছা? *

কিন্তু সোনাসরের কথা এখন থাক। সে তো আগামী বছরের ব্যাপার। এখন এ বছরের কথা হোক। আগে অমরনাথ দর্শন করে ফিরি। ঘরে ফিরে গৌতমকে ভাল দেখি। তারপরে আগামী বছরের কথা ভাবা যাবে। এখনও তিন মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে। চলার গতিবেগ বাড়ানো দরকার।

কিন্তু আমি তো একা নই। আমার সহযাত্রীরা যে কেউ কবি, কেউ গায়ক, কেউ উদাস। আবার কেউ-বা সাধুসঙ্গ করছে। তাহলেও তাদের তাড়াতাড়ি পা চালাতে বলি।

তারা আমার অনুরোধ রাখে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলে। কেবল গৌরীর খেয়াল নেই এদিকে। তার সময় কোথায়? সে যে সাধুসঙ্গ করছে।

তারাপীঠ নিবাসী জনৈক অশীতিপর সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার দেখা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। সেই থেকে সে সাধুবাবার কথা শুনতে শুনতে বড্ড ধীরে ধীরে পথ চলছে।

তবু আমি আবার গৌরীর কাছে আসি। বলি, "আরেকটু জোরে না হাঁটলে যে শেষনাগ পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে।"

"হ্যাঁ, চলুন।" সে জোরে জোরে পা ফেলে।

কিন্তু ঐ পর্যন্ত। কয়েক মিনিট বাদে দেখি শুধু গৌরী নয়, সকলেই আবার ঢিমে তালে চলতে শুরু করেছে।

করবেই বা কি? প্রায় প্রতি পদক্ষেপেই যে পথের প্রকৃতি তেমনি পাগল হবার মতো। একটু আগে আমরা নেমে এসেছি তৃণাচ্ছাদিত আরেকটি ছোট অধিত্যকায়। তার

---

* গত ২২শে জুন (১৯৭৮) শম্ভু সোনাসর গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেছে। তার সঙ্গে ছিল বিভাস দাস, গৌর চন্দ্র ও শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়। তারা ওয়ার্ড ওয়ান উপত্যকা ও মারগান গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে কাশ্মীর উপত্যকায় উপনীত হয়েছে। ১৯০২ সালে আর্থার নেভে প্রথম এই গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করেন। তাঁর পরে বোধকরি শম্ভুরাই সোনাসর পার হল। তারাই এ অঞ্চলে প্রথম ভারতীয় অভিযাত্রী। ওরা পহেলগাঁও থেকে রওনা হয়ে দ্বিতীয়দিন সোনাসর হ্রদ (১২,২৪৫´) দর্শন ও তৃতীয়দিন গিরিবর্ত্মটি অতিক্রম করেছে।

মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে এক অনিন্দ্যসুন্দর ঝরনা। ঝরনার তীরে দাঁড়িয়ে চোখ-মুখে জল দিয়েছি। তারপরে পেটভরা জল খেয়েছি। ভারি মিঠে জল।

চারিদিকে চক্‌চকে রোদ। একটু গরম লাগছে। তাও ভাল। বৃষ্টি নামলে বিপদ।

তার চেয়েও বড় বিপদ সন্ধে হলে। কিন্তু এরা যে কিছুতেই গতিবেগ বাড়াচ্ছে না! অগত্যা অসীমের শরণ নিই।

সব শুনে কি যেন একটু ভাবে সে। তারপরে বলে, "ঠিক আছে আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না, যা বলার আমিই বলছি। আপনি শুধু সায় দিয়ে যাবেন।"

আমি মাথা নাড়ি।

হঠাৎ অসীম চেঁচিয়ে ওঠে, "ঘোষদা, দেখুন তো ওটা ঈশান কোণ নয়?"

আমি মাথা নাড়ি।

অসীম চিন্তার ভাণ করে একটু। সবাই তার প্রতি মনোযোগী হয়ে উঠেছে। সে আবার বলে, "তাহলে তো সর্বনাশ! ঈশান কোণে মেঘ, নিশ্চয়ই ঝড় উঠবে।"

"ঝড়?" সহযাত্রীরা প্রায় সমস্বরে প্রশ্ন করে।

"হ্যাঁ। আর এ উচ্চতায় ঝড় মানেই Snow fall. অর্থাৎ Blizzard. তাই না ঘোষদা?"

আমি আবার মাথা নাড়ি।

"তাহলে তো আমাদের তাড়াতাড়ি হাঁটা উচিত?" সবার আগে গৌরী উৎকণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করে।

"নিশ্চয়।" সাধুবাবা উত্তর দেন, "ঝড় উঠলে ভারি বিপদ।"

"উঠবেই।" অসীম দৃঢ় কণ্ঠে রায় দেয়।

ব্যস, ব্রহ্মচারী আবৃত্তি বন্ধ করে, তুলতুল গান থামায়, ভাগনে ক্যামেরা কাঁধে নেয়। অশোকের গল্প শেষ হয়, সন্ন্যাসীর কথা ফুরোয়।

এবারে ওরা সত্যি সত্যি জোরে হাঁটতে শুরু করে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ি। মনে মনে অসীমকে ধন্যবাদ দিয়ে আমিও এগিয়ে চলি।

অসীম পাকা অভিনেতার মতো সবার আগে আগে যাচ্ছে। ভাবখানা যেন ঝড়ের ভয়ে পালিয়ে চলেছে।

দশ

'Seshnag is just ahead'

সাইনবোর্ডটায় নজর পড়তেই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলি। তাহলে দিনের পদযাত্রার যতি আসন্ন। তাড়াতাড়ি পা চালাই।

বাঁক পেরিয়েই দেখতে পাই তাকে। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাই, আনন্দে বিহ্বল হয়ে পড়ি। একি মাটির পৃথিবী, না স্বপ্নের স্বর্গ?

পথটা একটু নিচে নেমে সামনে প্রসারিত। পথের গা ঘেঁষে বাঁদিকে খাড়া পাহাড়, ডানদিকে নদী—জল অনেক নিচে। নদীর ওপারেও খাড়া উঁচু পাহাড়।

নদীটা প্রায় সোজা গিয়ে একটা হ্রদে পড়েছে। না, শুধু হ্রদ বললে অনেকখানি না-বলা রয়ে যায়। নীলকান্ত মণির মতো উজ্জ্বল ঘননীল সরোবর থেকে নীলগঙ্গা

বেরিয়ে এসেছে। দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে নদী নিজের পথ করে নিয়েছে। আর নদীপথের পাশ দিয়ে পাহাড় কেটে মানুষ তৈরি করেছে অমরতীর্থের পথ। সেই পথে আমরা এগিয়ে চলেছি শেষনাগের দিকে—পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যে-শেষনাগে পৌঁছতে পারেননি।

না, এগোতে পারছি না। কে যেন আমার পা দু'খানি মাটির সঙ্গে গেঁথে দিয়েছে। অপলক নয়নে তাকিয়ে আছি ঐ অপরূপ হ্রদের তীরে।

মনে পড়ছে মানস-সরোবরের কথা। জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ মানস দেখা হয়নি, হয়তো বা হবেও না কোনদিন। কিন্তু আজ এই শেষনাগের সামনে দাঁড়িয়ে আমি মানসের রূপ কল্পনা করতে পারছি।

একদিকে উঁচু উপত্যকা আর একদিকে উঁচু পাহাড়। পাহাড়ের ওপর দিকে পাথর আর বরফ, নিচের দিকে ঘাস ও ঝোপঝাড়। উপত্যকার দিকে ও হ্রদের তীরে ঘাস ও ছোট ছোট গাছ। ফুলও রয়েছে। কিন্তু পাহাড় যেমন জল থেকে সোজা উঠে গেছে, উপত্যকা তেমন নয়। ওদিকটাতে জলের কাছে অনেকটা বেলাভূমি রয়েছে। সেখানে কিছু মানুষ দেখতে পাচ্ছি। খুবই ছোট ছোট দেখাচ্ছে। তাহলেও বুঝতে পারছি ওঁরা স্নান করছেন। এই হ্রদে স্নান করলে নাকি সর্ব্বব্যাধি বিনষ্ট হয়। বিশেষ করে জীবনে নাকি আর কখনও চর্মরোগ হয় না। আর হয় অক্ষয় পুণ্য। যাঁরা মাইলখানেক পথ ঘুরে প্রায় শ'পাঁচেক ফুট উৎরাই ভেঙে ওখানে স্নান করতে নেমেছেন এবং হিমশীতল জলে স্নান করছেন, তাঁরা অধিকাংশই পুণ্যের প্রয়োজনে গিয়েছেন। পুণ্যলাভের জন্য আমরা যত চেষ্টা করে থাকি, পাপ না করার জন্য যদি তার এক দশমাংশ চেষ্টা করতে পারতাম, তাহলে মাটির পৃথিবী স্বর্গে রূপান্তরিত হয়ে যেত। কিন্তু তা হবার নয়। আমরা পাপ করে তারপরে পুণ্যলাভের আশায় দেবতার চরণে ঠাঁই নিতে চাই। জানি না ভগবান আমাদের আশ্রয় দেন কি না?

দাঁড়িয়ে রয়েছি হ্রদের পশ্চিম তীরে। এখান থেকেই নীলগঙ্গা বেরিয়েছে। হ্রদের পুবদিকে দুটি পাহাড়ের ফাঁক নিয়ে দূরে হিমবাহ দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে একটা নদী নেমে এসে হ্রদের বেলাভূমিতে আলপনা এঁকেছে। তারপরে জলে মিশেছে।

মহাগুণাস গিরিবর্ত্ম থেকে আসা আরেকটি ছোট নদী উত্তরের উপত্যকার ওপর দিয়ে এসে শেষনাগে পড়েছে। পুণ্যার্থীরা তারই তীর ধরে শেষনাগের তীরে পৌঁছেছেন। কিন্তু উপত্যকার কথা এখন নয়। আমরা তো ওখানেই চলেছি। এবারে এগোনো যাক।

পথটি হ্রদের পশ্চিম দিক থেকে অর্ধবৃত্তাকারে উত্তরে প্রসারিত। আমরা সেই পথ বেয়ে ওপরে উঠেছি। বেশিদূর উঠতে হল না। পথটা এবার নিম্নমুখী হয়ে উপত্যকায় মিশেছে।

নেমে আসি উপত্যকায়। প্রায় সমতল পথ দিয়ে এগিয়ে চলি। পথের পাশে বাঁদিকে খানিকটা জায়গা লোহার পাইপ দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। সামনে সাইনবোর্ড 'PONY YARD' অর্থাৎ আস্তাবল। কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ, তাঁরা ঘোড়ার জন্য আলাদা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু এতটুকু জায়গাতে ক'টি ঘোড়া রাখা যাবে? যাত্রার সময় তো হাজার হাজার ঘোড়া আসে!

আস্তাবল ছাড়িয়ে এগিয়ে চলি। উপত্যকাটি বেশ বড়—চন্দনবাড়ির চেয়ে অনেক

বড়। তবে খুবই রুক্ষ। ছোট-ছোট ফুল, ছোট-বড় ঘাস আর কাঁটাগাছ ছাড়া কিছু নেই। বড় গাছ থাকবে কেমন করে? এখানকাব উচ্চতা সাড়ে বারো হাজাব ফুট। কিন্তু কেবল উচ্চতার জন্যই বনের অভাব নয়। গোমুখীর উচ্চতা ১২,৭৭০ ফুট। গোমুখীর সন্নিহিত অঞ্চলে এবং আরও ওপরে রক্তবরণ হিমবাহে প্রচুর বড় বড় গাছ রয়েছে। এখানে বড় গাছ নেই কারণ এটি প্রকৃতপক্ষে হিমবাহ অঞ্চল। শীতকালে এ উপত্যকার সবটাই বরফে ঢেকে যায়। তার ওপরে এখানে সর্বদা প্রবল বাতাস বয়। বায়ুর জন্যই এই উপত্যকার নাম—বায়ুযান, কাশ্মীরীরা বলেন—ওয়াব্‌যান। উচ্চহিমালয়ে বাতাস মানেই শীতলতা—মৃত্যুর পদধ্বনি।

আস্তাবলের পরে পথের পাশে গোটাবিশেক তাঁবু। তারপরে পথটা আবার একটু ওপরে উঠে নেমে গিয়েছে মূল-উপত্যকায়। আমরা এগিয়ে চলি।

দেখা যাচ্ছে তাঁবুর নগরী। এখানে দুটি বিশ্রাম-ভবন ও দুটি মালবাহকদের ঘর রয়েছে। সেগুলিও দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। কিন্তু ঘর-বাড়ি নয়, তাঁবুগুলোই ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। আমরা তো তাঁবুতেই থাকব। ভাবতেও ভাল লাগছে।

এখন আবার কারা চন্দনবাড়ি রওনা হচ্ছেন? কয়েকজন অশ্বারোহী এদিকে আসছে, তার মানে চন্দনবাড়ি চলেছে। সন্ধ্যার আগে পিসু পার হতে পারবে কি? নইলে যে মুশকিলে পড়বে।

না, আমার দুশ্চিন্তা অমূলক। এরা ফিরে যাচ্ছে না। এরা আজই এসেছে—আমাদের সহযাত্রী সেই সাউথ ক্যালকাটার সাহেব-মেম। খাওয়া-দাওয়া সেরে আবার ঘুরতে বেরিয়েছে। তার মানে এতটা পথ ঘোড়ায় চড়েও অশ্বারোহণের আশ মেটেনি। ঘোড়াগুলো যে ঘোড়া হলেও জীব এবং তাদেরও একটু বিশ্রামের দরকার, এ কথাটা বোধহয় ভেবে দেখেনি ওরা।

আমাদের চিনতে পেরে ওরা একেবারে আকাশ থেকে পড়ে। জনৈকা যুবতী তুলতুলকে জিজ্ঞেস করে, "তোমাদের এত দেরি?"

গম্ভীর স্বরে তুলতুল জবাব দেয়, "আমার ঘোড়াটা যে আপনাদের ঘোড়ার মতো তেজী নয়। আর তাই ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে হেঁটে আসতে হল।"

"হেঁটে এলে!"

"হ্যাঁ।"

"কোথা থেকে?"

"চন্দনবাড়ি।"

"হেঁটে পিসু পার হলে?"

"হ্যাঁ।"

বিস্মিতা যুবতী বোধকরি কথা খুঁজে পাচ্ছে না। অতএব তার স্বামী তাকে সাহায্য করে, "এতে অবাক হবার কি আছে? পাহাড়ী পথে তো ঘোড়ায় চড়ার চেয়ে হাঁটা সহজ। নিজের ইচ্ছে মতো পথচলা যায়। পড়ে যাবার ভয় থাকে না।"

তুলতুল বোধহয় আর সহ্য করতে পারছে না। সে ওদের কাছ থেকে বিদায় না নিয়েই এগিয়ে চলে। আমরা তাকে অনুসরণ করি।

পৌঁছে গিয়েছি লোকালয়ে, কয়েকটি দোকান আর যাত্রীদের তাঁবু। পথের

দু-পাশেই বসতি। আর তারই ঠিক সামনে সাইনবোর্ড—

'WAVJAN

Ht. 12,200 ft.'

শেষ হল আজকের পদযাত্রা। বেলা দুটো বাজে। অর্থাৎ আট মাইল পথ আসতে প্রায় ছ'ঘণ্টা লেগেছে।

পথের ধারেই 'কিচেন টেন্ট্'। সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিলেন ফকিরবাবু। বললেন, "তিন ও চার নম্বর তাঁবু আপনাদের, একেবারে শেষদিকে। তাঁবুতে গিয়ে বিশ্রাম করুন, খাবার নিয়ে যাচ্ছে।"

পথের দু-পাশেই তাঁবু। বাঁদিকে প্রথম সারিতে কয়েকটি দোকান—চা ও খাবারের দোকান। ডানদিকে পথের ধারে দুটি পাথরের ঘর ও যাত্রীদের তাঁবু। এই স্থায়ী ঘর দুটি মালবাহকদের জন্য নির্দিষ্ট। ডানদিকে খানিকটা দূরে ফাঁকা মাঠের মাঝে বিশ্রাম-ভবন।

আমরা তাঁবুতে থাকব। অতএব বিশ্রাম-ভবনের কথা থাক। পথের ধারে 'কুণ্ডু ট্র্যাভেল্স'-এর 'ব্যানার' লাগানো রয়েছে। সেখান দিয়ে ভেতরে ঢুকেই দু-পাশে আমাদের তাঁবু। আর তারপরেই হ্রদ—শেষনাগ। এককথায় আমাদের তাঁবুর পেছনেই শেষনাগ। অপরূপ অবস্থান। স্থান নির্বাচনের জন্য ফকিরবাবুকে মনে মনে ধন্যবাদ দিই। আমরা এখানে রাত্রিবাস করব—চাঁদনী রাত। চাঁদের আলোয় শেষনাগকে দেখব, ভোরের আলোয় শেষনাগকে দেখব, সকালের সোনালি রোদে শেষনাগকে দেখব। যখন ইচ্ছে, যতক্ষণ ইচ্ছে হিমালয়ের অন্তরলোকের এই স্বর্গীয় সরোবরকে দেখব।

আমরা দুটি রাত এই বায়ুযানে থাকব। হ্যাঁ, বায়ুযান। হ্রদের নাম শেষনাগ, উপত্যকার নাম বায়ুযান। অনেকে অবশ্য হ্রদের এই তীরভূমিকেও শেষনাগ বলে থাকেন।

যাক্‌গে যেকথা ভাবছিলাম। এই রমণীয় স্থানে আমরা দুটি রাত অতিবাহিত করব—আজ এবং পরশু। পরশু সকালে পঞ্চতরণী থেকে রওনা হয়ে অমরতীর্থে অমরনাথজীকে দর্শন করব। পঞ্চতরণীতে ফিরে এসে দুপুরের খাওয়া সেরে সোজা চলে আসব এখানে।

বাসুদেব বেরিয়ে আসে তাঁবু থেকে। বলে, "এই দুটো আমাদের তাঁবু। ভেতরে গিয়ে বসুন।"

বাসুদেব ঘোড়ায় এসেছে। অনেকক্ষণ আগে পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু সে বসে থাকেনি। তাঁবু ঠিক করে আমাদের মালপত্র আনিয়ে রেখেছে। হিমালয়ের দুর্গম পথে এটাই নিয়ম। সুতরাং আমরা তাকে ধন্যবাদ দিই না।

আর ধন্যবাদ দেবার সুযোগই বা কোথায়? আমাদের সাড়া পেয়ে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছেন তুলতুলের মা ও বাবা, মিস্টার ও মিসেস বোস, অজিত ও বৌমা, ডাক্তারের মা ও অপর্ণা এবং আরও অনেকে। আমরা হেঁটে এসেছি। সুতরাং সবাই আমাদের, বিশেষ করে তুলতুল, গৌরী, মায়া ও সরকারদাকে অভিনন্দিত করেছে। অভিনন্দিত করেছে জ্যোতির্ময় ও অন্যান্য যাত্রীদের, যারা পথে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে আমাদের সঙ্গে হেঁটে এসেছে।

মিঃ চ্যাটার্জী নামে জনৈক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক তাঁর যুবক পুত্র, স্ত্রী ও জন পাঁচেক

শালীকে নিয়ে আমাদের সঙ্গে এসেছেন। আগেই বলেছি তাঁব ছেলেটিও আজ আমাদের সঙ্গে হেঁটে এসেছে। এই ভদ্রলোকের পুরো নামটি আমরা কেউ জানি না কারণ তুলতুলের বাবা তাঁর নাম রেখেছেন শালীবাহন। সেই নামেই তিনি এখন সুপরিচিত।

শালীবাহন জিজ্ঞেস করলেন, "আমার ছেলে কেমন হেঁটেছে?"

"ভালই।" উত্তর দিই।

উল্লসিত স্বরে শালীবাহন বললেন, "জানতাম ও ভাল হাঁটবে। কার ছেলে দেখতে হবে তো! আরে মশাই আমরা 'অরিজিন্যালি' গাঁয়ের ছেলে। এখন না হয় কলকাতায় গাড়ি ছাড়া একপাও চলি না, কিন্তু ছোটবেলায় গ্রামে থাকতে রোজ পাঁচ মাইল মাটির পথ ভেঙে স্কুলে যেতাম! কতক্ষণ সময় লাগত জানেন?"

"কতক্ষণ?"

"আধঘণ্টা।"

"আধঘণ্টায় পাঁচ মাইল!" আমরা বিস্মিত।

"হতে পারে না।" তুলতুলের বাবা সোজাসুজি মন্তব্য করেন।

শালীবাহন একটু বিচলিত হন। বলেন, "না, ঠিক আধঘণ্টা নয়, মানে মিনিট পঁয়তাল্লিশ লাগত আর কি?"

"দূরত্বটাও পাঁচ মাইল নয়, আরও কিছু কম ছিল।" মিঃ ভট্টাচার্য গম্ভীর স্বরে বলেন। আমরাও কষ্ট করে গম্ভীর থাকি।

কি যেন একটু ভাবেন শালীবাহন। তারপরে মিঃ ভট্টাচার্যকেই জিজ্ঞেস করেন, "আরেকটু কম হবে, তাই না?"

বলাবাহুল্য এই যাত্রাতে এসেই মিঃ ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে। তবু মিঃ ভট্টাচার্য বললেন, "কম বইকি, অনেক কম।"

"কত?"

"আপনার গ্রামের বাড়ি থেকে স্কুল আর কত দূর ছিল, বড়জোর মাইল দুয়েক।"

"দু-মাইল? তা হবে।" একবার থামেন শালীবাহন। তারপর বলেন, "কিন্তু ভেবে দেখুন, দু-মাইল হেঁটে আমরা প্রতিদিন স্কুল করেছি, আর এখনকার ছেলে-মেয়েরা একটা 'স্টেপ্' হাঁটতে চায় না। কিন্তু আমার ছেলে আমার ছোটবেলার সেই গুণটা পেয়েছে। হাঁটতে খুব ভালবাসে।"

"তা আর বলতে।" মিঃ ভট্টাচার্য যোগ করেন, "নইলে কি আর সে এতটা পথ এভাবে হেঁটে আসতে পারত?"

আর হাসি চেপে রাখা সম্ভব নয়, তাই তাড়াতাড়ি তাঁবুতে ঢুকে পড়ি।

একটু বাদে কাল বিকেলের সেই বৃদ্ধা তাঁবুতে আসেন। মুগ্ধকণ্ঠে বলেন, "তোমরাই ধন্য বাবা! অমরনাথজী কৃপা করলেন তোমাদের। তোমরা পায়ে হেঁটে যেতে পারছ তাঁর কাছে। আমার দুর্ভাগ্য, আমি পারলাম না।"

তিনি আজ ঘোড়া নিয়েছেন। সুতরাং প্রতিবাদ করা নিরর্থক। তবু মৃদু হেসে বলি, "আপনার বয়সে ঘোড়ায় চড়েই বা ক'জন অমরনাথ যেতে পারেন?"

ভদ্রমহিলা মনে মনে নিশ্চয়ই খুশি হলেন আমার কথায়। কিন্তু মুখে বলেন, "এ আর একটা এমন কি বাবা! এ তো ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায়।"

আমাদের খবরাখবর নিয়ে চলে গেলেন ভদ্রমহিলা। আমরা জুতো খুলে পদসেবায় লেগে যাই। হিমালয়ের পথে প্রত্যেক পদযাত্রী শ্রীচরণের সেবক।

একটু বাদে খাবার আসে। খেয়ে নিয়ে বিছানা খুলতে লেগে যাই। আলো থাকতে থাকতে গোছগাছ করে নেওয়া সুবিধে। মোমের আলোয় এসব কাজ করা খুবই কঠিন।

গতকাল চন্দনবাড়িতে ব্রহ্মচারী দরজার পাশের খাটিয়াটি নিয়েছিল। আজও তাই বাসুদেব তাকে সেই জায়গাটা দিয়েছে। কিন্তু আজ জায়গাটা পছন্দ হয় না তার। বলে, "আমাকে একেবারে শেষ খাটিয়াটা দিন।"

"কেন?"

"আমি জপতপ করি। এখান থেকে সব এঁটোকাঁটা বার বার তাঁবুতে ঢোকে।"

"আসল কথাটা বলছ না কেন পণ্ডিত?" অসীম প্রশ্ন করে।

ব্রহ্মচারী বুঝতে পারে না তার কথা। বলে, "কি কথা দাদা?"

"তুমি শুনেছ বায়ুযানে খুব বায়ু। দরজার কাছে শুলে তোমার শীত বেশি লাগবে।"

"কি যে বলেন অসীমদা! ব্রহ্মচারী মৃদু প্রতিবাদ করে, "শীতের ভয় আমি করি না। শুধু সদরে থাকা আমার পক্ষে অসুবিধে বলে, আমি ওখানটায় যেতে চাইছি।"

অসীম কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করে না। বলে, "ভয় নেই। রাতে তাঁবুর পর্দা ফেলে দেওয়া হবে।"

"তা হোক্ গে, আমি এখানে শোব না।" ব্রহ্মচারীর স্বরে বিরক্তি।

অসীম আর ঘাঁটায় না ওকে। আমি ব্রহ্মচারীর সঙ্গে খাটিয়া বদল করি। সে খুশি হয়।

খাওয়া ও গোছগাছের পরে বেরিয়ে আসি তাঁবু থেকে। শেষনাগের তীরে এসে দাঁড়াই। গোধূলি ঘনিয়ে আসছে তার বুকে। একটা রোমাঞ্চকর নীরবতা আর রহস্যময় সৌন্দর্য বিরাজ করছে সেখানে।

আর কিছুক্ষণ। তারপরেই আঁধারের যবনিকা তাকে ঢেকে দেবে। কিন্তু তা অল্পক্ষণের জন্য। অবশেষে চাঁদ উঠবে আকাশে। রহস্যময়ী শেষনাগ মোহময়ী রূপ ধারণ করবে।

আবার নেমে আসি পথে। প্রত্যেক তাঁবুর সামনেই জটলা। কুশল বিনিময় করতে করতে এগিয়ে চলি বড় রাস্তার দিকে।

দেখা হয় ডাক্তারের সঙ্গে। বলি "কি খবর তোমার? খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে?"

"না হয়ে উপায় কি দাদা? দুজন বৃদ্ধা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।"

"কি হয়েছে?"

"কি আর হবে? High altitude sickness, মাথার যন্ত্রণায় শয্যাশায়ী। একজন বারদুয়েক বমি করেছেন।"

"এখনই তাঁবুর বাইরে আসতে বলো। কানের টুপি আর হাতের দস্তানা খুলে কিছুক্ষণ লেকের ধারে গিয়ে বসতে বলো।"

"বলছি।" অসিত জবাব দেয়, "কিন্তু তাঁরা আসবেন কি?"

"না এলে aclimatized হবেন না। কষ্ট পাবেন।"

বড় রাস্তায় আসি। হাঁটতে থাকি সামনের দিকে। পথের দু-পাশে ফার্লংখানেক

জায়গা জুড়ে তাঁবুর কলোনী—দোকান-পাট ও যাত্রীনিবাস।

একেবারে শেষদিকে একটা তাঁবুর সামনে বেশ ভিড়। আমাদের কয়েকজন সহযাত্রীও রয়েছেন। তাঁদেরই একজন বলেন, "সাহেব সাধু।"

লক্ষ্য করে দেখি তাঁবুর ভেতরে জনৈক শ্বেতাঙ্গ গেরুয়াধারী পদ্মাসন করে বসে আছেন। তাঁর গায়ে নামাবলী, গলায় তুলসীর মালা। কয়েকজন ভক্তের সঙ্গে মৃদু কণ্ঠে কি যেন বলছেন।

কিন্তু সাধুর পাশে ঐ মেয়েটি কে? তার পরনে বিলিতি পোশাক অথচ গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। এই মেয়েটিকেই তো গতকাল এসময় চন্দনবাড়িতে নদীর ধারে পুডিং তৈরি করতে দেখেছি!

অসীমও সমর্থন করে আমার অনুমান। কিন্তু সে আজ আর কালকের মতো আলাপ জমায় না মেয়েটির সঙ্গে। বরং বলে, "বড্ড হাওয়া দিচ্ছে, শীত করছে। চলুন একটা চায়ের দোকানে গিয়ে বসা যাক।"

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। এখুনি তাঁবুতে ফিরে গিয়ে কি হবে? তাছাড়া আরেকবার গরম চা পেলে ভালই হয়।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা এসে একটা দোকানে ঢুকি—তাঁবুর দোকান। সর্দারজীর হোটেল-কাম্-রেস্তোরাঁ।

একপাশে উনুনের ধারে চা তৈরির সাজ-সরঞ্জাম। সর্দারজী সেখানেই বসে আছেন। আরেকপাশে দুখানি খাটিয়া পাতা। একখানিতে দুজন শ্রান্ত যুবক ও একজন যুবতী বসে আছে। মেয়েটিকে দেখে বাঙালী বলেই মনে হচ্ছে।

আমরা খালি খাটিয়াখানিতে বসি। মামা সর্দারজীকে চা বানাতে বলে।

তাঁবু হলেও দোকানের সামনের দিকটা সম্পূর্ণ খোলা। প্রচুর হাওয়া আসছে ভেতরে—বায়ুযানের হিমেল-হাওয়া। তবু তেমন একটা শীত লাগছে না এখানে। লাগবে কেমন করে, এখানে যে উনুন জ্বলছে! উচ্চ হিমালয়ে আগুনের আরেক নাম জীবন।

আমাদের অনুমান মিথ্যে নয়, ওরা বাঙালী। যুবক দুটি বন্ধু। যুবতীটি ওদের একজনের স্ত্রী। ওরা হাওড়া থেকে এসেছে।

তিনজনেই ক্ষীণদেহী, তার মধ্যে যুবতীটি বেশি রোগা। জীবনে সে আর কখনও এমন পাহাড়ী পথ পাড়ি দেয় নি। বেচারী বড়ই কাহিল হয়ে পড়েছে।

আসল কারণটা বুঝতে পারি একটু বাদে। ভাগনের প্রশ্নের উত্তরে একটি যুবক জানায়, "আমরা আজ শেষরাতে পহেলগাঁও থেকে রওনা হয়েছি।"

"পহেলগাঁও!" আমরা বিস্মিত।

"হ্যাঁ। চন্দনবাড়িতে লাঞ্চ করেছি। আজ একদিনে আঠারো মাইল হেঁটেছি।" সগর্বে উত্তর দেয় যুবকটি।

"তাহলে তো গা-হাত-পা ব্যথা হবেই।" সরকারদা মাথা নাড়েন।

"মাথা ধরা এবং বমিও তো হতে পারে।" পরিতোষবাবু যোগ করেন।

আমি ভাবি অন্য কথা। একে দুর্বল ও অনভিজ্ঞ, তার ওপরে দীর্ঘ ও দুর্গম পথ। কষ্ট তো হবেই। কিন্তু কি দরকার ছিল এই অসাধ্য সাধন করার? জীবনে ক'টি দিন আমরা হিমালয়ের পথে পদচারণা করার সুযোগ পাব? সেই সামান্য সময়টুকু যদি দুচোখ

মেলে হিমালয়কে না দেখতে পারি, তাকে অনুভব না করতে পারি, উপভোগ না করতে পারি—তাহলে কেন হিমালয়ে আসা? পথচলার প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার জন্য আমরা হিমালয়ে আসিনি, দেবতাত্মা হিমালয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাবার জন্যই হিমালয়ের পথে পথে পদচারণা করেছি। যে পথের ধূলিতে শঙ্করাচার্য ও বিবেকানন্দের পদধূলি মিশে আছে, সেই পথে চোখ বুজে ছুটোছুটি করে কেন অকারণে এমন কষ্ট পাওয়া?

মেয়েটির কষ্ট বুঝতে পারছি। বাঙালী মধ্যবিত্ত পরিবারের বউ। যে-মেয়ে কালে-ভদ্রে বাড়ির বাইরে বের হয়, সে একদিনে আঠারো মাইল পাহাড়ী-পথ ভেঙেছে, পিসু চড়াই পেরিয়েছে।

মেয়েটির হয়তো কষ্ট কিছু বেশি। কিন্তু যুবক দুটিরও কষ্ট হচ্ছে। অসুস্থ এরা তিনজনেই। সর্দারজী তাঁবুর বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। রুটি ডাল ও সব্‌জির ব্যবস্থাও করে দেবেন বলেছেন। ওরা তারই প্রতীক্ষা করছে। খেয়ে নিয়েই তাঁবুতে গিয়ে শুয়ে পড়বে। এবং আমার বিশ্বাস আগামীকাল সারাদিন ওদের বিশ্রাম নিতে হবে এখানে।

তাহলেও সেকথা বলি না। অন্যকথা বলি। বলি সর্দারজীকে, "রান্না হয়ে যাবার পরে এদের এক সস্‌প্যান গরমজল করে দিতে পারবেন?"

"পারব বৈকি!" সর্দারজী উত্তর দেন, "কিন্তু কেন বলুন তো?"

"পা-গুলো কিছুক্ষণ গরমজলে ডুবিয়ে না রাখলে যে এদের চোখে ঘুম আসবে না রাতে আর কাল সকালেও উঠে বসতে পারবে না।"

সর্দারজী মানুষটি ভাল। ব্যবসায়ী হলেও সেবাপরায়ণ। মৃদু হেসে তিনি ওদের বলেন, "আপনারা খেয়ে নিয়ে তাঁবুতে চলে যাবেন। আমি এক বালতি গরমজল ও দুটো 'এক্‌স্ট্রা' বালতি পাঠিয়ে দেব।"

ওরা আমার মুখের দিকে তাকায়।

আমি বলি, "জলটা সমান করে তিন বালতিতে ভাগ করে নেবেন। তারপরে তিনজনেই নিজের বালতি মাটিতে রেখে পা ঝুলিয়ে খাটিয়ায় বসবেন। একটু-একটু করে সইয়ে-সইয়ে পা দুইখানি পালা করে গরম জলে ডুবিয়ে রাখবেন কিছুক্ষণ করে। জল জুড়িয়ে গেলে পা মুছে মোজা পায়ে দিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়বেন। ঠিক কথা, একটা করে Novalgin কিংবা Analgin ট্যাবলেট খেয়ে নেবেন।"

ওরা মাথা নাড়ে। তারপরে মেয়েটির স্বামী স্বীকার করে, "এতটা পথ একদিনে হেঁটে বোধহয় কোন লাভ হল না! মনে হচ্ছে কাল আর আমরা পথ চলতে পারব না। এখানেই থেকে যেতে হবে।"

এইবারে কথাটা বলি ওদের, "হিমালয়ের পথ আনন্দের পথ। অযথা তাড়াহুড়ো করে এই মায়াময় পথের মাধুর্য নষ্ট করে দেবেন না। এভাবে পথ চললে শুধুই শরীরটাকে কষ্ট দেবেন, সময় সাশ্রয় হবে না। দু-দিনের পথ একদিনে এসে একদিন শুয়ে থাকা আর দু-দিনের পথ দু-দিনে আসা একই কথা। বরং তাতে পথ-চলার আনন্দ অনেক বেশি পাওয়া যায়।"

"আর আমরা এভাবে পথ চলব না।" মেয়েটি বলে। তার সঙ্গীরাও মাথা নাড়ে।

চা খাওয়া হয়ে গেছে। আমরা কিন্তু বসে আছি চায়ের দোকানে। বসে বসে

হাওড়ার যাত্রীদের সঙ্গে পথেব গল্প করছি। সর্দারজী ও তাঁর সহকারী মাঝে মাঝে যোগ দিচ্ছেন আমাদের আলোচনায়। তাঁরা অবশ্য হাতে কাজ করে যাচ্ছেন। 'বোটি' বানাচ্ছেন। এর পরে 'ডাল' ও সব্জি গরম কবে নিলেই ওদের খেতে দিতে পারবেন।

হিমালয়ের অন্যান্য তীর্থপথের মতো এপথেও আমিষ খাওয়া নিষেধ, সবাইকে নিরামিষ খেতে হয়। তবে পেঁয়াজ এবং মদে বোধহয় তেমন আপত্তি নেই। কারণ সহযাত্রীদের অনেকেই সঙ্গে নিয়ে এসেছেন পহেলগাঁও থেকে। পেঁয়াজ বাংলার বাইবে সবজি বলে স্বীকৃত আর মদ যে সুরলোকের সুরা। শুনেছি এখানেও নাকি কোন কোন দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। সেই কথাটাই জিজ্ঞেস করি সর্দারজীকে।

দিলখোলা সর্দারজী উত্তর দেন, "জরুরৎ হোগী তো দেখা যায়গী।"

সর্দারজী ও হাওড়ার যাত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নেমে আসি পথে। ইতিমধ্যে কখন যে নীল আকাশে চাঁদ উঠেছে টের পাই নি। চাঁদের আলোয় বায়ুযান বিচিত্র বেশে সাজ সেবে নিযেছে।

ঘননীল আলোময় আকাশ। সেখানে রুপোলী মেঘেব আনাগোনা। তারা বলাকার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশেব বুকে। আর সেই আকাশটা নেমে এসে প্রায় পাহাড়ে মাথা ছুঁয়েছে।

কাছের সেই সুনীল আকাশ থেকে রুপোলী আলো অবিরত গলে গলে পড়ছে—বায়ুযানের পথে ও প্রান্তরে আর শেষনাগের জলে ও স্থলে।

প্রায় ছুটে চলি শেষনাগের দিকে। তাঁবুর কলোনী পেরিয়ে উঁচু পাড়ে এসে দাঁড়াই।

রূপকথার সুনীল সরোবর। স্থির ও অচঞ্চল একখানি সুবিবাট নীলকান্ত মণি। তার উজ্জ্বল বুকে আকাশ আর পাহাড়ের ছায়া পড়েছে। আমি অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকি শান্ত সুন্দর ও শাশ্বত শেষনাগের দিকে।

এ তো মর্ত্য নয় স্বর্গ, সরোবর নয় স্বপ্ন—স্বপ্নের স্বপ্ন। বিচিত্র প্রকৃতির এমন বর্ণাঢ্য বেশ বড় বেশি দেখিনি। আমি পুলকিত, আমি শব্দহীন, আমি দিশাহারা।

এ তুমি আমায় কোথায় নিয়ে এলে! তুমি পরম করুণাময় আর আমি সৌভাগ্যবান। তোমার এই অপরূপ রূপ আমি প্রত্যক্ষ করতে পারলাম। হে রূপময়, হে বর্ণনাতীত সৌন্দর্যের আধার, হে প্রাণপুরুষ তোমাকে প্রণাম।

এগারো

সকালে ঘুম ভাঙে গানের সুরে—বাংলা গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত।

"হরি, তোমায় ডাকি, সংসারে একাকী
আঁধার অরণ্যে ধাই হে।
গহন তিমিরে নয়নের নীরে
পথ খুঁজে নাহি পাই হে।"

পাশের তাঁবুতে প্রভাত-সঙ্গীতে আসর বসেছে। প্রথমে মামা গাইছে, তারপরে ভাগনে ও জ্যোতির্ময় ধুয়ো ধরছে। শুনতে কিন্তু মন্দ লাগছে না। মামা গেয়ে চলেছে—

"সদা মনে হয় 'কী করি' 'কী করি',
কখন আসিবে কালবিভাবরী—
তাই ভয়ে মরি, ডাকি হরি! হবি!
হরি বিনে কেহ নাই হে॥" ..

সহযাত্রীদের সবারই বোধকরি ঘুম ভেঙে গিয়েছে। মামাব গলায় বেশ জোর আছে। ভালই হল। প্রভাতফেরীর কাজটা হয়ে গেল।

স্লিপিং ব্যাগের জীপ খুলে উঠে বসি। এককাপ চা পেলে হত। কিন্তু বেড-টি আসতে দেরি আছে এখনও। সবে সাড়ে পাঁচটা, ছ'টার আগে বেড-টি দিয়ে উঠতে পারে না। কি করবে? একে শীত, তার ওপরে এতগুলো মানুষ।

অতএব উঠে দাঁড়াই। জামা-জুতো পরে বেরিয়ে আসি তাঁবু থেকে। না, রোদ ওঠেনি এখনও। ওঠার কথাও নয়। হিমালয়ের সূর্য বড়ই আয়েসী, সকাল আটটার আগে ঘুম ভাঙে না তার।

রোদ আসেনি কিন্তু চারিদিক পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। মেঘমুক্ত আকাশ। ঝক্‌ঝকে সকাল! শেষনাগকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।

ওপারে পাহাড়ের গায়ে কাল রাতে কিছু বরফ পড়েছে। অনেকখানি অংশ সাদা হয়ে গিয়েছে।

তাঁবুর পাশ দিয়ে উঠে আসি উঁচু জায়গাটায়—ঠিক আমাদের তাঁবুর পেছনে, শেষনাগের পাড়ে। এখান থেকেই শেষনাগকে সবচেয়ে সুন্দর দেখায়।

কিন্তু ওখানে চাদর মুড়ি দিয়ে অমন করে বসে আছে কে? তাকিয়ে রয়েছে শেষনাগের দিকে?

আমাদের দলেরই কেউ হবে। এখানে এত সকালে বাইরের লোক কে আসবে?

আস্তে আস্তে এগিয়ে আসি। মনে হচ্ছে মহিলা। এত ভোরে এই শীতের সকালে একাকিনী অমন উদাস দৃষ্টিতে কে তাকিয়ে আছে শেষনাগের দিকে?

সে বোধহয় আমার পায়ের শব্দ শুনতে পেয়েছে। আমার দিকে তাকিয়েছে কে? চিনতে পারছি না। আমি এগিয়ে চলি।

সে হাসে।

কে? গৌরী নয়?

হ্যাঁ গৌরী।

গৌরী ডাক দেয়, "আসুন শঙ্কুদা! বসুন।"

আমি ওর পাশে বসি। তারপরে জিজ্ঞেস করি, "কতক্ষণ এখানে?"

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে বলে, "তা আধঘণ্টা হয়েছে। ঘুম ভেঙে গেল, তাই চলে এলাম। ভারি ভাল লাগছে বসে থাকতে। শেষনাগ সত্যি সুন্দর।"

"আর ওপারের ঐ পাহাড়টা?"

গৌরী দু-হাত জোড় করে প্রণাম জানায়। তারপরে বিনম্র কণ্ঠে বলে, "উনি তো স্বয়ং মহাদেব! দেখছেন না তাঁর জটা থেকে গঙ্গা নেমে এসেছে শেষনাগে।"

ভাল করে তাকাই, কষ্ট-কল্পনা। তাহলেও গৌরীর কথা ভাল লাগে আমার। ভক্ত তার নিজের মনের মুকুরে ভগবানকে দর্শন করেন। যাঁর চোখ আছে তিনি তাঁকে দেখতে

পান, যাঁর কান আছে তিনি তাঁর কথা শুনতে পারেন।

তাই বোধ হয় অভেদানন্দজী ঐ পাহাড়টা সম্পর্কে বলেছেন, 'চিরতুষারাবৃত হিমাদ্রিচূড়া হচ্ছে মহাদেবের মস্তক, আর ঐ তুষারনন্দী হচ্ছে তাঁর জটা।'

গৌরী এখনও অপলক নয়নে তাকিয়ে রয়েছে শিখরগুলোর দিকে। খুবই স্বাভাবিক, হর-পার্বতীর দেশে এসেছে সুতরাং প্রতি পদক্ষেপে শিব-দর্শন করছে।

কিন্তু ওর এমন আনমনা ভাব ভাল লাগে না আমার। তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠি, "এই জায়গাটার নাম কেন বায়ুযান হল জানো?"

"না তো।" গৌরী আমার দিকে তাকায়।

শুরু করি, "একদা এখানে বায়ুরূপী এক ভীষণ অত্যাচারী ভয়ঙ্কর দৈত্য বাস করত। তার অত্যাচারে ব্যতিব্যস্ত হয়ে স্বর্গের দেবতারা কৈলাসে বিশ্বনাথের কাছে গেলেন। বললেন—বায়ুদৈত্যের অত্যাচারে আমাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। হে মহেশ্বর! আপনি আমাদের রক্ষা করুন।"

মহাদেব মাথা নেড়ে বললেন—বায়ুদৈত্য আমার ভক্ত, সে আমার আশ্রিত। অতএব আমার পক্ষে তার কোন অমঙ্গল সাধন সম্ভব নয়। তোমরা নারায়ণের কাছে যাও।

—কিন্তু আপনি বাধা দিলে তো বিষ্ণুর পক্ষেও কিছু করা সম্ভব নয়।

বাধ্য হয়ে মঙ্গলময় শিবকে প্রতিশ্রুতি দিতে হল—ত্রিভুবনের মঙ্গলের জন্য নারায়ণ যদি বায়ুদৈত্যকে বিনাশ করেন, আমি বাধা দেব না।

আনন্দিত দেবগণ বিষ্ণুলোকে গিয়ে নারায়ণকে সব কথা জানালেন। তাঁরা করজোড়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন—আপনি আমাদেব বায়ুদৈত্যের অত্যাচার থেকে মুক্ত করুন।

বিষ্ণু বললেন—তথাস্তু।

তারপরে ভগবান শেষনাগকে আদেশ দিলেন—যাও, মর্ত্যে গিয়ে বায়ুদৈত্যকে বিনাশ করো।

শেষনাগ তথা বাসুকি এলেন এখানে। তিনি এক নিঃশ্বাসে এখানকার সব বায়ু শুষে নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বায়ুদৈত্যের প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হল। আর সেই থেকে এই রমণীয় উপত্যকার নূতন নাম হল 'বায়ুযান।'

"বায়ুদৈত্যের জায়গা বায়ুযান হলেও, শেষনাগ কিন্তু শেষনাগে নেই।"

নারীকণ্ঠে চমকে উঠি। পেছন ফিরে দেখি মিসেস মণ্ডল মুচকি হাসছেন।

সহাস্যে বলি, "লুকিয়ে গল্প শোনা ঠিক নয়।"

"ফাউ-তে পাপ নেই।" মিসেস জবাব দেন।

"ফাউ?"

"ফাউ বৈকি! বেড-টির সঙ্গে বেরিয়েছি সবার খোঁজ-খবর করতে। শুনলাম আপনারা তাঁবুতে নেই। বুঝতে পারলাম এখানে এসেছেন। তা, চায়ের খবর দিতে এলাম। গল্পটা ফাউ জুটে গেল।"

"কিন্তু কেবল শুনলেই চলবে না, বলতেও হবে।" আমি বলি, "আপনি বহুবার এখানে এসেছেন।"

"তা এসেছি, কিন্তু আমি আবার কি গল্প বলব?" মিসেস মণ্ডল বিচলিতা।

"শেষনাগের গল্পই বলুন।"

"শেষনাগ সম্পর্কে বলার মতো একটা কথাই জানা আছে আমার, সেটি বলছি। কিন্তু এখানে নয়, বেড-টি দেওয়া হচ্ছে, কাজেই তাঁবুতে চলুন।"

"গল্প?" গৌরী জিজ্ঞেস করে।

মিসেস জবাব দেন, "আসুন, চলতে চলতে গল্প বলছি।"

আমরা মিসেস মণ্ডলের সঙ্গে হাঁটতে শুরু করি। মিসেস বলতে থাকেন, "শেষনাগ বা সুবিশাল বাসুকি বোধহয় শেষনাগ হ্রদে নেই, কিন্তু রয়েছে তাঁর এক ক্ষুদ্রকার স্বজাতি।"

"কি রকম?" চলতে চলতে গৌরী প্রশ্ন করে।

মিসেস উত্তর দেন, "আপনারা তো জানেন অমরকথা বলবার জন্য শিব পার্বতীকে যে নির্জন গিরিগুহায় নিয়ে গিয়েছিলেন সেই গুহাই অমরতীর্থ অমরনাথ?"

আমরা মাথা নাড়ি। মিসেস মণ্ডল বলতে থাকেন, "অমরকথার মাহাত্ম্য হল যে শুনবে সে-ই অমর হয়ে যাবে। শিব তাই চাননি যে পার্বতী ছাড়া আর কেউ সে কথা শোনে। কিন্তু তখনও তাঁর গলায় একটি সাপ ছিল। শিব সে সাপটিকে শেষনাগে রেখে অমরনাথে গিয়েছিলেন। বোধহয় তিনি চাননি, সাপটা অমরকাহিনী শুনে অমর হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও সাপটা কিন্তু অমর হয়ে গেছে।"

আমরা মিসেসের মুখের দিকে তাকাই। তিনি বলতে থাকেন, "আপনারা জানেন যাত্রার সমর অমরনাথজীর ছড়ি নিয়ে যাওয়া হয় নিচে, ঐ হ্রদের তীরে। ওখানে একখানি নির্দিষ্ট পাথরের ওপর ছড়ি রেখে পূজারী ও সাধুরা স্নান ও পূজা-পার্বণ করেন। তখন নাকি দুধের মতো সাদা একটা পঞ্চমুখী সাপ শেষনাগ থেকে উঠে আসে। আস্তে আস্তে সে ছড়ির কাছে এসে দাঁড়ায়। মহান্তজী তাকে খেতে দেন। খেয়ে নিয়ে সে আবার ফিরে যায় শেষনাগের জলে।"

"যাঁরা আপনাকে একথা বলেছেন, তাঁদের কেউ দেখেছেন এ ঘটনা?" আমি প্রশ্ন করি।

মিসেস মণ্ডল উত্তর দেন, "না। কারণ স্নান করাবার সময় ছড়ির সঙ্গে শুধু পূজারী এবং সাধুরাই নিচে যেতে পারেন। তবে যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের কারও কাছ থেকে হয়তো শুনে থাকবেন ওঁরা। কিন্তু গত দু-বছর থেকে নাকি সাপটি আর উঠে আসছে না।"

"হয়তো অমরনাথজী তাঁর সাপটিকে নিয়ে গিয়েছেন।" আমি বলি।

"আপনি কি এ-কাহিনী বিশ্বাস করেন না শঙ্কুদা?" গৌরী প্রশ্ন করে।

"বিশ্বাস করা কঠিন!" কারণ বারো হাজার ফুট উঁচুতে এই তুষারগলা জলে কোন প্রাণীর বারো মাস বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। বিশেষ করে শীতের প্রায় সাত মাস যে জলাশয় বরফে ঢাকা থাকে।"

গৌরী কোন প্রতিবাদ করে না। সে নিজের তাঁবুতে চলে যায়। মিসেস মণ্ডলও বিদায় নেন। আমি তাঁবুতে ঢুকি।

চা খেয়ে আবার ফিরে আসি শেষনাগের তীরে। আজ আর কতক্ষণই বা আছি

তার কাছে। একটু বাদেই তো নিতে হবে বিদায়। সহযাত্রীরা তৈরি হচ্ছে। এই অবসরে আরও কিছুক্ষণ বিশ্বস্রষ্টার অপরূপ অবদান শেষনাগ হ্রদকে দেখা যাক।

আমি দেখি আর ভাবি। কাশ্মীরী ভাষায় 'নাগ' শব্দের অর্থ জলাশয়, সরোবর। কিন্তু শুধু সরোবর বললে শেষনাগ সম্পর্কে অনেক কথাই না-বলা থেকে যায়।

মনে পড়ছে আর্থার নেভের কথা। তিনি লিখেছেন—'It is a large sheet of water, of an emerald green colour on bright days, and is covered till june with ice...curiously contoured peaks rise to the south, and beyond them splendid Kohinoor mountain.'

মনে পড়ছে স্বামী অভেদানন্দের কথা। তিনি বলেছেন—'দুই পার্শ্বে চিরতুষারাবৃত পর্বতমালা। ...হ্রদটির দৃশ্য উপরের পথ হইতে এরূপ সুন্দর দেখায় যে, ইহাকে স্বর্গের অপ্সরাদের স্নানের স্থান বলিয়া ভ্রম হয়। হ্রদের উজ্জ্বল সবুজ বর্ণ। ...এই হ্রদের দক্ষিণে কতকগুলি পর্বতশৃঙ্গের পশ্চাতে বিখ্যাত কোহিনুর পর্বতটি সুন্দর দেখাইতেছে।'

শেষনাগের দিকে তাকিয়ে আজ আমার প্রবোধদার কথাও মনে পড়ছে। তিনি লিখেছেন, 'শেষনাগ এলো। হঠাৎ যেন খুলে গেল দিগন্তের পূর্বদ্বার। পশুরাজ সিংহ যেন বসে আছে পূর্বদিগন্ত জুড়ে। সমগ্র দেহে ধবল তুষার শোভা। তারই নীচে বিশাল হ্রদ। এত বিস্তৃত, এত ব্যাপক তার পটভূমি যে সেই হ্রদের আয়তন ঠাহর করা যায় না। স্থির ঘন নীলাভ জল....।'

সেই পটভূমির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি। আমি ভাগ্যবান। পণ্ডিত নেহরু যেখানে আসতে পারেন নি, সেইখানে আমি এসেছি। আমি পুলকিত বিস্মিত ও বিভ্রান্ত। আমি ভাষাহীন, আমি আত্মহারা।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি খেয়াল নেই। হঠাৎ কানে আসে, "ঘোষদা, ব্রেক ফাস্ট এসে গিয়েছে। খেতে চলুন।"

তাকিয়ে দেখি ভাগনে দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশে। একটু লজ্জা পাই। তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া দরকার। আবহাওয়া খুবই ভাল। মেঘমুক্ত নীলাকাশ। তবু হিমালয়ের খেয়ালী প্রকৃতিকে বিশ্বাস নেই। আজও ৮ মাইল পথ পাড়ি দিতে হবে, পেরোতে হবে ১৪,৫০০ ফুট উঁচু মহাগুণাস (মহাগুণেশ) গিরিবর্ত্ম। তারপরে পৌষপাথর কেলনাড় ও নাগ্‌গরখাঁ ছাড়িয়ে পঞ্চতরণী।

অতএব এবারে শেষনাগের কাছ থেকে নিতে হবে বিদায়। এ বিদায় চিরবিদায় নয়, আগামীকাল বিকেলে আবার আমি ফিরে আসব তার কাছে।

আবার দেখা হবে—এই আশাতেই বুক বেঁধে, শেষনাগ আমি এখন বিদায় নিচ্ছি তোমার কাছ থেকে। আশীর্বাদ করো, আমরা যেন অমরনাথজীকে দর্শন করে নির্বিঘ্নে ফিরে আসতে পারি তোমার কাছে, নিরাপদে ফিরতে পারি ঘরে। আমার গৌতমকে যেন গিয়ে ভাল দেখতে পাই!

ভাগনের সঙ্গে নেমে চলি নিচে। আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাগনে বলে, "চমৎকার আবহাওয়া। আমাদের ভাগ্য খুবই ভাল। আপনি ভাগ্যবান লেখক। আপনার আগে আর কোন বাংলা লেখক এখানে এত ভাল আবহাওয়া পান নি, অন্তত তাঁদের লেখা পড়ে তো তাই মনে হয়।"

একবার চুপ করে ভাগনে। কিন্তু আমাকে নীরব দেখে আবার বলতে থাকে, "আপনার পূর্ববর্তী লেখকরা প্রায় প্রত্যেকেই এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। আর ১৯২৮ সালের সেই দুর্ঘটনার কথা তো ভাবাই যায় না।"

সত্যই তাই। সেকথা ভাবলে আজও শিউরে উঠতে হয়। সেবারেও বহু যাত্রী যাত্রায় এসেছিলেন। আমাদের মতই তাঁরা আশ্রয় নিয়েছিলেন বায়ুযানের এই রমণীয় উপত্যকায়। কিন্তু তাঁদের অনেকেই শেষনাগের মায়া কাটাতে পারেন নি। অতর্কিতে প্রকাণ্ড একটা তুষারধ্বস নেমে এসেছিল তাঁদের ওপরে। ছ'শ মানুষ বরফের তলায় সমাধিস্থ হয়েছিলেন। পালাতে গিয়ে এবং ঠাণ্ডায় জমে মারা গিয়েছেন আরও কয়েকশ'।

সেদিনের সেই মৃত্যুপুরী আর আজকের এই শ্যামল সুন্দর রমণীয় উপত্যকা—একই জায়গা, ভাবা যায় না। ভাবার দরকারই বা কি? বায়ুযান যখন বরণ করেছে আমাদের, রমনীয় প্রকৃতি যখন অভিনন্দিত করেছে আমাদের, তখন সেই শোচনীয় দুর্ঘটনার কথা কেন স্মরণ করব? বরং বলব, আমরা ভাগ্যবান। প্রকৃতি আমাদের করুণা করেছেন। ভাগ্যবান সেই শহীদরাও। তাঁরা দেবতাত্মা হিমালয়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে রয়েছেন। তাঁদের অমর আত্মার প্রতি প্রণাম জানাই।

ব্রেক-ফাস্ট সেরে বেরিয়ে আসি তাঁবু থেকে। প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ফকিরবাবুর লোকজন ঘোড়াওয়ালাদের মালপত্র দিচ্ছে। ঘোড়ার পিঠে মালপত্র বোঝাই হচ্ছে।

তুলতুলের বাবার ঘোড়া ও মায়ের ডাণ্ডি এসে গিয়েছে। তাঁরা রওনা হলেন। রওনা হলেন আরও অনেকে। রওনা হয়ে গিয়েছেনও কেউ কেউ। তবে অশ্বারোহীদের কয়েকজন মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। তাঁদের ঘোড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

গতকাল এখানে পৌঁছবার পরে যথারীতি ঘোড়াগুলোকে ঘাস খেতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। বেশ কয়েকটা ঘোড়াকে খুঁজে পাওয়া যায়নি এখনও। সবচেয়ে দুঃখের কথা দুটি ঘোড়া মারা গিয়েছে।

বায়ুযানের তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে 'জহরীল' নামে একপ্রকার বিষাক্ত তৃণ জন্মায়। ঘাসের সঙ্গে মিশে থাকে জহরীল। প্রতিবছর যাত্রার সময় সেই ঘাস খেয়ে বহু ঘোড়া মারা যায়। এ ঘোড়াদুটিও বিষাক্ত ঘাস খেয়ে মারা গিয়েছে।

দরিদ্র হিমালয়বাসীদের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ঘোড়া। যাদের জমি নেই, তাদের রোজগারের একমাত্র হাতিয়ার ঘোড়া। ঘোড়া মারা যাওয়া মানে সর্বস্বান্ত হওয়া। মৃত ঘোড়ার মালিক তাই কান্নায় ভেঙে পড়েছে। কিন্তু দুঃখের কথা, তার চোখের জল আমার অশ্বারোহী সহযাত্রিণীদের মন ভেজাতে পারছে না। তাঁরা নিজেদের চিন্তায় আকুল। প্রকাশ্যেই বলছেন, "মরার ঘোড়া আর মরার সময় পাইল না। আমরা এখন কেমনে অমরনাথ যাই?"

ফকিরবাবু শান্ত মানুষ। রওনা হবার পরের থেকে তাঁকে কখনও রেগে যেতে দেখিনি। কিন্তু অশ্বারোহিণীদের স্বার্থপরতা তিনিও বরদাস্ত করতে পারলেন না। একটু কর্কশ কণ্ঠে ভদ্রমহিলাদের বললেন, "আপনারা তাঁবুতে গিয়ে বসুন। অন্য ঘোড়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

"কখন আর দেবেন? এদিকে যে আমাগো দেরি হইয়া যাইতে আছে।"

"দেরি হলেও করার কিছু নেই। যখন ঘোড়া পাওয়া যাবে, তখন রওনা হবেন। এখন তাঁবুতে গিয়ে বসুন।"

এবারে বোধহয় ফকিরবাবুর কণ্ঠস্বরের ঝাঁজ ধরা পড়ে তাদের কানে। তাঁরা তাঁবুতে গিয়ে ঢোকেন।

একটু বাদে ফকিরবাবু আবার কথা বলেন। এখন তাঁর স্বরে সেই ঝাঁজ নেই। তিনি ঘোড়াওয়ালাকে দেখিয়ে শান্ত স্বরে সবাইকে বলেন, "এরা বড় গরিব। এমনিতেই উপোস করে। তার ওপরে দুটো ঘোড়াই মরে গিয়েছে। এর সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়? তবু আমি কিছু টাকা দিচ্ছি। আপনারাও যদি সাধ্যমত একে দু-চারটে করে টাকা সাহায্য করেন, তাহলে কিছু ক্ষতিপূরণ হয়।"

বলা বাহুল্য সহযাত্রীরা সবাই ফকিরবাবুর আবেদনে সাড়া দিলেন না। তবে যাঁরা দিলেন, তাঁদের সংখ্যাও কম নয়। আর তাতেই ঘোড়াওয়ালার কান্না থেমে গেল। সে বার বার হাতজোড় করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকল।

বারো

শুরু হল যাত্রা। আজ আমাদের পদযাত্রার তৃতীয় দিন।

বাজার ও তাঁবুর কলোনী ছাড়িয়ে সামান্য উৎরাই পথে আমরা চলেছি এগিয়ে। আমরা মানে কুণ্ডু ট্র্যাভেলস্-এর পদাতিক বাহিনী। আজ আবও দুজন ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছেন। আর মায়া আমাদের সঙ্গে চলেছে। তার মানে এখন আমরা ষোলজন। তুলতুল অবশ্য বলছে আজও সে অন্তত দশজনকে ঘোড়া থেকে নামাবে।

পথের দু-পাশে সংকীর্ণ উপত্যকা। উপত্যকার দু-পাশে পাহাড়ের প্রাচীর। বাঁ-পাশের পাহাড়টা আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে আসছে। ডানদিকের পাহাড়টা মোটামুটি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে—সেই ছোট নদীটার ওপারে। নদীটা এসেছে মহাগুণাস গিরিবর্ত্ম থেকে। গিয়ে পড়েছে শেষনাগে। এরই তীর দিয়ে পুণ্যার্থীরা শেষনাগের তীরে যান। আর এখন আমরা তার তীরপথ ধরে শেষনাগ থেকে মহাগুণাসে চলেছি।

বাঁদিকের পাহাড়টা একেবারে পথের পাশে এসে হাজির হয়েছে। তাই পথটা বাঁক নিয়েছে ডাইনে। একটা কাঠের সাঁকো পেরিয়ে নদীর অপর পারে এলাম। তারপরে আবার এগিয়ে চললাম সামনে।

বস্তুতপক্ষে বায়ুযান উপত্যকাটি শেষ হল এখানে। শুরু হল চড়াই। পাহাড়ের গা বেয়ে চড়াই পথ। বাঁয়ে নদী, ডাইনে পাহাড়। আমরা সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছি। শুধু আমরা নয়, সবাই। পেছনে ফিরে তাকাই—ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। পদাতিক ও অশ্বারোহীদের আঁকাবাঁকা শোভাযাত্রা। তাঁবুর কলোনী পর্যন্ত প্রসারিত। তারপরে শেষনাগ।

না, শেষনাগকে দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে। তাকে অনুভব করা যাচ্ছে। শুধু আজ নয়, চিরদিন। আমরণ শেষনাগ আমার অনুভূতিতে দৃশ্যমান হয়ে রইবে।

পথের পাশে একটা সাইনবোর্ড—

'Holy cave	11 miles
Panchtarni	7 "
Pahalgam	19 "
Srinagar	78 "

তার মানে প্রায় এক মাইল হেঁটেছি। আরও সাত মাইল হাঁটতে হবে। আজ পঞ্চতরণী চলেছি। পঞ্চতরণী এপথের শেষ শিবির।

এখনও রোদের পরশ পাইনি। পাব কেমন করে? সবে তো আটটা বাজে। তবে দূরে রোদ দেখা যাচ্ছে। উচ্চ-হিমালয়ে রোদের আরেক নাম জীবন। ওখানে জীবনের উষ্ণতা, এখানে মৃত্যুর শীতলতা। অতএব তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলি।

সেই খোঁড়া ভদ্রলোক পিঠে বোঝা নিয়ে ক্রাচ-এ ভর করে এগিয়ে আসছেন। তিনি কাছে এলেন। আজও বলে উঠলেন—"জয় বাবা অমরনাথ!"

"জয়!" আমরাও জয়ধ্বনি করি।

তিনি একবার একটু থামেন। ক্রাচ্-এ ভর করে দাঁড়ান। একখানি হাত কপালে ঠেকিয়ে আমাদের নমস্কার করেন। তারপর হাসিমুখে এগিয়ে চলেন সামনে। আমরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি তাঁর দিকে। স্বাস্থ্যবান প্রৌঢ়। গায়ের রংটি কালো হলেও ভদ্রলোক বেশ সুশ্রী। মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি। তাতে তাঁর মুখখানি আরও সরল এবং নিষ্পাপ হয়ে উঠেছে।

তাঁর একখানি পা, আমাদের দুখানি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ক্রমেই আমাদের দূরত্ব বাড়ছে। তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন, আমরা পেছিয়ে পড়ছি। কি করব? হিমালয়ের পথে পথিককে পরিচালনা করে যে মন, ওঁর সেই মন আমাদের চেয়ে অনেক বেশি গতিশীল।

শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছি রোদে। প্রভাতী সূর্যের সোনালি পরশ ভারি মিঠে লাগছে। আমরা রোদে স্নান করতে করতে চলেছি এগিয়ে।

নদীটা তেমনি সঙ্গে সঙ্গে চলেছে। ওপারে নদীর গা ঘেঁষে খাড়া পাহাড়। এপাশে পাহাড়টা একটু দূরে। নদী আর পাহাড়ের মাঝখানে পথ—অমরতীর্থের পথ। ওপারে পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে তুষার প্রবাহ—হিমবাহ। কোথাও কোথাও গ্রাবরেখা। এপারের পাহাড়ে বরফ প্রায় নেই বললেই চলে, শুধু পাথর আর মাটি। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ফুটে আছে রঙিন ফুল। তারা বাতাসে দুলছে। ফুলের দোলা দেখতে দেখতে চলেছি এগিয়ে।

একটার পর একটা পাহাড় পেরিয়ে এগিয়ে চলেছি। বেশ কিছুক্ষণ একটানা চড়াই পেরোতে হচ্ছে। সকলেই শ্রান্ত। কিন্তু পথের পাশে প্রথম বসে পড়লেন সরকারদা। আমরাও অনুসরণ করি তাঁকে।

ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। হিমালয়ের হিমেল হাওয়া প্রাণ-প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। সুতরাং সরকারদা কয়েক মিনিট বাদেই আবার উঠে দাঁড়ান। আমাদের দিকে একবার তাকিয়ে তিনি এগিয়ে চলেন। এবারেও আমরা অনুসরণ করি তাঁকে।

কেবল কঠিন নয়, পথ খানিকটা দুর্গমও বটে। পাশের পাহাড়ের গা বেয়ে এখানে-ওখানে অবিরত জল পড়ছে। কোথাও কাদা, কোথাও পেছল। কখনও কয়েক পা নিচে নামছি, আবার কখনও অনেকটা করে ওপরে উঠছি। অতি সাবধানে লাঠি ঠুকে ঠুকে পথ

চলতে হচ্ছে।

সবচেয়ে দুঃখের কথা এখন আব ফুলদলের সঙ্গে দেখা হচ্ছে না, তারা গিয়েছে হারিয়ে। না হারিয়ে উপায় কি? পথের পাশের পাহাড়গুলো যে প্রায় সবাই ন্যাড়া—রুক্ষ পাথুরে পাহাড়। কাঁটাগাছ পর্যন্ত জন্মাতে পারে নি।

আমরা ফকিরবাবুর মেহমান। থাকা-খাওয়ার দুশ্চিন্তা নেই আমাদের। যাঁরা আমাদের মতো ভাগ্যবান নন, অর্থাৎ নিজেরাই দল বেঁধে যাত্রায় এসেছেন, তাঁদের অনেকেই যথাসাধ্য জুনিপারের গাছ বয়ে নিয়ে চলেছেন। পথ চলতে চলতে পথের পাশ থেকে তুলে নিয়েছেন।

জুনিপার উচ্চ হিমালয়ের একপ্রকার ছোট-ছোট জংলী গাছ। পাতায় ধূপের মৃদু সৌরভ। তাই পাহাড়ীরা বলে ধূপ গাছ। তুষারপাতের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য প্রকৃতি উচ্চ-হিমালয়ে গাছপালার পাতার প্রচুর পরিমাণে তৈলাক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। জুনিপারের পাতায় তেলের ভাগটা খুবই বেশি। তাই জুনিপার কাঁচা অবস্থাতেও বেশ ভাল জ্বলে।

যাত্রীরা জুনিপার নিয়ে চলেছেন। কারণ তাঁরা শুনেছেন, পঞ্চতরণী বৃক্ষলতাহীন রুক্ষ প্রান্তর। সেখানে জ্বালানীর বিশেষ অভাব।

শেষনাগের সেই নদীটা এখনও ডাইনে রয়েছে, কখনও কাছে আসছে, কখনও বা দূরে সরে যাচ্ছে। আমরা কিন্তু সর্বদা রয়েছি তার সঙ্গে সঙ্গে। না থেকে উপায় নেই যে! শেষনাগের এই সুন্দরী স্রোতস্বিনী আমাদের পৌঁছে দেবে মহাগুণাস গিরিবর্ত্মে।

পথটা বাঁয়ে বাঁক নিল। এখন আমরা একটি প্রায় সমতল সবুজ উপত্যকার ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছি। উপত্যকার বুক চিরে একটা ঝরনা যাচ্ছে বয়ে। জায়গাটি ভারি সুন্দব। একখানি বোর্ডে লেখা রয়েছে—

'Wavbal Top
Ht. 13,500 ft'

সবুজ উপত্যকাটি পেরিয়ে এসেছি বেশ কিছুক্ষণ। তারপর শুরু হয়েছে চড়াই।

পথের পাশে আবার সাইনবোর্ড। দূরত্ব নির্দেশক এই সাইনবোর্ডগুলো দেখলেই খুশি হয়ে উঠি। কারণ সাইনবোর্ড মানেই আরেক মাইল পথ কমে গেল। এটিতে লেখা রয়েছে।—

'Holy Cave 10 miles
Panchtarni 6 "

অতএব আমরা শেষনাগ থেকে দু-মাইল পথ এসেছি। দু'ঘণ্টা সময় লেগেছে। চড়াই পথ হলেও এত সময় লাগা উচিত ছিল না। কিন্তু কি করব? সহযাত্রীদের অধিকাংশ অনভিজ্ঞ, তার ওপরে সরকারদা আজ ভাল হাঁটতে পারছেন না।

আস্তে চলার আরও কারণ রয়েছে। আমরা যে চারিদিক দেখতে দেখতে পথ চলেছি। সহযাত্রীরা গতকালের মতোই উদাস হয়ে পড়েছেন। মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ। বেশ চড়া রোদ উঠেছে। কিন্তু গরম লাগছে না। লাগবে কেমন করে? সেই হিমেল হাওয়াটা যে এখনও রয়ে গিয়েছে।

উদাস হবার মতোই বটে। চড়াই পথ বেয়ে আমরা একটি প্রায় সমতল সংকীর্ণ ও

সবুজ উপত্যকায় উপনীত হয়েছি। চারিপাশ পাহাড়ে ঘেরা রমণীয় অধিত্যকা। নদীটা পাশের পাহাড়ের পরপারে পালিয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাতে এই রমণীয় উপত্যকার কোন ক্ষতি হয়নি। এখানে যে একটি চমৎকার ঝরনা রয়েছে। উপত্যকার বুক বেয়ে সে কলকল ছলছল করে ছুটে চলেছে।

একজন মধ্যবয়সী মহিলা ঝরনার তীরে চোখ বুজে বসে রয়েছেন। পাশে একখানি বাংলা শিবপুরাণ। ভদ্রমহিলা ধ্যান করছেন কি?

করতেই পারেন। ধ্যান করার উপযুক্ত স্থানই বটে। প্রকৃতির এমন অনন্ত ও অপরূপ পরিবেশেই তো জীবাত্মার পরমাত্মায় বিলীন হওয়া সহজ।

ঝরনার মিঠে জল পান করে তেষ্টা মেটাই। তারপরে শুরু করি পথ চলা।

আবার চড়াই পথ। গৌরীর ঘোড়াওয়ালা জানায়—এই জায়গাটার নামই আষাঢ়ঢাকি।

বেলা দশটা। ইতিমধ্যে উঠে এসেছে অনেক ওপরে। এখান থেকে পেছনে ফেলে আসা পথ ও প্রান্তরকে ছবির মতো সুন্দর দেখাচ্ছে।

"একটু বসবে নাকি?" সরকারদা আবার বলেন। তাঁর শরীরটা আজ সুবিধের নয়।

"বসলে তো ভালই হয়।" ব্রহ্মচারী বলে ওঠে মাঝখান থেকে।

"কেন তোমারও কি আবার শরীর খারাপ হল নাকি?" অসীম জিজ্ঞেস করে।

"না।" ব্রহ্মচারী উত্তর দেয়। "বসলে একটু ভাল করে নিচের উপত্যকাটি দেখা যেত।"

অতএব বসতে হয়। বসে বসে নিচের উপত্যকাটি দেখতে থাকি। সহসা সুর করে ব্রহ্মচারী বলে ওঠে,

"রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্যুৎশুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি॥"

থামে ব্রহ্মচারী। আমরা ওর দিকে তাকাই। সে নিজের থেকেই বলতে থাকে, "মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটকের পঞ্চম অঙ্কে এই শ্লোকটি রয়েছে। এখানে রাজা আপন মনে বলছেন—রমণীয় বস্তু দর্শন ও মধুর শব্দ শুনে সুখী লোকও উদাসী হয়ে পড়ে। হৃদয়ের অতি গভীরে নিবদ্ধ জন্মান্তরের কোন প্রিয় স্মৃতি যেন আপনা থেকেই তার মনে জেগে ওঠে।"

শুরু করি পথচলা। কিন্তু কয়েক মিনিট বাদেই আবার থামতে হয়। আমরা আরেকখণ্ড প্রায় সমতল প্রান্তরে উঠে এসেছি। তবে আগের সমতলের সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। এটি উপত্যকা নয়, অনেকটা গিরিবর্ত্মের মতো।

তুলতুল তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করে, "চড়াইটা কি ফুরিয়ে গেল?" তার কণ্ঠস্বরে আন্তরিক প্রত্যাশা।

তাহলেও মনের মতো উত্তর দিতে পারি না। শুধু বলি, "সামনের ঐ সাইনবোর্ডটার কাছে গেলেই বুঝতে পারা যাবে।"

"সাইনবোর্ড! আরে তাই তো! চলুন তাড়াতাড়ি যাওয়া যাক্।"

না, তুলতুলের অনুমান মিথ্যে নয়। সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে।

'Mahagunas top
Ht. 14,500 ft.
You are at the highest
point on this route.'

শুধু এ পথের নয়। ভারতের আর কোন গিরিতীর্থে যেতে এত উঁচু গিরিপথ পেরোতে হয় না।

হাতের লাঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তুলতুল মাটিতে বসে পড়ে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে, "বাঁচা গেল, আজ আর চড়াই ভাঙতে হবে না।"

স্বস্তি তার একার নয়, আমরাও আশ্বস্ত। সুতরাং সবাই বসে পড়ি। বসে বসে মহাগুণাস শিখরের সৌন্দর্য দেখতে থাকি। চারিদিকে ছড়িয়ে আছে বিচিত্র বর্ণের পাথর। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ফুটে আছে নানা রঙের ফুল।

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো রঙের বিরাট একখানি মসৃণ পাথর। মনে হচ্ছে তুষারপাতের পরেও এর মাথাটি জেগে থাকে বরফের ওপর। এবং মসৃণতার জন্য সেখানে তেমন বরফ পড়তে পারে না। ফলে সীমাহীন সাদার মাঝে কালোরূপে গিরিবর্ত্মের নিশানা হয়ে থাকে এই পাথরখানি। আর এটি কেবল এই গিরিবর্ত্মের বৈশিষ্ট্য নয়, হিমালয়ের অধিকাংশ গিরিবর্ত্মে পথিকের প্রয়োজনে প্রকৃতি এমনি ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

ভক্তরা অবশ্য বলেন, এখানি সাধারণ পাথর নয়—শিলারূপী জনৈক প্রকৃতি-প্রেমিক সন্ন্যাসী। আর তাই প্রকৃতি সাড়ে চোদ্দ হাজার ফুট উঁচুতেও ফুল ফুটিয়েছেন—সন্ন্যাসীকে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করছেন।

সেই কথাই জিজ্ঞেস করে অশোক। পরিতোষবাবু উত্তর দেন, "আপনি ঠিকই শুনেছেন। সে সত্যযুগের কথা। একজন সত্যান্বেষী সন্ন্যাসী এলেন এখানে, অমরনাথের যাত্রায়। কিন্তু তিনি বাবা অমরনাথকে দর্শন করতে পারলেন না।"

"কেন?" গৌরী প্রশ্ন করে।

পরিতোষবাবু জবাব দেন, "তাঁর যে আর যাওয়াই হল না এখান থেকে। প্রকৃতিপ্রেমিক সন্ন্যাসী ওখানে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির অপরূপ রূপসুধা পান করতে থাকলেন। দিন থেকে মাস, মাস থেকে বছর, বছর থেকে যুগ কেটে গেল। যুগের পর যুগ অতিবাহিত হল, কিন্তু তাঁর রূপতৃষা মিটল না—আজও মেটেনি। ইতিমধ্যে কেবল তাঁর রক্ত-মাংসের দেহটা প্রস্তরীভূত হয়ে গিয়েছে।"

একবার একটু থামেন পরিতোষবাবু। তারপরে আবার বলেন, "এই পাথরখানি সেই সৌন্দর্যপাগল ঋষি। আজও তিনি মহাগুণাসের সৌন্দর্য দর্শন করে চলেছেন।"

চুপ করলেন পরিতোষবাবু। সঙ্গীরা সবাই নীরব।

মনে পড়ছে প্রবোধদার সেই কথাগুলো। তিনি এই পাথরখানির বর্ণনা প্রসঙ্গে 'দেবতাত্মা হিমালয়ে' লিখেছেন, 'পথের বাঁদিকে একটু পাশে সেই ঋষির আয়তন পাহাড়ের সঙ্গে মিশে একাকী দাঁড়িয়ে। আমরা স্তব্ধ, বিমূঢ়...আমরা যেন অনেকটা মায়াচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সেই আয়তনকে এককালের ঋষি বলে ভাবতে লাগলুম। বিচিত্র বর্ণের

পাথরে, নানা রঙের ফুলে লতায় গুল্মে ও শিকড়ে এবং পরিশেষে মানব-অবয়বের কল্পনায় দৃশ্যটা অভিনব সন্দেহ নেই।'

আমরাও অপলক নয়নে তাকিয়ে আছি পাথরখানির দিকে। একটু বাদে নীরবতার অবসান করি। বলি, "স্থানীয় লোকদের ধারণা এই পাথরখানি অমরতীর্থের দ্বারী। তাঁরা মহাগুণাসকে বলেন নগরপাল! তাই এখানে এসে তাঁর অনুমতি নিয়ে অমরলোকে প্রবেশ করতে হয়। আসুন আমরাও প্রণাম করি সেই মহর্ষিকে। পথের নিরাপত্তার জন্য তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। তাঁকে বলি—তুমি আমাদের কৃপা করো। আমরা যেন অমরনাথজীর সুধালিঙ্গ দর্শন করে নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরে যেতে পারি।"

ভাগনে ও অসিতের ছবি তোলা শেষ হল। আমরা উঠে দাঁড়াই। এবারে রওনা হতে হবে। এখনও পাঁচ মাইল পথ বাকি। তবে আজকের মতো কষ্টকর পথ শেষ হয়েছে। তিন মাইলে দু'হাজার ফুট চড়াই ভেঙেছি। এবারে উৎরাই। পাঁচ মাইলে তিন হাজার ফুট উৎরাই পেরোতে হবে। পঞ্চতরণীর উচ্চতা ১১,৫০০ ফুট।

রওনা দিতে গিয়ে বাধা পাই। সামনের তিনটি শৃঙ্গ দেখিয়ে তুলতুলের ঘোড়াওয়ালা বলে, "ওঁরা হচ্ছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর। আর ঐ দেখুন শিবের জটা থেকে মা-গঙ্গা অবতরণ করছেন।"

লোকটি ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে বলছে। তবু ওর ভাষা ও কণ্ঠস্বরে বিস্মিত হই। সে মুসলমান কিন্তু কথাগুলো বলল শ্রদ্ধাভরা স্বরে।

তাকাই শৃঙ্গ তিনটির দিকে। আমরা নীরবে দর্শন করি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে। কিন্তু নীরব থাকে না ব্রহ্মচারী। সে বলে ওঠে,

"নাদোপাসানয়া দেবাঃ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ।
ভবন্ত্যপাসিতাঃ নূনং যস্মাদতে তদাত্মকাঃ॥"

"শ্লোক তো শুনলাম।" ব্রহ্মচারী থামতেই অসীম বলে, "কিন্তু বামুনের ছেলে হয়েও স্বীকার করছি কিছুই বুঝতে পারলাম না। অতএব হে পণ্ডিত! অর্থম্ পরিবেশনং কুরু।"

অসীমের ভাষা ও ভঙ্গিতে সবাই হেসে ওঠে।

হাসি থামলে ব্রহ্মচারী বলে, 'এটি নাদব্রহ্ম প্রসঙ্গে সঙ্গীতরত্নাকরের শ্লোক।"

"তা তো বুঝলাম, অর্থটা কি?"

"এই শ্লোকে বলা হয়েছে," ব্রহ্মচারী বলতে থাকে, "নাদ-সাধনার ফলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর নাদাত্মক ও সকলের আরাধ্য হয়ে উঠেছেন।"

অসীম কি যেন বলতে যাচ্ছিল কিন্তু পেরে ওঠে না। হঠাৎ একটা সমবেত সঙ্গীত শুনতে পাই। কারা যেন গাইছেন—

'দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!'

তাড়াতাড়ি পেছন ফিরি, দেখতে পাই ওঁদের। সবার আগে ফকিরবাবু, সবার শেষে মিসেস মণ্ডল মাঝখানে কয়েকজন নারী ও পুরুষ সহযাত্রী। ওঁরা গান গাইতে গাইতে ঘোড়ায় চড়ে চড়াই ভাঙছেন। আমাদের দেখতে পেয়ে হাত নাড়ছেন আর গাইছেন—

'গিরি-সঙ্কট, ভীরু যাত্রীরা, গুরু গরজায় বাজ,
পশ্চাৎ-পথ-যাত্রীর মনে সন্দেহ জাগে আজ।
কাণ্ডারী! তুমি ভুলিবে কি পথ? ত্যাজিবে কি পথমাঝ?
ক'বে হানাহানি তবু চলো টানি নিয়াছ যে মহাভার।...

ওঁরা কাছে আসেন। ফকিরবাবু ও মিসেস মণ্ডল ঘোড়া থেকে নেমে পড়েন। ফকিরবাবু অন্যান্য অশ্বারোহীদের এগিয়ে যেতে বলেন। তাঁরা সারি বেঁধে এগিয়ে চলেন।

ভাগনে ও অসিত আবার ক্যামেরা খোলে। ওঁরা আমাদের সঙ্গে ছবি তোলেন! ফকিরবাবু তুলতুলকে বলেন, "আজও আমরা তোমার সঙ্গী হতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি পঞ্চতরণী না পৌঁছতে পারলে, সেখানে আবার খাবার সময় গোলমাল শুরু হয়ে যাবে।"

"ঠিক আছে।" তুলতুল মাথা নাড়ে। বলে, "আমরা ঘোড়া থেকে নামাবার আরও লোক পাব। এখনও তাঁদের কোমর ব্যথা হয় নি, এইবার শুরু হবে।"

হাসতে হাসতে ফকিরবাবুরা ঘোড়ায় চাপেন। তাঁরা এগিয়ে যান। আমরাও শুরু করি পথ-চলা। পথের পাশে তেমনি পাথর আর টিনের চালা। সরকারী ভাষায়—Shelter Shed চারটি আশ্রয়-নিবাস আছে এখানে।

যে নদীটির তীরপথ অবলম্বন করে আমরা শেষনাগ থেকে এখানে এসেছি, সেটি সৃষ্ট হয়েছে মহাদেবের জটা থেকে। সুতরাং সে রয়ে গেল এখানে। আমরা বিদায় নিলাম তার কাছে থেকে।

এতক্ষণ সে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। তাকে ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে, তবু যেতে হবে। তাই বিদায় বেলায় তার জন্মস্থানটি আরেকবার দেখি—মহেশ্বরের মাথা থেকে তুষার প্রবাহ নেমে এসেছে নিচে, তার গা বেয়ে পাদদেশে নেমেছে। সেই হিমবাহ থেকে জন্ম নিয়েছে নদীটি।

তাকে বলি—তুমি দুঃখ কোরো না। আগামীকাল আমরা আবার ফিরে আসব তোমার কাছে। তুমিই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেয়ো শেষনাগ।

নদী ছাড়া গতি নেই হিমালয়-পথিকের। শেষনাগের নদীটি রয়ে গেল এখানে। সঙ্গী হল আরেকটি নদী—মহাগুণাসের নদী। সে আমাদের নিয়ে যাবে পঞ্চতরণীতে। এতক্ষণ আমরা এসেছি নদী-প্রবাহের বিপরীত দিকে, এবারে নদীটি চলেছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে।

প্রায়-সমতল গিরিবর্ত্মটি শেষ হয়ে গেল, শুরু হল উৎরাই। তবে পথটি মোটেই খাড়া নয়। ধীরে ধীরে নিচে নামছি। সুন্দর ও সহজ পথ।

তাহলে তুলতুলের আশা পূর্ণ হয়েছে। উৎরাই দেখে বেশ কয়েকজন অশ্বারোহী সহযাত্রী ভয় পেয়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়েছে। ওদের মধ্যে রয়েছে অজিত, বৌমা ও ডাক্তার ভট্টাচার্য এবং আরও অনেকে।

আমরা ইতিমধ্যে বোধকরি হাজারখানেক ফুট নেমে এসেছি। এই নামা ওঠাটাই অমরনাথ পথের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আজ সকালে ১২,৫০০ ফুট থেকে যাত্রা শুরু করে ১৪,৫০০ ফুটে উঠেছি। এবারে নেমে যাব ১১,৫০০ ফুট উঁচু পঞ্চতরণীতে। আগামীকাল সেখান থেকে যাত্রা করে আবার উঠব, ১৩,৫০০ ফুটে—অমরতীর্থ-অমরনাথে।

এই ওঠা-নামা নিঃসন্দেহে কষ্টকর। হিমালয়ের দুর্গম পথে, যেখানে মাথার ঘাম

পায়ে ফেলে চড়াই ভাঙতে হয়, সেখানে এটি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কারণ নামা মানেই আবার উঠতে হবে। কিন্তু এরও একটা সুফল আছে। পথ একটানা চড়াই কিংবা উৎরাই হলে পা-দুখানি বিষের টুকরো হয়ে ওঠে, অচল হয়ে পড়ে। আর চড়াই উৎরাই মেশানো পথ হলে, পা দু'খানি সচল থাকে।

"মা! মা এসে গিয়েছ?"

"হ্যাঁ বাবা। আমি পায়ে হেঁটে মহাগুণাস পেরিয়েছি।" গৌরী উত্তর দেয়।

তাকিয়ে দেখি প্থের পাশে একখানি পাথরের ওপর শুয়ে আছেন তারাপীঠের সেই সাধুবাবা। গতকাল গৌরীর সঙ্গে তিনি অনেকটা পথ চলেছেন।

সাধুবাবা শুয়ে শুয়ে আপেল খাচ্ছেন। গৌরী গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ায়। কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, "আপনি ভাল আছেন বাবা?"

না, সে প্রশ্নের উত্তর দেন না সাধুবাবা। তিনি হঠাৎ বলে ওঠেন, "জানো আমাব ভাই Press Editor. আমি ফিরে গিয়ে তাঁকে লিখতে বলব— This bloody State Govt. belongs to the Capitalists."

তীর্থপথ পরিক্রমা করতে করতে হঠাৎ সাধুবাবা সরকারের ওপর কেন ক্ষেপে গেলেন বুঝতে পারছি না। তাঁর সম্পাদক ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় নেই আমাদের। কিন্তু তিনি তাঁর দাদার আদেশ পালন করবেন বলে মনে হচ্ছে না। আর যদি সত্যই পালন করেন, তাহলেও আমাদের করার কিছু নেই। অতএব গৌরীকে ইশারা করে এগিয়ে চলি।

তেমনি উৎরাই পথ। পথের পাশে আবার সাইনবোর্ড—

'Holy Cave—9 miles
Panchtarni– 5 "

মহাগুণাস থেকে এক মাইল এসেছি। পৌঁছেছি এক টুকরো তৃণাচ্ছাদিত সমতলে। জায়গাটি ভারি সুন্দর। মনে হচ্ছে সবুজ গালিচা দিয়ে ঢেকে রেখেছে কেউ। ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে ফুটে আছে অসংখ্য ছোট-ছোট রঙিন ফুল। এগিয়ে চলি।

আরেকটি উপত্যকা। দু-দিকেই পাহাড়। নানা রঙের পাহাড়। কোনটি ঘাসে ছাওয়া সবুজ পাহাড়, কোনটি নিরেট পাথরের কালো কিংবা ধুসর পাহাড়। প্রান্তরের বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে একটি রুপোলী ঝরনা।

ঝরনার পাশে পাশে পথ। পথের ধারে সাইনবোর্ড—

'Poshpather (Flower Meadow)
Holy Cave 8 Miles.'

তাহলে এটাই পুষ্পত্রী অর্থাৎ স্থানীয়দের পৌষপাত্থর। এখানকার উচ্চতা ১২,৫০০ ফুট। এখান থেকে অমরতীর্থ ৮ মাইল, অর্থাৎ আমরা আজ চার মাইল হেঁটেছি। আরও চার মাইল হাঁটতে হবে। সাড়ে এগারোটা বাজে, চার ঘণ্টায় চার মাইল এসেছি। সবাইকে নিয়ে আসতে হয়েছে। ভালই হেঁটেছি। এবারে একটু বসা যেতে পারে।

এখানেও দুটি আশ্রয়-নিবাস রয়েছে। কিন্তু ওটা কি? সবারই নজর পড়ে।

প্রথম বলেন পরিতোষবাবু, "ওটা কি চায়ের দোকান নাকি?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।" ভাগনে ভাল করে দেখে নিয়ে বলে।

"তাহলে চলো, গিয়ে বসা যাক ওখানে। সরকারদা জোরে জোরে পা চালান। গবম পানীয়ের নাম শুনে তাঁব বোধ হয় পায়ের ব্যথা সেবে গেল।

দোকানের সামনে আসি। হ্যাঁ চায়ের দোকানই বটে। এখন আমাদের দলটি রীতিমতো ভারী। প্রায় পঁচিশজন। তুলতুল কথা রেখেছে—হেঁটে যাবার সুবিধে সম্পর্কে কয়েকটি বক্তৃতা দিয়ে প্রায় জনদশেক অশ্বারোহীকে পদাতিকে পরিণত করেছে এবং তাদের মধ্যে অজিত ও বৌমা, মিস্টার ও মিসেস বোস এবং শ্রীযুক্ত শালীবাহন রয়েছেন।

এতগুলো মানুষ তবু তুলতুল বলে, "আমি চায়ের দাম দেব।"

"কেন তুমি সবার ছোট বলে?" মামা জিজ্ঞেস করে।

"না। আমি চা খাই না বলে।" তুলতুল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়।

"কিন্তু তোমার অতিথিদের সম্মানে তোমার এখন একগ্লাস চা খাওয়া উচিত হবে।" অশোক অভিমত দেয়।

"তার মানে তুমি ওর আতিথ্য মেনে নিলে?' অসীম প্রশ্ন করে।

অশোক একটু ঘাবড়ে যায়। বলে, "না, মানে যখন খাওয়াতে চাইছে..."

"তখন আর আমাদের খেতে দোষ কি?" ব্রহ্মচারী যোগ করে।

চা খেয়ে আবার এগিয়ে চলি উৎরাই পথে। পথের একপাশে পাহাড়, আরেকপাশে পাহাড়ী নদী। নদীর ওপারে আবার পাহাড়। পাহাড়ের পাশে কিছু ঝোপঝাড় রয়েছে। বহু ভেড়া-ছাগল খাওয়া-দাওয়া সেরে নিচ্ছে সেখানে। তারা অক্লেশে পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা-নামা করছে।

তুলতুলের বোধহয় ঈর্ষা হচ্ছে ওদের দেখে! সে হঠাৎ বলে ফেলে, চারটে পা থাকলে আমরাও ওদের মতো ভাল Climber হতে পারতাম।"

"কিন্তু তাহলে যে তোমাকেও সবাই চতুষ্পদ বলত?"

সবাই আমার প্রশ্ন শুনে হেসে ওঠে। বেচারি তুলতুল লজ্জা পেয়ে নীরব হয়। সে জোরে-জোরে পা ফেলে সবার আগে এগিয়ে যায়। সহাস্যে বলি, "পাহাড়ের দিকে নজর রেখে পথ চলো। ওপরে ভেড়া চড়ছে, তাদের পায়ে লেগে যে-কোন সময় পাথর গড়াতে পারে।"

বেলা সওয়া বারোটা। অনেকটা পথ প্রায় খাড়া নেমে আসতে হয়েছে। কারণ এখুনি কাঠের সাঁকো পেরিয়ে ওপারে যেতে হবে।

নদী পেরিয়ে চড়াই পথ—পাথুরে পথ। পাথর বলতে বিরাট-বিরাট পাথর—boulders পথের ওপর মুখ থুবড়ে আছে। তার মানে পাশের পাহাড় থেকে তারা নেমে এসেছে পথে। সুতরাং এ-পাহাড়ে ভেড়া না চড়লেও সাবধানে পথ চলতে হয়।

গত দুদিন ধরেই দেখছি ওদের! আজও দেখা হল পথে। ওরা বাঙালী। ছেলেটি যুবক, মা ও স্ত্রীকে নিয়ে অমরনাথে চলেছে। মা খুবই বৃদ্ধা তবু ঘোড়া নেন নি। স্ত্রী চলেছে আগে আগে। মাঝখানে মা, তার পেছনে ছেলে। গত দুদিন যখনই দেখা হয়েছে, শুনেছি ছেলে মাকে পথ চলায় উৎসাহ দিচ্ছে। আস্তে আস্তে বলছে—এই তো এসে গিয়েছ, কষ্টের পথ পেরিয়ে এসেছ। আর সামান্যই বাকি।

কিংবা বলছে—তুমি ভয় পাচ্ছ কেন মা? পথ তো এমন কিছু কঠিন নয়। না পারলে বলো, আমি তোমাকে ধরছি।

আজ ছেলে বলছে, "ঘোড়াভাড়ার টাকা না থাকলে কি মানুষ তীর্থে যাবে না? তোমার চেয়ে বুড়ো, তোমার চেয়ে দুর্বল কত মানুষ বাবা অমরনাথকে দর্শন করে এলেন! তুমিই তো সেই খোঁড়া ভদ্রলোককে আজ সকালে দেখলে, সেই অন্ধ বৃদ্ধকেও ফিরে যেতে দেখলে! তাঁরা যদি পারেন, তুমি কেন পারবে না?"

"পারব না তো আমি বলি নি বাবা!" মা বলেন, "পারব, নিশ্চয়ই পারব। তবে আমি যে বড্ড আস্তে আস্তে চলছি, তোর আর বৌমার অসুবিধে হচ্ছে।"

"না মা!" পুত্রবধূ থেমে পেছন ফেরে। শাশুড়িকে বলে, "অসুবিধে হবে কেন? আপনি তো আমাদের সঙ্গে সমানে পথ চলেছেন। তাছাড়া হিমালয়ের পথে খুব তাড়াতাড়ি পথ চলার কোন মানে হয় না। দেবলোকে এসেছি, চারিদিক একটু ভাল করে দেখে নিতে হবে তো!"

ছেলে-বউ এমনি কথাবার্তায় ব্যস্ত রেখে বৃদ্ধাকে আস্তে আস্তে নিয়ে চলেছে অমরতীর্থের পথে। মনে মনে পুত্র ও পুত্রবধূকে ধন্যবাদ দিয়ে এগিয়ে চলি।

পাহাড়ের গা বেয়ে একটা ঝরনা নেমে এসে পাহাড়ী নদীতে মিশেছে। ঝরনার ওপরে কাঠের সাঁকো। পেরিয়ে এলাম।

সরকারদা আজ একেবারেই হাঁটতে পারছেন না। ক্রমেই পেছিয়ে পড়ছেন। আমাকেও আস্তে আস্তে হাঁটতে হচ্ছে তাঁর সঙ্গে। একটু একটু করে সহযাত্রীদের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে আমাদের।

তেরো

শেষ পর্যন্ত ছেলে-বউকে নিয়ে সেই বৃদ্ধাও ছাড়িয়ে গেলেন আমাদের। কি করব? সরকারদার আজ খুব কষ্ট হচ্ছে পথ চলতে। তবে তিনি মোটেই মনোবল হারিয়ে ফেলেননি। বরং বারবার আমাকে বলছেন, "তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে আমার জন্য। তুমি এগিয়ে যাও, আমি আস্তে আস্তে ঠিক পৌঁছে যাব।"

কেমন করে ওঁকে বলি—সহযাত্রীদের ফেলে এগিয়ে যাওয়া হিমালয়-পদযাত্রীর ধর্ম নয়। শুধু জানাই, "সরকারদা, আমি তো পঞ্চতরণীতে অফিস করতে যাচ্ছি না। 'লেট' হবার ভয় যখন নেই, তখন চলুন একসঙ্গেই যাওয়া যাক।"

'Holy Cave– 6 miles
Panchtarni– 2 "

সাইনবোর্ডটায় চোখ পড়তেই সরকারদার মুখে হাসি ফুটে ওঠে। বলেন "তাহলে আর দু-মাইল।"

"হ্যাঁ, মাত্র দু-মাইল।" আমি বলি।

সরকারদা একটু হাসেন। বলেন, "আমার যা 'স্পীড' তাতে তিন ঘণ্টার কমে দু-মাইল যেতে পারব না।"

"না, না। এর পরেই শুনেছি উৎরাই ও সমতল পথ। বড় জোর ঘণ্টা দেড়েক লাগবে। এখন পৌনে একটা, আমরা দুটো নাগাদ পৌঁছে যাব।"

সরকারদা কোন প্রতিবাদ করেন না। আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেন।

আস্তে আস্তে পথ চলে আমার কিন্তু একটা লাভ হয়েছে। আমি ইচ্ছেমতো

ডায়েরি লিখতে পারছি। আর তাই দেখে জনৈক অবাঙালী অশ্বারোহী আমাকে প্রশ্ন করে বসলেন, "Are you counting Yatris?"

কি উত্তব দেব? যাত্রী গুণে আমার কি লাভ? সবিনয়ে শুধু বলি, "না।"

বাঁক ফিরতেই সামনের সব বাধা অপসারিত হল। এতক্ষণ আমরা যে পাহাড়টার ওপর পথ চলেছি, সেটি শেষ হয়েছে এখানে। অনেক নিচে সবুজ ও ধূসর সমতল। সবুজের বুক জুড়ে সাদা আলপনা—আঁকাবাঁকা কয়েকটি ধারা। পাঁচটি তরঙ্গিনী-বিধৌত পঞ্চতরণী।

তারপরে ধূসর উপত্যকা। তার বুক জুড়ে সাদা ও রঙিন তাঁবুর মেলা। উপত্যকার শেষে সাদা ও কালো সারি সারি পাহাড়। জীবনে এমন আশ্চর্য সুন্দর দৃশ্যের খুব কমই সম্মুখীন হয়েছি।

আবার 'দেবতাত্মা হিমালয়'-এর সেই বর্ণনাটি মনে পড়ছে। প্রবোধদা এই পথের সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—'প্রতিঘণ্টায় আবিষ্কার করেছি নতুন দেশ, নতুন জগৎ, নতুন প্রকৃতি। প্রতি মাইল পথ হলো আমাদের জীবনের এক-একটি পরিচ্ছেদ, এক-একটি ইতিহাস। এত অল্প পথে এমন দুস্তর গিরিলোক আগে আমার দেখা ছিল না।'

আমাদেরও নয়। কিন্তু সেকথা না বলে সরকারদার সঙ্গে এগিয়ে চলি। একটা কাঠের পুল পেরিয়ে নদীর অপর পারে আসি। তারপরেই সোজাসুজি নামতে থাকি পঞ্চতরঙ্গিণী-বিধৌত বিচিত্র বর্ণের পঞ্চতরণী উপত্যকায়। আমাদের সঙ্গী নদীটিও এখানে এসে পঞ্চনদীব সঙ্গে মিশে গেল। শুনেছি এই পাঁচটি নদীর নাম—ভীমা, ভগবতী, সরস্বতী, ঢাকা ও বর্গশিখা।

এই পঞ্চনদীর সঙ্গে পাঞ্জাবের কোন সম্পর্ক নেই। এরা অমরগঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়ে সিন্ধ নালা নামে প্রভাহিত হয়েছে। সিন্ধ আর সিন্ধু (Indus) এক নয়। সিন্ধ কাশ্মীর উপত্যকায়। সোনামার্গ এই নদীর উপত্যকায় অবস্থিত। আর সিন্ধু নদ লাদাখে।

এপারে পাহাড়ের গা থেকেই সবুজ উপত্যকা। ওপারে সবুজের শেষে খানিকটা উঁচুতে অনেকখানি পাথুরে সমতল। তারপর পাহাড়। তার মানে উপত্যকাটি দুটি অংশে বিভক্ত—একটি এই ময়দানের মতো ঘাসে ছাওয়া নিচু অংশ, যেখান দিয়ে বয়ে গিয়েছে পাঁচটি নদী। আরেকটি মালভূমির মতো পাথুরে উঁচু অংশ, যেখানে সারি সারি তাঁবু।

আমরা সবুজ সমতলে নেমে এলাম। পথটি পশ্চিম থেকে পূর্বে প্রসারিত। কোমল মাটি ও ঘাসের ওপর পাথর বিছিয়ে পথ। ডানদিকে সমতলের শেষে পাশাপাশি তিনটি ন্যাড়া পাহাড়। তাদের গা বেয়ে হিমবাহ এসেছে নেমে। সেই হিমবাহ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে পঞ্চতরণী পঞ্চতরঙ্গিণী। তাদের পেরিয়েই ওপারে যেতে হবে আমাদের।

তীর্থের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যেক পুণ্যার্থীকে পঞ্চতরঙ্গিণীতে স্নান করতে হয়। আমি পুণ্যার্থী নই, শুধুই দর্শনার্থী। সুতরাং আমি স্নান করব না। তবে এই স্নানের কথা মনে পড়ছে আমার। 'বিশ্বকোষে' পড়েছি—

'যাত্রীরা এইখানে স্নান করে। স্নানের পর বস্ত্র ত্যাগ করিয়া ভূর্জপত্রের বস্ত্র পরে। কেহ কেহ বিবস্ত্র হইয়াই মনের উল্লাসে হর-হর জয়-জয় শব্দ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকে।

স্বামীজীও স্নান করেছিলেন এখানে। এ সম্পর্কে ভগিনী নিবেদিতা লিখেছেন,

'এখানকার ঠাণ্ডাও বেশ শুষ্ক এবং প্রীতিপদ ছিল। ছাউনীর সম্মুখে এক কঙ্করময় শুষ্ক নদীগর্ভ, উহার মধ্য দিয়া পাঁচটি তটিনী চলিয়াছে। ইহাদের সকলগুলিতেই, একটির পর অপরটিতে ভিজা কাপড়ে হাঁটিয়া গিয়া যাত্রীগণের স্নান করার বিধি। সম্পূর্ণরূপে লোকের নজর এড়াইয়া স্বামীজী কিন্তু এই নিয়মটি অক্ষরে অক্ষবে পালন করিয়াছিলেন।'

স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন, 'পঞ্চতরণীর পাঁচটি ধারা পার হয়ে "ভৈরবঘাট" বা "বৈরাগীঘাট" পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত নাতিবৃহৎ মাঠ! এটাই পঞ্চতরণী। এখানে আসতে নদীটিকে পাঁচবার পার হতে হয় বলে জায়গাটার নাম পঞ্চতরণী। দুটি ধারার জল এক হাঁটুর কম। অপরগুলি গভীর ও বেগবতী। কাঠ ও পাথর দিয়ে ধর্মার্থ-বিভাগ পুল করে দিয়েছে।'

অভেদানন্দজী বলেছেন, একটি নদীকে পাঁচবার পার হতে হয়। কথাটা একদিক থেকে সত্য কারণ এই পাঁচটি ধারা, পরে একটি নদী হয়ে গিয়েছে তবে এখানে কিন্তু পাঁচটি ধারা, অনেকের মতে পাঁচটি নদী।

সে যা-ই হোক, আমরা কাঠ ও পাথরের পুলের ওপর দিয়ে একটির পর একটি নদী পেরিয়ে ধীরে ধীরে উপত্যকার উঁচু অংশের দিকে চলেছি। এখান থেকেও তাঁবুগুলো দেখা যাচ্ছে কিন্তু এখনও বহু দূর—মাইল দেড়েক তো বটেই। এটা খুবই কষ্টকর। ক্লান্ত শরীর বিশ্রাম চাইছে। আশ্রয় দেখা যাচ্ছে কিন্তু পৌঁছতে পারছি না।

পেরিয়ে এলাম উপত্যকার নিচু অংশ, উঠে এলাম মালভূমি-সদৃশ উঁচু অংশে। এতক্ষণ পশ্চিম থেকে পুবে এসেছি, এবারে আবার উত্তরে এগিয়ে চললাম। আমাদের বাঁয়ে নদী, ডাইনে পাহাড়—অনেকটা দূরে।

"ওখানে কি হচ্ছে?" সরকারদা প্রশ্ন করেন, "সিনেমা শুটিং নাকি?"

তাই তো! পথ থেকে খানিকটা দূরে পাহাড়ের ধারে মাঠের মধ্যে ঘোড়ার পিঠে বসে রয়েছেন দুজন সুন্দরী যুবতী ও একজন সুদর্শন যুবক। তাঁদের মুখে 'মেক-আপ', পরনে 'কস্টিউম্'। তিনজন লোক 'রিফ্লেক্টার' দিয়ে তাঁদের মুখে আলো ফেলছেন। সামনে ক্যামেরা চলছে।

সুতরাং সরকারদার অনুমান মিথ্যে নয়, ফিল্ম শুটিং হচ্ছে। কিন্তু কোন কাহিনী-চিত্রের শুটিং কি? কি ছবি? বাংলা কি? কে পরিচালনা করছেন? কারাই বা অভিনেতা-অভিনেত্রী? এখান থেকে যে চেনা যাচ্ছে না কাউকে!

তাহলেও মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। হিমালয়ের ছবি হচ্ছে. এখানে এসে শুটিং করছেন। মনে মনে অজস্র ধন্যবাদ জানাই ওঁদের। তারপরে সরকারদাকে বলি, "সিনেমার শুটিং চলেছে। পরে বিস্তারিত জানা যাবে। এখন তাঁবুতে চলুন। দুটো বেজে গিয়েছে, খিদে পেয়েছে।"

"হ্যাঁ, চলো।" সরকারদা বলেন, "আমার জন্যই তোমার এত দেরি হয়ে গেল। একা হেঁটে এলে তুমি অন্তত ঘণ্টা দুয়েক আগে পৌঁছতে পারতে।"

"হয়তো পারতাম। কিন্তু হিমালয়ের দুর্গম পথে লক্ষ্যে পৌঁছনই বড় কথা নয়, সহযাত্রীদের সবাইকে নিয়ে নিরাপদে পৌঁছনই পদযাত্রার প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য। তাছাড়া অভ্যাস না থাকা সত্ত্বেও আপনি যে এই বয়সে পায়ে হেঁটে এই দুর্গম পথ পাড়ি দিচ্ছেন, এটাও তো কম কথা নয় সরকারদা।"

ডানদিকে পথের ধারে একটা বেশ বড় পাহাড়। পাহাড় থেকে ঝরনা নেমে এসেছে। কাঠের পুল পেরিয়ে আমবা ঝরনার অপর পারে আসি। আর এখানেই রয়েছে দুটি সাইনবোর্ড। প্রথমটিতে লেখা—

'Holy Cave– 4 Mıles.'

দ্বিতীয়টিতে— 'Panchatarni
Ht, 11,500 ft
Holy Cave 4 Miles.'

প্রথমটির পেছনে লেখা—

'Srinagar– 85 Mıles
Pahalgam– 26 "

"তাহলে ২৬ মাইল হাঁটলাম!" সরকারদা সহাস্যে বলেন।

"শুধু হাঁটলেন নয়, দুর্গম তীর্থপথের ২৬ মাইল অতিক্রম করলেন।" আমি যোগ করি। মনে মনে ভাবি—আর মাত্র ৪ মাইল। কাল সকালেই পৌঁছব অমরতীর্থে, দর্শন করব অমরনাথজীর সুধালিঙ্গ। আমার বহু বছরের স্বপ্ন সফল হবে।

এগিয়ে চলেছি তাঁবুনগরীর দিকে। দেড়ঘণ্টা ধরে তাকে দেখছি চোখের সামনে, কিন্তু এখনও পৌঁছতে পারলাম না। পদযাত্রীর পক্ষে এর চেয়ে বড যন্ত্রণা আর কি হতে পারে?

শুনেছিলাম পঞ্চতরণী বৃক্ষ-লতা শূন্য বন্ধ্যা প্রান্তর। শুধু আমি নই, শুনেছেন সকলেই। তাই অনেকে পথ থেকে 'জুনিপাব' সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু এখানে এসে দেখছি পঞ্চতরণী মোটেই বন্ধ্যা নয়। ময়দান-সদৃশ নিম্ন উপত্যকায় সবুজ ঘাসের কথা আগেই বলেছি, মালভূমি-সদৃশ এই পাথুরে উঁচু অংশেও ঝোপঝাড় দেখতে পাচ্ছি। পাশের পাহাড়টিতে তো প্রচুর ঘাস। তাই গুর্জর মেষপালকরা ভেড়া-ছাগল নিয়ে এসেছে এখানে। তারা আসছে বহুকাল ধরে। আক্রামবাট মল্লিকও এসেছিলেন এদেরই মতো। আব তাই আজ আমরা এসেছি এখানে—এই পঞ্চতরণীতে। চলেছি অমরতীর্থে।

শুধু ভেড়া-ছাগল নয়, শেয়ালও রয়েছে দেখছি—হিমালযান ফক্স্—। হঠাৎ একটা ঝোপ থেকে আরেকটা ঝোপের আড়ালে ছুটে গেল।

আর রয়েছে পাখি—ছোট-ছোট নানা রঙের পাখি। গাছপালা আছে বলেই ওরা আছে। শীতকালে যখন বরফ পড়ে গাছপালা তলিয়ে যাবে, ওরাও পালিয়ে যাবে এখান থেকে।

অবশেষে পাখির গান শুনতে শুনতে আমরা তাঁবু-নগরীতে প্রবেশ করলাম। বেলা আড়াইটে। অর্থাৎ আট মাইল পথ আসতে সাত ঘণ্টা লেগেছে। তা লাগুক গে, সরকারদাকে নিয়ে এসেছি তো!

তাঁবুতে এসে বসি। একটু বিশ্রাম করে জুতো মোজা খুলে ফেলি। বাইরের কল থেকে হাত-মুখ ধুয়ে আসি। ওপরের কোন ঝরনা থেকে পাইপ দিয়ে জল নিয়ে আসা হয়েছে।

সুরেন ও মদন খাবার নিয়ে আসে। গরম ভাত ডাল ও তরকারি। মায়া চাটনির বোতল নিয়ে সঙ্গে এসেছে তদারকি করতে।

এই মেয়েটা সত্যি বিস্ময়কর। দেখতে রোগা, বয়সও বেশি নয়—বছর বাইশ হবে হয়তো। কিন্তু যেমন মিষ্টি ব্যবহার, তেমনি বুদ্ধিমতী। কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী। সকালে উঠেই সে যাত্রার জন্য তৈরি হয়ে নেয়। তারপর কিচেনে গিয়ে ঠাকুরকে ব্রেক-ফাস্ট পরিবেশনে সাহায্য করে। পরিবেশন শেষ হতেই নিজে খেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে পথে। পদযাত্রীদের প্রথম দলে প্রতিদিন শিবিরে পৌঁছয়। আর তখুনি কিচেনে ঢুকে কাজে লেগে যায়। অথচ মায়া প্রকৃতপক্ষে কুণ্ডু ট্র্যাভেল্স-এর কর্মচারী নয়, সে দার্জিলিঙের 'হোটেল কুণ্ডুস'-এ কাজ করে। অতিথি হিসেবেই মিসেস মণ্ডলের সঙ্গে যাত্রায় এসেছে।

মায়ার কাছ থেকে জানা গেল ফিল্ম-শুটিং-এর ব্যাপারটা। অমরনাথ নিয়ে একখানি বাংলা ছবি নির্মিত হচ্ছে. নাম 'তুষারতীর্থ অমরনাথ'। ছবির পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায়। তিনিই কাহিনীকার ও চিত্রনাট্যকার। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন তারক বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রেষ্ঠাংশে অভিনয় করেছেন—দীপঙ্কর দে, সুমিত্রা মুখোপাধ্যায় ও সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়। তাঁদেরই আমরা শুটিং করতে দেখে এলাম।

সংবাদটা শুনে খুশি হলাম। হিমালয়ের তীর্থপথকে অবলম্বন করে আরেকখানি বাংলা ছবি নির্মিত হচ্ছে এবং ছবি তোলার জন্য পরিচালক, প্রযোজক, কলাকুশলী ও অভিনেতা-অভিনেত্রীরা দুর্গম ও দুস্তর পথ পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছেন। বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে 'বিগলিত-করুণা-জাহ্নবী-যমুনা'র পরে এটি হবে এ ধরনের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা। আমার পক্ষে এটি বিশেষ গৌরবের। কারণ প্রথম প্রচেষ্টাটিকে সার্থক করে তোলার জন্য আমি কিছু সাহায্য করার সুযোগ পেয়েছিলাম। *

আমরা 'বিগলিত-করুণা-জাহ্নবী-যমুনা'র শুটিং করেছি ১৯৭০ সালে। অর্থাৎ হিমালয় নিয়ে আরেকখানি ছবি তৈরি করতে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের সাত বছর লেগে গেল। তাহলেও 'বেটার লেট্ দ্যান নেভার।' সুতরাং এই শুভ প্রচেষ্টার জন্য প্রভাতবাবু ও তাঁর সহকর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। অমৃতময় অমরনাথের কাছে আমি তাঁদের সর্বপ্রকার সাফল্য কামনা করছি।

আমাদের আলোচনা থেমে যায়। হঠাৎ তাঁবু নড়ে উঠেছে। ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে ক্রমাগত। সবাই সচকিত! ব্যাপার কি? ভূমিকম্প নাকি। না! ঝড় উঠেছে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। সেই সঙ্গে শুরু হল মেঘের গর্জন। কাছাকাছি কোথায় যেন একটা বাজ পড়ল।

তাঁবুটা ভীষণ দুলছে। পর্দার ফাঁক দিয়ে ভেতরে জলের ঝাপটা আসছে। তাড়াতাড়ি স্লিপিং ব্যাগ ও কাপড়-চোপড় সরিয়ে আনি। সহযাত্রীরা অনেকেই ভয় পেয়ে গিয়েছেন। এ যাত্রায় তাঁরা প্রকৃতির এমন রুদ্র-রূপ আর দেখেন নি।

কিন্তু আমার তাঁবুতে কেউ কোন শব্দ করছে না। সবাই চুপচাপ খাটিয়ায় শুয়ে আছে। হয়তো মনে মনে বাবা অমরনাথের নাম জপ করছে কিন্তু মুখে কেউ কিছু বলছে না।

আর্তনাদ ভেসে আসছে অন্যান্য তাঁবু থেকে। নারীকণ্ঠই কানে আসছে বেশি। তাঁরা তারস্বরে বাবা অমরনাথের করুণা ভিক্ষা করছেন।

---

* *লেখকের 'গঙ্গা-যমুনার দেশে' বইখানি দ্রষ্টব্য।*

বৃষ্টি বাড়ছে, বাতাস বাড়ছে, আর্তনাদ বাড়ছে। কোন মহিলা ক্রন্দনজড়িত স্বরে চিৎকার করছেন, "বাবা আর দুইডা দিন। দুইডা দিন তুমি এট্টু সবুর করো। হেয়ার পরে, তুমি যত ইচ্ছা ঝড়-তুফান পাডাইও।"

ঠিকই বলেছেন ভদ্রমহিলা। পরশুদিন এসময় আমরা পহেলগাঁওয়ে পৌঁছে যাব। অতএব অমরনাথ দুটো দিন প্রকৃতিকে সংযত করে রাখুন। দুদিন বাদে যত ইচ্ছে ঝড়-তুফান পাঠান। তাতে তাঁর কোন ক্ষতি হবে না। তখনকার যাত্রীদের জন্য আমাদের মাথ্যব্যথা নেই।

এই স্বার্থপর উক্তির পরেও অমরনাথ কিন্তু কৃপা করলেন আমাদের। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ঝড় থেমে গেল, বৃষ্টিও বন্ধ হল একটু বাদে।

সঙ্গে সঙ্গে সদলবলে বেরিয়ে এলাম তাঁবু থেকে। শুধু আমরা নই, সবাই। যাঁরা এতক্ষণ তারস্বরে 'ত্রাহি অমরনাথ' বলে আর্তনাদ করছিলেন, তাঁরা হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসছেন বাইরে! আর এসেই বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যাচ্ছেন। মিঠে রোদে ভরে গিয়েছে চারিদিক। কে বলবে কয়েক মিনিট আগেও অমন ঝড়ের তাণ্ডব চলেছিল এখানে? বিচিত্রা প্রকৃতি! এতকাল হিমালয়ের পথে পথে পদচারণা করছি কিন্তু আজও তার মনের খবর পেলাম না।

সীতাংশু এসে হাজির হয়। সীতাংশু গোপালের মতো কুণ্ডু ট্র্যাভেল্‌স-এর আরেকজন ম্যানেজার। সে-ও খুব কষ্টসহিষ্ণু এবং কর্মঠ যুবক। পরশু রাতে সে তো প্রায় অসাধ্য সাধন করেছে। একজন 'ঠাকুর' ও দুজন 'বয়' সহ মালপত্র নিয়ে রাত দশটায় চন্দনবাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছে। সারারাত অশ্বারোহণ করে সকালে শেষনাগ পৌঁছেছে, সেখানে পৌঁছেও বিশ্রামের অবকাশ পায়নি। আমাদের জন্য রান্নার ব্যবস্থায় লেগে গিয়েছে।

ফকিরবাবু এখানে আরও তিনজন ম্যানেজার নিয়ে এসেছেন—অমিতাভ, কিশলয় ও রাজকুমার। তারাও সবাই কর্মঠ যুবক। কিন্তু তাদের কথা পরে হবে। আগে শোনা যাক সীতাংশু কি সন্দেশ নিয়ে এসেছে।

আমার কাছেই এসে দাঁড়ায় সীতাংশু। বলে, "ন'দা আপনাকে ডাকছেন।"

"কোথায়?"

"তার তাঁবুতে?"

"চলুন।" আমি সীতাংশুর সঙ্গে চলতে থাকি।

"নমস্কার!"

কয়েকজন বাঙালী পথের মাঝে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন বলাবলি করছিলেন। তাঁদেরই একজন হাতজোড় করে আমাকে নমস্কার করেন।

প্রতিনমস্কার করি। ভাল করে দেখি ওঁদের। ওঁরা ছ'জন—দুজন প্রৌঢ় চারজন যুবক। কিন্তু আমি তো কাউকে চিনতে পারছি না।

প্রথমে একজন প্রৌঢ় নমস্কার করেছেন আমাকে, তারপরে অন্যরা।

প্রৌঢ় ভদ্রলোককেই প্রশ্ন করি, "আপনারা?"

"কলকাতা থেকে আসছি। এখান থেকে মণিমহেশ যাব।" প্রৌঢ় উত্তর দেন।

জনৈক যুবক যোগ করে, "তাই গত দু'দিন ধরে সারাপথে আপনাকে খুঁজেছি।'

"পাই নি।" আরেকজন যুবক বলে, "কেন জানেন?"

"কেন?" জিজ্ঞেস করি।

"আপনার এই নীল 'উইন্ডপ্রুফ'টার জন্যে।'

"মানে!" আমি বিস্মিত।

দ্বিতীয় প্রৌঢ় বলেন, "আমরা আগেই শুনেছিলাম, আপনি কুণ্ডু ট্র্যাভেল্‌স-এর সঙ্গে যাত্রায় এসেছেন। তাই চন্দনবাড়িতে আপনার খোঁজ করলাম। কিন্তু আপনি তখন বেরিয়ে পড়েছেন। গোপালবাবু বললেন—আপনার গায়ে হলুদ রঙের ফুলহাতা সোয়েটার। কাল ও আজ সারা পথে আমরা হলুদ সোয়েটার খুঁজেছি। বহুবার আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে কিন্তু আপনার গায়ে নীল উইন্ড্‌প্রুফ দেখে আর আলাপ করি নি।"

সহাস্যে বলি, "হলুদ সোয়েটার কিন্তু আমার গায়েই আছে।" উইন্ডপ্রুফের বোতাম খুলে নিচের সোয়েটারটা দেখাই। বলি, "গোপাল ঠিকই বলেছে। গতকাল চন্দনবাড়ি থেকে বেরুবার পরেই সোয়েটারের ওপরে উইন্ড্‌প্রুফ পরেছি।

"এবং সেটি আর গা থেকে খোলেন নি।" প্রথম প্রৌঢ় যোগ করেন।

আবার হাস্যরোল।

হাসি থামলে জিজ্ঞেস করি, "তা আজ হলুদ সোয়েটার ছাড়া চিনতে পারলেন কেমন করে?"

"এখানে পৌঁছবার পরে আমরা আর হলুদের ভরসা করি নি। আপনার সহযাত্রীদের শরণ নিয়েছি। তাঁদেরই একজন একটু আগে চিনিয়ে দিলেন আপনাকে।"

প্রস্তাবনার পর কাজের কথা পাড়েন ওঁরা। বলেন, "আমরা আপনার 'হিমতীর্থ-হিমাচল' পড়েছি। আপনি লিখেছেন, অমরনাথ মণিমহেশরূপে বিরাজ করছেন সেখানে। তিনি এখান থেকেই সেখানে গিয়েছেন।"

আমি মাথা নাড়ি।

ওঁরা আবার বলেন, 'আমরাও এখান থেকে মণিমহেশ যাব। এ বিষয়ে কিন্তু খোঁজ-খবর নেবার জন্যই আমরা আপনার দর্শনার্থী।"

"এ তো আমার কর্তব্য।" আমি বলি, "কিন্তু এখন মাপ করতে হবে। ফকিরবাবু ডেকে পাঠিয়েছেন, তাঁর কাছে যাচ্ছি। আপনারা তো আজ এখানেই আছেন?

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তাহলে এক কাজ করুন।"

"কী?"

"একটু কষ্ট করে সন্ধ্যের পরে আমার তাঁবুতে চলে আসুন।"

"বেশ, আসব।"

"কোন অসুবিধে হবে না তো?"

"না, না। অসুবিধে হবে কেন?" ওঁরা সমস্বরে বলে ওঠেন, "আমরা আপনাদের কাছেই আছি।"

প্রথম প্রৌঢ় যোগ করেন, "আচ্ছা নমস্কার! খুব ভাল লাগল আপনার সঙ্গে আলাপ করে। আমরা ভাগ্যবান।"

"আমিও সৌভাগ্যবান।" উত্তর দিই, "আপনারা আমার পাঠক, আপনারা

ভালবাসেন আমাকে। আর আপনাদের ভালবাসাই আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।"

সীতাংশুর সঙ্গে ফকিরবাবুর তাঁবুতে এসে ঢুকি। এসে দেখছি লোকে-লোকারণ্য। সব কয়খানি খাটিয়া বোঝাই। বলা বাহুল্য সবাই আমার সহযাত্রী। এবং মেয়েদের সংখ্যাই বেশি।

ফকিরবাবুর পাশে এসে বসি। মিসেস মণ্ডল ও মায়া চা পরিবেশন করছে। আমিও এক কাপ পেয়ে যাই। সহাস্যে প্রশ্ন করি, "কার সম্মানে এই চায়ের আসর?"

"আমার।"

ভদ্রমহিলাব দিকে তাকাই। আমাদের সামনের খাটিয়ায় দরজার পাশে বসে আছেন তিনি। ভদ্রমহিলা সুন্দরী ও স্বাস্থ্যবতী। তিনি আমাদের সহযাত্রী নন। তবু তাঁকে চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

কোথায় দেখেছি?

না। মনে পড়ছে না।

তিনি মৃদু হাসছেন আর মাঝে মাঝে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন।

ফকিরবাবু আমাকে বলেন, "ইনি অভিনেত্রী সুব্রতা চট্টোপাধ্যায়।"

"অর্থাৎ শুভেন্দুর (চট্টোপাধ্যায়) বুড়োদা মানে অভিনেতা তরুণকুমারের..."

"স্ত্রী।"

তাই চেনা চেনা লাগছিল। চিনতে পারছিলাম না কারণ এখন তাঁর গায়ে ওভারকোট মাথায় বালাক্লাভা টুপি।

ভদ্রমহিলাকে নমস্কার করি।

তিনি প্রতি নমস্কার করেন। বলেন, "আমিই কষ্ট দিলাম আপনাকে। ফকিরদাব কাছে শুনলাম আপনি এসেছেন। আপনার বইতে এত হিমালয়ের কথা পড়েছি। আজ আমিও হিমালয়ে এসেছি। হিমালয়ে বসে হিমালয়ের লেখকের সঙ্গে পরিচিত হবার লোভ সামলাতে পারলাম না।"

"এতে আমাকে কষ্ট দেবার কি আছে?' বরং আমিই আপনার মতো একজন শিল্পীর সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেলাম।"

"না না। এ কি বলছেন?" সুব্রতা যেন আমার কথায় একটু লজ্জা পেলেন।

ওঁর বিনম্র ব্যবহার ভাল লাগে আমার। বিনয় কেবল বিদ্বানের ভূষণ নয়, 'কাল্‌চার'-এর পরিচয়ও বটে।

স্বাভাবিকভাবেই শুটিং-এর প্রসঙ্গ এসে পড়ে। সুব্রতা বলেন, "আমরা চন্দনবাড়ি ও শেষনাগের শুটিং সেরে এখানে এসেছি। অমরনাথে দু'দিন শুটিং করেছি। এখানকার কাজও আজ শেষ হয়ে গেল। আগামীকাল সকালে রওনা হব পহেলগাঁও। সেখানে কিছু কাজ বাকি আছে।"

কথায় কথায় জিজ্ঞেস করি, "আচ্ছা, ছবি করতে হিমালয়ের এমন দুর্গমস্থানে আপনি তো এই প্রথম এলেন?'

সুব্রতা মাথা নাড়েন।

"আর কোন ছবির আউট-ডোর শুটিং-এ নিশ্চয়ই আপনাকে এত কষ্ট পেতে হয়নি?"

সুব্রতা কি যেন একটু ভাবেন। তারপরে বলেন, "দৈহিক কষ্টের বিচারে হয়তো হয় নি। কিন্তু মনের কথা বললে বলতে হয়, সে কষ্টের তুলনায় আনন্দ পেয়েছি অনেক বেশি। এবং এমন অপার্থিব আনন্দলাভের জন্য আমি সারাজীবন হিমালয়ের পথে ও প্রান্তরে শুটিং করতে রাজী আছি।"

চোদ্দ

মণিমহেশ সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়ে ওঁরা বিদায় নিলেন। আর ঠিক তখুনি তাঁবুর পর্দা তুলে টর্চ জেলে গৌরী আমাদের তাঁবুতে ঢুকল।

"আরে এসো, এসো! কি খবর?" সরকারদা গৌরীকে স্বাগত জানান।

গৌরী আমার খাটিয়ার এক কোণে বসে পড়ে। বলে, "খবর একটা নিশ্চয়ই আছে। নইলে এই শীতের রাতে কম্বল ছেড়ে এখানে আসব কেন?'

অসীম নিজের একখানি কম্বল তাকে দিয়ে বলে, "এইটে গায়ে দিয়ে নিন।"

ব্রহ্মচারী বলে, "পা তুলে আরাম করে বসুন।"

গৌরী তাদের পরামর্শ মেনে নেয়। আমি ভাবি অন্যকথা—এমন কি খবর, যে এই শীতের রাতে সে এখানে ছুটে এসেছে? কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা গেল না। কিসের খবর? কোন দুর্ঘটনা নয় তো?

গৌরী আমাকে বলে, "পহেলগাঁও থেকে মালপত্র নিয়ে ফকিরবাবুর লোক এসেছে। সে একখানি 'ভ্রমণবার্তা' নিয়ে এসেছে।"

"ভ্রমণবার্তা?" আমি বিস্মিত। "ভ্রমণবার্তা বর্তমান বাংলাসাহিত্যের একমাত্র ভ্রমণবিষয়ক পত্রিকা। কিন্তু সে পত্রিকা তো কোন ধনী পত্রিকা গোষ্ঠীর ব্যবসা নয়, প্রমোদাদিত্য মল্লিক নামে চুঁচড়ার জনৈক পর্যটনপ্রিয় বেকার যুবকের আদর্শ। সে পত্রিকা পহেলগাঁওয়ে আসবে কেন?"

আমার প্রশ্নের উত্তরে গৌরী বলে, "মঞ্জু ও প্রণতি হোটেলের ঠিকানায় আমাকে পাঠিয়েছে। তাই ফকিরবাবুর লোক নিয়ে এসেছে।"

মঞ্জুলিকা রায় ও প্রণতি বসাক গত বছর আমাদের সঙ্গে কেদার-বদ্রী গিয়েছিল। দুটি মেয়েই শিক্ষয়িত্রী, অবিবাহিতা এবং হিমালয়কে ভালোবাসে। দুজনে খুবই বন্ধুত্ব আর সর্বদা একসঙ্গে থাকে।

"কিন্তু ওরা হঠাৎ তোমাকে ভ্রমণবার্তা পাঠাল কেন, ওরা তো ভ্রমণবার্তার কেউ নয়?"

"ওদের লেখা ছাপা হয়েছে।"

"কি লেখা?"

"বলতাল হয়ে অমরনাথ।"

এতক্ষণে বুঝতে পারি ব্যাপারটা। আমরা অমরনাথ যাচ্ছি। মঞ্জু ও প্রণতি তাদের লেখাটি আমাদের পড়ার জন্য পাঠিয়েছে। তাছাড়া আমারও মঞ্জুদের সঙ্গে আসার কথা ছিল। আর তাই লেখাটি পাওয়ামাত্র গৌরী আমাদের তাঁবুতে ছুটে এসেছে।

"লেখাটা একবার পড়ুন না, শুনি।" ব্রহ্মচারী মোমবাতিটা গৌরীর দিকে এগিয়ে দেয়।

"হ্যাঁ, খাবার আসতে এখনও দেরি আছে। লেখাটা পড়ে ফেল একবার, বলতাল থেকে অমরনাথের পথটির সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাক।" সরকারদা যোগ করেন।

"আমি পড়ব?" গৌরী তবু দ্বিধা করে।

অসীম কৃত্রিম ধমক লাগায়, "আপনি নয় তো কে পড়বে আপনার প্রিয়বান্ধবীদের কাহিনী?"

গৌরী তাড়াতাড়ি পত্রিকাটি খুলে পড়তে শুরু করে—

"হিমালয়ের দুর্নিবার আকর্ষণে আবার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। ১৯৭৬ সালের অক্টোবর ইনট্যুরের সঙ্গে কেদার-বদ্রী ঘুরে আসার পর বিভাস দাসকে বলেছিলাম—যদি কোন একটা গ্রীষ্মের ছুটিতে অমরনাথ যাওয়ার ব্যবস্থা করেন আমরা যেতে পারি।

গত মে (১৯৭৭) মাসের প্রথম দিকে খবর এলো—যাত্রার উদ্যোগ-আয়োজন চলছে পূর্ণোদ্যমে।

২৯ শে মে হাওড়া স্টেশনে এলাম আমরা মোট সাড়ে বারো জন। উদ্যোক্তাদের পক্ষে বিভাস দাস গৌর চন্দ্র ও পাচক নিত্যানন্দ। যাত্রীরা হলাম—হরপ্রসাদ পাল, তাঁর স্ত্রী রেবা দেবী, তাঁদের সাত বছরের ছেলে পার্থপ্রতিম পাল বা p3 শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, আনন্দমোহন মুখোপাধ্যায়, গৌরদার মা, রঞ্জিত গুহ, মালদহ নিবাসী বৃদ্ধ কার্তিকচন্দ্র বর্মন (দাদু) ও আমরা দুজন।

৩১শে মে সকালে নির্ধারিত সময়ের মাত্র এক ঘণ্টা পরে আমরা জম্মুতে নামলাম। বাস ছাড়লো বেলা দশটা নাগাদ। সেই রাতেই পৌঁছলাম শ্রীনগর।

অবশেষে এলো সেই ক্ষণ। ৩রা জুন রাতে জানলাম পরদিন সকালে আমাদের যাত্রা শুরু হবে। প্রচণ্ড উত্তেজনা, অস্থিরতা, গোছগাছ শুরু হয়ে গেল—কে কতটা সংক্ষেপ করতে পারে বোঝা। মুখে কেউ কিছু বলছে না, মনে মনে অস্থির সবাই। এখন যাত্রার সময় নয়। মেলা বা ছড়িদারের যাত্রার দুমাস আগে আমরা যাব। যে পথে অধিকাংশ লোক যায় সে পথে নয়, সোনামার্গ হয়ে একটা অপরিচিত পথে। সব মিলিয়েই সন্দেহ, সংশয়, হয়ত ভয়—ভয় অনিশ্চয়তার জন্য। সেদিন রাতে খেতে বসে আনন্দদা বলে উঠলেন—কাল থেকে পরীক্ষা শুরু, ফাইন্যাল পরীক্ষা? কথাটা সত্যি। ৩রা জুনের রাত পরীক্ষার আগের রাতের মতোই কাটলো।

৪ঠা জুন রাত শেষ হতে না হতেই সবাই উঠে পড়েছে। আমরা প্রস্তুত। আপাতত গন্তব্য বাসে সোনামার্গ। শ্রীনগর থেকে ৮৩ কি.মি.।

আমরা রওনা হলাম, সঙ্গে চলল সেই লাঠি—যা কেদার-বদ্রী, যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী-গোমুখীর পথে আমাদের বিশ্বস্ত সঙ্গী ছিল। দলের আর সকলেই নতুন করে লাঠি সংগ্রহ করে নিয়েছেন শ্রীনগর থেকে।

বাস ছুটেছে সিন্ধ নদীর ধার ধরে, আমাদের মন ছুটেছে পাহাড় পেরিয়ে আরো দূরে। কিন্তু আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব, পারা না পারার সংশয় সঙ্গ ছাড়ছে না। অদম্য উৎসাহ, অসীম ইচ্ছা, দুর্গম পথে হিমবানের আহ্বান—অমরনাথের আকর্ষণ একদিকে, আর একদিকে আত্মীয়-পরিজন, চেনা-অচেনা সকলের বিস্ময়। আমরা কোন কিছুতেই দমে

যাই নি। সংশয়কে মনের নিচে চাপা দিয়ে মুখে বলছি জয় অমরনাথ!

সোনামার্গ পৌঁছিলাম প্রায় ১২টা। "প্যাক্ লাঞ্চ" খেয়ে পথের ধারে একটু অপেক্ষা করতে হোল। বলতাল পর্যন্ত যাবার জন্য যদি কোন যানবাহনের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে ১৩ কি.মি. হাঁটার পরিশ্রম কমে যায়। পথও আছে কারণ আজকাল লে পর্যন্ত বাস চলে।

সঙ্গে কুলির সংখ্যা ১৩ জন। প্রথমে ওরা যেতে চায় নি। কম মাল নেবে ও অনেক বেশি টাকা পারিশ্রমিক পাবে এই শর্তে রাজী হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

একটা বাসের ব্যবস্থাও হল। মালপত্র, কুলি ও যাত্রী সকলকে বলতাল পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। তার জন্য পুরো বাসের ভাড়া দিতে হবে। ফেরাব পথে তো হাঁটতেই হবে—যা পাওয়া যায়। আবার বাসে উঠলাম। সোনামার্গের ট্যুরিস্ট অফিসার আমাদের শুভেচ্ছা জানালেন। আমাদের অবশ্য তার আগে তাঁকে লিখে দিতে হয়েছে—কোন দুর্ঘটনা ঘটলে কেউ দায়ী হবে না ইত্যাদি ইত্যাদি।

বলতাল, লে বা লাদাখের পথে একটা ছোট্ট উপত্যকা, জোজলা গিরিবর্ত্মের ঠিক নিচে। উচ্চতা প্রায় ৯৫০০ ফুট। গাছ বলতে পাইন, আর ইতস্তত ছড়ানো কিছু ভূর্জগাছ। মালপত্রসহ আমাদের নামিয়ে দিয়ে বাস চলে গেল।

তাঁবু ফেলার ব্যবস্থা হচ্ছে। নদীর বাঁ-তীরে একটু সমান জায়গায় পব পর দুটো তাঁবু পড়ল। স্টোভ জ্বলল, চায়ের জল বসে গেল। এমন সময় একজন মিলিটারি বাঙালি ভদ্রলোক এসে বললেন—কেন আর তাঁবুতে থাকবেন, আমরা একটা ঘর খুলে দেবার ব্যবস্থা কবছি, চলে আসুন।

ভদ্রলোককে ধন্যবাদ জানিয়ে সেই ঘরে এসে উঠলাম, তাঁবু দুটো কুলিদের জন্য রইলো। সূর্য অস্ত যাওয়ার আগে পর্যন্ত ঠাণ্ডা তেমন ছিল না। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা পড়তে লাগল। রাতে খাওয়া দাওয়ার পর হট্‌ড্রিঙ্কস খেয়ে আমরা স্লিপিং ব্যাগের চেন টেনে দিলাম।

পরদিন সকালে সূর্যের আলো এসে পড়ল সেই ছোট্ট উপত্যকার ওপর। কুলিরা পিঠে মালপত্র তুলে নিলো। আমাদের পদযাত্রা শুরু হোল। আগের দিনই পথের জন্য যার যার 'ড্রাই র‍্যাশন, খেজুর কিসমিস মিছরী আমসত্ত্ব লজেন্স দেওয়া হয়ে গেছে।

এখান থেকে অমরনাথ গুহা ১৫ কি.মি.। প্রথম ২ কি.মি. পথ সমান—জীপের চাকার দাগের পাশ দিয়ে দিয়ে এগিয়ে গেলাম। তারপর একটু চড়াই পার হয়ে পাহাড়ের গায়ে পথ ধরলাম। পথ চলার অযোগ্য নয়। কিছুদিন পর যখন পরিষ্কার করা হবে, মিলিটারি যাবে এই পথ দিয়ে মালপত্র যন্ত্রপাতি নিয়ে তীর্থের পথ পরিষ্কার করতে, একমাস ধরে তীর্থযাত্রীদের সাহায্য করতে, তখন এপথ আরো ভালো হবে। অমরনাথের নদী অমরগঙ্গার বাঁ-ধার ধরেই চলেছি. পথের বরফ গলে নেমে গেছে নদীর কাছে, কোথাও বা পথটাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে। নদীর জলের স্রোত বেশিরভাগই বরফের তলা দিয়ে বইছে। কোথাও বা বিরাট গর্ত বরফের মাঝে মাঝে। নদী সেখানে উচ্ছল, চঞ্চল। পথ ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ভাঙা পাহাড় পড়ছে। সব জায়গায় নিজেরা.পার হতে সাহস পাচ্ছি না। দাঁড়িয়ে পড়ছি। বিভাসবাবু ও গৌরদা হাত ধরে পার করে দিচ্ছেন।

কুলিরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে আমাদের সঙ্গে পরিমাণমত দূরত্ব বজায় রেখে পেছনে

পেছনে আসছে। পথে দেখা হোল দুজন যাত্রীর সঙ্গে। ওঁরা পহেলগাঁও দিয়ে এসেছেন—দর্শন করে এপথ দিয়ে ফিরছেন।

পথ ক্রমশ চড়াই হচ্ছে। আমরা মাঝে মাঝে একটু দাঁড়াচ্ছি, হাঁফাচ্ছি, আবার হাঁটছি। নদী অনেক নিচু দিয়ে যাচ্ছে। ওয়াটার বট্‌লের জল শেষ। নদীর গর্জন শুনছি কানে কিন্তু তাতে তো তৃষ্ণা নিবারণ হয় না।

পথের পাশে বসে পড়েছিলাম, হাঁফাচ্ছি। মনে হোল আর চলতে পারব না! কিন্তু দাদু হাঁটছেন এই বয়সে, মাসীমা হাঁটছেন বাতেব ব্যথা নিয়ে, বাচ্চা ছেলে p3, সেও হাঁটছে। নাঃ, এগিয়ে চলি আবার। এগিয়ে যাওয়া সহযাত্রীরা হৈ-চৈ করে উঠলেন। পালদা চীৎকার করে বললেন—চড়াই-এর শেষ আজকের মতো। এবার নামা।

প্রায় সমতল ঐ জায়গাটার নাম সান্তসিংহ টপ্‌। একটাও ঝরনা নেই কাছাকাছি। তবু দাঁড়ালাম সবাই। একটু বিরতি, দু-চারটে ছবি তোলা হোল।

আবার চলতে শুরু করলাম। এবার পথ কখনো সমান, কখনো নামছে। পথের ধারে ধারে ফুটে আছে নানা রঙের ফুল, জুনিপারের ঝোপে হল্‌দে ফুলের গুচ্ছ। সামনে বরফ ঢাকা পাহাড়ের মাথাগুলো ঝক্‌ঝক্‌ করছে। এতক্ষণ দুপাশে জমে থাকা বরফ। এবার তুষারাবৃত অঞ্চলও চোখে পড়ছে। দূরে নিচে বরফে ঢাকা একটা জায়গা দেখিয়ে কুলিরা বলল—ওটাই পঞ্চতরণী।

তার মানে আমরা প্রায় এসে পড়েছি। পথে জায়গায় জায়গায় বরফ রয়েছে। তেমন বিপজ্জনক কিছু নয়, তবু সন্তর্পণে পার হলাম।

কুলিরা বলে—কয়েকদিন আগেও এ পথ পুরো বরফে ঢাকা ছিল।

অবিশ্বাস করতে পারলাম না কারণ নদীর অপর পারে তখনো পাহাড় থেকে বরফ নেমে নদীর বুক ছুঁয়ে আছে।

একটা ঝরনা পেয়ে অরেঞ্জ স্কোয়াশ দিয়ে তৃষ্ণা মেটানো হোল।

১১ কি.মি. পথ পার হয়ে সঙ্গমে এসে পৌঁছলাম বিকাল ৫টায়। নেমে এলাম অনেকটা। তবু নদী রইলো অনেক নিচে। পথটা দেখে মনে হচ্ছিল ফেরার পথে এই চড়াই আবার পার হতে হবে। তবে সে ভাবনা বেশিক্ষণ ভাবার সুযোগ পেলাম না।

চারিদিকে জমাটবাঁধা সাদা সাদা কঠিন বরফ। উঁচু নিচু জমি একটু, তারই মাঝে তাঁবুর স্থান পাওয়া গেল। পরপর পাঁচটা তাঁবু পড়ল। বেশ হাওয়া দিচ্ছে, সবাই ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত। বিভাসবাবু বা গৌরদার ক্লান্তি নেই। তাঁরা তাঁবু পাতলেন কুলিদের সহায়তায়। তারপরই চায়ের জল বসল। রাত হতে দেরি আছে—তবু তখনই খিচুড়ি হলো, আমরা খেয়ে নিলাম। আটটা পর্যন্ত দিনের আলো থাকছে এ অঞ্চলে। রাত ৯টা নাগাদ আবার এলো হালুয়া, তারপর বোর্নভিটা। অনেকেরই মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, বোধহয় উচ্চতার জন্য। তাঁবুর দরজা বন্ধ করলাম। কালই আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। কলরব থেমে গেল। ঘুম আসে না। মাঝে মাঝে কুলিদের কথাবার্তার আওয়াজ আসছে। একটা তাঁবু—ওরা সবাই শুতে পারে নি—আগুন জ্বেলে কেউ কেউ বসে আছে। মাঝে একটু বৃষ্টি পড়তেই ওদের কথাবার্তার আওয়াজ বাড়লো। নিস্তব্ধ জনহীন তুষারমণ্ডিত পর্বতমালার মাঝে আমরা ক'টি মানুষ। প্রকৃতির কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছি। যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ এলে বাঁচার চেষ্টা করা বৃথা।

৬ই সকালে ঘুম ভাঙল। তাঁবু থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আকাশ পরিষ্কার। রোদ উঠলেই যাত্রা শুরু হবে। নদীর পুল পার হয়ে সামনের পাহাড়টার মাথায় উঠতে হবে। আঁকাবাঁকা চড়াই পথ দেখা যাচ্ছে। প্রাতরাশ শেষ করে আমরা লাঠি নিয়ে যাত্রা শুরু করলাম।

প্রায় এক কিলোমিটার পার হয়ে দুটো পথ দেখা গেল। আমরা থামলাম। কুলিরা বলল—আমাদের বাঁদিকে যেতে হবে। পহেলগাঁও দিয়ে চন্দনবাড়ি, শেষনাগ, পঞ্চতরণী হয়ে যে পথ এসেছে, এটি সেই পথ। এতক্ষণ আমরা যে পথে চলছিলাম, সে পথ এখন প্রচলিত পথের সঙ্গে এসে মিশলো। পথে আর অন্য কোন যাত্রী নেই। আমরা চলেছি প্রায় একই সঙ্গে সারি বেঁধে। বেশি চড়াই আর নেই। পথের ওপর বরফ রয়েছে, কঠিন বরফ। এই বরফ কেটে পথ করার জন্য আইস্ এক্স্ কেনা হয়েছিল। ভুলক্রমে তা কলকাতায় রয়ে গেছে। তাই আমাদের দলনেতা পা দিয়ে অথবা লাঠি দিয়ে পথ করছেন, আমরা তারই ওপর দিয়ে পার হচ্ছি।

বরফ গলছে, পথে বেশ কাদা। সন্তর্পণে চলতে হচ্ছে। ক্রমে পথ আর দেখা যাচ্ছে না। আমরা তখন পথ ছেড়ে নেমে এলাম অমর-গঙ্গার ওপর। পুরো নদীটার ওপরে বরফ জমে আছে—তলায় কঠিন, ওপরে পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে নরম বরফ। চলতে তেমন কষ্ট হচ্ছে না, তবে প্রতিটি পদক্ষেপেই শরীর দুলে উঠছে। এরই নাম বোধ হয় তুষাররাজ্য। এর আগে এমন পথে চলার অভিজ্ঞতা হয়নি। মাঝে মাঝে পা পিছলে যাচ্ছে, আছাড়ও খাচ্ছি। তবে তেমন বড় কিছু নয়। আঘাত লাগার সম্ভাবনা নেই। ভয় শুধু বরফ ভেঙে জলের স্রোতে ভেসে যাবার। কারণ এই বরফের তলা দিয়ে দুর্বার বেগে জল বইছে।

আমরা অবশ্য ঠিক মাঝখান দিয়ে যাচ্ছি না, একটু একটু ছড়িয়ে ছড়িয়ে, বাঁ দিক ঘেঁষে চলেছি। মনোযোগটা বেশির ভাগ পায়ের দিকে।

বরফ জমা নদীর পারে পাথর আর মাটি বেরিয়ে পড়েছে। আমরা বসলাম সবাই। একটু খেজুর, কিস্‌মিস্ মুখে দিলাম। সেখান থেকেই প্রথম দেখা গেল বাঁ দিকের পাহাড়ের গায়ে গুহা—নদীর বুক থেকে কিছু ওপরে। আর থেমে থাকা ঠিক হবে না। আবার নামি পথে, বরফ জমা নদীতে।

গুহা সামনে এসে গেছে। নদী ছেড়ে বাঁদিকে উঠতে লাগলাম। একটু চড়াই। তারপর সিঁড়ি—১৬০ খানির মতো। পালদা ও বৌদি আগের দিকে ছিলেন, ওঁরা ঘণ্টা বাজাচ্ছেন—ওঁরা পৌঁছে গেছেন। আমরা যাত্রীদলের পিছে পড়ে গেছি। আমরা কি সবার নিচে, আমাদের কি ঠাঁই হবে না?

জয় অমরনাথ—পৌঁছে গেলাম আমরাও। জনমানবশূন্য গুহায় গুহাধীশ একা ছিলেন। আমাদের উচ্ছ্বাস আর কলরবে মুখর হয়ে উঠলো সেই নির্জন গিরিকন্দর। বাঁদিকের রেলিং-এর গায়ে একটা ফলকে লেখা আছে ইংরাজীতে —"আমরা এখন ১৩,৫০০ ফুট ওপরে অমরনাথ গুহায় রয়েছি।"

রেলিং-এর মাথাটা শুধু জেগে আছে বরফের মধ্যে। গুহার ডান দিকের কোণে স্বয়ম্ভু সেই তুষার-লিঙ্গ শ্রীঅমরনাথ। তারপর ক্রমে বাঁদিকে আরও তিনটি ছোট ছোট লিঙ্গ। বেদীর সবটাই বরফে ঢাকা। লিঙ্গের রঙ দুগ্ধফেননিভ ধবল নয়, ঈষৎ নীলচে, না সবুজাভ? ঠিক বুঝতে পারছি না।

কঠিন অথচ মসৃণ, কোথাও কোন খাঁজ নেই, ভাঁজ নেই। স্পর্শ করলাম। পুরোহিত পূজারী কেউ নেই, নিজেরাই মন্ত্র পড়লাম, যার কাছে যা ছিল তাই দিয়ে আমরা দিলাম ভক্তি-অর্ঘ্য। সকলের চোখে জল।

জানি না দেবতা কোথায় আছেন—এই স্বয়ম্ভু তুষার-লিঙ্গে, পর্বত কন্দরে, হিমালয়ের হিমমণ্ডিত চূড়ায়—কিংবা মানুষের আপন অন্তরে? আমরা সবাই সেই সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বনিয়ন্তা, সত্য মঙ্গল প্রেমময় সুন্দরকে প্রণতি জানালাম।"

গৌরীর পাঠ শেষ হয়। সে উঠে দাঁড়ায়। বলে, "আমি তাহলে এখন আসি। একটু বাদেই রাতের খাবার আসবে।"

"এসো।" আমি বলি, "কাল কিন্তু সকাল-সকাল বেরুতে হবে, মনে আছে তো?"

গৌরী মাথা নাড়ে। সে বেরিয়ে যায় আমাদের তাঁবু থেকে।

রাতের খাবার আসতে এখনও কিছু দেরি আছে। বাইরে বেশ বাতাস বইছে। শীত শীত করছে। ওরা কম্বল মুড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে। আমিও স্লিপিংব্যাগের জীপ খুলি।

শুয়ে শুয়ে মঞ্জু ও প্রণতির লেখাটার কথাই ভাবতে থাকি। ভেবে চলি বলতাল-অমবনাথ পথের কথা। অমরনাথ দর্শনের জন্য আমাদের ৬০ মাইল হাঁটতে হবে আর ওদের মাত্র ১৮ মাইল হাঁটতে হয়েছে। আমারও ওদের সঙ্গে আসার কথা ছিল। আমিই বিভাসকে বলতালের পথে যাত্রার আয়োজন করতে বলেছিলাম। অথচ শেষ পর্যন্ত ওদের সঙ্গী হতে পারি নি।

কি জানি বাবা অমরনাথের বোধহয় ইচ্ছে নয় যে আমি সেই সংক্ষিপ্ত পথে যাত্রা শেষ করি। তাই সেবারে সামান্য কারণে আসা হয় নি, আর এবারে গৌতম অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও আসা হয়েছে। তবে অমরনাথের আশীর্বাদে সে নিশ্চয়ই এতদিন সুস্থ হয়ে উঠেছে।

আমাদের এই পথ অনন্তকালের যাত্রাপথ। এপথ শঙ্করাচার্য ও বিবেকানন্দের পথ। যুগ যুগ ধরে লক্ষ লক্ষ ভক্ত এই পথে অমরনাথ দর্শন করেছেন। হাজার হাজার পুণ্যার্থী এই পথের ধুলোয় শেষে শয্যা পেতেছেন। সুতরাং বলতালের পথে না এসে ভালই করেছি। তিনি যা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন।

তবে একটা কাজ করা যেতে পারে। এই পথে অমরনাথ এসে বলতালের পথে সোজা শ্রীনগর ফিরে যাওয়া যেতে পারে। তাতে যেমন দুটি পথ দেখা যায়, তেমনি দুটি দিনও বেঁচে যায়। ঐ পথে ফিরে গেলে আমরা অমরনাথ দর্শন করে আগামীকাল রাতেই শ্রীনগর ফিরে যেতে পারি আর এপথে পহেলগাঁও হয়ে শ্রীনগর যেতে আরও তিন দিন লেগে যাবে।

সেদিন রাতে পঞ্চতরণীর তাঁবুতে শুয়ে শুয়ে যখন এসব কথা ভাবছিলাম, তখন একবারও মনে পড়েনি কালিদাসবাবুর কথা। কিন্তু আজ একবছর পরে পঞ্চতরণীর সেই রাতের প্রসঙ্গে আমার বারবার মনে পড়ছে হিমালয়-প্রেমিক বন্ধুবর কালিদাস রায় গোষ্ঠীপতির কথা। মনে পড়ছে কারণ তিনিও এই পথে অমরনাথ দর্শন করে বলতালের পথে তাড়াতাড়ি শ্রীনগর ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। পারেননি। কালিদাসবাবু ও তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী সুজাতাদেবী অমরনাথের পথে চিরবিশ্রাম নিচ্ছেন।

কালিদাসবাবু বয়সে আমার চেয়ে বড় ছিলেন। কিন্তু উৎসাহ ও কর্মশক্তিতে তিনি

ছিলেন চিরনবীন। ভারতের প্রথম বে-সরকারী পর্বতারোহণ সংস্থা হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য। অ্যাসোসিয়েশন অফিসেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তাঁর উৎসাহ কর্মকুশলতা স্পষ্টবাদিতা এবং হিমালয়-প্রেম প্রথম থেকেই আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। তিনি প্রায় প্রতিবছর হিমালয়ের পথে পথে পদচারণা করেছেন। ১৯৫২ সালে বৃদ্ধ পিতামাতাকে কেদার-বদ্রী দর্শন করিয়ে এনেছিলেন। ছোট ভাই হিরণ্যমোহনকে নিয়ে ১৯৫৫ সালে কৈলাস-মানস সরোবর পরিক্রমা করেন।

হিমালয়ের প্রায় সমস্ত দুর্গম গিরিতীর্থ দর্শন করেছেন কালিদাসবাবু। হিমালয়ের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল হিমালয়ের মতোই অসীম ও অনন্ত। আর তাই কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি হিমালয়েই তাঁর স্থায়ী বাসভূমি নির্বাচিত করেছিলেন। কয়েকজন কাশ্মিরী বন্ধুর অনুরোধে প্রায় বছরখানেক ধরে কাশ্মীরে বসবাস করছিলেন। ছেলে-মেয়েদের কলকাতায় রেখে স্ত্রী ও ছোটছেলে ছ'বছরের রাজর্ষিকে নিয়ে তিনি শ্রীনগরে বাসা বেঁধেছিলেন।

কালিদাসবাবু অনেক আগেই অমরনাথ দর্শন করেছিলেন। কিন্তু সুজাতাদেবীর সে সুযোগ হয় নি। তাই দাশরথির সহকর্মী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে সুজাতাদেবী ও রাজর্ষিকে নিয়ে তিনি এবার এই পথে অমরনাথ রওনা হয়েছিলেন। ১৮ই জুলাই (১৯৭৮) তাঁরা শেষনাগ পৌঁছলেন। সুজাতাদেবী সহসা অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে তাপসবাবুদের সঙ্গে অমরনাথ দর্শন সম্ভব হল না কালিদাসবাবুর। তিনি তাঁদের বললেন—তোমাদের ছুটি কম, তোমরা এগিয়ে যাও। আমি অবসরপ্রাপ্ত বেকার মানুষ। তোমাদের বৌদি সুস্থ হয়ে উঠলে, আমি ধীরে-সুস্থে বাবাকে দর্শন করে শ্রীনগর ফিরে যাব।

দর্শন শেষে তাপসবাবুরা ২০শে জুলাই শেষনাগে ফিরলেন। দেখলেন সুজাতাদেবী তখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেননি। তবু কালিদাসবাবু তাঁকে অমরনাথ দর্শন করাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

শেষ পর্যন্ত কালিদাসবাবুর বাসনা পূর্ণ হয়েছে। তিনি তাঁর জীবনসঙ্গিনীকে বাবা অমরনাথের কাছে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তাঁরা দুজনে প্রাণভরে অমরনাথকে দর্শন করেছিলেন।

জানি না, করুণাময় অমরনাথের কাছে সেদিন তাঁরা কি প্রার্থনা করেছিলেন? তবে মনে হয় ভক্তবৎসল অমরনাথ তাঁদের প্রার্থনা পূর্ণ করেছেন। তিনি তাঁদের পার্থিব-প্রেমকে স্বর্গীয় প্রেমে রূপান্তরিত করেছেন। অমরনাথজী তাঁদের দু-জনকে একইসঙ্গে কাছে টেনে নিয়েছেন। জীবনসঙ্গিনী সুজাতাদেবী কালিদাসবাবুর মরণসঙ্গিনী হয়েছেন।

স্ত্রী অসুস্থ বলে কালিদাসবাবু অমরনাথ দর্শনের পরে তাড়াতাড়ি বাসায় (শ্রীনগর) ফিরতে চান। তিনি বলতালের পথ ধরেন। তিনি জানতেন যাত্রার মরশুম শুরু হয়ে গিয়েছে, সেদিনই শ্রীনগরের বাস পেয়ে যাবেন। সেই অভিশপ্ত দিনটা ছিল ২৮শে জুলাই, ১৯৭৮।

অভিজ্ঞ হিমালয়-পথিকের অনুমান মিথ্যে হয় নি। শ্রীনগর-লে (লাদাক) রোডে পৌঁছবার আগেই একটা মিনিবাস পেয়ে গেলেন। 'বাস'টা যাত্রী ধরবার জন্য আইনের

নিষেধ অমান্য করে কাঁচা রাস্তায় অমরনাথের দিকে এগিয়ে এসেছিল।

ঘরে ফেরার জন্য আকুল যাত্রীরা আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। নিরাপত্তার কথা বিস্মৃত হয়ে তাঁরা সেই বাসের সওয়ার হলেন। বাস কন্ডাক্টারের বাসনাও পূর্ণ হল। সে বিয়াল্লিশ জন যাত্রী পেয়ে গেল। বলা বাহুল্য বাসের আসনসংখ্যা ছিল অনেক কম। এ পথে দাঁড়িয়ে যাওয়া বিপজ্জনক জেনেও যাত্রীরা দাঁড়িয়ে যেতে সম্মত হলেন।

কন্ডাক্টারের আনন্দ আর ধরে না। মূল-পথ থেকে এগিয়ে এসে ভাল দাঁও মারা গেছে। কিন্তু সারথি সম্মত হল না। তার হাতে গাড়ির 'স্টিয়ারিং'। এবড়োখেবড়ো চড়াই-উৎরাই আঁকাবাঁকা ও সরু কাঁচা রাস্তা। ভারসাম্যের একটু এদিক-ওদিক হলেই আর রক্ষা নেই। সুতরাং সে বলে বসল—এত লোক নিয়ে যাওয়া নিরাপদ নয়।

কিন্তু কে গাড়ি থেকে নামবে? তাছাড়া কন্ডাক্টারও দণ্ডায়মান যাত্রীদের দলে। সুতরাং ড্রাইভারের গণতান্ত্রিক পরাজয় ঘটল।

সে গাড়ি ছাড়ল। কিন্তু তার রাগ পড়ল না। বাস চালাতে চালাতে মাঝে মাঝেই সে পাশ ফিরে কন্ডাক্টারের সঙ্গে ঝগড়া করতে থাকল।

কালিদাসবাবু বসেছিলেন সামনের দিকে; তিনি বারবার ড্রাইভারকে শান্ত হবার অনুরোধ জানান। কিন্তু ড্রাইভার সে অনুরোধ উপেক্ষা করে বাস এবং ঝগড়া দুটোই একসঙ্গে চালাতে থাকে। সে বোধহয় ভেবেছিল এইভাবেই চালিয়ে নিতে পারবে।

প্রায় কিন্তু পেরেছিল। প্রশস্ত জাতীয় সড়ক শ্রীনগর-লে রোড যখন আর দূরে নয়, তখুনি অঘটন ঘটল। হিমালয়ের পথে অসাবধানে গাড়ি চালাবার ফল ফলল। চোখের নিমেষে বাস গড়িয়ে পড়ল পাশের ঢালে।

কালিদাসবাবু শহীদ হলেন সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর ভাঙা হাতঘড়ি বলছে তখন সময় বিকেল ৫-৫০ মিনিট।

অন্যান্য আহতদের সঙ্গে সুজাতাদেবীকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। রাত দুটোয় তিনিও স্বামীর অনুগামিনী হন।

ছ'বছরের রাজর্ষির আঘাত কিন্তু খুবই সামান্য। তার দাদা শ্রীনগর গিয়ে তাকে ফিরিয়ে এনেছে কলকাতায়। দাদা-দিদিদের সঙ্গে সেও তার বাবা ও মায়ের শেষকৃত্য সুসম্পন্ন করেছে। তবে আজও সে ঘুমের ঘোরে সেই মরণ ঢালের ওপর ঘুরে বেড়ায়। বাবার পাশে বসে বারবার বলতে থাকে—বাবা, বাবাগো! তুমি কথা বলো। বাবা তুমি একবার কথা বলো।

অবোধ শিশু বোধকরি আজও বুঝতে পারছে না, তার সত্যাশ্রয়ী পিতা ছিলেন হিমালয়-প্রেমিক। তাই স্পষ্টবক্তা কালিদাস রায় গোষ্ঠীপতির কণ্ঠস্বর হিমালয়ের বাতাসে মিশে রয়েছে চিরকালের মতো। তিনি সস্ত্রীক শিবলোকে রয়ে গিয়েছেন।

তাঁদের অমর আত্মার শান্তি কামনা করি।

পনেরো

সুযোগ পেয়ে কলহপ্রিয় দেবর্ষি দেবী পার্বতীকে বললেন—মা, ত্রিভুবনে একমাত্র মহেশ্বর সেই অমরকথা জানেন।

—তাই নাকি! ভগবতী উল্লাসিতা।

কাজ হয়েছে বুঝতে পেরে নারদ সবিনয়ে নিবেদন করলেন—হ্যাঁ মা! একমাত্র মহাদেব ছাড়া আর কেউ জানেন না এই অনন্ত সৃষ্টির মূল-রহস্য। সে কাহিনী অমরকাহিনী। আপনি যদি একবার তাঁর কাছে থেকে সে কাহিনী শুনে নিতে পারেন, তাহলেই অমর হয়ে যাবেন।

পার্বতীর কাছে কথাটা বলে নারদ যথারীতি বিষ্ণুলোকে চলে গেলেন। আর তার কিছুক্ষণ পরেই শিব কৈলাসে ফিরে এলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পার্বতী আবদার শুরু করলেন—আজই আমাকে তোমার অমরকথা বলতে হবে, আমি অমব হব।

শিব বুঝতে পারলেন, এ নারদের কাজ। কিন্তু ক্ষতি যা হবার, হয়ে গিয়েছে। সুতরাং নারদকে না ডেকে পাঠিয়ে তিনি পার্বতীকেই ভোলাবার চেষ্টা করতে থাকলেন।

পারলেন না। বরং গৌরী রেগে গিয়ে বললেন—আমি আরেকবার বলছি, আমাকে অমরকথা বলো, আমি অমর হব। না বললে, এখুনি আমি কৈলাস থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করব।

শিব প্রমাদ গণলেন। তাঁর সতীর কথা মনে পড়ল। তিনি মুখে হাসি ফুটিয়ে যথাসম্ভব মধুর স্বরে বললেন—তুমিও যেমন। আমি কি একবারও বলেছি, তোমাকে অমরকথা বলব না? শুনে অবশ্য তোমার কোন লাভ নেই, কারণ তুমি এমনিতেই অমর। তবু তুমি যখন শুনতে চাইছ, আমি বলব। কিন্তু সেকথা তো এখানে বসে বলা যাবে না দেবী!

—কেন?

—অমরকথা গুপ্ত কথা। সেকথা যে শুনবে, সে-ই অমর হয়ে যাবে। কাজেই এমন গুপ্তস্থানে বসে বলতে হবে যে, কেউ না শুনতে পায়।

—এমন জায়গা কি আছে নাথ?

—আছে।

—কোথায়?

—হিমালয়ে। সে এক অপরূপ গুহা। মানুষ তো দূরের কথা দেবতারাও তার খবর জানে না। সেখানে বসে বললে, কেউ সে কাহিনী শুনতে পাবে না।

পার্বতী সানন্দে সম্মত হলেন। কারণ তিনি হিমালয়ের মেয়ে, এই সুযোগে একবার বাপের বাড়িও বেড়িয়ে আসা যাবে।

হর-পার্বতী পৌঁছলেন প্রকৃতির সেই অপরূপ নিভৃত নিকেতনে।

কাহিনী শুরু করার আগে উমাপতি উমাকে বললেন—অমরকথা কিন্তু অনেক বড়। শুনতে শুনতে তুমি যেন আবার ঘুমিয়ে প'ড়ো না। ঘুমোলেই কিন্তু আমি বলা বন্ধ করে দেব। আমি চোখ বুজে তোমাকে সে কাহিনী বলব। কাজেই তুমি যে জেগে রয়েছ,

তার প্রমাণস্বরূপ তোমাকে মাঝে মাঝে 'হুঁ' 'হুঁ' বলে শব্দ করতে হবে।

গৌরী সম্মত হলেন, শিব শুরু করলেন তাঁর অমরকথা—সৃষ্টির মূল-রহস্য (Cosmogonic mystery)। ঋগ্‌বেদের নারদীয় সূত্রে সেই সৃষ্টি-রহস্য সুন্দরভাবে বলা হয়েছে।

দিন গেল, রাত গেল, কেটে গেল দিনের পর দিন। অবশেষে শেষ হল অমরকাহিনী। ত্রিলোচন চোখ মেললেন। সবিস্ময়ে দেখলেন গৌরী সমাধিস্থা। তাহলে কে এতদিন 'হুঁ' 'হুঁ' করে সাড়া দিয়েছে? তিনি যে বহুবার সে শব্দ শুনেছেন। নিশ্চয়ই কেউ তাঁর সঙ্গে বেইমানি করেছে।

ক্রুদ্ধ রুদ্র চারিদিকে তাকালেন। দেখলেন গুহার এককোণে একটি শুকপাখি বসে রয়েছে। পশুপতি ত্রিশূল হাতে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি সেই শুকপাখিকে হত্যা করতে গেলেন।

পারলেন না। শুক গুহার বাইরে বেরিয়ে এল। ঈশানও ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তিনি তাকে তাড়া করলেন। পাহাড়-পর্বত, বন-জঙ্গল ও নদীনালার ওপর দিয়ে শুক উড়ে পালাতে থাকল। পিনাকীও ত্রিশূল হাতে তার পেছন পেছন ছুটতে থাকলেন।

এই শুক গোলোকের লীলাশুক। রাধা-কৃষ্ণ মর্ত্যে অবতীর্ণ হবার পরে সে বিষ্ণু-বিরহে অধীর হয়ে কৃষ্ণের খোঁজে মর্ত্যে আসে। উড়তে উড়তে একদিন সে শ্রান্ত হয়ে ঐ গুহায় আশ্রয় নেয়। দেখতে পায় হর-পার্বতীকে। সে সমাধিস্থা পার্বতীর কণ্ঠস্বর নকল করে 'হুঁ' 'হুঁ' বলে অনন্ত সৃষ্টি-রহস্য শ্রবণ করে।

শুক ভয়ে উড়ে পালাতে থাকে, শিবও তাকে তাড়া করতে থাকেন। তাঁর খেয়াল নেই যে অমর কথা শুনে শুক অমর হয়ে গিয়েছে। শিবের আর সাধ্য নেই শুককে মেরে ফেলেন।

উড়তে উড়তে শুক পৌঁছল বদরিকাশ্রমে—সরস্বতী নদীর তীরে ব্যাসদেবের আশ্রমে। সে দেখতে পেল ব্যাসদেবের স্ত্রী বটিকাদেবী স্নান শেষে সরস্বতীর তীরে দাঁড়িয়ে সূর্যপ্রণাম করছেন। প্রণাম শেষে সহসা বটিকাদেবী একটা হাই তুললেন। শুক যোগবলে সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে সেই সুযোগে বটিকাদেবীর মুখের ভেতর দিয়ে উদরে প্রবেশ করল।

একে সতী, তার ওপরে ব্যাসদেবের সহধর্মিণী, সুতরাং আশুতোষকে হার মানতে হল। তিনি শান্ত হলেন। শুকপাখিটির বুদ্ধি, তার জ্ঞানার্জনের আগ্রহ ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় পেয়ে শিব খুশি হলেন।

ব্যোমকেশ বটিকাদেবীকে আশীর্বাদ করে বললেন—এই শুক তোমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে ব্রহ্মজ্ঞানী হবে। সে জগৎবাসীকে ভাগবত তত্ত্বরস পরিবেশন করবে। আর যে গুহায় বসে সে আমার অমরকথা শ্রবণ করেছে, সেটি আজ থেকে অমরতীর্থে পরিণত হল কারণ আমি অমরনাথরূপে চিরস্থায়ী হব সেখানে।

বলা বাহুল্য সেই শুকই পরবর্তীকালের ব্যাসপুত্র পরমভাগবত শ্রীশুকদেব গোস্বামী। বারো বছর মাতৃগর্ভে বাস করে তিনি ভূমিষ্ঠ হন এবং সেদিনই সংসার ত্যাগ করেন। তিনিই মৃত্যুপথযাত্রী মহারাজা পরীক্ষিৎকে সপ্তাহকাল অখণ্ডভাবে হরিকথার অমৃতবাণী শুনিয়েছিলেন। সেই 'শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতং' বার্তাই শ্রীমদ্‌ভাগবত—নিখিল

শাস্ত্রের সার, দুঃখতপ্ত কলিগ্রস্ত সংসারী জীবগণের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন।

কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতের অমৃতকথা আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় নয়। *আমরা অমরনাথের কথায় ফিরে আসি। কৃত্তিবাস যে গুহায় বসে পার্বতী ও শুকপাখিকে অমরকথা শুনিয়েছিলেন, সেই গুহাই অমরতীর্থ, সেখানেই শিব অমরনাথরূপে চিরবিরাজমান।*

আজ আমরা সেই অমরতীর্থে পদার্পণ করব। সুধালিঙ্গরূপী শাশ্বত-সুন্দর ও মঙ্গলময় মহেশ্বরকে দর্শন করব। অতএব আর গল্প নয়। সাড়ে পাঁচটা বাজে। এখুনি চা এসে পড়বে। এবার উঠে পড়া যাক।

"আজ আর তাড়াহুড়ো করছেন কেন ঘোষদা," অসীম এখুনি শয্যাত্যাগ করতে রাজী নয়। সে বলে, "আজ তো আর ব্রেক-ফাস্টের হাঙ্গামা নেই।"

"কিন্তু প্রাতঃকৃত্য শেষ করে জিনিসপত্র সব গোছগাছ করে দিতে হবে তো।"

"কেন?" সরকারদা জিজ্ঞেস করেন।

"আমরা অমরনাথজীকে দর্শন করে এখানে ফিরে আসার আগেই ফকিরবাবু মালপত্র শেষনাগে পাঠিয়ে দেবেন। এখানে ফিরে এসে লাঞ্চ্ করেই আমরা শেষনাগ রওনা হয়ে যাব।"

"তার মানে আজ কত মাইল হাঁটতে হবে?" ব্রহ্মচারী প্রশ্ন করে।

"১৬ মাইল। এখান থেকে অমরতীর্থ ৪ মাইল অর্থাৎ যাতায়াতে ৮ মাইল আর শেষনাগ ৮ মাইল।"

"আগামীকাল রাতে আমরা কোথায় থাকব?"

"দি নিউ পাইনভিউ হোটেলে।"

"মানে?" ব্রহ্মচারী বিস্মিত এবং পুলকিত।

"হ্যাঁ, কাল আর তাঁবুতে বাস করতে হবে না। কাল আমরা পহেলগাঁওয়ে ফিরে যাব, শেষ হবে পদযাত্রা।"

"আগামীকাল তো তাহলে আমাদের ১৮ মাইল হাঁটতে হবে?"

"হ্যাঁ, উৎরাই পথ, অসুবিধে হবে না তেমন। সকালে ব্রেক-ফাস্ট করে বায়ুযান থেকে রওনা হব। ৮ মাইল হেঁটে দুপুরে চন্দনবাড়ি পৌঁছব। সেখানে লাঞ্চ্ করে সন্ধ্যার আগেই ফিরে যাব পহেলগাঁও। পূর্ণ হবে অমরতীর্থ অমরনাথ পদপরিক্রমা।"

আলোচনার যতি টেনে উঠে পড়ি। জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করি। কাজ হয়, প্রথমে ব্রহ্মচারী এবং পরে সরকারদা ও অসীম গাত্রোত্থান করে। তারাও নিজেদের জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করে দেয়।

একটু বাদে চা আসে। উপবাসী থেকে তীর্থদর্শন বিধেয়। কিন্তু আজকাল উপবাস দুই প্রকার—নিরম্বু ও চাম্বু। আমরা দ্বিতীয় পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছি। অর্থাৎ শুধু চা খেয়ে দর্শনে বের হচ্ছি। বাবা অমরনাথ অবশ্যই আমাদের পূজা গ্রহণ করবেন। কারণ চায়ে কোন দোষ নেই। বলা বাহুল্য, তবু ব্রহ্মচারী চা খেল না।

সকাল ঠিক সাড়ে ছ'টায় শুরু হল পদযাত্রা। সাধারণত পঞ্চতরণী থেকে যাত্রীরা আরও সকালে বের হন। বেরিয়েছেনও অনেকে। শুনেছি কেউ কেউ নাকি অন্ধকার থাকতেই বেরিয়ে পড়েছেন। হোঁচট খেয়ে পা ভাঙতে প্রস্তুত নই বলে, আমি অন্ধকারের

প্রতি শ্রদ্ধাশীল নই। তাছাড়া আমরা শুধু অমরনাথ দর্শনে আসি নি। সেই সঙ্গে দেবতাত্মা হিমালয়ের অপরূপ রূপ আস্বাদন করতে এসেছি। সুতরাং দিনের আলোয় চারিদিক উদ্ভাসিত হবার পরে ধীরে-সুস্থে পথে নেমেছি।

প্রায়-সমতল ও সোজা পথ। প্রশস্ত পথ। তবু সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছি। কারণ পাশাপাশি পথ চলবার চেষ্টা করলেই অশ্বরক্ষীদের চিৎকার কানে আসছে 'হৌশ্।'

সামনে ও পেছনে মানুষ আর ঘোড়ার শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রা শুরু হয়েছে শেষরাত থেকে, শেষ হবে মধ্যরাতে। এখন যাবার ভিড়, দুপুরের পর থেকে শুরু হবে ফেরার পালা। কিছুকাল আগেও কেবল শ্রাবণী পূর্ণিমাতেই প্রকৃত ভিড় হত অমরনাথের পথে। এখন আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে ভাদ্র পূর্ণিমা পর্যন্ত প্রায় প্রতিদিন এপথে ভিড় লেগে থাকে। অনেকের মুখে শুনেছি আজকাল নাকি আষাঢ়ী পূর্ণিমায় সুধালিঙ্গ সবচেয়ে বড় হয়। আমরা এসেছি ভাদ্রমাসে। মলমাস পড়ার জন্য এবছর শ্রাবণী পূর্ণিমার যাত্রা ভাদ্র-পূর্ণিমায় হচ্ছে. জানি না আমরা সেই স্বয়ম্ভু সুধালিঙ্গকে কত বড় দর্শন করতে পারব?

আগেই বলেছি পাঁচটি আশ্রয়-কুটির ও দুটি বিশ্রাম-ভবন আছে পঞ্চতরণীতে। তারই পাশ দিয়ে পথ চলেছি। মাঝে মাঝে পেছনে তাকাচ্ছি। সারা অধিত্যকাটিকে ছবির মতো সুন্দর দেখাচ্ছে। দু-পাশে সাদা সবুজ ও কালো পাহাড়। দূরে সাদা ও সবুজ নিম্ন-উপত্যকা আর স্ফটিক-স্বচ্ছ পাঁচটি ধারার আলপনা। পার্বতীকে নিয়ে অমরতীর্থে যাবার সময় অমরনাথ নাকি এখানে আনন্দনৃত্য করেছিলেন। তাই নীলকণ্ঠের জটাজাল থেকে ওখানে পাঁচটি ধারার সৃষ্টি।

ওখানে পাঁচটি, কিন্তু এখানে একটি। পাঁচটি ধারা একটি ধারায় পরিণত হয়ে সামনে প্রবাহিত। তারই তীরে তীরে পথ—অমরতীর্থ অমরনাথের পুণ্যপথ। আমরা সেই পথে চলেছি এগিয়ে। আমার বহুবছরের বাসনা পূর্ণ হবে আজ।

বাঁয়ে নদী, ডাইনে পাহাড়, মাঝখানে পুণ্য পথ। সামান্য চড়াই। অক্লেশে এগিয়ে চলেছি। হাওয়ার জন্য অবশ্য একটু একটু শীত লাগছে। লাগবেই তো, রোদ উঠতে যে এখনও অনেক দেরি।

নদীর ওপরেও পাহাড়। নাম গড়নগর। এপারের পাহাড়ের নাম ভৈরবঘাট। শিবতীর্থে এসেছি, ভৈরবের সঙ্গে দেখা করতেই হবে, সে যে শিবক্ষেত্রের রক্ষক।

অনেকে কিন্তু এ পাহাড়কে বৈরাগীঘাটও বলেন। আর্থার নেভে-ও তাই বলেছেন। এই পথের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন— 'Cross several torrents; wind round shoulder to Googamd; ascent steeply over the precipitous spur; then drop to the snow-bedded Amarawati stream, and ascend gradually to the cave, a lofty but shallow recess in the gypsum rock, with some frozen springs which represent the great Himalayan God Shiva.'

এখন পর্যন্ত আমরা অবশ্য পথের সঙ্গে এ বর্ণনার মিল খুঁজে পাচ্ছি না। হয়তো পাওয়াও যাবে না। কারণ নেভে এপথে এসেছিলেন এই শতাব্দীর প্রথম দশকে। ইতিমধ্যে পথের প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে। দুর্গমতাও অনেকখানি কমে গিয়েছে। আরেকটা কথা—নেভে অমরগঙ্গাকে অমরাবতী বলেছেন, কেন বুঝতে পারছি না। তখন কি অমরগঙ্গাকে অমরাবতী বলা হত?

আমরা অক্লেশে এগিয়ে চলেছি। এখনও পঞ্চতরণীর অধিত্যকা শেষ হয়নি। নদীতীরের এই বেলাভূমি থেকে দূরের ঐ পাহাড় পর্যন্ত ঘাস আর ঝোপঝাড়। শুনেছি এই সব ঝোপঝাড়ের মাঝে প্রচুর ভেষজ গুল্ম (Medicinal plants) রয়েছে। এবং ভারতীয় হিমালয়ের অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানেও সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণ ও সংগ্রহের কোন ব্যবস্থা নেই।

হিমালয় শুধু দেবালয় কিংবা শৈলপুরী নয়, সে অনন্ত ঐশ্বর্যের আধার। ভারত দরিদ্র দেশ। হিমালয় আমাদের দারিদ্র্য দূর করে দিতে পারে, ভারতের সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে। অথচ আজও আমরা হিমালয়ের ঐশ্বর্য আহরণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে উঠতে পারলাম না।

কিন্তু হিমালয়ের কথা থাক, অমরনাথজীর কথাই ভাবা যাক। ভক্তদের বিশ্বাস কেউ পথ হারায় না অমরনাথের পথে। অমরনাথ নিজেই যাত্রীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। আর শিবরাত্রির দিন কেউ যদি তুষারাবত দুর্গম পথ পেরিয়ে পঞ্চতরণী পর্যন্ত পৌঁছতে পারেন, তাহলে বাবা অমরনাথ নাকি তাঁর নিজের বায়ুযানে করে তাঁকে শিবালোকে নিয়ে যান।

আরে! ওখানে কে? চমকে উঠি। শুধু আমি একা নই, অনেকেই। এই মেয়েটিকেই তো সেদিন পহেলগাঁওয়ের পথে চটের জামা গায়ে দিয়ে একটা নেড়ীকুত্তা নিয়ে যেতে দেখেছি। সঙ্গে তার সেই সাহেবও রয়েছে দেখছি।

মেমসাহেবের সঙ্গে সাহেব কিংবা সাহেবের সঙ্গে মেমসাহেব—থাকবেই। তারাও যখন যাত্রায় এসেছে, তখন যাত্রাপথে তাদের সঙ্গে দেখা হওয়াও বিচিত্র নয়। সুতরাং দেখা হবার জন্য চমকে উঠি নি। বিস্মিত হয়েছি, কারণ ওরা পথ না চলে ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

না, ঠিক দাঁড়িয়ে নেই। সাহেব নদীর ধারে বালুকাবেলায় একটা গর্ত খুঁড়ছে। কিন্তু কেন? ওরা ওখানে গর্ত খুঁড়ে কি করবে?

"মনে হচ্ছে কুকুরটা মারা গিয়েছে।" মামা বলে, "এই উচ্চতায় এত ঠাণ্ডায় কি কুকুর বাঁচে?"

"কুকুরটাকে কবর দেবার জন্য সাহেব ওখানে গর্ত খুঁড়ছে।" ভাগনে যোগ করে।

মামা-ভাগনের অনুমান মনে হচ্ছে মিথ্যে নয়। যে কারণেই হোক নেড়ীকুত্তার বাচ্চাটা মারা গিয়েছে এবং ছেলেটি তার শেষকৃত্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করছে।

আর মেয়েটি? সে মরা কুকুরটাকে কোলে নিয়ে হিমালয়ের আকাশের দিকে রয়েছে তাকিয়ে। তার দু-চোখের কোল বেয়ে নেমে আসছে অশ্রুধারা।

আশ্চর্য! আমরা এদের হিপি বলি। বলি বাপে তাড়ানো, মায়ে খেদানো অপদার্থের দল। এরা নোংরা, এরা ঝগড়াটে, এরা গাঁজাখোর। এরা এল. এস. ডি. খায়। আমরা এদের স্বাভাবিক মানুষ বলেই মনে করি না। অথচ এদের বুকের মাঝেও এত স্নেহ, এত ভালবাসা।

পহেলগাঁওয়ের পথে এমন কত কুকুর ঘুরে বেড়ায়। মেয়েটি নেহাত খেয়ালের বশে কুকুরটার গলায় দড়ি বেঁধেছিল। অকারণেই সে তাকে সঙ্গে নিয়ে অমরনাথ চলেছিল। একবারও ভাবেনি কুকুরটা দুর্গম পথের ধকল এবং উচ্চ-হিমালয়ের

আবহাওয়া সইতে পারবে না।

বরং ইতিমধ্যে পথের কুকুরের জন্য ভালবাসায় মেয়েটির বুক কানায় কানায় ভরে উঠেছে। তাই আজ আর চোখের জল বাঁধ মানছে না। সে কাঁদছে। কি করবে, ভালবাসা যে বড় অন্ধ, অপত্য-স্নেহের কোন গণ্ডি নেই এ জগতে।

না, মেয়েটিকে কোন সান্ত্বনা দিতে পারি না। নীরবে ফিরে আসি পথে। ভারাক্রান্ত মনে এগিয়ে চলি অমরতীর্থের পথে। ভাবি—ভালই হল, কুকুরটা এখানে পৌঁছে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। পঞ্চতরণী পুণ্যভূমি। এখানে পুণ্যার্থীরা পূর্বপুরুষদের আত্মার সদ্‌গতির জন্য শ্রাদ্ধ করে থাকেন। পরদেশী যুবক-যুবতীর বাসনা পূর্ণ হবে। তাদের প্রিয় কুকুরটি আত্মা নিশ্চয়ই শান্তি লাভ করবে।

পঞ্চতরণীর উপত্যকা শেষ হয়ে গেল। শুরু হল চড়াই—খাড়া চড়াই। এবারে এক মাইলে প্রায় হাজার দেড়েক ফুট ওপরে উঠতে হবে। অনেকের মতে এটি পিসুর চেয়ে কঠিন। তাঁরা বলেন—'most toilsome ascent'.

আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আমরা সত্যি সত্যি শ্রান্ত। বারবার বিশ্রাম নিতে হচ্ছে। তবু বলব, পিসুর চেয়ে কঠিন নয় এ চড়াই। উচ্চতা বেশি বলেই এমনটি মনে হচ্ছে।

সারি বেঁধে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। একটির পর একটি গিরিশিরা অতিক্রম করছি। কেবলই ওপরে উঠছি আর উঠছি।

মাঝে মাঝে পথের ওপর দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছি। পাশের পাহাড়ের দিকে তাকাচ্ছি, সব শ্রান্তি দূর হয়ে যাচ্ছে। দেখছি আর দেখছি। দু-চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ছে নিবেদিতার সেই বর্ণনা— 'At these heights we often found ourselves in great circles of snow-peaks, those giants must have suggested to the Hindu mind the idea of the Ash-encovered God.—' সত্যি তাই! আমরা ভস্মমাখা ধূর্জটির দেশে এসেছি।

প্রতিদিনের মতো আজও সেই খোঁড়া ভদ্রলোক আমাদের পথে রওনা হয়েছেন। প্রতিদিনের মতো আজও তিনি আমাদের ধরে ফেললেন। 'জয় বাবা অমরনাথ!' বলে অভিনন্দিত করলেন। তারপর প্রতিদিনের মতো আজও তিনি আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলেন।

তবে আজ আমরাও বেশ তাড়াতাড়ি পথ চলেছি। কেউ অযথা সময় নষ্ট করছে না। আবৃত্তি গান ও সাধুসঙ্গ—সব বন্ধ। কথাও বড় একটা বলছে না কেউ। সবচেয়ে বিস্ময়কর সরকারদা সবার আগে আগে চলেছেন।

অথচ আজ আমরা অভুক্ত। আর আজকের পথ, বিশেষ করে এখন আমরা যে চড়াই পার হচ্ছি, তা যেমন খাড়া তেমনি পিছল। উচ্চতাজনিত কষ্টও হচ্ছে খুব। তবু সবাই একমনে পথে চলেছে। আজ যে আমরা সবাই এক মন। অমরতীর্থ দর্শনের আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষায় পথের দুঃখ-কষ্ট উপেক্ষা করে কৌতূহলী মন নিয়ে চলেছি এগিয়ে।

পথের পাশে গাছপালা নেই বললেই চলে। তবে পাহাড়ের গা বেয়ে মাঝে মাঝে ঝরনা আসছে নেমে। আর নীল আকাশের বুকে চলেছে অবিরত মেঘের খেলা।

সূর্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি এখনও। তার সময় হয় নি যে! তবে চড়াইয়ের জন্য

শীত লাগছে না। মাঝে মাঝে অবশ্য কোথা থেকে যেন পাগলের মতো ঠাণ্ডা বাতাস ছুটে আসছে। তখন একেবারে হাড় সুদ্ধু থর থর করে কেঁপে উঠছে। তাহলেও স্থির ও অচঞ্চল চরণে চলেছি এগিয়ে। আমরা যে অমরতীর্থের দ্বারে উপনীত, আমরা যে আজ অমরনাথজীকে দর্শন করব!

হঠাৎ ভাবনা থেমে যায়। ওঁদের দিকে নজর পড়তেই থমকে দাঁড়াই। ওঁরা কারা? ঐ যে পথের পাশে বসে গলাগলি করে গাঁজায় দম দিচ্ছেন।

"ঠিকই সন্দেহ করেছেন শঙ্কুদা!" অশোক বলে, "এই দুজন সাধুই সেদিন পহেলগাঁওয়ের পথে মারামারি করছিলেন।"

আশ্চর্য! সেদিন তো ভাবতেই পারি নি এঁরা আর কখনও পাশাপাশি পথ চলতে পারবেন। বরং ভেবেছি—মারামারিটা ভবিষ্যতের জন্য জমা রইল, কারণ এঁরা একদিনে যাত্রায় আসবেন।

তাই এসেছেন। তবে আমার আশঙ্কা সত্য হয় নি। আজ তাঁরা একসঙ্গে দর্শনে চলেছেন। অভিন্নহৃদয় হয়ে গঞ্জিকা সেবন করছেন।

কিন্তু একি শুধুই সাধুবাবাদের সাধন-ভজনের ফল? না, হিমালয়ের বিচিত্র লীলা, বাবা অমরনাথের অপার করুণা?

ষোল

পঞ্চতরণী থেকে রওনা হবার ঠিক একঘণ্টা পরে ভৈরবঘাটের চড়াই শেষ হল। সেখানেই সাইনবোর্ড—

Santsingh Top
Ht. 13,500'

ভেবে অবাক হই! মাত্র একঘণ্টায় সবাইকে নিয়ে দু-মাইল পথ এসেছি। এর মধ্যে মাইলখানেক কঠিন চড়াই। এক মাইলে ওদের প্রায় দু-হাজার ফুট উঠে আসতে হয়েছে। আসবেই তো! আজ যে অমরনাথ চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছেন। তাই পথশ্রম ও দৈহিক দুঃখকে তুচ্ছ জ্ঞান করে পাগলের মতো ছুটে এসেছি।

তাহলেও এখানে একটু বিশ্রাম করে নেওয়া যাক। অনেকটা চড়াই পেরিয়ে এই সংকীর্ণ ও নাতিদীর্ঘ সমতলটুকু পাওয়া গিয়েছে। জায়গাটিও ভারি সুন্দর। প্রায় পর্বতশিখরে একটি গিরিখাত (Gully)। দুপাশে পাহাড়ের প্রাচীর, মাথার ওপরে মেঘমুক্ত নীলাকাশ। সরকারি নাম 'সান্ত্-সিংহ পারি।' আর ভক্তরা বলেন ভৈরবঘাটি। শৈবতীর্থ অমরনাথের ক্ষেত্রপাল ভৈরবনাথ এখানেই বাস করেন। তাঁর অনুমতি ছাড়া অমরতীর্থে যাওয়া সম্ভব নয়।

হিমালয়ের প্রায় প্রত্যেক শিবতীর্থে এমন একটি করে ভৈরবঘাটি আছে। সে জায়গাগুলোর অবস্থানও ঠিক একই রকম—শিবক্ষেত্রের সীমান্তে এমনি একটু করে উঁচু সমতল।

অনতিদূরে সঙ্গম দেখা যাচ্ছে। সঙ্গম মানে পঞ্চতরণী নদী ও অমরগঙ্গার সঙ্গম। অমরগঙ্গা এসেছে অমরনাথ থেকে। এখানে সে মিলিত হয়েছে পঞ্চতরণী নদীর সঙ্গে।

তারপরে সিন্ধ নালা নাম নিয়ে চলে গিয়েছে বলতাল। বলতালের যাত্রীরা সিন্ধ নালার তীরপথ দিয়ে অমরনাথে আসেন। মঞ্জু প্রণতিরাও তাই এসেছে।

কিন্তু ওদের কথা আর নয়। অমরগঙ্গার কথাই ভাবা যাক। শুধু এ অমরগঙ্গা নয়, সেই সঙ্গে আরেক অমরগঙ্গার কথা—মণিময় মণিমহেশের অমৃতধারাও অমরগঙ্গা। তারই তীরে তীরে পথ চলে আমরা হাডসার থেকে মণিমহেশ গিয়েছি। কোথায় কাশ্মীর আর কোথায় চাম্বা? কোথায় মণিমহেশ আর কোথায় অমরনাথ? কিন্তু অমরগঙ্গা দুই তীর্থের পুণ্যবারি নিয়ে চলেছে। *

আমরা পঞ্চতরণী উপত্যকা থেকে ভৈরবঘাটের ওপরে উঠে এসেছি। এবারে তার গা বেয়ে অমরনাথ উপত্যকায় অবতরণ করব। সেখানে অমরগঙ্গা সঙ্গী হবে আমাদের।

অতএব আর দেরি নয়। তীর্থের দেবতা ডাক দিয়েছেন, এবারে তাঁর কাছে যাওয়া যাক।

"বাবা অমরনাথজী কি?

"জয়!"

উঠে দাঁড়াই। আবার শুরু হয় পথ-চলা—অমরতীর্থের পথ।

মিনিট কয়েক হাঁটার পরেই সমতল শেষ হয়ে গেল। শুরু হল উৎরাই। আমরা অমরনাথ উপত্যকায় নেমে চলেছি, ভৈরবঘাটের অপর পাশে অবতরণ করছি।

কিছুক্ষণ বাদেই দেখা হল তার সঙ্গে—অমরগঙ্গার সঙ্গে। অনেক নিচে বাঁদিকে দেখা যাচ্ছে সঙ্গম—পঞ্চতরণী নদী ও অমরগঙ্গার সঙ্গম।

পথটা এখানে এসে দু-দিকে প্রসারিত। পথের পাশে পথ নির্দেশিকা—ইংরেজী সাইনবোর্ড। বাঁদিকে বলতাল, সোজা পঞ্চতরণী ও ডানদিকে অমরতীর্থের পথ। বলতালের পথটি এখানে এসে পঞ্চতরণী পথের সঙ্গে মিশেছে। অর্থাৎ এটি শুধু নদীর সঙ্গম নয়, পথের সঙ্গমও বটে।

বলতালের পথটিকে একবার ভাল করে দেখে নিই। এই পথ দিয়েই মঞ্জু ও প্রণতিরা এখানে এসেছিল। গিয়েছিল অমরনাথে। **

এতক্ষণ আমরা উত্তর-পশ্চিমে এসেছি, এবারে যেতে হবে উত্তর-পূর্বে। এতক্ষণ এসেছি পঞ্চতরণী নদীর প্রবাহকে অনুসরণ করে, এবারে চলেছি অমরগঙ্গার প্রবাহের বিপরীত দিকে।

ডানদিকের পথ ধরে এগিয়ে চলি। পাহাড়ের গা দিয়ে পথ। আস্তে আস্তে ঢালু হয়েছে। নদীর ওপারে পাহাড় একটু দূরে। তীরভূমির কাছাকাছি কোথাও কোথাও বরফ জমে আছে কিন্তু অমরগঙ্গা স্বচ্ছ শীতল স্রোতস্বিনী। শুধু সুন্দরী নয়, বেগবতীও বটে। আমরা তার তীরভূমির দিকে নেমে চলেছি।

একটা বাঁক ফিরেই দেখতে পেলাম তাঁকে—সেই অপরূপকে, আমার শৈশবের স্বপ্ন অমরতীর্থ অমরনাথকে।

---

* লেখকের 'হিমতীর্থ হিমাচল' বইখানি দ্রষ্টব্য।

** কালিদাসবাবুর কথা সেদিন মনে পড়ে নি আমার। কারণ সে দুর্ঘটনা ঘটেছে একবছর বাদে। অমরনাথ দর্শন করে কালিদাসবাবুরা ওখান থেকেই বলতালের পথ ধরেছিলেন।

নদীর ওপারে অনেকটা উঁচুতে সেই শাশ্বত-সুন্দরী শিবালয়—বাবা অমরনাথের অভিনব আলয়। আমি প্রণাম করি। মনে মনে বলি—ঠাকুর, সকল বাধা উপেক্ষা করে আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি। তুমি আমার প্রাণের প্রণতি গ্রহণ কর।

এখনও কিন্তু কিছুদূরে! ভৈরবঘাটি থেকে গুহা দু-মাইল। আমরা তার আধমাইলের মতো পথ পেরিয়েছি। এখন উৎরাই পথে নেমে যেতে হবে অমরগঙ্গার বেলাভূমিতে। সেখানে পুল পেরিয়ে ওপারে। চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে পৌঁছতে হবে অমরতীর্থে।

—জয় বাবা অমরনাথ!

সামনের যাত্রীদল জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল। আমরাও সাড়া দিই—জয় অমরনাথ!

দূর যে আর দূরে নয়। দুঃখের পথ শেষ হয়েছে, আনন্দতীর্থ সমাগত।

পরম প্রত্যাশা পূর্ণ হবার আনন্দে উদ্বেলিত ভক্তবৃন্দ ভগবানের জয়গানে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেছে। জয় আর জয়! ভগবানের জয় আর ভক্তের জয়'! অমরনাথের জয় আর আমাদের জয়—আমরা যে দূরকে নিকট করেছি।

দু-জোড়া সাহেব-মেম এদিকে আসছে। ওরা অমরনাথ দর্শন করে ফিরছে। অমরতীর্থ কোন বিশেষ ধর্মের খাসমহল নয়। সর্বধর্মের সমান অধিকার সেখানে। অমরনাথজী মানুষের ভগবান।

এ ধারণা আজকের নয়, বহুবছরের। ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত বইতেও পড়েছি—'Along with the train of Hindu pilgrims many Europeans and Americans have been seen going to this place.' (R. C. Arora.)

ওরা কাছে আসে। মামা-ভাগনে যুবকদের সঙ্গে কথা বলে, তুলতুল গৌরী ও মামা কথা বলে যুবতীদের সঙ্গে। শ্বেতাঙ্গ যুবক-যুবতীরা খুব খুশি। অমরতীর্থকে ওদের নাকি ভারি ভাল লেগেছে। বারবার 'fantastic' 'splendid' ও 'sublime' প্রভৃতি শব্দগুলো ব্যবহার করছে। তারপরে ধীরেসুস্থে জানায়, ওরা গতকাল খুব সকালে শ্রীনগর থেকে রওনা দিয়ে বলতাল হয়ে সন্ধ্যায় অমরনাথ পৌঁছেছে। গুহার নিচের সমতল জায়গাটুকুতে তাঁবু খাটিয়ে রাত্রিবাস করেছে। আজ সকালে অমরনাথজীকে দর্শন করে পঞ্চতরণী পথে ফিরে যাচ্ছে। পহেলগাঁও। অর্থাৎ ওরা দুটি পথেই পদচারণা করতে পারল। আর সেই সঙ্গে শ্রীনগর, সোনামার্গ ও পহেলগাঁও সহ সিন্ধ ও লিডার উপত্যকা ভ্রমণের সুযোগ পেয়ে গেল।

অভিনবত্বের জন্য অভিনন্দন জানাই পরদেশী হিমালয়-প্রেমিকদের। তার পর এগিয়ে চলি আপন পথে।

নেমে এলাম অমরগঙ্গার তীরে। পথটি দুভাগে বিভক্ত। প্রশস্ত অংশটি একটা কাঠের সাঁকো পেরিয়ে ওপারে চলে গিয়েছে। আর সংকীর্ণ অংশটি পাহাড়ের গা বেয়ে সামনে প্রসারিত। আমরা পুল পেরিয়ে অমরগঙ্গার ডানতীরে এলাম।

অমরতীর্থ হারিয়ে গেল।

না, না, তিনি আছেন, তিনি থাকবেন। আছেন সামনের ঐ পাহাড়গুলোর পেছনে। পাহাড় আড়াল করেছে তাঁকে। আবার তিনি আবির্ভূত হবেন আমার সামনে। তাঁর সঙ্গে আমার সকল ব্যবধান যাবে ঘুচে। সেই পরমুহূর্তকে নিকটতর করার জন্য চলার বেগ

বাড়িয়ে দিই।

কিন্তু খুব জোরে চলতে পারছি না। এপারে আসার পরে উৎরাই পথ চড়াই হয়েছে। 'ইনট্যুর'-এর সঙ্গে মঞ্জু ও প্রণতিরা দু-মাস আগে অমরনাথ এসেছিল। অমরগঙ্গার ওপরে তখন কঠিন বরফ। তারা সেই তুষারাবৃত সমতল প্রান্তর পেরিয়ে অর্থাৎ অমরগঙ্গার বুকের ওপর দিয়ে অমরতীর্থের পাদদেশে পৌঁছেছে। তাদের এমন চড়াই ভাঙতে হয় নি।

আজ অমরগঙ্গা তরল-তরঙ্গিনী। তাই আমরা অমরগঙ্গার তীরে তীরে পথ চলেছি। সে ওপর থেকে নিচে নামছে, আমরা নিচের থেকে ওপরে উঠছি। সে আসছে অমরনাথের কাছ থেকে, আমরা যাচ্ছি অমরনাথের কাছে। কিন্তু সেও অশান্ত, আমরাও অশান্ত। তার অস্থিরতা স্বর্গবারি মর্ত্যে পৌঁছে দেবার জন্যে, আমাদের অস্থিরতা স্বর্গদ্বারে পৌঁছবার জন্যে।

'Holy Cave 1 Mile
Srinagar 89 Miles
Pahalgam 29 Miles'

সাইনবোর্ডটির দিকে নজর পড়তেই ভাবনা থেমে যায়। থমকে দাঁড়াই। পুলকিত কণ্ঠে তুলতুল বলে ওঠে, "উনত্রিশ মাইল এসে গেছি!"

"হ্যাঁ আর মাত্র এক মাইল।" অসীম যোগ করে।

ওরা তাড়াতাড়ি পা চালায়। আমরা ওদের অনুসরণ করি।

তবে এখনও সারি বেঁধে এগোতে হচ্ছে। একে তো সংকীর্ণ পথ, তার ওপরে ঘোড়াওয়ালাদের 'হৌশ'। পদাতিকদের পক্ষে প্রকৃতই বিরক্তিকর।

আর তাই বোধহয় কয়েকজন পদযাত্রী পথ থেকে নেমে গিয়েছেন অমরগঙ্গার বেলাভূমিতে। ওখানে পদযাত্রীদের পায়ে পায়ে জলের ধারে ধারে সুন্দর একটি পায়ে চলার পথ সৃষ্টি হয়েছে। ওখানে হৌশের উৎপাত নেই। তবু আমরা এই মূলপথ দিয়েই এগিয়ে চলি।

সকাল সওয়া আটটা বাজে। রোদ উঠে গিয়েছে। তার সোনালি রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে পাহাড় ও অমরগঙ্গাকে। চারিদিকে সুন্দরের ছড়াছড়ি। কিন্তু কোথায় সেই পরমসুন্দর? সেই মঙ্গলময় শিবালয়?

অমরগঙ্গা পার হবার সময়ে সেই যে অমরতীর্থকে হারিয়ে ফেলেছি, তার পরে আর তাঁকে দেখতে পাই নি এখনও। বিশ মিনিট কেটে গেল, হাঁটছি তো হাঁটছিই। কোথায় আমার সেই মানসতীর্থ?

'Look ahead,
You are near the Goal.'

কোথায়? সাইনবোর্ডটার দিকে চোখ পড়তেই তাড়াতাড়ি সামনে তাকাই।

হ্যাঁ, ঐ তো? ঐ যে অমরতীর্থ—আমার মানসতীর্থ! পরমারাধ্য অমরনাথের গুহামন্দির!

যেখানে পৌঁছবার জন্য সকল বাধা উপেক্ষা করে ছুটে এসেছি, বিশ্বকর্মার সেই অপরূপ সৃষ্টি আমার সামনে। যাঁর কাছে আসার জন্য আমি অসুস্থ গৌতমকে ফেলে

এসেছি, তিনি রয়েছেন এখানে। কাছে, খুবই কাছে।

সাইনবোর্ড পেরিয়ে নেমে আসি একটুকরো সমতলে। এখানে-ওখানে বড় বড় পাথর পড়ে আছে। সেগুলোকে ডিঙিয়ে কিংবা পাশ কাটিয়ে এগোতে একটু সময় লাগছে। এখন সাড়ে আটটা। ঠিক দু-ঘণ্টা হল আমরা পঞ্চতরণী থেকে রওনা হয়েছি।

আবার অমরতীর্থ হারিয়ে গেল। আমাদের যে নামতে হচ্ছে নিচের দিকে, বাঁদিকের পাহাড় থেকে একটা হিমবাহ নেমে এসেছে অমরগঙ্গায়। শক্ত বরফের সাদা হিমবাহ। তারই ওপরে ফুটখানেক চওড়া একটা ধাপ কেটে দেওয়া হয়েছে। সেই ধাপের ওপর দিয়ে যেতে হবে ওপারে।

"তবু যাহোক, একটু বরফ পাওয়া গেল।" তুলতুলের আনন্দ আর ধরে না। কি করবে, সে যে জীবনে কখনও বরফের ওপরে হাঁটবার সুযোগ পায় নি। তাই দুধের স্বাদ ঘোল দিয়ে মেটাতে চাইছে।

হিমবাহটি মাত্র শ'খানেক ফুট চওড়া। নতিমাত্রা (Gradient) ৩০ ডিগ্রির বেশি হবে না। তবু অশোক তুলতুলকে সাবধান করে, "দেখো, সাবধানে যেয়ো।"

"পড়ে গেলে মুশকিল হবে কিন্তু।" ব্রহ্মচারী যোগ করে।

কিন্তু ওদের সাবধানবাণী তুলতুলের কানে ঢুকেছে বলে মনে হচ্ছে না। সে এদিক-ওদিকে দেখতে দেখতে হেলে-দুলে হিমবাহের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে। গৌরী এবং মায়াও একইভাবে তুলতুলকে অনুসরণ করছে।

না, মোটেই ভুল করছে না ওরা। ব্রহ্মচারী ও অশোকের আশঙ্কা অমূলক। কারণ আগেই বলেছি হিমবাহটির ঢাল তিরিশ ডিগ্রির বেশি নয়। খাদও বহু নিচে। সুতরাং পা-পিছলে পড়ে গেলেও তেমন কিছু হবে না।

শুধু তুলতুল নয়, আমরাও পুলকিত। এ যাত্রায় এই প্রথম পথে বরফ পেলাম। অথচ অনেকের মুখেই শুনেছি, তাঁরা যাত্রায় এসে সঙ্গমের পর থেকেই বরফ পেয়েছেন। এসব জায়গা তো নাকি বরফে ঢাকা থাকে।

হিমবাহ পেরিয়ে ওপরে উঠে আবার অমরতীর্থের সঙ্গে দেখা হল। এবারে আরও কাছে। বলতে গেলে আমরা তাঁর পাদদেশে পৌঁছে গিয়েছি। সামনে শুধু একফালি প্রায়-সমতল পাথুরে প্রান্তর।

নেমে আসি প্রান্তরে। বাঁয়ে পাহাড়, ডাইনে অমরগঙ্গা আর সামনে অমরতীর্থ। প্রান্তরটি খুব বড় নয়। তাহলেও তেরো হাজার ফুট উঁচুতে এতখানি সমতল খুব বেশি দেখা যায় না। এটাই অমরনাথের শিবিরক্ষেত্র বা ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড্। শ্বেতাঙ্গ দম্পতিরা এখানেই গতকাল রাত্রিবাস করেছেন। 'ইনট্যুর'-এর যাত্রীরাও এখানে রাত কাটিয়েছে। আমাদের সে সুযোগ নেই। সুতরাং এগিয়ে চলি।

প্রান্তরের প্রান্তে পাহাড়ের গায়ে অমরতীর্থ। শত শত মানুষ সারি বেঁধে সেখানে চলেছেন। আমরা ধৈর্যহীন তবু তাড়াতাড়ি চলার উপায় নেই। প্রান্তরে যে মেলা বসেছে। মানুষ আর ঘোড়ার মেলা। অশ্বারোহীদের নামতে হচ্ছে এখানে। কেউ স্নান করতে যাচ্ছেন, কেউ স্নান শেষ করে জামা-কাপড় পালটাচ্ছেন। কেউ দর্শন করতে যাচ্ছেন, কেউ দর্শন করে এসে বিশ্রাম করছেন। কেউ বা চা কিংবা খাবার খাচ্ছেন। গুটিকয়েক চা ও খাবারের দোকান বসে গিয়েছে।

আমাদের খিদে পায় নি। তাছাড়া স্নান করে না খেয়ে বাবার কাছে যাওয়াই যে বিধেয়। আমরা না খেয়ে যাচ্ছি কিন্তু স্নান করব না। কেবল ভাগনে ও গৌরী বলে বসল, "আপনারা এগিয়ে যান, আমরা চট করে একটু স্নান করে নিই। মন্দিরে দেখা হবে।"

আপত্তি করা ঠিক নয়। আর আমরা যত উঁচুতে এসে থাকি, এখানকার জল যতই ঠাণ্ডাই হয়ে থাক, স্নান করে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে না। শরীরকে সুস্থ রাখে মন। সেই মনের তাগিদে ভাগনে ও গৌরী স্নান করতে চলেছে। আমি নিজেও এমন স্নান বহুবার করেছি। কখনই কিছু হয়নি। বরং সেই শীতলঅবগাহন পুণ্যস্নানে পরিণত হয়ে দেহ ও মনকে আনন্দময় করে তুলেছে। গৌরীদের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম হবে না।

গৌরীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠতে থাকি। কয়েক পা উঠেই পথের বাঁদিকে একটা ঝরনা। ঝরনাধারা নেমে গিয়ে অমরগঙ্গায় মিশেছে। এখানেও বেশ ভিড়। কেউ জল নিচ্ছেন, কেউ বা স্নান করছেন। জনৈক পুণ্যার্থী বললেন—এখানেই স্নান করার নিয়ম।

হতে পারে। কারণ ১৮৯০ সালে প্রকাশিত গেজেটিয়ারে পড়েছি—'in the Amar Veyut, the stream which flows at the bottom; the men divest themselves of all clothing, and enter the cave either entirely naked, or with pieces of birch-bark, which do duty of fig-leaves. The women content themselves for the most part with laying aside all superfluous articles of clothing, and shrouding themselves in a long sheet or blanket.'

আমরা কেউ ভূর্জপত্র কিংবা কম্বল নিয়ে আসি নি। অতএব স্নান করছি না। কিন্তু মন্দিরে যাচ্ছি। অন্তত হাতমুখ ধুয়ে নেওয়া উচিত। তাই পাথর ডিঙিয়ে পায়ে পায়ে নেমে আসি ঝরনার তীরে। হাতমুখ ধুয়ে জল খেয়ে ওয়াটার-বট্‌লে জল ভরে নিই—অমরতীর্থ অমরনাথের পুণ্যবারি।

আবার উঠে আসি পথে। এগিয়ে চলি গুহাতীর্থের দিকে। আমাদের আগে আগে সেই খোঁড়া ভদ্রলোক চলেছেন। অবাক কাণ্ড! তিনি যে কখন আমাদের ছাড়িয়ে এসেছেন! তাঁর তো এতক্ষণে দর্শন হয়ে যাবার কথা!

"ভদ্রলোক নিশ্চয় তর্পণ সেরে তবে গুহাতীর্থে চলেছেন।"

হয়তো মামার অনুমান মিথ্যে নয়। কিন্তু...। হ্যাঁ, একটা 'কিন্তু' থেকে যাচ্ছে। কেবল স্নান তর্পণের জন্যই তাঁর এত দেরি হয়েছে কি?

পথের ধারে ধারে সাধুরা বসে আছেন। না, কেউ কিছু চাইছেন না। কি চাইবেন? টাকা-পয়সা, খাবার-দাবার? এখানে টাকা-পয়সা মূল্যহীন। আর এখানে এসে যে আমাদেরই ক্ষুধা ও তৃষ্ণাবোধ হারিয়ে গিয়েছে। ওঁরা তো লোভ-মোহ-কাম-কাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী। তাই পথের পাশে বসে কেউ শাস্ত্রালোচনা করছেন, কেউ ভজন গাইছেন, কেউ বা ধ্যান করছেন।

শুরু হল সিঁড়ি। অমরগঙ্গার বেলাভূমি থেকে শ' তিনেক ফুট উঁচুতে অবস্থিত গুহাতীর্থ। শেষদিকে তার প্রায় একতৃতীয়াংশ অর্থাৎ শ'খানেক ফুট জুড়ে এই সিঁড়ি—সোজা গুহায় উঠে গিয়েছে। শুনেছি একশ' ষাটখানি সিঁড়ি আছে এখানে। আমরা এখন সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছি। মানস-তীর্থপথের শেষাংশ অতিক্রম করছি।

সিঁড়িগুলি বেশ খাড়া। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে একটু বিশ্রাম করে নিতে হচ্ছে। সেই ফাঁকে বারবার চেয়ে চেয়ে গুহাটিকে দেখছি। বিশ্বকর্মার বিচিত্র সৃষ্টি এই গুহামন্দির। আমরা বলি অমরতীর্থ, বৈজ্ঞানিকরা বলেন গুহা। তাঁরা বলেন—৩৪°১৩´ অক্ষরেখা ও ৭৫°৩২´ দ্রাঘিমায় অবস্থিত এই গিরিগুহা। পেছনের পাহাড়টির নাম অমরনাথ পর্বত। উচ্চতা ১৭,৩২১ ফুট। গুহার উচ্চতা ১৩,৫০০ ফুট। তার মানে গুহার ওপরে প্রায় চার হাজার ফুট উঁচু পাহাড়। তাঁদের মতে বাতাসের ক্ষয়করণের (Erosion) ফলে সৃষ্টি হয়েছে এই গুহা। উত্তর-পশ্চিমমুখী গুহা।

গুহাটির আকার নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। আমরাও ফিতে নিয়ে আসি নি যে মেপে দেখব। তবে 'একই আকাশ ভুবন জুড়ে' গ্রন্থের লেখক বন্ধুবর দেবপ্রসাদ দাশগুপ্ত বলেছেন—'গুহার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতা শ'দেড়েক ফুট। স্যার ফ্রান্সিস ইয়ংহাজব্যান্ড্ এই গুহার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে বলেছেন—'The Cave itself ıf of gypsum, and is fifty yards long by fifty broad at the mouth, and thrity at the centre, ın-side is a frozen spring which is the object of worship. .'

আমি অমরতীর্থে চলেছি। আর কয়েকটি মুহূর্ত। তারপরে, হ্যাঁ, তারপরেই আমার শৈশবের স্বপ্ন সফল হবে। আজ কত কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে একানব্বুই বছর আগে প্রকাশিত 'বিশ্বকোষ'-এর বর্ণনা—'অমরেশ্বরের গুহা। গুহায় প্রবেশ করিলে প্রথমে প্রায় ৫০ হাত সরল পথ। তাহার পর দক্ষিণ দিকে একটু ফিরিয়া আবার ১৬ হাত অগ্রসর হইতে হয়। গুহার ভিতর অত্যন্ত শীতল; উপর হইতে সর্বদাই টপ্‌টপ্ করিয়া জল ঝরিতেছে। মহাদেব স্বয়ম্ভু তুষারলিঙ্গ এইখানে—নির্মল ফটিকের ন্যায় ধপ্‌ধপ্ করিতেছে। কথিত আছে, চন্দ্রের মত শিবলিঙ্গের নাকি হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। পূর্ণিমাতে মহাদেবের পূর্ণমূর্তি দেখা যায়। তাহার পর প্রতিপদ হইতে এক এক কলা করিয়া কমিয়া আসে। অমাবস্যাতে তুষার-লিঙ্গের কিছুই অবশিষ্ট থাকে না,...আবার শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে ঐ লিঙ্গ প্রত্যহ এক এক কলা করিয়া বাড়িতে থাকে। এই স্থান জনশূন্য, অতিশয় ভয়ানক; বার মাস তথায় কেহই থাকিতে পারে না। ক্বচিৎ যোগী-সন্ন্যাসীদের কেহ কেহ সেখানে তিন-চার মাস অবস্থান করেন। তাঁহারাই বলিয়া থাকেন যে, চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে অমরনাথের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

'মহারাজ গোলাব সিংহ (কাশ্মীরের রাজা) একবাব সেখানে রাত্রিবাস করিয়াছিলেন। কথিত আছে, মহাদেব সর্পরূপে তাঁহাকে দেখা দিয়া অন্তর্হিত হন। আরও প্রবাদ আছে, এই স্বয়ম্ভুলিঙ্গ নাকি কপোতরূপও (শুক) ধারণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ সে কথা মিথ্যা। অমরনাথে যাইবার সময়ে পাণ্ডারা কতকগুলি পায়রা কাপড়ের ভিতর লুকাইয়া লইয়া যায়। শেষে অমরনাথের গুহার কাছে উপস্থিত হইয়া সেই সকল পায়রা উড়াইয়া দেয়। যাত্রীরা কপোতরূপী মহাদেবকে দেখিয়া ভক্তি করে। অমরনাথে আরও কয়েকটি দেবদেবী ও পাষাণময় বৃষের মূর্তি আছে।'

না, আমাদের সঙ্গে শুকপাখিদের সাক্ষাৎ হয় নি এখনও। আমার ধারণা কপোতরূপী মহাদেব নয়, সেই লীলাশুকের অমরত্ব প্রমাণ করার জন্যই পাণ্ডারা প্রতিবছর যাত্রার সময় একজোড়া পায়রা এনে ছেড়ে দেয় এখানে। অনেকেই সেই কপোত-কপোতীকে দেখে ভক্তিভরে প্রণাম করেছেন। তাঁরা ভুলে গিয়েছেন যে সেই

শুকই শ্রীশুকদেব গোস্বামী। কাজেই শুকরূপে তাঁর অমরনাথ গুহায় অবস্থান সম্ভব নয়।

প্রায় এসে গিয়েছি। আর বড়জোর বিশ পঁচিশ ধাপ সিঁড়ি বাকি আছে। তারপরেই আমরা গুহায় প্রবেশ করব। আজ আমার মনে পড়ছে ঊনআশি বছর আগের সেই দিনটির কথা, যেদিন পরিব্রাজক বিবেকানন্দ এই গুহায় প্রবেশ করেছিলেন। নিবেদিতা বলেছেন—স্বামীজী গুহায় প্রবেশ করলেন। হাসিমুখে ভূমিষ্ঠ হয়ে দুবার দুদিক থেকে লিঙ্গমূর্তিকে প্রণাম করলেন। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হল তিনি সদাশিবের শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করেছেন, তাঁর সামনে স্বর্গের দ্বার খুলে গিয়েছে।

পরে স্বামীজী সবাইকে বলেছেন যে, পাছে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন তাই নিজেকে কষে ধরে রেখেছিলেন। সেদিন স্বামীজীর এত বেশি পরিশ্রম হয়েছিল যে তাঁর হৃৎপিণ্ডের গতি স্তব্ধ হয়ে যেতে পারত। অথচ পরে একজন ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করে বলেছেন, সেদিন থেকেই তাঁর হৃৎপিণ্ড চিরদিনের মতো বড় হয়ে গিয়েছে।

শেষ ধাপটি পেরিয়ে এলাম। উঠে এলাম ওপরে—অমরতীর্থের অলিন্দে। আমরা কি সত্যই সকল সংকীর্ণতার ওপরে উঠে আসতে পেরেছি?

একবার নিচের দিকে তাকাই। মাটি আর মানুষের জগৎ। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু। অমরগঙ্গা ও তার বেলাভূমি, ওপারের পাহাড় আর এপারের পথ—সবকিছু ছবির মতো। পথ বেয়ে শত শত মানুষ উঠে আসছেন এখানে, এই স্বপ্নের স্বর্গে—সকল পাপ ও তাপের ঊর্ধ্বে অমরতীর্থ অমরনাথে।

কিন্তু না, আর নিজের কথা নয়, আমি যে ওপরে উঠে এসেছি। না, এখানকার কথাও আর নয়। এবারে ভেতরে যাওয়া যাক। সতীর্থদের সঙ্গে প্রবেশ করি অমরতীর্থে।

গুহার ভেতরে আলো কম। তার ওপরে জলসিক্ত। কিন্তু পথ চলতে অসুবিধে হচ্ছে না। প্রথমেই একফালি সমতল। তারপরে কয়েক ফুট উঁচুতে আরেকফালি সমতল। লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। দু-পাশে দু-সারি সিঁড়ি। একপাশে 'IN' ও আরেকপাশে 'OUT' লেখা। বেশি নয়, পাঁচ-ছ' ধাপ সিঁড়ি। সিঁড়ির দু-ধারেও কাঠ ও লোহার রেলিং। যাত্রার দিনে পঁচিশ/তিরিশ হাজার যাত্রী আসেন। তাই ভিড় এড়াবার জন্য সেই রেলিঙের ব্যবস্থা। এতে অবশ্য গুহামন্দিরের কিঞ্চিৎ শ্রীবৃদ্ধিও সাধিত হয়েছে।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি ওপরে। আবার একফালি সমতল। তারপরে আরেকটি স্তর। সেখানেও লোহার রেলিং।

উঠে আসি তৃতীয় স্তরে। বলা বাহুল্য এ স্তরটি সবচেয়ে ছোট এবং এখানে আলো খুবই কম।

তাহলেও দেখতে পাচ্ছি তাঁকে—আমার প্রাণের পরমারাধ্যকে। যাঁকে দর্শন করতে, প্রণাম করতে, আলিঙ্গন করতে কলকাতা থেকে ছুটে এসেছি এই গহন-গিরি-কন্দরে, বাবা অমরনাথের সেই স্বয়ম্ভু সুধালিঙ্গ আমার সামনে। আমি তাঁকে দর্শন করি। অপরূপকে অবলোকন করি। আমার দু-নয়ন সার্থক হয়, মন এক অনির্বচনীয় আনন্দে ভরে ওঠে।

গুহার ডানদিকে প্রায় শেষপ্রান্তে সুধালিঙ্গ। সুকঠিন ও উজ্জ্বল বরফের লিঙ্গমূর্তি। তাঁর গায়ের রং সাদা হলেও রুপোলী নয়, ঈষৎ নীল। ফলে সাধারণ তুষারস্তূপের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল এবং সুন্দর। তিনি যে সুন্দর অনন্তসুন্দরের মূর্ত প্রতীক।

ভক্তদের ফুল ও বেলপাতার সজ্জায় তিনি আরও সুন্দর হয়ে উঠেছেন। তাঁর শিয়রে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে, মাথার ওপরে ঝুলছে ঘণ্টা। মাঝে মাঝেই ঘণ্টাধ্বনিতে ভক্তদের কোলাহল যাচ্ছে হারিয়ে।

আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, তারই সামনে প্রায় দু-ফুট উঁচু গোলাকার যোনিপীঠ। পরিধি আট ফুটের মতো। সেখানেই তিনি রয়েছেন দাঁড়িয়ে। আজ তাঁর উচ্চতা সাড়ে তিন ফুটের মতো হবে। আমি দেখি, দু-চোখ ভরে দেখি আর মৃত্যুঞ্জয়কে আমার চোখের জলের নৈবেদ্য নিবেদন করি।

কেউ মন্ত্রপাঠ করছেন, কেউ ষোড়শ উপচারে পূজো করছেন। আমি যে মন্ত্র জানি নে, আমার তো কোন উপচার নেই। আমি শুধু আমার হৃদয়ের নির্যাস অশ্রু দিয়ে তোমাকে অন্তরে বরণ করে নিলাম।

ভক্তদের আবৃত্তি ও গানে মুখরিত মন্দির। মন্ত্রপাঠ ও প্রার্থনায় বিশ্বকর্মাসৃষ্ট অমরতীর্থ ধ্বনিত আর প্রতিধ্বনিত। ব্রহ্মচারী অমরনাথকে ইংরেজী অনুবাদ শোনাচ্ছে, গৌরী গান গাইছে, পরিতোষবাবু পুজো করছেন। সবাই কিছু না কিছু প্রার্থনা করছে। কেউ যশ চাইছে, কেউ জ্ঞান, কেউ অর্থ। আমি? আমার কি কিছুই চাইবার নেই অমরনাথজীর কাছে?

আছে। আমি ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসি। যেমন করে শিলারূপী কেদারনাথকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরেছি, তেমনি করেই তুষাররূপী অমরনাথকে আলিঙ্গন করি।

স্বামী বিবেকানন্দ যাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন, আমিও প্রণাম করছি তাঁকে। তাঁর কাছে আমি জগতের মঙ্গল কামনা করি! আর কাঁদতে কাঁদতে বলি—হে শুভ, হে মঙ্গল, হে করুণাময়! আমার গৌতমের ভাল-মন্দের সমস্ত দায়িত্ব তোমার ওপর ন্যস্ত করে আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি। তুমি তাকে সুস্থ করে তোলো। আমি যেন পহেলগাঁওয়ে ফিরে গিয়ে তার কুশল সংবাদ পাই।

কতক্ষণ পরে জানি না, কেউ ধাক্কা দিচ্ছে আমাকে। আমার যেন সম্বিত ফিরে আসে। উঠে বসি। চোখ মুছি। আবার তাঁকে দর্শন করি। পুনরায় প্রণাম করি।

তারপরে উঠে দাঁড়াই। গুহার অপর প্রান্তে এসে পার্বতী ও গণেশের তুষারমূর্তি দর্শন করি, প্রণাম করি।

অমরতীর্থ অমরনাথ দর্শন সাঙ্গ হল আমার। কিন্তু সঙ্গীরা সকলেই পূজা প্রার্থনা ও ছবি তোলায় ব্যস্ত। কি করবে, ওখানে যে বেজায় ভিড়। ক্যামেরাম্যানদের দাপটই বেশি। কেনই বা হবে না? তারা যে অমরনাথ দর্শনের প্রমাণ পেশ করার জন্য বহু বিশ্ববিখ্যাত ক্যামেরা নিয়ে এসেছে। তাদের সঙ্গে আমাদের ভাগনে পেরে উঠবে কেন?

সুতরাং সঙ্গীদের দেরি হবে। আমি তাই নেমে আসি নিচে—প্রথম স্তরে। এখানে ভিড় কম। ঠেলাঠেলি ও চিৎকার চেঁচামেচি তেমন নেই।

একপাশে একখানি পাথরের ওপর এসে বসি। বসে বসে ভাবতে থাকি নানা কথা—আজকের এই মধুর মুহূর্তের কথা। মনে পড়ছে স্বামীজীর কথা। অমরনাথ দর্শনের পরে তিনি ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলেন, 'I have enjoyed it so much... ...I thought that the ice-lingam was Siva Himself.....I never enjoyed any

religious place so much!'

তিনি বলেছিলেন—অমরনাথ আমাকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়েছেন। তুমি আজ বুঝতে পারছ না, কিন্তু একদিন বুঝতে পারবে। এই মাত্র তুমি যে তীর্থযাত্রা সুসম্পন্ন করলে, তার সুফল অবশ্য ফলবে। 'You have made the pilgrimage, and it will go on working. Causes must bring their effects. You will understand better afterwards. The effects will come...'

ভগিনী নিবেদিতা যা বুঝতে পারেন নি, আমার পক্ষে তা বুঝতে চাওয়া বাতুলতা। আমি শুধু জানি—স্বামী বিবেকানন্দের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হবার নয়। সঙ্গীরা সবাই অমরনাথ যাত্রার সুফল লাভ করবেন। এবং প্রাণের ঠাকুর আমার প্রার্থনাও পূর্ণ করবেন।

আর সেই সঙ্গে অমরতীর্থ অমরনাথের পুণ্যস্মৃতি আমার মনের মণিকোঠায় অমর হয়ে রইবে।

সতেরো

স্বর্গ হতে বিদায় নিয়ে মর্ত্যে নেমে এসেই আবার স্বর্গ হাতে পাওয়া গেল। মৃদু হেসে মিসেস ঝরনা মণ্ডল এক কাপ চা এগিয়ে দিলেন। চা দেহ ও মন দুয়েরই উপবাস ভঙ্গ করায়।

ঝরনাদেবীকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রান্তরের একপাশে একখানি পাথরে এসে বসি। চায়ে চুমুক দিতে দিতে ভেবে চলি। না, অমরনীর্থ অমরনাথের কথা নয়, কুণ্ডু ট্র্যাভেল্‌স-এর কথা। এঁদের ব্যবস্থাপনা সত্যই প্রশংসনীয়। অমিতাভ, কিশলয় ও রাজকুমার তিনজন ম্যানেজার এখন এখানে। তারা এতক্ষণ তাদের সহকারী মদন, মাখন ও হরির সাহায্যে অশক্ত এবং দুর্বল যাত্রীদের দর্শন করিয়েছে। ইতিমধ্যে গণেশ ও বিষ্টু খাবার ও চা তৈরি করে ফেলেছে। এবারে সবাই মিলে জলখাবার পরিবেশন করছে।

এই উচ্চতায় চার মাইল দুর্গম পথ পেরিয়ে ওরা নিজেরাই খাবার দাবার বাসনপত্র ও চা তৈরির সাজ সরঞ্জাম বয়ে নিয়ে এসেছে। গুহায় উঠবার মুখে অমরগঙ্গার তীরে রীতিমত একটা ক্যান্টিন খুলে বসেছে। বলা বাহুল্য ঝরনাদেবী সানন্দে ক্যান্টিন ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন।

"জ্যারা একমিনিট শুনিয়েগা!"

তাকিয়ে দেখি সেই খোঁড়া ভদ্রলোক। তিনি আমাকেই ডাকছেন। খাবারের ঠোঙ্গাটা হাতে নিয়েই তাড়াতাড়ি উঠে আসি তাঁর কাছে।

ভদ্রলোক একটুকাল চুপ করে থাকেন। কি যেন একটু ভাবেন। তারপরে একহাতে নিজের পেট দেখিয়ে সলাজস্বরে হিন্দীতে বলেন, "বড্ড খিদে পেয়েছে। আজ দু-দিন খাবার জোটে নি।"

"দু-দিন কিছু না খেয়ে এই দুর্গম পথ পেরিয়েছেন।" আমি বিস্মিত।

বিস্মিত হবার কথাই বটে। প্রতিদিন পথে তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে। 'জয় বাবা অমরনাথ' বলে হাসিমুখে আমাদের ছাড়িয়ে চলে গিয়েছেন। কোনদিন কিছু চান নি।

আজও তাঁর মুখখানি হাসিমাখা। আজও একটু হেসে তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ। তবে কি জানেন, এ ক'দিন ঠিক ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধ ছিল না। শুধু আজ

সকাল থেকে একটু দুর্বল লাগছিল, তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারছিলাম না। তাহলেও তেমন অসুবিধে হয় নি। কিন্তু দর্শনের পরেই কেন যেন প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গেছে। সাবা শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। আমাকে কিছু খেতে দেবেন?"

তাই ভদ্রলোকের আজ পথে এত দেরি হয়েছে। অভুক্ত দেহে অবসন্ন শরীরে ঠিকমত হাঁটতে পারেন নি। কিন্তু সেকথা তাঁকে বলা নিষ্প্রয়োজন। ওঁর প্রয়োজন কিছু খাবারের। আমি পকেটে হাত দিই।

"কি ব্যাপার?" ঝরনাদেবী এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন।

খোঁড়া ভদ্রলোক অসহায়ভাবে আমার দিকে তাকান। অর্থ সুস্পষ্ট—তিনি চাইছেন না যে আমি কথাটা মিসেস মণ্ডলকে বলি। কিন্তু আমার পক্ষে তাঁর অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয় না। সব শুনে মিসেস মণ্ডল ভদ্রলোককে বলেন, "আপনি এদিকে আসুন!"

ভদ্রলোক দ্বিধা করেন।

ঝরনাদেবী বলেন, "আপনি পুণ্যাত্মা! আপনাকে ভোজন করাতে পারা পরম সৌভাগ্যের। আপনি আসুন, এখানে এসে বসুন।"

আমিও একই অনুরোধ করি।

তিনি আমাদের অনুরোধ রাখেন। ধীরে ধীরে এসে একখানি পাথরের ওপর বসেন।

মিসেস মণ্ডল ইসারা করেন। রাজকুমার ও অমিতাভ তাঁকে খাবার এনে দেন, মায়া চা নিয়ে আসে।

ঝরনাদেবী জিজ্ঞেস করেন, "আপনি কোথা থেকে এসেছেন?"

ভদ্রলোক জবাব দিতে পারেন না। খাওয়াও শুরু করতে পারেন নি তিনি। তাঁর দু-চোখের কোল বেয়ে অবাধ্য অশ্রুধারা নেমে এসেছে।

মিসেস মণ্ডল মৃদুকণ্ঠে তিরস্কার করেন, "ছিঃ বাবা! আপনি কাঁদছেন কেন? আপনি খঞ্জ এবং দরিদ্র, কিন্তু তীর্থের দেবতা ডাক দিয়েছেন আপনাকে, আপনি তাঁকে দর্শন করেছেন। তিনিই তাঁর ভক্তকে খাবারের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আপনি তাঁর দান গ্রহণ করুন, আপনি খান।"

ভদ্রলোক চোখ মুছে খেতে আরম্ভ করেন। আমরা মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকি তাঁর দিকে। আর ভাবি, ঝরনাদেবী ঠিকই বলেছেন—তীর্থের দেবতা ডাক না দিলে তীর্থদর্শন হয় না।

ভদ্রলোক নিঃশব্দে খেয়ে চলেছেন।

"আপনি ঠিকই বলেছেন মা, এবারে বাবা অমরনাথ ডাক দিয়েছিলেন আমাকে।" ভদ্রলোক এতক্ষণ পরে কথা বলেন, "আমি হরিয়ানার মানুষ, একটা মাইনর স্কুলের দরিদ্র শিক্ষক। বহুকাল থেকে অমরনাথজীকে দর্শন করার বাসনা। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও পাথেয় সংগ্রহ করে উঠতে পারি নি। এবারে কি যেন মনে হল, যা ছিল তাই নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। বাবার অসীম দয়া, দর্শন হয়ে গেল।" তাঁর চোখে-মুখে পরম প্রশান্তির পরশ।

আমারও যে একই কথা। তিনি ডাক দিয়েছিলেন বলে তো আমারও তীর্থদর্শন হল। তীর্থের দেবতা ডাক দিলে তীর্থদর্শন হবেই, এ সত্যটি জীবনে আমি আরেকবার প্রত্যক্ষ করলাম।

"কিন্তু এখন ঘরে ফিরবেন কেমন করে?" মায়া জিজ্ঞেস করে, "বাসভাড়া রেলভাড়া, পথের খাবার!"

ভদ্রলোকের খাওয়া হয়ে গিয়েছে। ক্রাচে ভর করে তিনি একপায়ে উঠে দাঁড়ান। একটু হেসে বলেন, "ওসব নিয়ে আপনারা ভাববেন না মা! যিনি ডেকে এনেছেন, তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।"

তিনি আমাদের নমস্কার করেন। তারপরে বলেন, "জয় বাবা অমরনাথ!"

তিনি পথ-চলা শুরু করেন।

"একটা কথা!" মিসেস মণ্ডল এগিয়ে যান তাঁর দিকে।

ভদ্রলোক পেছন ফেরেন। বলেন, "কি কথা মা!"

"ফেরার পথে এ-দু'দিন যদি পঞ্চতরণী শেষনাগ ও চন্দনবাড়িতে আপনি আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেন, তাহলে বড়ই খুশি হব।"

"বেশ মা। তাই হবে।"

"আরেকটা অনুরোধ।"

"বলুন।"

"আমরা রিজার্ভড বাসে জম্মু যাব, সেখানে আমাদের রেলওয়ে কোচ্ রয়েছে। আমরা দিল্লী হয়েই কলকাতা ফিরব। আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন না?"

ভদ্রলোক আবার হাসেন। বলেন, "আপাতত পহেলগাঁও পর্যন্ত আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করলাম, তারপরে দিল্লীর কথা ভাবা যাবে।"

তিনি আবার নমস্কার করেন। বলেন, "জয় বাবা অমরনাথ!"

"জয় অমরনাথ!" আমরা প্রতিনমস্কার করি।

তিনি চলতে শুরু করেন। আমরা মুগ্ধনয়নে তাকিয়ে থাকি বাবা অমরনাথের প্রবীণ ও খঞ্জ ভক্তটির দিকে।

চমক ভাঙে। এবারে যে আমাবও রওনা হওয়া দরকার। সওয়া দশটা বাজে। আজ আরও বাবো মাইল হাঁটতে হবে। তার মধ্যে খাবার জন্য পঞ্চতরণীতে অন্তত ঘণ্টাখানেকের জন্য থামতে হবে। সহযাত্রীরা সবাই রওনা হয়ে গিয়েছে।

না, সবাই রওনা হয় নি। পরিতোষবাবু অপর্ণা ও অসীম রয়েছে। ঝবনাদেবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তাঁদের সঙ্গে শুরু করি পথ-চলা। সেই পথ। যে পথে অমরনাথ এসেছিলাম। সেই পথে ফিরে চলেছি শেষনাগ। কিন্তু দুয়ের মধ্যে অনেক তফাৎ। তখন ছিল স্বর্গের পথ, এখন মর্ত্যের। তখন ছিল তীর্থের পথ, এখন ঘরের। তখন ছিল মুক্তির পথ, এখন আসক্তির।

কিন্তু আসক্তির কথা থাক। মায়াবদ্ধ মানুষ হলেও স্বর্গ এবং মর্ত্য দুই-ই আমার কাছে সমান প্রিয়। মর্ত্যের খেলা সাঙ্গ হলে হাসতে হাসতে স্বর্গে ফিরে আসব। অতএব স্বর্গের কথা আলোচনা করতে করতেই আপাতত মর্ত্যে ফেরা যাক।

তাই পরিতোষবাবুকে প্রশ্ন করি, "আপনি শিবের উপাসক, সাধক মানুষ। শৈবতীর্থ অমরনাথ দর্শন করে ঘরে ফিরছেন। এখন আপনার কি মনে হচ্ছে?"

না, তিনি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করেন না। কোন রকম প্রস্তাবনা ছাড়াই পরিতোষবাবু শুরু করেন, "বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা তুষারতীর্থ অমরনাথ ও মরুতীর্থ হিংলাজ

দর্শন করব। হিংলাজ দর্শন সম্ভব হবে না বুঝতে পারার পর থেকে অমরনাথের প্রতি আকর্ষণ আরও বেড়ে গেল। বাবাকে আমার দর্শন করতে হবে। দুর্গম পথ অতিক্রম করতেই হবে।"

একবার থামলেন পরিতোষবাবু। কিন্তু আমরা কেউ কিছু বলতে পারার আগেই তিনি আবার বলতে থাকেন, "আপনারা জানেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মহাদেবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ রয়েছে। সেগুলো সবই কোনও না কোনও মানুষের আবিষ্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অমরনাথ কোনও সাধকের সাধনার প্রতিষ্ঠা নয়। এখানে শিব স্বয়ম্ভু, তিনি নিজেই প্রতিষ্ঠিত। ফলে এখানে প্রাণের ধর্ম, মানুষের ধর্ম স্থাপিত। এখানে কোন জাতি ধর্ম ও বর্ণের বিভেদ নেই। অমরনাথ মহামানবের মুক্তিতীর্থ। সবার হৃদয়ের সকল জ্বালা জুড়াবার শ্রেষ্ঠ স্থান অমরনাথধাম। মানুষ এখানে এসে অমরত্ব অনুভব করে।

তাই আমি এসেছিলাম এখানে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরেকটি বাসনা ছিল।"

"কি?" প্রশ্ন করি।

পরিতোষবাবু উত্তর দেন, "ভেবেছিলাম এই সঙ্গে পীঠস্থানটিও দর্শন করব, যেখানে দেবী মহামায়ার কণ্ঠ পতিত হয়েছে, যেখানে ভৈরব ত্রিসন্ধ্যেশ্বর রূপে বিরাজ করছেন, যে পীঠস্থানে তীর্থক্ষেত্র অমরনাথ।"

"কোথায় সেই পীঠস্থান?"

"ঠিক বলতে পারব না, শুধু জানি যেখান থেকে হিন্দুকুশ পর্বত আরম্ভ, সেখানে।"

"আপনি কি দর্শন করেছেন?" অপর্ণা জিজ্ঞেস করে।

পরিতোষবাবু উত্তর দেন, "না। কিন্তু সেকথা পরে বলব, এখন অন্য কথা বলে নিই।"

"বেশ বলুন।"

"ভেবেছিলাম, অমরবাণী প্রকাশের জন্য স্বয়ং মহাদেব যে পুণ্যস্থান নির্বাচন করেছিলেন, আমাকে দেখে যেতে হবে সে স্থানটি কত নির্জন কত গোপন।"

আবার থামলেন পরিতোষবাবু। তারপরে বলতে থাকলেন, "অমরনাথ দর্শন অর্থাৎ এই তীর্থযাত্রার কথা ভাবতে গেলে বহু কথা মনে পড়ে। সব কথা বলার সুযোগ নেই এখন, শুধু আজকের কথা—আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর দিনটির কিছু কথা আপনাকে বলছি।"

"বেশ বলুন।" আমি চলতে চলতে বলি।

ইতিমধ্যে আমাদের চড়াইপথ শেষ হয়েছে। আমরা উঠে এসেছি ভৈরবঘাটিতে। এবারে নেমে চলেছি পঞ্চতরণীর দিকে। এখন বেলা এগারোটা।

পরিতোষবাবু শুরু করেন, "আজ ভৈরবঘাটি পৌঁছতে খুবই কষ্ট হয়েছিল, কিন্তু অমরগঙ্গাকে দর্শন করে মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত পরিশ্রম দূর হয়ে গেল। সে সৌন্দর্য বর্ণনা করতে পারার ক্ষমতা আমার নেই। শুধু বলি আপনা হতেই আমার মাথা নত হয়ে এল। মনে হল চিরজীবন এখানে কাটাতে পারলে, আর কিছু চাই না।

গুহার সামনে পৌঁছে দেখা হল আপনার বৌদি এবং অপর্ণা ও মীরার সঙ্গে। বেলা বাড়লে ভিড় বাড়বে। তাই ভাবলাম আগে বাবাকে দর্শন করে পরে অমরগঙ্গায় স্নান ও তর্পণ করব। কিন্তু আপনার বৌদি স্নান না করে মন্দিরে যাবে না। কাজেই সে অবগাহন

স্নান করল আর আমি অপর্ণা ও মীবা অষ্টাঙ্গ-স্নান করলাম। তারপরে রওনা হলাম মন্দিরে। আমার মন আনন্দে ভরে উঠল—বাবার দর্শন পাব। আমার মতো ক্ষুদ্রজীবের প্রতিও বাবার কত দয়া!

তারপরে, হ্যাঁ তারপরে একসময় মন্দিরে প্রবেশ করলাম। বাবার পূজা করলাম। যাদের নামে পুজো দেবার কথা ছিল, তাদের সবার মঙ্গলের জন্য পূজা করলাম।

পূজাপাঠের পরে গুহায় বসে একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমাকে পেয়ে বসল। স্পষ্ট দেখতে পেলাম সেখানে বসে মহেশ্বর দেবী ভগবতীকে অমরতত্ত্ব শোনাচ্ছেন। সেখানে কোনও তুষারলিঙ্গ নেই। থাকবে কেমন করে? তখন তো তুষারলিঙ্গ ছিল না, ছিলেন স্বয়ং শিব। তুষারলিঙ্গ তো বাবার মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য, তাঁর ইচ্ছায় পরে গড়ে উঠেছে।

আমার জীবন সার্থক হল। অমরতীর্থ দর্শন করে বুঝতে পারলাম, আত্মা অমর। তাকে জানতে পারা মানেই তো অমরকাহিনী জানতে পারা। দেহ পচনশীল। তবু জীবমাত্রই অমর। কারণ আত্মা অবিনশ্বর।"

থামলেন পরিতোষবাবু। আমবা নেমে এসেছি পঞ্চতরণীর সমতলে। দূরে তাঁবুর মেলা দেখা যাচ্ছে। বেলা সওয়া এগারোটা। আর মিনিট পনেরোর মধ্যে আমরা শিবিরে পৌঁছে যাব। যাবার সময় যে পথটুকু যেতে আড়াই ঘণ্টা লেগেছে, ফেরার পথে সেটুকু আসতে মাত্র সওয়া ঘণ্টা লাগল।

কিন্তু এখনও তার কয়েক মিনিট বাকি আছে। তাই পরিতোষবাবুকে জিজ্ঞেস করি, "আপনি কি সেই পীঠস্থান দর্শন করেছেন?"

"না।" তিনি উত্তর দেন। বলেন, "গুহা থেকে নেমে অমরগঙ্গায় স্নান করে তর্পণ করলাম, জপ সেরে নিলাম। তারপরে সেই পীঠস্থান অর্থাৎ দেবী কণ্ঠেশ্বরীর মন্দির খোঁজ করতে শুরু করলাম। বহুজনকে জিজ্ঞেস করার পরে একজন সাধু জানালেন—শুনেছি এখান থেকে প্রায় মাইলখানেক দূরে সেই পীঠস্থান, আমি নিজে কখনও যাই নি। কিছুক্ষণ বাদে দু-জন সাধু রওনা হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু আপনারা যেতে পারবেন না, কারণ পথ বলে কিছু নেই। অগত্যা অমরগঙ্গার তীরে চণ্ডীপাঠ শেষ করেই ফিরে চলেছি ঘরে।"

খাওয়া-দাওয়া করে পঞ্চতরণী থেকে রওনা হতে দুপুর পৌনে একটা বেজে গেল। তুলতুল গৌরী মায়া ব্রহ্মচারী সরকারদা এমন কি অসীম পর্যন্ত আগে রওনা হয়ে গিয়েছে। পরিতোষবাবু বোসবাবু ও অজিতরাও সস্ত্রীক এগিয়ে গেছে। যাবেই তো, আট মাইল পথ পেরোতে হবে। তারমধ্যে পাঁচ মাইল চড়াই, তিন হাজার ফুট চড়াই ভেঙে উঠতে হবে মহাগুণাস গিরিবর্ত্মে। অতএব ওরা ঠিকই করেছে।

আমার দেরি হয়েছে অপর্ণার জন্য। অপর্ণার ব্যাগটি ঘোড়ার পিঠ থেকে কোথায় যেন পড়ে গিয়েছে। তার মধ্যে ওর এবং মীরার কাপড়-চোপড় টর্চ প্রভৃতি প্রচুর প্রয়োজনীয় জিনিস ছিল। কিন্তু বৃথাই এতক্ষণ পঞ্চতরণীতে খোঁজ-খবর করা হল। ব্যাগ পাওয়া গেল না। ঘোড়াওয়ালার সেই এক কথা—মালুম নহী।

যাই হোক, অপর্ণা অশোক ও মামা ভাগনের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়েছি পথে। অপর্ণার মনের অবস্থা খুবই খারাপ। সে মাঝে মাঝেই বেড়াতে বের হয়।

জিনিসগুলো তার খুবই দরকারী। অথচ কৃষ্ণনগরের অবিবাহিতা স্কুল শিক্ষয়িত্রীর পক্ষে সেগুলো আবার কিনে ফেলা খুব সহজ কাজ নয়।

সুতরাং তাকে অন্যমনস্ক করে তুলবার জন্য প্রশ্ন করে ফেলি, "আচ্ছা, আপনি কেন অমরনাথ এলেন?"

মনের অবস্থা যা-ই হোক, অপর্ণা কিন্তু শান্তস্বরে উত্তর দেয়, "ভ্রমণের নেশা ও প্রকৃতির পরম-বিস্ময় তুষারলিঙ্গ দর্শনের জন্যই আমি অমরনাথে এসেছি।"

"এর আগে আপনি কি আর কখনও হিমালয়ে এসেছেন?"

"হ্যাঁ। দার্জিলিং সিমলা ও কেদার-বদ্রী গিয়েছি। কাশ্মীরেও এসেছি আরেকবার।"

"আচ্ছা, হিমালয়কে আপনার এত ভাল আগে কেন যে বার বার হিমালয়ে আসছেন?"

"হিমালয় আমার ভাল লাগে, খুব ভাল। আমি হিমালয়কে ভালবাসি। ভালবাসা উপলব্ধির বস্তু, সুতরাং ভালবাসার কারণ ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।"

কথাটা মিথ্যে বলে নি অপর্ণা, সুতরাং একটু লজ্জা পাই। তাহলেও আবার জিজ্ঞেস করি, "অমরনাথের পথ সম্পর্কে কিছু বলুন।"

"পথ খারাপ নয়। তবে কেদার-বদ্রীর পথের মতো মাঝে মাঝে চা ও খাবারের দোকান থাকা দরকার। পিসু টপ্, যোজিপাল ও পৌষপাত্থর ছাড়া পথে আর কোথাও চায়ের দোকান পর্যন্ত নেই। আর নেই জল। এপথে ঝরনা বড়ই কম।"

"চন্দনবাড়ি থেকে শেষনাগ আসার পথে একজন বাঙালী যুবককে একঢোক জল দিয়েছিলাম। জল খেয়ে যুবকটি বললেন—দিদি প্রাণে বাঁচালেন। বাবা অমরনাথ আপনার মঙ্গল করবেন। জানেন কিছুক্ষণ আগে কয়েকটি কলেজের মেয়ের কাছে একটু জল চেয়েছিলাম। তারা জল তো দিলই না, উপরন্তু উপদেশ দিল, সঙ্গে জল আনা উচিত ছিল।"

একবার থামে অপর্ণা, তারপর আবার বলে, "এবারে সরকারি ব্যবস্থা খুব সুবিধের নয়। তবু সেদিন পহেলগাঁও থেকে চন্দনবাড়ি যাবার সময় একজন প্রবীণ যাত্রীকে পথের ধারে লাল কাপড় পেতে শুইয়ে অক্সিজেন দিতে দেখেছি। কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হয়ে উঠলেন ভদ্রলোক, আবার শুরু করলেন পদযাত্রা।

আর চনদনবাড়ির পথেই একটি মর্মান্তিক দৃশ্য দেখেছি।"

"কি?" ভাগনে জিজ্ঞেস করে।

অপর্ণা উত্তর দেয়, "দেখলাম পথের পাশে একজন মোটা মানুষকে হলুদ চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম, ভদ্রলোক বম্বের বাসিন্দা, ব্লাড প্রেসারের রোগী। যাত্রায় আসছিলেন, ঘোড়া থেকে পড়ে মারা গিয়েছেন। ঘোড়াওয়ালা পলাতক। ভদ্রলোকের ছোট ভাই পাগলের মতো ছুটোছুটি করছেন। আমাদের ডাক্তার ভদ্রলোককে পরীক্ষা করে ডেথ্ সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন।

থামল অপর্ণা। আমি বলি, "যাত্রাপথে আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা মনে পড়ছে আপনার?"

"হ্যাঁ।" অপর্ণা বলে, "সেটা পরদিনের, এই পথের।"

"শেষনাগ থেকে পঞ্চতরণী যাবার সময়ের অর্থাৎ গতকালের।" ভাগনে যোগ

করে।

অপর্ণা মাথা নাড়ে।

আমি বলি, "ঘটনাটা বলুন।"

"ও! তাও তো বটে।" অপর্ণা একবার হাসে। তারপরে বলতে থাকে, "গতকাল মহাগুণাস পার হবার পর থেকে বড়ই অসুস্থ বোধ করছিলাম। অল্পক্ষণ পরে পরেই আমাকে পথের ওপর বসে পড়তে হচ্ছিল। ক্রমে সঙ্গীদের থেকে অনেক পেছিয়ে পড়লাম। আস্তে আস্তে দিনের আলো মিলিয়ে গেল, নামল আঁধার। একে অন্ধকার তার ওপর নির্জন পাহাড়ী পথ। মাঝে মাঝে দু-চারজন ঘোড়সওয়ার আমাকে অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে। কেউ ফিরেও তাকাচ্ছে না। কেমন করে তাকাবে? সবারই শ্রান্ত দেহ, অচেনা দুর্গম পথ। সবাই নিজের চিন্তায় অস্থির।

কিন্তু না, আজও জগতে অপরের বোঝা বইবার জন্য দু-চারজন মানুষ পাওয়া যায়। তাদেরই দুজনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। দুজনেই অবাঙালী যুবক। তারা আমাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। তাদের কাছে একটা বড় টর্চ ছিল।

একজন আলো জ্বেলে পথ দেখিয়ে আমার সামনে সামনে চলল, আরেকজন রইল পেছনে। আমার কষ্ট লাঘবের জন্য সে মাঝে মাঝে বলতে থাকল—ওঁ নমঃ শিবায়। আর আমি দাঁড়িয়ে পড়লেই পথপ্রদর্শক আমাকে উৎসাহ দিতে থাকল—আরাম কর লো দিদি! ধীরে ধীরে চলো!

এইভাবে চলতে চলতে বাবা অমরনাথের কৃপার রাত ন'টার সময় আমার যন্ত্রণার অবসান হল। তারপরে অপেক্ষাকৃত তাড়াতাড়ি হেঁটে রাত দশটা নাগাদ পৌঁছলাম পঞ্চতরণী। যুবক দুটি আমাকে তাঁবুতে পৌঁছে দিয়ে, তবে নিজেদের আস্তানার খোঁজে গেল। জানি না তারা অত রাতে আশ্রয় পেয়েছে কিনা।"

"আজ তাদের সঙ্গে দেখা হয় নি?" মামা জিজ্ঞেস করে।

"কি জানি, হয়তো হয়েছে কিন্তু চিনতে পারি নি।"

"মানে!" আমরা বিস্মিত।

অপর্ণা বলে, "কাল অতক্ষণ একসঙ্গে পথ চলেছি, অথচ আমি ওদের নাম জিজ্ঞেস করি নি। তাছাড়া পঞ্চতরণী উপত্যকায় চাঁদের আলো ছিল বটে, কিন্তু আমরা কেউ কারও মুখের দিকে তাকাই নি। তাই আজ তাদের সঙ্গে দেখা হলেও চিনতে পারি নি।"

বিচিত্র ব্যাপার! নিঃশব্দে পথ চলতে থাকি।

একটু বাদে অপর্ণা আবার বলে, "আজ আমার কি মনে হচ্ছে জানেন?"

"কি?"

"বাবা অমরনাথজী ওদের পাঠিয়েছিলেন আমাকে সাহায্য করতে।"

'বিশ্বাসে মিলায়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।' নীরবে এগিয়ে চলি মহাগুণাসের পথে।

বিকেল সওয়া চারটার সময় মহাগুণাস পৌঁছলাম। আজ পঞ্চতরণী থেকে এই পাঁচ মাইল আসতে সাড়ে তিনঘণ্টা সময় লাগল। ভালই এসেছি। কারণ এর মধ্যে তিন হাজার ফুট চড়াই ভাঙতে হয়েছে। তাছাড়া এর আগেও আজ আট মাইল চড়াই-উৎরাই করতে হয়েছে। গল্প করতে করতে পথ চলেছি বলে পথকষ্ট টের পাইনি।

কয়েক মিনিট বিশ্রামের পরেই মামা মনে করিয়ে দেয়, "আকাশের অবস্থা ভাল নয়, আর দেরি করা উচিত হবে না।"

মামা অভিজ্ঞ হিমালয়-পথিক। আকাশের অবস্থা সত্যই ভাল নয়, যে-কোন সময়ে বৃষ্টি নামতে পারে। অতএব বিদায় নিই মহাগুণাসের কাছ থেকে। বিদায় নিই সেই প্রস্তরীভূত প্রকৃতি-প্রেমিক পুণ্যাত্মার কাছ থেকে। তাঁকে বলি—তোমার কৃপায় সুধালিঙ্গ দর্শন করেছি। এবারে আশীর্বাদ করো, আমি, যেন পহেলগাঁও ফিরে গিয়ে গৌতমের কুশল সংবাদ পাই।

এগিয়ে চলেছি উৎরাই পথে। মামা চলেছে আমার আগে আগে। তার মাথায় বালাক্লাভা, গলায় মাফলার, হাতে দস্তানা, পায়ে মোজা কিন্তু পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি ও চাদর। আমি সারা বছর ধুতি পরেও পহেলগাঁয়ে পৌঁছে প্যান্টের স্মরণ নিয়েছি, আর সে কিনা সত্যি সত্যি বাবু সেজে বহাল তবিয়তে বাবার সঙ্গে দেখা করে এল।

ধুতি নয়, তবে পায়জামা ও পাঞ্জাবি পরে আরও একজন অমরনাথ চলেছে।—কুণ্ডু ট্র্যাভেলস-এর অন্যতম ম্যানেজার গোপাল চক্রবর্তী। কিছুক্ষণ আগে দেখা হল তার সঙ্গে। আমাদের পরের দলকে নিয়ে সে আজ পঞ্চতরণী চলে গেল। গোপালের সঙ্গে রয়েছে আমার বন্ধু দেবীপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ও তার স্ত্রী আভাদেবী। দেবীপ্রসাদ তো বটেই আভাদেবীও হেঁটে যাচ্ছেন দেখে আমার সঙ্গীরা খুব খুশি হয়েছিল। তারা তখনও জানত না যে দেবী শুধু ব্যাঙ্ক ম্যানেজার নয়, একজন অভিজ্ঞ হিমালয়-পথিক। এবারে সে সস্ত্রীক লাদাখও বেড়িয়ে এসেছে। সুতরাং তার সহধর্মিণীর পক্ষে ঘোড়সওয়ার না হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু গাঙ্গুলিদের কথা এখন থাক। তাদের সঙ্গে আবার আমার শ্রীনগরে দেখা হবে। অতএব মামার কথায় ফিরে আসা যাক। কথায় কথায় মামাকে জিজ্ঞেস করি, "তুমি তো বাবুবেশে বাবাকে দর্শন করে এলে, এবারে এই যাত্রা সম্পর্কে কিছু বলো।"

"ঘোষদা, এইবার সত্যি বিপদে পড়লাম।" মামা যেন আঁতকে ওঠে। বলে, "হিমালয়কে ভালবাসি, তাই হিমালয়ে আসি। এসে দেবানুগ্রহ লাভ করি, তারপরে ঘরে ফিরে যাই। ও-সব বলা-টলা আমার পোষায় না। তার চেয়ে বরং ভাগনে কিছু বলুক।"

ভাগনে কিন্তু মামার মতো আপত্তি করে না। একবার অনুরোধ করতেই সে বলতে শুরু করে, "ব্যক্তিগত জীবনে আমি স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত। স্বামীজী অমরনাথ এসেছিলেন, সুতরাং অমরনাথ দর্শনের বাসনা আমার বহুদিনের। শুনেছিলাম অমরনাথ যাত্রায় জীবন আছে, রোমাঞ্চ আছে কিন্তু এটি দুঃসাহসিক কাজ। তাই পহেলগাঁও থেকে যাত্রা করার পরে বারবার তাঁকে জিজ্ঞেস করেছি, আমি পারব তো?

উত্তর পাই নি। তবে ভেবেছি আমার সাধনা নেই কিন্তু বিশ্বাস আছে। আমি বিশ্বাস করি কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করলে তাঁর দর্শন পাওয়া যায়। আমি সারা পথে তা-ই করেছি।

চন্দনবাড়ি থেকে শেষনাগের পথে চলতে চলতে বারবার মনে হয়েছে, বিজ্ঞানের এত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও মানুষ প্রকৃতির কাছে এখনও কত অসহায়? আবার শেষনাগের স্বর্গীয় সৌন্দর্য দেখে ভেবেছি—প্রকৃতি মানুষের চেয়ে কত সুন্দর? আর সেই প্রকৃতির যিনি নিয়ন্তা? তিনি কত সুন্দর কত শক্তিশালী? যাতায়াতের পরে মহাগুণাসে বসে

আপনাদের কি মনে হয়েছে জানি না। কিন্তু আমার মনে হয়েছে—তিনি শক্তি না দিলে আমার পক্ষে অমরনাথজীকে দর্শন করা সম্ভব হত না।”

একবার থামে ভাগনে। আমিও চলতে চলতে থমকে দাঁড়াই, তার মুখের দিকে তাকাই। সে আবার বলতে শুরু করে, “কাল বিকেলে কিছুক্ষণ পঞ্চতরণীর পঞ্চধারার পাশে বসেছিলাম। দেখছিলাম কত বিচিত্র ধরনের পাথর আছে হিমালয়ে। সবচেয়ে বিস্ময়কর এই সংখ্যাতীত প্রস্তরখণ্ডের একখানির সঙ্গে আরেকখানির কোন মিল নেই। তেমনি পৃথিবীতে কত মানুষ কিন্তু কোটি কোটি মানুষেরও আকৃতি ও প্রকৃতিতে কারও সঙ্গে কারও নেই কোন মিল।”

একটুকাল চুপ করে থেকে ভাগনে আবার কি যেন ভাবে। তারপরে জিজ্ঞেস করে, “আপনি জানেন ঘোষদা, স্বামী বিবেকানন্দজী পঞ্চতরণীতে স্নান করে কেবলমাত্র কৌপিন পরে অমরনাথ গিয়েছিলেন। সেখানেও সেই অবস্থায় অমরগঙ্গায় স্নান করে তিনি অমরনাথজীকে দর্শন করেছেন।”

আমি মাথা নাড়ি।

ভাগনে বলে চলে, “আমার অতখানি সাধ্য নেই। কিন্তু আমিও আজ অমরগঙ্গায় স্নান করেছি! এবং আপনি বিশ্বাস করুন, কোন কষ্ট হয় নি। বরং আমার সারা শরীরে এক অভূতপূর্ব আনন্দের শিহরণ বয়ে গেছে। এ তো তাঁর কৃপা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই অমরনাথজীর সামনে দাঁড়িয়ে চোখের জল সামলাতে পারি নি। হয়তো কেউ পারে না।”

আঠারো

শেষনাগ, তোমার শুভেচ্ছায় সুধালিঙ্গ দর্শন করে সুস্থ শরীরে ফিরে এসেছি তোমার কাছে। আজ আমি বিদায় নিচ্ছি তোমার কাছ থেকে। তুমি আশীর্বাদ করো—আমরা যেন নির্বিঘ্নে ফিরতে পারি ঘরে, গৌতমকে গিয়ে ভাল দেখতে পাই।

বিদায় নিয়ে এগিয়ে চলি চন্দনবাড়ির পথে। এখন সকাল পৌনে আটটা।

গতকাল বিকেল ছ'টায় শেষনাগ পৌঁছেছি। তার মানে যাবার সময় যে পথটুকু যেতে সাতঘণ্টা লেগেছিল, ফেরার পথে সেটুকু আসতে মাত্র পাঁচঘণ্টা লেগেছে। আরও কম লাগত, কিন্তু শেষদিকে প্রচণ্ড বৃষ্টি নেমেছিল। কাল সব মিলিয়ে ষোল মাইল হেঁটেছি। তাই তাঁবুতে ফিরে কিছুক্ষণ শুয়ে রয়েছি।

কিন্তু তারপরেই আকাশে চাঁদ উঠেছে। শেষনাগ রূপান্তরিত হয়েছে স্বর্গীয় সরোবরে। সকল শ্রান্তি বিস্মৃত হয়ে তার তীরে গিয়ে বসেছি। কেমন একটা অপার্থিব অনুভূতি আমার দেহ ও মনে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

আজ সেই শেষনাগের কাছ থেকে শেষবারের মতো নিতে হল বিদায়।

বিদায় বেলায় তোমাকে শুধু বলে যাই শেষনাগ—একটু বা দেই আমি তোমাকে আর দেখতে পাব না কিন্তু তোমাকে অনুভব করব। শুধু আজ নয় রদিন। আমরণ তুমি আমার অনুভূতিতে অম্লান হয়ে রইবে।

সঙ্গীরা অনেকেই এগিয়ে গিয়েছে। আমরা আটজন শুধু ধন রয়েছি একসঙ্গে —তুলতুল গৌরী ব্রহ্মচারী অসীম অশোক মামা-ভাগনে ও আমি। তুলতুলের কথাই

ভাবছিলাম চলতে চলতে। সত্যি সত্যি সে আর ঘোড়ায় উঠল না।

আরে, তাই তো! ওর কাছ থেকে তো কিছু শোনা হল না। সেই কথাই ওকে বলি।

দু-একবার মৃদু আপত্তি করে তুলতুল বলতে থাকে, "পার্ট ওয়ান পরীক্ষার পরে কোথাও বেড়াতে যাবার কথা ছিল, কিন্তু কখনও ভাবি নি, অমরনাথ আসব। ফকিরবাবুই প্রথম অমরনাথের প্রস্তাব দিলেন। বললেন—দারুণ লাগবে। বাবা-মা'র সঙ্গে আমিও রাজী হয়ে গেলাম। এইখানে বলে রাখি— আমি কিন্তু পুণ্যার্জনের জন্য আসি নি, এসেছি 'অ্যাড্‌ভেঞ্চার' করতে আর হিমালয়কে দেখতে।

তাই ট্রেনে উঠে আমার সমবয়সী কাউকে না দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাবা ঘোড়ার ব্যবস্থা করেছে কিন্তু আমার ইচ্ছে হেঁটে যাবার। অথচ সঙ্গী কোথায়?

তারপরে শুনলাম—আপনারা হেঁটে যাবেন। আপনারা সবাই আমার চেয়ে অনেক বড়। তবু সাহস করে আপনাকে বলে ফেললাম—আমি আপনাদের সঙ্গী হব। আপনি শুধু রাজী হলেন না, আমাকে উৎসাহ দিলেন। আমার ভাল লাগল।

প্রথমদিন যাত্রার সময় সঙ্গীরা প্রায় সবাই আমার সামান্য পরিচিত ছিলেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পথ চলার পরে সবাই আমার বন্ধু হয়ে গেলেন। আর সেই থেকে আপনারা আমার আবদারের অত্যাচার সমানে সয়ে চলেছেন।

এর আগে কখনও পাহাড়ী পথে এমন হাঁটি নি। তাই প্রথম দিন বেশ কষ্ট হচ্ছিল পথ চলতে, কিন্তু সেকথা কাউকে বলি নি। বললেই তো অসীমদা ঘোড়ায় চড়িয়ে দিতেন। সত্যি বলতে কি, আমার একটা ভীষণ জেদ চেপে গিয়েছিল। মা'র ধারণা আমি হাঁটতে পারি না। সেই ধারণা পালটাতে হবে। তাছাড়া আপনারা আমার চেয়ে বড়, আপনাদের সামনে ঘোড়ায় চড়া রীতিমত অসম্মানজনক।

যাবার সময় সত্যি বুঝি নি, কি দেখতে কিংবা কি পেতে যাচ্ছি? চন্দনবাড়ি পৌঁছে ভারি মজা লাগল। কিন্তু শুনলাম পরদিন পিসু পার হতে হবে। পিসু চড়াই বাজে রাস্তা, দারুণ কঠিন রাস্তা। সেই ধারণা নিয়েই পরদিন রওনা হলাম। কিন্তু কি বলব, সারাপথে পিসু চড়াই আমি সবচেয়ে বেশি enjoy করেছি। কালো মাটি আর পাথরের পথ। এঁকেবেঁকে ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠছে। একদিকে গভীর খাদ, আরেকদিকে খাড়া পাহাড়ের পাঁচিল। ওপরে অনন্ত নীলাকাশ। কি যে সুন্দর লাগছিল আমার, কি যে ভাল লাগছিল! সমস্ত পথটা যেন একখানি সুন্দর গানের মতো। আপনারা তো জানেন, আমি গান গাইতে গাইতেই পিসু পার হয়েছি।"

আমি মাথা নাড়ি।

তুলতুল বলতে থাকে, "জানেন, তখন আমার নিজেকে খুব উদার, খুব ভাল মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল আমি যে-কোন কঠিন কাজ এক নিমেষে করে ফেলতে পারি।

পিসু পার হবার পর মনটা খারাপ হয়ে গেল। কারণ তখন ভেবেছিলাম পিসু সবচেয়ে সুন্দর। কিন্তু সামনে যে আরও সুন্দর আমার জন্য অপেক্ষা করছে, তা কে জানত?

পৌঁছলাম পাহাড়ে ঘেরা শেষনাগের তীরে। মনে হচ্ছিল কেউ যেন নরুন দিয়ে সমান করে পাহাড়গুলো কেটে দিয়েছে। কি আশ্চর্য সুন্দর। বিস্ময়ে ও আনন্দে আমার

সারা শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। শেষনাগের সৌন্দর্য শুধু চোখে দেখি নি, সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করেছি—আজও করছি, চিরকাল করব।

পরদিন মহাগুণাস পার হলাম। মনে মনে খুব একটা গর্ব হল। নিজেকে পর্বতারোহিণী বলে ভাবতে শুরু করলাম। তারপরে পৌঁছুলাম পৌষপাত্থর। বসলাম সেই ঝরনার তীরে। হাতমুখ ধুয়ে প্রাণভরে অমৃত পান করলাম। মনটা খারাপ হয়ে গেল। আনন্দের সময়গুলো কেন যে এত তাড়াতাড়ি চলে যায়? তাই সেদিন সেই আনন্দের লগ্নটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য আপনাদের সবাইকে চা খাইয়ে ফেললাম।"

"তারপরে?" তুলতুল থামতেই অশোক বলে ওঠে।

"দাঁড়ান!" তুলতুল বলে, "চলে যাচ্ছি এখান থেকে, আরেকবার সব ভাল করে দেখে যাই।" সে চারদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে চলে।

আমরা যোজিপাল পার হচ্ছি। এখন সকাল পৌনে ন'টা। তার মানে একঘণ্টায় তিন মাইল এসেছি। পিসু টপ্ এখান থেকে দু-মাইল।

"অশোকদা শুনুন!" তুলতুল হঠাৎ বলে উঠল।

"হ্যাঁ, বলো!" অশোক এগিয়ে আসে তুলতুলের কাছে।

আমাদের অষ্টাদশ সহযাত্রী আবার শুরু করে, "পৌঁছলাম পঞ্চতরণী। আর মাত্র চার মাইল। কাল সকালেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছব। কিন্তু সেই গুহা তো আমার আসল লক্ষ্য নয়। তবু কেমন যেন একটা কৌতূহল হচ্ছিল। মনে মনে কল্পনা করছিলাম গুহা কেমন হয়? বরফের শিবলিঙ্গ—সেও এক আশ্চর্য ব্যাপার!

গতকাল সকাল সকাল রওনা হলাম। সবচেয়ে খাড়া রাস্তা পার হলাম। পথে একটা গ্লেশিয়ার পড়ল। বরফের ওপব দিয়ে হাঁটা একটা রীতিমত উত্তেজনার ব্যাপার। সত্যি বলতে কি প্রথমে একটু ভয় ভয় করছিল—যদি পড়ে যাই। কিন্তু পার হতে গিয়ে ভয় কেটে গেল।

অবশেষে পৌঁছলাম সেখানে। কী বিরাট গুহা! আমার কল্পনার সঙ্গে একেবারেই মিলল না। মনে হল—এ আমি কোথায় এলাম?

তবু সবার সঙ্গে সিঁড়ি ভেঙে ওপড়ে উঠলাম। গুহায় ঢুকলাম। বরফের শিবকে স্পর্শ করলাম পুজো করলাম।

সবই করলাম। কিন্তু তখন আমার মনের ভাব যে ঠিক কেমন হয়েছিল, তা বলা মুশকিল। কিছু বিস্ময়, কিছু ভাল লাগা, কিছু আনন্দ এবং কিছু বেদনা—সব মিলিয়ে একটু অদ্ভুত অনুভূতি হয়েছিল আমার।..."

থামল তুলতুল। মনে হচ্ছে ওর আরও অনেক কথা বলার ছিল, কিন্তু বলতে পারল না।

এই হয়। হিমালয়ের সব কথা বলা যায় না। বলার চেয়ে না-বলা বেশি থেকে যায়।

না, তুলতুল আবার কথা বলে। বলে, "আজ কিন্তু আমার বেশ ভাল লাগছে। যাবার বেলায় পথের পাশেপাশে যাদের ফেলে ফেলে চলে গিয়েছি, তাদের আবার নতুন করে কাছে পাচ্ছি। সেই ভৈরবঘাটি পঞ্চতরণী মহাগুণাস ও পৌষপাত্থর, সেই শেষনাগ ও এই যোজিপাল। আবার দেখা হবে পিসুর সঙ্গে। ভারি ভাল লাগছে। কিন্তু..."

আবার থামে তুলতুল। আমরা তার মুখের দিকে তাকাই।

একটু বাদে সে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, "কিন্তু এই ভাললাগার মাঝে মিশে আছে একটা মন-কেমন-করা ভাব। এবারে যে ঘরে ফিরছি। আর তো আসব না এদের কাছে। তবে এরা সবাই সর্বদা রয়ে যাবে স্মৃতিতে—আমার মনের মুকুরে।..."

আর কিছু বলতে পারে না তুলতুল। আমাদেরও নেই কোন জিজ্ঞাসা। ওর কথার সঙ্গে আমার কথাও মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

তাছাড়া কথা বলবার আর অবকাশও নেই। আমরা যে পৌছে গিয়েছি পিসু টপে। এবারে একটু বসতে হবে। চা খেতে হবে। একটানা পাঁচ মাইল হাঁটা হল। দু-ঘণ্টা লেগেছে। এখন সকাল পৌনে দশটা।

চা খেয়ে নিয়ে উৎরাই ভাঙা শুরু করা গেল। সেদিনের চড়াই আজ উৎরাই হয়েছে। তুলতুল মায়া ব্রহ্মচারী অশোক এমনকি মামা পর্যন্ত ছুটে ছুটে নামছে। অসীম ও গৌরীর সঙ্গে আমি অপেক্ষাকৃত আস্তে আস্তে চলেছি। তাহলেও একটানা উৎরাই। চন্দনবাড়ি পর্যন্ত তিন মাইল পথ যেতে একঘণ্টাও লাগবে না।

চলতে চলতে অসীমকে বলি, "অনেকের কথাই শুনলাম। তুমি তো বললে না কিছু?"

"কি আর বলব? ভাল লেগেছে, এটুকুই বলতে পারি।" অসীম উত্তর দেয়।

"না, না—এভাবে শুনতে চাইছি না আমি। আগে বলো, কেন এলে অমরনাথে?"

"আপনাকে তো বলেছি ঘোষদা, বাবা রেলে চাকরি করতেন। ছোটবেলা থেকেই তাঁর সঙ্গে বহু বেড়িয়েছি। পাঁচ বছর বয়সে চাঁদের আলোয় দিলওয়ারা মন্দির দেখার আবেশ আজও আমার মনে বাসা বেঁধে আছে। তাই শৈশবেই ভ্রমণের নেশা আমাকে পেয়ে বসে। পরে সেই নেশা পেশায় পরিণত হল। আপনি তো জানেন, 'ট্যুর' করাই আমার প্রধান কাজ।"

আমি মাথা নাড়ি।

অসীম বলতে থাকে, "গত পনেরো বছর দেশে-বিদেশে বহু বেড়ালাম। কিন্তু দেখলাম কর্মব্যস্ত সেই সব সুখ-ভ্রমণের কথা প্রায় সবটাই হারিয়ে যায়। তবু হিমালয়ের কথা কিছু মনে থাকে। এর আগে তিনবার কাশ্মীরে এসেছি। প্রতিবারই প্লেনে। তাবই মধ্যে একবার বলতাল থেকে ঘোড়ায় চড়ে অমরনাথ দেখে ফেলেছিলাম। সেই সুখস্মৃতি মনের মাঝে সজাগ হয়ে রইল। তখুনি ঠিক করেছিলাম একবার ট্রেনে ও বাসে চড়ে আসতে হবে কাশ্মীর, পায়ে হেঁটে প্রচলিত পথে যেতে হবে অমরনাথ। আমার সে আশা পূর্ণ হয়েছে।

সত্যি বলছি, আমার বড় ভাল লেগেছে এই যাত্রা। আর এ ভাল লাগা সেই প্রথম দিন থেকেই। উঁচুতলার মানুষ আমি নই, কিন্তু পেশার জন্য উঁচুতলাতেই থাকতে হয় সর্বক্ষণ। সেখানে দেখেছি ভ্রমণের পরেও সঙ্গীরা Mr. X, Mr. Y কিংবা Mr Z থেকে যান। আর ও যাত্রায় প্রথম দিনেই কেউ আমার দাদা কিংবা মামা হয়েছেন অথবা আমি কারও ভাই কিংবা ভাগনে হয়েছি। সেদিন থেকেই সহযাত্রীদের সবার প্রতি একটা আন্তরিক আকর্ষণ অনুভব করে আসছি।

সত্যি বলতে কি, প্রথম দিকে মনে একটা ভয় ছিল—হয়তো পারব না, হয়তো

শেষ পর্যন্ত ঘোড়া নিতে হবে। কিন্তু প্রথম দিনে দশ মাইল হেঁটে অনায়াসে চন্দনবাড়ি এলাম, পৌঁছে গেলাম এক নতুন দেশে। পরদিন পিসু পার হলাম। না, পথ তো তেমন দুর্গম নয়। আত্মবিশ্বাসে আমার মন ভরপুর হয়ে উঠল—আমি পারব, নিশ্চয়ই পারব।

তারপর থেকে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে পথ চলেছি। ওপরে উঠেছি, আর দেখেছি আকাশের রং বদলাচ্ছে। ভেবেছি—সমতলের মানুষ তো এমন সুনীল আকাশ কল্পনাও করতে পারে না। রাতের আকাশে চাঁদের সুশীতল উজ্জ্বলতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। হিমালয়ের নিস্তব্ধ অথচ প্রাণময় প্রকৃতি আমাকে বার বার হিমে ঢাকা উত্তরমেরু ও তপ্ত উজ্জ্বল সাহারার রাতের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। প্রতিদিন সকালে উঠে মনে হয়েছে—এই বা বুঝি সৃষ্টির প্রথম প্রভাত।

অবশেষে পৌঁছলাম অমরনাথ। দর্শন করে বেরিয়ে এলাম গুহার বাইরে। চারিদিকে তাকালাম। মনে হল আমি অন্য এক গ্রহে রয়েছি। আমার সামনে যতদূর দেখা যায় vast barren twisted stretches of rocks, enduring through endless centuries.

সেই হিমেল হাওয়ায় আদিম যুগের পাথরদের সামনে দাঁড়িয়ে আমার তখন মনে হয়েছিল অমরনাথ কোন কোমল অনুভূতির স্থান নয়, রাধা-কৃষ্ণের ব্রজলীলা সেখানে অচল। অমরনাথ শিবক্ষেত্রে, মহাশক্তির মহান্‌তীর্থ। সংসারে কেউ আমার নয়, আমি একা। আমি সেই মহাশক্তির মাঝে মিশে যেতে চাইলাম।"

থামল অসীম। ইতিমধ্যে উৎরাই পথ শেষ হয়ে গিয়েছে। আমরা নেমে এসেছি পিসু চড়াই থেকে। চন্দনবাড়ি এসে গেল বলে।

অসীম নিঃশব্দে পথ চলেছে, গৌরীও কোন কথা বলছে না। সে আজ সকাল থেকে বড় বেশি নীরব। কি যেন ভেবে চলেছে মনে মনে। নীলগঙ্গার শব্দ শুনতে শুনতে আমিও নীরবে পথ চলেছি।

কেটে যায় কিছুক্ষণ। তারপরে অসীমকে বলি, "আচ্ছা, সুধালিঙ্গ সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক কারণ সম্পর্কে কিছু ভেবেছ?"

"নিশ্চয়ই।' অসীম উত্তর দেয়। বলে, "আপনারা দেখেছেন গুহার ছাদ চুঁইয়ে তুষারলিঙ্গের মাথার ওপর থেকে ফোঁটাফোঁটা জল পড়েছে।"

আমি মাথা নাড়ি।

অসীম বলতে থাকে, "ঐ জলই জমছে। জমছে দুভাবে—ওপর থেকে তুষারদণ্ডের আকারে নিচে নামছে আর গুহার মেঝে থেকে তুষারদণ্ড ওপরে উঠছে। কয়েকদিন বৃষ্টি হয়নি বলে আমরা মাত্র সাড়ে তিনফুট তুষারলিঙ্গ দেখে এলাম, বৃষ্টি হলে আরও বড় লিঙ্গ দেখতে পেতাম।"

একটু থেমে অসীম আবার বলতে থাকে, "বিজ্ঞানের ভাষায় ঐ icicle তুষারদণ্ডকে বলে Stalactite ও Stalagmite. স্ট্যালাক্‌টাইট সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকদের বক্তব্য—ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ে গুহার ছাদ থেকে ঝুলন্ত তুষারদণ্ড সৃষ্ট হয়। আর স্ট্যালাগ্‌মাইট সম্পর্কে তাঁরা বলেন—ফোঁটায় ফোঁটায় জল পড়ে গুহার মেঝে থেকে সৃষ্ট তুষারদণ্ড ক্রমে ক্রমে ওপরে উঠতে থাকে। এই দুটি পদ্ধতিতে সৃষ্ট তুষারদণ্ড মিলিত হয়েই সৃষ্টি করেছে তুষারলিঙ্গ।"

"কিন্তু অসীমদা!" গৌরী কথা বলে এতক্ষণে, "স্ট্যালাগ্‌মাইট তো হয় Conical মোচাকৃতি, তুষারলিঙ্গের মাঝখানটা তো তেমন নয়?"

"না হবার কারণ বায়ুপ্রবাহ। এই গুহাটির এমন অবস্থান যে সামনের উপত্যকা থেকে সর্বদা তার ভেতর হাওয়া ঢুকছে। প্রকৃতপক্ষে গুহাটাও সৃষ্ট হয়েছে হাওয়ার জন্য। কিন্তু সেকথা যাক্ গে, যেকথা বলছিলাম—অবস্থানের জন্য গুহাটির ভেতর সর্বদা বাতাস ঢোকে। অথচ গুহা থেকে বাতাস বেরিয়ে যাবার অন্য কোন পথ নেই। কাজেই ভেতরে গিয়ে ঘুরপাক খেয়ে সে বাতাস গুহামুখ দিয়েই বেরিয়ে আসে। আবার নতুন বাতাস ঢোকে, আবার ঘুরপাক খেয়ে বেরিয়ে আসে। বায়ুপ্রবাহ তুষারলিঙ্গটিকে পরিক্রমা করে চলে। আর তারই ফলে মোচাকৃতি স্ট্যাল্যাগ্‌মাইট গোলাকার তুষারলিঙ্গে পরিণত হয়।"

বেলা সাড়ে দশটায় চন্দনবাড়ি পৌঁছলাম। সঙ্গীরা সেই তাঁবুর সামনেই বসে আছে। না, বসে নেই—ওরা খাচ্ছে।

লাঠি ও হ্যাভারস্যাক্ রেখে হাত-মুখ ধুয়ে এলাম। খাবার এসে গেল। পৌনে তিন ঘণ্টায় আট মাইল পাহাড়ী পথ পেরিয়েছি। বেশ খিদে পেয়েছে।

পঞ্চতরণী ও শেষনাগের মতো ফকিরবাবু চন্দনবাড়ির এই তাঁবুগুলিও ভাড়া নিয়ে রেখেছেন। গাঙ্গুলিরাও আমাদের মতো এখানে থেকে গিয়েছে। এর পরে ফকিরবাবুর আরও দু-দল যাত্রী আসবেন। তাঁরাও এখানে রাত্রিবাস করবেন।

খাওয়াটা ভালই হল। কুণ্ডু ট্র্যাভেল্‌স-এর ব্যবস্থাপনা সত্যই প্রশংসনীয়। তবে এজন্য ওঁদের সবাইকে প্রাণপাত পরিশ্রম করতে হচ্ছে। মিসেস মণ্ডল গতকাল পঞ্চতরণীতে রয়ে গিয়েছেন। আর ফকিরবাবু আজ আমাদের সঙ্গে চলেছেন পহেলগাঁও। পরশু পরের দলকে নিয়ে আবার ওপরে আসবেন।

জ্যোতির্ময় সিগারেট কিনতে দোকানে গিয়েছিল। খবরটা পেয়েই ছুটতে ছুটতে ফিরে এল। জানাল, "একটা 'ট্রাক' পাওয়া গিয়েছে। মাল নিয়ে এসেছিল, এখন খালি ফিরে যাচ্ছে পহেলগাঁও। আমি ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলেছি। সে চল্লিশজন যাত্রী নিয়ে যেতে রাজী আছে। জনপ্রতি দশটাকা করে ভাড়া লাগবে।"

সাজ সাজ রব পড়ে গেল। বলা বাহুল্য পদাতিকদের চেয়ে অশ্বারোহীদের উৎসাহ বেশি। তাঁরা ঘোড়ার হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইছেন। আর বটেই তো, সহজ হলেও দশ মাইল রাস্তা। গাড়ি পেলে কে আর ঘোড়ায় চড়ে?

কিন্তু কপালে দুর্ভোগ লেখা থাকলে, কে তা মুছতে পারে? অশোক দুঃসংবাদ নিয়ে এল, "পহেলগাঁও-চন্দনবাড়ি মোটরপথ এখনও যাত্রী পরিবহনের উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া গতকাল বিকেলে এ অঞ্চলেও বেশ বৃষ্টি হয়েছে। কাঁচা রাস্তা, খুবই কাদা হয়েছে কোথাও কোথাও। পুলিশ কর্তৃপক্ষ বলছেন, তাঁরা ট্রাক-এ কোন যাত্রী যেতে দেবেন না।"

তাঁরা ভাল কথাই বলছেন। কিন্তু ঘরমুখো তীর্থযাত্রীরা কি সহজে সে নির্দেশ মেনে নিতে পারেন। অতএব পুলিশ অফিসারের কাছে 'ডেপুটেশন' গেল।

কোন ফল হল না। ভদ্রলোক নাকি খুবই কড়া। তিন বলেছেন—যাতে কেউ

জীবন সংশয় করে ট্রাক্ কিংবা জীপ-এ না উঠতে পারেন, তা দেখার জন্যই আমি এখানে রয়েছি।

সংসারে কর্তব্যপরায়ণ মানুষগুলো মাঝে মাঝে এমনি নির্দয় হয়ে পড়েন।

অগত্যা আবার শ্রীচরণের শরণ নেওয়া গেল। আর পুল পেরিয়েই বুঝতে পারলাম, পুলিশ অফিসার ঠিক কাজই করেছেন। গাড়ির পক্ষে পথ সত্যই বিপজ্জনক। যেমন কাদা, তেমনি পেছল। তার ওপরে আবার বাঁকগুলো এখনও ঠিকমত তৈরি হয় নি। নামার সময় সামনে-পেছনে করে গাড়িকে আস্তে আস্তে মোড় ফেরাতে হয়। তখন একটু এদিক-ওদিক হলেই সব শেষ।

গৌরীর আজ কি যেন হয়েছে? সকাল থেকে সে কেবল পেছিয়ে পড়ছে। তাহলেও তাকে কিছু জিজ্ঞেস করি না। কারণ এখন হেঁটে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।

সঙ্গীদের ইশারায় এগিয়ে যেতে বলি। আমি গৌরীর সঙ্গে হাঁটতে থাকি। আমরা নীরবে পথ চলেছি।

কিছুক্ষণ বাদে হঠাৎ গৌরী কথা বলে। প্রশ্ন করে, আচ্ছা শঙ্কুদা, আপনি তো আমাকে জিজ্ঞেস করলেন না—অমরনাথ যাত্রা আমার কেমন লাগল?"

এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তবু উত্তর দিই, "ভেবেছিলাম পরে জিজ্ঞেস করব।"

"কিন্তু পথের কথা, পথে শোনা ভাল নয় কি?"

"বেশ বলো।"

গৌরী চুপ করে আছে। আমি ওর দিকে তাকাই। তার চোখ দুটি অশ্রুসজল। গৌরী কাঁদছে! কিন্তু কেন? গত বছর আমরা এক সঙ্গে কেদার-বদ্রী গিয়েছিলাম। ওর মা আমাদের সঙ্গে কুম্ভমেলায় গিয়েছিলেন। তবু আমি যে ওর সম্পর্কে কিছুই জানি না। শুধু জানি সে শিক্ষিতা আর আধুনিকা হয়েও খুবই ভক্তিমতী।

"শঙ্কুদা!"

গৌরী বলতে শুরু করেছে। আমি চলতে চলতে শুনি।

গৌরী বলছে, "ছোটবেলা থেকেই আমি সুদূরের পিয়াসী। কেন জানি না, আমার কেবলই মনে হত, আমি যেন কোন এক অদৃশ্য সৌন্দর্যলোক থেকে নির্বাসিত হয়ে মাটির পৃথিবীতে এসে জীবনযন্ত্রণা ভোগ করছি। আমার মন এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেতে চাইত। মনে হত আমার মুক্তি মুক্ত-আকাশের নিচে। ভগবান আমাকে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করলেন না। প্রায় প্রতি বছর মা-বাবার সঙ্গে আমি বেড়াতে বের হতাম ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে।

১৯৬২ সালে আমার জীবনের এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পরে প্রকৃতিকে আরও নিবিড়ভাবে কাছে পেতে চাইলাম।" থামল গৌরী।

আমি ওর মুখের দিকে তাকাই। সে আবার শুরু করে, "শঙ্কুদা, মেয়েরা জীবনে যা চায়, আমি তা সবই পেয়েছিলাম। বোধহয় একটু বেশি করেই পেয়েছিলাম। শিক্ষা-দীক্ষা রূপ অর্থ ও যশে সে ছিল আদর্শ পুরুষ। তাঁর ভালবাসা ছিল সীমাহীন। আর তাই হয়তো ভাগ্য বাধ সাধল, অত সুখ আমার কপালে সইল না। বিয়ের দু-বছর পরেই এক

মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় সে চলে গেল চিরকালের মতো। সে শিবলোক থেকে এসেছিল, শিবলোকেই চলে গেল। তাঁর নামও ছিল বিশ্বনাথ।

তারপর থেকে আমার জীবনের একই ইতিহাস। আমি শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছি। শান্তির জন্য লেখাপড়া করলাম, চাকরি করলাম কিন্তু শান্তি পেলাম না। সব সময় আমার মন কেবল সেই একজনকেই কাছে পেতে চাইত।

এইভাবে তেরো বছর কেটে গেল। কিন্তু কোথাও শান্তি পেলাম না। অবশেষে আমার দিদিমা একদিন আমাকে কেদার-বদ্রী ও গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী দর্শনের পরামর্শ দিলেন। তিনি আমাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন।

দিদিমার আশীর্বাদ মিথ্যে হয় নি শঙ্কুদা, আমি ১৯৭৫ সালে যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী-গোমুখী গিয়েছি। গতবছর আপনাদের সঙ্গে কেদার-বদ্রী গিয়েছি। এবছর বাবার দয়ায় তাঁকে দর্শন করতে পারলাম।"

থামল গৌরী। এখনও যে দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হবে। তার পথ চলতে কষ্ট হচ্ছে। কথায় ব্যস্ত রেখে ওকে আমার পহেলগাঁও নিয়ে যেতে হবে। তাই বলি, "যাত্রাপথে তোমার অভিজ্ঞতার কথা কিছু বলো।"

গৌরী আবার শুরু করে, "এবারে কলকাতা থেকে রওনা হবার আগে আমাকে এক সন্ন্যাসিনী আশীর্বাদ করলেন—গৌরী, অমরনাথে তোমার কি দর্শন হয়, দেখো।

কলকাতা থেকে পহেলগাঁও আসার পথে তাই বারবার ভেবেছি—কি দর্শন হবে আমার? কাকে দর্শন করব অমরনাথের পথে?

আপনার মনে আছে শঙ্কুদা, সেদিন পহেলগাঁও থেকে চন্দনবাড়ি আসবার সময়ও আমি এমনি পেছিয়ে পড়েছিলাম? অনেকক্ষণ আপনাদের সঙ্গে পথ চলি নি?"

"হ্যাঁ, আমরা তোমার জন্য একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম।"

"তখুনি তাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।"

"কাঁদের সঙ্গে?"

"আপনারা এগিয়ে গিয়েছেন। আমি তখন একা একা পথ চলেছি। হঠাৎ দেখি আমার সামনে পথ চলেছেন কৌপিন পরা তিনজন সন্ন্যাসী। তাঁদের দু-জন মধ্যবয়সী আর একজন বছর তিরিশের যুবক। তিনি দীর্ঘদেহী স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ। তাঁর উন্নত নাসিকা, টানাটানা চোখ ও ঘাড় পর্যন্ত বাবরি চুল।

তিনি হঠাৎ পেছিয়ে এলেন আমার কাছে, মধুর স্বরে আমাকে উৎসাহিত করে পথ চলতে থাকলেন। কথায় কথায় জানালেন তিনি মির্জাপুরের মানুষ। ডাক্তারী পড়তে পড়তে হঠাৎ সন্ন্যাস নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। কয়েকদিন আগে তিনি বৈষ্ণোদেবীকে দর্শন করতে গিয়েছিলেন। সেখানে অমরনাথ দর্শনের স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন। তিনি চলতে চলতে আমাকে বৈষ্ণোদেবীর মাহাত্ম্য শোনালেন।

কিছুক্ষণ বাদে তাঁর সঙ্গীরা তাঁকে খেতে ডাকলেন। তাঁরা একটা ঝরনার ধারে বসে রুটি খাচ্ছিলেন। যুবক সন্ন্যাসী আমাকে বললেন—তোমারও তো খিদে পেয়েছে, তুমিও এসো না! আমাদের সঙ্গে ভোজন করবে।

জনবিরল পথ। আমি একা। আমি ভয় পেলাম। বললাম—না। আমি এগিয়ে যাই। চন্দনবাড়িতে আমার খাবার রয়েছে। তিনি হেসে বললেন—আচ্ছা, যাও। সাম্‌কো ফির

মিলেঙ্গে।

আমার ভয় ভাঙল না। ভাবলাম এঁরা কাঁরা, সন্ন্যাসী না ভণ্ড?

খাওয়া-দাওয়ার পরে চন্দনবাড়িতে বিশ্রাম করছি। হঠাৎ চমকে উঠলাম। সেই সন্ন্যাসী, একেবারে তাঁবুর ভেতরে চলে এসেছেন। মেয়েদের তাঁবু। আমার সঙ্গীরাই বা কি ভাবছেন?

তবু আমি তাঁকে বসতে বললাম। তিনি বসলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা বললেন কিছুক্ষণ। তারপরে জানালেন—আমরা আজই শেষনাগ চলে যাচ্ছি।

অবাক হলাম! বর্ষাকাল, ওঁদের কাছে আলো নেই। পিসু চড়াই সহ আট মাইল দুর্গম পথ পেরোতে হবে। অথচ সেই সন্ধ্যেবেলা ওঁরা শেষনাগ রওনা হচ্ছেন? কিন্তু জানতাম 'না' করে কোন লাভ হবে না। ওঁর মা ও বোনেরা নিশ্চয়ই ওঁকে সন্ন্যাসী হতে নিষেধ করেছিলেন। তখন তাঁদের কথা শোনেননি।

আমি শুধু তাঁকে প্রণাম কবলাম। বললাম—তুমি আমার চেয়ে বয়সে ছোট তবু আমাকে আশীর্বাদ করো।

তিনি একটু হাসলেন। মধুর স্বরে বললেন—আমি তোমার চেয়ে বয়সে বোধহয় বড় হব।

এবারে আমি হাসলাম। বললাম—তোমার বয়স কত?

তিনি সহাস্যে জানালেন—পঞ্চাশ পেরিয়ে গিয়েছে।

বিস্মিত হলাম। কারণ দেখে তাঁকে তিরিশ বছরের যুবক বলে মনে হয়। কয়েকটা মুহূর্ত নীরবে কাটল। তারপরে বললাম—তুমি তো যোগসিদ্ধ সন্ন্যাসী, তুমি নিশ্চয়ই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার অতীত ও ভবিষ্যতের সব কথা বলে দিতে পারো?

তিনি আবার একটু হাসলেন। শুধু বললেন—ফির মিলেঙ্গে। তারপরে সেই গোধূলি বেলাতেই সঙ্গীদের সঙ্গে খালিপায়ে ও খালিগায়ে শেষনাগের পথে রওনা হয়ে গেলেন।

পরদিন আমাদের পদযাত্রার সঙ্গী হলেন অশীতিপর এক বৃদ্ধ বাঙালী সন্ন্যাসী।...

"সেই তারাপীঠের সাধুবাবা?" জিজ্ঞেস করি।

"হ্যাঁ।" গৌরী উত্তর দেয়। সে বলতে থাকে, "মনে তখন একটাই ভয়—শেষ পর্যন্ত পায়ে হেঁটে তাঁর চরণে পৌঁছতে পারব তো? সেই সাধুবাবাকেও প্রশ্নটা করলাম। তিনি উত্তর দিলেন—পারবি না কিরে? তুই আমার মা, আমার তারা-মা। তোর কাছে তো তিনি সহজলভ্য। তুই আমাকে আশীর্বাদ করে যা মা, আমি যেন তাঁর দর্শন পাই।

পরশু পঞ্চতরণীর কাছে নেমে দেখি আমি একা, আপনাদের থেকে অনেকটা এগিয়ে এসেছি। হঠাৎ কোথা থেকে সেই সুপুরুষ সন্ন্যাসী এসে সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি সেদিন সকালে পঞ্চতরণী থেকে রওনা হয়ে অমরনাথজীকে দর্শন করে ফিরে চলেছেন শেষনাগ। সারাদিন খাওয়া হয় নি কিছু, শেষনাগ পৌঁছে আটা যোগাড় করে রুটি বানিয়ে খাবেন। আমার সঙ্গে একটা আপেল ছিল। প্রণাম করে সেটি তাঁর হাতে দিলাম। খেতে খেতে তিনি আমাকে আশীর্বাদ করলেন—তোমার জয় হোক। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—বৈষ্ণোদেবী স্বপ্নে তোমাকে যেভাবে বাবাকে দেখিয়েছেন, তার সঙ্গে কিছু মিলল কি? তিনি উত্তর দিলেন—সব মিলে গিয়েছে। আমি ঠিক সেইভাবে তাঁকে

দর্শন করেছি।

তিনি কিন্তু বিদায় নিলেন না। আমার সঙ্গে গল্প করতে করতে তাঁবুতে এলেন। বললেন—তুমি পরিশ্রান্ত। খাটিয়ায় শুয়ে একটু বিশ্রাম করে নাও। আমি তাঁকে খাটিয়ায় বসতে বললাম। তিনি আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে মাটিতে বসে পড়লেন। মনে করার কিছু নেই ওঁরা যে কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী।

যাই হোক, আমি ওঁকে কিছু দান দিতে চাইলাম। উনি বললেন—বোনের কাছ থেকে দান নিতে নেই। অনেক অনুরোধের পর, হয়তো আমাকে শাস্তি দেবার জন্যই, তিনি অনুগ্রহ করে টাকা-কয়টি গ্রহণ করলেন। তারপরে নিজের কমণ্ডলু থেকে অমরনাথের অমৃতবারি আমার গায়ে ছিটিয়ে দিয়ে বললেন— ইত্‌নাহি কহনা হ্যায় যাঁহা ভী যানা হ্যায় উহা যাও। একটা লালসুতো আমার বাঁহাতের কব্জিতে বেঁধে দিয়ে আবার বললেন—মঙ্গলবার তক্ পেঁয়াজ লহ্‌সুন মৎ খানা। কিসী না কিসী রূপ মে ভগবান কা দর্শন পাওগে।

সেদিন বিকেলে আরেকটা ঘটনা ঘটে গেল। সন্ধ্যার একটু আগে হঠাৎ তাঁবুতে বসে শুনতে পেলাম—আমার তারা-মা! কোথায় আমার তারা-মা?

তাড়াতাড়ি তাঁবু থেকে বেরোতেই তারাপীঠের সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সামনে পড়ে গেলাম। আর তিনি আমাকে দেখতে পেয়েই ছুটে এসে আমার পা-দুখানি জড়িয়ে ধরলেন।

ওখানে আরও অনেকে দাঁড়িয়েছিলেন। আমি কোনমতে পা ছাড়িয়ে নিলাম। লজ্জা ভয় ও দুঃখে আমার চোখে জল এসে গেল। আমি তাঁকে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলাম—আপনি একি করলেন বাবা? তিনি হাসতে হাসতে বললেন—কিরে বেটি? পারলি নিজেকে লুকিয়ে রাখতে, শেষ পর্যন্ত ধরা তো পড়ে গেলি। আমি সব জানি। তুই আমার তারা মা!

গতকাল যখন পবিত্র গুহায় পৌঁছলাম, তখন সহসা এক অত্যাশ্চর্য অনুভূতিতে আমার মন ভরে উঠল। মনে হল আমি একা হলেও একা নই। আমি আছি, অমরনাথ আছেন। আর অমরনাথের মাঝেই মিশে আছে আমার বিশ্বনাথ। শুধু সে আছে, আর কেউ নেই। রয়েছে আমার মনের মন্দিরে—গুহাতীর্থ অমরনাথে।

গুহা থেকে নেমে এলাম নিচে। দেখা হল অমলাদি অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে। অমলাদি বললেন—সেই সন্ন্যাসী সত্যি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছেন। আমি প্রশ্ন করলাম—তারাপীঠের সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী? তিনি বললেন—না গো না, তোমার সেই মির্জাপুরের সন্ন্যাসী, যাঁকে কাল তুমি দান দিলে। আমি বললাম—তাঁকে আবার আজ কোথায় দেখলেন? অমলাদি উত্তর দিলেন—কেন, গুহায়। তিনিই তো দু-বাহু দিয়ে ভিড় আগলে রেখে তোমাকে অতক্ষণ বসে পুজো করবার সুযোগ করে দিলেন। আমি প্রশ্ন করলাম—আপনি ঠিক দেখেছেন?—নিশ্চয়। অমলাদি বললেন—আমি কেন, সবাই দেখেছে। জিজ্ঞেস করো না এদের!

না। কাউকে জিজ্ঞেস করি নি কিছু। তবে তারপর থেকে মনে মনে সেই একই কথা ভেবে চলেছি—তাঁর যে সেদিনই পঞ্চতরণী থেকে শেষনাগ চলে আসার কথা! তাছাড়া তিনি তো দর্শন করেই এসেছিলেন, তাহলে আবার কেন অমরনাথ গেলেন?

আর গেলেনই যখন, তখন তার সঙ্গে আমার দেখা হল না কেন? এমনকি গুহাতেও আমি দেখতে পাই নি তাঁকে অথচ তিনি নাকি আগাগোড়া আমাকে আগলে রেখেছেন।

সারাপথে আমি তাই তাঁর কথাই ভেবে চলেছি শঙ্কুদা! বার বার মনে পড়ছে সেই সন্ন্যাসিনীর আশীর্বাদ—গৌরী, অমরনাথে তোমার কি দর্শন হয় দেখো।

দেখেছি। কিন্তু কিছুই যে বুঝতে পারছি না। কেবলই ভাবছি—কে এই সন্ন্যাসী? পবিত্র গুহায় স্বামী বিবেকানন্দ যাঁর দর্শন পেয়েছিলেন, তিনিই কি সেই সুপুরুষ সন্ন্যাসীর রূপ নিয়ে আমাকে করুণা করে গেলেন?"

পহেলগাঁও। সেই পরিচিত পহেলগাঁও। আমরা ফিরে এসেছি।

সেই পুল পেরিয়ে রামজী মন্দির আর ময়দান। সেই বাজার ছাড়িয়ে ট্যুরিস্ট্ অফিস আর বাসস্ট্যান্ড।

তারপরে পাইনবনের পাশে পাশে সেই মসৃণ পথ, আস্তে আস্তে উঠে গিয়েছে নিউ পাইন ভিউ হোটেল—পাঁচদিন আগে যেখান থেকে শুরু হয়েছিল পরমপ্রার্থিত পদযাত্রা। আর কয়েক মিনিট পরে আজ সেখানেই শেষ হবে আমার অমরতীর্থ-অমরনাথ পদপরিক্রমা।

কিন্তু ওভাবে ছুটে আসছে কে?

অজিত নয়!

হ্যাঁ। অজিতই তো! চন্দনবাড়ি থেকে আমি আর গৌরী আস্তে আস্তে পথ চলেছি। ওরা ঘোড়ায় এসেছে। তাই অনেক আগে পৌঁছে গিয়েছে হোটেলে। কিন্তু সে অমন করে ছুটে আসছে কেন? উৎরাই পথ। অজিত যে ব্লাডপ্রেসারের রোগী! কার কাছে ছুটে আসছে সে? আমার কাছে কি?

অজিত আসে। হাঁপাতে হাঁপাতে হাত বাড়ায়। বলে, "ঘোষদা! আপনার টেলিগ্রাম। খুলে দেখুন তো! মনে হচ্ছে গৌতমের খবর।"

টেলিগ্রাম! গৌতমের খবর? আমার হাত কাঁপছে।

গৌরী আমার হাত থেকে টেলিগ্রামটা ছিনিয়ে নেয়। তাড়াতাড়ি খুলে ফেলে পড়ে—

'MYSELF WILL BE ATTENDING SCHOOL FROM
NEXT WEEK (.) FOLLOW YOUR PROGRAMME.

GOUTAM

টেলিগ্রামটা ওর হাত থেকে নিয়ে নিই। আবার পড়ি, ভাল করে দেখি। একবার নয়, দু-বার নয়, বারবার।

ভাল হয়ে গিয়েছে। আমার গৌতম ভাল হয়ে গিয়েছে। সে নিজেই টেলিগ্রাম করেছে। আমাকে আমার ভ্রমণসূচী অনুসরণ করতে লিখেছে। সে আগামী সপ্তাহ থেকে স্কুলে যাবে।

আগামী সপ্তাহ? আবার টেলিগ্রামটা দেখি। ১৯শে অগাস্ট টেলিগ্রাম করেছে, এখানে এসে পড়েছিল এতদিন। আমরা যেদিন এখান থেকে পদযাত্রা শুরু করেছি, সেই শুক্রবারেই সে টেলিগ্রাম করেছে। আজ ২৩ শে অগাস্ট মঙ্গলবার। তার মানে সে

গতকাল থেকে স্কুল করছে।

চোখদুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। গতকাল সুধালিঙ্গের সামনে যেমন করে কেঁদেছিলাম, তেমনি করে কাঁদতে কাঁদতে আজ আবার তাঁকে বলি—ঠাকুর! তুমি আমার কথা রেখেছ। যেদিন এখানে বসে আমি তার ভাল-মন্দর সব দায়িত্ব তোমার ওপরে ন্যস্ত করেছিলাম, সেদিনই তুমি তাকে ভাল করে তুলেছ। নইলে পরদিন সে আমাকে টেলিগ্রাম পাঠাবে কেমন করে? আমি বুঝতে পারি নি ঠাকুর। আমি তোমাকে তেমন করে বিশ্বাস করতে পারি নি বলেই বারবার বিরক্ত করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

অমিত অমরনাথ! গতকাল তোমার সুধালিঙ্গের সামনে দাঁড়িয়ে তোমার কাছে কামনা করেছিলাম—পহেলগাঁওয়ে ফিরে এসে আমি যেন গৌতমের কুশল সংবাদ পাই। তুমি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করেছ। গতকাল থেকেই সে স্কুলে যেতে শুরু করেছে।

অমিয় অমরনাথ! তুমি স্বামী বিবেকানন্দজীকে ইচ্ছামৃত্যু বর দিয়েছিলে। তোমার সুধালিঙ্গ দর্শনের পরে তাই স্বামীজী বলেছিলেন—'The effects will come.' তাঁর সেই অমরবাণীও অমরতীর্থ অমরনাথে অক্ষরে অক্ষরে সত্য হল। জীবনে আমি তোমার আরও অনেক তীর্থ দর্শন করেছি, কিন্তু এমন প্রত্যক্ষভাবে আর কোন তীর্থদর্শনের ফল লাভ করি নি।

অমৃতময় অমরনাথ! তুমি আমার সকৃতজ্ঞ প্রণাম গ্রহণ করো। তোমার স্নেহময় পুণ্যস্মৃতি আমার মনের মণিকোঠায় অমর হয়ে রইল।

নীল দুর্গম

উৎসর্গ

বাবা ও মা-কে

এমনটি যে হবে তা কারুব কল্পনাতেও আসে নি। এমন কি এই যুদ্ধের মূলে যিনি—সেই কলহ-বিশারদ নারদও ভাবতে পারেন নি যে, সত্যি সত্যি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ইন্দ্রের এমনি একটা প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হয়ে যাবে। আর ভাববেনই বা কেমন করে? রাজ্য নিয়ে যুদ্ধ হয়, রানী নিয়ে যুদ্ধ হয়, আদর্শ নিয়ে যুদ্ধ হয়—তাই বলে ফুল নিয়ে? কিন্তু হয়েছিল তাই। পারিজাত নিয়েই নাকি যুদ্ধ বেধেছিল।

সেই দেবদুর্লভ পারিজাতের বন পেরিয়ে আমাদের যেতে হবে। ভৌগোলিকরা বলেন—ভুইন্দার উপত্যকা, গাড়োয়ালীরা বলেন—ফুলোঁ কা ঘাটি। বিখ্যাত পর্বতারোহী ও দার্শনিক ফ্র্যাঙ্ক এস্. স্মাইথ নাম দিয়েছেন—ভ্যালী অভ ফ্লাওয়ার্স, আমরা বলি—নন্দন-কানন।

শ্রীকৃষ্ণ ও ইন্দ্রের সেই সমর-ক্ষেত্র কোথায় জানি না। তবে শুনেছি—ব্রহ্মকমল ফেনকমল হেমকমলে পরিপূর্ণ কলির এই কানন, দ্বাপরের পারিজাত বনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

চারিদিকে তার তুষাবমণ্ডিত শৈলশিখর।

স্মাইথ বলেছেন, 'the most beautiful Himalayan valley I have ever seen.' তিনিই একে সভ্য জগতের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছেন। কিন্তু নিতান্ত আকস্মিক ভাবে তাঁর সঙ্গে এই উপত্যকার পরিচয়। ১৯৩১ সালে স্মাইথ কামেট (২৫৪৪৭ ফুট) বিজয় করে যখন গামশালী দিয়ে ফিরে আসছিলেন তখন তিনি প্রচণ্ড তুষার ঝড়ে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। দল ছাড়া স্মাইথ সহযাত্রী হোল্ডস্ওয়ার্থের সঙ্গে দিশেহারা হয়ে ছুটতে থাকেন। ঝড় থামল, দৃষ্টি স্বচ্ছ হল। তাঁরা বিস্মিত হলেন। দেখতে পেলেন—যতদূর চোখ যায় শুধু ফুল আর ফুল। লাল নীল হলুদ বেগুনি—জগতে যত রং আছে, যত গন্ধ আছে—সব এসে জড়ো হয়েছে এখানে। আকস্মিক ভাবে জগতে অনেক বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে। পথ হারিয়ে এক পথিক পিরামিড আবিষ্কার করেছিলেন। পথহারা পর্বতারোহীরা আবিষ্কার করলেন এই উপত্যকা।

অবশ্য ডাক্তার টি. জি. লংস্টাফের মতে সম্ভবত ১৮৪৮ সালে রিচার্ড স্ট্র্যাচী এই উপত্যকা অতিক্রম করেছিলেন। ১৮৬২ সালের ৩১শে অক্টোবর কর্নেল এডমান্ড স্মাইথ এবং ১৯০৭ সালের জুলাই মাসে লংস্টাফ নিজেও এই উপত্যকায় এসেছিলেন। কিন্তু তাঁরা এই কাননের কথা তেমন করে প্রচার করেন নি বলেই আমরা হোল্ডস্ওয়ার্থ ও স্মাইথকেই এই কাননের আবিষ্কারক বলব।

উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানীদের স্বর্গ এই কানন। সমুদ্র-পৃষ্ঠ থেকে প্রায় বারো হাজার ফুট উঁচু। জোশীমঠ থেকে উনিশ মাইল। কিন্তু মাইল মেপে পাহাড়ী পথের বিচার হয় না। বিশেষ করে গোবিন্দঘাটের পর বারো মাইল পথ, অত্যন্ত চড়াই। তাহলেও এ পথে দলে দলে তীর্থ যাত্রী আসেন। যান লোকপাল-হেমকুণ্ড ও নন্দন-কানন। হেমকুণ্ডে তাঁরা কতটা পুণ্য সঞ্চয় করতে পারেন জানি না, কিন্তু প্রাণভরে নন্দন-কাননের সৌন্দর্য-সুধা পান করে ঘরে ফেরেন। আমরাও যাব সেখানে। দু হাতে ফুল সরিয়ে পথ চলব। দেখব অমল-ধবল শুভ্র-সুন্দর নীলগিরি আমাদের আবাহন করছে। স্মাইথের স্বপ্ন ছিল নীলগিরি, 'unique in

my recollections for its beauty and interest, indeed the finest snow and ice-peak I have ever climbed...simple, beautiful and screne in the sun-light, the perfect summit of the mountaineers dreams.'

নীলগিরি অনেকটা নীলকণ্ঠ শৃঙ্গের মত—একেবারে ত্রিভুজাকৃতি। আশে পাশের সব শিখর ছাড়িয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। স্মাইথ ১৯৩৭ সালে এই শিখর আরোহণের গৌরব অর্জন করেন। কিন্তু সেই প্রথম, সেই শেষ। আজ পর্যন্ত আর কেউ এই শিখরে আরোহণ করতে পারেন নি। তাহলে আমরা এই শিখর নির্বাচিত করেছি কেন? পর্বতাভিযানে যত রকম বাধার সম্মুখীন হতে হয়, নীলগিরি তা সবই আমাদের উপহার দেবে। এই বাধাকে জয় করার অভিজ্ঞতা আমাদের আগামী দিনের বৃহত্তর পর্বতাভিযানের পথ প্রশস্ত করে দেবে।

বারো জন অভিযাত্রী, ছজন শেরপা ও দুজন সহকারীসহ বটানিক্যাল সার্ভে অভ ইন্ডিয়ার একজন বটানিস্টকে নিয়ে আমাদের দল। ২২শে সেপ্টেম্বর (১৯৬২) দুন এক্সপ্রেসে আমরা হাওড়া থেকে ঋষিকেশ যাত্রা করছি। আমাদের নেতা অমূল্য সেন দার্জিলিং হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের অ্যাড্‌ভান্স ট্রেন্‌ড্‌। সহ-নেতা ভানু ব্যানার্জি সার এডমান্ড হিলারীর 'সিলভার হাট' অভিযানের সদস্য ছিল। শিখর অভিযাত্রীদলের অপর দুজন সদস্য নিতাই রায় এবং নিরাপদ মল্লিকও দার্জিলিং থেকে বেসিক ট্রেনিং নিয়েছে।

দেশবাসীর অকুণ্ঠ সাহায্য ও আশীর্বাদ নিয়ে আমরা চলেছি দুর্গম নীলগিরি শিখরে। সফল আমাদের হতেই হবে। আশীর্বাদ করুন—শুভ যাত্রা লগ্নে যে পবিত্র জাতীয় পতাকা আপনারা আমাদের নেতার হাতে তুলে দিচ্ছেন, নীলমণি-নীলগিরির রজতশুভ্র স্বপ্ন-শিখরে তাকে স্থাপিত করে, আমরা যেন উন্নত শিরে আপনাদের মাঝে ফিরে আসতে পারি।

॥ ১ ॥

সেকি! লাল আলোটা সবুজ হয়ে গেছে! কখন হল? এইমাত্র কি? এর আগে তো চোখে পড়েনি। পড়বে কেমন করে? আত্মীয়-স্বজন সহ অগণিত শুভানুধ্যায়ীর আগমনে প্লাটফর্মে তিল ধারণের স্থান নেই। তাঁরা ফল ও মিষ্টি এনেছেন। ফুলের তোড়া ও মালা এনেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন, আলিঙ্গন করেছেন, আশীর্বাদ করেছেন। এতক্ষণ কি অন্য কোন দিকে তাকাবার অবসর ছিল, না থাকে? লালকে সবুজ হতে দেখি নি, কিন্তু স্টেশনে আসার পরে গত এক ঘণ্টায় যা দেখেছি তার তুলনা নেই। স্বজন-স্বগণের অন্তরের সবটুকু প্রীতি জড়ানো যে শুভেচ্ছা পেয়েছি, তা অভূতপূর্ব। বার বার মনে হয়েছে এই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন পাবার যোগ্যতা আমাদের আছে কি? আমরা কি পারব নীলগিরি শিখরে আরোহণ করতে? নিশ্চয়ই পারব। কিন্তু যাঁর অকৃপণ করুণা না হলে, এই অভিযানের আয়োজন সম্ভব হত না—আমাদের সেই শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী শারীরিক অসুস্থতার জন্য আজ স্টেশনে আসতে পারেন নি। ব্যথা পেয়েছি, কিন্তু বিমর্ষ হই নি। কারণ আমরা জানি তিনি রোগশয্যা থেকেও আমাদের আশীর্বাদ করছেন।

আমাদের সবাইকে গাড়িতে উঠতে দেখেই, নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় পনেরো মিনিট

পরে, গার্ডসাহেব বাঁশিতে ফুঁ দিলেন। আত্মীয়-বন্ধুর সমবেত জয়ধ্বনির মধ্যে দুন এক্সপ্রেস নড়ে উঠল।

কতবার তো এই গাড়িতে চেপে কত জায়গায় গিয়েছি। প্রতিবারই এমনি করে লাল আলো সবুজ হয়েছে। গার্ডসাহেব বাঁশি বাজিয়েছেন, আলো দেখিয়েছেন, দুন এক্সপ্রেস নড়ে উঠেছে। কিন্তু এমন অনুভূতি তো কোনদিন হয় নি। এমন উৎসাহ, এমন উদ্দীপনা, এমন সম্বর্ধনা, জীবনে এই প্রথম।

ধীরে ধীরে আমাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব ও শুভানুধ্যায়ীরা প্লাটফর্মের জনারণ্যে মিলিয়ে গেলেন। মিলিয়ে গেল আলো-ঝলমল হাওড়া স্টেশন ও কলকাতা মহানগরী—যে নগরী থেকে গত তিন বছর যাবৎ প্রতিবার এমনি একদল দামাল ছেলে দুন এক্সপ্রেসে চেপে হিমালয়ের গর্বকে খর্ব করার প্রচেষ্টায় যাত্রা করে। গাড়ি চলল এগিয়ে। আমরা চললাম এগিয়ে—ব্রহ্মকমল পরিবেষ্টিত অমল-ধবল শুভ্র-সুন্দর গাড়োয়ালের নীলগিরির দিকে।

যাত্রা হল শুরু। মনে পড়ছে আর এক সেপ্টেম্বরের সন্ধ্যায় এমনি ভাবেই যাত্রা করেছিলেন আমাদের এসোসিয়েশানের প্রাক্তন-সম্পাদক শ্রীসুকুমার রায়, তাঁর সহযাত্রীদের নিয়ে, নন্দকান্ত নন্দাঘুন্টির উদ্দেশ্যে। ১৯৬০ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বরের সেই গৌরবান্বিত গোধূলি থেকেই বাঙালীর পর্বতারোহণের ইতিহাস শুরু।

মনে পড়ছে 'মানা' অভিযানের নেতা শ্রীবিশ্বদেব বিশ্বাস ও তাঁর সহযাত্রীদের কথা। মনে পড়ছে শ্রীপৃথ্বী চৌধুরীর কথা। বাইশ বছরের সেই দুঃসাহসী যুবক আমাদের বীরেন সরকার সহ ছ জন তরুণ অভিযাত্রীকে নিয়ে গত বছর (১৯৬১) ২০শে অক্টোবর ২১৬৯০ ফুট উঁচু নন্দাখাত অভিযানের নেতৃত্ব করেন।

এঁরা সবাই আমাদের পথিকৃৎ। আজ এই শুভ লগ্নে এঁদের সবাইকে আমাদের ধন্যবাদ জানাই।

"হিমালয়ান এসোসিয়েশান—জিন্দাবাদ।'

শ্রীরামপুর স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। অপেক্ষমাণ জনতা আমাদের সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন। প্রাণেশ ও দেবীদাস উত্তরপাড়ার বাসিন্দা। ওদের আত্মীয়-স্বজনরা বিদায় জানতে এখানে এসেছেন। বীরেন ও টোপগের সঙ্গে প্রাণেশ আগেই চলে গেছে। কাল ওদের টেলিগ্রাম পেয়েছি। ঋষিকেশে আমাদের জন্যে বাসের ব্যবস্থা করে ওরা পিপলকোঠি রওনা হয়ে গেছে।

দেবীদাস দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, তার স্বজনদের সঙ্গে কথা বলছে। কিন্তু সে কথায় সুরের পরশ নেই। যাঁর ভ্রমরকৃষ্ণ আঁখির একটু সলাজ দৃষ্টি এই বিদায়লগ্নকে কাব্যময় করে তুলতে পারত, দেবীদাস তাঁকেই খুঁজে পাচ্ছে না।

রণেশদা ও শেষকিরণ সুরানা আমাদের সঙ্গে আছে। ওরা বর্ধমানে নেমে যাবে। শরীর ভাল নয় বলে রণেশদা অভিযানে যেতে পারছেন না। গেলে খুবই ভাল হত। ওঁর মত বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ লোকের প্রয়োজন অপরিহার্য। আর শেষকিরণের কথা ভেবে দুঃখ পেয়ে লাভ কি? তারই এ অভিযানে নেতৃত্ব করার কথা। কিন্তু এম. এ. পরীক্ষার

জন্য তাকে বর্ধমানে পড়ে থাকতে হল। নন্দাঘুণ্টি অভিযানেও শেষকিরণের অংশ গ্রহণ করার কথা ছিল। ৯ই অগাস্ট (১৯৬০) আনন্দবাজারে তার নাম পর্যন্ত ছাপা হয়েছিল। কিন্তু সেবারেও অনিবার্য কারণে শেষ পর্যন্ত শেষকিরণ অংশ গ্রহণ করতে পারে নি। সত্যই হতভাগ্য সে—দুর্ভাগ্য আমাদের।

বর্ধমানেও শ্রীরামপুরেরই পুনরাবৃত্তি। সস্ত্রীক ডাক্তার শৈলেন মুখার্জি ও বহু শুভানুধ্যায়ী এই গভীর রাতে আমাদের বিদায় জানাতে স্টেশনে এসেছেন—সঙ্গে ফুল ফল ও মিষ্টি।

বর্ধমান থেকে গাড়ি ছাড়ল। অনেক ফুল পাওয়া গেছে। পিনাকী ফুল সাজিয়ে বাসর রচনা করল। এইবারে শুয়ে পড়া যাক। যতটা সম্ভব জিরিয়ে নেওয়া ভাল। এতক্ষণ নিজেদের কথা ছিলাম ভুলে। কিন্তু এবারে সে ভুল ভাঙতে হবে। সবার কথা ভাবতে হবে। সুখে-দুঃখে বিপদে-বিজয়ে, একসঙ্গে থাকতে হবে, খেতে হবে, চলতে হবে। আমি এই অভিযাত্রী পরিবারের একজন, আলাদা প্রাণ থাকলেও আলাদা মন নেই।

রেলওয়ে বোর্ড আমাদের 'সিঙ্গল ফেয়ার ডাব্‌ল্ জার্নি কনসেশান' দিয়েছেন। মালপত্রের জন্য আমাদের মাত্র অর্ধেক ভাড়া লেগেছে। আমরা তৃতীয় শ্রেণীর স্লিপিং বার্থের যাত্রী। চার আনার বিনিময়ে এমনি আরাম কয়েক বছর আগেও কল্পনাতীত ছিল। গতকালের কল্পনা আজ বাস্তবে পরিণত, আজকের কল্পনা আগামীকাল বাস্তবে রূপায়িত হবে—এই তো সভ্যতার নিয়ম। অদূর ভবিষ্যতে এই কাঠের বেঞ্চখানায় গদি লাগানো হবে। জানলা দিয়ে আর কয়লাব কালো ছাই প্রবেশ করবে না। গাড়িতে বসেই বাড়ির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা যাবে।

একি করছি! চলেছি না নীলগিরি শিখরে? অভিযাত্রীর আবার ঘরের কথা কেন? পিছুটান থাকলে নাকি মানুষ এগিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু আমরা তো কেউই সন্ন্যাসী নই। যাঁরা আমাদের পথিকৃৎ তাঁরাও যে প্রায় সকলেই সংসারী। সংসার তো তাঁদের তুষার-সাধনায় বিঘ্ন উৎপাদন করে নি।

ঝড়ের বেগে গাড়ি ছুটে চলেছে। কারও কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। ওরা কি সবাই ঘুমিয়ে পড়ল? আমি ভাবছি—সেজকা প্রবোধদা শিশিরদা মনিদা লক্ষ্মীদা ডেসমন্ড্ ও ব্রডীর কথা। বিদ্যাদানের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ডক্টর এলমার জে. ব্রডী আমেরিকা থেকে ভারতে এসেছে। কিন্তু হিমালয় তাকে শুধু অধ্যাপনা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে দেয় নি। দার্জিলিং থেকে সস্ত্রীক বেসিক ট্রেনিং নিয়েছে। কথা ছিল ব্রডী আমাদের সঙ্গে যাবে। কিন্তু নানা কারণে সে আমাদের সঙ্গী হতে পারে নি।

"মিস্টার, শুনিয়ে মিস্টার, আপকা টিকট্ দেখাইয়ে।"

ঘুম ভেঙে গেল। খুব কাছাকাছি কেউ কাউকে ডাকছেন। হ্যাঁ, আমাদের গাড়ির কন্ডাক্টার ভানু ও চঞ্চলকে ডাকছে। ডাকবেনই তো। ওরা যে অন্যের বার্থ বেদখল করেছে। ওদের ভাগে পড়েছিল জানালার ধারে দুটি বার্থ। দৈর্ঘ্যে ওদের দেহের চেয়ে কিছু ছোট। তাই নিজেদের বার্থ খালি রেখে অন্য দুটি খালি বার্থ ওরা বেদখল করে নিয়েছে। এখন বোধ হয় খালি বার্থের আরোহীরা গাড়িতে উঠেছেন। কন্ডাক্টার জবর-দখলকারীদের উৎখাত করতে এসেছেন। কিন্তু প্রতিপক্ষ যে শব্দহীন। সাড়া দেবে কি?

নাঃ, ভানু সাড়া দিয়েছে। তবে কন্ডাক্টারের পক্ষে এরকম সাড়া না পেলেই বোধ হয় ভাল ছিল। তিনি ভানুর সাড়ায় ভড়কে গেছেন। এই গভীর রাতে তাকে বিরক্ত করার জন্যে চোস্ত ইংরাজিতে কন্ডাক্টারের কাছে কৈফিয়ৎ চাইছে ভানু। উৎখাত করতে এসে উৎখাত হলেন কন্ডাক্টার। এক পা দুপা করে পেছিয়ে গেলেন। ভানু নিশ্চিন্ত হয়ে পাশ ফিরতে যাচ্ছে এমন সময়, "কিরে? লোকটা গেছে তো?"

সেকি! চঞ্চল তাহলে জেগেই ছিল? ভানুর সঙ্গে আমিও হেসে উঠলাম।

"এখানে কিছু খেয়ে নিতে হবে।"

"কে?"

"আমি দেবীদাস।"

শুধু আমার নয়, ঘুম ভেঙেছে পিনাকী অমূল্য ও ডাক্তারের। পিনাকী বলে, "কি হয়েছে দেবীদাস?"

"একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়েছে। ভাবছি এখানেই কিছু খেয়ে নিলে কেমন হয়?"

"মোটেই ভাল হয় না। তুমি যদি রোজা করতে তাহলে না হয় ভেবে দেখা যেত?"

"মানে?" দেবীদাস গরম হয়েছে।

"এখন রাত তিনটে।"

"অ্যাঁ। কিন্তু আমার ঘড়িতে যে ছটা বেজে চার মিনিট।"

"ওটা কাল বিকেলের সময়, যখন তুমি বৌমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছিলে।"

অমূল্য আমাকে ডাকে।

"কি বলছ?" প্রশ্ন করি।

"আপনি বলেছিলেন ওয়াকি টকি নেওয়া হল না—দেবীদাসের ডিমোশান হল। এখন তো বুঝতে পারছেন, ওর প্রোমোশন ঠেকানো গেল না।"

"কি রকম?"

"ওয়ারলেস্ ইঞ্জিনিয়ার থেকে ফুড মিনিস্টার—রাষ্ট্রভাষায় খাদ্-মন্ত্রী।"

তুমুল হাস্যরোলের মধ্যেও ডাক্তার প্রতিবাদ জানায়, "ভুল হল। অমূল্য, তোমার ভুল হল।"

"কি হবে তাহলে?"

"একে কি প্রোমোশন বলে? এ যে ঘোড়া থেকে সহিস।"

আমাদের হট্টগোলে নিরাপদর ঘুম ভেঙে গেছে। তাহলেও সে এতক্ষণ চুপচাপ শুয়ে ছিল। এবারে গম্ভীর স্বরে শুরু করে, "দেবীদা, বিয়িং দি ফাদার অভ দি এক্সপিডিশান..."

এ কি বলছে নিরাপদ? আমরা অবাক হয়ে চেয়ে থাকি। সেও বুঝতে পারে আমাদের অজ্ঞতা। আমার দিকে তাকিয়ে বলে, "মানে...আমাদের দলে তিনজন বিবাহিত, তবে জনক হবার সৌভাগ্য একমাত্র দেবীদারই হয়েছে। তাই বলছিলাম", নিরাপদ আবার দেবীদাসের দিকে তাকায়, "বিয়িং দি ওনলি ফাদার অভ দি এক্সপিডিশান, আপনি কি

করে বাড়ি থেকে অনুমতি পেলেন?"

"ছেলে বড়। প্রথমে তাকেই বোঝালাম—তুই সঙ্গে গেলে যে আমায় চিঠি লিখতে পারবি না। তাই তোকে রেখে যাচ্ছি। ছেলে মেয়েকে বোঝাল..."

"মেয়ের মাকে কে বোঝাল, আমরা তাই জানতে চাইছি।" অমূল্য চিৎকার করে ওঠে।

দেবীদাস নির্বাক। বাইরে অসীম আকাশ আর সীমাহীন অন্ধকার। সে করুণ চোখে তাকিয়ে আছে সেদিকে। হয়তো উষার আশায়। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। ছেড়ে আসা স্টেশনে কিছুই খাওয়া হয়ে ওঠে নি দেবীদাসের।

'অশোচ্যানন্বশোচস্তং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥'

আবার ঘুম ভাঙল। না এবারে সত্যি সকাল হয়েছে। কিন্তু গীতাপাঠ করছে কে? এ যে দেখছি ডাক্তার! তন্ময় হয়ে পড়ছে—

'ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংযায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥'

যেমন কণ্ঠস্বর তেমনি উচ্চারণ। শুনতে ভালই লাগছে। কিন্তু শোনার কি উপায় আছে?

"এ নিশ্চয়ই মল্লিকের কাজ।" নিতাই চিৎকার করে উঠেছে। মল্লিক মানে নিরাপদ। নিরাপদ কিন্তু নির্বিকার। পলকহীন নয়নে সে চেয়ে আছে দূরের ঐ শিশির-ভেজা ছোট্ট গাঁয়ের দিকে।

নিতাইকে জিজ্ঞেস করি, "কি করেছে মল্লিক?"

"আমাকে সরিয়েছে। শুয়েছিলাম আপনার নিচের বার্থে। আমি এখানে এলাম কেমন করে?"

আশ্চর্য! আমরা তো কেউ টের পাই নি। আর যাকে সরিয়েছে সেই যখন পায় নি, আমরা টের পাব কেমন করে?

ডাক্তারের গীতাপাঠ শেষ হয়েছে। সে পুজোয় বসেছে। চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়েছে।

"তাহলে আজ দুপুরের মেনুটা এখনই ঠিক করে ফেলা যাক।"

সে কী? সকালের খাওয়াই যে এখনও হল না!

কিন্তু দূরদর্শী দেবীদাস বলে চলে, "ভাত ডাল ভাজা তরকারী মাটন..."

"না না চিকেন।" বলেই আবার চোখ বোজে ডাক্তার! খুব মনোযোগ দিয়ে পুজো করছে কি না।

গাড়ি থেমেছে। গয়া এসেছে। চা এল। পিনাকী মিহিদানার ঠোঙ্গা বার করতে যায়। দেবীদাস পিনাকীর দিকে এগিয়ে যেতে চায়। কিন্তু পারে না। অমূল্য নিতাই ও নিরাপদ অতি কষ্টে তাকে বসিয়ে দেয় তার সীটে। ডাক্তারের পুজো শেষ হয়েছে। সে চোখ খুলেই বলে, "আমার কাছে ট্যাবলেট আছে।"

"কিসের?" দেবীদাস জিজ্ঞেস করে।

"ক্ষিদে নষ্ট করার।"

"আমি খাব না।"

"কাল রাতে দেখেছি আপনি হাঁ করে ঘুমোন।"

"রাতের কথা রাতে হবে। এখন তো মিহিদানা খাওয়া যাক।" আমরা হাসিতে ফেটে পড়ি। এই সুযোগে দেবীদাস পিনাকীর পাশে গিয়ে বসে পড়ে।

॥ ২ ॥

প্রায় তেইশ ঘণ্টা কেটে গেল। গাড়ি চলছে, আমরা চলেছি। আলাপ-আলোচনা, গাল-গল্প, খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে আমাদের সময় গাড়ির মতই ছুটে চলেছে।

গাড়ি থামল। লখ্‌নউ এসে গেছে। হাত পায়ের জড়তা ভাঙাতে সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। আমিও নামলাম। তবে আলস্য পরিহার করতে নয়, এখানে এসে আমি গাড়ির মধ্যে বসে থাকতে পারি না। লখ্‌নউকে আমার বড় ভাল লাগে। লখ্‌নউ উত্তর প্রদেশের বৃহত্তম মহানগরী। ভুলভুলাইয়া রেসিডেন্সি চিড়িয়াখানা ও হজরৎগঞ্জ ভারত বিখ্যাত। লখ্‌নউয়ের মানুষ সুন্দর, ভাষা সুন্দর, সঙ্গীত সুন্দর। সুন্দরের চিরস্থায়ী আবাস লখ্‌নউ। লখ্‌নউকে সকলের ভাল লাগে। আমার কিন্তু ভাল লাগে অন্য কারণে। ভাল লাগে এই স্টেশনটির জন্য। যদি কোনদিন 'আর্ট-ইন ইন্ডাস্ট্রির' মত 'আর্ট-ইন-স্টেশন' কথাটি চালু হয়, তবে লখ্‌নউয়ের স্থান হবে ভারতীয় রেলপথের পুরোভাগে। লখ্‌নউয়ের চেয়ে বৃহত্তর ও আধুনিকতর স্টেশন ভারতে আছে। কিন্তু সুন্দরতর স্টেশন আছে কি?

তাই গাড়ি থামলেই নেমে পড়ি। বেরিয়ে আসি বাইরে। রাস্তায় পায়চারি করতে করতে স্টেশনটি দেখি আর ভাবি...

কিন্তু আজ বোধ করি ভাবার অবকাশ হল না। গেটের বাইরে পা বাড়াতেই কানে এল, "কোথায় যাচ্ছেন?"

"প্রায় চল্লিশ মিনিট এখানে গাড়ি দাঁড়াবে। একটু ঘুরে আসি।"

"চলুন আমিও যাচ্ছি। শেরপা পূর্বা ছান্দুর পেটের গোলমাল হয়েছে। ওর জন্য বিস্কুট নিয়ে আসি।"

"কেন? বিস্কুট তো আমাদের সঙ্গেই রয়েছে।"

"না না। ডাইজেস্টিভ কিছু নিতে হবে।" কিন্তু দেবীদাস ওদিকে ছুটছে কেন? ওটা তো বিস্কুটের দোকান নয়। পকোড়া আবার ডাইজেস্টিভ হল কবে থেকে? তাহলেও দেবীদাস হাঁক ছাড়ে, "এই এক কিলো লাগাও।"

"সে কী, ছান্দুকে এক কিলো পকোড়া খাওয়াবেন?"

"ছান্দু নয়, আমি, মানে আমরা খাব।"

"একটু বাদেই যে রাতের খাবার এসে যাবে।"

আমার অবান্তর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে দেবীদাস নিজের কাজ গুছিয়ে নেয়। গরম ঠোঙাটি হাতে নিয়ে বলে, "চলুন।"

"কোথায়?"

"ছান্দুর বিস্কুট কিনতে।"

ছোট লাইনের স্টেশন পেরিয়ে আমরা বড রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। রাস্তা পেরুতে হবে। ওপারেই বাজার। দেবীদাস থমকে দাঁড়ায়। না দাঁড়ায় না, কি একটা ইশারা করেই উলটো দিকে ছুটে চলে। নিরুপায় হয়ে ওর পেছনে ছুটি। বেশিদূর ছুটতে হয় না। দেবীদাস কলা কিনছে। বাছাবাছি ও দরাদরি চলল প্রায় মিনিট দশেক ধরে। আমি দর্শক মাত্র। অবশেষে দেবীদাস রফা করে, "দেও তিন দরজন।"

"সে কি মশাই, ক্ষেপে গেলেন নাকি? কাল সকালেই তো আমরা হরিদ্বার পৌঁছচ্ছি। এগুলো খাব কখন?"

"কেন আজ রাতে। সাহেবদের দেখেন নি ডিনারের পর ফ্রুটস খায়?" কলার কাঁদি আমার কাছে দিয়ে দেবীদাস বলে, "চলুন।"

"কোথায়?"

"ছান্দুর বিস্কুট কিনতে।"

"কিন্তু এদিকে যে প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে এল।"

দেবীদাস অবিচলিত। সে এগিয়ে চলে। আমি তাকে অনুসরণ করি।

দু-তিনটি দোকানে হানা দিয়ে আমাদের জন্য আর কিছু না কিনে, শেষ পর্যন্ত শ্রীমান ছান্দুর ভোজনোপযোগী সেই পরম ঈপ্সিত ডাইজেস্টিভ বিস্কুট কেনা হল। আর কিনেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অবিচলিত দেবীদাস বিচলিত হয়ে উঠল। বিস্কুটের ঠোঙা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে সে পকোড়া হাতে ছুট লাগাল। গাড়ি টাঙ্গা রিকশা ঠেলা ও পদচারীদের সশঙ্কিত করে প্রকম্পিত হৃদয়ে সে দুন এক্সপ্রেসের পানে ছুটল। আমি তাকে অনুসরণ করি। বেশ কয়েকজনের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে একাধিকবার গাড়ি চাপা এড়িয়ে প্লাটফর্মে প্রবেশ করে দেখি সহযাত্রীরা গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে গাড়ির দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে। গার্ডসাহেব সবুজ আলো দেখাচ্ছেন—দুন এক্সপ্রেস নড়ে উঠেছে।

ঐ তো মনসা পাহাড়। হরিদ্বার এসে গেছি। শুধু হরিভক্ত ও হরভক্তদের মোক্ষদ্বার নয়, ধর্মপ্রাণ ভক্তদের মোক্ষক্ষেত্র নয়, আমাদের মতো ভক্তিহীন অধার্মিক পাহাড়-পাগলেরও পরম-প্রিয় এই হরিদ্বার।

আজ সোমবার ২৪শে সেপ্টেম্বর। সকাল আটটা। চারিদিকে চকচকে রোদ। কালও নাকি বেশ বৃষ্টি হয়েছে। কলকাতায়ও ঠিক তাই হয়েছিল। আমাদের রওনা হবার আগের দিন সে কি বিরামহীন বৃষ্টি। তারই মধ্যে শেরপাদের দ্বিতীয় দল হিমালয়ান ইন্সটিটিউটের সাজসরঞ্জাম নিয়ে দার্জিলিং থেকে শেয়ালদা পৌঁছল। ট্রাম বাস বন্ধ। এক কোমর জল ভেঙে শেয়ালদা গিয়েছিলাম। কি দুশ্চিন্তায়ই না পড়েছিলাম। অথচ আশ্চর্য, পরদিন সকাল থেকেই খটখটে রোদ। হরিদ্বারেও কি তাই হল?

গাড়ি থেমেছে। কোয়ার্টার মাস্টার পিনাকী সিংহ ও দেবীদাস চঞ্চল হয়ে উঠল। চঞ্চল হয়েছে ম্যানেজার চঞ্চল মিত্র। বলতে গেলে এখান থেকেই কাজ শুরু হল। প্রাথমিক প্যাকিং পিনাকীকেই করতে হয়েছে সত্য, কিন্তু হাওড়া স্টেশনে রণেশদা শেষকিরণ ও কয়েকজন সহৃদয় রেলকর্মী আমাদের মালপত্রের ঝক্কি সামলেছে। আজ

তারা কেউ নেই। হরিদ্বার স্টেশনের রেলকর্মীরা নিজেদের কাজ ফেলে আমাদের মালপত্রের তদারকি করবেন না। তাই ওরা প্লাটফর্মে লাফিয়ে পড়ল। "কুলি, এই কুলি" বলে চিৎকার করে উঠল। কুলি কাছেই ছিল। চিৎকারের প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু মানুষ তো সব সময়ে প্রয়োজন হিসেব করে কাজ করে না।

কুলি এল। দলে দলে কুলি এসে ভিড় করল। কিন্তু মালপত্র পরীক্ষা করার পর কুলিদলপতির শ্রীমুখ থেকে যে টাকার অঙ্কটি নিঃসৃত হল, তা শুনে শুধু ক্যাশিয়ার শৈলেশ চক্রবর্তীর নয়, আমাদের সকলেরই হৃদ্‌কম্প শুরু হল। অতএব পিনাকী প্রস্তাব করে, "বারো আনা মাল তো ব্রেকভ্যানেই রয়েছে। রেলের কুলিরাই ওগুলো ঋষিকেশের গাড়িতে তুলে দেবে। সঙ্গে আমাদের আধটনের মতো পার্সোনাল লাগেজ। চোদ্দজন মিলে এ মালটুকু ও প্লাটফর্মে নিতে পারব না?"

"নিশ্চয়ই পারব।" ছাপ্পান্ন বছরের প্রবীণ যুবক শৈলেশদাই সবার আগে হেঁকে ওঠেন।

মালপত্র গাড়ি থেমে নামানো হল। দেবীদাস ইতিমধ্যে 'Nilgiri (Garhwal) Expedition, 1962' ফেস্টুন দুটো গাড়ির গা থেকে খুলে ফেলেছে। ঠিক হল রীলে করে মাল নিয়ে যাওয়া হবে। সবাই কিছু দূরে দূরে দাঁড়িয়ে পড়লাম। শৈলেশদাও এসে দাঁড়ালেন আমাদের সঙ্গে। অনেক বলে কয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করলাম। তিনি তাঁর সাদা র‍্যাশন ব্যাগটি নিয়ে ঋষিকেশের গাড়িতে চলে গেলেন। বয়ে নিয়ে যাওয়া মালপত্র পাহারা দেবেন শৈলেশদা।

কুলিরা কাছেই বসে আছে। বসে বসে বিড়ি ফুঁকছে। কি যেন বলাবলি করছে, আর মাঝে মাঝেই হো হো করে হেসে উঠছে। হাসবেই তো, আমরা যে ওদের জুলুম মেনে নিই নি। শুধু ওরা নয়, হরিদ্বারের অন্যতম বাসিন্দা শ্রীহনুমানের বংশধরগণও বোধ করি ক্ষুব্ধ হয়েছে আমাদের আচরণে। নইলে ওরা কেন একে একে এসে ভিড় করেছে আমাদের চারপাশে? কুলিরা হাসছে, ওরা ভেংচি কাটছে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেবীদাস জানে, কুলিদের অসন্তুষ্ট করে ঋষিকেশ পৌঁছনো যাবে, কিন্তু হনুমানদের হাতে রাখাই উচিত। র‍্যাশন ব্যাগ থেকে কলা বের করে প্লাটফর্মে ছড়িয়ে দেয় দেবীদাস। হনুমানকুল অম্লানবদনে দেবীদাসের ঘুষ গ্রহণ করে। কলা কেনার জন্য কাল রাতে অনেক কথা শুনতে হয়েছে তাকে। অনেকেই কলা খায় নি। সেই কলা আজ জান বাঁচাল আমাদের। দূরদর্শী দেবীদাস।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই মালপত্র সব নিয়ে আসা হল ঋষিকেশের গাড়িতে। অমূল্য ভানু নিতাই নিরাপদ ও ডাক্তার হর-কি-প্যারী দেখতে চলল। ওরা এই প্রথম হরিদ্বার এসেছে। চঞ্চল ওদের গাইড হল। আজীবা তার সঙ্গীদের নিয়ে খেতে গেল। ব্রেকভ্যানের মালপত্র তদারক করতে ছুটল পিনাকী ও দেবীদাস। শৈলেশের সঙ্গে আমিও পড়ে রইলাম প্লাটফর্মে।

শৈলেশদা তাঁর সাদা থলিটি দেবীদাসের টুল-বক্সের ওপর রেখে প্লাটফর্মের বেঞ্চিতে এসে বসেন। আমি পায়চারি করতে থাকি। গাড়ি ছাড়ার দেরি আছে। প্লাটফর্মে শুধু আমরা দুজন। কোথা থেকে আবার একটা হনুমান এসে হাজির হল। দু-চার বার এদিক ওদিক দেখে নিয়ে সে আমাদের কামরায় ঢুকে পড়ে। এবং সঙ্গে সঙ্গে শৈলেশদা

এমন ভাবে চিৎকার করে ওঠেন, যেন পালে বাঘ পড়েছে। দ্বিতীয় দরজা দিয়ে তিনিও গাড়িতে ঢোকেন। হাত পা নেড়ে বলতে থাকেন, "হেই হেই।" হনুমানও তাঁকে ভেংচি কাটতে থাকে। নির্ভীক হনুমান ধীর পদক্ষেপে শৈলেশদার থলির দিকে এগোয়। ঐরকম একটি থলি থেকে দেবীদাস ওদের কলা বের করে দিয়েছিল। শৈলেশদা আর্তনাদ করে ওঠেন, "গেল গেল।"

এগিয়ে যাই। জানলা দিয়ে একখানি আইস্-এক্স হাতে তুলে নিই। হনুমানের নজর পড়ে আমার দিকে। আইস-এক্সয়ের সম্মান রেখে সে পেছনের দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়। হেসে শৈলেশকে বলি, "কি আর করত হনুমানটা?"

"কি করত না? দেখতে পাও নি সে আমার থলির কাছে আসছিল?" অপুত্রক শৈলেশদা অপত্যস্নেহে থলিটায় হাত বুলিয়ে, আবার নেমে আসেন গাড়ি থেকে।

"শৈলেশদা ও শৈলেশদা! টুল্সের বাক্সটা একটু দিয়ে যাবেন?" ঐ প্লাটফর্ম থেকে দেবীদাস হাঁকছে। শৈলেশদা নিরুত্তর। এমন কি তিনি দেবীদাসের দিকে ফিরে পর্যন্ত তাকাচ্ছেন না। বাধ্য হয়ে আমি উঠে দাঁড়াই। কিন্তু দেবীদাস ততক্ষণে লাইন ডিঙিয়ে আমাদের প্লাটফর্মে উঠে এসেছে। বলে, "ব্রেকের মাল নামাতে গিয়ে কুলিরা দুটি বাক্স ভেঙে ফেলেছে। সারাতে হবে।"

"দাঁড়াও, দাঁড়াও। তুমি গাড়িতে উঠবে না। আমি দিচ্ছি তোমার টুল-বক্স।" শৈলেশদা দেবীদাসকে বাধা দেন।

একজন দুজন করে যাত্রী সমাগম হচ্ছে। শৈলেশদা বেঞ্চির সীট থেকে ব্যাক্ রেস্টের ওপর উঠে বসেছেন। অপলক নয়নে তাকিয়ে আছেন তাঁর থলিটির দিকে।

দেবীদাস ও পিনাকী এসে জানাল, ব্রেকের মালপত্র সব গাড়িতে উঠে গেছে। একটু বাদে শেরপারাও ফিরে এল। দেবীদাস বলে, "চলুন কিছু খেয়ে আসা যাক।"

"সবাই তো একসঙ্গে যেতে পারব না।" শৈলেশদা বলেন।

"কেন?"

"তোমার সব কিছুতেই কেন।"

"বেশ আপনি থাকুন। আমরা চলি।"

"তা চলবে না? আমি বুড়ো মানুষ না খেয়ে তোমাদের মাল পাহারা দেব।"

লজ্জা পেয়ে বলি, "আমার তেমন ক্ষিদে পায় নি। আমি এখানে বসছি। আপনারা খেয়ে নিয়ে আমার জন্য যা হোক কিছু নিয়ে আসুন।"

"তাই ভাল।" শৈলেশদা খুশি হয়েছেন। তারপরে আমার কানের পাশে মুখ এনে বলেন, একটু গাড়িতে চল। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

দু জনে গাড়িতে উঠি। শৈলেশদা ফিস্ফিস্ করে বলেন, "খুব সাবধান। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এই থলিটার পাশে বসে থাকবে।"

"কেন? ওতে কি আছে?"

"টাকা।'

"টাকা!"

"হ্যাঁ যাতে কেউ আঁচ করতে না পারে, তাই সমস্ত টাকা রেখেছি এই থলিতে। কাউকে বলবে না। খুব সাবধান। একটু এদিকে ওদিকে হলেই কিন্তু..."

॥ ৩ ॥

গাড়ি ছেড়েছে হরিদ্বার থেকে। কিন্তু নেই সেই গতিবেগ। দুন এক্সপ্রেস যদি হয় চার ঘোড়ার ফিটন, এ তাহলে নিঃসন্দেহে চার বেয়ারার পাল্‌কি। চলেছে হেলে দুলে মজলিশী চালে—সুরঙ্গ পেরিয়ে, ঝরনা ডিঙিয়ে, শাল আর দেওদার বনের বুক চিরে।

চলেছি সবাই। ওরা হরিদ্বার দেখে যথাসময়ে ফিরে এসেছিল। হরিদ্বার নাকি আগের চেয়ে আরও বড়, আরও জম-জমাট হয়েছে। হবেই তো। কোন এক সময় হরিদ্বার ছিল শুধু তীর্থক্ষেত্র, ছিল তপোভূমি। সাধু সন্তরা এখানে আসতেন তপস্যা করতে। ভোলানন্দগিরি মহারাজ এখানেই তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আসতেন দলে দলে তীর্থযাত্রী—যেতেন গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী, কেদার-বদ্রী। তখনও কুম্ভমেলা হত এখানে কিন্তু ছিল না এত ধর্মশালা। যাত্রীরা রেললাইনের ধারে ছোট ছোট কুঁড়ে বানিয়ে বা তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটাতেন। মনে পড়ে ১৯৩৮-এর সেই ট্র্যাজেডির কথা। তারিখটা ছিল ৭ই এপ্রিল। আগুন লেগে যাত্রীদের দুশ কুটির ভস্মীভূত হয়েছিল।

সেই হরিদ্বার আর এই হরিদ্বার। সেদিনের এই পর্ণকুটিরের জায়গায় আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে গগনচুম্বী প্রাসাদ। হরিদ্বার এখন আর শুধু তীর্থক্ষেত্র নয়, বাণিজ্যকেন্দ্রও বটে। অদূর ভবিষ্যতে এখানে রাশিয়ার সহযোগিতায় স্থাপিত হবে হেভি ইলেট্রিক্যাল্‌স্‌-এর কারখানা। গঙ্গার অপর পারে গৌরী পর্বতশ্রেণী থেকে কুনাও বনবিশ্রাম গৃহ পর্যন্ত, এই একশ মাইল বনভূমি সংরক্ষিত হয়েছে, হাতি হরিণ বাঘ ও চিতা বাঘ প্রভৃতি বন্যজন্তুদের নিরাপদ বাসভূমি (Sanctuary) রূপে। কিছুদিনের মধ্যেই এটি একটি ন্যাশনাল পার্কে পরিণত হবে। তখন চণ্ডী পাহাড়ের মূল্য যাবে কমে। দেবী চণ্ডীকাকে দর্শন না করে, তাঁর বাহনকে দর্শন করবেন অনেকে।

"বলতেই সেই অতিকায় পালোয়ানটা জল থেকে উঠে এসে দু হাতে আমায় জড়িয়ে ধরল। আমার তো প্রাণপাখি খাঁচাছাড়া হবার যোগাড়। বলল..."

ওদিকে দেখছি অমল বেশ জমিয়ে নিয়েছে। আমি কোথায় ভেবে চলেছিলাম হরিদ্বারের কথা, রায়ওয়ালার কথা। বলাই হয় নি, রায়ওয়ালায় গাড়ি দাঁড়িয়েছে। হরিদ্বার—ঋষিকেশ—দেরাদুন পথের জংশন এই স্টেশন। যখন ঋষিকেশের রেল লাইন হয় নি, তখন যাত্রীরা অনেকে এখানে নেমে পায়ে হেঁটে ঋষিকেশ যেতেন। ঋষিকেশের রেল লাইন হবার পর, রায়ওয়ালার মূল্য গিয়েছিল কমে। তাই বোধ করি সরকার রায়ওয়ালাকে একটি শিল্পনগরীতে পরিণত করে তুলছেন। তবে রায়ওয়ালার কথা থাক। অমূল্য-কাহিনী শোনা যাক।

ওরা তখন হর-কি-প্যারীতে। সকলে ছবি তোলার ফিকির খুঁজছে। কারণ প্রকাশ্যে হর-কি-প্যারীর ছবি তোলা নিষেধ। হঠাৎ অমূল্য দেখে, পতিত-পাবনীর প্রবল স্রোতে এক জোড়া গোঁফ জলে ভাসছে। তার মনে পড়ে 'গোঁফের আমি, গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।' আর চেনা গোঁফ দেখতে পেয়েই অমূল্য চিৎকার করে ওঠে, "ঠিক হ্যায়।" প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চেনা গোঁফের অচেনা মালিক তার দৈত্যের মতো দেহখানি নিয়ে জল থেকে ওপরে উঠে আসে। দু হাতে জড়িয়ে ধরে অমূল্যকে। বলে, "এক জাত্‌ কা মরদ্‌ দেখনেসে কিসকো না আনন্দ্‌ হোতা হ্যায়!"

অমূল্য হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। এ তাহলে তার গোঁফের জন্য আরেক গোঁফধারীর আনন্দ-বিগলিত আলিঙ্গন!

তারপর ঋষিকেশ। আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব সহ সাধুদি স্টেশনে এসেছেন। এখনও অনেক ফল মিষ্টি রয়েছে, তারই কিছু সাধুদিকে দিয়ে দিলাম। সাধুদি ভেবেছিলেন আমরা অন্তত একটা দিন ঋষিকেশে থাকব। থাকব না শুনে মনে মনে একটু দুঃখ পেলেন। কিন্তু মুখে তা প্রকাশ করলেন না। বারবার হাত দুখানি কপালে ছুঁইয়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলেন—ওদের মনোবাসনা পূর্ণ করো। ওরা যেন সুস্থ শরীরে সবাই ঘরে ফিরে যায়।

স্টেশন থেকে বেরিয়েই দেখি বাস দাঁড়িয়ে। বীরেন ও প্রাণেশ আমাদের জন্য বাস ঠিক করে রেখে গেছে। ব্রেক থেকে মালপত্র ছাড়িয়ে বাসে বোঝাই করা হল। সময় কম লাগল না। মাল তো কম নয়। সব মিলিয়ে প্রায় দু টন। আমরা কয়েকজন স্টেশনেই স্নান সেরে নিলাম। বাকি কজন ঘাটে চলে গেল। ঠিক হল স্নান করে, বাজার সেরে, তারা পুরনো বাস স্ট্যান্ডে ফিরে আসবে। সেখানে সুভাষ হোটেলে খাওয়া সেরে, আমরা যাত্রা করব।

সুভাষ হোটেলে পৌঁছনো গেল। গাড়ি থামতেই দেবীদাস গিয়ে হোটেলে ঢুকল। ডাক্তার নিরাপদ নিতাই ও শৈলেশদা গাড়িতে রইলেন। আমি ছুটলাম টুরিস্ট কালিকমলীর অফিসে—আমাদের বটানিস্টের খবর নিতে। তাঁর দেরাদুন থেকে এখানে এসে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবার কথা। খবর পেলাম তিনি এখনও এসে পৌঁছন নি। টুরিস্ট অফিসারকে বলে এলাম—আমরা রওনা হয়ে যাচ্ছি, জোশীমঠে তাঁর জন্য অপেক্ষা করব। তিনি যেন তাড়াতাড়ি জোশীমঠে চলে যান।

হোটেলের লোক এসে খবর দিল—খানা রেডি। হোটেলে ঢুকে দেখি, দেবীদাস বেশ সাজিয়ে বসেছে—কতক্ষণ আগে কে জানে! থলি বিভ্রাটের জন্যে শৈলেশদা বাসেই বসে রইলেন। আমরা তাঁর খাবার পাঠিয়ে দিলাম। ড্রাইভার জানিয়ে গেল বারোটায় শেষ গেট। আর মাত্র আধঘণ্টা বাকি। কিন্তু ওরা যে এখনও বাজার করে ফিরে এল না। আমরা তো খেয়ে নিই। ওরা না হয় পথে কোথাও খেয়ে নেবে। বারোটার গেট ধরতেই হবে। আমাদের খাওয়া হলে দেবীদাস বলে, "আপনারা যান আমি আসছি।"

ওরা বাজার সেরে ফিরে এল। বারোটা বাজতে আর বারো মিনিট বাকি। পিনাকী বলে, "বাস ছেড়ে দাও, আমরা ব্যাসীতে খেয়ে নেব।"

কিন্তু দেবীদাসের দেখা নেই। নিরাপদ ছুটল সুভাষ হোটেলে। বারোটা বাজতে আর মাত্র সাত মিনিট। ড্রাইভার ক্রমাগত অসহিষ্ণু ভাবে হর্ন দিচ্ছে। এই গেট ধরতে না পারলে একদিন এখানে বসে থাকতে হবে। গেট এখানে থেকে মাইলখানেক।

নিরাপদকে একা ফিরতে দেখে আমরা উত্তেজিত। সমস্বরে চীৎকার করি, "সে কী, দেবীদাসের কি হল?"

হতাশ কণ্ঠে সে জবাব দেয়, "ড্রাইভার যত হর্ন দিচ্ছে, দেবীদা তত ভাত নিচ্ছেন।"

চার পাঁচ জনকে নিয়ে অমূল্য মরীয়া হয়ে ছুটল সুভাষ হোটেলে। দেবীদাসকে ধরে নিয়ে এল। বারোটার আর দু মিনিট বাকি।

না, আমাদের বারোটা বাজে নি। আমরা গেট পেলাম। গেট পেরিয়ে 'গঙ্গা মাঈ কি জয়' বলে ড্রাইভার নিশ্চিন্তে বাস ছেড়ে দিল। বাস ছুটল তীব্র গতিতে। নীলগিরি অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হল।

চড়াই উৎরাই অপ্রশস্ত পথ ধরে এগিয়ে চলল আমাদের বাস। বেলা প্রায় দুটোয় ব্যাসী পৌঁছলাম। অভুক্ত সহযাত্রীদের সঙ্গে দেবীদাস আবার খেতে বসে গেল। আমাদের তাড়ায় নাকি ঋষিকেশে তার খাওয়াই হয় নি।

বিকেল চারটেয় দেবপ্রয়াগ এলাম। দেবভূমি দেবপ্রয়াগ। হিমালয়ের পঞ্চ-প্রয়াগের শ্রেষ্ঠ প্রয়াগ। ভাগীরথী ও অলকানন্দার মিলনভূমি দেবপ্রয়াগ। আমরা ঋষিকেশ থেকে বিয়াল্লিশ মাইল এসেছি। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আমরাও চিন্তান্বিত। সকালে রেডিওতে শুনেছি ওপরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। টিহ্‌রী যাবার রাস্তা পেরিয়েই লছমৌলীতে শুরু হল মুষল ধারায় বৃষ্টি। যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। একটু দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছে না। ড্রাইভার খুব আস্তে আস্তে চালাচ্ছে। কীর্তিনগর পর্যন্ত এইভাবেই চলতে হবে। রাস্তা ভাল নয়। কীর্তিনগর এখান থেকে দু মাইল।

সন্ধ্যার একটু আগে শ্রীনগরে পৌঁছলাম। এখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। বাস থেকে নেমে কোন রকমে টুরিস্ট হোমে ছুটে এলাম। বীরেনের অনুরোধে টুরিস্ট অফিসার আমাদের রাত্রিবাসের বেশ ভাল বন্দোবস্তই করে রেখেছেন। বসে রইলাম বৃষ্টিবন্ধের প্রতীক্ষায়।

গতবারে মানা অভিযাত্রীদের শ্রীনগর থেকেই হাঁটতে হয়েছিল। যথেষ্ট কুলি না পাওয়ায় তাঁদের নিজেদেরই মালপত্র বইতে হয়েছিল। ওরা সংখ্যায় ছিলেন কম, কিন্তু মালপত্র ছিল আমাদের প্রায় দ্বিগুণ। তাহলেও পথকষ্ট ওদের নিরুৎসাহ করতে পারে নি। আমাদেরও পারবে না। আমরাও প্রমাণ করব—বাঙালী ধৈর্যহীন নয়, কর্মবিমুখ নয়, কাপুরুষ নয়।

॥ ৪ ॥

প্রতীক্ষা ব্যর্থ হয়েছে। সারারাত বৃষ্টি হয়েছে, এখনও হচ্ছে। কবে থামবে কে জানে। তাই বলে আমরা থামি নি। আজ ২৫শে সেপ্টেম্বর—সকাল পাঁচটা পঁয়ত্রিশে আমাদের বাস শ্রীনগর থেকে ছেড়েছে। বাস চলছে বটে তবে রাস্তা রীতিমত ভয়াবহ। তাহলেও পথের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। উষার প্রথম আলোয় আকাশ আর পাহাড় আলাদা হয়ে গেল। অপরাজিতা কৃষ্ণকলি ও সন্ধ্যামালতীর দল আত্মপ্রকাশ করল। মাঝে মাঝে ক্যাকটাসের বন, এক একটি যেন ঝাড়লণ্ঠন। মেঘে ঢাকা পাহাড়—যেন ওড়না জড়ানো। গাছে ছাওয়া পাহাড়—যেন কোঁকড়ানো কালো কেশে মুখখানি ঢাকা।

রুদ্রপ্রয়াগের কাছে এসে বাস থামাতে হল। রাস্তা বন্ধ। ধস নেমেছে। পি. ডাবলু. ডি-র লোক রাস্তা ঠিক করছে। আমরা নেমে তাদের সাহায্য করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্তা মোটামুটি ঠিক হয়ে গেল। ড্রাইভার ভগৎরাম খালি বাস নিয়ে এল এপারে। আমরা হেঁটে এসে বাসে উঠলাম।

অবশেষে রুদ্রপ্রয়াগ। রুদ্রপ্রধান রুদ্রপ্রয়াগ। হিমালয়ের পঞ্চপ্রয়াগের দ্বিতীয় প্রয়াগ। অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর মিলনভূমি, দেবর্ষি নারদের তপোভূমি রুদ্রপ্রয়াগ। জিম্ করবেটের রুদ্রপ্রয়াগ।

জিম্ করবেটের স্বর্গীয় আত্মা যদি আজ এখানে আসেন, তা হলে নিঃসন্দেহে বিস্মিত হবেন। সে রুদ্রপ্রয়াগ আর নেই। সেই দড়ির ঝোলাটিও নিশ্চিহ্ন হয়েছে। সেখানে এখন লোহার পুল।

রুদ্রপ্রয়াগ এখন রীতিমত শহর। এখানে তৈরি হচ্ছে হাইডেল পাওয়ার স্টেশন। তবে এখনও কেদার যাত্রীদের নামতে হয় রুদ্রপ্রয়াগে। অলকানন্দার পুল পেরিয়ে ওপারে গিয়ে কুণ্ডচটির বাস ধরতে হয়। কিন্তু এই পায়ে চলা পুলের ওপরে বাস যাতায়াতের জন্য বড় পুল তৈরি করা হচ্ছে। অদূর ভবিষ্যতে ঋষিকেশ থেকে একই বাসে পৌঁছনো যাবে কুণ্ডচটি কিংবা তারও আগে।

আমরা ঋষিকেশ থেকে ৮৮ মাইল এসেছি। চা খেয়ে বাসে উঠলাম। সাড়ে আটটা বাজে। একটু বাদেই গেট খুলল। বাস চলল। কোন্ ফাঁকে আর একখানা বাস আমাদের আগে এসে দাঁড়িয়েছিল। সে এখন ধুলো ওড়াচ্ছে আর আমরা তাই খাচ্ছি। বাধ্য হয়ে আমরা আরও পেছিয়ে পড়লাম। তাহলেও আমরা এগিয়ে চলেছি। কিন্তু আর বুঝি এগোনো যায় না। আগের সেই বাসটি বিকল হয়েছে। বিকল বলা ভুল। অচল হয়েছে। কদিন ধরেই এ অঞ্চলে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। কর্দমাক্ত পথে আগের সেই বাসের চাকা বসে গেছে। পথ বন্ধ।

আমরাও হাত লাগালাম। বহু কষ্ট করে শেষ পর্যন্ত চাকা তোলা গেল। পাথর দিয়ে রাস্তা মেরামত করার পর দু ঘণ্টা বাদে আবার কোনমতে বাস চলল।

গৌচরে পৌঁছতে এগারোটা বেজে গেল। গৌচর রুদ্রপ্রয়াগ থেকে চোদ্দ মাইল। অল্পের জন্য আমরা গেট ফেল করলাম। পিছনের মিলিটারি ট্রাকটি কিন্তু গেট পেল। পেল বলা ভুল। গেট খুলে দেওয়া হল। সীমান্তের পথ। মিলিটারির বেলায় গেটের নিয়ম খাটে না। খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের বেলাতেই বা খাটবে কেন? আমাদের বাসও তো সাধারণ যাত্রীবাহী নয়। কথাটা প্রথম খেয়াল হল ভানুর। বলে, "চলো, গেটম্যানের কাছে যাওয়া যাক।"

সব শুনে গেটম্যান বলে তার কোন আপত্তি নেই, যদি আমরা চামোলীতে ফোন করে ডেপুটি কমিশনারের কাছ থেকে অনুমতি নিতে পারি।

"ফোন পাব কোথায়?"

"কেন, ঐ তো পোস্টাফিসে।"

অনেক চেষ্টা করেও পোস্টমাস্টার চামোলীর লাইন পেলেন না। কোথাও হয়তো ধস নেমে টেলিফোনের তার ছিঁড়ে গেছে। ওপরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। গভীর দুশ্চিন্তা নিয়ে ফিরে এলাম। উপায় নেই। সাড়ে চার ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। গেট খুলবে সাড়ে তিনটায়। দু-ঘণ্টার জন্যে বলতে গেলে সারা দিনটাই মাটি হল।

পিনাকী বলে, "এখানেই স্নান খাওয়া সেরে নিতে হবে।"

ভানু বলে, "নিউজ-রিপোর্টটাও ডেসমন্ডকে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার।"

স্টেট্‌সম্যানের সহকারী সম্পাদক ও বিখ্যাত পর্বতারোহী শ্রীডেস্‌মন্ড ডয়েগ

আমাদের এই অভিযানের প্রধান পরামর্শদাতা। স্টেট্‌সম্যান দু-মাসের জন্য এই অভিযানের ইংরেজী সংবাদ-স্বত্ব ক্রয় করেছেন। কিন্তু রিপোর্ট ও ফটো পাঠাবার দায়িত্ব আমরা নিজেরাই নিয়েছি। তাঁদের তরফ থেকে কোন সাংবাদিক বা ফটোগ্রাফার আমাদের সঙ্গে আসেন নি। এই অভিযান কোন বিশেষ ব্যক্তি বা সংস্থার অর্থানুকূল্যে আয়োজিত হয় নি। সংবাদ ও ছবির বিনিময়ে স্টেট্‌সম্যানের কাছ থেকে কিছু অর্থ আমরা পেয়েছি। কিছু আমরা নিজেরাই দিয়েছি। অধিকাংশ অর্থ ওষুধ এবং কিছু কিছু রসদ ও সরঞ্জাম বিভিন্ন সহৃদয় ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান আমাদের দান করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ভারত সরকার আমাদের অর্থ সাহায্য করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের সক্রিয় সহযোগিতার জন্যই আমরা প্রয়োজনীয় অর্থ ও সামগ্রী সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি—তথা জনসাধারণের সাহায্যে সংগঠিত ভারতের এই প্রথম পর্বতাভিযান সম্ভব হয়েছে।

নিরাপদ উত্তেজিত, "দেখে যান অমূল্যর কীর্তি।"

"কেন কী হল?"

"বাধার পর বাধা। বাসে জোশীমঠ পৌঁছুতে পারব কিনা ঠিক নেই। আর সে কিনা লিডার হয়ে ঐ পাথরখানার আড়ালে গিয়ে চিঠি লিখতে বসেছে!"

"ওঃ এই কথা।"

"কেন? এটাই কি কিছু কম হল। কাকে লিখছে জানেন?"

"কাকে?"

"শবরীকে।"

"সে তো সেই ত্রেতা যুগের ব্যাপার।"

"না দাদা ত্রেতা নয় কলি, ঘোর কলি। ত্রেতা ও দ্বাপরের ঐ নামগুলো ফিরে এসেছে এযুগে। এ শবরী সে শবরী নয়।"

"তবে কে?"

"কে আবার? লিডারের কিছু হবে হয়তো।"

"বটেই তো। কোথায় বাড়ি ঘর ছেড়ে এসেছে। বাড়িতে কুশলসংবাদ দেবে, তা নয়। কে কবে কি হবে, বসে বসে তার কাছে চিঠি লেখা! চলো অমূল্যর চিঠি সেন্সার করে আসি।"

পাথরখানির পাশে পৌঁছতেই অর্ধশায়িত অমূল্য সচকিত হয়ে উঠে বসে, "কি ব্যাপার?"

"দেখি কাকে কি লিখছ।" অমূল্য কাঁচুমাচু। অর্ধসমাপ্ত চিঠিখানা নিরাপদ কেড়ে নেয় ওর হাত থেকে। কিন্তু চিঠিতে নজর বুলিয়েই সে যেন কেমন হয়ে যায়। নিরাপদ চলে যাবার পর অমূল্যর সুইট-শবরী স্নেহের সর্বেশ্বর হয়েছে। অমূল্যকে জিজ্ঞেস করি, "কিন্তু আজ তো ভাই পয়লা এপ্রিল নয়।"

পিনাকী এসে হাজির। বলে, "তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নাও। রান্না হয়ে এল।"

কখনই বা হোটেলে অর্ডার দেওয়া হল, আর কখনই বা রান্না চড়ল? তবে পিনাকী যখন বলছে, তখন স্নান করে এলে যে খাবার পাওয়া যাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাসে ফিরে এলাম। কেউ কেউ কলতলায় ছুটল। আমরা জামা কাপড় তেল সাবান নিয়ে

এগিয়ে চলি নদীর দিকে—অলকানন্দার তীরে।

ওপরে বৃষ্টি হলেও এখানে এখনও বৃষ্টি নামে নি। তবে সূর্য মাঝে মাঝেই মেঘের পিছনে লুকিয়ে পড়ছে। ভ্রমণে মেঘলা আবহাওয়া সব সময়েই মনোরম। তাই ভাল লাগছে পথ চলতে। চলেছি গৌচরের সুদীর্ঘ সমতল প্রান্তর পেরিয়ে। হ্যাঁ, সমতল বৈকি। একেবারে বাংলা দেশের মতো সমতল। তবে উচ্চতা ৩০০০ ফুট। গৌচর একটি উপত্যকা—চারিদিক পাহাড়ে ঘেরা। উপত্যকার মাঝখান দিয়ে মোটরপথ। পথের ধারে সারি সারি দোকান, ধর্মশালা নর্মাল-স্কুল, মেয়েদের জুনিয়ার হাইস্কুল, আয়ুর্বেদিক ঔষধালয়, ডাকঘর ও গান্ধী আশ্রম।

বৃটিশ আমলে গৌচর ছিল বিমানক্ষেত্র। তিব্বত রক্ষার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত। ভারতীয় বাহিনী তিব্বত ছেড়ে চলে আসার পর আমাদের কাছে সেই বিমানক্ষেত্রের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল। সেদিনের বিমানক্ষেত্র আজ গোচারণের ভূমিতে রূপান্তরিত। আশ্চর্য, আজও গৌচর এবং অগস্ত্যমুনির সমতল প্রান্তরকে প্রয়োজনে লাগানো হচ্ছে না।

॥ ৫ ॥

বাস ছেড়েছে গৌচর থেকে। ইতিমধ্যে নেমেছে বৃষ্টি। এতক্ষণ টিপটিপ করে পড়ছিল। এবারে জোরে শুরু হয়েছে। যতই এগোচ্ছি ততই বেশি ধস চোখে পড়ছে। রাস্তার যা অবস্থা তাতে বাসে কতদূর যাওয়া যাবে, ড্রাইভার ভগৎরামও নিশ্চয় করে বলতে পারছে না। অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি পড়ছে। একটু দূরের জিনিস দেখা যাচ্ছে না। ভগৎরাম মাঝে মাঝে বাস থামিয়ে চুপচাপ বসে থাকছে। বৃষ্টি একটু কমলে আবার আস্তে আস্তে চালাচ্ছে।

এমনি ভাবে বলতে গেলে প্রাণ হাতে নিয়ে আমরা পৌঁছেছি কর্ণপ্রয়াগ। কর্ণগঙ্গা ও অলকানন্দার মিলনভূমি, দাতা কর্ণের তপোভূমি, কর্ণধন্য কর্ণপ্রয়াগ। হিমালয়ের পঞ্চপ্রয়াগের তৃতীয় প্রয়াগ। আমরা ঋষিকেশ থেকে ১০৯ মাইল এসেছি। গৌচর থেকে ছ মাইল। এই ছ মাইল পথ বাসে আসতে দেড়ঘণ্টা লেগেছে।

এখন পাঁচটা বাজে। আর একটু দেরি হলে গেট পাওয়া যেত না। গেটম্যান গেট খুলে দিল, কিন্তু পথের খবর কিছুই দিতে পারল না। আমরা এগিয়ে যাওয়াই সাব্যস্ত করলাম। তাড়াতাড়ি চা খেয়ে, কর্ণশিলার উদ্দেশে প্রণাম করে, আবার রওনা হলাম।

বৃষ্টি থেমে গেছে। স্বভাবতই আমরা উৎফুল্ল। বাসও অপেক্ষাকৃত জোরে চলেছে লংগাসু গ্রামের মধ্য দিয়ে। শান্ত সমাহিত সুন্দর একখানি গ্রাম। পথ জনশূন্য। বাদলা দিনে কেউ আর বাইরে বেরোয় নি। কেনই বা বেরুবে? ওদের ঘর আছে, ঘরণী আছে। ঘরছাড়া ডাক্তার বোধকরি তার ছেড়ে-আসা ঘরকে উদ্দেশ করে গান ধরেছে, 'এমন দিনে তারে বলা যায়,...'।

না। ঐ তো একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে। ওরও কি ঘর নেই? বাস থামাতে বলছে কেন? যে কারণেই বলুক, ভগৎরাম ব্রেকে চাপ দেয়। বাস থামে। লোকটি এগিয়ে আসে। বলে, "সামনেই রাস্তা ধসে গেছে। আপনারা নন্দপ্রয়াগ পৌঁছুতে পারবেন না। তার চেয়ে আজ রাতটা এখানেই থেকে যান। গ্রামের স্কুলে আপনাদের

থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এগিয়ে গেলে পথে রাত কাটাতে হবে।"

"কাটাতে হয় কাটাব। পথের নেশাতেই তো আমরা পথে বেরিয়েছি ভাই।" অমূল্য আমাদের প্রতিনিধিত্ব করে।

ভানু বলে, "সঙ্গে তাঁবু রয়েছে ভাবনা কিসের?"

"যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। আমরা এগিয়ে যাব।" লিডার ঘোষণা করে।

অতএব ভগৎরাম গাড়ি ছাড়ে। গাঁয়ের লোকটি পথ ছেড়ে দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আমাদের চলন্ত বাসের দিকে।

গরিবের কথা বাসি হলে ফলে। গোঁয়ার্তুমির ফল যে এমন হাতে হাতে পাব তা তখন বুঝতে পারি নি। লংগাসু ছাড়িয়েই শিউরে উঠলাম। এ যেন বর্ষাকালের পূর্ব-বঙ্গের মেঠো পথ। মাঝে মাঝেই বাসের চাকা বসে যাচ্ছে। কখনও আমরা বাসে চড়ছি। কখনও বাস আমাদের ওপর চড়ছে। আমরা বাস থেকে নেমে ঠেলে-ঠুলে রথচক্রকে কর্দমমুক্ত করছি। কিন্তু এত করেও বেশি দূর এগোনো গেল না। সংকীর্ণ পথের একটা বিরাট অংশ সম্পূর্ণ ধসে গেছে।

পাশের পাহাড় থেকে অনবরত পাথর গড়িয়ে পড়ছে। দু-একখানি আমাদের বাসের ছাদেও পড়ছে। ওদের আকৃতি আর একটু বড় হলে কি হবে বলা যায় না। কিন্তু সেকথা ভেবে অযথা শঙ্কিত হই কেন? প্রকৃতির হাতে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করেছি। ভয়-ভাবনা অলকানন্দায় বিসর্জন দিয়ে অলকানন্দার মতই উচ্ছল হয়ে উঠতে হবে। সহসা দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে অমূল্য আবৃত্তি শুরু করে—

'...When life is dull,
Or when my heart is full
Because my dreams have frowned,
I wander up the rills,
To stones and tarns and hills–
I go there to be crowned,'

অমূল্য থামে। আমাদের মুকুটলোভী মন ভেসে চলে, অলকানন্দা পেরিয়ে নন্দনকানন ছাড়িয়ে—নীলগিরি শিখরে। ভানু কিন্তু আমাদের মতো চুপ করে থাকে না। সহ-নেতা নেতার মতোই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে—

'That height and crown,
From whence you may look down
Upon triumphed chance!'

পাহাড়, পাহাড় আর পাহাড়। পাহাড় ছাড়া কিছুই নেই এখানে। আছে, কিন্তু এখানে নয়, অনেক নিচে, অলকানন্দার তীরে। ছোট্ট একফালি সমতল প্রান্তর। কয়েকটি কুটির আর কিছু চাষের জমি। গাড়োয়ালী গ্রাম—হরকোটি। গ্রামের সীমা উঠে এসেছে খাড়া পাহাড়ে। সেই পাহাড় কেটে তৈরি হয়েছে পথ—মহাপ্রস্থানের পথ—আমাদের নীলগিরির পথ।

পিনাকী ঘোষণা করে, "ব্যস—আজ রাতের ধর্মশালা এই ভগৎরামের বাস, আর মেনু শুকনো চিঁড়ে।"

"চিড়ে খেয়ে রাত কাটাতে হবে?" দেবীদাসের কণ্ঠে বিদ্রোহ।

"নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" চঞ্চল বলে ওঠে।

"কেন ঐ গাঁয়ে গিয়ে দুধ আনা যায় না?"

বলা হয় নি—পিনাকী শৈলেশদা ডাক্তার ও দেবীদাস চা খায় না। পিনাকীর জল হলেই চলে। শৈলেশদা ও ডাক্তার গুঁড়ো দুধ পেলেই খুশি। কিন্তু দেবীদাসের নাকি খাঁটি ঘন ভয়সা দুধ না হলে অসুবিধে হয়।

ভানু বলে, "যাওয়া যায় না তা নয়, তবে যেতে যেতেই সন্ধে হয়ে যাবে। গেলে হয়তো দুধ খেতে পারবেন। কিন্তু খেয়েদেয়ে ফিরে আসতে পারবেন কি?"

"কেন?"

"জিম্ করবেটের সেই ম্যান ইটিং লেপার্ডটার কথা মনে আছে তো? সে যদিও কর্ণপ্রয়াগের এ দিকে আসত না, কিন্তু তার আত্মীয়স্বজন নাকি প্রতিশোধের নেশায় মরীয়া হয়ে রাতের আঁধারে এ সব অঞ্চলেও ঘুরে বেড়ায়।"

"দরকার নেই মশায় গাঁয়ে গিয়ে। তার চেয়ে আসুন রান্নাব ব্যবস্থা করা যাক।"

"কোথায়?' চঞ্চল জিজ্ঞেস করে।

"কেন এই রাস্তার ওপর। দরকার হলে তাঁবু ফেলে।"

"বেশ চেষ্টা করে দেখুন।" ম্যানেজার অনুমতি দেয়। শেরপাদের নিয়ে দেবীদাস নেমে পড়ে বাস থেকে।

আরও পাঁচখানি বাস অচল হয়ে আছে এখানে এসে। প্রায় সবকটিই বদ্রীযাত্রীতে বোঝাই। বুড়ো বুড়ীর সংখ্যাই বেশি। কিছু ছোট ছোট ছেলেমেয়েও আছে।

"ইস এরা না খেয়ে থাকবে কেমন করে?" শৈলেশদা সবিশেষ চিন্তিত।

"কেন বুড়োদেরই কি কষ্ট কিছু কম হবে?" ডাক্তার গম্ভীর কণ্ঠে বলে। শৈলেশদা আড়চোখে তাকে একবার দেখে নিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকেন।

"বুড়োদের কথা ভাবছেন কেন? দেখছেন না তাঁরা চিঁড়ে ও ছাতুর পোঁটলা খুলে বসেছেন। বরং বাচ্চাদের কিছু বিস্কুট দেওয়া যেতে পারে।" পিনাকীও দেখছি শৈলেশদার দলে।

"আমাদের অসুবিধে হবে না তো?" শৈলেশদা বিচলিত।

"না অসুবিধের কি আছে? আমাদের যেমন করে হোক চলে যাবে।" পিনাকী অভয় দেয়, "এক যাত্রায় পৃথক ফল হওয়া ঠিক নয়। কি বলো অমূল্য?"

কিছুক্ষণ বাদেই সদলবলে দেবীদাস ফিরে এল। অনেকটা ওয়াটারলুর পর নেপোলিয়নের মতো, "নাঃ। রান্নার জায়গা খুঁজে পেলাম না। পাহাড়ী পথে এত কাদা।"

পিনাকী চিঁড়ে ও গুড় পরিবেশন করল। দই নেই, জল নেই, শুকনো চিঁড়ে। খেয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। শুরু হল ভ্যারাইটি পারফর্ম্যান্স। কেউ গান, কেউ আবৃত্তি আর ডাক্তারের গীতা পাঠ।

আঁধার নেমে এসেছে এই পাহাড়ী পথে, ঐ হরকোটি গাঁয়ে। আর অলকানন্দার ওপারে। শাল ও দেওদারে ছাওয়া কৃষ্ণ কালো পাহাড়ে পাহাড়ে। আঁধার ঘনিয়েছে সবার মনে। কেমন করে ঝড় বাদলের মধ্যে রাত কাটাব এই অজানা জঙ্গলাকীর্ণ পথে? অধিকাংশ যাত্রীরাই সশঙ্কিত। তা হলেও উপায় নেই। অপেক্ষা করতে হবে উষার। আশা

করতে হবে সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতের। কিন্তু কি ভাবে এই কাল-রাত্রি কাটানো যায়? ঠিক হল—ভেতরে আলো জ্বেলে দরজা, জানলা বন্ধ করে, সবাই বাসের মধ্যে বসে থাকবে। রাতে কেউ একা বাস থেকে নামবে না।

গান থেমেছে। আবৃত্তি শেষ হয়ে গেছে। গীতা পাঠও সমাপ্ত হয়েছে। শুধু চলেছে অলকানন্দার ক্রুদ্ধ গর্জন আর নীলগিরি অভিযাত্রীদের নাসিকা গর্জন। শুনছি আর ভাবছি—সেদিনের কথা, যেদিন বাস ছিল না। এই পথও ছিল না। অথচ কত শত যাত্রী মহাপ্রস্থানের পথ পাড়ি দিতেন। শীত কষ্টে, ক্ষুধার তাড়নায়, রোগে ভুগে, বাঘের পেটে গিয়ে, অনেকের ভাগ্যেই বদ্রীদর্শন হয়ে উঠত না। যাঁরা ভাগ্যবান তাঁরাও সবাই ঘরে ফিরে আসতে পারতেন না। কিন্তু পুণ্যার্থীদের প্রবাহে ভাঁটা পড়ে নি। আর আজ একটা রাত বাসে কাটাতে হবে বলে সবাই বিরক্ত, বিচলিত ও ভীত। কারণ অনেকেই এসেছেন ঘোরার নেশায়। এসেছেন অবসর বিনোদন করতে। হিমালয়ের অপার সৌন্দর্য উপভোগ করতে। এমন কি যাঁরা পুণ্যসঞ্চয় করতে এসেছেন, তাঁরাও সবাই একাগ্রচিত্ত নন।

'পিণি তু সরাব সোয়া, পিনি তু সরাব।
দুনিয়া দোরঙ্গে হোগী মৌসুম খারাপ ॥
এ গিরি তু বসন্ত কি ফুল ফলা নীল পিলা।'

এই সঘন-গহন রাতে, এই ভয়ঙ্কর পরিবেশে, কারা আবার বসন্তের জয়গান গাইছে! কিন্তু কে সে খবর দেবে আমাকে? ভগৎরাম ও তার সহকারীকেও দেখছি না। একা বাইরে বেরুব কি? সবাই যে নিষেধ করেছে। করুকগে, কি আর হবে? বৃষ্টির শব্দও পাচ্ছি না। এতক্ষণে হয়তো প্রকৃতি তার ভাণ্ডার উজাড় করে দিয়েছে আর আমি প্রাণের ভয়ে বাসের মধ্যে বসে আছি? এতই যদি ভয়, তবে কেন এলাম এই দুর্গম পথে?

ট্রানজিস্টার কাঁধে ঝুলিয়ে একটা টর্চ হাতে নিয়ে বাস থেকে নেমে পড়ি। অন্তহীন কালো আকাশ তারায় ছেয়ে গেছে। আমার মনের আকাশেও আশার আলো জ্বলে ওঠে। কাল হয়তো আর বৃষ্টি নামবে না। শুধু আকাশে নয়, ঐ তো মাটিতেও আলো রয়েছে। আলো জ্বলছে হরকোটি গাঁয়ে। হয়তো বন্যজন্তুদের হাত থেকে রক্ষা পেতে গ্রামবাসীরা আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। আকাশের তারা আর মাটির আগুন, আশার আলো আর জীবনের আলো। দুয়ে মিলে এক হয়ে গেছে। আরও একটি আলো দেখতে পাচ্ছি। আলো নয়, আঁকা-বাঁকা একটি রুপোলী রেখা—উত্তাল উদ্দাম অলকানন্দা।

ওখানে আবার কারা? দেখা যাক না কি ব্যাপার। এগিয়ে চলি। জনকয়েক ড্রাইভার ও তাদের সহকারীরা পাথর দিয়ে রাস্তা প্রশস্ততর করছে, যাতে কোনরকমে একখানি বাস ঘোরানো যায়। এই ছখানি বাসকে এখান থেকেই ঋষিকেশ ফিরে যেতে হবে। তাই শীত বর্ষা ও নিদ্রাকে উপেক্ষা করে এরা রাস্তা চওড়া করছে। প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামরত মেহনতি মানুষের দল। এরাই তো বিশ্বকর্মা।

'শ্রাবনী কু গাজ সোয়া, শ্রাবনী কু গাজ।
অন্যারু মুখরী তেরী কেঁওয়ে হোলা আজ ॥
এ গিরি তু বসন্ত কি ফুল ফলা নীল পিলা।'

গান এখনও চলেছে। এগিয়ে চলি! হ্যাঁ, যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই। বাকি সব

ড্রাইভার ও তাদের সহকারীরা তুরিয়ানন্দ হয়ে টলতে টলতে সঙ্গীত-সরস্বতীর আরাধনায় মত্ত। একটু আগে যাদের দেখে এলাম, এরাও তাদেরই মতো মেহনতী মানুষ। ওরা মর্তের পথ প্রশস্ত করছে,—আর এরা...?

থাক। এখানে দাঁড়িয়ে কাজ নেই। পাছে দেখতে হয় যে আমাদের শান্তশিষ্ট নম্র-ভদ্র ভগৎরামও এদের দলে। তাই এগিয়ে চলি। বাঃ! এ বাসের যাত্রীরাই দেখছি সত্যিকারের ধার্মিক। আলোচনা চলেছে, 'যাহার চিত্তসংযম হইয়াছে, যাহার হস্তপদাদি সংযত আছে, অর্থাৎ যাচ্ঞা, অবৈধ দানগ্রহণ, কুৎসিত স্থানে গমন, অভক্ষ্য ভক্ষণ, অপরিমিত আহার, ইন্দ্রিয় সেবন, ক্রোধাদি রিপুর অপব্যবহার কার্যাদি হইতে যিনি বিরত আছেন, যিনি তীর্থমাহাত্ম্যাদি অবগত আছেন, তিনিই তীর্থ-ফললাভের সম্পূর্ণ অধিকারী।'

এঁরাও পথ প্রশস্ত করছেন—স্বর্গের পথ।

এগিয়ে চলি। শেষ বাসখানির পাশে পৌঁছে থমকে দাঁড়াই। ভেতর থেকে শিশুর কান্না ভেসে আসছে। ভেসে আসছে নারীকণ্ঠের ঘুমপাড়ানী গান। ক্লান্ত সন্তানকে শান্ত করতে চাইছেন শ্রান্তিহীনা জননী। জননী নয় বিষ্ণু। কি হবে স্বর্গে গিয়ে?

চলে আসি ধসের পাশে। পাহাড়ের গা থেকে ধস নেমেছে। রাস্তার একটা বিরাট অংশ ধসে গিয়ে অলকানন্দায় বিলীন হয়েছে। ধস নয়, সংহাররূপী রুদ্র।

আশে-পাশে কোথাও কোন প্রাণের সাড়া নেই। সময়ের স্পন্দনও যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। কড়-কড়-কড়াৎ। ভয় পেয়ে পেছিয়ে আসি। না, এখানে নয়। ঐ পাহাড়ের গা থেকে আর একখানি পাথর ধসে পড়ল অলকানন্দায়। ঘড়ির দিকে তাকাই। রাত দুটো বেজে গেছে। এখনও ভোর হতে অনেক দেরি। একটু বসা যাক না এখানে। ধসের পাশে একখানি পাথরে বসে পড়ি। ট্রানজিস্টারটা খুলি। কাঁটা ঘোরাতেই—

'Of life immense in passion, pulse, and power,
Cheerful, for freest action form'd under the laws divine,
The Modern Man I sing.'

পাশ্চাত্য সঙ্গীত। ইউরোপে এখন সবে সন্ধ্যে। ওরা ঐ অলকানন্দার মতই উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

আকাশের তারা আর মাটির আগুন, রুদ্রের তাণ্ডব আর বিশ্বকর্মা মানুষ, স্নেহময়ী জননী আর মাতাল ড্রাইভার, স্বর্গলোভী মানুষের শাস্ত্রালোচনা ও মর্তভোগী মানুষের রক-এন্-রোল। বিচিত্র এই পৃথিবী।

॥ ৬ ॥

"ম্যানেজ করেছি।"

চোখ মেলে তাকাই। দেবীদাস আমাকে ডাকছে। রাত ফুরিয়েছে—জীবনের এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার রাত। আজ ২৬শে সেপ্টেম্বর। শেষরাতে সেই ধসের পাশ থেকে উঠে এসে, ড্রাইভারের পাশের সীটে আশ্রয় নিয়েছিলাম। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। দেবীদাসের ডাকে ঘুম ভাঙল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উঠতে পারি না। পা দুটো স্টিয়ারিং হুইলের ভেতর থেকে বের করে আনতে সময় লাগে। আমার সীট, ভগৎরামের সীট,

হ্যান্ডব্রেক ও স্টিয়ারিং জুড়ে আমার সুখ-শয্যা। আশ্চর্য ব্যাপার। আমি তো বসে ছিলাম আমার সীটে। কখন আমার এ হাল হল? যখন হয়েছে তখন নিশ্চয়ই আমাতে আমি ছিলাম না।

দেবীদাস তাড়া লাগায়, "তাড়াতাড়ি নামুন। জুড়িয়ে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে ম্যানেজ করেছি।"

"কী ম্যানেজ করেছেন?"

"এই যে।" ওর হাতে আধ মগ দুধ ও একখানি বিরাট দেশী বিস্কুট।

"একি মেড্ ইন্ হরকোটি?"

"না। মেড্ ইন্ শুন্‌লা।"

"সে আবার কোথায়?"

"কাছেই। ধসের পরে বাঁকটা পেরিয়েই ছোট একটি গ্রাম। সারা রাতই ক্ষিদের জ্বালায় ছটফট করেছি। তাই ভোর হতেই বেরিয়ে পড়লাম। দেখি শুনলা ইন্সপেক্‌শান বাংলোর নিচেই একটি দোকান। সে যাই হোক। ওপারে বাস ঠিক করা হয়েছে। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন। মাল বইতে হবে।"

কাল সন্ধ্যায় নেহাত বাঘের ভয়ে হরকোটি নামতে পারে নি। কিন্তু আজ সকালে ঠিক দুধ যোগাড় করে এনেছে। দুগ্ধ-প্রিয় দেবীদাস দত্ত।

দুধ খেয়েই মাল বইতে শুরু করলাম। শেরপারা ইতিমধ্যে আইস-এক্স দিয়ে ধসের ওপরে একটি পায়ে চলা পথ তৈরি করে ফেলেছে। সেই সঙ্কীর্ণ পথরেখার ওপর দিয়ে মাল ঘাড়ে নিয়ে অতি সন্তর্পণে যাওয়া আসা করতে হচ্ছে আমাদের। শুধু আমরা নই, বদ্রীগামী ও বদ্রী-ফেরত যাত্রীদেরও তাই করতে হচ্ছে। এ ধস মেরামত করতে বেশ কয়েকদিন সময় লাগবে। এ কদিন এভাবেই মহাপ্রস্থানের পথ চালু থাকবে।

নতুন বাসে মাল বোঝাই করা হল। কাল সন্ধ্যায় মাত্র দুখানি বাস এসেছিল ওপর থেকে। কিন্তু আজ সকালেও দুখানি বাস এসে গেছে। আরও নাকি আসছে । বাস বদল হল। বদল হল ভগৎরাম। শান্ত-শিষ্ট নম্র-ভদ্র ভগৎরাম। সেও আমাদের সঙ্গে মাল বয়েছে। কোন নিষেধ শোনে নি।

বেলা নটায় বাস ছাড়ল। জোর করেই ছাড়া হল। ড্রাইভার রাজী হচ্ছিল না। বেলা এগারোটায় নাকি নন্দপ্রয়াগের গেট। আগে পৌঁছলে দুশ' টাকা ফাইন। সেই ঝুঁকি নিয়েই আমরা বাস ছাড়লাম। ক্ষুধা তৃষ্ণা ও অনিদ্রায় সকলেই অবসন্ন। তাছাড়া আবহাওয়াকেও বিশ্বাস নেই। সকাল থেকে বৃষ্টি নামে নি বটে কিন্তু রোদও ওঠে নি। আকাশ থমথমে।

ভগৎরাম এখন দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে। হাত নাড়ছে। হাতে আমাদের দেওয়া সার্টিফিকেট। পরম সমাদরে আঁকড়ে ধরে আছে। বিপজ্জনক পথ পেরিয়ে যাদের নিয়ে এসেছে এতদূর, তাদের এই সামান্য স্বীকৃতিটুকু ওর কছে এত মূল্যবান কেন কে জানে? ওর বড় আশা ছিল, আমাদের পৌঁছে দেবে জোশীমঠ। আশাহত ভগৎরামের চোখের জল আমাদের চোখকেও সজল করে তুলেছে।

আবার বৃষ্টি নামল। মুষলধারে নয়, টিপটিপ করে। কর্দমাক্ত পথকে দুর্গমতর করে তুলছে। তাহলেও বাস এগিয়ে চলেছে ক্রুদ্ধ গর্জনে, ভয়ঙ্করী প্রকৃতির সকল বাধাকে উপেক্ষা করে। আমরা এগিয়ে চলেছি 'নীল দুর্গমের' দিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নন্দপ্রয়াগ পৌঁছলাম। আমরা ঋষিকেশ থেকে ১২১ মাইল এসেছি। এসেছি মন্দাকিনী ও অলকানন্দার সঙ্গম, মহর্ষি কণ্বের ধ্যানে ধন্য, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার মিলনতীর্থ নন্দরাজার নন্দপ্রয়াগে। কিন্তু এখন পৌরাণিক কাহিনীর প্রতি কোন কৌতূহল নেই, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতিও কোন আকর্ষণ নেই। চোখে ঘুম, পেটে খিদে, মনে ভয়। শুধু পথ ভয়াবহ বলে নয়, নতুন একটি ভয় ঢুকেছে মনে। দুশ টাকা জরিমানার ভয়। ড্রাইভারের নিষেধ না শুনে, গেটের নিয়ম না মেনে, এগারোটার জায়গায় সাড়ে নটার সময় বাস নিয়ে এসেছি নন্দপ্রয়াগ। কাজটা যে ঠিক নয়, তা তখনও মনে ছিল। তবু ক্ষুৎপিপাসায় কাতর দেহের আবেদনে মন মানা শোনে নি। দূর থেকে নন্দপ্রয়াগকে দেখে উল্লসিতও হয়েছিলাম। নন্দপ্রয়াগে জল পাব, চা পাব, খাবার পাব। কিন্তু যতই এগিয়েছি, ততই সেই উল্লাসে ভাঁটা পড়েছে. দু-শ' টাকা জরিমানার ভয় আমাদের সবার মনকে ভারী করে তুলেছে।

বাস থামল, ইঞ্জিনের শব্দ বন্ধ হল। আমরাও শব্দহীন। এত আশার নন্দপ্রয়াগে এসেও কেউ বাস থেকে নামছে না। শুধু শৈলেশদা একা গজগজ করছেন, "যত সব গোঁয়ারের পাল্লায় পড়া গেছে। এক ঘণ্টার জন্যে দু-শ' টাকা।" তিনি টাকা গুনছেন। জরিমানার টাকাটা পকেটে পুরে আবার বল্লেন, "ওঠ আর বসে থেকে কি হবে? গোঁয়ার্তুমির খেসারত দিয়ে, কিছু গিলে, রওনা হওয়া যাক।"

একজন পুলিশ একটু দূরে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে। তাকিয়ে তাকিয়ে আমাদের দেখছে। কি দেখছ? তোমার টাকা রেডি।

ড্রাইভারের জিম্মায় গাড়িতে সব মালপত্র রেখে, খালি হাতে একটা চায়ের দোকানের দিকে এগিয়ে চলি। শৈলেশদা চলেছেন সবার আগে। তবে খালি হাতে নয়। সেই সাদা থলিটি তাঁর হাতে রয়েছে বৈকি। শৈলেশদা আছেন অথচ তাঁর থলিটি নেই, এ অবস্থা কল্পনাতীত।

পিনাকী চা ও ভাজির ফরমাশ দিল। দোকানদারটি বেশ চটপটে। বুঝতে পেরেছে, আমাদের আর তর সইছে না। সহসা শৈলেশদা বলেন, "পুলিশের টাকাটা নাও।"

'শৈলেশদা ঠিকই দেখেছেন। দেখবেনই তো। তাঁর যে আগাগোড়া নজর ছিল ঐ দিকে। পুলিশ আসছে। তার মাথায় খাকি পাগড়ি, পরনে খাকি হাফ প্যান্ট ও হাফ শার্ট, হাতে বেটন। সে আসছে অস্থির পদক্ষেপে। আসছে আমাদের কাছে। চোখে স্থির দৃষ্টি, মুখে অমায়িক হাসি। সে এল। এসেই জিজ্ঞেস করল, "আপ সব কলকাত্তাকে পাহাড় চহড়নেওয়ালে হ্যায়?"

"জী হাঁ।" সসম্ভ্রমে শৈলেশদা উত্তর দেন। সঙ্গে সঙ্গে সে স্যালুট করে শৈলেশদাকে। কি ব্যাপার? কোথায় তিনি ওকে সেলাম ঠুকবেন। আর ওই কিনা...? আমরাও হাত তুলে নমস্কার করি।

সে দোকানদারকে ধমক লাগায়, "এ রামুয়া আচ্ছা করকে চায় বানাও। জায়দা পয়সা মাত্ লেও।" তারপর সুর নামিয়ে আমাদের বলে, "আপকো ড্রাইভারকো হাম বোলা, গাড়ি লাইনকা পহেলে লাগানে। সবসে পহেলে আপকো গাড়ি ছোড়েঙ্গে। ফিরভি আপকো কুছ তকলিফ হোগী—দেড়ঘণ্টা ঠহরনে পড়েগা।"

উপক্রমনিকা তো ভালই হল। এবার আসল কথাটি বলে ফেল তো বাছাধন!

আমাদের নির্বাক দেখে একগাল হেসে সে আবার শুরু করে, "আপলোক বহুত জলদি চলা আয়া...।"

এইরে এইবারে বোধহয়...না, আবার স্যালুট ঠোকে সে। হেলে দুলে ফিরে চলে গেটের দিকে। আমরা 'পাহাড় চহড়নে ওয়ালারা' অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকি সেই সরকারি প্রতিনিধির পদক্ষেপের দিকে। দুষ্মন্তও বোধ হয় শকুন্তলার লাজ-নম্র পদসঞ্চারের পানে এমন করে তাকিয়ে থাকেন নি কোনদিন।

বাস চলছে বটে। তবে রাস্তার কথা না বলাই ভাল। এখনও বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। এখানে বৃষ্টি হচ্ছে কয়েকদিন ধরেই। সমস্ত নদীতে বান ডেকেছে। অলকানন্দার প্রবল স্রোতে অনেক গরু ভেড়া ও ঘোড়ার মৃতদেহ ভেসে যাচ্ছে। এখানেই এই, ওপরে না জানি কি। যাই হোক, আমরা থামব না। আমরা এগিয়ে যাব।

আজ কতটা যেতে পারব কে জানে। প্রতিদিনই আমাদের যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত হচ্ছে। প্রথম আটত্রিশ ঘণ্টায় রেলে ন শ উনত্রিশ মাইল এসেছি—কলকাতা থেকে ঋষিকেশ। পরশু ছ ঘণ্টায় ছেষট্টি মাইল—ঋষিকেশ থেকে শ্রীনগর। কাল সারাদিন ধরে বাস এগিয়েছে মাত্র সাঁইত্রিশ মাইল। আজ যদি পিপলকোটি পৌঁছতে পারি, তাহলেই নিজেদের ভাগ্যবান মনে করব। পিপলকোঠি হরকোটি থেকে মোটে চব্বিশ মাইল।

অর্থ সংগ্রহের জন্য এমনিই আমাদের রওনা হতে দেরি হয়ে গেছে। আরও দেরি হচ্ছে। সামনে শীত। তার চেয়েও বড় কথা বাজেটের বেশি খরচ হয়ে যাচ্ছে। শুনছি পিপলকোঠির পরে আর বাস যেতে পারবে না। না পারলে পিপলকোঠি থেকে জোশীমঠ, এই উনিশ মাইল পথ, হেঁটে যেতে হবে। কুলিভাড়া, খাওয়া ও অন্যান্য খরচ বাবদ দুদিনে অন্তত দেড় হাজার টাকা বাড়তি খরচ হবে।

রাস্তা ক্রমেই ভয়ঙ্কর হচ্ছে। ডাইনে পাহাড়, বাঁয়ে খাদ—খাদের নিচে অলকানন্দা। বৃষ্টি পড়ছে। পাহাড়ের গা বেয়ে বৃষ্টির জল রাস্তায় পড়ছে। রাস্তার জল গড়িয়ে গড়িয়ে খাদে পড়ছে। জলে কাদায় পিচ্ছিল পথ। অজস্র ধস নেমেছে পাহাড় থেকে। ধসের জন্যে মাঝে মাঝে থামতে হচ্ছে। পি. ডাবলু. ডি.-র লোক রাস্তা সাফ করছে। তারা বলল—এ গাঁয়ের নাম মাথিয়ানা। আজ সকালেই লোহা লক্কড় বোঝাই একটা মিলিটারি ট্রাক এখানে কাদায় বসে গিয়েছিল।

রাস্তার পাশে বহু জায়গা ধসে গেছে। রাস্তা এত সংকীর্ণ যে বাসের চাকার পাশে বড় জোর দু তিন ইঞ্চি জায়গা অবশিষ্ট থাকছে। কোন প্রকারে একটি চাকাও যদি তিন চার ইঞ্চি ওপাশে চলে যায়...? থাক, তার চেয়ে আশা করা যাক—এই বৃষ্টি এখনই থামবে। আমরা বাসে বসেই জোশীমঠ পৌঁছতে পারব।

এই নতুন বাসের নতুন ড্রাইভারের নাম রামদাস। আগে ছিল ভগৎরাম। এখন রামের দাসানুদাস হনুমান। যোগ্য প্রতিনিধি। এই পথেও বেশ জোরে বাস চালিয়েছে। তার চোখ দুটি সব সময়েই রাস্তার দিকে, হাত এবং পা যে যার যথাযথ কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে। কিন্তু মুখখানিকে সে কখনই রেহাই দিচ্ছে না। এতক্ষণ নানা প্রশ্ন করে আমাদের বকিয়েছে। এখন বোধহয় ওর সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গিয়ে নিজেই বকতে

শুরু করেছে—"গতবার ঠিক ওই জায়গায় একটা যাত্রী বোঝাই বাস অলকানন্দায় পড়ে গিয়েছিল।"

আঁতকে উঠি। ভয়ে ভয়ে জায়গাটা দেখে নিই। ওপারে বালাসুতি নদী এসে অলকানন্দায় মিশেছে। জিজ্ঞেস করি, "যাত্রীরা?"

"একজন ছাড়া সবাই নিখোঁজ।" নির্বিকার চিত্তে রামদাস জবাব দেয়।

"কে সেই একজন?" আমাদের বাসটা এখন ঠিক সেই জায়গায়।

"আশ্চর্য ভাবে বেঁচে গেছে। পড়ে যাবার সময় সে কেমন করে যেন বাসের জানলা গলে বেরিয়ে এসেছিল। আর পড়তে পড়তে তার শাড়ি বেঁধে যায় এই গাছটার একটা ডালে। শাড়ি ধরে মেয়েটি ঝুলে ছিল অনেকক্ষণ। পি. ডাবুল. ডি.-র লোক এসে তাকে উদ্ধার করে।"

বাসের চাকা পিছলে যাচ্ছে। একেবারে পাহাড় ঘেঁষে বাস চলছে। হঠাৎ গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দিল রামদাস। বকাটে রামদাস গম্ভীর হল। আমরাও শব্দহীন। ডাক্তার পকেট থেকে গীতা বের করল। কিন্তু গীতা পাঠের শব্দ শুনতে পাচ্ছি না। হয়তো নিঃশব্দে ভগবানকে ডাকছে। ঝুপ করে একটা শব্দ হল। চমকে পেছনে তাকাই। রাস্তার অনেকটা অংশ সম্পূর্ণ ধসে গিয়ে অলকানন্দায় পড়ছে। মিনিটখানেক আগেই আমাদের বাস ঐখানে ছিল। ধসটা এক মিনিট আগে নামলে, কিংবা বাসটা আর এক মিনিট পরে আসলে, আমরাও ভবিষ্যৎ যাত্রীদের কাছে কাহিনীর বিষয় হয়ে থাকতাম।

গতবারে একজন বেঁচেছিল কিন্তু এবারে? আমাদের যে কারুরই পরনে শাড়ি নেই।

মনে মনে যে যাই ভাবি, কেউ কোন কথা বলছি না। সবাই তাকিয়ে আছি পথের দিকে—অতি পরিচিত পথ। কিন্তু এ পথের এমন রূপ তো আর দেখি নি। আগে কেদারনাথের চেয়ে বদ্রীনাথের পথ সুগম ছিল। কিন্তু দিন দিন এ পথ দুর্গমতর হচ্ছে। অথচ এ পথের মূল্য দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই পথ এখন আর শুধু বদ্রীনাথের পথ নয়, জেলা সদর চামেলীর পথ। হোতি নীতি বরহোতি ও মানা গিরিদ্বারের পথ।—সীমান্তের সড়ক।

"ঐ দেখুন ওপারে গোপেশ্বরের পথ।" রামদাস আবার মুখর হয়ে উঠেছে।

থমথমে আবহাওয়াটা খানিকটা কেটে গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। নড়েচড়ে বসি। বলি, "তা হলে তো চামোলী এসে গেল।"

"হ্যাঁ, চামোলীতে কিছু খেয়ে নিতে হবে।" যাক দেবীদাস এতক্ষণে নর্ম্যাল হয়েছে।

"গোপেশ্বর কোথায়?" পকেট-গীতা পকেটস্থ করে ডাক্তার জিজ্ঞেস করে।

"এখানে।" অমূল্য নিজেকে দেখিয়ে দেয়।

হেসে পিনাকী বলে, "কেদারনাথ থেকে উখীমঠ হয়ে চামোলীর হাঁটাপথে একটা বড় গ্রাম।"

জগৎ পরিবর্তনশীল। এই চামোলী বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়েও তা বুঝতে পারছি। চারিদিকে তাকাচ্ছি আর অবাক হচ্ছি। নিচে অলকানন্দা তীরের সেই সংকীর্ণ চাষের জমি উধাও হয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য সরকারী কোয়ার্টার। বাসস্ট্যান্ডে বড় বড় দোকান, পাহাড়ের ওপর বড় বড় অফিস। ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরা পথচারী। কেউ

কেউ আমাদের বাসের ফেস্টুন পড়ছেন। আমাদের দেখছেন। এমন সময় "এই যে এসে গেলে তা হলে।"

কে? চারিদিকে তাকাই।

"আরে আমি...।" দাড়ি-গোঁফ-মণ্ডিত, স্বাস্থ্যবান একজন ভদ্রলোক এগিয়ে আসছেন। গায়ে ওভারকোট, গলায় হাতে-বোনা মাফলার, মাথায় ফেল্টের টুপি, চোখে কালো চশমা, পায়ে বাটার হান্টার, কাঁধে ক্যামেরা ও ওয়াটার বট্‌ল্, হাতে লাঠি? একেবারে সেন্টপার্সেন্ট টুরিস্ট। চেনা চেনা মনে হলেও ঠিক চিনতে পারছি না।

"কিহে! এরই মধ্যে অধমকে ভুলে মেরে দিলে? আমি চৌধুরী।"

"চৌধুরীদা!" আমরা চিৎকার করে উঠি। কি আনন্দ, আমাদের হিমালয় পাগল চৌধুরীদা। বড় ঘরের ছেলে, বড়লোকের জামাই, বড় চাকুরে চৌধুরীদা।

"ভালই হল। আজই 'ইনার লাইন' পারমিট পেয়ে গেছি। চলো একসঙ্গেই যাওয়া যাক।" বলেই তিনি কাকে যেন ইশারা করলেন। একজন কুলি তাঁর মালপত্র নিয়ে এল। সেগুলো বাসের ওপরে তোলা হল। আর এই ফাঁকে দেবীদাস ছুটে গিয়ে দু ঠোঙা ভাজি নিয়ে এল।

বাস ছাড়ল। চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করি, "পারমিট নিলেন কেন? কোথায় যাচ্ছেন?"

"লোকপাল-হেমকুণ্ড ও নন্দনকানন।"

"হুররে!" আমরা সমবেত কণ্ঠে বলে উঠি, "আপনি তাহলে অনেকদিন আমাদের সঙ্গে থাকবেন।"

বাস চলেছে। দেবীদাসের ভাজি বিতরণ সমাপ্ত হয়েছে। আমরা ভাজি সহযোগে চৌধুরীদার গল্প শুনছি। হঠাৎ তিনি গল্প থামিয়ে গর্জে উঠলেন, "এই রোক্‌কে।' কি ব্যাপার? আরে তাই তো। এ যে প্রাণেশ আর টোপগে। ক্ষীর্ণকায় প্রাণেশ ও স্বাস্থ্যবান টোপগে। আমাদের কনিষ্ঠতম সভ্য প্রাণেশ চক্রবর্তী ও নীলগিরি পর্বত সম্পর্কে অভিজ্ঞতম শেবপা টোপগে। ভাগ্যিস চৌধুরীদা দেখেছিলেন। কিন্তু ওরা এখানে এল কেমন করে? ওদের তো পিপলকোঠিতে থাকার কথা। যাই হোক ওদের তুলে নিয়ে আবার বাস ছাড়া হল। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ওরা। চলন্ত বাসের মধ্যে কোলাকুলি চলল। তারপর প্রাণেশ জানাল, "কি চিন্তায় পড়েছিলাম আপনাদের জন্য। পিপলকোঠিতে নিচের কোন খবর নেই।"

"বীরেন কোথায়?" অমূল্য জিজ্ঞেস করে।

"বীরেনদা কুলির বন্দোবস্ত করতে জোশীমঠ চলে গেছেন। পিপলকোঠিতে কুলি পাওয়া যায় নি। আমরা বসে থেকে থেকে অধৈর্য হয়ে হেঁটেই চামোলী রওনা হয়েছিলাম। যাক জলে কাদায় ছ মাইল হাঁটা সার্থক হল। আপনারা এসে গেছেন।

॥ ৭ ॥

"ম্যায় শের সিং সাব্‌।" বাস থেকে নামতেই সে আমাদের স্যালুট ঠোকে। বুটের শব্দে অপ্রস্তুত হই। লোকটি বেশ কেতাদুরস্ত বলতে হবে। গায়ে টুইডের গলাবন্ধ কোট, পরনে একই কাপড়ের সরু পায়জামা—একেবারে দিশী সুট। দেখে মনে হচ্ছে বয়স ষাটের

কাছাকাছি। কিন্তু বয়সের ভারে একটুও নুয়ে পড়ে নি। লম্বায় ছ ফুটের চেয়ে কিছু বেশি তবে রোগাই বলা চলে। এমন উজ্জ্বল চোখ সচরাচর বড় দেখা যায় না।

কিন্তু শের সিং..। নামটা খুব পরিচিত মনে হচ্ছে। ও...মনে পড়েছে। নন্দাঘুণ্টি অভিযানের মেট—অর্থাৎ কুলিদের সর্দার। এই কি সেই লোক? সে যে শুনেছি,...আবার সেই শের সিং? কিন্তু উপায় কি? বীরেন যে ওকেই জোশীমঠ থেকে পাঠিয়েছে।

এইমাত্র আমাদের বাস কোনমতে পিপলকোঠি এসে পৌঁছল। এখন বেলা ঠিক বারোটা? যে ভাবেই হোক, যে কদিনেই হোক, পিপলকোঠি পর্যন্ত বাসে আসতে পেরেছি। তবে খবর পেলাম, বাস আর ওপরে যাবে না। আমাদের হেঁটেই জোশীমঠ যেতে হবে। যেতে হয় যাব। এ পর্যন্ত তো আসতে পেরেছি। এই বা কম কিসের! বীরেন প্রাণেশ ও টোপগে পাঁচদিন আগে এখানে এসেছে। তখন থেকেই জোশীমঠের বাস বন্ধ। বহু চেষ্টা করেও ওরা এখানে কুলি যোগাড় করতে পারে নি। এ অঞ্চলের অধিকাংশ কুলিই এখন রাস্তা তৈরির কাজে লেগেছে। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে সেনাবাহিনী মোটরপথ প্রসারিত করছেন। সে কাজে মজুরী কিছু কম হলেও পরিশ্রম কম। কেন ওরা মাল ঘাড়ে করে আমাদের সঙ্গে বরফ আর ধসের ওপর ছুটে বেড়াবে। তাছাড়া কয়েকদিন আগে বাহাত্তর জনের এক শিখ তীর্থযাত্রীদল লোকপাল-হেমকুণ্ড দর্শন মানসে এখানে এসেছিলেন। তাঁরা বেশি মজুরী দিয়ে অবশিষ্ট সব কুলিদের সঙ্গে নিয়ে গেছেন। বীরেন বাধ্য হয়ে প্রাণেশ ও টোপগেকে এখানে রেখে জোশীমঠ গিয়ে এই শের সিংকে পাঠিয়েছে। কিন্তু শের সিং যদি সেইরকম করে? সে তখন দেখা যাবে। এখন যখন সেই আমাদের একমাত্র সহায়, তখন পরম সমাদরে তাকে বরণ করতে হবে। বলি, "তোমার কথা আমি শুনেছি নন্দাঘুণ্টি অভিযাত্রীদের কাছে।"

শের সিং বিগলিত হয়, "আমাকে বাদ দিয়ে এ অঞ্চলে কি পর্বতাভিযান হয়, না হয়েছে? তবে জমিজমা সামলাতে কয়েকবার আর যাওয়া হয়ে ওঠে নি। আপনারা আর কি শুনেছেন? শুনেছেন, যারা টিলমন্ সাবের সঙ্গে কথা বলেছেন।"

"তা তো বটেই।" অমায়িক হাসি হাসতে হয়।

"সরকারসাব মানা থেকে লোক আনবার চেষ্টা করেছিলেন, পারেন নি। সুরানা-সাব গোবিন্দঘাটের জশবীর সিংকেও চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু এত লোক সে পাবে কোথায়?"

"আমি যে জোশীমঠের ঈশ্বর সিংকে চিঠি দিয়েছিলাম?"

আবার শের সিং-এর চোখ দুটি নেচে ওঠে, "আমি তারই মেট। ম্যায় শের সিং সাব।"

"যাক ভালই হল। তোমার মতো একজন বিচক্ষণ, কর্মঠ ও অভিজ্ঞ লোককে আমরা পেলাম।"

"কী যে বলেন সাব্। টিলমন্ সাব্ বলতেন—শের সিং, পর্বতাভিযানে নসীবই হল আসল।"

"তা তুমি লোকজন সব নিয়ে এসেছ তো?"

"কোন ফিকির করবেন না। চব্বিশটা খচ্চর নিয়ে এসেছি। দশজন কুলি যোগাড় করেছি। কাল সকালেই রওনা হব। আপনারা মাল ভাগ করে ফেলুন।"

"মাল ভাগ?'

"হ্যাঁ সব মাল খুলে নতুন করে প্যাকিং করতে হবে। চব্বিশটা আড়াইমণ ও দশটা একমণ বোঝা করে ফেলুন। ফালতু জিনিস আলাদা করে রাখবেন। আমি এখানেই একটা দোকানে রেখে দেব।"

"তার পরেও যে প্রায় চার/পাঁচ মণ মাল থাকবে, তা বইবে কারা?"

"আপনারা। বাকি মাল রুক্‌স্যাকে ভরে আপনাদের বইতে হবে...। আচ্ছা আমি তাহলে চলি। খাওয়া দাওয়ার পর আবার আসব।"

শের সিং অদৃশ্য হল। ভাবি কে কুলির সর্দার? আমি না শের সিং?

খচ্চরগুলো আশে পাশেই বাঁধা হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। প্রয়োজনীয় কুলি না পেয়ে শের সিং খচ্চরের বন্দোবস্ত করেছে। ভালই করেছে। একটি এদেশীয় খচ্চর সাধারণত আড়াই জন মানুষের বোঝা পিঠে নিয়ে অক্লেশে চড়াই উৎরাই পেরুতে পারে। পাহাড়ে ওরা মানুষের পরম বন্ধু। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে খচ্চরই ছিল ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর প্রধান সহায়। এই ভারবাহী পশুর দল আর্মি ট্রান্সপোর্ট কার্ট থেকে শুরু করে বন্দুক মেশিনগান গোলাবারুদ রসদ পোশাক-পরিচ্ছদ, এমন কি আহত সৈনিকদের দুর্গম পথ পেরিয়ে বহুদূর পর্যন্ত বহন করেছে। কোন কোন খচ্চর শত্রুর গোলাগুলিকে উপেক্ষা করে যেভাবে কর্তব্যপালন করেছে, তাতে মানুষ হলে তারা অনায়াসে ভিক্টোরিয়া ক্রশ পেত।

শুধু কষ্টসহিষ্ণু ভারবাহী বলে নয়, খচ্চর বুদ্ধিমানও বটে। অনেক সময় দেখা গেছে তার রক্ষকের চেয়ে খচ্চরের বুদ্ধি বেশি। টমি অ্যাটকিন্‌স্ নামে একজন বৃটিশ পদাতিক তার খচ্চরের পিঠে ভারী দু বাক্স গোলাবারুদ চাপিয়ে নিশ্চিন্ত মনে শত্রুব্যূহের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। খচ্চর প্রথমে মৃদু আপত্তি জানাল। তারপর দুজনে কিছুক্ষণ ধরে টানাটানি চলল। অবশেষে খচ্চরেরই জয় হল। এক ঝটকায় টমির হাত থেকে মুক্ত হয়ে সে বিদ্যুৎবেগে নিজের শিবিরে ফিরে এল। কম্যাণ্ডিং অফিসার তাড়াতাড়ি তার পিঠ থেকে মূল্যবান বাক্স দুটি নামিয়ে তাকে নিয়ে এলেন নিজের তাঁবুর পাশে। ভাল করে খাইয়ে তাকে সসম্মানে সেখানেই বেঁধে, দিবানিদ্রার চেষ্টায় তাঁবুতে প্রবেশ করলেন। গর্বিত খচ্চর বোধ হয় আরও জোরালো অভিনন্দন আশা করেছিল। তাই সে এমন চিৎকার শুরু করল যে কম্যাণ্ডিং অফিসারের দিবানিদ্রার দফারফা। দু দিন বাদে ক্লান্ত অবসন্ন শ্রীমান টমি অতিকষ্টে শত্রুপক্ষের দৃষ্টি এড়িয়ে শিবিরে ফিরে এল। এসেই জানাল—তার খচ্চরটি হারিয়ে গেছে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, খচ্চরও মানুষের মতো অক্সিজেনের অভাব সইতে পারে। পথ তৈরি করে দিতে পারলে খচ্চর অনায়াসে পিঠ-বোঝাই মাল নিয়ে এভারেস্ট জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করতে পারে। একশ ফুট ওপর থেকে পড়লে নিদেনপক্ষে মানুষের হাত পা ভাঙে। কিন্তু তিনশ ফুট ওপর থেকে পড়েও খচ্চর অক্ষত রয়েছে। তবে সব নিয়মেরই বোধকরি ব্যতিক্রম আছে। একবার একটি খচ্চর ক্রুদ্ধ হয়ে একজন সেপাইয়ের মাথায় পদাঘাত করে। চিকিৎসক পরীক্ষা করে বলেন, সেপাইটির কিছুই হয় নি। কিন্তু পশুচিকিৎসক বল্লেন, খচ্চরটি খোঁড়া হয়ে গেছে।

খচ্চরের আরেকটি প্রধান গুণ হল নিয়মানুবর্তিতা। ওরা সব সময় মাল পিঠে নিয়ে সারি বেঁধে একই গতিতে পাহাড়ের গা ঘেঁষে এগিয়ে চলে। চালক বাঁশি বাজাবার সঙ্গে

সঙ্গে সে যেখানে থাকে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে।

সীমান্ত রক্ষা ও সীমান্ত এলাকার উন্নয়নের জন্য খচ্চর তাই অপরিহার্য। কিন্তু ভাল জাতের খচ্চর যে সব অঞ্চল থেকে আসত, তা এখন ভারতের বাইরে। ফলে আমাদের বিদেশ থেকে খচ্চর আমদানী করে একটা মোটা অঙ্কের বিদেশী মুদ্রা ব্যয় করতে হচ্ছে। এতদিন পর্যন্ত আমরা একটি ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলাম। কিছুদিন হল ভারত সরকার সাইপ্রাস থেকেও খচ্চর আমদানীর ব্যবস্থা করেছেন।

উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের মতে দু জাতীয় গাছের সংমিশ্রণে ভাল জাতের গাছ জন্মায়। কিন্তু প্রাণীবিজ্ঞানীদের মতে দু জাতীয় প্রাণীর সংমিশ্রণে যে প্রাণীর জন্ম হয় সে তার পিতামাতার কেবল দোষগুলিই পায়। এই নিয়মটি কিন্তু খচ্চরের বেলায় খাটে না। ঘোড়া ও গাধার সংমিশ্রণে হয় খচ্চর। সে ঘোড়ার কাছ থেকে পায় বুদ্ধি আর গাধার কাছ থেকে পায় কষ্টসহিষ্ণুতা। উপরন্তু সে হয় অত্যন্ত সাবধানী। ঘোড়া বা গাধার মত তার পা ফস্‌কায় না।

অনেক স্ত্রী খচ্চরই প্রজনন-ক্ষমতাহীন। একমাত্র ভাল ঘোড়া ও গাধার সংমিশ্রণেই বড় ও ভাল জাতের খচ্চর জন্মলাভ করে। বছরে একবার এদের একটি করে বাচ্চা হয়। আর চার বছর বয়স না হলে কোন খচ্চর মানুষের কাজে আসে না। অর্থাৎ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ছাড়া খচ্চরের অভাব পূরণ করা সম্ভব নয়।

পিপলকোঠি অনেক বড় হয়ে গেছে, অনেক বদলে গেছে। বড় বড় বাড়িঘর, বড় বড় দোকানপাট। টেম্পল্ কমিটির রেস্ট হাউস এবং পি. ডাব্‌লু. ডি.-র ইন্সপেকশান বাংলো—কত কি। এসব কিছুই ছিল না কয়েক বছর আগে। তখন পিপলকোঠি ছিল বদ্রীনাথ বাস পথের টার্মিনাস। তারপরে টার্মিনাস হয়েছিল বেলাকুচী, এখন জোশীমঠ। আমাদের মন্দভাগ্য, এখান থেকেই হাঁটা শুরু করতে হবে।

বাস এগিয়ে যাওয়ায় কিন্তু পিপলকোঠির কোন ক্ষতি হয় নি। বরং ভালই হয়েছে—বাস পথ গাড়োয়ালের সমৃদ্ধি এনেছে। বছরে প্রায় সোয়া লক্ষ যাত্রী কেদার-বদ্রী ও পঁচাত্তর হাজার যাত্রী গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী দর্শনে আসেন। কম করেও দু কোটি টাকা তাঁরা গাড়োয়ালে খরচ করে যান। বাস যতই এগিয়ে যাবে, যাত্রীসংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাবে। গাড়োয়াল সমৃদ্ধতর হবে।

এখন পিপলকোঠি বাস স্টেশনের ওয়েটিং হল আরও বেশি জমজমাট। তবে অধিকাংশ যাত্রীই ঘরমুখো। স্বভাবতই পথের কথা শুনে তারা উদ্বিগ্ন। উদ্বেগ জিনিসটা আবার সংক্রামক। তাই বলে আমাদের যেন এই সংক্রামক ব্যাধিতে না পেয়ে বসে। আমাদের ঘরে ফেরার অনেক দেরি।

বাস থেকে মালপত্র নামিয়ে আমরা ওয়েটিং হলে জড়ো করলাম। পিনাকী ছুটল খাবারের অর্ডার দিতে। চৌধুরীদা আগেই চিঠি লিখে ইন্সপেকশান বাংলোয় ঘর ঠিক করেছেন। তিনি তাঁর ঘরে চলে গেলেন। ঘর ছাড়লেই কি ঘরের মায়া ছাড়া যায়?

খাওয়া শেষ হতে বেলা তিনটে বেজে গেল। বেশ ভালই খাওয়া হল। শ্রীনগর ছাড়ার পরে আর এরকম খাওয়া জোটে নি। স্বভাবতই খাওয়ার পর শরীরে অবসাদ

জড়িয়ে এল। কিন্তু শুয়ে পড়লেন শুধু শৈলেশদা। শেরপাদের সাহায্যে নরম দেখে কয়েকটা কিটব্যাগ মাটিতে সাজিয়ে, তাঁর সাদা থলিটিতে মাথা ঠেকিয়ে শুয়ে পড়েছেন তিনি। টাকার বালিশ মাথায় দিয়ে ঘুমোচ্ছেন আমাদের ক্যাশিয়ার।

ভানু চঞ্চল পিনাকী ও প্রাণেশ, শেরপাদের সঙ্গে নিয়ে সাজসরঞ্জামের কয়েকটা কিট খুলে বসল। পর্বতাভিযানে প্যাকিংয়ের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। প্রথমত বোঝাগুলো মোটামুটি সমান ওজনের হওয়া দবকার। উচ্চতা যতই বাড়বে, বোঝাও তত হালকা হবে। দ্বিতীয়ত প্রতিটি বোঝার মধ্যে সব রকম জিনিস থাকা দরকার, যাতে যে কোন একটি খুললে খাবার থেকে ওষুধ পর্যন্ত সবই কিছু কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু এখন সে রকম প্যাকিং করার সময় নেই। জোশীমঠ ও বেসক্যাম্পে আবার নতুন করে প্যাকিং করতে হবে। এখন শুধু শের সিংয়েব নির্দেশ অনুযায়ী আড়াইমণের চব্বিশটা ও এক মণের দশটা বোঝা তৈরি করে ফেলতে হবে। নিতান্ত প্রয়োজনীয় কিছু সাজসরঞ্জাম আমাদের রুকস্যাকে বোঝাই করে ফেলব। আইস-এক্স মোজা সোয়েটার স্লিপিং-ব্যাগ ওয়াটার-বটল ক্যামেরা থালা চামচ ও মগ প্রভৃতি বের করে সবাইকে ভাগ করে দিতে হবে।

অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। এমনিই ওবা দশ জন হয়ে গেছে। এর ওপরে আবার আমরা যদি ওদের সাহায্য কবতে যাই, তাহলে কাজের চেয়ে অকাজ হবে বেশি। তার চেয়ে বরং থালা মগ ও চামচগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক। ওগুলোতে নাম লেখাতে হবে। যাতে বদল না হয়ে যায়। সবগুলোই দেখতে একরকম কি না! বেবিয়ে পড়লাম পথে।

নাম লিখতে যা সময় গেছে, তার দ্বিগুণ সময় আমরা ঘুরে কাটিয়েছি। ভালই লেগেছে। ভাগ্যিস আজ আর বৃষ্টি নামে নি। রোদের উত্তাপও বেশি নেই। মেঘলা আকাশ, ভেজা মাটি আর সবুজ পাহাড়। পুণ্যলোভী তীর্থযাত্রী আর রিক্ত গাড়োয়ালী। ওরাও তীর্থদর্শন করে কিন্তু দর্শনী দিতে পারে না। তাই বোধ হয় তীর্থের ফলও লাভ করতে পারে না। ভগবানের কাছে যারা রয়েছে, তারাই ভগবানের প্রসাদ পাচ্ছে না।

বেলা গড়িয়ে এসেছে। সোনালি সূর্যের আলো পড়েছে কাছে ও দূরের পর্বতশৃঙ্গের শিরে শিরে। ফিরে এলাম বাস স্টেশনে। এসেই আক্কেল গুড়ুম। পিনাকী মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে।

"কি ব্যাপার?"

"আর বলো কেন? লোকটার পাত্তা নেই।"

"কোন্ লোক?" বুঝতে পারি না।

"আরে তোমার সেই শের সিং। বলে গেছে চারটের সময় আসবে। সাতটা বাজতে চলল। মালপত্র সব রিপ্যাকিং হয়ে গেল। এদিকে তারই দেখা নেই। এত মাল এখন কোথায় রাখি? কি করি?"

তাই বলে তো হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। ঠিক হল এই অবেলায় আর টানা হেঁচড়া না করে মালপত্র সব এখানেই রাখা হবে। শেরপাদের সঙ্গে পিনাকী ও চঞ্চল এখানে থাকবে। তারা পালা করে রাত জেগে মালপত্র পাহারা দেবে। বাকি সকলে যাবে ইন্সপেকশান বাংলোয়। সেখানে প্রাণেশ একখানি ঘর নিয়েছে। সেই ঘরেই আমাদের রাতের শয্যা—শয্যাহীন শয্যা। এবারে আমরা বিছানাপত্র আনি নি। এমন কি

তীর্থ পথের প্রধান সম্বল যে কম্বল, তা পর্যন্ত আনি নি। এ পথ তীর্থের পথ হলেও আমরা তীর্থযাত্রী নই। কম্বলের বদলে স্লিপিং-ব্যাগ সম্বল করে আমরা এবার বেরিয়েছি। কিন্তু স্লিপিং ব্যাগ ও এয়ার ম্যাট্রেসকে কি শয্যা বলা চলে?

রাতের খাওয়া সেরে আমরা চললাম ইন্সপেকশান বাংলোয়। চঞ্চল পিনাকী ও শেরপাদের জন্য কষ্ট হচ্ছে। কাল সারারাত ওদের কেটেছে বাসে। আজ কাটবে বাস স্টেশনে।

॥ ৮ ॥

নাঃ, অমূল্যর হাঁক ডাকে আর শুয়ে থাকা গেল না। স্লিপিং-ব্যাগ ছেড়ে উঠে বসলাম। অমূল্য কোন অন্যায় করে নি। সত্যি সকাল হয়ে গেছে। প্রাণেশ নিতাই ও নিরাপদ ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে নিয়েছে। বাকি সবাই প্রায় প্রস্তুত। আমিও হাত মুখ ধুয়ে নিলাম। এমন সময়, "এই যে পাহাড় চহড়নেওয়ালারা। আজ কতদূর চড়বে?" চৌধুরীদা চড়াও হলেন।

"বেলাকুচী পর্যন্ত।"

"কখন রওনা হবে?"

"কয়েকজন এক্ষুনি। তারা আগে ঘিয়ে বেলাকুচীতে আমাদের খাওয়ার বন্দোবস্ত করবে।"

"তারা কারা?"

"প্রাণেশ নিরাপদ ও নিতাই।"

"তাহলে ভাই দাড়িওয়ালা, তোমার এই নাবালক দাদাটিকেও সঙ্গে নাও।"

দাড়ি আমাদের সকলেরই বড় হয়ে গেছে এই পাঁচদিনে। কিন্তু আমাদের দাড়ির নেই কোন আভিজাত্য—নেহাতই পর্বতাভিযানের দাড়ি। দাড়িওয়ালা বলতে নিতাইকেই বোঝায়। ওর দাড়ি মেহনতের দাড়ি—বহু পরিশ্রমে লালিত বর্ধিত ও কর্তিত। অথচ দাড়িওয়ালা বললে সে বেশ একটু ক্ষুণ্ন হয়। তবে চৌধুরীদার দেখছি ভাগ্য ভাল। নিতাই মৃদু হেসে বলে, "বেশ তো চলুন না আমাদের সঙ্গে। আমরা তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাব।"

"মানে?" সদাহাস্যময় চৌধুরীদা যেন গম্ভীর হলেন।

"আপনি সঙ্গে থাকলে আমাদের সময়টা কাটবে ভাল। গল্প শুনতে শুনতে বেলাকুচী চলে যাব।"

"ওঃ। আমি বুঝি গপ্পবাজ।"

"আজ্ঞে না। গল্পকার।"

চৌধুরীদার গাম্ভীর্য মিলিয়ে গেল।

সাতটা বাজে। রুকস্যাক পিঠে নিয়ে ইন্সপেক্শান বাংলোর মায়া কাটিয়ে রওনা হলাম নিচে। আজও আকাশ বেশ পরিষ্কার। দোহাই বাবা বদ্রীনাথ! তোমার বরুণচন্দ্রকে একটু সংযত করো। আর যেন তিনি আমাদের কৃপা না করেন।

বাস স্টেশনে এসে চক্ষু স্থির। শেরপারা ঘোরাঘুরি করছে। ওয়েটিং হলের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত পায়চারি করছে। আর পিনাকী একটা কাঠের বাক্সের ওপর বসে সর্বহারার দৃষ্টিতে পথের দিকে তাকিয়ে আছে। শের সিং এখনও নিখোঁজ।

রহস্যময় লোকের পাল্লায় পড়া গেছে। কিন্তু উপায় কি? শের সিং ছাড়া যে গতি নেই আমাদের। ধৈর্য হারালে চলবে না। প্রতীক্ষা করতে হবে।

নিচের দিক থেকে প্রথম বাস এল। তেমন ভিড় নেই। কয়েকজন স্থানীয় লোক ও মাত্র জন দশেক যাত্রী এসেছে। আমরা বাস স্টেশনের কাছেই একটা হোটেলে চা ও খাবার খেয়ে শের সিংয়ের পথ চেয়ে বসে আছি। হোটেলের সামনেই একজন মুচি তার দোকান সাজিয়ে বসেছে। আমাদের শেরপারা ভিড় জমিয়েছে সেখানে। আর কিছুক্ষণ এ ভাবে চললে মুচি বেচারিকে বোধহয় বিদায় নিতে হবে এখান থেকে। হাতুড়ি নিয়েছে আং দাওয়া, সুই নিয়েছে আং টেম্বা, বাটালি নিয়েছে আং ছুতার। নিজেরাই নিজেদের আধমণি জুতোগুলো মেরামত করে নিচ্ছে। মুচি নির্বাক দর্শক। এমন জুতো আর এমন জুতোর মালিক—দুই-ই তার কাছে নতুন ঠেকছে। সে অবাক হয়ে নির্বাক হয়ে গেছে। তিনজনের মধ্যে আং ছুতারকেই বড় ওস্তাদ বলে মনে হচ্ছে। সে একেবারে মুচির আসনে বসে গিয়েছে। আমাদের ভাগ্য ভাল। যোগ্য ব্যক্তিকেই সঙ্গে নিয়ে এসেছি। জুতো সেলাই থেকে রান্না পর্যন্ত, সবই পারে। আং ছুতার আমাদের শেরপা-পাচক।

কতক্ষণ আর পাচকের মুচগিরি দেখব। দোকানীর পয়সা মিটিয়ে উঠে পড়ি। ফিরে চলি বাস স্টেশনে।

আরে! একি কাণ্ড! এ যে স্বয়ং ডাক্তার। লিকলিকে লম্বা ফর্সা দেহটির অতি সামান্য অংশ গামছায় আবৃত করে পিপলকোঠির রাজপথে পায়চারি-রত!

"কি ব্যাপার?"

"চেষ্টা করছি।" উদ্বিগ্ন ডাক্তার উত্তর দেয়।

"তোমাকে যেন সকালেও একবার..."

"তুমি দেখছি রবার্ট ব্রুস্‌কেও ছাড়িয়ে গেলে হে।" শৈলেশদার কথায় আমরা হেসে উঠি। কিন্তু স্বাস্থ্য-সজাগ ডাক্তার নির্বিকার। সময় নষ্ট না করে সে আবার পায়চারি শুরু করে।

আমরা ওয়েটিং হলে প্রবেশ করি। এমন সময় গরম প্যান্ট ও জ্যাকেট পরা একজন যাত্রী আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন। তাঁর মাথায় ফেল্টের টুপি, চোখে চশমা, হাতে লাঠি। বেশ চোখা চেহারা—বাঙালী বলেই মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম তাই। তিনি কাছে এসেই বিশুদ্ধ বাংলায় জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের মধ্যে চঞ্চল মিত্র কেউ আছেন?"

"আমি, কেন বলুন তো?" চঞ্চল উত্তর দেয়।

"নমস্কার। আমি ভট্টাচার্য, মানে বটানিক্যাল সার্ভে অভ ইন্ডিয়ার..."

"ডক্টর উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য। আসুন সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। এই হচ্ছে অমূল্য সেন—লিডার..."

যাক, ভদ্রলোক আমাদের সমবয়সী। দেখে বেশ মিশুকে বলেই মনে হচ্ছে। পিনাকী জিজ্ঞেস করে, "আপনার মালপত্রের ওজন কত হবে?"

"তা প্রায় মণ ছয়েক। দেড়মণের মতো তো ব্লটিং পেপারই আছে।"

"ব্লটিং পেপার!" পিনাকী বিস্মিত।

"স্পেসিস্‌ কালেক্‌শান বা প্রজাতি সংগ্রহের জন্য।"

"ও সেগুলো বুঝি ব্লটিং পেপার দিয়ে মুড়ে আনতে হয়?"

"ঠিক মুড়ে নয়। ফুল বা পাতা দুটো ব্লটিং পেপারের মধ্যে রেখে দুদিক থেকে চাপ দিতে হয়। ব্লটিং পেপার রসটা শুষে নেয়। প্রজাতি নষ্ট হয় না।"

"আপনার সহকারী দুজন কোথায়?" ভানু জিজ্ঞেস করে।

"ঐ যে আমার মালপত্রের ওপর বসে আছে।"

"আপনি তা হলে আগেই আমাদের ধরে ফেললেন?" জিজ্ঞেস করি।

"হঁ্যা। ভালই হল। ঋষিকেশে আপনাদের পেলাম না। তার পাঠালাম শ্রীনগরে। সেখানেও দেখা হল না। আপনার চিঠি পেলাম—জোশীমঠে দেখা হবে। মনটা একটু খারাপই হয়ে গিয়েছিল।"

শের সিংয়ের এখনও দেখা নেই। মানুষের ধৈর্যের একটা সীমা আছে। আমরা সেই সীমায় এসে পৌঁছেছি। এমন সময় অমূল্য চিৎকার করে ওঠে, "এসেছে।"

"কে? শের সিং?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায়?"

"ঐ যে।"

ঠিকই দেখেছে অমূল্য। সেই কোট ও পায়জামা, সেই রোগা লম্বা সোজা শরীর। মুখে তেমনি অমায়িক হাসি। ধীর পদক্ষেপে এই দিকে আসছে। একা নয়, সঙ্গে জন দশেক লোক। ওরাই আমাদের মালবাহক। ওদেরই জন্যে আমাদের এই দীর্ঘ প্রতীক্ষা। বাঁচা গেল। তবে এত দেরি করল কেন? থাক সে কথা আর জিজ্ঞেস করে দরকার নেই। নিজের থেকে বলে ভাল, নইলে কারণটা অজানাই থাক। দলবল সহ শের সিং ওয়েটিং হলে ঢোকে। সামনে এসেই স্যালুট ঠোকে। বিনয়ের অবতার। মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করে, "খবর ভাল? খচ্চরের পিঠে মাল সব বোঝাই হয়ে গেছে?"

"না সব হয় নি।" পিনাকী উত্তর দেয়।

"সে কী? খচ্চরওয়ালারা এতক্ষণ বসে করল কি?" বলেই সে হাঁক ডাক শুরু করে "হেই উধার কাহা? হাত চালাও। জল্‌দী করো।"

অনুচরবর্গ নিঃশব্দে খচ্চর বা নিজেদের পিঠে ইচ্ছেমত মাল বোঝাই করতে লাগল। আমরা নিঃশব্দে শের সিংকে দেখছি। কিন্তু উপেনবাবু আমাদের মতো নীরব নন। তিনি তাঁর ব্লটিং পেপার সম্বন্ধে বড় বেশি সচেতন। তাঁবু বিছানাপত্র পোশাক-পরিচ্ছদ খাবার-দাবার কে কোথায় কি ভাবে নিল, তা তিনি তাকিয়েও দেখলেন না। কিন্তু বেছে বেছে একটি তাগড়াই খচ্চরের পিঠে তাঁর ব্লটিং পেপার চাপাতে বললেন। শুধু খচ্চর নয়, খচ্চরের মালিকও বেশ শক্তপোক্ত। নাম অমর সিং। উপেনবাবুর নেক নজরে ধন্য হয়ে সে বুক ফুলিয়ে বলে, "একদম নয়া খরীদা সাব। দশ রোজভি নহি হুয়া। পুরা পানশ রুপিয়া লাগা।"

আধ ঘণ্টার মধ্যেই মাল বোঝাই শেষ হল। সূর্য এই ফাঁকে পিপলকোঠির

মাথায় এসে উপস্থিত হয়েছে—পাহাড়ের ছায়া, ওয়েটিং হল, ও আমাদের ছায়া, ছোট থেকে ছোট হয়ে প্রায় মিলিয়ে গেছে। 'বদ্রী বিশাল কী জয়' বলে সেই বাস চলাচলের অনুপযুক্ত জলসিক্ত কর্দমাক্ত বাসপথ ধরে আমরা রওনা হলাম। বদ্রীবিশালের চরণে নিজেদের সমর্পণ করতে নয়, নীল দুর্গমের সঙ্গে সংগ্রাম করতে। এ সংগ্রাম প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সংগ্রাম, দুর্গমের সঙ্গে দুর্বিনীতের সংগ্রাম, সভ্যতার শাশ্বত সংগ্রাম।

খচ্চরওয়ালারা চলেছে সবার আগে। ওদের পেছনে শেরপাদের সঙ্গে অমূল্য ভানু নিতাই নিরাপদ ও প্রাণেশ। শের সিংয়ের দেরি দেখে নিতাইদের আর আগে যাওয়া হয় নি। কিন্তু চৌধুরীদা রওনা হয়ে গেছেন অনেকক্ষণ। অমূল্যদের পেছনে চলেছে কুলির দল। চলেছে বলা ভুল। শের সিং ওদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দেরির জন্যে আমরা তাকে কিছুই বলি নি। না-বলাটাই বুঝি ওকে আঘাত দিয়েছে সবচেয়ে বেশি। লজ্জিত শের সিং তাই তার অনুচরবর্গকে ক্রমাগত স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, তাদের জন্যই এই বুড়ো বয়সে কলকাতার সাবদের কাছে তার নাম ইজ্জত সব গোল্লায় গেল। ব্যাটাদের সব পায়াভারী হয়েছে। থাকত সেই টিল্‌ম্যান সাবের যুগ, চাবুকের চোটে ঘর ছেড়ে মাল ঘাড়ে নিত। আর এখন কিনা তাকে খোশামোদ করে লোক জোগাড় করতে হচ্ছে। সারা সকাল বসে শের সিং যাদের খোশামোদ করেছে, তারা কিন্তু একেবারেই শব্দহীন। এমন কি নিজেদের মধ্যে পর্যন্ত কথা বলছে না। শের সিং সত্যিই শের।

খুব সাবধানে পথ চলতে হচ্ছে। আজ এখনও ধসের সম্মুখীন হতে হয় নি। শুনেছি পথে তিন জায়গায় বিরাট ও ভয়ঙ্কর ধস নেমেছে। রাস্তা মেরামত করতে নাকি কয়েক সপ্তাহ লাগবে। তাই বাস বন্ধ। ফলে আমাদের এই উনিশ মাইল বেশি হাঁটতে হচ্ছে।

মাথার ওপর পাহাড়ের গা থেকে ছাতার মতো পাথর ঝুলছে—ছেঁড়া ছাতা। টুপটাপ করে জল ঝরছে। পাহাড়ের জল ঐ সব পাথর বেয়ে আমাদের মাথায় পড়ছে। জল নয়, শান্তি জল। রৌদ্রদগ্ধ শ্রান্তদেহ ঐ জলে সিঞ্চিত হচ্ছে। অশান্ত চিত্ত শান্ত হচ্ছে।

অনেক দিনের অনভ্যাস। এ যাত্রায় এই আমাদের প্রথম পদযাত্রা। মাল কাঁধে এই প্রথম পাহাড়ী পথ চলা। মালের ওজনটাও উপেক্ষা করার মতো নয়—প্রায় পঁচিশ শের। এর আগে এরকম পথে কুলিরাই মাল বয়েছে। আমি ছড়ি হাতে হেলে দুলে পথ চলেছি। এ যাত্রার সঙ্গে সে যাত্রার পার্থক্য অনেক। এবারে গিরিতীর্থ দর্শনে যাচ্ছি না, যাচ্ছি নীল দুর্গমের স্বপ্ন-শিখর দর্শনে। এ যাত্রায় রুকস্যাক বইতেই হবে। যে নিজের মাল বইতে পারে না, তার পর্বতাভিযাত্রী হবার যোগ্যতা নেই। কাজেই যত কষ্টই হোক, সে কথা কাউকে বলা যাবে না। তাই মাঝে মাঝে পাহাড়ের গায়ে রুকস্যাক ঠেকিয়ে নিঃশব্দে জিরিয়ে নিচ্ছি। ফলে ক্রমেই পেছিয়ে পড়ছি। এ অবস্থা শুধু আমার নয়, তবে সকলেরও নয়। অমূল্যরা কেমন শেরপাদের সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলেছে। চলবেই তো, ওদের যে উঠতে হবে নীল দুর্গমের শিখরে।

সবাই আমরা এক সারিতে চলেছি। বারো বছর আগেও কেবলমাত্র ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত এমনি একটি সারি তথা কোন ভারতীয় পর্বতাভিযান ছিল কল্পনাতীত। হিমালয়ের আকর্ষণ ভারতের শাশ্বত। সভ্যতার সূত্রপাত থেকেই হিমালয় মানুষের মনকে

নাড়া দিয়েছে। কালক্রমে সে হয়েছে দেবালয়। দেবানুগ্রহ লাভ করার মানসে মানুষ হিমালয়ে এসেছে। সাধন ও ভজনে নিজেদের নিয়োজিত করেছে। দেবালয় পরিণত হয়েছে আশ্রমে। পরবর্তীকালে পণ্যসম্ভার নিয়ে সওদাগরের দল হিমালয় পেরিয়ে আসা যাওয়া শুরু করেছে। পথ আবিষ্কৃত হয়েছে। পথের ধারে মানুষ বাসা বেঁধেছে। বসতি গড়ে উঠেছে। কিন্তু কারও মনে পর্বতারোহণের বাসনা দেখা দেয়নি।

পর্বতারোহণের জনক ইয়োরোপ। একজন ট্রয় দেশীয় যুবকের মনে একদিন হঠাৎ সিসিলির এট্না পর্বতের শিখরে আরোহণ করার আকাঙ্ক্ষা হল। নেহাত পর্বতারোহণের জন্যই তিনি ঐ শিখরে আরোহণ করলেন—পর্বতারোহণের জন্ম হল। ক্রমে ইটালী থেকে আল্‌পস পেরিয়ে ফ্রান্স জর্মনি ইংল্যান্ড—সারা ইয়োরোপে, পর্বতারোহণ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। ইয়োরোপের সকল পর্বতশৃঙ্গ মনুষ্য-পদানত হল। তখন পর্বতারোহীদের নজর পড়ল হিমালয়ের দিকে।

১৮৮৩ সালে ডাবলু. ডাবলু. গ্র্যাহাম নামে একজন ইংরেজ পর্বতারোহী দুজন সুইস পথপ্রদর্শক নিয়ে দার্জিলিং এলেন। কাবরু, কাবরু-উত্তর ও কাবরু-দক্ষিণ সহ সিকিমের কয়েকটি শিখর জয় করলেন। যদিও সঠিক মানচিত্র প্রণয়ন করতে পারেননি বলে তাঁর এই শৃঙ্গ-বিজয় স্বীকৃতি পায়নি।

দশ বছরের মধ্যেই ইংরেজ অভিযাত্রীদের নজর পড়ে বিশ্বের উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ এভারেস্টের ওপর। কিন্তু প্রথম অভিযান পরিচালিত হয় কর্নেল হাওয়ার্ড বেরীর নেতৃত্বে ১৯২১ সালে। তারপরে অবশ্য অন্যান্য দেশের পর্বতারোহীরাও এভারেস্ট জয়ের চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু বত্রিশ বছর পরে (২৯শে মে, ১৯৫৩) ইংরেজ অভিযাত্রীদলকেই এভারেস্ট তার প্রথম জয়মাল্য পরিয়ে দেয়। আর সেদিনই প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় পর্বতারোহণের জন্মদিন। যদিও প্রথম ভারতীয় পর্বতাভিযান সংগঠিত হয় ১৯৫১ সালে, শ্রীগুরুদয়াল সিংয়ের উদ্যোগে। তবে পর্বতাভিযানের প্রতি ভারতবাসীর সত্যিকারের আগ্রহের উন্মেষ হয় এভারেস্ট জয়ের পর থেকে। হিমালয়ের বিভিন্ন অভিযান ভারতভূমি থেকেই আরম্ভ হয়েছে। ভারতীয় শেরপা ও কুলিরা সে সব অভিযানে উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছে। ১৯৩১ সালের ২১শে জুন ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথের নেতৃত্বে গাড়োয়ালের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কামেট (২৫,৪৪৭ ফুট) আরোহণকারীদের মধ্যে লেওয়া ও কেশর সিং নামে দুজন ভারতীয় ছিলেন। কিন্তু ১৯৫৩ সালের সাফল্যের পরেই আমরা প্রথম উপলব্ধি করেছি, তাহলে তো আমাদের দেশেও তেনজিং আছেন। আমরাও পারব। কিন্তু তার জন্যে চাই উপযুক্ত শিক্ষা। সরকারের তরফ থেকে সুইস্ ফাউন্ডেশান ফর অ্যালপাইন্ রিসার্চ-য়ের কাছে স্কীম চাওয়া হল। Rosenlaui সুইস মাউন্টেনিয়ারিং স্কুলের অধ্যক্ষ আর্নোল্ড গ্লাট্‌হার্ড ভারতে এলেন। তিনি দার্জিলিংয়ের বার্চ হিলে (জওহর পর্বত) শিক্ষাকেন্দ্র এবং সিকিমের জোংরীতে (১৫,০০০ ফুট) শিক্ষাশিবির নির্বাচনের পরামর্শ দিলেন। ১৯৫৪ সালে হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের জন্ম হল। মেজর এন. ডি. জয়াল হলেন অধ্যক্ষ এবং শ্রীতেনজিং নোরগে হলেন ফিল্ড-ট্রেনিংয়ের অধিকর্তা। সুইশ ফাউন্ডেশান পরামর্শ দিলেন, "A course of preparatory character should include lectures on geography, morphology, geology or physiology and climatology." এ পর্যন্ত দার্জিলিং থেকে ছ'শ নিরানব্বই জন ছেলে বেসিক ও উনআশী জন ছেলে

অ্যাডভান্স ট্রেনিং নিয়েছে।

পরের বছরই ভারতীয় অভিযাত্রীরা পর্বতাভিযানের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করলেন। মেজর জয়ালের নেতৃত্বে একই দিনে (৬ই জুলাই ১৯৫৫) কামেট (২৫,৪৪৭) ও আবিগামিন (২৪,১৩০ ফুট) বিজিত হল। এ পর্যন্ত হিমালয়ের আঠারোটি শৃঙ্গ ভারতীয় পর্বতাভিযাত্রীরা আরোহণ করেছেন। আনন্দের কথা, এর মধ্যে দুটি শৃঙ্গ বেসরকারী বাঙালী অভিযাত্রীদল জয় করেছেন।

পর্বতাভিযানের প্রতি আগ্রহ ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কিছুদিন হল ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশান নামে একটি সরকারি সংস্থা স্থাপিত হয়েছে। এদের প্রধান উদ্দেশ্য হল ভাল পর্বতারোহী তৈরি করা। ১৯৫৭ সালে ভারতীয় 'চো-উ' অভিযানের জন্য যে স্পন্সরিং কমিটি গঠিত হয়েছিল, তাই এই ফাউন্ডেশানে রূপান্তরিত হয়েছে। এরাই দুবার এভারেস্টে অভিযান পাঠিয়েছেন। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবের মানালীতে, দার্জিলিং-এর মতো একটি সরকারি ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই উত্তরপ্রদেশের গোয়ালদামে আর একটি হবার কথা আছে। জনসাধারণও পেছিয়ে থাকেন নি। এখন সারা দেশে প্রায় কুড়িটি বেসরকারি পর্বতারোহণ সংস্থা গঠিত হয়েছে। গৌরবের কথা তার মধ্যে চারিটিই কলকাতায়।

পর্বতারোহণ কেবলমাত্র শারীরিক কৌশল নয়, একটি সুকুমার কলা। অজানাকে জানাই পর্বতারোহণের প্রধান উদ্দেশ্য। পর্বতারোহীর সঙ্গে পর্বত ও পার্বত্য মানুষের একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পর্বতারোহণ দেহ ও মনকে সুস্থ ও স্নেহপরায়ণ করে তোলে। নিয়মানুবর্তিতা ও একতার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হয় পর্বতাভিযানে। অভিযাত্রী শীত-গ্রীষ্ম, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শ্রান্তি ও ভয়কে জয় করার শক্তি অর্জন করেন। তাঁর অনুভূতি প্রখরতর হয়। ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ বলেছেন—'On a mountain-top a man feels himself to be no interloper on life's stage, no temporary improvisation to suit an obscure prupose, but an entity whose span is timeless, whose scope is magnificent beyond conception, whose birth and death are incidental milestones on a splendid road without beginning and without end.'

পাশ্চাত্য দেশের মেয়েরা বহুকাল থেকেই পর্বতারোহণে আগ্রহশীলা। এই তো সেদিন (১৪ই মে ১৯৬২) কাউন্টেস ডরোথী গ্রাভিনা নামে একজন সাতান্ন বছরের ইংরেজ মহিলার নেতৃত্বে মেয়েরা পশ্চিম নেপালে কাঞ্জিরোবা হিমাল-এর (২২০০০ ফুট) একটি নামহীন শৃঙ্গ জয় করে গেলেন। তবে আমাদের মেয়েরা এতকাল গিরিতীর্থ দর্শনের মধ্যেই তাঁদের পর্বতাভিযানের আগ্রহকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এই সীমা প্রথম লঙ্ঘন করেন তেনজিংয়ের দুই মেয়ে নীমা ও পেম্‌পেম্‌ ও ভাগ্নী ডোমা। ১৯৫৯ সালের অগাস্টে মেয়েদের চো-উ অভিযানে এঁরা অংশ গ্রহণ করেন। দুর্ভাগ্যের কথা এই অভিযানে দুজন শেরপা সহ ৩৯ বৎসর বয়স্কা নেত্রী, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহিলা পর্বতারোহিণী ম্যাডাম এম. ই. ক্লদ কোগান ও ক্লদ ভ্যানড্রার স্ট্র্যাট্‌লেন মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁরা দক্ষিণ ফ্রান্সের নীস ও বেলজিয়ামের ব্রাসেলস্‌ থেকে এসেছিলেন।

গত বছর থেকে দার্জিলিং-এ মেয়েদের জন্য বেসিক কোর্স এবং এ বছর থেকে অ্যাড্‌ভান্স কোর্স খোলা হয়েছে। এ পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশটি মেয়ে বেসিক ও সাতটি মেয়ে

অ্যাড্‌ভান্স ট্রেনিং নিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে আমরাও বলতে পাবব—ভারতে ম্যাডাম কোগানের মতো মেয়ে আছেন। *

"কি ভাবছেন? ওদিকে দেখুন গরুড় গঙ্গার পথ।" উপেনবাবুর ডাকে চিন্তায় ছেদ পড়ে। কিন্তু পথ কোথায়? পথ যে ধস নেমে মুছে গেছে। যখন এই বাসপথ হয় নি তখন ওপরের ঐ ধসে যাওয়া পথ দিয়েই বদ্রীনাথ যেতে হত। কিন্তু অতীতের ঐ মহাপ্রস্থানের পথ আজ পরিত্যক্ত। তাই আর ধস পবিষ্কার করা হয় নি। একালের পথ সেকালের পথকে টুঁটি টিপে মারছে।

"বহুত নসীব সাব। লাটুদেবী বাচা দিয়া।"

কি হল? শের সিং বলছে লাটুদেবী নাকি বাঁচিয়ে দিয়েছে? কি বাঁচল? কাকে বাঁচাল? আমাদের ধার্মিক চিকিৎসক শ্রীবিমল ঘোষালকে। সত্যি খুব জোর বেঁচে গেছে। আর একটু হলেই অলকানন্দায়। অথচ শের সিং বার বার নিষেধ করেছে—কৃপা করকে কোই কিসিকো ওভারটেক মাত কিজিয়ে। অর্থাৎ যে যার পেছনে চলছে তাকে তার পেছনেই চলতে হবে। কিন্তু কথাটি ডাক্তারের মনে ধরে নি। তাই সে একটু এগিয়ে যেতে চেয়েছিল। আমরা পথ ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু খচ্চররা শুনবে কেন? লাথির চোটে ডাক্তারকে প্রায় ফেলে দিয়েছিল অলকানন্দায়। ভাগ্যিস বসে পড়েছিল, আর শের সিং ছুটে এসে টেনে ধরেছিল। বড় জোর বেঁচে গেছে ডাক্তার। বেঁচে গেলাম আমরা।

॥ ৯ ॥

হে দেবী তুমি জয়যুক্তা; জন্মাদিনাশিনী সর্বসংহারিণী, মঙ্গলদায়িনী। তুমি প্রলয়কালে ব্রহ্মাদির কপোলহস্তে বিচরণকারিণী, তুমি দুঃখপ্রাপ্যা, চিৎস্বরূপা, করুণাময়ী, বিশ্বধারিণী, তুমিই দেবোপক্ষিণী, পিতৃতোষিণী তোমাকে নমস্কার করি।

'মধুকৈটভ বিধ্বংসি বিধাতৃ বরদেঃ নমঃ।
রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো দেহি দ্বিষো জহি॥'

নিদ্রা গেল টুটে। রেডিও চলছে। চণ্ডীপাঠ হচ্ছে। তাই তো! আজ ২৮শে সেপ্টেম্বর, আজ যে মহালয়া। খেয়ালই ছিল না। কিন্তু ভুল হয় নি দেবীদাসের। সে

---

* আমার অনুমান সত্য হয়েছে। এ বছর (১৯৬৪) ১০ই অক্টোবর প্রবীণ পর্বতারোহিণী শ্রীমতী জয়েস্ ডানসীথের নেতৃত্বে ভারত স্কাউট্স্ ও গাইড্স-এর মহিলা পর্বতারোহীরা মৃগথুনি শৃঙ্গ জয় করেছেন।

এ বছরই ২রা অক্টোবর বাঙালী মেয়েদের ঘরকুনো দুর্নাম ঘুচিয়ে পৃথিবীর পর্বতারোহণের ইতিহাসে ভারতীয় নারীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন অনিমাদি—শ্রীমতী অনিমা সেনগুপ্তা এম এ, বি টি, এম এড। আমাদের ট্রেল্‌স পাস (১৭,৭০০ ফুট) অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তিনি। ফেরার পথে পিথোরাগড় জেলার লিলামে (৬০০০ ফুট) ধসের কবলে পড়ে প্রাণত্যাগ করেন। ১২ই সেপ্টেম্বর হাওড়া স্টেশনে তাঁকে আমরা বিদায় দিয়েছিলাম হিমালয়ের পথে। তিনি আর আমাদের মাঝে ফিরে আসেন নি। কিন্তু আমরা তাঁকে হারাইনি। তিনি আছেন আমাদের অন্তরে, প্রত্যেক হিমালয়-প্রেমিকের মাঝে। তিনি বেঁচে আছেন হিমালয়ের হিমানীতে, কমনীয়া কুমায়ুনের মাটিতে আর ভারতীয় পর্বতারোহণের ইতিহাসে।

ঠিক সময়মত উঠে, আমার রুকস্যাকের মধ্য থেকে ট্র্যানজিস্টারটা বের করে নিজের বিছানায় নিয়ে চালিয়ে দিয়েছে। সুপ্ত বেলাকুচী জেগে উঠেছে, মুখর হয়ে উঠেছে মহাদেবীর আগমনী বার্তায়।

প্রায় সবারই দেখছি আমার আগে ঘুম ভেঙেছে। সবাই—শ্রদ্ধাবনত চিত্তে শুনছে—

'সকল দেবতার শরীর হইতে সঞ্জাত ত্রিলোকব্যাপী অনুপম তেজরাশি একত্র হইয়া এক নারীমূর্তি ধারণ করিল।

মহাশম্ভু, বিষ্ণু, চন্দ্র, সূর্য, ইন্দ্র, পৃথিবী তথা ব্রহ্মা, বিশ্বকর্মা প্রভৃতির স্ব স্ব সৃষ্টি ক্ষমতায় সদৃশ তেজরাশিতে দেবীর নখাগ্র হইতে কেশ পর্যন্ত সমগ্র শরীরাংশ উদ্ভূত হইল...।'

আধো অন্ধকারেও দেখতে পেলাম, অমূল্য যেন হাতজোড় করে প্রণাম করল। আর অমূল্যর দেখাদেখি ডাক্তার ও শৈলেশদা প্রণাম করলেন সকল দেবতার তেজরাশি সম্ভূতা মহালক্ষ্মীকে।

শুনতে খুবই ভাল লাগছে। কলকাতায় কি এত ভাল লাগত? হয়তো নয়। বাংলা থেকে পৌনে এগারো শ মাইল দূরে, মহাপ্রস্থানের পথের ধারে, হিমালয়ের পাদমূলে, ছোট্ট গ্রাম বেলাকুচীর চটিতে, বাংলা কথা, বাংলা গান, বাংলা সুর ভেসে আসছে। দূরকে নিকট করছে, ঘরকে কাছে আনছে। তাই বোধ হয় এত ভাল লাগছে।

ভাল লাগছে আরও একটি কারণে। মহালয়া বহন করে আনে মহামায়ার আগমনী সুর। মহালয়া আমাদের এক স্বর্গীয় আনন্দ ধারায় অবগাহন করায়, রণরঙ্গিনী বেশে দশভুজা চামুণ্ডার মহিষাসুরকে নিহত করার কাহিনী স্মরণ করায়। বাঙালীকে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা দেয়। আমাদের শক্তি পূজাও সবে শুরু হয়েছে। এরই মধ্যে দুর্যোগের কবলে পড়ে আমরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। মহালয়া আমাদের প্রাণে আনল নতুন আশা, মনে আনল নতুন বল—আমরা সেই আশায় বুক বেঁধে সেই বলে বলিয়ান হয়ে এগিয়ে যাব...

'অতএব...মাভৈঃ—ভয় দূরীভূত হইয়াছে। অসুররূপ যে সমস্ত অশুভবৃত্তি, আমাদিগকে সত্যপথ হইতে বিচ্যুত করিতেছে, যে অপরাজ্ঞান আমাদিগকে পরাজ্ঞান হইতে সর্বদা বিপথগামী করিতেছে, তাহার হাত হইতে পূর্ণ নিষ্কৃতি পাইতে স্বতস্ফূর্তচিত্তে...আমরা দেবী মহামায়াকে শুভ মাতৃলগ্নে স্মরণ করিয়া অভীষ্ট ফললাভ করি।'

আর দেরি নয়। এবারে বেরিয়ে পড়তে হবে। আমরা অভীষ্ট ফললাভ করব, নীল দুর্গম জয় করব।

বেলাকুচী জায়গাটা নতুন হলেও একেবারে ছোট নয়। কয়েকটি দোকান ও অনেকগুলি চটি আছে। তারই একটির দোতলায় কাল রাতে কাটিয়েছি। আমরা ঋষিকেশ থেকে ১৪৩ মাইল এসেছি। এখান থেকে জোশীমঠ পনেরো মাইল। এখানকার উচ্চতা ৪০০০ ফুটের কিছু বেশি। অথচ জোশীমঠ ৬১৫০ ফুট। আজ আমাদের প্রায় ২১০০ ফুট চড়াই ভাঙতে হবে। যেমন করেই হোক আজ জোশীমঠ পৌঁছতেই হবে।

"পথ কোথাও কিছু পাওয়া যাবে কিনা তার ঠিক নেই। এখানেই আমাদের পেট ভরে খেয়ে নিতে হবে, কি বলেন পিনাকীদা?"

"আচ্ছা দেবী! এটা কি নীলগিরি অভিযান, না খাদ্য আন্দোলন?" শৈলেশদা রেগে ওঠেন। পাছে রাগারাগিতে সময় নষ্ট হয় তাই পিনাকী তাড়াতাড়ি একটা খাবারের দোকানে ঢুকে পড়ে। বিজয়ী দেবীদাস পরাজিত শৈলেশদাকে একবার দেখে নিয়ে, নিঃশব্দে পিনাকীর পেছনে পেছনে দোকানে ঢোকে। আপন মনে কি বকতে বকতে শৈলেশদাও দেখি দেবীদাসের পিছু নেন। আমরাও তাঁকে অনুসরণ করি।

খচ্চর ও কুলির দল এগিয়ে গেছে। শের সিং গেছে ওদের সঙ্গে। ওদের কথা না ভেবে ভোরের আলোয় বেলাকুচীকে দেখা যাক। একটু দূরেই বিচিত্র একটি ঝরনা, বোধহয় পাতালগঙ্গা থেকে নেমে এসেছে। আজ কদিন ধরেই তো আমরা কত ঝরনা দেখেছি। কিন্তু এমনটি তো এর আগে চোখে পড়ে নি। অনেক ওপর থেকে অজস্র ধারায় জল পড়ছে—জল নয়, স্ফটিক গলে গলে পড়ছে। ভোরের মিঠে রোদ সেই স্ফটিকের বুকে সৃষ্টি করেছে অজস্র রামধনু। রংয়ের বন্যা জেগেছে প্রকৃতির প্রাণে—আমাদের মনে।

একটা পুল পেরিয়ে এলাম। অলকানন্দার এই পুলটি ভেঙে গিয়েছিল কিছু দিন আগে। পি. ডাবলু. ডি. নাকি দু মাস সময় চেয়েছিলেন। নিচে চিরবিক্ষুব্ধা অলকানন্দা। দুই তীরে ইস্পাতের মতো কঠিন পাথরের খাড়া পাহাড়। সময়সাপেক্ষ বৈকি। কিন্তু মানুষ প্রয়োজনে অসম্ভবকে সম্ভব করে। দু মাস সময় দিলে যে কেবল এ বছরের মতো বদ্রীর পথরুদ্ধ হবে তাই নয়, সীমান্তও অরক্ষিত থাকবে। তাই বীর জওয়ানরা অসাধ্য সাধন করেছেন। দু দিনে দু মাসের কাজ শেষ করেছেন। নতুন পুল তৈরি হয়েছে—বেলাকুচীর বেইলী ব্রীজ।

"গির গিয়া গির গিয়া...পড়ে গেল...খচ্চর...মানুষ"। একটা সমবেত আর্ত চিৎকারে সচকিত হই। উদ্‌ভ্রান্ত হই। কে পড়ল, কেন পড়ল, কোথায় পড়ল? ছুটে চলি। সামনে একটা মারাত্মক ধস। বাসপথের কোন চিহ্ন নেই। পি. ডাবলু. ডি.-র লোক ধসের ওপর ফুটখানেক জায়গা দুরমুশ করে কোনমতে মানুষ চলাচলের উপযোগী করে দিয়েছে। সেই জায়গা পেরুবার সময় উপেনবাবুর ব্লটিং পেপার সুদ্ধ তাঁর এত সাবধানে বাছাই করা খচ্চরটির পা ফস্‌কে গেছে—৫০০ ফুট নিচে বিক্ষুব্ধ অলকানন্দায় বিলীন হয়েছে। আর তার সাধের নয়া খচ্চরকে বাঁচাতে গিয়ে অমর সিং...। সর্বনাশ এখন উপায়? পদযাত্রার দ্বিতীয় দিনেই দুটি প্রাণ ডালি দিতে হল!

আমরা বোবা হয়ে গেছি। তাকিয়ে আছি সেই সর্বনাশা ধসের দিকে, তাকিয়ে আছে শেরপা ও কুলিরা, তাকিয়ে আছে খচ্চরগুলো—ভয়ার্ত নয়নে। পর্বতাভিযানের জন্যে আরও একজন মানুষ বিদায় নিল পৃথিবী থেকে। এমনি ভাবেই বিদায় নিয়েছেন ম্যালোরী ও তাঁর সহযাত্রী আর্ভিন, বিদায় নিয়েছেন হার্ম্যান বুল ও আরও অনেকে। কিন্তু সেই মৃত্যুঞ্জয়ী মহাবীরদের আত্মবলিদান বিফল হয় নি। পরবর্তী অভিযাত্রীরা তাঁদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, তাঁদের পথ দিয়েই এগিয়ে গেছেন—হিমালয় হার মেনেছে।

অমর সিংয়ের আকস্মিক অকালমৃত্যুতে তাই বিচলিত হলে চলবে না। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। নীলগিরি জয় করে এই মরণকে মহীয়ান করে তুলতে হবে।

একটা চিৎকার শোনা যাচ্ছে। শব্দটা নিচে থেকে আসছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই

নিরাপদ বলে ওঠে, "বেঁচে গেছে।"

"হ্যাঁ। ঐ তো শুয়ে আছে।" প্রাণেশও দেখতে পেয়েছে তাকে।

জয় বাবা বদ্রীনাথ। তাই যেন হয়। অমর সিং যেন বেঁচে যায়।

কেউ কিছু বলার আগেই সেই খাড়া ধস বেয়ে প্রাণ হাতে করে প্রাণেশ ও নিরাপদ নিচে নেমে গেল। আমরা রুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে আছি ওদের দিকে। নাঃ, ওরা নির্বিঘ্নে নেমে গেছে। একটু বাদে টোপগে ছান্দু ও ছুতার দড়ি নিয়ে সেই ভাবেই নিচে নেমে গেল। প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে ব্লটিং পেপারের বোঝা সমেত অমর সিংকে সঙ্গে করে ওরা অন্য পথে উঠে এল ওপরে। আশ্চর্য! নীচে গড়িয়ে পড়ার সময় খচ্চরের পিঠ থেকে কেমন করে যেন ব্লটিং পেপারের বোঝাটি খসে পড়েছে। একখানা বড় পাথরে আটকে ছিল অমর সিংয়ের মতই। নিজের জীবন দিয়েও খচ্চরটি নন্দনকাননের প্রথম সরকারি উদ্ভিদ সমীক্ষাকে সম্ভব করে গেল।

অমর সিংয়ের আঘাত তেমন মারাত্মক নয়। কয়েক জায়গায় ছড়ে গেছে। একটা হাঁটুতে একটু চোট লেগেছে। বিমল তার প্রাথমিক চিকিৎসা করল। অমর সিংকে জিজ্ঞেস করি, "তুমি আস্তে আস্তে হেঁটে যেতে পারবে তো?"

এতক্ষণ সে কোন শব্দ করে নি। মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে ছিল। ভেবেছিলাম দুর্ঘটনার আকস্মিকতায় হয়তো বোধশক্তি হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আমার কথা শুনেই সে একেবারে ভেঙে পড়ে। হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে। বলে, "মাতাজীকো মানা নেহী শুনা। অব্ ক্যায়সে উন্‌হে মুহ্ দেখাউঁ?"

শের সিং ও পান সিং ওকে সান্ত্বনা দিতে থাকে। পান সিং অমরের মামা। সেও আমাদের মাল বইছে। পান সিং জানায় মাত্র কয়েকদিন আগে, জোতজমা বন্ধক রেখে তার দিদি অমরকে এই খচ্চরটি কিনে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন রাস্তা মেরামতের মালপত্র বয়ে অমর সেই দেনা শোধ দেবে। কয়েকদিন অমর রাস্তার কাজ করেছে। সে কাজে পরিশ্রম কম, বিপদ কম আবার পয়সাও কম। তাই কাজটা অমরের ঠিক মনে ধরছিল না। এমন সময় এল শের সিংয়ের আমন্ত্রণ। কিন্তু পাহাড়-চড়ার ব্যাপার শুনেই দিদি বললেন—দরকার নেই বাপু ওসবের মধ্যে গিয়ে। নতুন খচ্চর, এখনও পথ চলায় তেমন অভ্যস্ত হয় নি। শেষকালে একটা বিপদ আপদ হোক আর কি! অমর বলল—তোমার যত মিথ্যে ভয়। গাঁ সুদ্ধ সবাই যাচ্ছে। তুমি কিছু ভেবো না মা। মাও আর তেমন আপত্তি করেন নি। মাসখানেকের মধ্যেই অমর ফিরে আসবে। অনেক টাকা আনবে। মুনরীর বাবার দাবি মেটাবে।

"মুনরী কে?" পান সিংকে জিজ্ঞেস করি।

'আমাদের গাঁয়ের বুধন সিংয়ের মেয়ে। অমরের ছোটবেলার খেলার সঙ্গী। ওরা সাদী করতে চায়। কিন্তু দুশো টাকার কমে বুধন সিং মেয়ে দেবে না।"

খুব ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়েছে অমর। অনেক কষ্টে মা তাকে মানুষ করেছেন। কত আশা, অমর একদিন বড় হবে, রোজগার করবে, রাঙা টুকটুকে বৌ আনবে। তিনি পা ছড়িয়ে দাওয়ায় বসে ফরমাশ করবেন। আজ পাঁচদিন হল সেই অমর ঘরে নেই। হয়তো তিনি সেই দাওয়ায় বসেই ভাবছেন—অমর কবে ফিরবে, কত টাকা নিয়ে আসবে, কবে মুনরী আসবে তার ঘরে?

অমর কোন দিনই খুব মিশুকে নয়। খেলার সঙ্গী কোন কালেই তার বেশি ছিল না। যারা ছিল তাদের অনেকের সঙ্গেই তার আর যোগাযোগ নেই। এখন তার—সবার উপরে মুনরী সত্য, তাহার উপরে নাই। শৈশবসাথী জীবনসাথী হবে। সে হয়তো কলসী মাথায় সখীদের সঙ্গে চলেছে গাঁয়ের ঝরনায়। হাস্যে ও লাস্যে ঝরনার মতই উচ্ছল হয়ে উঠছে। সহসা সখীর প্রশ্নে চমকে ওঠে, নিজের অলক্ষেই থমকে দাঁড়ায়। ভাবে—অমর এখন কোথায়? আজ পাঁচদিন হল অমরকে দেখে নি। আরও পঁচিশ দিন অদর্শনের এই যন্ত্রণা সইতে হবে। কিন্তু তার পর? মনে মনে হাসে—তার পর অমর আসবে অনেক টাকা নিয়ে। সেই টাকা দিয়ে সে তাকে কিনে নেবে। অবশেষে এক শুভদিনে শুভক্ষণে...

বদ্রীনাথ! তুমি না করুণার সাগর। তুমি কেন এমন করে মানুষের আশায় বাদ সাধো? অলকানন্দা! তুমি না অলকাপুরীর বিগলিত করুণা ধারায় সঞ্জীবিত করছ এই মর্তভূমিকে? তুমি কেন এমন করে দুটি জীবনকে ঊষর মরুভূমিতে পরিণত করলে?

"অমরকে কিছু টাকা দেওয়া উচিত।"

অমূল্যের কথায় বাস্তবে ফিরে আসি। "দেওয়া উচিত বৈকি। কিন্তু আমাদের পুঁজি যে বড়ই কম।"

চঞ্চল বলে, "তাহলে নিজেদের মধ্যে চাঁদা তোলা যাক আর অভিযান তহবিল থেকেও কিছু দেওয়া হোক।"

"আমি পঞ্চাশ টাকা দেব।" উপেনবাবু সবার আগে প্রতিশ্রুতি দেন।

ভানু বলে, "আমিও।"

পিনাকী অমরের মাথায় একখানি হাত রেখে সস্নেহে বলেন, "কেঁদো না ভাই। আমরা যথাসাধ্য তোমায় সাহায্য করব।"

শের সিং অমরের চোখের জল মুছে দেয়। ভানু তাকে হাত ধরে টেনে তোলে। হাসি ফোটে অমরের ঠোঁটে। এই হাসি সঞ্চারিত হবে তার মা'র ম্লান মুখে—মুনরীর কালো-হরিণ চোখে।

এই হাসি আমাদের নীলগিরি পথের পরম পাথেয় হয়ে রইল।

॥ ১০ ॥

আট ঘণ্টা পদচারণার পর বেলা তিনটের সময় আমরা জোশীমঠ পৌঁছলাম। পথে শুধু অনিমঠে দুধ খাবার জন্যে কয়েক মিনিট থেমেছিলাম। দেবীদাসের কিন্তু শুধু দুধে তৃষ্ণা মেটে নি। সে একটি স্কুলের ছাত্রর সঙ্গে খাতির জমিয়ে তার ঝোলা থেকে বেশ বড় একটি শশা ম্যানেজ করেছিল।

খুবই কঠিন পাকদণ্ডী পেরোতে হয়েছে আমাদের। দূরত্ব কমাবার জন্য সেই সাততলা বাসরাস্তা এড়িয়ে পাকদণ্ডী ভেঙেছি। লাভ হয়েছে কতটা জানি না। হয়তো ঐ পথ দিয়ে এলে সময় বেশি লাগত। কিন্তু নিঃসন্দেহে পরিশ্রম অনেক কম হত।

এখনও জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়ছে। চোখে অন্ধকার দেখছি। তাহলেও আনন্দিত হয়েছি। আমরা সিংহদ্বারে পৌঁছেছি। জোশীমঠ এসেছি। বীরেনের উল্লাসে আমাদের সকল কষ্টের উপশম হল। অথচ বীরেন ধীর স্থির ও সংযমী। এমন মুহূর্তেও

আসে যখন মানুষ তার প্রকৃতিকে ছাড়িয়ে যায়।

প্রাণেশ ও টোপগেকে পিপলকোঠিতে রেখে, এই দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে বীরেন একা জোশীমঠ এসেছে। কুলি যোগাড়ের জন্য ঝড় জল মাথায় করে পিচ্ছিল পাহাড়ী পথে পাগলের মতো ছুটে বেড়িয়েছে। শের সিংকে পিপলকোঠি রওনা করিয়ে দিয়েও তার মন শান্ত হয় নি। আকাশের দিকে তাকিয়ে অধীর হয়েছে। অনেকেই তাকে নিরুৎসাহ করেছে। তাদের মতে—এই আবহাওয়ায় অভিযান চালানো সম্ভব নয়। কিন্তু অভিজ্ঞ বীরেন নিরুৎসাহ হয় নি। বেস কমান্ডার মেজর উবেরয়ের সাহায্যে শ্রীনগর কর্ণপ্রয়াগ ও পিপলকোঠির সঙ্গে ওয়াবলেশে যোগাযোগ করেছে। খবর পেয়েছে—আমরা অগ্রসর হচ্ছি। সে ধৈর্য সহকারে প্রতীক্ষা করেছে। আজ তার সেই প্রতীক্ষার অবসান হল। কেন সে উল্লসিত হবে না? কেন সে ছুটে আসবে না? আলিঙ্গনে আমাদের অস্থির করে তুলবে। প্রশ্নবানে জর্জরিত করবে না?

হঠাৎ বীরেনের খেয়াল হল যে সকালে যা খেয়ে বেরিয়েছি, এখন তার কণামাত্রও আমাদের উদরে অবশিষ্ট থাকার কথা নয়। বলে, "চলুন বিড়লা রেস্ট হাউসে যাওয়া যাক। দুখানা ঘর নিয়েছি। চৌধুরীদাও সেখানে আছেন।"

"জলযোগের ব্যবস্থা?" আমরা উৎকণ্ঠিত।

"চলুন। আমি সব ব্যবস্থা করছি।"

বিড়লা রেস্ট হাউসে আসা গেল। ফুল বাগানে ঘেরা সুন্দর একখানি দোতলা বাড়ি। আলোহাওয়াযুক্ত বেশ বড় বড় ঘর। দিবারাত্র কলের জল। আমরা একতলায় পাশাপাশি দুখানা ঘর পেয়েছি।

জোশীমঠ শুধু বদ্রীনাথ বাসপথের প্রান্তসীমা নয়, গাড়োয়ালের একটি সমৃদ্ধ জনপদ। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় সংস্কৃতির একটি শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। জগদ্গুরু শঙ্করাচার্যের তপস্যাধন্য এই জোশীমঠ। এখানকার জ্যোতির্মঠ তাঁর প্রতিষ্ঠিত চারিটি মঠের অন্যতম। শত শত যাত্রী প্রতিদিন জোশীমঠ আসেন। যাতায়াতের পথে তারা এই মনোরম মহকুমা শহরে দু একদিন বিশ্রাম করে যান। ফলে এখানে গড়ে উঠেছে অসংখ্য চটি ও চারটি ধর্মশালা এবং রেস্ট হাউস। যাত্রীদের বড় একটা স্থানাভাব হয় না এখানে কিন্তু এবারে ঘর পেতে নাকি অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে বীরেনকে।

তিব্বতের প্রধান দুটি পথ—মানা ও নীতি গিরিদ্বারের পথ এসে মিলিত হয়েছে এখানে। যুগ যুগ ধরে এই পথে ভারতের সঙ্গে তিব্বতের সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান চলেছে, অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্য চলেছে। আজ জঙ্গী লালচীন গ্রাস করেছে তিব্বত। নীতিজ্ঞানহীন সেই যুদ্ধবাজদের প্ররোচনায় শান্ত সীমান্ত অশান্ত হয়ে উঠেছে। পুণ্যতীর্থকে পরিণত করতে হচ্ছে প্রতিরক্ষা শিবিরে। জোশীমঠ আজ ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার রক্ষা-কবচ। ফলে যাত্রীদের স্থানাভাব ঘটেছে।

জওয়ানদের ভিড়ে ভরে গেছে বিড়লা রেস্ট হাউস। তীর্থদর্শন স্থগিত থাকতে পারে, কিন্তু ওদের আগমন স্থগিত হলে তীর্থ যাবে, ধর্ম যাবে, দেশ যাবে। তাই ওদের দাবি সবার আগে। মা-বোন স্ত্রী ও সন্তান সবাইকে ছেড়ে যাঁরা যাচ্ছেন তুষারাবৃত সীমান্তে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হানাদারদের রুখতে। জলবায়ু সয়ে নেবার জন্যে (Acclimatisation) এখানে থাকতে হচ্ছে কয়েকদিন। সৈন্য শিবিরে সবার ঠাঁই হচ্ছে না,

তাই ওরা ঠাঁই নিয়েছেন এখানে। জওয়ানদের ভিড়ে ভরে গেছে রেস্ট হাউস।

তবু আমরা ঘর পেয়েছি। পেয়েছি মেজর উবেরয়ের চেষ্টায়। গত জুন মাসে, ক্যাপ্টেন জগজিৎ সিংয়ের নেতৃত্বে সেনাদল নীলগিরি জয় করতে পারেন নি। তাঁরা যা পারেন নি, আমরা তাই করতে যাচ্ছি শুনে মেজর উবেরয় বীরেনকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন—এই ঘর দুখানির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠল ভানু—সাড়ে চারটে বাজে। পাঁচটায় পোস্টাফিস বন্ধ। রিপোর্ট পাঠাতে হবে। গৌচরের পরে আর কোন খবর পাঠাতে পারি নি। অমূল্যকে নিয়ে ভানু ছুটল পোস্টাফিসে।

শুয়ে বসে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেওয়া গেল। তারপর একসময় দেবীদাস বলল, "পিনাকীদা এবারে বেরিয়ে পড়া যাক।"

"চলো।" পিনাকী উঠে বসে, 'শৈলেশদাকে বলে, "বাজারে যেতে হবে। ফর্দটা সঙ্গে নিন।"

"আজীবা।" শৈলেশদা হাঁক দেন।

"সাব্।"

"বাজার জানে হোগা। টাইমকা অভাবমে কলকত্তাসে সব চীজ নেহী লে আনে সকা। ও সব চীজ কিন্‌নে হোগা।"

"জী সাব্।"

"তোমলোগকো হামারা সাথমে জানা হোগা। রেডী হো যাও।"

"হামলোগ তৈয়ার হ্যায় সাব্।"

"তব চলো।"

ওরা চলে গেল। জোশীমঠের পর পথে আর কোন বাজার পড়বে না। কাজেই প্রয়োজনীয় সব কিছুই এখান থেকে কিনে নিতে হবে। এছাড়া আরও অনেক কাজ রয়েছে। এখানেই রিপ্যাকিংয়ের কাজ সেরে নিতে হবে। এর পরে আবার প্যাকিং হবে বেসক্যাম্প বা মূল শিবিরে। আরও কুলি যোগাড় করতে হবে। যে দশজন কুলি ও চব্বিশটি খচ্চর আমরা পেয়েছি, তারা যাবে ঘাংরিয়া পর্যন্ত—ষোল মাইল দূরে লোকপাল ও নন্দনকাননের পথে একটি জনহীন উপত্যকা। সেখান থেকে নন্দনকাননের পথ অতি দুর্গম—সে পথে খচ্চর অচল। শুধু খচ্চর নয়, পিপলকোঠির কুলিরাও সে পথে যেতে নারাজ। বীরেন ও প্রাণেশ শের সিংয়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল কুলি যোগাড়ের চেষ্টায়।

বদ্রীনাথ তীর্থপথের বাইরে কোথাও যেতে হলে চামোলী বা জোশীমঠে সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে ইনার লাইন পারমিট নিতে হয়। আমরা কলকাতা থেকে এখানকার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী এইচ. দেবরালকে চিঠি দিয়েছিলাম। উত্তরে তহশীলদার শ্রী পি. ডি. পন্থ আশ্বাস দিয়েছেন, এখানে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেই আমরা পারমিট পেয়ে যাব। অমূল্যরা ফেরার পথে তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসবে।

জোশীমঠের মারফতই আমাদের কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। এর পরে আমাদের ঠিকানা—কেয়ার অভ্ পোস্টমাস্টার, জোশীমঠ। বেসক্যাম্প থেকে রানার ডাক এনে পোস্টমাস্টারের হাতে দেবে ও তাঁর কাছ থেকে আমাদের চিঠিপত্র নিয়ে ফিরে যাবে।

সন্ধের পব অমূল্যরা ফিরে এল। জিজ্ঞেস করলাম, "এত দেরি হল যে?"

"বাঃ আমরা যে বাজার ঘুরে তহশীলদারের সঙ্গে দেখা করে ফর্ম নিয়ে এলাম।" অমূল্য উত্তর দেয়।

"সেজন্যে এত দেরি হয় নি।" চঞ্চল প্রতিবাদ করে।

"কি জন্যে?" জিজ্ঞেস কবি।

"কম্পিটিশান চলছিল।"

"কিসের?"

"লিপিলেখার।"

"কাদের মধ্যে?"

"নেতা ও সহনেতার।"

"জিতল কে?"

"শেষ পর্যন্ত কাউন্ট করে উঠতে পারি নি। তবে খুবই কীন্ কন্‌টেস্ট হয়েছে।

॥ ১১ ॥

"কৌন হ্যায়?"

"ম্যায় শের সিং সাব্।"

এই সাত সকালে আবার শের সিং কেন? কাল রাতেই তো কুলি সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। কুলি এজেন্সির মালিক ঈশ্বর সিং নিজে এসে অগ্রিম নিয়ে, কাগজ পত্র সই করে দিয়ে গেছেন। আরও পনেরো জন স্থানীয় কুলি যোগাড় হয়েছে। ওরা অভিযান শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাদেব সঙ্গে থাকবে এবং ২০,০০০ ফুট পর্যন্ত মাল বইবে। বরফের ওপর কাজ করলে দৈনিক এক টাকা করে বাড়তি মজুরী পাবে। কিন্তু এখন আবার শের সিংয়ের আগমন কেন?

তাড়াতাড়ি দরজা খুলি।

"সাব্। সব আদমী বিগড় গিযা।"

আদমী মানে কুলি তা বুঝতে পারছি। কিন্তু তারা বিগড়ে গেল কেন? শের সিং জানায়—"পুরা গরম পোশাক না পেলে ওরা এক পাও নড়বে না।"

"কিন্তু কাল যে টাকা নিয়ে সবাই টিপসই করে দিয়ে গেল?"

"টিপসই দিলে কি হবে সাব? যদি হাওয়া হয়ে যায়? কি করব? একা কজনকে সামলাব?"

"তুমি কি করতে বল?"

"ওদের দাবি মেনে নিতেই হবে।"

"কত করে লাগবে?"

"আপনাদের কাউকে যেতে হবে দোকানে।"

"বেশ চলো।" আর সময় নষ্ট না করে পিনাকী শের সিংকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে অমূল্য বলে, "তাহলে আজকের দিনটাও গেল।"

"তাই তো দেখতে পাচ্ছি। রেডিমেড তো আর পাওয়া যাবে না, সব তৈরি করাতে

হবে।” নিরাপদ বলে।

“কত করে লাগবে মনে হয় হে?” শৈলেশদা নিজের পোর্টফোলিও নিয়ে ব্যস্ত।

“পিনাকীদা এলেই জানা যাবে।” প্রাণেশ উত্তর দেয়।

সঙ্গে সঙ্গে শৈলেশদা বলে ওঠেন, “তোমাকে আর জ্ঞান দিতে হবে না।”

প্রাণেশ চুপ করে থাকে। আমি বলি, “চলো প্রাণেশ, একটু ঘুরে আসা যাক।”

“কিন্তু বৃষ্টি নেমেছে যে?”

“না বলে ডাক্তারের ছাতাটা নিয়ে নাও।”

ডাক্তার আড়-চোখে আমার দিকে তাকায়। ছাতা মাথায় আমরা নেমে আসি বড় রাস্তায়। বাস স্ট্যান্ড পেরিয়ে এগিয়ে চলি সিংহদ্বারের দিকে। হঠাৎ থেমে যায় প্রাণেশ। জিজ্ঞেস করি, “থামলে কেন?”

“আপেল কিনব।”

“আপেল নয়, এখানে বলে সেও। খুব টক হবে কিন্তু।”

‘তা হলেও খেতে ভাল। খুব সস্তা। মাত্র দেড় টাকা সের।” বড় দেখে দুটি আপেল নিয়ে প্রাণেশ একটি আমার হাতে দেয়। বলে, ‘কিছু আপেল নিয়ে যাবেন নাকি আমাদের সঙ্গে?”

“পিনাকী বলছে এক বাক্স নেবে।”

প্রাণেশ খুশি হয়। আমরা লক্ষ্যহীন ভাবে বড় রাস্তা দিয়ে হাঁটতে থাকি। মোটে আটটা বাজে। দশটার আগে পোস্টাফিস ও তহশীলদারের অফিস খুলবে না। বেরিয়েই যখন পড়েছি, ডাকের বন্দোবস্ত পাকা করে ও পারমিটগুলো যোগাড় করে রেস্ট হাউসে ফিরব। ঘুরে ফিরে এই দু ঘণ্টা সময় কাটিয়ে দেওয়া যাক। প্যাকিংয়ের কাজ কাল রাতেই প্রায় শেষ হয়ে গেছে। কেনাকাটাও প্রায় শেষ। কুলি সমস্যার সমাধান করতে পারলেই আমরা রওনা হতে পারি।

সিংহদ্বারের বাজার ছাড়িয়ে আমরা সেনানিবাসের দিকে হাঁটছি। নিচেই নতুন বাসপথ—প্রসারিত হচ্ছে বিষ্ণুপ্রয়াগ পর্যন্ত। সে পথের দু ধারে ধাপে ধাপে ক্ষেত—পাহাড়ের গায়ে কি বিচিত্র আলপনা!

“আরে! এ যে দেখছি একটা হাতি। হাঁটু গেড়ে বসে আছে। কিন্তু হাতি পর্বত তো নন্দনকাননের কাছে। আর হাতি পর্বত নাকি হাতির মতো নয়। কাল আসার সময় তো পাহাড়টা দেখি নি।” প্রাণেশ বিস্মিত।

“কাল আসার সময় দেখার মতো অবস্থা ছিল না প্রাণেশ। তাই খেয়াল করো নি। এর আসল নাম কি বলতে পারি না। তবে স্থানীয় লোকেরা ওকেই হাতি পাহাড় বলে। ওপারে ঐ যে দুটি গ্রাম দেখছ—ওদের নাম চাই ও থাই। চীনারা ও গ্রাম দুটি দাবি করেছে।”

“আরে চীনাদের কথা ছেড়ে দিন। পাগলে কি না চায়। ওরা তো বদ্রীনাথও চাইছে...”

“নীলগিরিও চেয়েছে।”

মিলিটারি পোশাকপরা এক ভদ্রলোক কিছুক্ষণ থেকেই আমাদের পেছন পেছন আসছিলেন। প্রাণেশের কথার মাঝেই তিনি হঠাৎ বাংলায় বলে ওঠেন।

আমরা অবাক হয়ে পেছনে তাকিয়ে বলি, "চাইলেই পাওয়া যায় না।"

"নিশ্চয়ই। অন্যায় দাবির একটা সীমা থাকা উচিত।" ভদ্রলোক উত্তর দেন।

"যদি তারা সে সীমা লঙ্ঘন করতে চায়?"

"উপযুক্ত শাস্তি পাবে।"

"কিন্তু আপনি...?"

"আমার নাম বিকাশ ভৌমিক। মাস দেড়েক হল এখানে এসেছি। আবার আজই চলে যাচ্ছি।"

"কোথায়?"

"হট স্প্রিংয়ে।"

"সে আবার কোথায়?"

"লাদাক তিব্বত সীমান্তের একটি ভারতীয় ঘাঁটি। সেখানে কয়েকটা উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। চুশুল কিংবা থয়েস বিমানক্ষেত্রে নেমে কিছুদূর জীপে গিয়ে তার পব হেঁটে যেতে হয়।" একটু থেমে ভদ্রলোক আবার বলেন, "চলুন না আমার তাঁবুতে। কিছুক্ষণ গল্প করা যাবে। আর কতক্ষণই বা আছি এখানে।"

মাঝারি আকারের একটি তাঁবুতে এসে ঢুকলাম। কাঠের তক্তা পাতা। আসবাবপত্র বলতে একটি খাটিয়া ও একটি টেবিল। টেবিলের ওপর কবিগুরুর একখানি বাঁধানো ছবি। সামনে কয়েকটি তাজা রঙীন ফল। ধূপের স্নিগ্ধ সুবাসে আমোদিত হয়ে আছে তাঁবুর বাতাস। জিজ্ঞেস করি, "কোন বিশেষ কারণে আজই কবির প্রতি আপনার পক্ষপাতিত্ব, না এ আপনার নিত্যকর্মপদ্ধতি?"

"কবিতার সঙ্গে সম্পর্ক তো শেষ হয়ে গেছে। তাই কবিকে পুজো করে স্মৃতিটুকু বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছি।"

"যুদ্ধের ধ্বংসলীলার হাত থেকে আপনি কেমন করে সে স্মৃতিকে রক্ষা করবেন?"

"কেন? কাজী নজরুল পারেন নি? বায়রন ও ওয়েন পারেন নি?"

একজন লোক কফি ও বিস্কুট নিয়ে তাঁবুতে ঢোকে। পবিবেশন করে চলে যায়। বিকাশ বলে, "কিন্তু এই ঝড়জলের মধ্যে আপনারা পারবেন কি নীলগিরি জয় করতে? ...আমাদের ব্যারাকেও কয়েকজন মাউন্টেনিয়ার্স আছেন। তাঁরা তো বলছেন আপনারা দুঃসাহসী।"

"ঠিকই বলেছেন।" প্রাণেশ উত্তর দেয়, "দুঃসাহসী না হলে পর্বতাবোহী হওয়া যায় না। নীলগিরি বম্বে মাউন্টেনিয়ারিং কমিটিকে পরাজিত করেছে, আর্মি টিমকে ফিরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বার বার তিনবার। এবার তাকে হার মানতেই হবে।"

"আপনাদের অভিযান সার্থক হোক। তবে আমি এই ঝড় জলের জন্য ভয় পাচ্ছি।"

"কিন্তু জানেন তো—'জল ভরা মেঘ রয় না চিরকাল'...।"

আমার কথায় বিস্মিত হয় বিকাশ। একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, "চিরকাল বলতে গীতিকার কি বোঝাতে চেয়েছেন জানি না। তবে এই গান অনেকের জীবনেই সত্য নয়।" বিকাশ যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। প্রাণেশও কোন কথা বলছে না। একটা

অস্বস্তিকর নীরবতা। এমন হাসিখুশি লোকটি হঠাৎ এরকম হয়ে গেল কেন?

বলি, "কবিগুরু ও কাজী যার জীবনের আদর্শ, তার কি এমন নৈরাশ্যবাদী হওয়া উচিত?"

"আমি নৈরাশ্যবাদী নই। হলে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতাম না। কিন্তু গানের ঐ কথাটি সবার জীবনে সত্য হয় না। আমার জীবনেও হয় নি।"

আমাদের অনুরোধে বিকাশ শুরু করে—বিকাশের বয়স যখন নয়, ছোট বোন বীথিকার ছয় তখন ওদের মা মারা যান। বাবা একটা মার্চেন্ট অফিসে কাজ করতেন। নটা ছটা ডিউটি করেও ছেলেমেয়ের প্রতি যথেষ্ট নজর ছিল তাঁর। বহু যত্ন ও শ্রমে তিনি মানুষ করেছেন ওদের। গত বছর বি. এ. পাশ করার পর বাবা বীথিকার বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। বিকাশ সে বিয়েতে যেতে পারে নি। সে তখন সবে লেফ্‌টেন্যান্ট হয়েছে, ছুটি পায় নি। ছুটি পেয়েছে এক বছর বাদে গত জুলাই মাসে। তখন বীথিকার বরের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তবে আলাপ জমাবার ফুরসুত পায় নি। বিকাশ ব্যস্ত ছিল নিজেকে নিয়ে—অনীতাকে নিয়ে। আর সবাই ব্যস্ত ছিলেন ওদের দুজনকে নিয়ে।

বাবার অনেক দিনের আশা। শুধু বাবার আশাই বা কেন? বাবার বন্ধু অনিমেষ-বাবুর আশাই কি কম ছিল? তার ছোট মেয়ে অনীতার সঙ্গে বিকাশের ছোটবেলা থেকে জানাশোনা। বীথিকার সহপাঠী, এক পাড়ায় বাস, এক সঙ্গেই বড় হয়েছে দুজনে। যতই বড় হয়েছে, ততই বেশি কারণে অকারণে সময়ে অসময়ে বিকাশ গেছে অনীতাদের বাড়ি, অনীতা এসেছে তাদের বাড়ি। মুচকি হেসেছে বীথিকা, হয়তো বা দুই পিতাও। তবে খুশিই হয়েছেন তাঁরা। অনেকদিনের আশা বন্ধুত্বকে আত্মীয়তায় রূপান্তরিত করবেন।

বিকাশ আর অনীতার আশাই বা কিছু কম ছিল কি? বিকাশ যেবার ফোর্থ ইয়ারে, অনীতা ও বীথিকা সেবার এসে ভর্তি হল কলেজে। বহু কষ্টে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে ওরা বেরিয়ে আসত বাইরে। কফি হাউসের এক কোণে গিয়ে বসত দুজনে। সময় যেত বয়ে, কিন্তু কথা ফুরত না। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠত অনীতা। পাঁচটা বাজে।

বিকাশ ভাবত—পাঁচটা রোজই বাজবে। কিন্তু এমন লগ্ন যে আর আসবে না তাদের জীবনে।

আবার পরক্ষণেই নিজের নৈরাশ্যবাদী মনকে ধিক্কার দিয়ে মনে মনে বলত—এর চেয়েও মধুর লগ্ন আসবে তাদের জীবনে।

কবে? ভাবনার জট জটিল হত, কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর মিলত না।

সে লগ্ন কিন্তু সত্যই এসেছে। তবে অনেক দিন বাদে—প্রায় চার বছর পরে। এর মধ্যে অনেক অদল বদল হয়ে গেছে। বি. এ. পাশ করে বিকাশ কমিশন পেয়ে যোগ দিয়েছে সেনাবাহিনীতে। সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট থেকে লেফটেন্যান্ট হয়েছে। অনীতাও বি. এ. পাশ করেছে। বছরে একবার বিকাশ কলকাতায় গিয়েছে। শুধু গতবছরই ছুটি পায় নি। তবে অনীতা নিয়মিত চিঠি লিখেছে। কিন্তু কথাটা জানায় নি তাকে। বিকাশ জানতেই পারে নি—সেই মধু-লগ্ন হয়েছে সমাগত।

গত জুলাই মাস বিকাশ দু মাসের ছুটি পেয়ে কলকাতায় গেল। পাঠানকোট এক্সপ্রেস শেয়ালদায় থামল। তাড়াহুড়ো করে গাড়ি থেকে নামল। কিন্তু এত তাড়াহুড়োর

প্রয়োজন ছিল না। স্বামীর সঙ্গে বীথিকা একা এসেছে স্টেশনে। অনীতা কোথায়? সে যে তাকে আসতে লিখেছিল। কেন এল না? এমন তো কোনদিন হয় নি। একটা অজানা আশঙ্কায় মনটা কেঁপে ওঠে। তাহলেও বীথিকা ছোট বোন। সঙ্গে নতুন জামাই। হেসেই কথা বলতে হয়।

কিন্তু ধৈর্যের একটা সীমা আছে। ট্যাকশিতে বসে আর কথাটা চেপে রাখতে পারে না সে। সকলের কুশল সংবাদ জানার ছলে একসময় জিজ্ঞেস করে ফেলে ওদের খবর।

বীথিকা যেন আকাশ থেকে পড়ে। নতুন জামাই বেচারা অরুণকে কিন্তু আকাশের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হয়েছে।

বীথিকা পালটা প্রশ্ন করেছে—কেন বিকাশ কি অনীতার চিঠি পায় নি! তারপর বলেছে অনীতা ভাল আছে। আর কাকাবাবু কামীমাকে তো এখন ভাল থাকতেই হবে। আগামী সোমবার যে অনীতার বিয়ে।

কার বিয়ে! নীতার! বিকাশ বিচলিত হয়েছে।

বীথিকা আর গম্ভীর থাকতে পারে নি। বলেছে—ভয় নেই। তার সঙ্গেই অনীতার বিয়ে।

অরুণ আকাশ থেকে দৃষ্টি নামিয়ে বিকাশের দিকে তাকিয়েছে। আর তাকিয়েই নতুন পরিচয়ের ব্যবধান ভুলে হেসে ফেলেছে। বিকাশেরও হাসি ফিরে এসেছে। বুঝতে পেরেছে—বাবা ও কাকাবাবু কথাটা তাকে জানাবার দরকার মনে করেন নি।

সোমবারের তখনও চারদিন বাকি। দিন নয় যুগ—চার যুগ। অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত কাকাবাবু কাকীমার সঙ্গে দেখা করতে বিকাশ একবার ওবাড়ি গিয়েছিল। কিন্তু নিষ্ফল প্রয়াস। অনীতা ছাড়া আর সবার সঙ্গেই দেখা হয়েছে।

অবশেষে সানাই বাজল। এল সেই বহু প্রতীক্ষিত লগ্ন। কত দিন বাদে দেখা। অথচ বিকাশের চোখে চোখ পড়তেই চোখ নামিয়ে নিল অনীতা। এ কি সেই চটুল চপল অনীতা? ওর দৃষ্টিতে এত লজ্জা, এত নম্রতা, এত গভীরতা তো আর কোনদিন দেখে নি বিকাশ। তার হাতের মুঠায় অনীতার একখানি হাত থেকে থেকে কেবলি কেঁপে কেঁপে উঠেছে। এ কম্পন ছিল বহুক্ষণ। ছিল বিয়ে বাড়ির কল-কোলাহল মিলিয়ে যাবার পরেও। বিকাশের বুকে মুখ লুকিয়ে বারে বারে কেঁপে উঠছিল অনীতা—ঝড়ের হাওয়ায় যেমন করে কাঁপতে থাকে রজনীগন্ধার গুচ্ছ। অনীতার মাথায় হাত বুলিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বিকাশ বলেছিল—এতদিনে সেই মধু-লগ্ন এসেছে। লগ্ন যে বৃথা বয়ে যাচ্ছে। তবু অনীতার ভয় যায় নি। বোধহয় তার মনে হয়েছে—সেই আনন্দ, সেই সুখ, সেই পাওয়া—সবই স্বপ্ন। অত তার সইবে না।

অনেক কথা আর হাসি দিয়ে বিকাশ তার ভয় জয় করেছিল। অনীতা আগের মতো উচ্চ কণ্ঠে বলেছিল—সে সব সইতে পারবে, কিন্তু আর তাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না।

বিকাশ বুঝিয়েছে—তার যে ছুটি ফুরোলেই চলে যেতে হবে জোশীমঠ। জোশীমঠ তো ফ্যামিলী স্টেশন নয়।

অনীতা বোঝে নি। বলেছে—না হোক। কত অফিসার নন-ফ্যামিলী স্টেশনে বাড়ি ভাড়া করে ফ্যামিলী নিয়ে থাকেন। তারাও তাঁদের মতো থাকবে। তাছাড়া জোশীমঠ

চমৎকার জায়গা? বদ্রীনাথ খুবই কাছে। সুযোগমত দুজনে একবার বদ্রীনারায়ণকে প্রণাম করে আসবে।

এমনি কত আশা আর কত কল্পনার মাঝে সেই শ্রান্তিহীনা রজনীর মিলন মধুর প্রহরগুলো কোথায় হারিয়ে গেল, টের পেল না ওরা। হঠাৎ কে কড়া নাড়ে। ওরা চুপ করে থাকে। বিকাশ ভাবে—ঠানদি ও শালীর দল রাত না ফুরোতেই হামলা করতে এসেছে। কিন্তু শব্দটা ক্রমেই চলে বেড়ে। আর চুপ করে থাকতে পারে না। কদিন থেকেই বাবার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। তাড়াতাড়ি দরজা খোলে বিকাশ। অরুণ দাঁড়িয়ে আছে। আর সঙ্গে একজন পিয়ন। বিকাশের একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম এসেছে।

সই করে পিয়নের কাছ থেকে খামটা নিয়ে খুলে ফেলে বিকাশ। তার মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। অনীতা উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে—কোন খারাপ খবর কিনা?

নিঃশব্দে বিকাশ কাগজখানি তার হাতে দেয়। অনীতা পড়ে—LEAVE CANCELLED STOP REPORT JOSHIMATH IMMEDIATELY...

কাহিনী শেষ করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে বিকাশ। হয়তো আরও কিছু আশা করেছিলাম, কিংবা আশঙ্কা। কিন্তু আর কিছুই বক্তব্য নেই। তার মানে।

মনে মনে কোথায় যেন একটা ছন্দপতন অনুভব করি। ক্ষণেকের বিরহ। অল্প কিছুদিনের। লড়াই বাধলে হয়তো বিপদ ঘটতে পারে—কিন্তু সে তো একটা সম্ভাবনা মাত্র। তাতে এত বিচলিত হবার কী আছে।

সেই কথাই বলে আসি বিকাশকে। আশ্বাস ও অভয় দিই, উৎসাহিত করি। বলি, "কবিরা ঋষি, সর্বদর্শী। তাঁদের কথা সত্য বলে মনে করবেন। 'জলভরা মেঘ রয় না, রয় না চিরকাল'!"

॥ ১২ ॥

হিস্...স্...স্...। কিসের শব্দ? অজগর নাকি? তাড়াতাড়ি স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসি। অমূল্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। জিজ্ঞেস করি, "কি একটা শব্দ হল?"

"হ্যাঁ, আপনার এয়ার-ম্যাট্রেসের হাওয়া বেরিয়ে গেল।"

"কেমন করে?"

"ছিপি খুলে। কাজটা এগিয়ে রাখলাম আর কি।"

"তার মানে তোমার কীর্তি?"

"পাঁচটা বাজে। ছটার মধ্যেই যে বেরিয়ে পড়তে হবে।"

অমূল্য একা নয়। পিনাকীও ওর দলে! একই উপায়ে ওরা সবাইকে ঘুম থেকে তুলেছে।

আমরা তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিলাম। একটু বাদেই সদলবলে শের সিং এসে হাজির হল। ওকে দেখে প্রাণে বল এল। ভয় ছিল আবার পিপলকোঠির মতো না করে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা মালপত্র নিয়ে রওনা হয়ে গেল। যাবার আগে শৈলেশদা ওদের উপদেশ দিতে ভুললেন না, "বিষ্ণুপ্রয়াগের আগে প্রায় শ খানেক ফুট রাস্তা ধসে গেছে। পিঠ থেকে মাল নামিয়ে খুব সাবধানে খচ্চরগুলোকে পার করবে—অমর সিংকা খচ্চরকা বাত্ ভুলো মাত্।"

এ উপদেশ দেবার অধিকার শৈলেশদার অবশ্যই আছে। রাস্তা ধসে গেছে খবর পেয়ে কাল বিকেলে নিতাইকে নিয়ে তিনি তদন্তে বেরিয়েছিলেন। জরীপ করে ফিরে এসেই অভয় বাণী দিয়েছেন, "যত সব বাজে গুজব। তেমন কিছুই নয়। যাওয়া যাবে।"

ঠিক ছটার সময় আমরা যে যার রুকস্যাক নিয়ে বিড়লা রেস্ট হাউস থেকে বেরিয়ে পড়লাম। এলাম বদ্রীনাথ মন্দির কমিটির ক্যান্টিনে। চা ও পুরী দিয়ে ব্রেকফাস্ট হল। ইতিমধ্যেই ক্যান্টিনের সামনে বেশ ভিড় জমে উঠেছে। জানা অজানা বহু শুভানুধ্যায়ী আমাদের বিদায় জানাতে এসেছেন।

অবশেষে বিদায় নেবার পালা এল। সবার শুভেচ্ছা ও শুভাশীর্বাদ মাথায় নিয়ে আমরা হাসিমুখে বিদায় নিলাম। এ বিদায় চিরবিদায় নয়। আমরা আসব ফিরে। আসব বিজয়-মুকুট মাথায় পরে। ওঁরা আমাদের পথ চেয়ে থাকবেন, আমাদের ফিরে আসার দিন গুনবেন। সেই দিনকে ত্বরান্বিত করতে, আমবা ত্বরিত পদক্ষেপে চলেছি এগিয়ে। চলেছি নীল দুর্গমের দিকে।

এমনি করেই এগিয়ে গিয়েছিলেন শ্রীগুরুদযাল সিং ১৯৫১ সালে, গাড়োয়ালের বিখ্যাত ত্রিশুল (২৩,৩৬০ ফুট) পর্বত শৃঙ্গের দিকে। যদিও তাঁর সঙ্গে রয় ডি. গ্রীনউড নামে একজন ইংরেজ ছিলেন, তাহলেও এই অভিযানই প্রথম ভারতীয় পর্বতাভিযান। অভিযাত্রীদের অপর দুজন হলেন এন. ডি. জয়াল ও সুরেন্দ্রলাল। তাঁরা ২১শে জুন তুষারময় ত্রিশুল শৃঙ্গ জয় করে বিশ্বের পর্বতাবোহণেব ইতিহাসে ভারতের নাম লিপিবদ্ধ করলেন।

১৯৫২ সালে শ্রী পি. এন. নিকোরের নেতৃত্বে চারজনের এক ভারতীয় দল কুমায়ুনের পঞ্চচুলী-২ (২২,৬৫০ ফুট) শৃঙ্গে অভিযান চালিয়ে পরাজিত হন। কিন্তু নিকোরে এই পরাজয় মেনে নিলেন না। পুনরায় নতুন উদ্যমে অভিযান চালিয়ে পরের বছর ২৭শে মে সফলকাম হলেন। এই সাফল্য অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণ। কারণ এব আগে ১৯৫০ ও ১৯৫১ সালে তিন দল বিদেশী অভিযাত্রীকে পঞ্চচুলী পরাজিত করেছে। *

১৯৫৩ সালে ভারতীয় পর্বতারোহণের ইতিহাসে একজন নতুন নেতার নাম লিখিত হল—মেজর এন. ডি. জয়াল। তাঁর নেতৃত্বে গাড়োয়ালের কামেট (২৫,৪৪৭ ফুট) ও আবিগামিন (২৪,১৩০ ফুট) অভিযান পরিচালিত হয়। ১৭ই জুন আবিগামিন বিজিত হল, কিন্তু কামেট রইল অপরাজিত। জয়াল হাল ছাড়লেন না। ১৯৫৫ সালে আবার যাত্রা করলেন। এবারে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হল—একই দিনে (৬ই জুলাই) ঐ দুটি শৃঙ্গ জয় করে তিনি এক নতুন নজির স্থাপন করলেন।

পরের বছর ১২ই জুন শ্রী কেকি বুনশা আবার ত্রিশুল আরোহণ করলেন। একই সময় শ্রী গুরুদয়াল সিং পশ্চিম গাড়োয়ালের মৃগথুনি (২২,৪৯০ ফুট) আরোহণের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু দলের অন্যতম সদস্য শ্রী এন. চক্রবর্তীর আকস্মিক মৃত্যুতে এই

---

* কুমায়ুন হিমালয়ের পাঁচটি দুর্গম শিখর নিয়ে পঞ্চচুলী। আমাদের নেতা অমূল্য সেন গত ৪ঠা জুন (১৯৬৪) পঞ্চচুলী-৩ (২০,১৭০ ফুট) আরোহণ করেছে। এই অভিযানে পঞ্চচুলী-৪ (২০,৭৮০ ফুট) ও পঞ্চচুলী-৫ (২১,১২০ ফুট) শৃঙ্গ দুটিও ভারতীয় পর্বতারোহীরা আরোহণ করে। ফ্লাইট লেঃ এ. কে. চৌধুরী অভিযানের নেতৃত্ব করেন।

অভিযান পরিত্যক্ত হয়। এই বছরই ২৫শে জুলাই মেজর জয়ালের নেতৃত্বে লাদাকের সাকাং (২৪,১৫০ ফুট) শৃঙ্গে ভারতের জাতীয় পতাকা প্রোথিত হল। আমাদের টোপগে সে শিখর-বিজয়ীদের অন্যতম।

তারপরই মেজর জয়ালের সেই বিখ্যাত নন্দাদেবী অভিযান। নন্দাদেবী (২৫,৬৪৫ ফুট) ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। শের সিংয়ের টিলমন্ সাব্ (এইচ. ডবলু. টিলম্যান) ১৯৩৬ সালের ২৯ শে অগাস্ট প্রথম এই শৃঙ্গ আরোহণ করেন। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কবলে পড়ে মাত্র সাড়ে ছয় শ ফুট বাকি থাকতে জয়ালকে নন্দাদেবী থেকে ফিরে আসতে হয়। নীলগিরির মতো নন্দাদেবীও আজও ভারতীয় পর্বতরোহীদের কাছে অপরাজিত। কিন্তু জয়ালের এই গৌরবময় অভিযান চিরকাল আমাদের পরম উৎসাহ ও চরম উদ্দীপনার উৎস হয়ে থাকবে। *

১৯৫৮ সালে তিনটি ভারতীয় অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র কুমারের পরিচালনায় স্থল ও নৌ বাহিনীর একদল অভিযাত্রী তৃতীয়বার ত্রিশুল জয় করেন। শ্রী গুরুদয়াল সিং ১৯ শে জুন তারিখে মৃগথুনি আরোহণ করে পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এ বছরই কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে পূর্ব নেপালের বিখ্যাত শৃঙ্গ চো-উ (২৬,৭৫০ ফুট) অভিযান আয়োজিত হয়। শ্রী কেকি বুনশা এই অভিযানের নেতৃত্ব করেন। ১৫ই মে শ্রী সোনাম গিয়াত্সো ও পাসাং দাওয়া লামার সঙ্গে শ্রী বুনশা এই শিখরে আরোহণ করেন সত্য, কিন্তু তাঁদের বিজয়ের আনন্দ বিষাদের পরশে ম্লান হয়ে যায়। এই অভিযানে ভারত ডালি দিয়েছে তার তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ পর্বতারোহীকে—ভারতের পর্বতারোহণের ইতিহাসে যাঁর নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।

'ইয়ে রাস্তা সির্ফ খালি খচ্চরকে লিয়ে' সাইন বোর্ডটায় নজর পড়তেই চমকে উঠি! বাস্তবে ফিরে আসি। একি কাণ্ড! যে রাস্তা দিয়ে আমরা এতগুলো দ্বিপদ প্রাণী এতক্ষণ ধরে উৎরাই ভেঙেছি, সেই রাস্তা স্রেফ খালি খচ্চরের জন্যে। মাঝে মাঝে হামাগুড়ি দিতে হয়েছে বলে কি আমরা চতুষ্পদ হয়ে গেছি? বীরেন ব্যাপারটা বুঝিয়ে দেয়, "না না, মানুষের যেতে বাধা নেই। রাস্তা খারাপ বলে মাল সমেত খচ্চর যাওয়া নিষেধ। তবে খালি খচ্চর যেতে পারে। তাই এই সাইনবোর্ড।"

কর্তৃপক্ষের ভাষাজ্ঞানকে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা সেই খালি খচ্চরের রাস্তা দিয়েই এগিয়ে চলি।

"বাঁচা গেল। আপাতত উৎরাই শেষ হল।" ডাক্তার হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। আমরা ধৌলীগঙ্গা বা বিষ্ণুগঙ্গার তীরে এসে পৌঁছেছি। সামনেই বিষ্ণুগঙ্গার ওপর ১৩০ ফুট

---

* মেজর জয়ালের স্বপ্ন মিথ্যে হয় নি। গত ২০ শে জুন (১৯৬৪) শ্রী নওয়াং গোম্বু ও শেরপা দা নরবু নন্দাদেবী শিখরে ভারতের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করেছেন। কিন্তু এই অভিযানে আং নিমা নামে একজন শেরপার প্রাণ ডালি দিতে হয়েছে। ক্যাপ্টেন এন. কুমার অভিযানের নেতৃত্ব করেন।

লম্বা লোহার পুল। ফিকে নীল বিষ্ণুগঙ্গা এসে গৈরিক অলকানন্দায় মিলিত হয়েছে। এখানে—এই বিষ্ণুপ্রয়াগে। হিমালয়ের পঞ্চপ্রয়াগের পঞ্চম প্রয়াগ—বিষ্ণুতীর্থ বিষ্ণুপ্রয়াগ।

"এই হচ্ছে সেই গাঁয়ের পথ।" পিনাকী বাঁ দিকের পাহাড়টা দেখিয়ে দেয়, "অবিশ্যি এখান থেকে বেশ দূরে, আর গ্রামটা অনেক উঁচুতে। খুবই চড়াই পথ।"

'সে এক মজার গ্রাম। নামটা মনে নেই পিনাকীর। তবে এমন গ্রাম ভূ-ভারতে আছে বলে জানতাম না। প্রমীলার দেশের কথা পড়েছি। কিন্তু সে দেশেও অর্জুনের প্রয়োজন হয়েছিল। এ গ্রাম নাকি এখনও প্রমীলাবর্জিত। গ্রামের বাসিন্দারা সবাই পুরুষ। আর সকলেই অকৃতদার।

শৈলেশদা এক দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন সেই সংকীর্ণ পথরেখার দিকে। সহসা আপন মনে বলে উঠলেন, "কতবার তো এই পথে গিয়েছি, কিন্তু এমন স্বর্গাদপি গরীয়সী গ্রামের কথা তো কখনও শুনিনি।"

তাহলে কি আমাদের অনুমান মিথ্যে নয়। এই অভিযানে আসা নিয়ে শৈলেশদার সঙ্গে বৌদির সত্যই মনোমালিন্য হয়েছে?

"শুনলে কি করতেন?"

"একবার গিয়ে দর্শন করে আসতাম সেই মহাপুরুষদের।"

আমার সঙ্গে কারও কোন মনোমালিন্য হয় নি তবু আমি ভাবি সেই মহাপুরুষদের কথা। পিনাকী বলেছে—তাঁরা সকলেই মধ্য-বয়সী। শৈলেশদার স্বর্গাদপি গরীয়সী গ্রাম যে কিছুকালের মধ্যেই জনশূন্য হয়ে যাবে।

বিষ্ণুগঙ্গার পুল পেরিয়েই বিষ্ণুমন্দির। মন্দিরের পেছনে সঙ্গম। প্রায় দেড়শ ধাপ সিঁড়ি ভেঙে সঙ্গমের জল স্পর্শ করতে হয়।

এখন সে অবকাশ নেই। কাজেই দেবর্ষি নারদের তপস্যাধন্য বিষ্ণুতীর্থ বিষ্ণুপ্রয়াগকে দূর থেকে প্রণাম করে আমরা এগিয়ে চলি। অনেক চড়াই ভাঙতে হবে। পৌঁছতে হবে গোবিন্দঘাট। এক ঘণ্টা হেঁটে আমরা মাত্র মাইল দুয়েক এগিয়েছি। এতক্ষণ আমাদের একটানা উৎরাই ভেঙে প্রায় ১৭০০ ফুট নেমে আসতে হয়েছে। বিষ্ণুপ্রয়াগের উচ্চতা ৪৫০০ ফুট। এবারে আবার চড়াই। গোবিন্দঘাটের উচ্চতা ৬০০০ ফুট।

এক সময় রওনা দিলেও আর আমরা এক সঙ্গে চলছি না। বীরেন ও প্রাণেশ এগিয়ে গেছে। শৈলেশদাকে নিয়ে পিনাকীও এগিয়ে গেল। উপেনবাবু তাঁর প্রধান সহকারী কারকিকে নিয়ে আসছেন সবার পেছনে। পথের দু ধারে গাছপালা দেখে তিনি লোভ সামলাতে পারেন নি। প্রজাতি সংগ্রহ শুরু করে দিয়েছেন।

গাছ ভালবাসলেও উপেনবাবু গেছো নন। গেছো বলতে বোধ হয় অমূল্যকেই বোঝায়। পথের ধারে একটি বড় গাছে বসে আছে অমূল্য। ফুল পাড়ছে। কার জন্য কে জানে।

অমূল্যকে তাড়াতাড়ি নেমে আসতে বলে এগিয়ে চলি। আবার ভাবতে থাকি মেজর জয়ালের কথা। তাঁর সাফল্যময় সংক্ষিপ্ত জীবন কাহিনী চিরকাল ভারতের পর্বতারোহণের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। শৈশবেই তাঁর অসাধারণ পর্বতপ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে এক সহপাঠীর সঙ্গে মেষপালকদের দুর্গম

পথে ছ সপ্তাহ হেঁটে কোলাই হিমবাহ ও জোজলা গিরিবর্ত (১১,৫৮০ ফুট) পার হয়ে অমরনাথ দর্শন করেন। ১৯৪২ সালে তিনি আর. এল. হোল্ডসওয়ার্থ ও জে.এ.কে. মার্টিনের সঙ্গে আরোয়া হিমবাহে (বদ্রীনাথের ওপরে) ১৯০০০ ফুট উঁচুতে শিবির স্থাপন করেন। ১৯৪৬ সালে জ্যাক গিবসনের বন্দরপুছ (যমুনোত্রীর ওপরে) অভিযানে তেনজিংয়ের সঙ্গে ১৯৪০০ ফুট পর্যন্ত আরোহণ করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র বিশ বছর। এই বছরই তিনি আর্মি কমিশন পান। তিনি একজন প্যারাশুটিস্ট ও ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। ১৯৪৯ সালে তিনি গুলমার্গের আর্মি স্কী স্কুলের শিক্ষক ও পরে প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৯৫১ সালে তিনি মেজর পদে উন্নীত হন ও ফরাসী অভিযাত্রীদের সঙ্গে নন্দাদেবী অভিযানে ২২০০০ ফুট পর্যন্ত আরোহণ করেন। পরের বছর তিনি বেঙ্গল স্যাপার্সের কামেট অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন। ১৯৫৩ সালে কামেট ও আবিগামিন অভিযানের নেতৃত্ব করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি দার্জিলিং হিমালয়ান ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কর্মভার গ্রহণের আগে, সুইস ফাউন্ডেশান ফর অ্যাল্পাইন রিসার্চের আমন্ত্রণে তেনজিং ও কয়েকজন শেরপা সহ সুইজারল্যান্ডে যান। সেখানে ট্রেনিং কোর্স (Aiguilles du Tour) এবং রক ক্লাইম্বিং কোর্স (Rosenlaui) পাশ করে তিনি গাইডস ডিপ্লোমা ও ব্যাজ পেলেন। তিনিই প্রথম বিদেশী যাঁকে এই সুদুর্লভ সম্মানে ভূষিত করা হয়। পরের বছর কামেট ও আবিগামিন বিজয়ের পরে তিনি অ্যাল্পাইন ক্লাবের সভ্য নির্বাচিত হন এবং বিলেতে সফর করে আসেন। ১৯৫৬ সালে সাকাং জয় করেন। পরের বছর তিনি অস্ট্রিয়া থেকে স্কী টিচার্স কোর্স পাশ করেন ও নন্দাদেবী অভিযানে নেতৃত্ব করেন।

তারপর ১৯৫৮। মেজর জয়াল চো-উ অভিযানে অংশ গ্রহণ করার আমন্ত্রণ পেলেন। পেলেন একেবারে শেষ সময়। তিনি ছুটে চললেন মুল শিবিরে। মাত্র একদিন সেখানে বিশ্রাম নিয়ে, জলবায়ু সহ্য হবার আগেই ১৮০০০ ফুট উঁচুতে হিমবাহের ওপর স্থাপিত এক নম্বর শিবিরে রওনা হলেন। বেপরোয়া না হলে পর্বতাভিযাত্রী হওয়া যায় না। সে দিক থেকে তিনি হয়তো কোন অপরাধ করেন নি। কিন্তু প্রকৃতি এই বেপরোয়া বীরকে বরদাস্ত করতে পারল না। এক নম্বর শিবিরে পৌঁছেই তিনি নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলেন। সহযাত্রীরা তাঁকে নিচে নিয়ে যেতে চাইলেন। কিন্তু অভিজ্ঞ পর্বতারোহী বুঝতে পেরেছিলেন তাঁর সময় ফুরিয়ে এসেছে। তিনি তাঁদের নিরস্ত করলেন। বললেন—আমাকে এখানেই থাকতে দাও। নইলে আমি চো-উ'কে দেখতে পাব না। আমি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলে তোমরা এখানেই আমাকে কবর দিয়ো। তারপর ঐ সুদুর্গম গিরিশৃঙ্গ জয় করে নিরাপদে ঘরে ফিরে যেয়ো। তিনি তাকিয়ে রইলেন সেই অচল অটল ও উদ্ধত পর্বতশৃঙ্গের দিকে। তাঁর অন্তিম মুহূর্ত ঘনিয়ে এল। তিনি ক্ষীণ কণ্ঠে কি যেন বললেন—বোধহয় আশীর্বাদ করলেন সর্বকালের সকল পর্বতারোহীকে—'May (you) climb from peak to peak.'

চো-উ বিজিত হল। তবে ভারতীয় পর্বতারোহণের জনক মেজর এন. ডি. জয়ালের অকাল মৃত্যুতে ঐ অভিযানে ভারতের যে ক্ষতি হয়েছে, তা আজও পূরণ হয় নি। কোনদিন হবে কি না কে জানে?

কিন্তু জয়াল মৃত্যুহীন। তাঁর অন্তিম মুহূর্তের বাণীকে আমরা সার্থক করে তুলব। তাঁর মৃত্যুর পরে আজ পর্যন্ত চোদ্দটি পর্বত শিখর আমাদের কাছে মাথা নত করেছে।

দুবার এভারেস্ট অভিযান হয়েছে এবং বিশ্বের এই উচ্চতম শিখর মাত্র ৩০০ ফুটের জন্য ভারতীয় পর্বতারোহীদের ফিরিয়ে দিয়েছে।

॥ ১৩ ॥

"মাছের ফ্রাই! আহা, কতদিন খাই নি, গোবিন্দঘাটে মাছ পাওয়া যায় বুঝি।" নিতাইয়ের জিভে জল এসে গেছে।

আমরা ঘাট চটিতে একটি চায়ের দোকানের সামনে এসে বসেছি। নিতাই বেশ কিছুক্ষণ থেকেই খাই খাই করছিল। সুযোগ পেয়ে নিরাপদ বলেছিল "এখন তো চা আর পকোড়া খেয়ে নে। এর পর দেখ না গোবিন্দঘাটে গিয়ে কি হয়।"

"কী?"

"সে এক এলাহি ব্যাপার। তাই তো পিনাকীদা আগে আগে চলে গেলেন। খিচুড়ি আলুর ঝোল মাছির ফ্রাই..." উত্তেজিত নিতাই মাছিকে মাছ শুনে লুব্ধ হয়েছে। তার জিভে জল এসে গেছে।

নিরাপদ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় না। উদাস দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকিয়ে নিতাইয়ের থালা থেকে বেশ কয়েকখানা পাকোড়া তুলে নিয়ে ধীরে সুস্থে জানায়, "গোবিন্দঘাটে কেন? দেখছিস না, এখানেও কত রয়েছে? চারিদিকে ভন্ ভন্ করছে?"

নিতাই সত্যি সত্যিই চারদিক দেখে নেয়। তারপর রেগে গিয়ে বলে, "কোথায় মাছ?"

"আমি তো মাছ বলি নি।"

"তবে কি বলেছিস?"

"মাছি।"

কোন আবহাওয়া বিশারদ আমাদের সঙ্গে নেই, তবুও ভেবেছিলাম বৃষ্টি বন্ধ হবে। প্রকৃতির ওপর মানুষের কোন হাত নেই জানি। কিন্তু ভগবান প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তিনি এই শুভ প্রচেষ্টায় আমাদের সহায় হবেন—এ বিশ্বাস ছিল বলেই আমরা জোশীমঠ থেকে গোবিন্দঘাট যাত্রা করেছি। কিন্তু বৃষ্টি একেবারে বন্ধ হয় নি। ঝির-ঝির ধারায় মাঝেমাঝেই বর্ষণ চলেছে। পিচ্ছিল পথ। কিছুক্ষণ আগেই একটা ঝরনা পেরোতে হিমশিম খেতে হয়েছে। অতি সন্তর্পণে পাহাড়ের গা বেয়ে এগিয়ে চলেছি। সেই মালবাহী খচ্চরের অতলসমাধির কথা এখনও আমাদের সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে আছে। হয়তো বা ভগবানই আমাদের প্রতি বিরূপ হয়ে প্রকৃতির এই অন্যায় অত্যাচারকে বরদাস্ত করছেন। কিন্তু কেন? আমরা তো কোন পাপ করি নি।

পাপ না করলেও অনেক সময় প্রায়শ্চিত্ত অপরিহার্য হয়ে পড়ে। অন্তত শের সিং এতক্ষণ ধরে তাই বোঝাতে চাইছে। বহু অভিযানে অংশ নিয়েছে সে। অভিজ্ঞ শের সিং প্রস্তাব করে, "প্রকৃতির এই অন্যায় অসহযোগিতা থেকে ত্রাণ পাবার একটি মাত্র উপায় আছে।"

আমরা চলা বন্ধ করে তার দিকে তাকালাম। শের সিং বলল, "লাটুদেবীর পুজো দিলে তিনি সদয়া হয়ে প্রকৃতিকে শায়েস্তা করবেন। মানা ও আগের নীলগিরি অভিযাত্রী দল তাঁর পুজো দিয়ে যথেষ্ট সুফল পেয়েছিলেন।

আমরা শের সিং-এর প্রস্তাবে রাজী হলাম। সে জানাল, "পুজো দিতে একটি পাঁঠা অর্থাৎ অন্তত পঞ্চাশটি টাকার দরকার।'

সামান্য পুঁজি সম্বল করে আমরা এই দুঃসাহসিক অভিযান শুরু করেছি। ইতিমধ্যেই হিসেবের বেশি খরচ হয়ে গেছে। তবু এই বিরক্তিকর বর্ষণের হাত থেকে রেহাই পেতে আমরা পঞ্চাশ টাকা খরচ করতে প্রস্তুত। ঠিক হল, পথে ভুইন্দার গাঁয়ে পাঁঠা কিনে ঘাংরিয়ায় এই পুজোপার্বনের পালা সাঙ্গ করা হবে।

ভারি সুন্দর গোবিন্দঘাটের শিখ গুরুদ্বারটি। সবুজ গম্বুজটা বহুদূর থেকে দেখা যায়। অলকানন্দার তীরে একখানি একতলা বাড়ি। সামনে মরশুমী ফুলের বাগান। চারিদিকের পাহাড়ে অসংখ্য ছোট ছোট ঝরনা। যেন রুপোর গহনা গায়ে হাস্যময়ী প্রকৃতি আমাদের দেখছে—কাছে ডাকছে। তাই তো আমরা এসেছি ছুটে—চলেছি নীলগিরির শুভ্র-শীতল স্বপ্ন-শিখরে।

ভুইন্দার গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম ছাড়িয়ে আমরা গোবিন্দঘাটে পৌঁছলাম। জোশীমঠ থেকে সাত মাইল এগিয়েছি। আজ ৩০শে সেপ্টেম্বর। এখন বেলা প্রায় দুটো। ঘাটচটি ও পাণ্ডুকেশ্বরের ঠিক মাঝখানে কয়েক বছর আগে গড়ে উঠেছে এই গোবিন্দঘাট। শিখগুরু গোবিন্দ সিংয়ের নামে এর নাম। লোকপালগামী শিখ তীর্থযাত্রীদের প্রয়োজনে তৈরি হয়েছে গুরুদ্বার।

সরকারি ডাকবাংলোটিও ছবির মতো। চারিদিকে সুন্দর বাগান। বাংলোর গা ঘেঁসে চলে গেছে একটি আঁকাবাঁকা পথ—মহাপ্রস্থানের পথ। বদ্রীনাথ আরও বারো মাইল। এখান থেকেই আমাদের পথ পৃথক হয়ে গেল। আমরা যাব অলকানন্দার ঐ ঝুলা পেরিয়ে, দুর্গমতর চড়াই পথ দিয়ে ঘাংরিয়া। লোকপাল ও নন্দনকানন পথের জংশন। এখান থেকে সাত মাইল।

আজ থেকে আমাদের হাঁড়ি চড়বে। হাঁড়ি নয় ডেক্‌চি। আজ থেকে আমাদের স্বপাক শুরু। আং ছুতার রান্না চড়িয়েছে। ওর জুতো সেলাই দেখেছি। এখন দেখা যাক কেমন রান্না করে?

১লা অক্টোবর। আজ আমাদের সারাদিন চড়াই ভাঙতে হবে। গোবিন্দঘাট থেকে ঘাংরিয়া। সাত মাইলে ৪০৮৬ ফুট ওপরে উঠতে হবে। গোবিন্দঘাট ডাক-বাংলোর নিচেই চেক-পোস্ট। সেখানে আমাদের ইনার লাইন পারমিট দেখাতে হল। তারপরে শিখ গুরুদ্বার। গুরুদ্বারের সামনে জশবীর সিংয়ের সঙ্গে দেখা। আমাদের জন্য কুলি যোগাড় করতে পারেন নি বলে তিনি খুবই লজ্জিত। তাহলেও আমাদের বিদায় জানাতে হালুয়া প্রসাদ হাতে নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন। জশবীর সিং এই গুরুদ্বারের সেবক। গুরুদ্বার ছাড়িয়েই অলকানন্দার ঝুলা। ঝুলা ছাড়িয়েই চড়াই শুরু। মরণ-পণ লড়াই করে এই চড়াই পেরোতে হয়। কিন্তু পথটি বড়ই সুন্দর। ভুইন্দারগঙ্গা বা লক্ষ্মণগঙ্গার তীর দিয়ে

পথ? এ নদীটি নন্দনকানন থেকে এসেছে। এরই উৎসের কাছাকাছি কোথাও আমরা বেস-ক্যাম্প ফেলব।

একি? শের সিং কাদের বাপান্ত করছে? যারা এই শীতে শেষ রাতে উঠে সবার আগে বেরিয়ে গেছে, তাদের কী? কিন্তু কেন? জিজ্ঞেস করতে শের সিং আরও ক্ষেপে যায়। বলে, "ওরা কি সাধে সাত সকালে বেরিয়ে পড়েছে? সব মেহনত চুরির ফিকির। অল্প মাল নিয়ে এগিয়ে গেছে। কিন্তু আমিও দেখে নেব। ম্যায় শের সিং সাব্।"

মেহনত চোরদের দেখে নেবার জন্য শের সিং জোর-কদমে এগিয়ে যায়।

দেড় মাইল এসে একটি গ্রাম—নাম পুনগাঁও। মাঝারি আকৃতির পাহাড়ী জনপদ। গোটা পঁচিশেক বাড়ি। লোকসংখ্যাও সামান্য—মাত্র দুশ পঞ্চাশ জন। বাড়িগুলো শহরের মতো ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে নেই। বেশ দূরে দূরে একে অন্যের স্পর্শ বাঁচিয়ে যে যার মনে চুপচাপ বসে আছে। টিন, কাঠ ও স্লেট পাথরে তৈরি। প্রায় সব বাড়ির চালেই লাউ-কুমড়োর লতা। গ্রামবাসীরা শীতের ন মাস এখানে বাস করেন। গ্রীষ্মের তিন মাস অনেকেই চলে যান আরও ওপরে—প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে, ভুইন্দার গ্রামে। সেখানেও তাঁদের বাড়ি-ঘর আছে, জমি-জমা আছে। সে-সব জমিতে শুধু গ্রীষ্মকালেই চাষ-আবাদ হয়। ওঁরা চাষ করতেই যান। পুনগাঁও-এর জমিতে বছরে দু বার ফসল ফলে। তাই সবাই ভুইন্দার যেতে পারেন না। কিছু লোক এখনও এখানে আছেন—এখনও ওঁদের গ্রীষ্মকাল। আর আছে কুকুর—অসংখ্য ভুটিয়া কুকুর এ-পথে। আমরা নেহাত সংখ্যায় অনেক বলেই ওরা আমাদের আক্রমণ করছে না। দূরে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি করছে। অত্যন্ত হিংস্র, শক্তিশালী ও প্রভুভক্ত এরা। এখন অধিকাংশ বাসিন্দারা ভুইন্দারে। ভালুকের হাত থেকে গ্রামের গরু ভেড়া ও শিশুদের রক্ষা করার ভার এখন ওদের ওপর। ভালুকের বড় অত্যাচার এ অঞ্চলে। এবারে নাকি অত্যাচারটা আরও বেড়েছে। কয়েকদিন আগে ভেড়া মেরেছে, পথচারীকে আহত করেছে। তাই গ্রামের মোড়ল শিকারীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। গ্রামের মোড়লকে বলে—মালগুজারদার। সবাই তাঁর কথা শোনে। তিনিও সব সময় সবার মঙ্গল চিন্তা করেন।

সাহসী ও শান্ত এখানকার আদিবাসীরা। খুব অতিথি-বৎসল এঁরা। গ্রামে অতিথিদের জন্য আলাদা একটি বাড়ি আছে। সেই বাড়িটিই সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে ভাল। এঁরা বলেন—পঞ্চায়েত ঘর। এখন অনেক বাড়িই বন্ধ। কিন্তু পঞ্চায়েত ঘর খোলা আছে। রক্ষণাবেক্ষণের লোকও আছে। টিনের চাল, কাঠের দেওয়াল ও মেঝে। মেঝেতে শুকনো ঘাস বিছিয়ে রাখা হয়েছে। ঐ ঘাসের ওপরে বিছানা পাতলে বেশ গরম লাগে। এখানে ভুইন্দার থেকে শীত কম হলেও শীত নেই বলা চলে না। উঁচু যে প্রায় ৭০০০ ফুট। শীতকালে এখানেও বরফ পড়ে।

অরূপকৃষ্ণ নামে একজন উচ্চশিক্ষিত বাঙালী সন্ন্যাসী প্রায় ন বছর এখানে আছেন। গ্রামের সবাই তাঁকে ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। সারা জীবন হিমালয়ে ঘুরেও গিরিরাজের প্রতি তাঁর আকর্ষণ কমে নি। বরং হিমালয়কে ভালবেসে তিনি হিমালয়ের ছেলে-মেয়েদেরও ভালবেসে ফেলেছেন। তাঁদের সেবা করাই এই উনসত্তর বছরের

সন্ন্যাসীর একমাত্র সাধনা। পুনগাঁও পাণ্ডুকেশ্বর পোস্ট অফিসের অধীনে। স্বামীজী চেষ্টা করেছেন এখানে একটি পোস্ট অফিস প্রতিষ্ঠা করতে। আশাকরি অদূর ভবিষ্যতে তাঁরই প্রচেষ্টা সফল হবে।

এখানকার প্রধান ফসল আলু ও রামদানা বা ফলারী—ডাঁটার বীজের মতো এক রকম রঙীন শস্য। ফলারী দিয়ে লাড্ডু তৈরি হয়। খেতে নাকি খুব ভাল। খেলে শরীর বেশ গরম হয়। বলা তো যায় না—হয়তো দিল্লীকা লাড্ডুর মতো খেলেও পস্তাতে হবে, না খেলেও পস্তাতে হবে। তার চেয়ে খেয়ে পস্তানোই ভাল।

চঞ্চলকে বললাম—"লাড্ডু খাব।"

ম্যানেজার চঞ্চলেরও লাড্ডু ম্যানেজ করতে কোন আপত্তি নেই। সে এগিয়ে গেল লাড্ডুওয়ালার দিকে। কিন্তু হায় অদৃষ্ট! কোথা থেকে ডাক্তার ছুটে এসে ধমক দিয়ে বলল, "তোমরা দেখছি একটা বিপদ না বাধিয়ে ছাড়বে না।"

চুপ করে থাকি। ডাক্তার আবার বলে, "ও লাড্ডু খেলে আর নীলগিরি যেতে হবে না, জোশীমঠের মিলিটারি হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে ধুঁকতে হবে।"

অতএব আর বাক্যব্যয় না করে সেখান থেকে চম্পট দিলাম। শুধু আমি ও চঞ্চলই নয়—লাড্ডুর লোভে অমূল্য প্রাণেশ নিতাই নিরাপদ এমন কি ছাপ্পান্ন বছরের শৈলেশদা পর্যন্ত আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ডাক্তার কিন্তু সেখান থেকে নড়ল না। সবাই লাড্ডুওয়ালাকে ছাড়িয়ে আসার পরে সে সব শেষে রওনা হল ভুইন্দারের পথে। খাবার ব্যাপারে ডাক্তার কাউকে বিশ্বাস করে না। কর্তব্যপরায়ণ চিকিৎসক।

অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে পথ। উইলো ওক ও আখরোট বনের মধ্যে দিয়ে আমরা নীরবে এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ কানে আসে, "আপলোক আগয়ে। বৈঠিয়ে।"

তাকিয়ে দেখি একটা ঝরনার ধারে ছোট একখানি ঝুপড়ি—চা দুধ ও পকোড়ার দোকান। দোকানদার আমাদের ডাকছে। ডাক্তারের ভয়ে এগোতে সাহস পাই না। কিন্তু একি কাণ্ড! ডাক্তারই যে গিয়ে দোকানের সামনে বসে পড়ল। আমরা পুলকিত হলাম।

দোকানী জানায় সে আমাদেরই জন্য দোকান খুলে রেখেছে। চৌধুরীদা কাল ঘাংরিয়া যাবার পথে ওকে আমাদের কথা বলে গেছেন। তাই ও সেই বাহাত্তর জন তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে নেমে না গিয়ে আমাদের পথ চেয়ে বসেছিল। আমরাই ওর এ বছরের শেষ খদ্দের।

চৌধুরীদা একা বেরিয়েছেন। একাই পথ চলছেন। কিন্তু আমাদের প্রতি সব সময়েই তাঁর সজাগ দৃষ্টি।

চা খেয়ে চাঙ্গা হয়ে আবার শুরু হল পথ চলা। আগের মতই অন্ধকার স্যাঁতস্যাঁতে পথ।

বেশ ঘন জঙ্গল। স্থানীয়রা বলেন—ভালুকের জঙ্গল। আসল নাম—বাগডোর। দল বেঁধে ছাড়া কেউ চলে না এ পথে। উপেনবাবু জঙ্গল পেয়ে মহা খুশি। এতক্ষণ তিনি আমাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে এগোচ্ছিলেন। এবারে সহকারীদের নিয়ে কাজ শুরু করে দিলেন। ভালুকের ভয় ভুলে ওপরে উঠে প্রজাতি সংগ্রহ করছেন উপেনবাবু।

চীরগাছের আশেপাশে পথের দু ধারে বিচুটি আব তামাক পাতার ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে অসংখ্য স্যান্টোনাইন, জংলী গোলাপ, আইভি, অর্কিড ও রডোডেনড্রন গুচ্ছ আর অজস্র ঝরনা। একটি শেষ না হতেই আর একটি। শুধু এখানেই নয়। লক্ষ্মণগঙ্গার ওপারেও পাহাড়ের গা বেয়ে ঝির ঝির ধারায় ঝরছে শাশ্বতকালের সংখ্যাতীত সুন্দরী ঝরনা।

'ইয়ে ঘণ্টা বাবু হরিদত্ত ওভারশিয়ার
কুমায়ুনওয়ালানে চড়হায়া...।'

বাবু হরিদত্ত এখন কোথায় আছেন জানি না। কিন্তু তাঁর ঘণ্টাটি আর অক্ষত নেই। আমরা একটি মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি—লক্ষ্মণের মন্দির। জায়গাটি বেশ মনোরম। পেছনে একটি পাহাড়ী নদী। স্থানীয়রা বলেন—কর্ণগঙ্গা। শের সিং জানাল—একটু বাদেই ভুইন্দার গ্রাম। সেখানে কর্ণগঙ্গা গিয়ে ভুইন্দারগঙ্গায় মিশেছে। কর্ণগঙ্গা এসেছে কাকভূষণ্ডী হ্রদ থেকে। সেখানে পুরাণের সেই অমর কাকটির দেখা মেলে কিনা জানি না, কিন্তু হ্রদটি নাকি অপরূপ। অনেকেই দেখতে যেতে চান। তবে এ পথে নয়। তাঁরা যান বিষ্ণুপ্রয়াগের পরের চটি ঝারকুলা থেকে। খুবই কঠিন পাকদণ্ডী। অধিকাংশ যাত্রীরাই পথকষ্টে কাতর হয়ে ফিরে আসেন। অথচ এই কর্ণগঙ্গার তীর দিয়ে গেলে যাওয়া নাকি অসম্ভব নয়। এ পথেই যাওয়া উচিত। কাকভূষণ্ডী কত সুন্দর জানি না, কিন্তু কর্ণগঙ্গা অনিন্দ্যসুন্দর। বীরেন তো মুগ্ধ-বিস্ময়ে তাকিয়ে রয়েছে ঐ দিকে। কাছে যেতে বলল, "দেখ একটি চঞ্চলা চপলা কিশোরী উচ্ছল আবেগে নূপুর বাজিয়ে চলেছে কোন্ এক অদৃশ্যলোকে।"

একটু বাদেই ভুইন্দার। কর্ণগঙ্গা ও ভুইন্দাবগঙ্গার সঙ্গমে ছোট একটা পাহাড়ী গ্রাম।

ঘোড়া দেখেই খোঁড়া। দোকান পেয়েই সবার গলা শুকিয়ে গেল। ডাক্তার এখনও পেছনে। এই ফাঁকে বসে পড়া যাক। কখন তার কি মতি হবে, কিছুই বলা যায় না।

নাঃ, ডাক্তার আর কোন ঝামেলা করল না। সেও এসে ঠেলেঠুলে আমাদের মধ্যে জায়গা করে নিল। কিন্তু ভগবান তার অদৃষ্টে বিশ্রাম লেখেন নি। ফলরীর লাড্ডু না খেতে দেবার ফল তাকে হাতে হাতে পেতে হল। দোকানীর অনুরোধে ডাক্তার তার অন্দরমহলে প্রবেশ করে। দোকানীর স্ত্রী খুব অসুস্থ। তাকে দেখা শেষ করে আসতে না আসতেই দোকানের সামনে ভিড় জমে উঠল। রোগীর ভিড়। ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে।

দেবীদাস কিন্তু ইতিমধ্যে বেশ জমিয়ে নিয়েছে। কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড়ী ছেলে-মেয়ে উৎসুক নয়নে আমাদের চারিদিকে ঘুর ঘুর করছিল। তাদের সঙ্গে খাতির জমিয়ে দেবীদাস নাচছে আর গাইছে—

'পতি টিপো, পতি টিপো বহিনি,
কি ভয়?
জ্বর ভয়।
তাওয়া ঢিল না গর।'

আর সকলে তালে তালে হাততালি দিয়ে কনসার্টের কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। আমরাও কনসার্ট দলে যোগ দিলাম।

ভুইন্দারের বাড়ি-ঘর পুনগাঁওয়ের মতো ছাড়াছাড়ি করে দাঁড়িয়ে নেই। এক

জায়গায় জড়াজড়ি করে বসে আছে। বাড়িও কম। জায়গাটিও ছোট। গ্রামের শেষে দোতলা পঞ্চায়েত-ঘর।

ভুইন্দারের পরেই লক্ষ্মণগঙ্গা পেরোতে হল। পেরিয়েই শুরু হল মারাত্মক রকম চড়াই। শাল দেওদার ও চীরগাছের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পথ।

ভুইন্দারের পর থেকেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়েছে। চারিদিকের দৃশ্য আমাদের আলাদা করে দিয়েছে। যে যেখানে ইচ্ছা দাঁড়িয়ে প্রকৃতির অপূর্ব লীলা দেখছে, ছবি নিচ্ছে, গান গাইছে আর আপন মনে পথ চলছে। এক সময় দেখলাম আমি ও অমূল্য শুধু রয়েছি, আর সকলে চলে গেছে দৃষ্টির আড়ালে।

হঠাৎ কোথা থেকে কতকগুলো কালো মেঘ ছুটে এল আমাদের মাথার ওপরে। চারদিকের সব আলো মিলিয়ে গেল, নেমে এল আঁধার। শুরু হল শিলাবৃষ্টি। দূরের ঝরনা অদৃশ্য হল। কাছের ঝরনার শব্দ হারিয়ে গেল বৃষ্টির গর্জনে। আমরা একটা গাছের নীচে এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু এ তো আর বটগাছ নয় যে বর্ষাতির কাজ করবে। একটু বাদেই গাছের ছোট ছোট পাতার ফাঁক দিয়ে জল পড়তে শুরু করল। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে থাকলাম। বৃষ্টি তো রোজই হচ্ছে। বর্ষাতিগুলো ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হয় নি। সে যাই হোক এখন উপায় কি? শীতে যে হু হু করে কাঁপছি। অমূল্য বলে. "চলুন দৌড়নো যাক।"

নেতার আদেশে বৃষ্টি মাথায় করে ছুটে চললাম পিচ্ছিল পাহাড়ী পথ দিয়ে। হঠাৎ দেখতে পেলাম একখানি পাথর কাত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে—অনেকটা গুহার মতো। ঢুকে পড়লাম সেখানে।

কিছুক্ষণ বাদে দেখি ছাতা মাথায় শের সিং এসে দাঁড়িয়েছে গুহার সামনে। কর্তব্যনিষ্ঠ মেট হেসে বলে, "এইখানে এসে একটু দাঁড়ান, দেখবেন আপনারা ডাকবাংলোর সামনে বসেই বৃষ্টিতে ভিজছেন।"

বেরিয়ে এলাম। আরে! সত্যই তো। ঐ যে ঘন জঙ্গলের মধ্যে একখানি বাড়ি—ঘাংরিয়া ফরেস্ট ডাক-বাংলো।

॥ ১৪ ॥

বরাত জোরে দু জন বেশি কুলি পাওয়া গেল। জোশীমঠে যে পনেরোজন যোগাড় করতে পেরেছি, তাদেরই শুধু আমাদের সঙ্গে ওপরে যাবার কথা। পিপলকোঠির কুলি ও খচ্চরওয়ালারা মালপত্র সব নামিয়ে দিয়ে, পাওনা গণ্ডা বুঝে নিয়ে, পুরনো ধর্মশালায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। ওদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক শেষ। কাল ওরা ঘরে ফিরে যাবে।

দুজন কিন্তু ঘরের ডাকে সাড়া দেয় নি। অমর সিং ও পান সিং। পাওনাগণ্ডা মিটিয়ে দেবার পরেও ওরা যে যেখানে ছিল, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অমর বলল, "আমরাও আপনাদের সঙ্গে যাব।"

একি শুধুই ভদ্রতা? আমরা ওর মৃত খচ্চরের দাম দিয়েছি। অমর আবার বলে, "আমরা আপনাদের মাল বইব। শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকব।"

খুশি হয় শের সিং। খুশি হই আমরা। ওরা খুশি মনে গিয়ে কাজে লাগে। ভাবি,

মানুষের কৃতজ্ঞতা বোধ তাহলে এখনও একেবারে মুছে যায় নি। শহরে যা আভিধানিক, এখানে তা ব্যবহারিক।

ঘাংরিয়ার কোন স্থায়ী বাসিন্দা নেই। ডাক-বাংলোর চৌকিদারও ভুইন্দারের লোক। আর এই গুরুদ্বারের চৌকিদার তো তার মাল বেঁধে ফেলেছে। আমরা রওনা হলেই সেও গোবিন্দঘাট রওনা হবে। এমন কি এখানকার ভালুকরাও কদিন পরে বাগডোরে নেমে যাবে।

ঘাংরিয়া একটি ছোট সমতল উপত্যকা। উচ্চতা ১০০৮৬ ফুট। এখানে বনবিভাগের ডাক-বাংলো ও শিখ গুরুদ্বার আছে। ডাক-বাংলোর একখানি ঘরে কাল থেকে চৌধুরীদা ঠাঁই নিয়েছেন। বাকি ঘরখানা তিনি আমাদের জন্যে ঠিক করে রেখেছেন। চৌকিদারের কাছ থেকে খবর পেয়েছি, চৌধুরীদা আজ সকালে লোকপাল-হেমকুণ্ড দর্শনে গেছেন। গুরুদ্বারেও আমরা একখানি ঘর নিয়েছি। এখানেই আমাদের হেড কোয়ার্টার্স। রান্নার ব্যবস্থা করে পিনাকী মালপত্রের তদারকি করছে।

হন্তদন্ত হয়ে অমূল্য ছুটে এল, "সর্বনাশ হয়ে গেছে।"

"কি হল?" এই তো ঘণ্টাখানেক আগে ওরা দিল্ খুলে আড্ডা দেবার লোভে ডাক-বাংলোয় সটকে পড়েছিল। এর মধ্যে আবার কি সর্বনাশ হল? আমরা ওর দিকে তাকিয়ে থাকি।

অমূল্য বলে, "চৌধুরীদা এখনও ফিরে আসেন নি।"

"সে কি? সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এখনও ফিরে এলেন না।" চিন্তিত হই।

"একটু এগিয়ে দেখলে কেমন হয়?"

"দেখতে হবে।" বীরেন ও অমূল্যের সঙ্গে টর্চ ও আইস এক্স নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। অন্ধকার রাত। টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ভূজ আর পাইন বনের মধ্য দিয়ে পিচ্ছিল পথ। অতিকায় পাথরে বোঝাই। টর্চের আলোয় যেন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। আমরা হোঁচট খেতে খেতে নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছি। কোথায় চলেছি জানি না।

আলেয়া নয় তো? হয় তো তাই! নইলে আলোটা মিলিয়ে গেল কেন? নাঃ চোখের ভুল নয়। অমূল্যও দেখেছে। আমরা এগিয়ে চলি। ঐ যে আবার সেই আলো। না, এ তো আলেয়া নয়। মানুষ। টর্চের আলো। আমরা টর্চ নাড়তে থাকি। ছুটে চলি। কাছে আসি। হ্যাঁ, চৌধুরীদা। কিন্তু উনি ওরকম টলছেন কেন? আমরা তাঁকে একটা পাথরের ওপর বসিয়ে দিই। কুলিটিও বসে পড়ে। ওরা সত্যিই অবসন্ন। কিছুক্ষণ বাদে চৌধুরীদা আবার যে কে সেই, "আমি গিছলাম। দেখে এলাম। অপূর্ব। আমার জীবন সার্থক। কোনদিন ভাবতেও পারি নি, আমি পারব। বুঝলে অমূল্য? আমি পেরেছি।"

"এবারে আস্তে আস্তে চলুন। ডাক-বাংলোয় গিয়ে বিশ্রাম করবেন। শুনেছি এ জায়গাটা নাকি ভাল নয়।" অমূল্য বলে।

"খাক অমূল্য। এখন আমাকে ভালুকে খাক। বাঁচার আর ইচ্ছে নেই।"

আমরা বিস্মিত হই। কি বলছেন চৌধুরীদা?

"আর আমার বাঁচার ইচ্ছে নেই। সুখের পর দুঃখ। হাসির পর কান্না। আনন্দের পর নিরানন্দ। এই তো জগতের নিয়ম। আজ যে আনন্দ পেয়েছি তার তুলনা নেই। এর পর আর দুঃখ পেতে চাই না।"

"আচ্ছা যে আপনাকে দুঃখ দেয় তাকে আমরা দেখে নেব'খন। এখন তো ডাক-বাংলোয় চলুন।" এক রকম জোর করেই অমূল্য তাঁকে টেনে নিয়ে চলে।

আর চৌধুরীদা বার বার বলতে থাকেন, "কী হবে কলকাতায় ফিরে গিয়ে? বাঁচার আর আমার ইচ্ছে নেই।"

চৌধুরীদাকে ডাক-বাংলোয় রেখে আমরা ফিরে এলাম গুরুদ্বারে। এসে দেখি থালা পড়েছে। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকল। বেশ শীত শীত করছে। করবেই তো। অক্টোবর মাস। চারিদিকে পাহাড়। তাহলেও আমরা গৃহতলে রাত্রিবাস করছি। এর পরেই তাঁবু-জীবন। নিরাপদ নিতাই চঞ্চল টোপগে ও ছান্দুকে নিয়ে ভানু কাল সকালে মূল-শিবির বা বেস ক্যাম্প প্রতিষ্ঠার জন্য নন্দনকাননের দিকে রওনা হচ্ছে। ওদের কাল থেকেই তাঁবু-জীবন শুরু। আজীবা আং দাওয়া ও আং টেম্বা এখানেই থাকবে। ওরা পিনাকীকে রিপ্যাকিংয়ে সাহায্য করবে। আমাদের কুলি কম। চারদিন ধরে সব মাল মূল শিবিরে নিতে হবে।

আমরা কয়েকজন কাল লোকপাল-হেমকুণ্ড দর্শন করে আসব। তীর্থ দর্শনও হবে, আবার নতুন জলবায়ু সহ্য করার অভ্যাসও (Acclimatisation) হবে। একটা সাধারণ ধারণা আছে যে পাহাড়ে মানুষের শরীর ভাল থাকে। কথাটি মিথ্যে নয়। কিন্তু এ কথা কেবল একটা নির্দিষ্ট উচ্চতা পর্যন্ত সত্য। শৈলাবাস কখনই ৭/৮ হাজার ফুটের বেশি উঁচু হতে পারে না। দশ হাজার ফুটের ওপরে মানুষের দেহে ও মনে উচ্চতার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অক্সিজেনের অভাব, অত্যধিক শীত, জলাভাব ও পুষ্টিশূন্যতা মানুষকে দুর্বল করে তোলে। তার ওপরে প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো রয়েছেই। কাজেই জলবায়ু সয়ে নেওয়া প্রতি পর্বতারোহীর অবশ্য কর্তব্য। এই কর্তব্যে অবহেলা করে মেজর জয়াল অকালে মরণকে বরণ করেছেন। প্রায় সব মানুষই জলবায়ু সয়ে নিতে পারে। তবে তার জন্যে অভ্যাসের প্রয়োজন। তাই প্রতি অভিযাত্রীকে প্রকৃত অভিযান আরম্ভ করার আগে কিছুদিন সেই অঞ্চলে বাস করতে হয়। বারো তেরো হাজার ফুট হল এই অভ্যাসের আদর্শ স্থান। তবে চুপচাপ তাঁবুতে বসে থাকলেই চলবে না। প্রতিদিন আশ পাশের পাহাড়ে অন্তত দু তিন হাজার ফুট উঠে আবার নেমে আসতে হবে। এতে যেমন পর্বতারোহণের অভ্যাস হয়, তেমনি জলবায়ুও সয়ে যায়। পর্বতারোহণের নিয়ম অনুযায়ী দশ হাজার ফুটে কয়েকদিন ও তার ওপরে প্রতি দু হাজার ফুটে অন্তত দুদিন করে বিশ্রাম নেওয়া অবশ্য কর্তব্য। পনেরো হাজার ফুটে মানুষের কর্মক্ষমতার শতকরা চল্লিশ ভাগ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়ে তবে তাকে তৎক্ষণাৎ নিচে নামিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত।

প্রথম ভারতীয় এভারেস্ট (১৯৬০) অভিযাত্রীদল বারো হাজার ফুট উঁচুতে তিন সপ্তাহ বাস করেছিলেন। আমরাও ভেবেছিলাম মূল ও অগ্রবর্তী মূল শিবিরে দিন দশেক কাটাব। কিন্তু এদিকে অনেক দেরি হয়ে গেল। হয়তো আর অতদিন অপেক্ষা করা সম্ভব হবে না। তবে অন্তত পাঁচ সাতদিন থাকতেই হবে।

"আচ্ছা বিমলদা, ভালভাবে acclimatised না হলে কি হয়?" প্রাণেশ জিজ্ঞেস করে।

"Altitude sickness দেখা দেয়।"

"সে আবার কি রকম?"

"নানা রকমের। যেমন—সর্দি, শুকনো কাশি, মাথাধরা, বমি করা পেটের অসুখ, বুক ধড়ফড় করা, দৃষ্টি বিভ্রম, তুষার ক্ষত, মানসিক অবসাদ, খিটখিটে ভাব, নিদ্রাহীনতা, অরুচি ও পেশীর দুর্বলতা ইত্যাদি।"

"আচ্ছা আমরাও কেউ না কেউ হয়তো এসব অসুখে পড়ব। তখন কি কি ওষুধ ব্যবহার করবেন তা ভেবে রেখেছেন কি?"

"নিশ্চয়ই? যেমন ধর সর্দি। শুধু সর্দিই বা বলি কেন? সেই সঙ্গে গা ব্যথা ও সামান্য জ্বরও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে Novalgin-Quinine দেব ঠিক করেছি। আর শুধু শুকনো কাশি হলে Cosavil ট্যাবলেট দেওয়া যেতে পারে।"

"মাথা ধরার হাত থেকে কি করে পরিত্রাণ পাব হে ডাক্তাব?" আমি জিজ্ঞেস করি।

"আপনাদের সকলেরই অল্পবিস্তর পাহাড়ে ঘোরার অভ্যেস আছে। কাজেই চোদ্দ হাজার ফুটের নিচে কারও মাথা ধরবে বলে মনে হয় না। একটু আধটু যদিও বা ধরে তার জন্য ওষুধের কোন দরকার হবে না। তবে একান্তই যদি কারও না কমে, তাহলে Deypyrin ট্যাবলেট খেতে দেব।"

"আচ্ছা বিমল, সমতলের মতো ওপরেও কি Avomine বা Largactil খেলে বমির হাত থেকে রেহাই পাব?" কৌতূহলী বীবেন প্রশ্ন করে। ওব ডাক্তারি করার বড়ই শখ। এককালে হোমিওপ্যাথি পড়েছে। কিন্তু পেটের দায়ে শেষ পর্যন্ত কেরাণীর খাতায় নাম লেখাতে হয়েছে।

ডাক্তার জবাব দেয়, "নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তবে আমার বিশ্বাস পনেরো হাজার ফুটের ওপরে Stemetil ট্যাবলেট ব্যবহার করাই উচিত হবে।"

দেবীদাস এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। এবারে মুখ খোলে, "আরে ভাই, সবই তো শুনলুম। কিন্তু আসল কথাটাই যে শোনা হল না।"

আমরা সবাই দেবীদাসের দিকে তাকাই। একটু থেমে দেবীদাস আবার বলে, "পেটের অসুখে কি খাওয়া উচিত?"

"কেন? এখুনি দরকার?" অমূল্য জিজ্ঞেস করে।

"না, মানে, জেনে রাখা ভাল আর কি।"

"তাহলে জেনে রাখ, কিছু না খাওয়াই শ্রেষ্ঠ ওষুধ।"

"তুমি থাম দেখি।" অমূল্যর চিকিৎসা দেবীদাস মেনে নিতে পারে না।

ডাক্তার হাসতে হাসতে বলে, "পাহাড়ে এসে প্রত্যহ প্রত্যেকের একটি করে Sulphaguanidine এবং Entero-Quinol ট্যাবলেট খাওয়া উচিত। তা সত্ত্বেও যদি কারও পেট ব্যথা করে, তাহলে Baralgan ট্যাবলেট খাওয়া যেতে পারে।"

"বুক ধড়ফড় করলে?"

"পূর্ণ বিশ্রাম।"

"দৃষ্টি বিভ্রম ও তুষারক্ষত হলে কি করবে?" বীরেন আবার প্রশ্ন করে।

"রঙীন চশমা ছাড়া কখনই বরফের ওপর চলাফেরা করা উচিত নয়। কারণ সূর্যের Ultra violet রশ্মি বরফের মধ্যে absorbed হয় না। ফলে তা চোখে প্রতিফলিত হয়ে

দৃষ্টিবিভ্রম ঘটায়। সেক্ষেত্রে Locula (20%) ব্যবহার করতে হবে। আর তুষারক্ষত বা frostbite-এর কোন চিকিৎসা পাহাড়ে বসে করা সম্ভব নয়। ভগবান না করুন, তবে কেউ যদি একান্তই আক্রান্ত হয়, তাহলে বেশি পরিমাণে priscol ট্যাবলেট খাইয়েও ক্ষতস্থানে antiseptic dressings করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রোগীকে নিচে নামিয়ে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করাই উচিত হবে।"

"আচ্ছা আমরা যে ইন্ডিয়ান অক্সিজেনের দুটো সিলিন্ডার বয়ে নিয়ে চলেছি, তার দরকার হবে কী?"

"নেহাত কারও নিমোনিয়া না হলে ও দুটোর প্রয়োজন হবে না। আমাদের পরীক্ষা করে ডাক্তার হীরালাল সাহা তো তোমার সামনেই বললেন বাইশ হাজার ফুটের নিচে আমাদের কারও অক্সিজেনের দরকার হবে না।"

"কিন্তু শুনেছি একুশ হাজার ফুটে মাত্র আট দিন কাটিয়ে ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং-এর পঁচিশ পাউন্ড ওজন কমে গিয়েছিল?"

"তা বটে। আবার সার জন হান্ট কি বলেছেন জানো?"

"কী?"

"Men like Pasang Dawa Lama can reach the top of Everest without oxygen."

"আচ্ছা এত উঁচুতে তো কোন রোগের জীবাণু বাঁচতেই পারে না। তাহলে নিমোনিয়া হয় কেন?"

"এত উঁচুতে জীবাণু বাঁচে না সত্যি। তবে রোগী নিজেই তা বয়ে নিয়ে আসতে পারে। তাই দেখলে না ডাক্তার সাহা সেদিন আমাদের কত করে পরীক্ষা করলেন?"

"আর এসব জায়গায় নিমোনিয়া হলে নাকি দিন দুয়েকের মধ্যেই একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যায়?"

"তা হয় বৈকি। চিকিৎসার সময়টুকু পর্যন্ত পাওয়া যায় না। গত কয়েক বছরে ভারতের যে কজন পর্বতারোহী মারা গেছেন, তাঁরা সকলেই স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ ও যুবক—বয়স চব্বিশ থেকে ছত্রিশের মধ্যে। একমাত্র জয়াল ছাড়া অন্য সবাই তেরো থেকে পনেরো হাজার ফুটের মধ্যে নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে দুদিনের মধ্যে মারা গেছেন। কিন্তু এঁরা সবাই সাবধান হবার সুযোগ পেয়েছিলেন। যেমন ধরো আগের দুটি অভিযানে জয়ালের রক্তবমি হয়েছিল।"

"মিল গিয়া। তাগড়াওয়ালা মিল গিয়া। ম্যায় শের সিং সাব।'

আমাদের ডাক্তারি আলোচনায় ছেদ পড়ে। একগাল হাসি নিয়ে ঝড়ের বেগে শের সিং ঘরে প্রবেশ করে। খালি হাতে নয়, দড়ি হাতে। দড়ির অপর প্রান্তে নন্দনকানন ফেরত ছাগ-নন্দন। জাগ্রতা লাটুদেবীর চলন্ত মানত।

শৈলেশদা হাঁক ছাড়েন, "কত নিল?"

"আর বলেন কেন। সব বকরীওয়ালারা নিচে নেমে গেছে। বেটা সুযোগ বুঝে দাম চড়িয়ে দিল। অনেক পটিয়ে পাটিয়ে পঞ্চাশ টাকায় রাজী করিয়েছি।"

"পঞ্চাশ!" শৈলেশদা চেঁচিয়ে ওঠেন, "এই আধমরা বকরীর দাম পঞ্চাশ টাকা! দরকার নেই পুজো টুজোর। তোমার লাটুদেবী মাথায় থাকুন। এ বকরী তুমি ফিরিয়ে

দাও।”

“এ কি বলছেন শেঠজী!” শের সিং আজ কদিন ধরেই শৈলেশদাকে শেঠজী বলে ডাকছে। বোধহয় ভেবেছে নতুন উপাধিতে বশীভূত হয়ে শৈলেশদা হিসেবের ফাঁস আলগা করবেন। কিন্তু ও তো জানে না যে ভবি ভোলবার নয়।

“ঠিকই বলছি। তিরিশ টাকার মধ্যে হলে পুজো হবে। নইলে হবে না।” শৈলেশদা নির্ভয়ে সাফ জবাব দেন।

“কিন্তু আপনারা মানত করে লাটু দেবীর...!”

“না না এটা ঠিক হচ্ছে না শৈলেশদা।” মাঝখান থেকে ডাক্তার বলে ওঠে।

“কিছু না জেনে কথা বলবে না বিমল।” শৈলেশদার ধমকে ধর্মপ্রাণ ডাক্তার চুপসে যায়। শৈলেশদা গজগজ করতে থাকেন।

অবস্থাটা ক্রমেই ঘোরাল হয়ে উঠছে দেখে শৈলেশদার পাশে গিয়ে আস্তে আস্তে বলি, “পুজো না দিলে কিন্তু অভিযান বন্ধ হয়ে যাবে।”

“কেন?’ শৈলেশদা আঁতকে ওঠেন।

“লাটুদেবীর মানত না মানলে কুলিরা এখান থেকে এক পাও এগোবে না।”

“তাই বলে জেনে শুনে পনেরোটা টাকা বেশি দেব? আমি খবর নিয়েছি পঁয়ত্রিশ টাকায় দর ঠিক হয়েছে।”

নাঃ শৈলেশদাকে নিয়ে পারা গেল না। শের সিং-এর পেছনে টিকটিকি লাগিয়েছেন। বাধ্য হয়ে বলি, “শেঠজী তো রাজী হচ্ছেন না শের সিং। আমি বলি একটা কাজ করো।”

“কী?”

“গোটা চল্লিশেক টাকার মধ্যে পুজোটা সেরে ফেল।”

“শেঠজী তবে তিরিশ বলছেন কেন?”

যাক শের সিং তাহলে পাঁচ টাকা প্রণামীতেই রাজী হল। শৈলেশদাকে অনুরোধ করি, “ওকে চল্লিশটা টাকা দিয়ে দিন। আমাদের ভালর জন্যই যখন করছে।”

হারিয়ে যাওয়া হাসি ফিরে এল শের সিং-এর মুখে। টাকা নিয়ে সেলাম ঠুকে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। এবারে কম্বল মুড়ি দিয়ে সে লাটুদেবীর আরাধনায় বসবে। অনেক রাত অবধি চলবে সেই পুজোপাঠ। কাল ভোরে ছাগ-নন্দনকে বলি দেওয়া হবে। তার অক্ষয় স্বর্গ লাভের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও অক্ষয় রৌদ্র লাভ এবং সেইসঙ্গে মাংস-ভাত।

॥ ১৫ ॥

ঘুম ভাঙল পাখির ডাকে। না বৃষ্টির শব্দ পাচ্ছি না তো! তবে কি...! চোখ মেলে দেখি, বাইরের জগৎ সূর্যকিরণে পরিপূর্ণ। প্রভাত-সূর্যের উজ্জ্বল হাসিতে সমস্ত অঞ্চল উদ্ভাসিত। বিশ্বাস করাই কঠিন যে গত কদিন অবিশ্রান্ত বর্ষণ হয়েছে। একি যাদু না মায়া! যাই হোক, আমরা ভাগ্যবান। ধন্য হলাম জাগ্রতা লাটুদেবীর এই অকৃপণ করুণায়।

অমূল্য সেনের আজ অনেকটা শ্যাম রাখি না কুল রাখি অবস্থা? কাল রাতে ঠিক হয়েছিল, অমূল্য আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে আজ সকালে লোকপাল যাবে। চারজন

শেরপাসহ আমাদের দু জন এখানে থাকবে। তারা অবশিষ্ট মালপত্রের তদারকি করবে ও সম্ভব হলে আরও কুলি যোগাড় করে বেস ক্যাম্পে মাল পাঠাবার চেষ্টা করবে। সেই দুজনের একজন পিনাকী। আরেকজন কে তা কাল ঠিক হয় নি। আজ দেখা যাচ্ছে পিনাকী ছাড়া আর কেউ এই ঘন জঙ্গলে ঘেরা ঘাংরিয়া গুরুদ্বারে বসে থাকতে তেমন রাজী নয়। পিনাকীর কথা আলাদা, তার মত নীরব কর্মী খুব কম চোখে পড়ে। কিন্তু তার একার পক্ষে তো সব দিক সামলানো সম্ভব নয়। আরও একজনের এখানে থাকা দরকার। কিন্তু সেই দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে অমূল্যই জানে। তবে সবাই লোকপাল যেতে চাইছে। আমরা অমূল্যর দিকে তাকিয়ে আছি। কাকে সে থাকতে বলবে?

"তোমাদের কাউকে থাকতে হবে না। ভানুরা রওনা হয়ে গেলে, তোমরাও বেরিয়ে পড়ো লোকপালের পথে। বীরেনের জানা জায়গা। আজ সে-ই তোমাদের নেতা।"

"তুমি?"

"আমি পিনাকীদার সঙ্গে এখানেই থাকব। নীলগিরি জয় করতে পারলে, ফেরার পথে লোকপালজীকে প্রণাম করতে যাব।"

অমূল্য আমাদের অনেকের চেয়েই বয়সে ছোট, তবু সে আমাদের নেতা। নেতৃত্বের প্রথম প্রয়োজন ত্যাগ। ত্যাগে তাকে সবার বড় হতে হবে।

নিতাই নিরাপদ চঞ্চল টোপগে ও ছান্দুকে নিয়ে ভানু রওনা হয়ে গেল নন্দনকাননের পথে—বেস ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করতে। শের সিং ওদের প্রথপ্রদর্শক। কুলিরা যতটা সম্ভব মালপত্র নিয়ে আগেই রওনা হয়ে গেছে।

ওদের রওনা করিয়ে দিয়ে আমরাও তৈরি হয়ে নিলাম। দেরি করা ঠিক হবে না। সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসতে হবে। দূরত্ব বেশি নয়—মাত্র সাড়ে তিন মাইল। কিন্তু সাড়ে চার হাজার ফুট চড়াই ভাঙতে হবে।

লোকপালের লোকপালজী বা লক্ষ্মণের ছোট মন্দিরটি বিশ্বের উচ্চতম দেবালয়। এখন অবশ্য লোকপাল শিখতীর্থ হিসেবেই পরিচিত। ওঁরা বলেন—গুরু গোবিন্দ সিং গত জন্মে তপস্যা করেছিলেন ওখানে। তবে লোকপাল বহু প্রাচীন হিন্দুতীর্থ। 'রহস্যময় রূপকুণ্ডে'র লেখক আমাদের বীরেনও তাই বলে।

আজ দিনের আলোয় পথে বেরিয়ে বুঝতে পারছি, ঘাংরিয়া একটি ছোট উপত্যকা। চারিদিকেই পাহাড়। ডাক-বাংলো থেকে পথটি ফার্লং খানেক বেশ সমতল। তার পরেই ক্ষীণকায়া খরস্রোতা হেমগঙ্গা বা লক্ষ্মণগঙ্গা। আমরা এরই উৎস দর্শনে চলেছি।

একটি কাঠের সাঁকো পেরিয়ে পথটি দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছে—বাঁ দিকে নন্দনকাননের পথ, ডান দিকে লোকপাল। কিছুটা হেঁটেই দেখি, হেমগঙ্গার তরল জলে তুষারের ছোঁয়া লেগেছে। দুদিকে বরফ মাঝে জল—হেমগঙ্গা বয়ে চলেছে। ডান দিকে একটি অনিন্দ্য-সুন্দর ঝরনা। পথ ধীরে ধীরে চড়াই হচ্ছে। পাথর ভেঙে পথ তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে। পাথরগুলো মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। পা দিতেই সবসুদ্ধ নড়ে উঠছে। আইস্ এক্স দিয়ে কোনরকমে সামলে নিচ্ছি। তবু যা হোক, এখন একটা পথ হয়েছে। বীরেন বলল—দু বছর আগে নাকি এও ছিল না। তখন আগাগোড়া পাকদণ্ডী

ভেঙে লোকপাল পৌঁছতে হত। মামুলী পাকদণ্ডী নয়—হয় গাছের শিকড়, নয় ডাল ধরে সোজাসুজি পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠে যাওয়া। পাকদণ্ডীর প্রতি বাঁকে পাহাড়ের গায়ে কিংবা গাছের ডালে একটি লাল নিশান বাঁধা থাকত—পথের নিশানা। কয়েকটি নিশান আজও অক্ষত রয়েছে। যাত্রীরা যেমন করে হোক এক নিশানা থেকে আরেক নিশানায় লক্ষ্য স্থির রেখে এগিয়ে যেতেন।

ভূজ গাছের এত ঘন জঙ্গল এর আগে আর দেখি নি। গাছগুলো ছবির মতো—পরগাছায় বোঝাই। ঠিক সাধারণ পরগাছা নয়। অনেকটা ঝুরির মতো—পাতায় ছাওয়া লতা ডালে ডালে দুলছে।

শুধু গাছ নয়, পাতা নয়—লতা নয়, ফুলেরও ছড়াছড়ি এ পথে। উপেনবাবু উল্লসিত। উল্লসিত আমরাও। আমরাও ফুল তুলছি—তুলছি হিমালয়ান ব্লু পপি, হলুদ সূর্যমুখী—আরও অনেক নাম-না-জানা ফুল। ভাবছি—এখানেই যদি এত, তাহলে নন্দনকাননে না জানি কত? ভাবতেও ভাল লাগছে।

ভূর্জবন শেষ হয়ে গেছে। অনেক ওপরে উঠে এসেছি। ক্রমাগত চড়াই ভাঙছি। ভীষণ চড়াই। দম ফুরিয়ে গেছে। মাঝে মাঝেই জিরিয়ে নিচ্ছি। বুঝতে পারছি চৌধুরীদা কাল কেন ওরকম করছিলেন। এখনও ঘাংরিয়া দেখতে পাচ্ছি। নন্দনকাননের পথটিও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। সংকীর্ণ আঁকা-বাঁকা। যেমন সমতল একটি পথ—আমাদের নীলগিরি পর্বতের পথ।

ভূর্জবন শেষ হলেও সবুজ শেষ নি। পথের দুদিকে ছোট ছোট ঝোপ। উপেনবাবু বলেন অ্যালপাইন্ শ্রাব্। গোল ঘাস—অনেকটা পেঁয়াজকলির মতো। প্রায় সারা বছরই বরফ পড়ে এখানে। তাই ওদের এমন মোটা-সোটা গড়ন।

থমকে দাঁড়ালাম। একটা গুহা—একটু দূরে, বেশ উঁচুতে। যখন ঘাংরিয়াতে গুরুদ্বার ছিল না, তখন এই গুহাটিই ধর্মশালা হিসেবে ব্যবহৃত হত। নাম ছিল নারাথোর। কেন জানি না কয়েক বছর আগে টিহরীর এক সন্ন্যাসী ওখানে এসে বহুদিন ছিলেন।

মিশর তো বহুদূর! তবে আমাদের সামনে স্ফিংস এল কেমন করে? অনেকটা স্ফিংসের মতো দেখতে নিকষ কালো পাথরের একটি পাহাড়। কত বিচিত্র গড়নের বিচিত্র ধরনের পাহাড় আছে এ পৃথিবীতে। আমরা কতটুকুই বা জানি এই জগতের।

হেমগঙ্গা বরফে রূপান্তরিত—অনেকটা হিমবাহের মতো। বরফের সঙ্গে মিশে আছে অজস্র পাথর। দুটি পাহাড়ের মধ্য দিয়ে হিমবাহটি নেমে এসেছে। আমাদের ওপারে যেতে হবে। কাজটি খুব সহজ নয়। একটু জিরিয়ে নিলে কেমন হয়? হঠাৎ প্রাণেশ চিৎকার করে উঠল, "ঐ দেখুন।"

"সত্যিই তো। তবে আর দেরি নয়। চলো তাড়াতাড়ি ওপারে চলো। কিন্তু ওগুলো কি ফুল?"

"ব্রহ্মকমল।" উপেনবাবু বলেন। আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন শৈলেশদা। আনন্দিত আমরাও। ক্ষিপ্র পদক্ষেপে মরীয়া হয়ে হিমবাহ পেরিয়ে এলাম। এলাম স্বপ্নে দেখা ব্রহ্মকমল বনে। ব্রহ্মকমল নয় দেবদুর্লভ পারিজাত। যে পারিজাতের জন্যে সত্যভামা কেঁদে কেটে একশেষ, যে পারিজাত নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ইন্দ্রের সেই প্রচণ্ড সংগ্রাম, এই সেই পারিজাত।

আহা! কি গন্ধ! কি রং, কি অপূর্ব রূপ! হালকা হলুদ রংয়ের বড় বড় ফুল। একটি নয় দুটি নয়—শত শত। হাওয়ায় দুলছে, গন্ধ ছড়াচ্ছে। আমরা আমোদিত হচ্ছি। পথশ্রম ভুলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছি।

আমরা ব্রহ্মকমল তুলছি। উপেনাবাবু দরদী কণ্ঠে বললেন, "দেখবেন যেন গাছের গায়ে চোট না লাগে। হিমালয়ের কয়েকটি অঞ্চলে কেবল এই ফুল হয়। এদের বংশবৃদ্ধিও কম। কাজেই গাছ নষ্ট হলে এরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।"

ইচ্ছে ছিল না ওদের ছেড়ে পথ চলি। তবু পথ চলতে হচ্ছে। নইলে সন্ধের আগে ফিরে যেতে পারব না। ঘাংরিয়াতে পাঁচটার আগেই সন্ধে নেমে আসে। পথে মাঝে মাঝে বরফ পড়ে রয়েছে। এ যাত্রায় বরফের ওপর এই আমাদের প্রথম পথ চলা। কিন্তু বরফের কথা এখন থাক।

চড়াই শেষে একটি পতাকা। বাতাসে উড়ছে। লোকপালের নিশানা। আমরা এসে গেছি।

ছোট একটি উপত্যকা—লোকপাল। প্রায় সবটা জুড়েই একটি স্বচ্ছ সরোবর—হেমকুণ্ড। সোয়া মাইল পরিধিবিশিষ্ট, ডিম্বাকৃতি একটি হ্রদ। নিথর নিস্পন্দ নিরুদ্বিগ্ন। ঢেউ নেই স্রোত নেই, এমন কি বুদ্বুদ পর্যন্ত নেই। এত স্থির ও এত শান্ত যে কেউ যদি জলে নেমে এক টুকরো কাগজ জলে ফেলে হেঁটে যায় তাহলে কাগজটুকু তাকে অনুসরণ করে। জল গভীর নয়, তবে ভীষণ ঠাণ্ডা। জল জমে কঠিন হবার সময় সমাগত। কয়েকদিন পরেই হেমকুণ্ড বরফের হ্রদে রূপান্তরিত হবে। তিনদিকেই বরফের পাহাড়—সপ্তশৃঙ্গ। উচ্চতম শৃঙ্গটির উচ্চতা ১৬,৫৮১ ফুট। পাহাড় থেকে বরফের প্রবাহ নেমে এসেছ হেমকুণ্ডের জলে। প্রবাহের আশে পাশে কোথাও কোথাও এখনও খয়েরী রংয়ের শ্যাওলা আছে জমে। এখন খয়েরী দেখছি বটে, কিন্তু এ-রং স্থায়ী নয়। ওদের আসল রং কি, কেউ জানে না। সকালে হয়তো সবুজ ছিল, এক খয়েরী, বিকেলে আকাশী রংয়ে রূপান্তরিত হবে। আলোর তারতম্য অনুসারে ওদের রং বদলায়। কিন্তু কদিন পরেই এই রং বদলের পালা সাঙ্গ হবে। ওরা তুষারে তলিয়ে যাবে। সব সাদা হয়ে যাবে।

কথিত আছে পাণ্ডু রাজা এখানে তপস্যা করে দিব্য-দেহ ধারণ করেছিলেন। লক্ষ্মণও নাকি এখানে তপস্যা করেছিলেন। আগে একে লোকপাল সরোবর বা দণ্ড সরোবর বলত। হেমকুণ্ড নাম হয়েছে ১৯৩৬ সালে, দিয়েছেন সোহন সিং—একজন ওভারসিয়ার। তিনিই প্রমাণ করেছেন এই সরোবরের তীরে গুরু গোবিন্দ গত জন্মে পঞ্চাশ বছর তপস্যা করেছিলেন। তখন তাঁর নাম ছিল কলগী ঘর।

'সপত্ শৃঙ্গ শোভত হ্যাঁয় জাঁহা
হেমকুণ্ড নাম হ্যাঁয় তাঁহা।'

সপ্তশৃঙ্গের এপাশে হেমকুণ্ড ওপাশে নন্দনকানন। রতবন, ঘোড়ী (২২,০১০) প্রভৃতি যে সব পর্বত নন্দনকাননের উত্তর দিক জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, তারা এই পর্বতশ্রেণীরই অন্য অংশ। এখান থেকে কাকভুষণ্ডীর শিখর দেখা যায়। আকাশ পরিষ্কার বলে নীলকণ্ঠ শিখরও চেখে পড়ছে। সপ্তশৃঙ্গের মতো মাথা উঁচু করে সেও আমাদের আশীর্বাদ করছে। এমন শান্ত সুন্দর স্বর্গীয় পরিবেশ বড় একটা চোখে পড়ে না। অথচ এই

অপূর্ব পরিবেশের মাঝে ভগ্নদূতের মতো এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে কতগুলো আবহাওয়া নিরুপণ যন্ত্র। কোন আবহাওয়া অফিস বা অফিসার নেই। যন্ত্র আছে যন্ত্রী নেই। যন্ত্রীহীন যন্ত্র।

প্রথমেই শিখ ধর্মশালা, বেশ বড় কাঠের বাড়ি। চওড়া বারান্দা। নতুন তৈরি হয়েছে। ধর্মশালার দরজা খোলা। রান্নার বাসনপত্রও রাখা হয়েছে। কিন্তু কোন লোকজন দেখছি না। ধর্মশালার সামনে একখানি সাইনবোর্ড—এইখানে জুতো খুললে তবে এগোনো যাবে। ঘাংরিয়ার পরে চামড়ার জুতো পরে এ পথে আসা নিষেধ। আমরা কাপড়ের হান্টার শু পরে এসেছি। সে জুতোও খুলতে হল এখানে। পায়ে খুবই ঠাণ্ডা লাগছে। তাহলেও উপায় নেই।

ধর্মশালা পেরিয়ে কয়েক পা এগিয়ে শিখ গুরুদ্বার। খুব পুরনো নয়। মাত্র বছর বিশেক আগে তৈরি হয়েছে। ভেতরে কি আছে বুঝতে পারছি না। দরজায় তালা।

একটি ক্ষীণ ধারা বেরিয়ে যাচ্ছে কুণ্ড থেকে। এই ধারাটিই হেমগঙ্গা। এখান থেকে সৃষ্ট হয়ে ঘাংরিয়াতে ভুইন্দার গঙ্গায় গিয়ে মিশেছে। পথে হেমগঙ্গাকে জমে যেতে দেখেছি। অথচ এখানে এত জল। একটি নদীর উৎস হয়েও হেমকুণ্ড শুকিয়ে যাচ্ছে না। তবে কি এই কুণ্ডের নিচে কোথাও প্রস্রবণ আছে?

সেই ক্ষীণ ধারাটিকে ডিঙিয়ে আমরা এপারে এলাম। কয়েক পা হেঁটেই অতি প্রাচীন একটি ক্ষুদ্র মন্দির। পাথরের দেওয়াল, স্লেটের চাল। কোন রকমে হামাগুড়ি দিয়ে একজন লোক ভেতরে ঢুকতে পারে। ভেতরে লক্ষ্মণমূর্তি। শিখরা বলে লোকপালজী। আমার কিন্তু মনে হচ্ছে পদ্মাসন বুদ্ধের প্রতিমূর্তি। আরও একটি মূর্তি রয়েছে মন্দিরে—দেবী চণ্ডীকার মূর্তি। মন্দিরের সামনে কালিকমলীর পুরনো ধর্মশালা। শিখ ধর্মশালার চেয়ে ছোট। তাহলেও কোন এক সময়ে এইটি ছিল যাত্রীদের একমাত্র আশ্রয়।

এখানে জন্মাষ্টমীতে লোকপালজীর মেলা হয়। নীতি, গামশালী, মানা, পুন, ভুইন্দার প্রভৃতি গ্রাম থেকে বহু যাত্রী তখন এখানে আসেন। কিন্তু রাতে কেউ বড় একটা এখানে থাকেন না। বীরেনের কথা আলাদা। গতবার সে গুরুদ্বারের কাছে ঐ তপশিলার ওপরে একা বসেছিল সারারাত। কি দেখেছে তা সে-ই জানে। তবে পুণ্যার্থীদের বিশ্বাস ধর্মশালার বাইরে এখানে রাত্রিবাস করলে এই পুণ্যভূমি কলুষিত হবে। গভীর রাতে স্বর্গের দেব-দেবীরা ও অদৃশ্য সিদ্ধ-পুরুষরা হেমকুণ্ডের পবিত্র বারিতে অবগাহন করতে আসেন। তাঁদের জ্যোতিতে লোকপাল জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে।

একটি ঘণ্টা ও একটি পেতলের প্রদীপ মন্দিরে পড়ে আছে। উপকরণ রয়েছে। যাঁর যে ভাবে ইচ্ছা, যতক্ষণ ইচ্ছা পুজো করতে পারেন। পুরোহিতের প্রয়োজন নেই, আচারের বিচার নেই, ধর্মাধর্মের বিভেদ নেই। প্রসাদের আড়ম্বর নেই, দক্ষিণার দরকার নেই, এমনকি মন্ত্রেরও আবশ্যক নেই। ভক্ত ভক্তিভরে আপন মনে আপন পদ্ধতিতে ভগবানকে ডাকুক। ভগবান সে ডাকে সাড়া দেবেন। ভক্ত ও ভগবানের মিলনতীর্থ এই মন্দির।

॥ ১৬ ॥

'আসমুদ্র হিমাচল যখন মহাত্মাজীর পুণ্য জন্মতিথি উদ্‌যাপনে ব্যস্ত, তোমরা যখন রমণীয় হেমকুণ্ডের রহস্য উন্মোচনে ব্যস্ত, আমরা তখন বেস ক্যাম্পে স্থান নির্বাচনে ব্যস্ত ছিলাম। সকাল নটায় ঘাংরিয়ায় তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, প্রায় মাইল সাতেক হেঁটে, বেলা দুটোর সময় আমরা মনোমত জায়গা খুঁজে পেয়েছি। তিনটি তাঁবুই ফেলেছি। আশে পাশে তাঁবু ফেলার মত আরও জায়গা আছে। একটু আধটু সমান করে নিতে হবে।

সামনেই রতবন, তার নিচে কাটা খাল বা ভুইন্দার গিরিবর্ত্ম (১৬৭০০)—রতবন ও নীলগিরির জলবিভাজিকা। কিন্তু এ পথে নীলগিরির চূড়ায় ওঠা সম্ভব নয়। কুলিরা এ জায়গাটাকে বলে মূলা সিউয়াচাঁদ। আমরা কিন্তু নাম দিয়েছি উমাপ্রসাদ নগর। হিমালয়ের পথে পথে যিনি সারাটা জীবন কাটিয়ে দিলেন, সার আশুতোষের সেই সুযোগ্য পুত্র, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় সেজকা ছাড়া আর কার নামে এই অভিযান-নগরীর নামকরণ করব বল? প্রাণহীন প্রান্তরে আমরা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছি।

পাশেই প্রচণ্ড গর্জনে বয়ে চলেছে ভুইন্দার গঙ্গা। আমরা তার তীর ধরেই এখানে এসেছি। তোমরাও তাই আসবে। প্রান্তর প্রাণহীন, কিন্তু ভুইন্দার গঙ্গা প্রাণচঞ্চল।

প্রচণ্ড হাওয়া বইছে এখানে। ভয় হচ্ছে তাঁবু না উড়িয়ে নিয়ে যায়। শীতও করছে খুব। করবেই তো, জায়গাটা তো উঁচু কম নয়—১৩,৭০০ ফুট। তাছাড়া চারিদিকে তুষারাবৃত চূড়া। তাই বলে নীলগিরি নেই এর মধ্যে। সে লুকিয়ে আছে। তাকে খুঁজে বের করতে হবে।

বাবুলালকে রেখে দিলাম। তোমাদের আরও একজন কুলি কমে গেল। কাল ওকে এখানে রেখে, নিতাই নিরাপদ ও ভানুর সঙ্গে আমি অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পের জায়গা খুঁজতে যাব। এখানে চোরের ভয় নেই জানি। তবু একজনের থাকা উচিত। চোর না থাকলেও ভালুক আছে।

আজ এখানেই থাক। সব ঠিক আছে তো?'

চঞ্চলের চিঠিটা ফিরিয়ে দিলাম অমূল্যকে। চিঠিটা কাল সন্ধে বেলাই এসেছে। কিন্তু কাল আর আমার পড়া হয়ে ওঠে নি। লোকপাল থেকে ফিরে বড়ই পরিশ্রান্ত বোধ করছিলাম।

চিঠিটা পকেটে গুঁজে অমূল্য বলল, "আপনাকে ও উপেনদাকে ডাক্তার আজ বিশ্রাম নিতে বলেছে। আপনারা আমার সঙ্গে এখানে থাকুন। ওদের সবাইকে নিয়ে পিনাকীদা বেরিয়ে পড়ুক বেস ক্যাম্পের দিকে।"

শৈলেশদা দেবীদাস বীরেন পিনাকী ও প্রাণেশ তৈরি হয়ে নিল। ওদের রওনা হতে বেলা প্রায় নটা বেজে গেল। আমি ও অমূল্য ওদের সঙ্গে সেই পুল পর্যন্ত এলাম। ওরা চলে গেল। আমরা ফিরে এলাম।

আজ আকাশ বেশ পরিষ্কার। সকাল থেকে একবারও বৃষ্টি নামে নি। তিন জন শেরপা ও শের সিং পাশের ছোট্ট মাঠে পয়সা দিয়ে তাস খেলছে। ওদের কাছেই একটি ঘোড়া ও তিনটি ভেড়া চরছে। অমূল্য কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখতে চলে গেল। গিয়ে বসল একটি বিরাট পাথরের ওপর। ওখানে রোদ পড়েছে।

উপেনবাবু আজ আর ঘর থেকে বেরোন নি। কাল নামার সময় তাঁর হাঁটুতে ব্যথা হয়েছে। চারিদিক চুপচাপ। পাখি নেই, হাওয়া নেই। গাছগুলোও পাথরের মতো স্থির। আমার বড় কথা বলতে ইচ্ছে করছে। একবার চৌধুরীদার কাছে যাওয়া যাক। ওঃ। সেদিন রাতের পরে তো আর চৌধুরীদার কথা বলা হয় নি। কাল তিনি নন্দনকানন দেখে এসেছেন। ফিরেই সোজাসুজি এখানে এলেন। বল্লেন, "কিহে হেমকুণ্ড কেমন দেখলে?"

"অপূর্ব।" আমরা সমস্বরে বলে উঠেছি।

"কি? আমি কি কিছু বাড়িয়ে বলেছি?"

"না না। যথার্থ বলেছেন। সেখানে গেলে আর ঘরে ফেরার বাসনা থাকে না।"

ডাক্তার শেষ করার আগেই অমূল্য যোগ করেছে, "বাঁচতেও নাকি আর ইচ্ছে করে না।"

"তাহলে?" চৌধুরীদা আনন্দে প্রায় চিৎকার করে উঠেছেন, "অথচ দেখো শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হয়ে গেছে, আমি নাকি সব কথাই বাড়িয়ে বলি।"

"খুব অন্যায়। আচ্ছা আমরা ফিরে গিয়ে বৌদিকে বারণ করে দেব।" অমূল্য একটু থেমে আবার বলেছে, "দাদা। যদি কিছু মনে না করেন..."

"আরে বলেই ফেলো না। মনে করার কি আছে। এখানে আমরা সবাই বন্ধু।"

"আপনি কি বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়েছেন?"

চৌধুরীদা হো হো করে কিছুক্ষণ হেসে নিয়ে তারপর বলেছেন, "তোমরা বোধহয় ভেবেছ, তোমাদেব বৌদি খুব ঝগড়াটে?"

"আজ্ঞে না।" আমরা লজ্জা পেয়েছি।

"মোটেই ঝগড়াটে নয় হে! তবে আত্মীয়-স্বজন এই ঘুরে বেড়াবার জন্যে আমাকে পাগল বলে।"

"তাই বুঝি আপনাকে আসতে দিতে চান নি?"

"ঠিক তার উলটো। বলেছে, পুরুষ মানুষ আবার কবে ঘরে বসে থাকে?"

চৌধুরীদার কথা ভাবতে ভাবতে ডাক-বাংলোয় আসি। কিন্তু তাঁর ঘরের সামনে এসেই চমকে উঠতে হয়। একি কাণ্ড? তালা ঝুলছে তাঁর ঘরে। আর যে চৌধুরীদার সঙ্গে গল্প করা হল না। চৌকিদার জানাল—তিনি ফিরে গেছেন।

কোন রকমে দিনটা কাটিয়ে দিলাম। বিকেল চারটেয় পিনাকী ফিরে এল কুলিদের নিয়ে। ঠিক হল কাল আমরা বেস ক্যাম্পে যাব।

আজ ৪ঠা অক্টোবর। সকাল দশটায় উপেনবাবু অমূল্য ও আমি রওনা হলাম। শেরপা আং টেম্বা, আং দাওয়া ও ছুতারকে নিয়ে শের শিং একটু আগে রওনা হয়েছে। কুলিরাও মাল নিয়ে গেছে। আজও সব মাল যায় নি। তাই আজীবাকে নিয়ে পিনাকীকে থাকতে হল ঘাংরিয়াতে।

নিবিড় জঙ্গলের মধ্য দিয়ে অতি সংকীর্ণ পথ। মাঝে মাঝেই নিচু হয়ে চলতে হয়। কোথাও বা গাছের ডাল কোথাও বা পাথর। আমাদের প্রত্যেকের পিঠেই রুক্স্যাক্— প্রায় পনেরো সের। খচ্চরওয়ালারা ঠিকই বলেছে। এ পথে খচ্চর অচল।

একটা পুল পেরিয়ে ভুইন্দার গঙ্গার পরপারে এলাম। জঙ্গল আরও গভীর হল। একটু চড়াই ভেঙেই দেখি, দুটি পথ দুদিকে চলে গেছে। ভানুরা সেদিন এখানে এসেই ভাবনায় পড়েছিল। আজ অবশ্য আর কোন অসুবিধে নেই। গত তিন দিন ধরে আমাদের কুলিরা রোজ দুবার করে এ পথে যাতায়াত করছে। এখন সহজেই পথ চিনে নেওয়া যায়।

বাগডোরের মতো এখানেও সেই ওল জাতীয় গাছ দেখতে পাচ্ছি। পাহাড়ীরা এই গাছের মূল শুকিয়ে গুঁড়ো করে আটার অভাব মেটায়। এর রুটি নাকি খুবই পুষ্টিকর। জানা রইল—আটা কম পড়লে আমাদেরও কাজে লাগবে। আরও একরকম ফল দেখতে পাচ্ছি। ওরা বলে শ্বেত ফল। খেতে অনেকটা কুলের মত। হৃদ্‌রোগের মহৌষধ। আমাদের হৃদয়ের রোগ নেই। তাহলেও আমরা খাব। সরস্বতী পূজোর আগে কুল, পেলে কে ছাড়ে?

জঙ্গল পাতলা হয়েছে, তবে শেষ হয় নি। অসংখ্য ঝোপ-ঝাড় ও লতাপাতা চারিদিকে। তাতে ফুটে আছে ছোট ছোট নানা রকমের ফুল। অধিকাংশই হলুদ। পাহাড়ের গা থেকে শুরু করে ভুইন্দার গঙ্গায় গিয়ে শেষ হয়েছে। ঝিঁঝি পোকার দল অবিরাম ডেকে চলেছে। দিনের বেলায় এমন ঝিঁঝির ডাক বড় একটা শোনা যায় না। আর ডাকছে একটা নাম-না-জানা পাখি। ভারি মিষ্টি স্বর।

কিন্তু কোথায়?

"সর্বনাশ, ধস নেমেছে। আর পথ নেই।"

উপেনবাবুর ডাকে এগিয়ে যাই। আমরা একটা প্রশস্ত ধসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে? এমনি একটা ধস পেরোতে গিয়েই অমর সিংয়ের খচ্চরটা অলকানন্দায় পড়ে গিয়েছিল। স্বভাবতই উপেনবাবু উদ্বিগ্ন। কিন্তু অমূল্য নির্বিকার। চারিদিক দেখে নিয়ে বলে, "একটু ওপরে উঠে গেলেই হবে। আমি আইস এক্স দিয়ে পথ করে দিচ্ছি।"

বড় বড় গাছ কমে এসেছে। ঝোপঝাড় রয়েছে দুধারে। কিছু কিছু ফুলও আছে। তবে অধিকাংশই শীতের আক্রমণে মরে গেছে। এখানে সেপ্টেম্বর থেকেই শীত। নন্দনকাননে আসার প্রকৃষ্ট সময় জুলাই ও অগাস্ট—আগেও নয়, পরেও নয়। আমাদের বাঁয়ে বদ্রীনাথের নর পর্বত। কিন্তু ঠিক দেখা যাচ্ছে না—ঢাকা পড়েছে কয়েকটি ছোট ছোট পাহাড়ে। পাহাড় থেকে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের প্রবাহ নেমে এসেছে এখানে। একটি নয়—পর পর তিনটি—খোকওয়া খড়ক, কাঠেলি খড়ক ও উজলা খড়ক। খড়ক শব্দের অর্থ হিমবাহ। কিছুদিন পরেই ঐ পাথরের ওপর দিয়ে পাহাড় থেকে তুষারের প্রবাহ নেমে আসবে ভুইন্দার গঙ্গায়। তখন এই পাথরের প্রবাহ রূপান্তরিত হবে তুষারের প্রবাহে—হিমবাহে।

উজলা খড়ক ধরে পাহাড়ের ওপর উঠে গেলে পৌঁছনো যাবে নাগতালে। ছোট একটি হ্রদ—হেমকুণ্ডের ক্ষুদ্র সংস্করণ।

পাথর ডিঙিয়ে আমরা পথ চলছি। পাথরের নিচে ফুটে আছে ফুল। তুষারের সঙ্গে লুকোচুরি করে ছোট ছোট দুষ্টু ফুলগুলো লুকিয়ে আছে পাথরের আড়ালে। ভয়ে ভয়ে ফুটেছে বলে খুব বড় নয়। পাতাগুলো আরও ছোট। ফুল ক্ষণিকের, কিন্তু পাতাকে বেঁচে থাকতে হয় অনেক দিন। পাতার রং সবুজ। সবুজ ফুলও আছে, তবে অধিকাংশই হলুদ

কিংবা বেগুনী।

ভুইন্দার গঙ্গা বাঁক নিয়েছে ডান দিকে। বাঁকের আগে একটা বরফের পুল। ওপরে বরফ নিচে জল।

পথটি বেঁকেছে বাঁয়ে। সামনের ধৌলা বারনানী পাহাড় থেকে একটি জলধারা এসে মিলেছে ভুইন্দার গঙ্গায়। এই জলধারাই দ্বারী নদী। নন্দনকাননের দ্বার-রক্ষক। সঙ্গমকে ডাইনে রেখে আমরা এগিয়ে চললাম উত্তর-পশ্চিমে। একটু এগিয়েই দ্বারীর ওপরে একটা সাঁকো—ভূজগাছের ডাল ও পাথর দিয়ে তৈরি। খুব পিপাসা পেয়েছে। রুকস্যাক্‌গুলো পিঠ থেকে খুলে পাথরের আড়ালে রাখলাম। যা হাওয়া চলেছে, নইলে জিনিসপত্র সব উড়ে যাবে। গামছা হাতে নিয়ে নেমে এলাম নদীর তীরে। জল উড়ছে—নদীর জল। প্রবল বেগে নেমে আসছে জল। পাথরে পাথরে প্রতিহত হয়ে জল উড়ছে। উড়ন্ত জলে লেগেছে রামধনুর পরশ।

হিম-শীতল জলে তৃষ্ণা মিটিয়ে, কাকস্নান সেরে উঠে এলাম ওপরে। রুটি ও আলুসেদ্ধ দিয়ে জঠরাগ্নির জ্বালা নিবারণ করলাম।

সাঁকো পেরিয়ে খানিকটা হেঁটে আমরা চাঁদনী চকের সামনে এসেছি। ভুইন্দার উপত্যকার চাঁদনী চক চকবাজার নয়, চাঁদের আলোতেও চক চক করা একটি চূড়া। খুব উঁচু নয়, তবে সব সময়েই ওর চূড়ায় বরফ থাকে। কোন সময়েই ধস নেমে কালো হয় না। সারাদিন রোদে জ্বলে। রাতে চাঁদ থাকলে তো কথাই নেই, তারার আলোতেও চিক্ চিক্ করে।

পথের পাথর ছোট হয়েছে। কিন্তু এই অতিকায় পাথরটা এখানে এল কেমন করে? কাছে এসে দেখি ঠিক সাধারণ পাথর নয়। নিচের দিকটা ফাঁকা—অবিকল গুহার মতো। অথচ পাহাড় বেশ দূরে। গুহার মুখে কিছু পোড়া কাঠ পড়ে রয়েছে। ভেতরে ঘাস বিছানো। ভেড়াওয়ালারা বোধহয় এখনে রাত্রিবাস করে। সামনে আগুন জ্বালিয়ে রাখে, ভালুকের হাত থেকে নিস্তার পেতে।

সামনেই একটা পাথরের প্রাচীর। আমরা নন্দনকাননে এসেছি। অনেক কষ্ট করে, অনেক ঝুঁকি নিয়ে এসেছি। নীলগিরির সহজ পথ মানা গ্রাম দিয়ে। আমাদের সম্বল সামান্য, তবু অসামান্য সৌন্দর্যের আকর্ষণে এই কষ্টকর পথ বেছে নিয়েছি। এই সৌন্দর্যের পসরা সঙ্গে করে নিয়ে যাব। ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথের মতো আমরাও বলতে পারব, '...in dark winter days, I wandered in spirit to these flowerful pastures with their clear running streams set against a freeze of silver birches and shining snow peaks. Then once again I saw the slow passage of the breeze through the flowers, and heard the eternal note of the glacier torrent coming to the camp fire throught the star filled night.'

শুনেছি ভেড়ার মুখ থেকে নন্দনকাননকে রক্ষা করার জন্যে বন-বিভাগ থেকে এই পাথরের প্রাচীর তৈরি করা হয়েছে। প্রাচীর আছে কিন্তু প্রহরী নেই। প্রাচীর অর্থহীন।

উত্তরে দেওমাংরীও উইলডুঙ্গা, দক্ষিণে সপ্তশৃঙ্গ, পুবে ধৌলা বারনানী, চাঁদনীচক,

বামনিধর ও রুপিনধর, পশ্চিমে বতবন, সিংহ ও টিপরা খড়ক—এই প্রায় সাত বর্গ মাইল জুড়ে ভুইন্দার উপত্যকা। তারই মাঝে মাইল তিনেক দীর্ঘ ও মাইল খানেক প্রস্থ একটি প্রায় সমতল প্রান্তর *নন্দনকানন*। নানা রকমের গাছে বোঝাই। সব গাছেই ফুল হয়। তবে বেশির ভাগ ফুলই এখন শুকিয়ে গেছে। তাহলেও উপেনবাবু আশা করেন শ চারেক প্রজাতি সংগ্রহ করতে সক্ষম হবেন। স্মাইথ এডিনবার্গ বটানিক্যাল গার্ডেনের জন্যে ১৯৩৭ সালে আড়াই শ প্রজাতি সংগ্রহ করেছিলেন। স্মাইথের মতো আমাদেরও ফুল সরিয়ে পথ চলতে হচ্ছে। এত ফুল এক সঙ্গে কোনদিন দেখি নি। সাদা এ্যানাফেলিস ও পলিগোনাম, নীল জেরনিয়াম ও জেন্‌সিয়াম, সবুজ রুমেক্‌স, বেগুনী পোটেন্‌টিলা। তাছাড়া রয়েছে রডোডেনড্রন, প্রুনাস্‌ ও ভূজ গাছ। আরও কত গাছ, কত ফুল— উপেনবাবু শুধু নোট নিচ্ছেন।

ফুলের গন্ধ আছে জানি, কিন্তু গন্ধহীন ফুল পেলেও আমরা ফেলে দিই না। গন্ধহীন ফুল তো দূরের কথা, এখানে দেখছি অধিকাংশ পাতারও গন্ধ আছে। ভারি মিষ্টি গন্ধ—কোনটির বা পাকা কলার মতো, কোনটির বা পাকা আপেলের মতো। সবার সেরা গন্ধ হল জুনিপারের—এক রকমের ফুলহীন লতা।

গাড়োয়ালীরা একে বলে ধূপ গাছ। ওরা এই গাছের পাতা শুকিয়ে গুঁড়ো করে ধূপের কাজ চালায়। পুজো-পার্বণে ব্যবহার করে। এর ঘন সবুজ ছোট ছোট পাতাগুলো কাঁচাই জ্বলে। ভূজ গাছ ও রডোডেনড্রন গাছও কাঁচা জ্বলে। তাই আমরা নন্দনকাননের কাছে বেসক্যাম্প করেছি। কিছু কেরোসিন আমরা বার্মাশেল ও এসোর কাছ থেকে পেয়েছি। কিন্তু সে তেল দিয়ে বেস বা অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পে রান্না করব না—পাঠিয়ে দেব ওপরের শিবিরে।

আমরা খুণ্ড নদীর সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। নদী না বলে ঝরনা বলাই ভাল। বাঁদিকের খুণ্ড খড়ক থেকে নেমে এসে ভুইন্দার গঙ্গায় গিয়ে মিলেছে। বাঁ দিকে আমাদের সঙ্গে চলেছে সীমাহীন পর্বতশ্রেণী—তারই মাঝে রুপিনধর ও বামনিধর পর্বত। খুণ্ড খড়ক মনে হচ্ছে রুপিনধর থেকেই নেমে এসেছে। আর বামনিধরের পাশে রয়েছে একটি গিরিবর্ত্ম। এই গিরিবর্ত্মের ওপর দিয়েই তৈরি হবে নতুন পথ। নন্দনকানন থেকে হনুমান চটি তথা বদ্রীনাথ ধাম।

খুণ্ড নদীতে সাঁকো নেই। কয়েকখানি বড় বড় পাথর ডিঙিয়ে আমরা এপারে এলাম। এলাম নন্দনকাননের সুন্দরতম অংশে। জুলাই-অগাষ্ট মাসে এই অংশটি ছেয়ে যায় বড় বড় ফুলে। পথিক পাগল হয় এখানে এসে। পাগল হয়েছিলেন কিউ রয়েল বটানিক্যাল গার্ডেনের একজন বটানিস্ট—জোয়ান মার্গারেট লেগী।

আর একটি পাহাড়ী ঝরনা পেরিয়ে ঢালু জমির ওপর দিয়ে আমরা চললাম ভুইন্দার গঙ্গার দিকে। দূরে আরও একটি বরফের সাঁকো দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে ভুইন্দার গঙ্গা। স্বর্গের সুনীল আকাশ নেমে এসেছে মর্তের মাটিতে। তারা আনন্দ ধারায় নন্দনকাননকে সঞ্জীবিত করে ছুটে চলেছে—কখনও এক ধারায়, কখনও বহু ধারায়। জাহ্নবীও এত উচ্ছল নয়, যমুনাও এত নীল নয়। এমন পাগল-করা নদী জীবনে দেখি নি। ভাবছি—কোন কবি কি কোনকালে আসে নি এখানে? ভাবে নি—নন্দনকাননের এই সুহাসিনী স্রোতস্বিনীর নাম 'নন্দাবতী' হল না কেন?"

In loving memory
of
Joan Margaret Legge
Feb, 21st. 1885
July 4th. 1939
'I will lift up mine eyes unto the hills '
From whence cometh my help'

জীবন ও মৃত্যু দুটি সমান্তরাল রেখা। নন্দাবতী জীবনের স্পন্দন, লেগীর সমাধি মৃত্যুর নিশান। নন্দাবতীর তীরে, ফুলের বনে, অন্তিম শয়ানে জোয়ান মার্গারেট লেগী। লন্ডনের উদ্ভিদ বিজ্ঞানী। ফুলের জন্যই মরণকে বরণ করেছেন তিনি। ফ্র্যাঙ্ক এস. স্মাইথের 'Valley of Flowers' বইখানি পড়ে ছুটে এসেছিলেন এখানে। ফুলের গন্ধে আকুল হয়ে পাগলের মতো ছুটোছুটি করেছিলেন। ভুলে গিয়েছিলেন, নন্দনকাননে পাথর আছে। আর সে পাথর ফুলের মতো কোমল নয়। ফুল তুলতে গিয়ে পা ফসকে পড়ে গিয়েছিলেন নিচে, মৃত্যুকে ডেকে এনেছিলেন নিজে। হয়তো অন্তিম মুহূর্তে চারদিকের অগণিত পর্বত-শৃঙ্গের পানে চেয়েছিলেন করুণ নয়নে, কিন্তু তারা এগিয়ে আসে নি। তাতে তাঁর কিন্তু কোন ক্ষতি হয় নি। এই কাননের ফুলের ডাকে সব ফেলে, সবাইকে ছেড়ে, ছুটে এসেছিলেন তিনি। আর ঘরে ফিরে যান নি। প্রিয় ফুলবনেই শেষ-শয্যা পেতেছেন।

এ তো ইচ্ছা মৃত্যু। জীবনকে ভালবেসে জীবনদান। এ মৃত্যু তাঁকে শান্তি দিয়েছে, সুন্দর করেছে। এই তো তাঁর উপযুক্ত সমাধিস্থল—'The Valley of Flowers, a valley of peace and perfect beauty where the human spirit may find its repose.'

॥ ১৭ ॥

'বনে বনে ফুল ফুটেছে দোলে নবীন পাতা—
কার হৃদয়ের মাঝে হল তাদের মালা গাঁথা?
বহু যুগের উপহারে বরণ করি নিল কারে?
কার জীবনে প্রভাত আজি ঘোচায় অন্ধকার?'

ঘুম ভেঙে গেল। কেউ গান গাইছে। বোধ হয় বিমল। কিন্তু এখন তো তার গীতা পাঠের সময়। হয়তো মূল শিবিরের স্বর্গীয় নীরবতায়, আকাশ-মাটির মিলনের আকুলতায়—গীতা ছেড়ে গীতালির গীত গাইছে।

গতকালের পদযাত্রার কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে নন্দন-কাননের স্বর্গীয় সৌন্দর্যের কথা, সৌন্দর্যের পূজারী স্বর্গগতা মার্গারেট লেগীর কথা।

মার্গারেটের মৃত্যুর পরে কতকাল কেটে গেছে। এই সুদীর্ঘ কালে যাঁরাই নন্দন-কাননে এসেছেন, তাঁরা সবাই আমাদের মতো শ্রদ্ধাবনতশিরে একবার ওখানে দাঁড়িয়েছেন। আমাদের মতো তাঁদেরও কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এসেছে। চোখ ঝাপসা হয়ে উঠেছে, বার বার মনে হয়েছে—আমরা ধন্য, ধন্য আমাদের জীবন, ধন্য এই নন্দনকানন।

কিন্তু আমরা অভিযাত্রী। যাত্রাপথে হৃদয়াবেগকে প্রাধান্য দেবার অধিকার নেই আমাদের। তাই আমরা মার্গারেটের সমাধিকে প্রণাম করে এগিয়ে এসেছি। পর পর পাঁচটি ঝরনা পেরিয়েছি। ঝরনাগুলো বাঁদিকের দেওমাংরী বাঁক থেকে নেমে এসে নন্দনকাননকে সিক্ত করে নন্দাবতীতে মিশেছে। বাঁদিকে আমরা প্রথম যে গিরিশ্রেণীটি পেয়েছিলাম, দেওমাংরী বাঁক কিন্তু ঠিক সে গিরিশ্রেণীতে নয়। সে গিরিশ্রেণীটি বেঁকে সোজা উত্তরে চলে গেছে। ঐ বাঁককে বলে উইলডুঙ্গা বাঁক। ঠিক ঐখানেই আরেকটি গিরিশ্রেণী উত্তর থেকে এসে একটু বেঁকে পুবে প্রসারিত হয়েছে। এই বাঁককেই দেওমাংরী বাঁক বলে। এই গিরিশ্রেণীরই ওপারে নীলগিরি। আমরা এপারে বেস ক্যাম্প করেছি।

প্রথম নজরে মনে হয় নন্দনকানন সমতল। কিন্তু সত্যই তা নয়। বেশ উঁচু-নিচু। আমাদের ক্রমাগত ওঠা-নামা করতে হয়েছে। নন্দনকানন শেষ হলেও এই ওঠা-নামা শেষ হয় নি, বরং বেড়েছে। নন্দনকাননের পরে একটা বিরাট প্রান্তর—প্রায় মাইল দেড়েক দীর্ঘ। বড় বড় পাথরে বোঝাই। পাথর পেরোতে দম ফুরিয়ে আসে। ওখানে ফুল নেই কিন্তু আছে ভূজ ও রডোডেনড্রন। ওদের মাঝে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। একজন থাকলে আরেকজন থাকবেই। অনেকটা আমাদের শৈলেশদা ও প্রাণেশের মতো। হোক না একজনের ছাপ্পান্ন ও আরেকজনের বাইশ। বছর দিয়ে কি মনের ওজন মাপা যায়।

স্লিপিং ব্যাগের জিপ খুলে বেরিয়ে আসি। অমূল্য অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ঘুমোক। এর পরে রাতের পর রাত হয়তো তাকে বরফের ওপর বসে কাটাতে হবে। এ তাঁবুটিতে এখন আমরা দুজনে থাকি। এই রকম পাঁচটি, চারজনের বাসোপযোগী একটি ও একটি মেসটেন্ট অর্থাৎ বড় তাঁবু আমরা নিয়ে এসেছি। একটি ভানুর ও একটি পিনাকীর, বাকি পাঁচটি আমরা এনেছি দার্জিলিং হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের জয়াল মেমোরিয়াল ফান্ড থেকে। পর্বতারোহণের অন্যান্য সরঞ্জামও নামমাত্র ভাড়ায় তাঁরাই আমাদের দিয়েছেন। অবশ্য এজন্যে আমাদের অনেক ঝামেলা সইতে হয়েছে। কোন এক অভিযাত্রী দল নাকি সাজ-সরঞ্জামের পুরো ভাড়া মিটিয়ে দেন নি। ফলে কর্তৃপক্ষ আমাদের সাজ-সরঞ্জাম দিতে ইতস্তত করেছিলেন। কিন্তু ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ কর্নেল জসওয়ালের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ও আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর ত্বরিৎ হস্তক্ষেপে আমরা শেষ পর্যন্ত সব কিছুই পেয়েছি।

তাঁবু ছাড়াও তৈরি করা হয়েছে গুদাম, রান্নাঘর ও কুলিদের কোয়ার্টার্স। ভেড়াওয়ালাদের পরিত্যক্ত পাথরের চারটি দেওয়াল—দরজার জন্য একটু ফাঁকা। ওরা গ্রীষ্মকালে যখন ভেড়া চড়াতে আসে তখন পাথরের ওপর পাথর চাপিয়ে এমনি ছাঁদহীন ঘর তৈরি করে ডাল-পালা দিয়ে চাল ছেয়ে নেয়। আমরা আই. সি. আই-এর দেওয়া এ্যালকাথিন শীট বিছিয়ে গুদাম ও তেরপল দিয়ে রান্নাঘর বানিয়েছি। কুলিদের নিয়ে শের সিং চলে গেছে একটু দূরে। বিরাট একখানা পাথরের আড়ালে ভূজগাছের ডাল ও এ্যালকাথিন শীট দিয়ে তাদের কোয়ার্টার্স তৈরি করেছে।

নাঃ। বিমলের গান আর শোনা যাচ্ছে না। সাতটা বেজে গেছে। একটু বাদেই বেড-টি আসবে। এবার বাইরে বেরুনো যাক।

আঁধার কেটে গেছে। আকাশ ও মাটির মিলন শেষ হয়েছে। বিচ্ছেদের ব্যবধান বাড়ছে। সন্ধ্যায় শুরু হয় ওদের অভিসার। তারারা মুচকি হাসে। সে হাসি ওদের গা-সহা

হয়ে গেছে। ওরা লজ্জা পায় চাঁদের হাসিকে। ভয় পায় দিনের আলোকে।

আঁধার কেটে গেলেও রোদ আসতে অনেক দেরি। অথচ চারিদিকে সোনালি রোদের ছড়াছড়ি। রোদ পড়েছে সপ্ত শৃঙ্গের শিরে শিরে, বামনিধরের চূড়ায় চূড়ায়, রতবনের শিরায় শিরায়। খুশিতে ওরা ঝলমল করছে। কিন্তু রোদ আসছে না এখানে। দিবাকরকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে টিপ্‌রা খডক। শুধু তার মাথার ওপর আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। আমাদের আশ্বাস দিচ্ছে সে আসছে।

দূর থেকে কাছে চোখ ফেরাই। এ যে সাদায়-সাদায় সাদা হয়ে গেছে সব। সাদা আমাদের হাল্‌কা হলুদ রংয়ের তাঁবুগুলো, সাদা উপেনবাবুর ঘন সবুজ রংয়ের তাঁবুটি। কালোও সাদা হয়েছে। সাদা এ্যালকাথিন শীটের চাল। সাদা রুমেক্সের ডাল। কোথাও কোন প্রাণের স্পন্দন নেই। মনে হচ্ছে সারা অঞ্চলটাই একটা বিরাট শবদেহ। যেন কেউ তার ওপর একখানি সাদা চাদর বিছিয়ে দিয়েছে।

নিতাই ও নিরাপদর তাঁবুর কাছে এগিয়ে আসি। ওদের তাঁবুর গায়ে থার্মোমিটারটি ঝোলানো রয়েছে। সেকি! এ যে দেখছি মাইনাস ২.২ সেন্টিগ্রেড। এখন এখানেই এই। পরে ওপরে কি হবে?

কিন্তু ভয় কিসের? মৃত্যুর মাঝেও যে শোনা যাচ্ছে জীবনের জয়গান—নন্দাবতীর উচ্ছল নূপুরধ্বনি। পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সংগ্রাম করে সে বেঁচে আছে। বাঁচিয়ে রেখেছে নন্দনকাননকে।

আরও একটি প্রাণের প্রতীক রয়েছে এখানে—জাতীয় পতাকাটি। সে-ও সাদা হয় নি, সদাই সগর্বে উড়ছে। ঐ পতাকার সম্মান আমাদের রক্ষা করতেই হবে। সব বাধাবিপত্তি তুচ্ছ করে ওকে নিয়ে যেতে হবে। প্রতিষ্ঠা করতে হবে নীলগিরির রজতশুভ্র স্বপ্ন শিখরে।

"সাব্ চায়।"

পেছন ফিরে দেখি মগ হাতে ছুতার দাঁড়িয়ে। মগটা হাতে নিলাম। ছুতার চলে গেল রান্নাঘরে। এবার সে কেটলি হাতে এক তাঁবু থেকে আরেক তাঁবুতে গিয়ে সবার ঘুম ভাঙাবে। তারা কোনমতে একখানি হাত স্লিপিং ব্যাগ থেকে বের করে মাথার কাছে রাখা মগটি তুলে ধরবে ছুতারের সামনে। ছুতার মগ ভরে দেবে গরম তরল সোনালি পানীয়ে। শুয়ে শুয়েই তারা চুমুক দেবে—স্বর্গসুখ উপভোগ করবে। না, মুখ ধোবে না কেউ। উত্তাপ যে হিমাঙ্কেরও নিচে।

পকেটে হাত দিয়েই চমকে উঠি। তাই তো ডায়রিটা যে পড়াই হয় নি। পরশুদিন নিতাই নিরাপদ চঞ্চল টোপগে ও ছান্দুকে নিয়ে ভানু অগ্রবর্তী মূল শিবির বা অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পের জায়গা খুঁজতে বেরিয়েছিল, কিন্তু খুঁজে পায় নি। গতকাল সকালে তাই বীরেন প্রাণেশ চঞ্চল ও টোপগেকে নিয়ে নিরাপদ আবার বেরিয়েছিল। এবারে আর বিফল হয় নি। জায়গা খুঁজে বার করে সেখানে মালপত্র রেখে এসেছে। এই আবিষ্কারের কাহিনী প্রাণেশ ডায়েরি-বদ্ধ করে আমাকে পড়তে দিয়েছে।

চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে মগটা রান্নাঘরে রেখে, নেমে আসি নন্দাবতীর তীরে। একখানা পাথরের ওপর বসি। চারিদিক আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে। ওপারে ভূজ ও রডোডেনড্রনের পাতায় পাতায় কাঁপন জেগেছে। ডায়েরিটা বার করি। প্রাণেশ লিখেছে—

'৪ঠা অক্টোবর, ১৯৬২। বীরেনদা ও আমি চা হাতে নিয়ে তাঁবুর বাইরে তাকালাম। তুষারে ঢেকে গেছে সব, এমন কি আমাদের জুতো দুজোড়া পর্যন্ত। কাল রাতে ভুলে আমরা জুতো বাইরে রেখেছিলাম। এখন উপায়? একটু বাদেই অ্যাডভান্স বেসের জায়গা খুঁজতে বের হব। ঝেড়ে ঝুড়ে জুতো ঠিক করে নিতে হবে। জুতোয় হাত লাগালাম। এমন সময় নিরাপদ এল। আমাদের অবস্থা দেখে সে হেসেই খুন। কাল তারও এই অবস্থা হয়েছিল।

চোখে আইস গগ্‌লস, হাতে আইস এক্স, পরনে পর্বতারোহণের পোশাক, পিঠে সামন্ত অয়েল স্টোর্সের সরষের তেলের টিন। বেরিয়ে পড়লাম পথে। পথে বলা ভুল—পথ নেই এখানে। পাথরের পর পাথর ডিঙিয়ে, ঝরনার পর ঝরনা পেরিয়ে, কখনও লাফিয়ে, কখনও হামাগুড়ি দিয়ে, খুলিয়াঘাটা গিরিবর্ত্মের দিকে চলেছি। খুলিয়াঘাটার কাছাকাছি কোথাও ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড খুঁজে বের করতে হবে। আশে পাশে জল ও জ্বালানী থাকা চাই। হিমানী সম্প্রপাত স্থান (Avalanche point) হলে চলবে না।

টোপগে এগিয়ে গেছে। তাকে দেখাচ্ছে একটি বিন্দুর মতো। বীরেনদা, মাঝে মাঝে ম্যাপ দেখছেন। চড়াই—শুধু চড়াই। একটির পর একটি গিরিশিরা (ridge) উঠে গেছে। এখন যেটায় দাঁড়িয়ে আছি, নিচ থেকে মনে হয়েছিল এটাই শেষ। এখন দেখছি এর ওপরেও একটি আছে। ওখানে উঠলে হয়ত আরেকটি দেখব। এ যেন মরীচিকা।

একটা ঝরনার সামনে এসে টোপগের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। সে একখানি বড় পাথর ধরে ঠেলাঠেলি করছে। আমরাও হাত লাগালাম। পাথরখানা গড়িয়ে ঝরনার মাঝে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। ব্যাস্ পুল তৈরি হয়ে গেল। সেই পাথরে পা দিয়ে আমরা এপারে এলাম।

মাঝে মাঝে আইস-এক্স দিয়ে ধাপ কেটে, মাঝে মাঝে হামাগুড়ি দিয়ে, একটা ছোট জঙ্গলে হাজির হলাম। জঙ্গলে গাছ নেই, আছে গাছের কঙ্কাল। প্রাণহীন পত্রহীন জুনিপারের বন। মরে যায় নি, মেরে ফেলা হয়েছে। ভেড়াওয়ালারা আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে। ভেবেছে আগামী বছর যখন ভেড়া চড়াতে আসবে তখন কেটে নিয়ে যাবে। কার অন্ন কার ভোগে লাগে! এগুলো এখন আমাদের কাজে লাগবে।

ছল্ ছল্ শব্দে চমকে উঠি। জল কোথায়। সবই তো পাথর! বিরাট বিরাট পাথরের একটি প্রবাহ। তবে কি পাথরের নিচ দিয়ে জল বইছে, কিন্তু সে-জল দেখা যাচ্ছে না? বেশ খানিকটা এগিয়ে সুবিধামত জায়গা দেখে আমরা সেই পাথরের প্রবাহ পেরিয়ে এলাম।

বেলা দুটো নাগাদ অপেক্ষাকৃত একটু সমতল জায়গায় এসে উপস্থিত হলাম। জায়গাটা খুব ছোট। ভেড়াওয়ালারা নাম দিয়েছে চাকুলঠেলা। এক পাশে একখানা প্রকাণ্ড পাথর। তারই মধ্যে ছোট একটি গুহা। পাথরটির তলা থেকে একটি ঝরনা, বেরিয়ে এসেছে। উলটোদিকে গভীর খাদ। চঞ্চলদা বললেন, "কাল তো এরকম জায়গা দেখিনি। আমরা বোধ হয় অন্য পথে চলে গিয়েছিলাম।"

"ওখানে কি লেখা?" নিরাপদ চিৎকার করে উঠল। তাকিয়ে দেখি বড় পাথরখানার গায়ে খোদাই রয়েছে—'G O M B U.'

"তাহলে এখানেই বম্বে মাউন্টেনিয়ারিং কমিটি গত বছর তাঁদের অন্তর্বর্তী শিবির

স্থাপন করেছিলেন। আমার পিসতুতো ভাই গোম্বু তাঁদের দলে ছিল।" বলে টোপগে সেই গুহার মধ্যে চলে গেল।

নওয়াং গোম্বু বর্তমান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহী। দুটি ভারতীয় এভারেস্ট অভিযানেই সে শিখর অভিযাত্রীদলে ছিল। আগামী বছরের আমেরিকান এভারেস্ট অভিযানেও সে দলভুক্ত হয়েছে। *

একটু বাদে টোপগে একখানি বিবর্ণ কাগজ হাতে বেরিয়ে এল। জুন মাসের ইংরেজী খবরের কাগজ। জুন মাসেই ক্যাপ্টেন জগজিৎ সিং-এর নেতৃত্বে অল আর্মি টিম এসেছিলেন নীলগিরি জয় করতে। টোপগে তাদের সঙ্গে ছিল। মাত্র পাঁচশ ফুটের জন্য ওদের পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। আমাদের অদৃষ্টে কি আছে কে জানে। ওরা যা পারে নি, গোম্বু যা পারেন নি, আমরা তা পারব কী!

জায়গাটা আমাদের সকলেরই পছন্দ হল। শুধু শিবির স্থাপনের আদর্শ স্থান নয়। এখান থেকে চারিদিকের দৃশ্যও বড় মনোরম। পুবে রতবন, দক্ষিণ-পুবে ঘোড়ী, দক্ষিণে সপ্তশৃঙ্গের দুটি শৃঙ্গ, আর নিচে ছবির মতো ভুইন্দার উপত্যকা।

পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে আমরা ঝরনার ধারে বসে পড়লাম। সঙ্গের খাবার বেব করা হল।

বীরেনদা আবার ম্যাপ নিয়ে বসলেন। চঞ্চলদা ও নিরাপদ গিয়ে তাঁর পাশে বসল। তিন জনে পরামর্শ চলল কিছুক্ষণ ধরে। তারপর তাঁরা পাথরটির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। আমরাও ওদের পেছনে এলাম। বাযনোকুলার চোখে লাগিয়ে নিরাপদ চারিদিক দেখল।

"নীলগিরি কোথায়?" চঞ্চলদা বললেন।

নিরাপদ বায়নোকুলার হাতে পেছিয়ে এল। খাদের কাছে একখানি পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, "ঐ যে। শুধু একপাশের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। এখান থেকে শিখর দেখা যায় না।"

না যাক। যা দেখেছি, তাই বা কম কী? চারদিকের অগণিত পর্বতশৃঙ্গের মাঝে লুকিয়ে থেকে সে মুচকি হাসছে—হাসছে গত পঁচিশ বছর ধরে। তাহলেও আমরা এসেছি। এসেছি শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে। জানি না তুমি আমাদের ফিরিয়ে দেবে কিনা। জানি না আমরা ঘরে ফিরব কি না। তবু আমরা এসেছি। আজ দূর থেকে তাই তোমাকে জানাই আমাদের প্রথম প্রণাম।'

---

* শ্রীনওয়াং গোম্বু ১৯৬৩ সালের ১লা মে আমেরিকান অভিযাত্রী জেমস ডাবলু. হুইটেকারের সঙ্গে এভারেস্ট শিখরে আরোহণ করেন। বিখ্যাত পর্বতারোহী অধ্যাপক জি. ও. ডাইরেনফোর্থের সুযোগ্য পুত্র নর্মান জি. ডাইরেনফোর্থ এই প্রথম আমেরিকান এভারেস্ট অভিযানের নেতৃত্ব করেন।

শ্রী গোম্বু ১৯৬৪ সালের ২০শে জুন বেলা সাড়ে এগারোটায় শেরপা দা নরবুর সঙ্গে নন্দাদেবী শিখরে আরোহণ করেন। ক্যাপ্টেন এন কুমার এই অভিযানের নেতৃত্ব করেন।

শ্রীগোম্বু তৃতীয় (১৯৬৫) ভারতীয় এভারেস্ট অভিযানেও শিখরে আরোহণ করেছেন। লেঃ কমঃ এম. এস. কোহলী এই অভিযানের নেতৃত্ব করেন।

॥ ১৮ ॥

দিন কাটে কিন্তু রাত কাটে না। যত ভোরেই ঘুম ভাঙুক না কেন, এখানে সরকারিভাবে দিন শুরু হয় সকাল নটায়। আমরা দু তিনজন ছাড়া নটার আগে কেউ স্লিপিং ব্যাগ ছাড়ে না। আবার বিকেল পাঁচটা না বাজতেই সবাই তাঁবুতে ঢুকে পড়ে। প্রায় রোজই বিকেলে তুষারপাত লেগে আছে। সাতটা নাগাদ কাঁপতে কাঁপতে কিচেনে এসে রুটি আর আলুর ঝোল দিয়ে ডিনার সেরে, তাঁবুতে ফিরে ব্যাগস্থ হই। তারপরে রেডিও শুনে, গল্প করে কিছুক্ষণ কাটিয়ে চোখ বুজি। কিন্তু ঘুম কি আসে? জেগে থাকি একা। না, আমার সঙ্গে জেগে থাকে নন্দাবতী। নন্দাবতীর স্রোতের মতই জীবনের কত বিস্মৃত কথা ও কাহিনী কোথা হতে ভেসে আসে মনে—আবার কোথায় হারিয়ে যায়। কিন্তু রাত ফুরোয় না। ভাবি ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিই। কিন্তু রাতকে ফাঁকি দিয়ে কি হবে? রাত রাতই থাক। প্রতীক্ষারও একটা মাধুর্য আছে।

দিন কি ভাবে কেটে যায় টেরই পাই না। শুধু কাজ আর কাজ। দিনের প্রথম কাজ ডাক্তারের সামনে হাজিরা দেওয়া। রোজই সে আমাদের পরীক্ষা করে বিধান দেয়—কি খাব, স্নান করব কিনা, ওপরে যাব কিনা? ডাক্তারের ছাড়পত্র পেলে শুরু হয় কাজ। হিসেব করে বেঁধেছেঁদে অ্যাডভান্স বেসে মাল পাঠানো, টেম্পারেচার ও ব্যারোমেট্রিক প্রেসার নোট করা, রিপোর্ট ও চিঠিপত্র লেখা, ম্যাপ দেখা ও পথ ঠিক করা, উপেনবাবুর প্রজাতি সংগ্রহে সাহায্য করা—আরও কত কাজ।

অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পে এখনও তাঁবু খাটানো হয় নি। কুলিরা সেই গুহাটার মধ্যে মাল রেখে আসছে। ঘাংরিয়ার পাট চুকিয়ে পিনাকী কাল চলে এসেছে। আজ তাই সতেরোজন কুলিই আমরা এখান পেয়েছি। কিন্তু আজও সব মাল যায় নি। কুলির অভাবে আমাদের বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। দু তিনজন কুলিকে সব সময়েই বেস ক্যাম্পে রাখতে হয়। ছুতার একা রান্নার কাজ সামলাতে পারে না। কাঠ আনতেই একজন লোকের দরকার। আজ আবার একজনকে ডাকহরকরা করে জোশীমঠ পাঠানো হয়েছে।

বেস ক্যাম্প থেকে এই আমরা প্রথম ডাক পাঠালাম। প্রিয়জনদের চিঠি দিয়েছি। সবচেয়ে বেশি চিঠি লিখেছে অমূল্য ও ভানু—নেতা ও সহনেতা। প্রিয়জনের সংখ্যার দিক থেকেও দেখছি ওদের নেতৃত্ব করার যোগ্যতা আছে।

জোশীমঠের পোস্টমাস্টারের সঙ্গে আমরা বন্দোবস্ত করে এসেছি। ডাকের থলিটি পেলেই তিনি প্রয়োজন হলে টিকিট লাগিয়ে, ফর্ম পূরণ করে, চিঠি তার ও পার্শেল পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। আমাদের চিঠি-পত্র তিনি সেই ডাকহরকরার হাতেই দিয়ে দেবেন। কুলিরা কিন্তু সকলেই ডাকহরকরা হতে চায়। ওদের সবারই বাড়ি জোশীমঠের কাছাকাছি। এ রকম আর্নড্ লিভ পেলে কে ছাড়ে? জোশীমঠ যেতে চায় না শুধু একজন—অমর সিং। ওর খচ্চর মারা গেছে। ও মাকে কেমন করে মুখ দেখাবে?

এখান থেকে কলকাতায় চিঠি যেতে আট দশদিন লাগবে। এর পরে আরও বেশি। যতই ওপরে উঠব ততই দেরি হবে। ওপর থেকেও কুলিরা খবর বয়ে আনবে। আমরা ওয়াকি টকি সেট আনতে পারি নি।

দেহ ও মনে কোন প্রকার জড়তা এলে তাকে পাহাড়ের কাছে হার মানতেই হবে।

পাহাড়কে হার মানাতে পারে তারা, যারা সহ্যশক্তির সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। অনাহার-অনিদ্রা, শীত-গ্রীষ্ম, তুষার ঝড় ও বরফের ধ্বস, আরও কত। পর্বতারোহীকে হতে হবে নির্ভীক, কর্তব্যে কঠোর, সঙ্কল্পে অটল। প্রস্তুত থাকতে হবে সকল প্রকার দুর্ঘটনার জন্যে।

চারিদিকের বরফাবৃত চূড়া থেকে প্রতিফলিত সূর্যালোকে দিনের বেলায় এখানে বেশ গরম, আর রাতে প্রচণ্ড শীত। তাছাড়া অক্সিজেনের অভাব তো রয়েছেই। এই আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে আমরা আশে পাশে ছোট-খাটো পাহাড়ে উঠে শরীরটাকে ঝর-ঝরে করে নিচ্ছি। আজই আমি প্রথম পর্বতারোহণের পোশাক পরেছি—পায়ে দিয়েছি ক্লাইম্বিং বুট, গায়ে ফেদার জ্যাকেট, পরনে ফেদার ট্রাউজার, হাতে গ্লাভ্‌স, মাথায় বালাক্‌লাভা টুপি, চোখে স্নো গগ্‌ল্‌স, কোমরে বেঁধেছি দড়ি। আমরা সারি বেঁধে পাহাড়ে ওঠা শিখছি।

শৈলেশদা অনেক উঁচুতে একখানা পাথরে বসে আমাদের দেখে নিচ্ছেন। আমরা তাঁর কোমরে দড়ি বাঁধি নি। বয়স হয়েছে, পড়ে টড়ে গেলে বিপদ হবে। তাই তিনি আমাদের ওপর দারুণ চটে গেছেন। দড়িকেও লোক কত ভালবাসে!

হঠাৎ দেখি শৈলেশদা সেখানে নেই। কোথায় গেলেন। নিচে তাকাই। পড়ে যান নি তো? নাঃ ঐ যে তিনি নেমে আসছেন। একেবারে আমাদের কাছে নেমে এলেন। ইশারায় দেখালেন তিনজন লোক নন্দাবতীর গা থেকে উমাপ্রসাদ নগরে উঠে আসছে। কারা এল? কেন এল?

তিনজনের একজন কুলি। বাকি দুজনের পরনে অতি উগ্র রঙীন পোশাক। একজন বেশ লম্বা আরেকজন খুব বেঁটে। একজনের মাথায় ছোট ছোট চুল—একেবারে পাহালওয়ানের মতো। চেহারাটি কিন্তু উলটো। দ্বিতীয় জনের চুল আবার তেমনি বড় বড়। শৈলেশদা বললেন, "লোকটা পাগল। আরে এটা কি তোর লিলি-পুলের পথ যে মেয়েছেলে সঙ্গে নিয়ে এসেছিস?"

আমরা অতি কষ্টে হাসি চেপে রাখি।

আগন্তুকরা শের সিং-এর ঘর ছাড়িয়ে আমাদের এলাকার বাইরে গিয়ে থামল। আইস এক্স দিয়ে রুমেক্সের শুকনো জঙ্গল পরিষ্কার করে তাঁবু খাটাল। পাওনা মিটিয়ে কুলিকে বিদায় করে দুজনে তাঁবুর ভেতরে অদৃশ্য হল। ভালই হল। ওরা তাহলে কয়েকদিন এখানে থাকবে। শহরে প্রতিবেশী যতই দুঃসহ হোক, এই বিজন প্রান্তরে আমরা ওদের পরম প্রিয় বলেই বরণ করব।

আজকের মতো প্রশিক্ষণ শেষ। শ্রান্ত দেহে নেমে চলেছি ক্যাম্পে। প্রতিবেশীরাও দেখি এদিকে আসছে। বেশ জোরে জোরে উঠে আসছে। নিতাইকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে তার পাশ দিয়ে একটা মাঝারি গোছের পাথরে গিয়ে চড়ল। বোধ হয় ওরা আমাদের রক ক্লাইম্বিং-এর কসরত দেখাচ্ছে। শৈলেশদা এতক্ষণে তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন, "তাই বল। বড় চুল মেয়েছেলে নয়!"

আমরা এবারেও গম্ভীর। নিতাই প্রতিবেশীদের ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করল, "আপনারা কোথা থেকে আসছেন?"

"উই আর ক্লাইম্বার্স ফ্রম দি সাউথ।"

"সাউথ" শব্দটা সে এমনভাবে উচ্চারণ করল যে, দক্ষিণ ভারত বা দক্ষিণ আমেরিকা—দুই হতে পারে।

"তা আপনারা কোন্ পিক ক্লাইম্ব করতে এসেছেন?" ভানু প্রশ্ন করে।

চারিদিকে একবার নজর বুলিয়ে বড় চুল বলে, "উ'ইল্ ক্লাইম্ব দিস্ পিক।"

'সে কি! ও যে রতবন। নীলগিরি বিজয়ের পর ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ, পিটার অলিভারের সঙ্গে দুবার চেষ্টা করেও ঐ পর্বত শিখরে আরোহণ করতে পারেন নি। দু বছর পরে ১৯৩৯ সালের ৮ই অগাস্ট আঁদ্রে রশ-এর নেতৃত্বে, সুইস অভিযাত্রী আর্নস্ট হুবাব, শেরপা নিমা ও মৌর কৌলিয়া নামে একজন স্থানীয় কুলি ২০, ২৩০ ফুট উঁচু এই দুর্গম শৃঙ্গটি আরোহণ করেন।

আমাদের চুপ করে থাকতে দেখে বড়-চুল কাঁধ দুলিয়ে বলে, "আমরা ফরেন ট্রেন্‌ড্ মাউন্টেনিয়ার্স। ও ট্রেনিং নিয়েছে সুইজারল্যান্ডে আর আমি নিয়েছি চিলিতে।"

"চিলিতে?" ডক্টর ভট্টাচার্য বুঝতে পারেন না।

"চিলি, অ্যান্ডীজ, সাউথ ম্যারিকা।" বড়-চুল ব্যাখ্যা করে।

"কিন্তু শেরপা সাজ-সরঞ্জাম খাবার দাবার—কিছুই তো আপনাদের সঙ্গে দেখছি না।" বীরেন জিজ্ঞেস করে।

"আমরা শেরপা ছাড়াই ক্লাইম্ব করি। ইকুইপমেন্ট আমরা এনেছি ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং-এর কাছ থেকে। আর খাবার আমাদের সঙ্গে আছে—চা-চিনি, জ্যামজেলী আর ছত্রিশখানা আটাব রুটি।" ছোট-চুল বলে।

"কখানা?" দেবীদাস বিস্মিত।

"ছ..ত্রি..শ...খানা। দুজনের পুরো তিন দিনের খোরাক। যথেষ্ট। এই পিক্ ক্লাইম্ব করতে আর কদিন লাগবে?"

"এদের মাথার কলকব্জা ঢিলে আছে।" ডাক্তার বাংলায় বলে।

"কিন্তু ওটা হচ্ছে রতবন। স্মাইথও ওখানে উঠতে পারেন নি। তাঁর সহযাত্রী অলিভার বলেছেন—It was the hardest and steepest climb I have done in the Himalayas.' ওদের নির্ঘাৎ মৃত্যু থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করি।

"ওঃ। তাই বুঝি?" ছোট-চুল চিন্তিত।

"বেশ আমরা তবে ঐ পিক্‌টা ক্লাইম্ব করব।" বড়-চুল বলে।

"ওটা ঘোড়ী পর্বত। আরও উঁচু—২২০১০ ফুট। কোন ভারতীয় আজ পর্যন্ত উঠতে পারেন নি। ১৯৩৯ সালের ১৮ই অগাস্ট আঁদ্রে রশ, ডেভিড জগ ও ফ্রিত্‌শ স্টিউরি ঐ শৃঙ্গে আরোহণ করেন। ওটাও বেশ শক্ত হবে।" নিরাপদ পরামর্শ দেয়।

"আচ্ছা তাহলে নদীর ওপারে ঐযে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে, আমরা ওটা ক্লাইম্ব করব।"

"তাই ভাল।" ওদের উৎসাহিত করে তুলতে চাই। কারণ এবারে বড় চুল যে পাহাড়টি দেখিয়েছে, সেটি কোন পর্বতশৃঙ্গ নয়। পাথরের একটি স্তূপ—টিপরা খড়ক। দূরত্ব সামান্য, উচ্চতা বেশি নয়। আমরা কাল বিকেলেও একবার ওর ওপরে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

ওরাও যাক। গিয়ে বেড়িয়ে আসুক। টিপরা খড়ককে পর্বতশৃঙ্গ ভেবে, আর এই

বেড়ানোকে পর্বতাভিযান ভেবে ওরা যদি আত্মপ্রসাদ লাভ করে, করুক। আমরা ওদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করব না। আমবা স্মরণ করব তাঁদের, যাঁদের স্মৃতি আজ আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সহায়—যাঁরা আমাদের পথিকৃৎ।

আমরা ভাবব ১৯৫৯ সালের কথা। সে বছর গাড়োয়াল ও কুমায়ুনে সেনা বাহিনীর তিনটি বিভাগ থেকেই তিনটি অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। নৌবাহিনীর একদল অভিযাত্রী লেঃ কমঃ এম. এস. কোহলির নেতৃত্বে ২৫শে মে নন্দাকোট শৃঙ্গে (২২,৫১০ ফুট) আরোহণ করেন। স্থল বাহিনীর দলটি ক্যাপ্টেন জগজিৎ সিং-এর নেতৃত্বে ৭ই জুন কৃষ্ণচূড়া (ব্ল্যাক পিক—২০,৯৫৬ ফুট) এবং এয়ার ভাইস মার্শাল এস. এন. গয়ালের নেতৃত্বে ১৭ই অক্টোবর ২৩,৪২০ ফুট উঁচু দুর্গম চৌখাম্বা-১ আরোহণ করেন।

এলো ১৯৬০। ভারতীয় পর্বতারোহণের ইতিহাসে আরেকটি নতুন অধ্যায়—ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং-এব নেতৃত্বে প্রথম এভারেস্ট (২৯,০২৮ ফুট) অভিযান। ২৪শে মে ২৬,৭০০ ফুট উঁচুতে, সাত নম্বর শিবির স্থাপিত হল। কথা ছিল পরদিন ভোর চারটের সময় শিখর অভিযাত্রীদলের তিনজন সদস্য—ক্যাপ্টেন এন. কুমার, সোনাম গিয়াত্‌সো ও নওয়াং গোম্বু যাত্রা করবেন বিশ্বের সর্বোচ্চ স্থানটিতে। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে জানা গিয়েছিল আগামী কয়েকদিন আবহাওয়া ভালই থাকবে। জয় প্রায় করায়ত্ত। সারা দেশে রটে গিয়েছিল খবরটা। বিজয় সংবাদ এল বলে। প্রথম রাতে আবহাওয়া ভালই ছিল। কিন্তু অস্থিরমতি এভারেস্ট বেঁকে দাঁড়াল শেষ রাতে। শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়। তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করেও কোন লাভ হল না। অবশেষে মরীয়া হয়ে অভিযাত্রীদল সকাল সাতটার সময সেই দুর্যোগের মধ্যেই রওনা হলেন। তাঁরা এগিয়ে চললেন। ঝড়ের বেগ ক্রমেই বেড়ে চলল। বরফের গুঁড়ো তাঁদের নাকে মুখে আঘাত করতে থাকল। এমন কি আইস্ গগলসের রন্ধ্রপথ দিয়ে চোখে প্রবেশ করতে লাগল। তাপমাত্রা তর তর কবে মাইনাস বাইশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে নেমে গেল। ঠাণ্ডায় অক্সিজেন জমে যেতে লাগল। দৃষ্টি আচ্ছন্ন শরীর অবসন্ন, পথ দুর্গম। তবু তাঁরা এগিয়ে চললেন। পৌঁছলেন ২৮,৩০০ ফুটে। সেখানে তাঁরা পনেরো মিনিট অপেক্ষা করলেন। শেষ আশা—যদি ঝড়ের বেগ একটু কমে। বৃথাই তাদের প্রতীক্ষা। ব্যর্থ হল সকল প্রচেষ্টা। মাত্র সাতশ ফুটের জন্য এভারেস্ট রইল অপরাজিত। কিন্তু অভিযাত্রীরাও পরাজিত হন নি। কারণ—'A mountain always poses a challenge and the Himalayan giants test man's quality to the utmost. Success is important, but even more important is the spirit of daring and fellowship which alone make such attempts possible.

॥ ১৯ ॥

উনিশ শ ষাট সাল যেমন ভারতীয় পর্বতারোহণের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে, তেমনি এ বছরই বাংলার পর্বতাভিযানেরও উদ্বোধন হল। ২২শে অক্টোবর নতুন পথে দুর্গম তুষার-মৌলী নন্দাঘুণ্টি (২০,৭০০ ফুট) বিজিত হল। পর্বতাভিযানে বাংলার অবদান বহুল। হিমালয় অভিযানে যারা অপরিহার্য, সেই বীর শেরপারা সকলেই বাংলার

অধিবাসী—তাঁরা বাঙালী। তাছাড়া প্রথম এভারেস্ট অভিযানে ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট অজিতকুমার চৌধুরী ও ক্যাপ্টেন (ডাক্তার) সুধাংশুকুমার দাস অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাহলেও প্রথম বেসরকারী বাঙালী অভিযানরূপে নন্দাঘুন্টি আরোহণ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

সাফল্যের দিক থেকে বিচার করলে ১৯৬১ সাল ভারতীয় পর্বতারোহণের সুবর্ণ বৎসর। এই বছর ৬ই মে মধ্য নেপালের অপরাজিত অন্নপূর্ণা-৩ (২৪,৮৫৮) ফুট আরোহণ করা হল। লেঃ কমঃ কোহলি এই অভিযান পরিচালনা করেন। এ বিজয়ের ফলে অন্নপূর্ণার চারটি শৃঙ্গেই ভারতীয় অভিযাত্রীরা আরোহণ করলেন।

যে পর্বত শিখর বদ্রীনাথকে দিয়েছে তার ধ্যানগম্ভীর রূপ, সেই নীলকণ্ঠ (২১,৬৪০ ফুট) এতকাল দাঁড়িয়ে ছিল উদ্ধত গৌরবে, ছিল অপরাজিত। এই বছর ১৩ই জুন সে মনুষ্য পদচিহ্নে অঙ্কিত হল। ১৯৩৭ থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত সাত দল অভিযাত্রীকে পরাজিত করে, নীলকণ্ঠ তাঁর কণ্ঠস্থিত জয়মাল্যখানি পরিয়ে দিল শ্রী ও. পি. শর্মা ও তাঁর দুজন শেরপা সহযাত্রীর কণ্ঠে। এর আগে কেউ এই শৃঙ্গে ১৯,০০০ ফুটের ওপরে উঠতে পারেন নি। ক্যাপ্টেন এন. কুমার এই অভিযানের নেতৃত্ব করেন। বাঙালী ডাক্তার, লেঃ আর. সি. রায় ও ফ্লাঃ লেঃ অজিতকুমার চৌধুরী এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

এ বছরই নন্দাদেবী শিখরে দ্বিতীয় ভারতীয় অভিযান পরিচালিত হল শ্রীগুরুদয়াল সিংয়ের নেতৃত্বে। অভিযাত্রীরা সাফল্যের সঙ্গে ২০,৫০০ ফুট উঁচুতে দু নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করলেন ১০ই জুন। কিন্তু অকাল বর্ষণের কবলে পড়ে তাঁরা ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। ফেরার পথে ১৬ই জুন দেবীস্থান-১ (২১,৯১০ ফুট), ২১শে জুন মাইকতোলি (২২,৩২০ ফুট) ও ৩০শে জুন ত্রিশুল জয় করলেন।

সেপ্টেম্বর মাসে আনন্দবাজার পত্রিকার অর্থানুকূল্যে পরিচালিত হল মানা (২৩,৮৬০ ফুট) অভিযান। কিন্তু এ অভিযান বিফল হয়।

২০শে অক্টোবর পর্বতারোহণের একটি নতুন নজির স্থাপিত হল। কয়েকটি তরুণ মাত্র তিন হাজার টাকা সম্বল করে শেরপাদের সাহায্য ছাড়াই ২১,৯৬০ ফুট উঁচু নন্দাখাত শৃঙ্গে আরোহণ করেন। এই অভিযাত্রীদলে ছিলেন সর্বশ্রী পৃথ্বী চৌধুরী, বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন বসু, অমর চৌধুরী, রমেশ খান্না ও বৃজমোহন মনোচা এবং আমাদের সহযাত্রী বীরেন সরকার।

পরের দিন (২১শে অক্টোবর) শ্রী সোনাম্ গিয়াত্সোর নেতৃত্বে বিজিত হল ২২,৭০০ ফুট উঁচু সিকিমের কাঞ্চনঝাউ।

১৯৬২ সালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা মেজর জন ডায়াসের নেতৃত্বে ভারতের দ্বিতীয় এভারেস্ট অভিযান। এ অভিযানও বিফল হয়েছে। কিন্তু অভিযাত্রীরা দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে ২৮,০০০ ফুট উঁচুতে তিন দিন কাটিয়ে, মানুষের সাহসিকতা সহনশীলতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার যে পরিচয় দিয়েছেন, তা অভূতপূর্ব। প্রচণ্ড তুষার ঝড়ে পড়ে মাত্র তিনশ ফুট বাকি থাকতে তাঁরা ফিরে আসতে বাধ্য হন।

এ বছর (১৯৬২) এ পর্যন্ত একটি মাত্র পর্বতশৃঙ্গ বর্জিত হয়েছে। নেতা মেজর কে. এস. রানা তিনজন শেরপা ও ক্যাপ্টেন আলুওয়ালিয়ার সঙ্গে ২৬শে এপ্রিল কোকটাং শৃঙ্গে

(২০,১৭০ ফুট) আরোহণ করেন। আমাদের স্বপ্ন সফল হলে, আরোহণের সংখ্যা বাড়বে। কিন্তু তা হবে কী? আমরা কি পারব নীল দুর্গমের শিখরে উঠতে? নিশ্চয়ই পারব। নইলে কেন এই পুজোপার্বণের দিনে সব ছেড়ে এসেছি এখানে?

শিব শিবানীকে নিয়ে চলে গেলেন কৈলাশ। কিছুকাল কেটে গেল। মেনকা মেয়েকে না দেখে কাতর হয়ে পড়লেন। মেয়েকে আনাবার জন্য গিরিরাজ হিমালয়কে উত্যক্ত করে তুললেন। বাধ্য হয়ে তিনি মৈনাককে পাঠালেন। মৈনাক গিয়ে শিবকে বললেন—মেয়ের মুখ না দেখে মায়ের বুক পুড়ে যাচ্ছে। তাই বাবা আমাকে পাঠিয়েছেন। সপ্তমী অষ্টমী ও নবমী এই তিন দিনের জন্যে গৌরীকে ছেড়ে দিন। সে দশমীতে আবার ফিরে আসবে কৈলাশে। মহাদেব নিরুত্তর, মৈনাক উৎকণ্ঠিত, মহামায়া নির্বাক। তাঁরও একান্ত ইচ্ছা মা-বাবাকে দেখতে যান। কিন্তু শঙ্করের অমতে যান কেমন করে? শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই অনুমতি চাইলেন। শিব প্রথমে রাজী হলেন না। এমনি ভাবেই সতী একদিন দক্ষালয়ে চলে গিয়েছিলেন। আর ফিরে আসেন নি। ভগবতী তখন বিশ্বনাথকে বললেন—আমি পুজো নিতে যেতে চাইছি। সেখানে তিন দিনে তিন লক্ষ সন্তানের পুজো নেব। আপনি অনুমতি করুন হে মহেশ্বর। নিরুপায় শিব অগত্যা অনুমতি দিলেন। লক্ষ্মী সরস্বতী সহ শিবানী সিংহরথে আরোহণ করলেন। কার্তিক ও গণেশ চললেন মায়ের সঙ্গে।

মা এসেছেন দেশে। পুজো আরম্ভ হয়ে গেছে। আজ ৭ই অক্টোবর—মহাষ্টমী। মনে পড়ছে কলকাতার কথা। দুঃখ দৈন্য নিয়েছে বিদায়। আকাশ বাতাস হয়ে উঠেছে আনন্দমুখর। হাসি মুখে, নতুন পোশাকে, সবাই বেরিয়েছে পথে। প্রতিমা দেখছে—পুজো দেখছে। আর আমরা...?

আমরাও পুজো দেখছি। কলকাতায় নয়, হিমালয়ে—উমাপ্রসাদ নগরে। ডাক্তার পুজোয় বসেছে—প্রাণেশ তাকে যোগান দিচ্ছে। আয়োজন যাই হোক, সন্তানের সংখ্যা নগণ্য নয়। আমরা সবাই ভক্তিভরে পুজো দেখছি।

পুজো শেষ হল। ডাক্তার ব্রহ্মকমলের নির্মাল্য ও লর্ডসের লজেন্স প্রসাদ বিতরণ করল সবাইকে।

কুলিরা মাল নিয়ে চাকুলঠেলায় রওনা হয়ে গেল। সব মাল অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পে পাঠাতে আরও দিন দুয়েক সময় লাগবে। তবে গত কাল তাঁবু ফেলা হয়েছে। আজ তাই ভানু নিতাই নিরাপদ ও চঞ্চলকে নিয়ে অমূল্য চলে যাচ্ছে অ্যাডভান্স বেসে। পিনাকীও ওদের সঙ্গে যাবে। মালপত্র গুছিয়ে দিয়ে কাল ফিরে আসবে।

ওরা চলে যাচ্ছে। আমরাও সকাল সকাল খেয়ে নিলাম। ছুতার আজ রান্নাটা ভালই করেছে। শেরপাদের সঙ্গে সেও চলে যাচ্ছে ওপরে। কাল থেকে কুলি চন্দ্র সিং ছুতারের পদে প্রোমোশান পাবে। কি খেতে হবে কে জানে?

বেলা এগারোটার সময় অমূল্যরা রওনা হয়ে গেল। কাল থেকেই ওরা নীলগিরির নতুন পথ খুঁজতে শুরু করবে। স্মাইথ ১৯৩৭ সালে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে নীলগিরি বিজয় করেছিলেন। তাঁর মতে অন্য কোন্ দিক থেকে শিখরাভিযান সম্ভব নয়। আমরা

একবার চেষ্টা করে দেখব, নতুন কোন পথে যাওয়া যায় কি না।

অমূল্যদের নন্দাবতীর উৎস পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে তাঁবুতে ফিরে চলেছি। হঠাৎ দেখি ফরেন ট্রেনড্ মাউন্টেনিয়ার্সদের একজন একটা কিটব্যাগ কাঁধে করে জোর কদমে নন্দাবতীর দিকে চলেছে। আমাদের দেখতে পেয়েই সে দাঁড়িয়ে পড়ে। কাঁধ থেকে কিটটা নামায়। কাছে এসে দেখি বড়-চুল। সে অমূল্যদের দিকে ইশারা করে জিজ্ঞেস করে, "ওরা কোথায় চলল?"

"ওপরে। আমাদের অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পে।" বীরেন বলে।

"সেটা কোথায়?"

"চাকুলঠেলায়।"

"সে আবার কোথায়?"

"মোটামুটি উত্তরে। এখান থেকে প্রায় এগারোশ ফুট ওপরে..."

বড়-চুলের 'কোথায়'-এর স্রোত বন্ধ করার জন্য বীরেনের কথার মাঝেই বলে উঠি, "আপনি কোথায় চললেন?"

"ওপারে।"

"কেন?"

"একই কারণে।"

"মানে?"

"অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পের সাইট সিলেক্ট করতে। আইডিয়্যাল সাইট পেলে এই কিটটা সেখানে রেখে আসব।"

"আপনার কমরেড?" বীরেন বলে।

"পেটের গোলমাল। শুয়ে আছে। রুটিগুলো ঠিক বরদাস্ত হচ্ছে না।"

"আচ্ছা আপনি যান। আমি ও ডাক্তার তাকে দেখে আসব'খন।"

বড়-চুল তার জামাটা ঠিকঠাক করে, কাঁধটাকে কয়েকবার দুলিয়ে নিয়ে, কিটটাকে কাঁধে নিল। তারপর আমাদের দিকে একটি তির্যক দৃষ্টি হেনে, তার টিপরা খড়ক অভিযানের অগ্রবর্তী মূল শিবির নির্বাচনের জন্য যাত্রা করল।

চন্দ্র সিং বৈকালী ঘণ্টা বাজিয়েছে। আমরা মগ হাতে রান্না ঘরে ছুটলাম। চা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখি শের সিংয়ের সঙ্গে ছোট-চুল। কি ব্যাপার? ছোট-চুল জানাল চিলি-ট্রেন্ড কমরেড তার অ্যাডভান্স বেস থেকে আর ফিরে আসে নি। চিন্তার কথা। এ তো অ্যান্ডিজ নয়, এ যে হিমালয়। এখানে ভালুক আছে, হয়তো বা তুষার মানবও আছে। ছোট-চুল কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলে, "একটা উপায় করুন।"

কিন্তু কিছুই করতে হল না। কিছুক্ষণ বাদে সেই সর্ব-রং-সমন্বিত সাজ ধরা দিল বায়নোকুলারের লেন্সে—ঝোপ-ঝাড় ও পাথরেব মধ্যে নড়বড় করছে চিলি-ট্রেন্ড। টলতে টলতে কোন মতে নেমে আসছে। কাঁধে কিট নেই, ঠোঁটে সিগ্রেট নেই, চোখে মুখে সেই স্মার্টনেস নেই।

যেভাবেই হোক, শেষ পর্যন্ত সে এসে পৌঁছল নন্দাবতীর তীরে। আমরাও ততক্ষণে অপর তীরে এসে দাঁড়িয়েছি। চৈৎ সিংকে ওপারে পাঠালাম। আর পাঠিয়েই বিপদ হল। ঘোড়া দেখেই খোঁড়া। বড়-চুল তার ঘাড়ে চাপবে। চৈৎ সিং তাকে যতই

বোঝাক, সে কিছুতেই এই ভর-সন্ধ্যেবেলায় ক্লাইম্বিং বুট খুলে বরফ জলে নামবে না। এই জল এড়াতে গিয়েই নাকি তার এত দেরি। মাইল খানেক চড়াই ভেঙে উৎসের কাছাকাছি এক জায়গায় পাথর পেয়ে, তবে সে ওপারে গেছে। ডাক্তারকে এপারে দেখেও তার নিমোনিয়ার ভয় গেল না। অবশেষে চৈৎ সিংয়ের সওয়ার হয়ে তার অ্যাডভান্স বেস প্রতিষ্ঠা করে, বিজয় গর্বে ফিরে এল চিলি-ট্রেন্ড।

পরদিন। আজ ফরেন্ ট্রেন্ডদের সাড়াশব্দ পাচ্ছি না। অথচ বেলা দশটার সময় পিনাকীকে নেমে আসতে দেখে আমরা গলা ছেড়ে চিৎকার করেছি। পিনাকীর সম্মানে দ্বিতীয় রাউন্ড চায়ের হুকুম জারি করা হল। পিনাকী কিছু মালপত্র দিয়ে দুজন কুলি ওপরে পাঠিয়ে দিল। ডাক নিয়ে জমান সিং জোশীমঠে চলে গেল। একান্ন খানা চিঠি গেছে আজ। তার মধ্যে একত্রিশ খানাই নেতা ও সহনেতার—ওপর থেকে নিয়ে এসেছে পিনাকী। নিজের কিন্তু একখানাও নেই। পরের বোঝা বয়ে বেড়ানোই ওর কাজ। কিন্তু নিজের কথা কি কোন দিন ভাববে না পিনাকী?

হঠাৎ দেখি বড়-চুল রান্নাঘরে, "ক্যান্ আই বায় অর বরো সাম্ সিগ্রেট্স প্লিজ?"

"না, তবে এমনি দিতে পারি। ইম্পিরিয়াল টুব্যাকো আমাদের অনেক সিগারেট দিয়েছেন।" পিনাকী খাওয়া ফেলে স্টোর্স থেকে দু প্যাকেট ক্যাপ্স্টান এনে ওকে দিল। সিগারেট হাতে পেয়েও বড়-চুল কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে—আমাদের খাওয়া দেখছে।

ডাক্তার জিজ্ঞেস করে, "আপনাদের খাওয়া হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ...না, মানে, ঐ রুটিগুলো বড্ড শক্ত হয়ে গেছে। আর জেলীও গরম করে নরম করতে হবে। আচ্ছা ধন্যবাদ। চলি।"

"আরে সেকি? আসুন আসন, বসে পড়ুন। লজ্জার কি আছে?" বীরেন বলে।

"আমার বন্ধু..."

"তাকেও ডাকুন।" প্রাণেশ আশ্বাস দেয়। বড়-চুল সেখানে দাঁড়িয়েই হাতখানা একবার নাড়ে। বোধ করি সিগন্যাল দেয়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ছোট-চুল এসে গেল। সে জোর হাঁপাচ্ছে। সিগন্যাল পেয়েই ছুটে এসেছে কিনা।

পরদিন দুপুরে আমাদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করে ওরা তাঁবু গুটিয়ে ঘাংরিয়া রওনা হল। বড়-চুলের অ্যাডভান্স বেস থেকে কিট্ ব্যাগটা আমরাই কুলি দিয়ে আনিয়ে দিয়েছি। পথের খাবারও ওদের সঙ্গে দিয়ে দিয়েছি। এবারে আর ওদের শৃঙ্গ-বিজয় হল না। বোধকরি ভালই হল, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যেতে পারল।

একটু আগে মালপত্র কাঁধে নিয়ে ওরা ঘর-মুখো হয়েছে। অনেকটা দূর অবধি আমরা ওদের এগিয়ে দিয়েছি। বিদায় বেলায় আমাদের চোখের পাতা ভারী হয়ে উঠেছে। বেস ক্যাম্পের এই কর্মময় জীবনে অনেক আনন্দের জোগান দিয়ে গেছে ওরা।

ওদের বিদায় বেলায় কুলিরা কিন্তু চোখের জল ফেলে নি। তাদের বড়ই আশা ছিল বখশিস্ পাবে। কুলিদের সে আশা পূর্ণ হয় নি। বখশিস্ পায় নি কথাটা অবশ্য সম্পূর্ণ সত্য নয়। তবে যা পেয়েছ, তা তাদের কোন কাজেই আসে নি। ছত্রিশখানা রুটির চব্বিশখানাই ওরা এখানে রেখে গেছে।

॥ ২০ ॥

"সব ঠিক আছে তো?" উপেনবাবু তাঁবুতে ঢোকেন।

অমূল্যরা চলে যাবার পর আমরা সবাই মেস টেন্টে বাস করছি। উপেনবাবুকেও আমাদের তাঁবুতে নিয়ে এসেছি। তিনি শুধু অমূল্যর জায়গা দখল করেন নি, তার বাণীটি পর্যন্ত আত্মস্থ করে ফেলেছেন। 'সব ঠিক আছে তো' কথাটা অমূল্যর পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের অভিযান-অভিবাদনে পরিণত।

"না, বড্ড শীত করছে।" সাড়া দিই।

"মাইনাস আট ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডেও কি গরম লাগবে নাকি? কিন্তু খেতে গেলেন না কেন?"

"সারা বিকেল তাঁবুর ওপরের বরফ ঝেড়ে এখন বড্ড শীত করছে। তাছাড়া স্লিপিং ব্যাগটা এত করে গরম করেছি। বেরুলেই তো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু কথাটা আবার ডাক্তারকে বলবেন না যেন।"

"না বললেও ডাক্তার তা জেনে নিতে জানে।" বলতে বলতে ডাক্তার হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুতে ঢোকে। তার পেছনে একে একে বীরেন প্রাণেশ ও পিনাকী ভেতরে আসে। ডাক্তার সোজা আমার কাছে এসে দাঁড়ায়। বলে, "কি বলছিলেন উপেনবাবুকে?"

চুপ করে থাকি। ডাক্তার আবার প্রশ্ন করে, "কি হয়েছে বলুন। খেতে যান নি কেন?"

উপেনবাবু মুচকি হাসছেন। আমি গম্ভীরস্বরে বলি, "কিছুই হয় নি। তবে শরীরটা ভাল লাগছে না। তাই শুয়ে আছি।"

"কিছুই হয় নি অথচ শরীরটা ভাল লাগছে না? স্লিপিং ব্যাগের জিপ খুলুন দেখি।"

যে স্লিপিং ব্যাগের আভ্যন্তরীণ উষ্ণতার মায়ায় আহার ত্যাগ করেছি, সেই স্লিপিং ব্যাগ খুলতে হবে? তার চেয়ে ডাক্তারের হাতে আত্মসমর্পণ করাই ভাল। ডাক্তার স্টেথো আনতে যাচ্ছে। বাধা দিয়ে বলি, "ওর দরকার হবে না। আমার কিছুই হয় নি।"

"তাহলে খেতে যান নি কেন?"

"শীত লাগছিল।" বলেই হেসে ফেলি।

ডাক্তার হাঁফ ছেড়ে বাঁচে, "আমি ভাবলাম না জানি কি হয়েছে। তাই বলে শীতের ভয়ে না খেয়ে থাকবেন। না না, তা হবে না। আমি চন্দ্র সিংকে বলছি শৈলেশদার খাবারের সঙ্গে সে আপনার খাবারটাও এখানে দিয়ে যাবে।" ডাক্তার তুষারপাতের মধ্যেই আবার বেরিয়ে যায়।

ট্রানজিস্টার পর্ব শেষ হল। কিন্তু আড্ডা শেষ হল না। শুয়ে শুয়ে গুলতানি চলছে। তবে মুখ দেখা দেখি নেই। উপেনবাবু ছাড়া আমরা সবাই স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে। তিনি যথারীতি হাতে কাজ করছেন, মুখে কথা বলছেন। সারাদিন ধরে যে সব প্রজাতি সংগ্রহ করেছেন, সেগুলো ব্লটিং পেপারে চাপা দিচ্ছেন। যেদিনেরটা সেদিন না করলে প্রজাতি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এ কাজটা শুধু বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াই নয়, কিছুটা শিল্পকলাও বটে। কুঁড়ি থেকে ঝরে যাবার আগে পর্যন্ত, প্রতিটি ফুলের বিভিন্ন অবস্থার নমুনা তিনি সংগ্রহ করছেন। শুধু ফুল নয় লতাপাতাও বহু যোগাড় করেছেন। কিন্তু যোগাড় করলেই হল

না। প্রজাতিগুলো যাতে নয়নাভিরাম ভাবে সাজানো হয়, সেদিকেও তাঁর কড়া নজর।

এই সব গাছপালার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ উপেনবাবুর জীবনে এই প্রথম। ওদের জীবনচক্রের ভেতর তিনি নাকি এমন অনেক কিছু দেখেছেন যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকেও খুব উপভোগ্য। তাঁর মতে—এখানকার গাছপালারা প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য অর্থাৎ আকস্মিক ঠাণ্ডায় কোন ক্ষতি হবার আগেই তাদের বংশ বিস্তারের কাজটি সেরে নেয়। হিমালয়ের এগারো থেকে চোদ্দ হাজার ফুট উঁচুতে, জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাধারণত বরফ থাকে না। এই উচ্চতায় যেখানেই মাটি আছে, সেখানেই এ সময় নানারকমের দুর্লভ গাছপালা দেখতে পাওয়া যায়। অল্প বরফ ও তুষারপাতের মধ্যে যারা বেঁচে থাকতে পারে, তারাই শুধু এ সব জায়গায় জন্মায়। এদের অধিকাংশেরই পাতায় এমন সংরক্ষণ ব্যবস্থা আছে যে তুষার এদের কোন ক্ষতি করতে পারে না।—যেমন ভুজ রডোডেনড্রন জুনিপার ইত্যাদি। যাদের তা নেই, তারা সব কিছু বিসর্জন দিয়ে শীতের সময় বীজটিকে বরফের তলায় ঘুম পাড়িয়ে রাখে—যেমন পলিগোনাম পোটেনটিলা অর্কিস (হাতাজড়ী) ইত্যাদি। নন্দনকাননের অধিকাংশ গাছপালাই এই ধরনের জীবনযাত্রা পছন্দ করে। তাই কেবল জুলাই অগাস্ট মাসেই এখানে ফুলের বাহার।

ব্রহ্মকমল (Saussurea obvallata) হেমকমল (Saussurea grandiflora) ফেনকমল (Saussurea gossypiphora) প্রভৃতি কিন্তু অন্য উপায়ে বাঁচে। এরা আরও উঁচুতে প্রায় বরফের মধ্যে জন্মায়। ব্রহ্মকমলের পাতায় শুধু যে কাটা ও তীব্র গন্ধ আছে তাই নয়, পাতাগুলো অনেকটা এ্যালক্যাথিনের মত—বাইরের দিকটা শুষ্ক, ভেতরটা তৈলাক্ত। এই পাতাই পাপড়ির মতো ফুলটিকে ঢেকে রাখে। ফলে হিমেল হাওয়া সহজে তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। আর হেমকমল ও ফেনকমলের গাছগুলো তুলোর আঁশ দিয়ে আবৃত—যেন প্রাকৃতিক স্লিপিং ব্যাগ। এ জাতীয় আরও অনেক ফুল আছে, যেমন অ্যানাফেলিস। এরা কোন দিনই শুকিয়ে যায় না। তাই এরা বদ্রীনারায়ণের পূজার নির্মাল্য।

"ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি?"

উপেনবাবুর প্রশ্নে আমার ভাবনার সূত্র ছিঁড়ে যায়, বলি "না।"

"এখনও শীত করছে? বরফপড়া কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে। আমার কাজও শেষ হয়েছে। বেরুবেন নাকি একটু?"

ইতিমধ্যে শরীরটা বেশ গরম হয়েছে। এখন আর তেমন শীত লাগছে না। উপেনবাবুর প্রস্তাবটা মন্দ নয়। স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসি।

তাঁবুর বাইরে এসে দেখি উপেনবাবু ঠিকই বলেছেন। তুষারপাত বন্ধ হয়েছে। কিন্তু এ আমি কোথায় এলাম? এ তো উমাপ্রসাদ নগর নয়, এ যে অমরাবতী। তারায় ভরা আকাশ নেমে এসেছে আমার কাছে, যেন মুক্তো বসানো ঘন-নীল একখানি চন্দ্রাতপ কেউ দিয়েছে টাঙিয়ে। আনাগোনা করছে শুভ্র মেঘদল, যেন বলাকাকুল আপন মনে যাচ্ছে উড়ে, কোন এক অদৃশ্য সরোবরে। শুধু আকাশ নয়, চাঁদ নেমে এসেছে আমাদের তাঁবুর ঠিক ওপরে। কেন যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে। ও যদি আর একটু আসত নেমে, কিংবা আমার এই হাত দুখানি আর একটু বড় হত, তাহলে আমি ধরে ফেলতাম ওকে,

আমার শৈশবের স্বপ্ন সফল হত---চাঁদ হাতে পেতাম।

চারিদিক শুধুই সাদা। তুষারে সাদা হয়ে আছে মাটি পাথর পাহাড় জঙ্গল, এমন কি আমাদের তাঁবু কটি। চাঁদের মধুর আলোর প্রতিসরণে উপেনবাবু রূপান্তরিত হয়েছেন ছায়ায়—কায়াহীন ছায়ায়।

এই গতিশূন্য সীমাহীন স্তব্ধ জগতে আমরা অনাহুত। শুধু আমরা নই, অনাহুত ঐ নন্দাবতী। অনাদি অনন্তকাল ধরে সে জীবনের জয়গান গেয়ে চলেছে। শীতে সে অসাড় হয় নি, তুষারে উদ্বিগ্ন হয় নি, জ্যোৎস্নায় উদ্বেলিত হয় নি। তার দিন-রাত্তির প্রভেদ নেই, শীত-গ্রীষ্মের বিভেদ নেই—জরা নেই মৃত্যু নেই। অমরাবতীর প্রাণধারা এই নন্দাবতী। চিরযৌবনের প্রতীক এই নন্দাবতী। আমাদের পরম প্রেরণা এই নন্দাবতী।

অমর সিংয়ের মামা পান সিং। পান সিংয়ের মামা চন্দ্র সিং। তিনজনেই কুলি হিসেবে এসেছে আমাদের সঙ্গে। ভাগ্নে ও নাতি মাল বইছে নিয়মিত। আজ সকালেও ওরা মাল নিয়ে গেছে চাকুলঠেলায়। দাদু কিন্তু আজ কদিন হল বৃত্তি বদলেছে। কুলি চন্দ্র সিং পাচক ঠাকুর হয়েছে। রাঁধছে ভালই। আজ তাই খেতে বসে জিজ্ঞেস করি তাকে, “তুমি কি আগে কোথাও রসুইয়ের কাজ করেছ চন্দ্র?”

“জী সাব্।”

“কোথায়?”

“প্রথমে দেরাদুনে। জোন্স মেমসাবের বাড়িতে। তিনি আমাকে রান্নার কাজ শিখিয়েছেন। পরে এক আমেরিকান পর্বতাভিযাত্রী দলেরও পাচক হয়েছিলাম। তাঁরা তো আমার রান্না খেয়ে খুশি হয়ে আমাকে তাঁদের দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন।”

বিস্মিত হই। এটা তো জানা ছিল না যে আমাদের পাচকও আমেরিকা ফেরত। কৌতূহলী হয়ে চন্দ্রকে তাঁর অতীত জীবনের কথা শোনাতে অনুরোধ করি। চন্দ্র সিং বলতে থাকে—কুমায়ুনের পিথোরাগড় জেলায় তিব্বত সীমান্তের শেষ ভারতীয় বড় গ্রাম গার্বিয়াংয়ের কাছে একটি ছোট্ট গাঁয়ে তার বাড়ি। কিন্তু সে জন্মেছে গাড়োয়ালের গৌচরে, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে। বিশ বছর বয়সে দেরাদুনে এসে গুর্খা রেজিমেন্টে ভর্তি হল চন্দ্র সিং। তিন বছর বাদে ব্রহ্মদেশ পৃথক হবার পরে, তাকে চট্টগ্রাম-আরাকান সীমান্ত রক্ষায় নিযুক্ত করা হয়। ছ বছর বাদে, জাপান যুদ্ধ ঘোষণা করার পরে তাকে মণিপুরে বদলী করা হল। পরের বছরই আজাদ হিন্দু ফৌজের মুখে পড়ে সে আহত হয়। ছশ গজ দূর থেকে একটা রাইফেলের গুলি এসে তাঁর বাঁ পায়ের হাঁটুতে লাগে। দু মাস সরকারি হাসপাতালে থেকে চন্দ্র সুস্থ হয়ে ওঠে, কিন্তু তাকে আর সেনাবাহিনীতে নেওয়া হয় না। পরিবর্তে তাকে দশ বছরের জন্য ষোল টাকা মাসোহারা বরাদ্দ করে তাকে বরখাস্ত করা হয়।

চন্দ্র সিং ফিরে এল গাড়োয়ালে। ফেরিওয়ালার কাজ শুরু করল কোটদ্বারে। বাবা আলমোড়ার একটি মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দিলেন। বছর দুয়েক বাদে একটি ছেলে হল। সুখেই ছিল সে। ফেরিওয়ালা থেকে দোকানদার। ছোট্ট একটি শান্তির সংসার। কিন্তু ভগবান বাদ সাধলেন। চন্দ্রের সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। তিন বছরের একটি

অবুঝ ছেলের দায়িত্ব তার কাঁধে চাপিয়ে, সহসা স্ত্রী ইহলোক ত্যাগ করল।

চন্দ্র আবার পথে বেরুল। দোকান তুলে দিয়ে ফেরি শুরু করল। এবারে আর একা নয়। সঙ্গে তার তিন বছরের ছেলে। সারা বছর গাড়োয়ালের মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। মাল আনতে তাকে যেতে হত ঋষিকেশ হরিদ্বার দেরাদুন। দেরাদুনেই সেবার পরিচয় হল মিস্ নর্মান জোন্সের সঙ্গে।

চন্দ্র সিং আবার বৃত্তি বদলাল। ফেরিওয়ালা থেকে বাবুর্চি। জোন্স্ তাকে খুবই স্নেহ করতেন। তার ছেলেকে তিনি মিশনারি স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। চন্দ্র সিংয়ের আশা পূর্ণ হতে চলল।

কিন্তু কিছু দিন যেতে না যেতেই চন্দ্র সিং বুঝতে পারে, তার শ্রদ্ধেয়া মেম-সাব কুলবধূ নন, জনপদ বধূ। দেরাদুনের বিত্তশালী সমাজের বিলাস-সঙ্গিনী। নিত্য নব সাজে, গোধূলীলগ্নে টাঙ্গায় চড়ে তিনি বেরুতেন অভিসারে। মাঝে মাঝে যাবার আগে তাঁর সে রাতের অতিথির রসনা সম্পর্কে আভাস দিয়ে যেতেন। ফরমাশমত রসুই পাকাতে হত চন্দ্র সিংকে। বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁর হয়েছে এই দু বছরে। কিন্তু কোনদিন কোন অসুবিধায় পড়তে হয় নি তাকে। মাইনে ছাড়াও যখন যা কিছু প্রয়োজন হয়েছে, হাত পাতলেই মেমসাব তাকে দিয়েছেন। দুটো বছর তার বড়ই শান্তিতে কেটেছে। কিন্তু তার পর আবার তার জীবনের চাকা ঘুরেছে। দেশ স্বাধীন হল। সাব্‌রাও দেরাদুন থেকে একে একে পাত্‌তাড়ি গোটালেন—মেমসাবের বাজার মন্দা হল। তিনি চলে গেলেন কলকাতায়।

ছেলেকে হস্টেলে রেখে চন্দ্র আবার পথে বেরুল। তারপর পনেরো বছর কেটে গেছে। চন্দ্র সিংয়ের ঘটনাবহুল জীবনে আরও অনেক ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু ছেলেকে সে নিয়মিত টাকা পাঠাতে কসুর করে নি কোনদিন। ছেলেটি দুবছর আগে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে এখন কলেজে পড়ছে। আগামী বছর বি এ পাশ করবে। চন্দ্রের স্বপ্ন সফল হবে।

দেরাদুন থেকে চন্দ্র গেল হিমাচল প্রদেশে—মণ্ডি শহরে। কোনবারই বেশিদিন বেকার থাকতে হয় নি তাকে। এবারেও তার অন্যথা হল না। কয়েকদিনের মধ্যেই সিনেমা হলের গেট কিপারের কাজ পেয়ে গেল। বেশ মজার চাকরি। কত লোকের সঙ্গে জানাশোনা হল, খাতির পেল। সবাই সেধে আলাপ করে। তারই মধ্যে একটা দূরত্ব বজায় রাখে চন্দ্র সিং। তার মূল্য বেড়ে যায়।

কিন্তু সব নিয়ম কি সবার বেলায় খাটে? তাই সেদিন শো শুরু হবার আগে পুষ্পাকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, চন্দ্র তাকে কাছে না ডেকে থাকতে পারে নি। পুষ্পাও কিন্তু তার ডাকে সাড়া দিয়েছিল। এগিয়ে এসেছিল কাছে। করুণ কণ্ঠে বলেছিল—তার বাবা তাকে 'খেল' দেখার পয়সা দেয় নি। পঞ্চদশী কিন্নরীর অশ্রুধারা, পঁয়তিরিশোত্তর কুমায়ুনীর মন ভিজিয়েছিল। বন্ধ দুয়ার খুলে গিয়েছিল।

সদা অনুসন্ধিৎসু চন্দ্র বছর খানেকের মধ্যেই অপারেটারের কাজটা রপ্ত করে ফেলল। কিছুদিন বাদে স্থায়ী অপারেটার চলে গেলে চন্দ্র সিং গেট কিপার থেকে অপারেটার হল। তার মাইনে বাড়ল, সম্মান বাড়ল, প্রতিপত্তি বাড়ল।

পুষ্পার তো পোয়াবারো। সেও অপারেটিং রুমে তার স্থায়ী আসন করে নিল।

চন্দ্রর পাশে বসে যেদিন খুশি, যতক্ষণ খুশি, খেল দেখে সে। ছবি ছিঁড়ে গেলে দুজনে মিলে জোড়া লাগায়। দুজনের বয়সের পার্থক্য বিবেচনা করে ওদের নিয়ে কেউ কোন আলোচনা করে নি কোন দিন।

চলমান চন্দ্র সিংয়ের জীবন থেকে এইভাবে আরও একটি বছর হারিয়ে গেল। পঞ্চদশী পুষ্পা তখন সপ্তদশী কুমারী। চন্দ্রের বয়সটাও স্থির থাকে নি, বেড়েছে। কিন্তু দুজনের বয়সের পার্থক্য যেন কমে গেছে। কতখানি কমেছে তা তখনও তলিয়ে দেখে নি চন্দ্র। দেখার পালা যখন এল, তখন ভাবার সময়টুকুও ছিল না তার হাতে।

সেদিন নাইট শো শেষ হবার কিছু আগে, হঠাৎ পুষ্পা এল তার কাছে। বিস্মিত হল চন্দ্র—এই গভীর রাতে..। তার বিস্ময়ের ঘোর কেটে যাবার আগেই পুষ্পা পড়ল ভেঙে—কাল বিকেলেই পাত্রপক্ষ আশীর্বাদ করতে আসবে তাকে। আর সে আসতে পাবে না চন্দ্র সিংয়ের কাছে।

চন্দ্র আর যেতে দেয় নি পুষ্পাকে। কাউকে কিছু না বলে, মণ্ডি থেকে চিরবিদায় নিয়েছে সে রাতে। অচিন দেশের ভিন জাতের এক কিশোরীর হাত ধরে, চন্দ্র আবার নেমে এসেছে পথে।

পথে পরাশর মন্দিরে দেবতাকে সাক্ষী রেখে পুষ্পার সিঁথিতে সিঁদুর দিল লেপে। সস্ত্রীক চন্দ্র সিং এল পাউরীতে। আবার গাড়োয়ালে। বেকার রইল না সে। ডি. এ. ভি. কলেজের জনৈক অধ্যাপকের সুনজরে পড়ল। কাজ পেল—দোভাষীর কাজ। মিস জোন্‌সের বাড়িতে ইংরেজিটা শিখে নিয়েছিল চন্দ্র। তিব্বতী নেপালী গাড়োয়ালী কুমায়ুনী ও হিন্দি তার নিজের ভাষা। আরাকানী ও মনিপুরী মোটামুটি জানে সে। আর পুষ্পার প্রয়োজনে কিন্নরী ভাষাও শিখতে হয়েছে তাকে। অধ্যাপক পড়ে যান—চন্দ্র সিং সঙ্গে সঙ্গে ভাষান্তরিত করে বলে যায়। সবাই এই নিরক্ষর লোকটির মেধা দেখে বিস্মিত হন।

কর্মঠ চন্দ্র সিং অবসর সময় স্থানীয় সরকারি পশম বয়ন কেন্দ্রে কাজ করে। কলেজ ছুটি হলেই বেরিয়ে পড়ে পাহাড়ে—হাতাজড়ী ভূতকেশ ইত্যাদি দুর্মূল্য শেকড়, শিলাজিত কস্তুরী ও পশম প্রভৃতি সংগ্রহ করে চালান দেয়। এবারে আমাদের সঙ্গেও সে এই কারণেই এসেছে। এসব অঞ্চলেও ও সব জিনিস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

সেই অধ্যাপকের সুপারিশেই সেবার আমেরিকান পর্বতাভিযাত্রীদের পাচক ও দোভাষীর কাজ পেল সে। ওদের ম্যানেজার ব্যারী সাহেব তার আচরণে ও রন্ধনে এমন প্রীত হলেন যে অভিযান শেষে তাকে নিয়ে চললেন নিজের দেশে। বহুবিধ পেশার মধ্যে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা চন্দ্র সিং সঞ্চয় করেছে তার জীবনে। কিন্তু তার আমেরিকা সফরের স্মৃতি সব বৈচিত্র্যকে দিয়েছে ম্লান করে। জিজ্ঞেস করি, "যথা—?"

চন্দ্র সিং বলে চলে, "হাওয়াই জাহাজ থেকে নেমেই বুঝতে পারি, সে এক আজব দেশ। সেখানে দিন রাতের ফারাক নেই। বাড়িগুলো খাড়া পাহাড়ের মতো। রাস্তাগুলো খাদের মতো। গাড়ি চলে নদীর মতো—কত রকমের গাড়ি। কত সাব্ আর মেম। কাফ্রীও আছে। তারাও কিন্তু ভাল ভাল কোটপ্যান্ট পরে। সবাই আস্তে আস্তে কথা বলে, জোরে জোরে পথ চলে, আর আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

"ব্যারী সাব্ তার বিরাট লাল মোটরে করে আমাকে যে বাড়িটায় নিয়ে এলেন,

সেটা ঠিক ঐ রতবনের মতো উঁচু। গাড়ি থেকে নেমে বাড়িটার দিকে তাকিয়ে তো আমার দেমাক খারাপ হয়ে গেল। কত পায়রার খোপ। কিন্তু সেই চলন্ত ঘরটায় চেপে ওপরে উঠে বুঝতে পারি সেগুলো পায়রার খোপ নয়, বড় বড় ঘর—সাব্ মেমরা থাকেন। দরজাগুলো সব একইরকম। ব্যারী সাবের নেম প্লেটটা ছিল খুবই ছোট। আমি হাত দিয়ে মেপে রেখেছিলাম। একদিন অন্য ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম কি না? আর সেই বুড়ী মেমটা তো সেদিন আমাকে এই মারে কি সেই মারে। মজার ব্যাপার, বাইরে শীত কিন্তু ঘরের ভেতর গরম। বেশ আরাম লাগে। আর গোসলখানাটা দেখার মতো। কত রকমের কল—গরম জল, ঠাণ্ডা জল।

"ব্যারী সাব্ পাঁচ দিন আমাকে নিয়ে ঘুরে বেড়ালেন। সমুদ্র দেখলাম—কত জাহাজ। আর সবচেয়ে আজব হল সেই দ্বীপটা—সেখানে টিপরা খড়কের মতো উঁচু এক দেবী মূর্তি। সবাই খুব ভক্তি করে সেই দেবীকে। আমিও তাকে ফুল দিয়ে প্রণাম করেছি।

"কি করে কোন্ দিকে যেতে হয় সাব্ আমাকে সব শিখিয়ে দিলেন। তার পরে একদিন দপ্তরে যাবার সময় আমাকে টাকা পয়সা দিয়ে গেলেন। বললেন বেড়িয়ে আসতে। সাব্ চলে যাবার পর আমিও কোট প্যান্ট জুতো পরে বেরিয়ে পড়লাম। এলাম সেই চলন্ত ঘরটার কাছে। বোতাম টিপলাম। ঘরটা এল। দরজা খুলে গেল। আমি ভেতরে ঢুকলাম। দরজা বন্ধ হল। আমি একা। দরজা খুলে গেল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম। কয়েকজন সাব্ মেম ঢুকে পড়লেন। ঘরটা চলে গেল। কিন্তু কোথায় রাস্তা? জানলার কাছে দাঁড়িয়ে তো আমার চক্ষু চড়ক গাছ। রাস্তার লোকগুলোকে চুঁটির (পিঁপড়ে) মতো দেখাচ্ছে। সাবের ঘর থেকে তো চুহার (ইঁদুর) মতো দেখায়। তাহলে কি আরও উপরে উঠে এসেছি? আবার বোতাম টিপলাম। ঘরটা এল। এবারে আর ভয় নেই—ভেতরে একজন মেমসাব। দরজা বন্ধ হল। দরজা খুলে গেল। আমরা দুজনে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু কোথায় রাস্তা? এখন যদিও রাস্তার লোকগুলোকে বিল্লীর মতো দেখাচ্ছে কিন্তু রাস্তা যে অনেক নিচে। আবার ঘরটায় চড়ব? দরকার নেই বাপু। ও আমায় কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে। তার চেয়ে সিঁড়ি দিয়েই নামা যাক। ঐ তো পাশেই সিঁড়ি। সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করি। নামছি তো নামছিই। সিঁড়ির আর শেষ নেই।

"বেড়াবার সুখ বেরিয়ে গেছে। এবার ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরে যেতে পারলে হয়। সিঁড়ির একটা ধাপে বসেই জিরিয়ে নিলাম। তার পরে আবার ওপরে উঠতে শুরু করি। উঠছি তো উঠছিই। কিন্তু কোথায়? লোকগুলো যে আবার চুহার চেয়ে ছোট দেখাচ্ছে। তাহলে কি বেশি ওপরে উঠে এলাম? হয়তো হবে। আবার নিচে নামা? আমার পেটের চুহারা তখন ডন মারতে শুরু করেছে।"

এইভাবে সারাদিন ধরে চলল চন্দ্রের উত্থান ও পতন। বেড়ানো হল না, খাওয়া হল না, দিনভর কারও সঙ্গে কথা বলা হল না। বাড়িতে থেকেও ঘরে ঢুকতে পারল না চন্দ্র সিং।

অবশেষে সন্ধেবেলা শ্রান্ত দেহ বিদ্রোহ ঘোষণা করল। সে সিঁড়ির ওপরই এলিয়ে পড়ল। গভীর রাতে সেখান থেকে ব্যারী সাহেব উদ্ধার করলেন তাকে। ফিরিয়ে আনলেন নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। আর সেই দরজার সামনে এসেই ঠোঁট কামড়াল চন্দ্র।

উত্থান-পতন কালে কম করেও চার-পাঁচ বার সে সেখানে এসেছে, কিন্তু নেমে প্লেট দেখেও নিঃসন্দেহ হতে পারে নি যে সেটাই তার স্বর্গদ্বার।

॥ ২১ ॥

অনেক কথা, অনেক কাহিনী, অনেক হাসি-কান্না জড়িয়ে আছে আমাদের বেস ক্যাম্পের জীবনে। কিন্তু সে সব কথা এখন থাক।

পর্বতাভিযানে বেস ক্যাম্প হল বসতবাড়ি আর অন্যান্য ক্যাম্পগুলো হল অফিস-কাছারি। ওপরে কেউ অসুস্থ হয়েছে, পাঠিয়ে দাও বেস ক্যাম্পে। রসদ কম পড়েছে, খবর দাও বেস ক্যাম্পে। বাড়ির জন্য মন কেমন করছে, দাঁড়াও—বিকেলে ডাক আসুক বেস ক্যাম্প থেকে। আরও কত কি। যখন যা কিছু দরকার তখনই শুধু বেস ক্যাম্প, বেস ক্যাম্প আর বেস ক্যাম্প। কিন্তু না, আর বেস ক্যাম্প নয়।

অনেকক্ষণ হল সন্ধ্যা নেমেছে এখানে—এই অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পে। বেস ক্যাম্পের তুলনায় এখানে সন্ধ্যা হয় দেরিতে। জায়গাটা এগারোশ' ফুট উঁচু বলে রুপিনধর সূর্যকে আড়াল করে রাখতে পারে না। আজ সকালে শেরপাদের নিয়ে ভানু নীলগিরির নতুন রাস্তা খুঁজতে বেরিয়েছে। ওরা আলো নিয়ে যায় নি। কেনই বা নিয়ে যাবে? বিকেলের আগেই যে ওদের ফিরে আসার কথা। অথচ এখনও আসছে না। চিন্তার কথা।

কিছুক্ষণ হল নিরাপদ চঞ্চল ও ছুতার আলো নিয়ে ওদের খুঁজতে বেরিয়েছে। পর্বতারোহণের নিয়ম অনুযায়ী সন্ধ্যার পরে এরকম বাইরে বেরোনো উচিত নয়।

আজ বেস ক্যাম্প থেকে একতাড়া চিঠি এসেছে এখানে। আজ ১০ই অক্টোবর। আঠারো দিন পরে এই প্রথম আমরা ঘরের খবর পেলাম। চিঠি লিখেছেন ডেসমন্ড অমিতাভ সুকুমার রঞ্জন মাণিক শিশিরদা ও লক্ষ্মীদা। অমিতাভ আমাদের সঙ্গে আসেনি। ফলে আমরা একজন বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ সংগঠকের সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি। লক্ষ্মীদা আমাদের সাফল্য প্রার্থনা করে কালীঘাটে পুজো দিয়েছেন, সারাদিন উপোস করেছেন। জানি না সে উপবাস সার্থক হবে কিনা, তাঁর প্রার্থনা পূর্ণ হবে কিনা।

বেস ক্যাম্প থেকে তিনটি ছোট ছোট তাঁবু এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। বেস ক্যাম্পের সব ছোট তাঁবুগুলো এইভাবে একে একে ওপরে নিয়ে আসা হবে। বেস ক্যাম্পে তখন কেবল থাকবে উপেনবাবুর তাঁবু ও আমাদের মেসটেন্টটি। এখানেও কয়েকদিন বাদে কোন তাঁবু থাকবে না। নিয়ে যাওয়া হবে ওপরে। তখন এই গুহাটাই হবে আমাদের অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্প।

কারা যেন কথা কইছে! ওরা কি তাহলে ফিরে এল? হাঁ, ঐ তো আলো—টর্চের আলো। ওরা এসেছে। সবাই এসেছে। নিরাপদে এসেছে। আসবেই তো, নিরাপদ যে গিয়েছিল ওদের খুঁজে আনতে।

কিন্তু যে আশায় ভানু আজ শেরপাদের নিয়ে সারাদিন বরফ চষে বেরিয়েছে, তা ব্যর্থ হয়েছে—ওরা পথ খুঁজে পায় নি।

সময় ও সামর্থ্যের কথা ভেবে আমরা ঠিক করেছিলাম, ফ্রাঙ্ক স্মাইথের দীর্ঘ ও শ্রমসাধ্য পথে না গিয়ে, খুলিয়াঘাটা গিরিবর্ত্ম না পেরিয়ে, দুতিন মাইল উত্তরে এগিয়ে নীলগিরির দক্ষিণ দিক থেকে চেষ্টা করে দেখব যদি শিখরের কোন সংক্ষিপ্ত পথ পাওয়া

যায়। স্মাইথের পথে এখান থেকে নীলগিরির দূরত্ব কম করেও আট-নয় মাইল। নীলগিরি মানে শিখর নয়—উত্তর-পূর্ব পাদদেশ মাত্র। সেখানেই আমাদের এক নম্বর শিবির স্থাপন করে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অভিযান চালাতে হবে। তার মানে সমস্ত পাহাড়টাকে চক্কর মারতে হবে—অনেকটা মাথা ঘুরিয়ে নাক ছোঁয়ার মতো। পথে ১৬,৫০০ ফুট উঁচু খুলিয়াঘাটা গিরিবর্ত্ম পেরোতে হবে। পেরোতে হবে অসংখ্য ফাটলে বোঝাই খুলিয়াগার্ভিয়া হিমবাহ। এক নম্বর শিবির থেকে শিখরের উচ্চতা হবে প্রায় পাঁচহাজার ফুট। দূরত্ব হবে প্রায় পাঁচ মাইল। পথে অন্তত আরও দুটি শিবির করতে হবে। জায়গা পাওয়া যাবে কিনা কে জানে?

কিন্তু এ তো পঁচিশ বছর আগের হিসেব। এই পঁচিশ বছরে কত পাথর গড়িয়েছে, কত ধস নেমেছে, কত পরিবর্তন হয়েছে ভূপ্রকৃতির। তাই আমরা আশা করেছিলাম, কোন সংক্ষিপ্ত পথ নিশ্চয় পাওয়া যাবে।

সে আশা বিফল হল। ওরা পথ খুঁজে পায় নি তবে এই অন্বেষণকেও অনায়াসে একটি ছোটখাটো অভিযান বলা যেতে পারে। ভানু খুবই পরিশ্রান্ত। তাছাড়া একবার সে একটা তুষার-ফাটলের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। দু পায়ের কয়েক জায়গায় ছড়ে গেছে। অমূল্য তাকে ওষুধ লাগিয়ে দিল। ডাক্তার সব ওষুধের গায়ে গুণাগুণ ও ব্যবহারের নিয়ম লিখে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।

ছুতার চা নিয়ে এল। সাধারণত এ সময় আমরা রাতের খাওয়া সেরে ফেলি। আজ দেরি হয়ে গেছে। চায়ের চুমুক দিতে দিতে ভানু বলে—মাইল দুয়েক যাবার পরই ওরা একটা কঠিন চড়াইয়ের সম্মুখীন হয়। দুখানি দড়িতে ওরা এগিয়ে চলে। বহু বড় বড় বরফাবৃত পাথর পেরিয়ে, ওরা আরও কঠিন একটা চড়াইয়ের সামনে উপস্থিত হয়। ক্রমেই চড়াই বেশ খাড়াই হয়। ফাটলের সংখ্যা বাড়ে। ভানু নাকি এত কাছাকাছি এত বেশি ফাটল এর আগে দেখে নি।

প্রতি মুহূর্তে জীবন বিপন্ন করে, প্রতি পদক্ষেপে সংগ্রাম করে, ওরা বেলা প্রায় তিনটের সময় একটা সংকীর্ণ গিরিশিরায় আরোহণ করতে সমর্থ হয়। আশা করেছিল সেখান থেকে ওরা শিখরের পথ পাবে। কিন্তু বৃথা—সামনেই একটা বরফের প্রাচীর, চীনের প্রাচীরের চেয়েও মারাত্মক। জায়গাটাও ভয়ঙ্কর। ঠিক নিচেই একটা চওড়া ফাটল। তবুও কয়েকবার চেষ্টার পর আজীবা সেই দেওয়ালের ওপরে উঠে গেল। কিন্তু আর নয়। ওপর থেকে চিৎকার করে আজীবা জানাল আর পথ নেই—বিরাট এক খাদ। কম করেও আড়াই হাজার ফুট গভীর।

ওরা ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে প্রায় সাড়ে আঠারো হাজার ফুট উঁচু থেকে। নীলগিরির কাছে এই আমাদের প্রথম পরাজয়। কিন্তু প্রাথমিক পরাজয়ে বিচলিত হলে চূড়ান্ত সংগ্রামে জয়লাভ করা যায় না। বিচলিত আমরা হই নি, কারণ আমরা চির আশাবাদী। জয় আমাদের হবেই।

আলোচনায় বাধা পড়ে। ছুতার এসে জানায় রান্না হয়ে গেছে।

খেতে এসে সবাই খুশি। একেবারে রাজসিক ব্যাপার—থ্রি কোর্স ডিনার—ডাল আলুসিদ্ধ আর মাংস। এখানে এসে আমরা যা পাচ্ছি, তাই অমৃত বলে গলাধঃকরণ করছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত কারও কোন অসুখ হয় নি। তবে ভাল খেতে পেলে, কার না

ভাল লাগে—আনন্দ হয়। সমাজ সংসার সব ছেড়ে, এই মনুষ্যবর্জিত মৃত্যুশীতল প্রান্তরে, পাহাড় আর বরফের সঙ্গে ঘর পাতলেও—আমরা তো মানুষ।

॥ ২২ ॥

'India watches your brave progress'—তার এসেছে। পাঠিয়েছেন আমাদের হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশানের সভাপতি সুসাহিত্যিক প্রবোধকুমার সান্যাল। কলিকাতা থেকে রওনা হবার সময় প্রবোধদার সঙ্গে দেখা হয় নি। তিনি তখন ইউরোপে। ফিরে এসেই তিনি আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে তিনি অমূল্যকে একখানি চিঠিও লিখেছেন—'তোমারই পথের দিকে আমাদের মন পড়ে রয়েছে, এবং সেই মন তোমাদের প্রতি পদক্ষেপকে অনুসরণ করছে...তুমি এতদিনে দুর্গম থেকে দুস্তরের দিকে অগ্রসর হয়েছ। তোমাদের পথ নির্বিঘ্ন হোক, অটুট থাকুক, উৎসাহ এবং স্বাস্থ্য অম্লান হোক,—এই কামনা নিয়ে আমি তোমাদের নিরাপদে ফিরে আসার অপেক্ষায় রইলুম।'

চিঠিখানি হাতে নিয়ে অমূল্য উঠে দাঁড়ায়। তার চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। গম্ভীর কণ্ঠে সে বলে, "আর দেরি নয়। আমাদের দুর্গম থেকে দুস্তরের দিকে অগ্রসর হতে হবে। সারা ভারত আমাদের দিকে চেয়ে আছে। স্মাইথের পথেই আমাদের যেতে হবে। আজই যেতে হবে।"

"নিশ্চয়ই।" ভানুও উঠে দাঁড়িয়েছে। উঠে দাঁড়িয়েছে শেরপা সর্দার আজীবা ও তার সহকর্মীরা। উঠে দাঁড়িয়েছে নিতাই আর নিরাপদ।

কিন্তু সাব্যস্ত হল নিতাই ও নিরাপদ আজ অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পেই থাকবে। ভানু ও শেরপাদের নিয়ে অমূল্য এগিয়ে যাবে। সঙ্গে যাবে চারজন কুলি ও দুটি তাঁবু। আগামীকাল বাকি মালপত্র ও কুলিদের নিয়ে নিতাই নিরাপদ ও চঞ্চল রওনা হবে।

এখানের শীতই আমরা বরদাস্ত করতে পারছি না। তাঁবুর বাইরে বেরুলে মনে হয় হাত পা ও নাক অবশ হয়ে গেল। মাথাটা ঝিম ঝিম করে ওঠে। উনোনের ধারে গিয়ে বসলে একটু ভাল লাগে। কিন্তু বসার কি জো আছে? কজনই বা বসতে পারে সেখানে। তার মধ্যে আবার দুটো লেডিজ সীট। শৈলেশদা ও ডাক্তার এলেই উঠে দাঁড়াতে হয়। অমূল্য ভানু নিতাই ও নিরাপদ কিন্তু বড় একটা আগুনের ধার ধারে না। তা হলেও যেখানে ওরা যাচ্ছে সেখানে নিশ্চয়ই ওদের শীতে কষ্ট হবে।

নিতান্ত প্রয়োজনীয় মাল বার করা হল। অধিকাংশই হালকা কাঠের ছোট ছোট বাক্স। বেস ক্যাম্পে পিনাকী সব মাল খুলে ফেলে নতুন করে বাক্স বোঝাই করেছে। আইস পিনগুলোতে লোহার আংটা লাগিয়েছে। শের সিংয়ের সাহায্যে আমরা নন্দাবতীর ওপর একটা কাঠের পুল তৈরি করেছি। ওপারে প্রচুর জ্বালানী কাঠ ও অনেক দুর্মূল্য প্রজাতি পাওয়া গেছে। তাছাড়া টিপরা খড়কে বেড়াতে যাওয়াও সহজ হয়েছে। টিপরা খড়ক থেকে নীলগিরি শিখর দেখা যায়।

ডাক্তারের কথা না বলাই ভাল। কেউ মালটি-ভিটামিন ও এন্টেরোকুইনল্ ট্যাবলেট না খেলে তার 'মিল' বন্ধ। কাশি কিংবা হাঁচি হলে তো কথাই নেই।

নিতাই নিরাপদ ও চঞ্চল আজ কদিন ধরেই কুলিদের সঙ্গে খুলিয়াঘাটার ওপারে

মাল রেখে আসছে। পথে লাল নিশান পুঁতে এসেছে। ওরা এক নম্বর শিবিরের পথে রওনা হলে ট্রান্সপোর্ট অফিসার বীরেন, সহকারী প্রাণেশকে নিয়ে এই মাল ট্রান্সপোর্টের ভার নেবে।

কুলিদের সঙ্গে আমাদের কনট্র্যাক্ট হয়েছিল যে তারা বিশ হাজার ফুট পর্যন্ত মাল বইবে। বরফের ওপর কাজ করতে হবে বলে আমরা ওদের গরম পোশাক দিয়েছি ও দৈনিক এক টাকা করে বাড়তি মজুরি দিচ্ছি। কিন্তু কয়েকজন কুলি প্রথম দিনই খুলিয়াঘাটার চেহারা দেখে বেঁকে বসেছিল—পর্বতারোহণের পুরো সাজ-সরঞ্জাম না পেলে তারা মাল বইবে না। এখানে আদালত নেই। কাজেই ব্রীচ অভ কনট্র্যাক্টের বিচার নেই। বাধ্য হয়ে, নিজেদের জীবন বিপন্ন করে গা থেকে সব পর্বতারোহণের পোশাক ওদের খুলে দিতে হয়েছে।

অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক আগে খেতে বসেছি আজ। ওরা চলে যাচ্ছে। কবে আবার একসঙ্গে বসে খাব কে জানে।

সকাল থেকেই আকাশটা কেন যেন গোমরা মুখো হয়ে রয়েছে। সেই ঘন-নীল চন্দ্রাতপখানিকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়ার মতো মেঘ সর্বত্র জমে আছে। চারিদিকে একটা থমথমে ভাব। কখন কিভাবে তুষারপাত শুরু হবে কেউ বুঝতে পারছি না। তা হলেও খেয়ে উঠেই রওনা হল ওরা। শুরু হল অভিযানের চতুর্থ পর্যায়। সবার আগে চলেছে অমূল্য ও ভানু। ওরাই তো পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। সঙ্গে যাচ্ছে পাঁচজন শেরপা ও চারজন কুলি। এগিয়ে যাচ্ছে ওরা—এগোচ্ছে পাথর টপকে, শুকনো জুনিপারের দলকে পদদলিত করে।

জুনিপার অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে। ছিল কিছু লম্বা লম্বা ঘাস আর পাথরের গায়ে নক্‌শা কাটা নীল নীল ফুল। তারাও হারিয়ে গেল। পাথরের আড়ালে ছায়ায় ছায়ায় যেখানে তুষার-গলা জল ফোঁটা ফোঁটা করে ঝরে পড়ে, সেখানে প্রকৃতির অনাদরে আপন আনন্দে বেড়ে উঠেছে রং-বেরংয়ের শ্যাওলা। তারই মাঝে গলা বাড়িয়ে উঁকি মারছে দু একটি ছোট ছোট ফুল। বাইরের জগতে প্রকৃতি কি খেলা খেলছে, তারই খবর নিতে শ্যাওলা জগতের এই ক্ষুদ্র ব্যবস্থা।

আধ মাইল চড়াই ভেঙে একটি গিরিশিরায় উপস্থিত হল ওরা। এখান থেকেই হিমরেখা বা eternal snow-line। গিরিশিরাটি খুবই সংকীর্ণ। মাত্র ফুট দুয়েক চওড়া। বাঁ দিকে পাহাড়টা ধাপে ধাপে নেমে গেছে। ডান দিকে ভয়ঙ্কর খাদ—প্রায় দেড় হাজার ফুট। এখন আর খাদের দিকে তাকাতে ওদের ভয় করে না। পা ফস্‌কালে কতটা নিচে গড়িয়ে পড়বে, তা ওরা মনে মনে হিসেব করে নিয়েছে। আছাড় খেয়ে খেয়ে আছাড়ের ভয় কেটে গেছে।

গিরিশিরার শেষে খাড়া একটি বরফের দেওয়াল। খুব উঁচু নয়। স্টেপও কাটা আছে। দেয়ালের পরে আরও খানিকটা চড়াই। সেই চড়াই পেরিয়েই মনে হল—*প্রেমপাগল পবনের টানে নীল আকাশের গা থেকে সাদা ওড়নাখানি পড়েছে খসে।*

এই সেই ১৬,৫০০ ফুট উঁচু খুলিয়াঘাটা গিরিবর্ত্ম। ভুইন্দার উপত্যকা থেকে খুলিয়াগার্ভিয়ার একমাত্র প্রবেশ পথ। কত রকমের বরফ। কোথাও বেশ শক্ত, কোথাও

চিনির মতো দানাবাঁধা, কোথাও বা মিল্ক পাউডারের মতো। মাঝে মাঝেই হাঁটু পর্যন্ত তলিয়ে যাচ্ছে। খুলিয়াঘাটা যেন বলতে চায়—'যেতে নাহি দিব।' কিন্তু ওরা এগিয়ে চলে।

উত্তর-দক্ষিণ দুদিকে পাহাড়—প্রায় সবটাই বরফে ঢাকা। এখানে সেখানে একটু আধটু কালো দেখা যাচ্ছে। কালো সাদার উজ্জ্বলতা বাড়িয়েছে। পূর্বে ও পশ্চিমে দুটি উপত্যকা, ভুইন্দার ও খুলিয়াগার্ভিয়া। তবে খুলিয়াগার্ভিয়াকে উপত্যকা না বলে হিমবাহ বলাই ঠিক হবে। ভুইন্দারের শেষপ্রান্তে আমাদের বেস ক্যাম্প বা মূল শিবির, খুলিয়াগার্ভিয়ার শেষ প্রান্তে হবে আমাদে঩ ক্যাম্প ওয়ান বা এক নম্বর শিবির।

খুলিয়াঘাটা মোটেই সমতল নয়। বেশ উঁচু-নিচু। নিঃশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হয়। সব সময়েই প্রচণ্ডবেগে হাওয়া বইছে। বরফ উড়ছে। এখানে শীত ছাড়া আর কোন ঋতু নেই। তুষারঝড় ছাড়া আর কোন দুর্যোগ নেই। বরফ ছাড়া আর কোন বস্তু নেই।

কাল রাতের তুষারপাতে গত কয়েকদিনের পথরেখা নিশ্চিহ্ন। এখন লাল নিশানই পথের একমাত্র চিহ্ন। দেড়ঘণ্টা ক্রমাগত চড়াই ভেঙে সবচেয়ে উঁচু জায়গায় উঠে ওরা সবাই বরফের ওপর বসে পড়ল। আর না জিরুলে নয়। এক এক টুকরো ক্যাডবেরির চকলেট মুখে পুরল।

ওরা মেঘের ওপরে উঠে এসেছে। ওদের মনে হচ্ছে ওরা আকাশে বসে আছে। দূরে জোশীমঠের পাহাড়গুলো আব্ছা সবুজ দেখাচ্ছে। ঘোড়ী (২২,০১০) ও হাতি (২২,০৭০) পর্বত উপুড় হয়ে ওদের দেখছে—যেন এখনই মাথায় ভেঙে পড়বে। অ্যাডভান্স বেস থেকে ঘোড়ী ও হাতি ভাল করে দেখা যাচ্ছিল না—সপ্তশৃঙ্গ ওদের আড়াল করে রেখেছিল। এখান থেকে সপ্তশৃঙ্গকে বড় বেঁটে মনে হয়। বেঁটে মনে হয় ঐ উনিশ হাজার ফুট উঁচু পাথুরে পাহাড়টিকে। সে এতদিন নীলগিরিকে আড়াল করে রেখেছিল। এখান থেকে নীলগিরি শিখর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

সে কী? নীলগিরিতে বরফ নেই! আছে, তবে এদিকে নয়। নেই বলেই এত অপূর্ব। যেন ঘন বাদামী একখানি পাথরে গড়া গাড়োয়ালের এই নীলগিরি। নীল আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে সে ওদের ডাকছে কাছে।

চকলেট খাওয়া হলে যে যার ওয়াটার বট্‌ল্ থেকে খানিকটা রবিনসন্‌স লেমন বার্লি গলায় ঢেলে আকণ্ঠ তৃষ্ণার তীব্রতা কমিয়ে নিল। তার পর চারদিকে তাকাল। পশ্চিমের পর্বতমালাটি রোদে জ্বলছে। দেখা যাচ্ছে মুকুট, (২৩,৭৬০) মানা (২৩,৮৬০) মন্দির (২১,৫২০) ও কামেট (২৫,৪৪৭)। দেখা যাচ্ছে নন্দাদেবী (২৫,৬৪৫) ও আরও অনেক নাম-না-জানা শৃঙ্গ। ওদের সবার শিরে সূর্য সোনা ঢেলে দিয়েছে। খুলিয়াঘাটায়ও সোনার ছড়াছড়ি—সে হাসছে। হাসছে অমূল্য ও ভানু—ভাগ্যবানের হাসি। খুলিয়াঘাটার এমন আলো ঝলমল রূপ দেখা ভাগ্যের কথা।

এতক্ষণ ছিল চড়াই, সামনে শুরু উৎরাই। দুয়ের মাঝে এই জায়গাটুকু মোটামুটি সমতল। তবে বরফাবৃত। গত কদিন ধরে ওরা এখানেই মাল ফেলে গেছে। বহু বাক্স ও কিটব্যাগ পড়ে আছে একখানি এ্যালক্যাথিনের শীটের ওপর। নষ্ট হয় নি—এ যে প্রাকৃতিক কোল্ড স্টোরেজ। চুরি হয় নি—এখানে যে মানুষ নেই।

সমতল জায়গাটুকু উত্তর-পশ্চিমে প্রসারিত হয়ে হঠাৎ খাড়া নিচে নেমে গেছে। খুলিয়াগার্ভিয়ায় মিশেছে। এ জায়গাটাকে কুলিরা বলে 'দাড়া'। ওরা গিরিবর্ত্মকে দাড়া বলে।

কয়েকজন কুলি মাল রেখে অ্যাডভান্স বেসে ফিরে গেল। শুধু পান সিং অমর সিং ও চৈৎ সিং আজ ওপরে যাবে। বরফকে ওরা পরোয়া করে না। মোজা ও পট্টির তোয়াক্কা রাখে না। ভূজের ছাল পায়ে জড়িয়ে, এক হাঁটু বরফ ভেঙে, অক্লেশে ওরা চলাফেরা করে।

সহসা খুলিয়াঘাটার হাসি মিলিয়ে গেল। আশে পাশের সকল পাহাড়ের মাথা থেকে কে যেন সোনার মুকুটগুলো খুলে নিল। কোন এক অদৃশ্য আলাদিনের প্রদীপ ঘর্ষণে সেখানে জন্ম নিল শত সহস্র দৈত্য—কালো কুৎসিত মেঘ। তারা ছুটে এল খুলিয়াঘাটায়। আক্রমণ করল নীলগিরি অভিযাত্রীদের।

তুষার পড়ছে, বরফ উড়ছে। ঘনিয়েছে আঁধার। দু ফুট দূরেও কিছু দেখা যাচ্ছে না। দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজে ওরা বসে রইল।

ঝড়ের তাণ্ডব একুট স্তিমিত হলে ওরা সেই খাড়া উৎরাই বেয়ে আধো অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে নামতে শুরু করল। প্রতি পদক্ষেপে পা ফস্‌কে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে প্রায় কোমর অবধি তলিয়ে যাচ্ছে। একে অন্যকে টেনে তুলছে।

উৎরাই পথটুকু সোজাসুজি মোটে দু তিন ফার্লং। কিন্তু হিমানী সম্প্রপাত স্থান ও ফাটলের জন্য সোজাসুজি নামার উপায় নেই। এঁকে বেঁকে পাঁচ ছ ফার্লং ঘুরে তবে খুলিয়াগার্ভিয়ায় পৌঁছনো যায়। তাতেও হিমানী সম্প্রপাত স্থানের নিচ দিয়ে ও ফাটলগুলোর পাশ ঘেষে না চলে উপায় নেই। তাই ওদের অতি সন্তর্পণে চলতে হচ্ছে।

আবহাওয়া ভাল ছিল বলে ওরা আজ উইন্ডপ্রুফ পরে বেরোয় নি। শীতে সারা শরীর অবশ হয়ে যেতে চাইছে। তবু ওরা এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে লাল নিশান পুঁততে হচ্ছে। বলা তো যায় না কোথায় যেতে কোথায় যাবে। এগোলেই চলবে না। পৌছুবার পথও ঠিক করে রাখতে হবে। যদি পথ ভুল না হয়ে থাকে, তাহলে পরবর্তী দল এই নিশান দেখেই এগিয়ে যাবে।

॥ ২৩ ॥

সব হারিয়েও মানুষকে ভাবতে হয় তার কিছুই হারায় নি। দুর্যোগের রাতেও তাকে সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতের প্রহর গুনতে হয়। আশাই বাঁচিয়ে রাখে মানুষকে। তাকে পরাজয়ের জগৎ থেকে পরম-জয়ের শিখরে পৌঁছে দেয়।

অমূল্য চির-আশাবাদী। কোন অবস্থাতেই সে প্রকৃতির কাছে পরাজয় বরণ করতে রাজী নয়। তাই ওরা প্রাণ হাতে করে দীর্ঘ চল্লিশ মিনিট ধরে আটশ ফুট বিস্তৃত সেই ভয়ঙ্কর উৎরাই ভেঙে নিচে নেমে আসতে পেরেছে। না পারার সম্ভাবনাই বেশি ছিল। নামার সময় প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইছিল—ওদের প্রায় ঠেলে নামিয়ে নিয়ে এসেছে। ফলে সেই ভয়ঙ্কর পথেও তারা সাবধানে চলার কোন সুযোগ পায়নি। একরকম ছুটে নামতে হয়েছে। তবে যতই নিচে নেমেছে, ততই ঝড়ের বেগ কমেছে। কিন্তু তুষারপাত কমে নি। এইভাবে এগোতে এগোতে সহসা ডান দিকের প্রান্তরটি চোখে পড়েছে. ওদের। অমূল্য বলে উঠেছে, "এসো, আজ এখানেই তাঁবু ফেলে, কড়াইশুঁটির সুপ আর রুটি খেয়ে, রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাক।"

এই প্রান্তরটি খুলিয়াগার্ভিয়া হিমবাহের পার্শ্ব গ্রাবরেখার ওপরে, খুলিয়াঘাটা

গিরিবর্ত্মের ঠিক নিচে অবস্থিত। এক বর্গ মাইলের মতো জায়গা। প্রায় সমতল। তবে মাঝে মাঝে বেশ বরফ আছে। আর আছে ধূসর পাথর। বাঁ দিকে হিমবাহ ধরে পথ চললে পৌঁছনো যাবে বদ্রীনাথের উত্তরে মানা গ্রামে। দিন দুয়েক লাগে। মানা গ্রাম দিয়ে এলে এখানেই বেস ক্যাম্প করা যেত। সময় ও শ্রম দুই-ই বাঁচত। খুলিয়াঘাটাও পেরোতে হত না। কিন্তু নন্দনকানন যে দেখতে পেতাম না। তাছাড়া জায়গা পেলেই ক্যাম্প করা যায়, কিন্তু সব জায়গায় কি বেস ক্যাম্প হয়? এখানে না আছে জ্বালানী, না আছে জল।

শেরপা ও কুলিরা তাঁবু খাটাবার আয়োজন করছে। একটু জিরিয়ে নেবার জন্য অমূল্য ও ভানু বরফের ওপরই বসে পড়ে। বসেই খেয়াল হয় হাঁটু অবধি অসাড় হয়ে গেছে। জুতোর ভেতরে নরম বরফ ঢুকেছে। ঘামে ভেজা মোজা জমে শক্ত হয়ে গেছে। জুতো পরিষ্কার করে ওরা নতুন মোজা পরে নিল।

ওদের মনে হল পাহাড়ে ঘেরা এই প্রান্তরটি একটি পর্যঙ্ক (Basin)—সৃষ্ট হয়েছে ভূমি গ্রাবরেখা (Ground moraine) দিয়ে, আর দুধারে রয়েছে পার্শ্ব গ্রাবরেখা (Lateral moraine)।

তাঁবু খাটানো শেষ হল। সন্ধে হয় হয়। জনতা স্টোভ ধরিয়ে ছুতার তাদের তাঁবুতে রান্না চাপিয়ে দিল। দীপ্তি লণ্ঠন জ্বালিয়ে অমূল্য ও ভানু নিজেদের তাঁবুতে ম্যাপ নিয়ে বসল। তুষারপাত এখনও চলেছে। মনে হল সারারাতই চলবে। সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। কিন্তু এ রকম তুষারপাত মাথায় করে ঘুমোনো সম্ভব নয়। তাঁবুসুদ্ধ বরফের তলায় চাপা পড়বে। খুলিয়াঘাটায় ঝড়ের যে প্রচণ্ড তাণ্ডব চলেছে, তার তীব্র গর্জন এখানেও ভেসে আসছে। আশে পাশের পাহাড় থেকে ভেসে আসছে হিমানী সম্প্রপাতের শব্দ। হিমানী সম্প্রপাত পর্বতারোহীদের অন্যতম প্রধান শত্রু। পাহাড়ের গায়ে বরফ জমে জমে একসময় নিজের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে প্রচণ্ড বেগে নিচে নেমে আসে। তুষার ও বরফের এই আকস্মিক পতনকেই হিমানী সম্প্রপাত বলে। হিমানী সম্প্রপাতের শব্দ বহুদূর থেকে শোনা যায়। ওরাও কান পেতে তাই শুনছে। কারণ সে শব্দ যতই ভয়াবহ হক, শুনতে খারাপ লাগছে না ওদের। যেখানে যন্ত্রের আওয়াজ নেই, জনতার কোলাহল নেই, পশুর চিৎকার নেই—সেখানে বাতাসের তর্জন আর ঝড়ের গর্জনকেও বড় আপন বলে মনে হয়। ওরা সেই তর্জন-গর্জন শুনছে আর মন দিয়ে ম্যাপ দেখছে।

রুটি টিনের পিনাট (কড়াইশুটি) ও কফি নিয়ে ছুতার তাঁবুতে ঢোকে। ম্যাপ বন্ধ করে অমূল্য ও ভানু মহানন্দে খাওয়া শুরু করে। যেমন খিদে, তেমনি শীত। খিদে মিটল, শীতও কমল। ছুতার থালা ও মগ নিয়ে চলে যায়। অমূল্য বলে, "ভানু, এবারে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ো। আমি বসে আছি। দুজনের ঘুমোনো চলবে না। তাঁবুর বরফ ঝাড়তে হবে।"

"জাগতে হয় দুজনেই জাগব। জেগে জেগে ভাবব—

...হিমরেখা
নীলগিরিশ্রেণী-'পরে দূরে যায় দেখা
দৃষ্টিরোধ করি, যেন নিশ্চল নিষেধ
উঠিয়াছে সারি-সারি স্বর্গ করি ভেদ
যোগমগ্ন ধূর্জটির তপোবনদ্বারে।"

অমূল্য গলায় মেলায়, “...রাত্রি আসে,
ঘুমাবার কেহ নাই, অনন্ত আকাশে
অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্দ্রাহত
শূন্যশয্যা মৃতপুত্রা জননীর মতো।”

এইভাবে রাত কেটেছে ওদের। কোন অবসাদ আসে নি দেহে ও মনে। আজ সকালে উঠেই অমূল্য বলেছে, ‘প্যাক্ আপ।”

বাঁধাছাঁদা শেষ হলে বলেছে, “কুইক মার্চ।”

একটি তাঁবু কিন্তু গুটনো হল না। রান্নার সরঞ্জাম ও কিছু রসদ দেখে দেওয়া হল। ভাল জায়গা যখন পাওয়া গেছে তখন একটা অন্তর্বর্তী শিবির করতে দোষ কি? বরং তাতে সুবিধেই হবে। নিচে যারা রয়েছে, তারা অ্যাডভান্স বেস থেকে মাল এখানে রেখে যাবে। এক নম্বর শিবিরে যারা থাকবে, তারা সেই মাল এখান থেকে নিয়ে যাবে। এ ব্যবস্থায় কোন শিবিরেই সভ্য সংখ্যার সহসা হ্রাস-বৃদ্ধি হবে না। ফলে রসদের হিসেবও ঠিক থাকবে। সকালে অ্যাডভান্স বেস থেকে মাল নিয়ে রওনা হলে, মাল এখানে রেখে, খালি হাতে সন্ধের আগেই ফিরে যাওয়া যায়। আবার সকালে খালি হাতে এক নম্বর থেকে এখানে এসে, মাল নিয়ে সন্ধের আগেই সেখানে ফিরে যাওয়া যাবে। অ্যাডভান্স বেস থেকে এক নম্বরের দূরত্ব হবে আট ন মাইল। এই দীর্ঘ ও দুর্গম পথ একজন লোকের পক্ষে পিঠে মাল নিয়ে একদিনে অতিক্রম করা অত্যন্ত কষ্টকর। তাছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো লেগেই আছে। কবে কে পথে আটকে পড়ে কে জানে। তখন এই তাঁবুটিই হবে তার পরম আশ্রয়।

ধোঁয়াটে মেঘ নীল আকাশকে আবৃত করে রেখেছে। তুষার-ছোঁয়া হিমেল হাওয়া বইছে প্রবল বেগে। দুদিকেই চিরতুষারাবৃত পর্বতমালা। নাম-না-জানা শৃঙ্গগুলো কুড়ি থেকে তেইশ হাজার ফুট উঁচু। তবে শুধু উচ্চতা দিয়ে ওদের মাপা যায় না। টোপগের মতো অভিজ্ঞ পর্বতারোহীও বলে—ঐ সব চূড়ায় কেবল চুহারাই উঠতে পারে।

পেছনে খুলিয়াঘাটা আর ডাইনে নীলগিরির পথ। পথ মানে ‘জনপথ’ নয়। পাথর আর বরফে বোঝাই দুই পর্বতমালার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ অঞ্চল। উঁচুনিচু হলেও খুব খাড়া চড়াই-উৎরাই নয়। তারই ওপর দিয়ে চলেছে ওরা। টোপগে চলেছে সবার আগে। তার পরিচিত এ পথ। তার পেছনে দুই অ্যাডভান্স ট্রেনড্—অমূল্য ও ছান্দু—উনিশ বছরের তরুণ শেরপা। তার পর ভানু, আং টেম্বা, আং দাওয়া ও ছুতার। সবার শেষে প্রবীণ সর্দার আজীবা। সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও সবচেয়ে সহনশীল বলেই সে রয়েছে সবার পেছনে।

মাইলের পর মাইল কেবল পাহাড়। কোনটি গোল, কোনটি ছুঁচলো, কোনটি বা আকারহীন মেঘের মতো। এক নজরে বোঝা যায় না—কোন্‌টি মেঘ আর কোন্‌টি পাহাড়। কেউ নীল, কেউ লাল, কেউ বাদামী। কেউ সাদা আবার কেউ বা কৃষ্ণকালো। দিনান্তের রক্তপলাশী রোদ গড়িয়ে পড়বে ওদের পায়ে, ছড়িয়ে যাবে সারা গায়ে। তার পর মাথায় সস্নেহ পরশ বুলিয়ে বিদায় নেবে একটি রাতের জন্য। পর্বতপুরীর রাজকন্যারা তখন ম্লান মুখে খুলে ফেলবে তাদের নানা রংয়ের উৎসব-সাজ, মুছে ফেলবে সকল

প্রসাধন। শিথিল শরীর পড়বে এলিয়ে। হাঁটুতে মুখ গুঁজে, তারা নীরবে কান্নার ঝরনা বইয়ে দেবে। প্রভাতের প্রহর গুনবে—রক্তপলাশী রোদের প্রতীক্ষায়।

একটা বাঁক পেরিয়েই নীলগিরি সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিগোচর হল। সামনে ডান দিকে। খুলিয়াঘাটার ওপর থেকে ওরা নীলগিরির বাদামী পাথুরে কঠিন রূপ দেখে মোহিত হয়েছে। এখান থেকেও তার অমল ধবল কোমল তুষারময় রূপ দেখে ওরা বিমোহিত হল। নীলগিরি বিশাল, নীলগিরি সুন্দর। সবচেয়ে সুন্দর তার শিখর—পর্বতারোহীর স্বপ্ন-শিখর। মনে হয় নীল আকাশের নিচে একখানি সোনালি বর্শাফলক সূর্যের রক্তিম রশ্মিতে রাঙা হয়ে আছে।

কখনও হাঁটু অবধি বরফে ডুবে যাচ্ছে, কখনও আইস এক্স বরফে তলিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝেই ফাটল—ছোট বড় নানা আকারের, নানা ধরনের। কোনটি সরলরেখা, কোনটি বক্ররেখা—যেন কোন শিল্পী আপন খেয়ালে তুলি বুলিয়েছেন। অতি সাবধানে ওদের সেই ফাটল পেরোতে হচ্ছে। সবাই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছে। জোরে জোরে নিশ্বাস হচ্ছে। পিপাসায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। পকেট থেকে লজেন্স নিয়ে মুখে পুরছে। শ্রান্তি কমছে, কিন্তু পিপাসা মিটছে না। সবাই জলের আশায় এদিক সেদিক চাইছে। জল থেকে হয় বরফ। বরফ থেকে জল। চারিদিকে বরফ, আকাশে সূর্য কিন্তু কোথায় জল নেই—এক ফোঁটা জল।

হ্যাঁ আছে। ঐ তো টোপগে যাচ্ছে ছুটে। সামনের ঐ ফাটলের মধ্যে নিশ্চয় একটু জল আছে। এই যথেষ্ট। এ টুকুই সবাই ভাগ করে খাবে। কিন্তু কেমন করে? আবার পিঠ থেকে রুকস্যাক নামিয়ে মগ বার করতে হবে? না, কি দরকার? এই তো অমূল্য কেমন খাচ্ছে। উপুড় হয়ে শুয়ে ফাটলের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে। গরুর মতো জিভ দিয়ে চেটে চেটে জল খাচ্ছে। প্রয়োজনে মানুষকেও দেখছি গরু হতে হয়।

চড়াই ও উৎরাই প্রায় সমান সমান। তাই ওরা তেমন ওপরে উঠতে পারছে না। খুলিয়াগার্ভিয়া উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রসারিত। মোটামুটি তেরো থেকে ষোল হাজার ফুট উঁচু। ১৯৩৭ সালে ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ যখন এখানে এসেছিলেন তখন এ অঞ্চল প্রস্তর পরিপূর্ণ ছিল। তিনি এখানে লতা ও গুল্মের চিহ্ন দেখেছিলেন। ফলে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে অঞ্চলটি পনেরো হাজার ফুটের বেশি উঁচু নয়।

আবার একটি ফাটল। প্রায় এক ফার্লং লম্বা। ফাটলের দু পাশই বিপজ্জনক। এবারে উপায়? আজীবা কিন্তু ফাটলের মধ্যেই নেমে গেল। ওরা তাকে অনুসরণ করে। এ যেন কাশীর গলি।

নির্বিঘ্নেই সে গলি পেরিয়েছে ওরা। তার পরেও এগিয়েছে অনেকটা—কম করেও মাইল দুয়েক। এখন বেলা দুটো। প্রায় পাঁচঘণ্টা হেঁটে পৌঁছেছে খুলিয়াগার্ভিয়ার শেষ প্রান্তে—একটি ছোট্ট মালভূমিতে। একেবারে নীলগিরির পাদমূলে। আর পথ নেই। সামনেই একটা বরফের দেয়াল। ভানু বলে, "এই সেই আইস্ ফল বা হিম-প্রপাত।"

অমূল্য বলে, "হল্ট"।

নীলগিরির দক্ষিণ-পশ্চিমে খুলিয়াগার্ভিয়া হিমপ্রবাহের উৎসের কাছে এই মালভূমি-সদৃশ ক্ষেত্রটিতে প্রতিষ্ঠিত হল আমাদের এক নম্বর শিবির। এখানকার উচ্চতা ১৬,৩০০ ফুট। আজ ১২ই অক্টোবর। কলকাতা থেকে রওনা হবার বিশ দিন পরে প্রথম অভিযাত্রী

দল নীলগিরির পাদমূলে পৌঁছল।

স্থানটি শিবির প্রতিষ্ঠার জন্য আদর্শ ক্ষেত্র। কাছাকাছি কোন হিমানী সম্প্রপাত-বিন্দু নেই। অস্থির প্রকৃতির কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হয়েও স্থির। বরফের অবস্থাও সহনীয়। তবে আশে পাশে কোথাও জল নেই। থাকাও সম্ভব নয়। বরফ গলিয়ে জল বানাতে হয়। জল ছাড়া যে মানুষ বাঁচতে পারে না। অভিযাত্রীরাও তো মানুষ।

আমাদের এক নম্বর শিবিরের পুবে নীলগিরি, পশ্চিমে কয়েকটি অজানা শৃঙ্গ, উত্তর সেই হিম-প্রপাত। এই প্রপাত পেরিয়ে উত্তর-পুব দিক থেকে শিখরে আরোহণ করতে হবে। সোজাসুজি এখান থেকে শিখরের দূরত্ব মাইল খানেক। উচ্চতার পার্থক্য পাঁচ হাজার ফুটও নয়। কিন্তু সোজাসুজি শিখরে যাবার উপায় নেই। অসংখ্য অনতিক্রম্য বরফের দেয়াল ও ফাটল।

এখানে বসে কল্পনাও করা যায় না—আমাদের এই বসুন্ধরা ধনে-ধান্যে পুষ্পে ভরা। কল্পনাও করা যায় না—এই নীলগিরির নিচেই নন্দনকানন, আর পাগল-করা নদী নন্দাবতী। এখানে শুধু সীমাহীন পাহাড় ও অন্তহীন তুষার। নাইবা রইল ফুল, নাইবা রইল ফল, নাইবা রইল জল—এখানে যা রয়েছে তা যে আর কোথাও নেই। এখানে আছে নীলগিরি—নভোনীলে নীলগিরি।

তাই ওরা আজ এখানে এসেছে সব কিছু ছেড়ে, সব কিছু ভুলে। শুধু ভাবছে কেমন করে যাবে ঐ স্বপ্ন-শিখরে। ভাবুক অমূল্য, ভাবুক ভানু। আমরা ফিরে আসি বেস ক্যাম্পে, দেখুন! সেখানে আমাদের দিন কাটে কিভাবে!'

॥ ২৪ ॥

'I am speaking to you...about the grave situation...because of continuing and unabashed aggression by the Chinese forces.'

সে কী! চীন প্রকাশ্যভাবে ভারত আক্রমণ করেছে? নিশ্চয়ই করেছে। নইলে জাতির উদ্দেশ্যে বেতার বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু কেন বলছেন—

'We have done our utmost to prevent war from engulfing the world. But...a powerful and unscrupulous opponent...has...threatened...the freedom of our people and the independence of our country.'

তাঁর মতো শান্তিকামী নেতাও ঘোষণা করছেন, 'we must gird up our loins and face this...I have no doubt...that we shall succeed.'

নিশ্চয়ই। জয় আমাদেরই হবেই। কিন্তু কেন এমন হল? প্রায় একমাস হল আমরা কলকাতা ছেড়েছি, তবে সংযোগ তো হারাই নি। সপ্তাহে দু দিন করে আমাদের লোক জোশীমঠে যাচ্ছে। চিঠিপত্র ও খবরের কাগজ আনছে। কেউ তো জানায় নি এরকম পরিস্থিতির কথা। কাগজেও তো কিছু দেখি নি। তাছাড়া ট্র্যানজিস্টার রেডিও তো আছেই। তবে তিন-চারদিন হল সেটি বিগড়ে গিয়েছিল। বহু চেষ্টা করে একটু আগে পিনাকী সেটিকে মেরামত করেছে। আর তার পরেই রেডিও খুলে চমকে উঠেছি।

এখান থেকে তিব্বত সীমান্ত সোজাসুজি মাত্র মাইল দশেক। সোজাসুজি পথ নেই

বটে, তবে মানা বা নীতি দিয়ে আক্রমণ করলে, আমরা ঘেরাও হয়ে পড়ব। তাই বলে কি আমরা পালিয়ে যাব? অভিযান বন্ধ করে দেব?

না, অর্ধপথে অভিযান বন্ধ করা মানে নৈতিক দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদী চীনের এই নির্লজ্জ আক্রমণের কাছে নতি স্বীকার করা। ঠিক হল যুদ্ধের সংবাদ ওপরে জানানো হবে না যাতে কথাটা কুলিদের কানে না যায়। ডট্‌পেনটা নিয়ে লিখলাম, 'প্রিয় অমূল্য, জয়ী হয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। আমরা তোমাদের পথ চেয়ে বসে আছি।'

কি আর হবে বসে থেকে। কাল কি করব তা কালই ঠিক করা যাবে। রাতের খাওয়া শেষ করেই যে যার স্লিপিংব্যাগে ঢুকে পড়লাম। বীরেন ও প্রাণেশ এখন অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্পে। ওরা ক্যাম্প ওয়ান থেকে ফিরে এসেছে। এবারে উপেনবাবু ও শৈলেশদা ক্যাম্প ওয়ানে যাবেন। আমাদের কারও পর্বতারোহণের পোশাক নেই, সবই ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছি। তবুও শৈলেশদা যাবেন। তিনি আমাদের শুনিয়ে দিয়েছেন, "এই জামাকাপড় ও হান্টার পরেই আমি রণেশের সঙ্গে গোমুখ থেকে বদ্রীনাথ গেছি। ১৯,৫১০ ফুট উঁচু কালিন্দী খাল পেরিয়েছি। এই হান্টার পরেই আমি নীলগিরি থেকে বেড়িয়ে আসব।"

বেস ক্যাম্পে আজ আমরা মোটে পাঁচজন। দেবীদাস ডাক্তার শৈলেশদা আমি ও উপেনবাবু। উপেনবাবু শেষ পর্যন্ত ৪৩৫ প্রজাতি সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। শীত এসে গেছে। এ সময়ে এত প্রজাতি সংগ্রহ করা সত্যই বিস্ময়কর। এজন্য অবশ্য তাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। ইতিমধ্যে প্রজাতি খুঁজতে খুঁজতে তিনি একবার জোশীমঠ পর্যন্ত চলে গিয়েছিলেন। তবে তাঁর সে পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। এমন কয়েকটি দুর্লভ গাছ তিনি পেয়েছেন, যা অন্য কোন সময়ে পাওয়া যেত না।

পিনাকী ও চঞ্চল কাল সকালে ক্যাম্প ওয়ানের দিকে রওনা হয়ে গেছে। শেরপা ছান্দু ও আং টেম্বা পরশুদিন অ্যাডভান্স বেসে এসেছিল। জানিয়ে গেছে ওরা ক্যাম্প টু-এর জায়গা পেয়েছে। রাস্তাও তৈরি করে ফেলেছে। কিন্তু স্থায়ীভাবে চলে যেতে পারছে না, কারণ খাবার নেই। পিনাকী তো রেগেই আগুন। তার হিসেবে গরমিল? খাবার নিয়ে নিজেই রওনা হয়ে গেছে।

এদিকে আমাদের কিন্তু শোচনীয় অবস্থা। টিনের খাবার যা ছিল, তা সব আগেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সামান্য যা আটা-আলু, চা-চিনি, চাল-ডাল, নুন ও গুঁড়ো দুধ ছিল, তার অধিকাংশই পিনাকী নিয়ে গেছে। তবে কাল সকালে লোক গেছে জোশীমঠ। কিন্তু সেও তো চারদিনের ধাক্কা। এদিকে শীতও বাড়ছে। আজ ভোরের উত্তাপ ছিল মাইনাস ২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। নন্দাবতী থেকে জল নিয়ে ওপরে আসতে আসতেই বরফ হয়ে যায়। সরষের তেল পর্যন্ত জমে যাচ্ছে।

কিন্তু এসব কথা এখন ভেবে আর কি হবে? মরণপণ করেই তো এখানে এসেছি। আমি ভাবছি বিশ্বাসঘাতক প্রতিবেশীর কথা। বর্বর চীনের এই অতর্কিত আক্রমণের কথা। বিশাল আমাদের দেশ, বিশালতর তার সীমান্ত। সারা উত্তর সীমান্ত জুড়েই গিরিরাজ হিমালয়। এতকাল সে ছিল আমাদের সীমান্তরক্ষী। শুধু সীমান্তরক্ষী নয়, ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারক। তিন হাজার বছর আগে লেখা ঋগ্বেদে প্রথম হিমালয়কে বলা হয়েছে গিরিরাজ। উপনিষদে উমাকে কল্পনা করা হয়েছে হিমালয়ের কন্যা। গঙ্গা হয়েছেন

হিমালয়ের ভগিনী। শিব মূর্ত হয়েছেন হিমাচ্ছাদিত শৈলে। মেরুপর্বত হয়েছে বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু। শতাব্দীর পর শতাব্দী কত সত্যদ্রষ্টা ঋষি কত উপচারে সাজিয়েছেন হিমালয়কে। নিজেদের চিন্তা-ভাবনা আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন হিমালয়ে।

অনন্তকাল ধরে হিমালয় আমাদের অনেক দিয়েছে। শিবালয় হিমালয়ে অসংখ্য দেবালয় আর অগণিত তীর্থ—যা না থাকলে ভারত শিবহীন হত, ধর্মহীন হত। হিমালয়ের হিমানী গলে সৃষ্টি হয়েছে নদী—যে নদী না থাকলে ভারত জলহীন হত। হিমালয়ে রয়েছে কুবেরের ভাণ্ডার—অজস্র প্রাকৃতিক সম্পদ। এই সম্পদকে কাজে না লাগাতে পারলে ভারত সম্পদহীন থেকে যাবে। হিমালয়ে বাস করে লক্ষ লক্ষ মানুষ, যাদের জীবনে উন্নতি না আনতে পারলে, ভারতের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যর্থ হবে।

সেই হিমালয়কে কুক্ষিগত করতে চাইছে চীন। অসুররূপী এই আক্রমণকারীর কবল থেকে হিমালয়কে রক্ষা করতে হলে, পার্বত্য যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হতে হবে আমাদের। হিমালয়ের প্রতিটি গিরিবর্ত্মে, প্রতিটি গ্রাবরেখায়, প্রতিটি উপত্যকায় গড়ে তুলতে হবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। পর্বতারোহণ শিক্ষা আজ অপরিহার্য এদেশে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম খেয়াল নেই। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল—একটা খসখস আওয়াজে। আমাদের তাঁবুর চারিদিকে কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষ না জন্তু? মানুষ বলতে তো আমরা কটি প্রাণী আর কুলিদের কজন। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর কুলিরা এখন বিশ্রাম করছে। এই তুষারঝরা রাতে তারা তাঁবুর চারিপাশে ঘুরে বেড়াবে কেন? এখানে আসা অবধি কোন জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয় নি। কিন্তু তাঁবুটা যে সত্যিই নড়ছে। খুব জোরে নড়ছে। নাঃ, আর শুয়ে থাকা সম্ভব নয়। স্লিপিং ব্যাগের চেন খুলে হাত বাড়িয়ে এভাররেডি টর্চটা জ্বালি। উপেনবাবু জুতো পরছেন। বলি, "কোথায় যাচ্ছেন একা একা?"

কিন্তু কাকে বলা! তিনি ততক্ষণে টর্চ ও আইস এক্স নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে তাঁবুর বাইরে। শৈলেশদা এবং দেবীদাসেরও ঘুম ভেঙে গেছে। ওদের তাড়াতাড়ি আসতে বলে আমিও বাইরে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু কোথায়? কেউ নেই, কিছু নেই। তবে তাঁবু নাড়াল কে? অনেক খোঁজাখুঁজি হল। কিন্তু তার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না।

ফিরে এলাম তাঁবুতে। রাত এখন তিনটে। যুদ্ধের সংবাদ দিয়ে এই কালরাত্রি শুরু হয়েছে। রাত না ফুরোতেই কেউ আমাদের তাঁবু আক্রমণ করেছে। সে কে? স্মাইথ নাকি এখানে সেই Abominable Snowman-এর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। তার কেউ নয় তো? হলে ভালই হয়। কারণ তুষারমানব বা ইয়েতি সত্যই আছে কি না, তা নিয়ে শুধুই তোলপাড় হল।

এই তোলপাড় কবে থেকে শুরু হয়েছে তার সঠিক কোন হিসেব নেই। তেনজিং বলেছেন—তাঁর জন্মের আগেই তাঁর বাবা মাকালুর কাছে বরুণ হিমবাহে প্রথম ইয়েতি দর্শন করেন। ইয়েতিটা দেখতে ছিল অনেকটা স্ত্রী-বনমানুষের মতো। লম্বায় ফুট চারেক। গায়ে বড় বড় ছাইরংয়ের লোম—কোমরের ওপরে ঊর্ধ্বমুখী ও নিচে নিম্নমুখী। চোখ

দুটি কোটরাগত। মাথাটা ওপর দিকে ছুঁচলো। তীক্ষ্ণ শিস দিতে দিতে দুপায়ে ভর দিয়ে সে অনায়াসে একটা চড়াই বেয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

তেনজিংয়ের বাবা তার পর এক মাস শয্যাশায়ী ছিলেন। তিনি ১৯৩০ সালে আরও একবার ইয়েতি দর্শন করেছিলেন। তেনজিং সেবারে প্রথমে এভারেস্ট অভিযানে এসেছেন। তাঁর বাবা রংবুক হয়ে এক নম্বর শিবিরে এলেন তেনজিংয়ের সঙ্গে দেখা করতে। তাকে একা সেখানে রাত কাটাতে হল। কারণ সবাই তখন দু নম্বর শিবিরে। পরদিন ভোরে তিনি অমনি একটা তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ শুনতে পেয়ে, তাঁবুর পর্দা তুলে দেখতে পেলেন একটি ইয়েতি হিমবাহের দক্ষিণ দিক থেকে এসে উত্তরে মিলিয়ে গেল।

তেনজিং নিজেও ইয়েতির অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তিনি বলেন, 'এরা মানুষ নয়, জন্তু। এরা সাধারণত রাতে চলাফেরা করে। পাহাড়ী গাছপালা ও জন্তু জানোয়ার খেয়ে বেঁচে থাকে।'

১৯৫২ সালের দুটি সুইস এভারেস্ট অভিযানেই ইয়েতি নিয়ে হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল। থিয়াংবোচে মঠ পেরিয়ে খুম্বু হিমবাহের নাকের (Snout) কাছে তারা সাড়ে এগারো ইঞ্চি লম্বা পৌনে পাঁচ ইঞ্চি চওড়া পায়ের ছাপ পান। ছাপগুলো ছিল একটি সরল রেখায়? দুটি ছাপের দূরত্ব ছিল বিশ ইঞ্চি। সবচেয়ে বিস্ময়কর হল, ছাপগুলো হঠাৎ এক জায়গায় শুরু হয়ে হঠাৎ এক জায়গায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। দুজন সুইস বিজ্ঞানী অনেক খোঁজাখুঁজি করেও ছাপের সৃষ্টিকর্তাদের খুঁজে বার করতে পারেন নি।

সে বছরই শরতকালে দ্বিতীয় এভারেস্ট অভিযাত্রীদলের কুলিরা একই জায়গায় ইয়েতি দেখতে পেয়েছিল। তাদের মতে—ইয়েতিটা চার থেকে পাঁচ ফুট লম্বা, গায়ে ঘন বাদামী রংয়ের লোম ও চওড়া চোয়াল। কুলিদের দেখেই সে প্রকাণ্ড হাঁ করে, জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। কিন্তু শেষে কি ভেবে তীক্ষ্ণ শিস দিয়ে হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায়।

ইয়েতি সমস্যা সমাধানের জন্য ১৯৫৪ সালে একটি ইঙ্গ-ভারতীয় অভিযান ও এই বছর (১৯৬২) হিলারীর মাকালু অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযাত্রীরা কয়েকটি পদচিহ্ন ছাড়া আর কিছুই আবিষ্কার করতে পারেন নি।। *

তবে ১৯৫৫ সালে নেপালের সোলো খুম্বুতে খুমজুং ও পাংবোচে মঠে তেনজিং দুটি মাথার খুলি দেখেছিলেন। খুলি দুটির ওপরের দিকটা তেমনি ছুঁচলো ও তখন পর্যন্ত লোমাবৃত ছিল। তবে দুটির লোম একরকম নয়। খুমজুংয়েরটির কালো ও মোটা—ঠিক শুয়োরের মতো। আর পাংবোচেরটা ছাই রংয়ের—হয়তো বা অল্প বয়সের। মঠের লামারা এদের শুভ প্রতীক বলে মনে করেন কিন্তু কোথায় পেয়েছেন তা বলতে পারেন না।

শেরপারা বলে ইয়েতিদের আদিনিবাস হল সোলো খুম্বুতে। নামচে বাজার (১০,০০০ ফুট) ও থামে (১২,০০০ ফুট) পেরিয়েই ওদের এলাকা। আগে নাকি ওরা সংখ্যায় বেশ ভারী ছিল। তবে এখন খুবই কমে গেছে। কেমন করে কমে গেল, তা নিয়ে ওদের মধ্যে একটি মজার গল্প প্রচলিত আছে।

---

*১৯৬৪ সালের ৩রা অক্টোবর ল্যাংট্যাং লিরুং অভিযাত্রীরা তাঁদের ২০,০০০ ফুট উঁচু মুল শিবিরের কাছে চারটি আঙুল সহ নয় ইঞ্চি লম্বা ও পাঁচ ইঞ্চি চওড়া ইয়েতির পদচিহ্ন দেখতে পেয়েছেন। দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার পিটার টেলার এই অভিযানের নেতৃত্ব করেছেন।

সে অনেক দিন আগের কথা। কতকাল আগের তা কেউ জানে না। তার্গনা গ্রামে রোজ রাতে ইয়েতিরা এসে বাড়িঘর ও ক্ষেতখামার নষ্ট করত। তারপর আবার নিজেরাই সেগুলোকে ঠিক করার চেষ্টা করত—কিন্তু পারত না। এই অত্যাচার থেকে রেহাই পাবার জন্য অবশেষে গ্রামবাসীরা একটা ফন্দি বার করল। ওদের এলাকায় গিয়ে ছাং (মদ) ও খুক্‌রী রেখে দিয়ে এল। ইয়েতিরা ছাং খেয়ে মাতাল হয়ে খুক্‌রী নিয়ে নিজেদের মধ্যে মারামারি করে নির্বংশ হয়ে গেল।

শেরপাদের মতে ইয়েতিরা দু রকমের—মেত্রে ও চুত্রে। মেত্রেরা আকারে ছোট কিন্তু মানুষখেকো। আর চুত্রেরা বড় কিন্তু মানুষখেকো নয়।

বৈজ্ঞানিক স্যান্ডার্সন বলেছেন, 'I am firmly convinced that they range from extremely primitive humans, without true speech, tools or knowledge of fire-making and still in varying degrees hairy'. হারওয়ার্ডেন বলেছেন, 'a creature covered with thick black fur with a considerable mane hanging from its head.' বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জুলিয়ান হাক্সলে বলেছেন—ইয়েতি ভালুক জাতীয় জন্তু। Abode of Snow-এর রচয়িতা বিখ্যাত ভৌগোলিক কেনেথ মেসন বলেছেন—ইয়েতি এক রকমের বনমানুষ বা ভালুক।

টিলম্যান, এরিক সিপ্‌টন ও হাওয়ার্ড বেরীও নাকি এদের সন্ধান পেয়েছিলেন। তেনজিং এবং হিলারীও এদের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু কেউই প্রমাণ করতে পারেন নি। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে তারা যা পারেন নি, নিখরচায় আমাদের ভাগ্যে যদি তা জুটে যায় তো মন্দ কি? কিন্তু শেরপারা যে বলে জীবন্ত ইয়েতি দেখলেই নাকি মরণ অনিবার্য।

॥ ২৫ ॥

কিসের শব্দ? নাঃ ধস নয়। ধসের আওয়াজ ক্ষণস্থায়ী। এ তো ক্রমেই বাড়ছে। আমাদের সবারই ঘুম ভেঙে গেছে। বাইরে বেরিয়ে এলাম। আরে! উমাপ্রসাদ নগরের আকাশে এরোপ্লেন। আহা কতদিন ও শব্দ শুনি নি, কতদিন এরোপ্লেন দেখি নি, কতদিন যান্ত্রিক সভ্যতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখি নি। কিন্তু যন্ত্রহীন এ জগতে এই যন্ত্রদানবের আগমন কেন? মানুষকে যারা যন্ত্রে পরিণত করার যুদ্ধে মেতেছে, তাদের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই তো? সম্ভবত আছে, কারণ কোন চিহ্নই যে নেই এর গায়ে!

পুরো ভুইন্দার উপত্যকাটিকে চক্কর মেরে চাকুলঠেলার ওপর দিয়ে এরোপ্লেনটা সোজা উত্তরে চলে গেল। কেন এল, কি দেখল আর কোথায় গেল?

চন্দ্র সিং চা নিয়ে এল। আমরাও তাঁবুতে ফিরে এলাম। কিন্তু চা বলতে যা বোঝায় চন্দ্র সিংয়ের হাতে তা নয়। চন্দ্র সিং নুন-চা নিয়ে এসেছে। এখন এ-ই অমৃত। নুনের অবস্থাও নাকি ভাল নয়। চন্দ্র সিং ওয়ার্নিং দিয়ে গেল। এক মাসের অভিযানে যদি দেড় মাস লাগে তবে নুনের আর দোষ কি?

হঠাৎ দেবীদাস চিৎকার করে ওঠে, "দেখুন দেখুন কি রকম বরফ পড়ছে।"

সত্যই তো। এখানেই এই, ওপরে না জানি কি হচ্ছে। গত কয়েক দিন এখানে তুষারপাত হয় নি দেখে ভেবেছিলাম আবহাওয়া বোধ হয় ভাল হয়ে গেল। কিন্তু এ কি

কাণ্ড!

দেবীদাস আবার বলে, "শৈলেশদা এখন বাইরে গিয়ে বরফের মধ্যে গড়াগড়ি খেতে পারেন?"

"কেন পারব না? কি দেবে বলো।"

"পাঁচ টাকা।"

"ঠিক?"

দেবীদাস মাথা নাড়ে। শৈলেশদা লাফিয়ে ওঠে। লাফিয়ে ওঠে ডাক্তার। খুনে আসামীর মতো শৈলেশদাকে গ্রেপ্তার করে। বলে, "এ আমি কিছুতেই অ্যালাউ করব না। এই ছেলেমানুষীর ফলে ফ্রস্ট বাইট পর্যন্ত হতে পারে, জানেন?"

"রেখে দাও তোমার ফ্রস্ট বাইট। আজ দেবীর পাঁচ টাকা আমি খসাবই।'

এক ঝটকায় ডাক্তারের হাত ছাড়িয়ে তাঁবুর ফুটো দিয়ে বাইরে গলে যান শৈলেশদা। আমরা বেরিয়ে দেখি ততক্ষণে তিনি গড়াগড়ি শুরু করে দিয়েছেন। দেবীদাসকে দেখে তাঁর উৎসাহ আরও বেড়ে গেল।

বাধ্য হয়ে দেবীদাস বলে, "ঠিক আছে। এবার উঠে আসুন।"

বরফ ঝাড়তে ঝাড়তে দেবীদাসের সামনে এসে হাত পেতে হাঁক ছাড়েন শৈলেশদা, "রুপিয়া নিকালো।"

দেবীদাসের সঙ্গে আমরাও উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়লাম। শেষের দিকে শৈলেশদাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। কাল রেডিও শোনার পর থেকে আমরা প্রাণ খুলে হাসি নি—হাসতে পারি নি। পাঁচ টাকার বিনিময়ে দেবীদাস আমাদের প্রাণের হাসি ফিরিয়ে আনল।

আজ যে আরও অনেক হাসি আমাদের ভাগ্যে ছিল, তা তখনও বুঝতে পারি নি। বুঝতে পারি কিছুক্ষণ বাদে, যখন ধন বাহাদুর হঠাৎ এসে হাজির হয়। জানায়—তার পিতাঠাকুরের 'থার' (barking deer) ধরার কল তৈরি হয়ে গেছে। আমরা তার সঙ্গে ছুটে এলাম নন্দাবতীর পুলের কাছে। আমাদের দেখেই শের সিং তার পেটেন্ট স্যালুট ঠুকে সগর্বে বলে, "কাম ফিনিশ্ কর দিয়া। ম্যায় শের সিং সাব।"

একটি নয়, পাশাপাশি পাঁচটি ফাঁদ পেতেছে শের সিং। অনেকটা ইঁদুর মারা জাঁতাকলের কায়দায় তৈরি পাথরের ফাঁদ। একখানি সমতল সুবিশাল পাথরের ওপরে আলগা ভাবে আর একখানি পাথর দাঁড় করানো হয়েছে। দাঁড়িয়ে থাকা পাথরের সঙ্গে দড়ি দিয়ে এক টুকরো রুটি বাঁধা আছে। থার বা কাকর-মৃগ ঐ রুটির লোভে পুল পেরিয়ে এপারে আসবে। রুটিতে কামড় দিলেই দড়িতে টান পড়বে। সঙ্গে সঙ্গে ওপরের পাথরখানি পড়বে তার গায়ে। বেচারি থারের ভবলীলা সাঙ্গ হবে। আর শের সিং ভবের-হাটে তার লোমশ চামড়াটি বেচে দ্বিতীয়াকে নাকের নথ গড়িয়ে দেবে।

শের সিং আবার বলে, "সবাই বলেছিল পাগলা সাবদের চব্বিশখানা রুটি কোন কাজেই আসবে না। সেই রুটি দিয়েই আমিই কল পেতেছি।"

"কল নয়, বল গাঁড়াকল।" দেবীদাস মন্তব্য করে।

আমার হেসে উঠি ! শের সিং গম্ভীর হয়ে যায়। নাঃ দেবীদাসকে নিয়ে আর পারা গেল না। সে শের সিংয়ের এমন মুডটা নষ্ট করে দিল। ওর মুড ফিরে পাবার আশায়

বলি, "তোমার কলে কোনদিন থার পড়েছে শের সিং?"

"পড়ে নি আবার? প্রথম পড়েছে সেই ১৯৩৪ সালে, যেবারে টিলমন্ ও সিপ্‌টন্ সাবের সঙ্গে নন্দাদেবীর রাস্তা খুঁজতে গিয়েছিলাম। রাস্তা পাই নি, কিন্তু হনুমান পর্বতের কাছ থার পেয়েছিলাম।"

"সেই কি তোমার প্রথম পর্বতাভিযান শের সিং?"

"জী সাব্।"

"তার আগে তুমি কি করতে?"

"সে অনেক কথা।"

"বলো না একটু সে সব কথা।"

উৎসাহিত শের সিং বলে চলে—ছাপ্পান্ন বছর আগে পশ্চিম নেপালের বজং সামন্ত রাজ্যে ধরার গ্রামে এক ঠাকুর রাজপুত পরিবারে তার জন্ম হয়। সে তার বাবার তৃতীয়া স্ত্রীর সন্তান। শেব সিংয়ের বাবা সবসুদ্ধ সাতটি বিয়ে করেছিলেন। শেষের চারজন স্ত্রী তাদের শ্বশুরঘর দেখেন নি। তাঁরা তাঁদের বাপের বাড়িতেই পড়ে থাকতেন। শের সিং-য়ের বাবা পালা করে তাঁর শ্বশুরবাড়ি ঘুরে বেড়াতেন। স্বভাবতই শের সিং শৈশবে পিতার স্নেহ পায় নি। মা তাকে মানুষ করেছেন। সেই মাও হঠাৎ মারা গেলেন। শের সিংয়ের বয়স তখন মাত্র বারো। সৎমা ও বৌদিদের অত্যাচারে তাকে পথে নামতে হল।

উদ্দেশ্যহীন ভাবে চলতে চলতে একদিন সে এসে আলমোড়ায় পৌঁছল। নতুন দেশ, নতুন ভাষা। তবু চোদ্দ বছরের শের সিং আশায় বুক বেঁধে জীবিকার অন্বেষণ করে। একটা কাজও পয়ে যায়—কুলির কাজ। পিঠে মাল নিয়ে মহীশূরের মহারাজার সঙ্গে সে চলল কৈলাশ ও মানস-সরোবর পরিক্রমায়। বয়সের তুলনায় মালের ওজন বেশি। পথও অতীব দুর্গম। তবু কিশোর শের সিং পিছু হটল না। লিপুলেখ গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করে সে অভিজ্ঞ ও জোয়ান কুলিদেব সঙ্গে সমান তালে এগিয়ে চলল। সেবারে মহামারীর কবলে পড়ে বহু যাত্রী মারা গেছে। পথের দুধারে তাদের মৃতদেহ দেখে শের সিং চমকে উঠল কিন্তু ভয় পেল না।

পরিক্রমা পূর্ণ করে সে ফিরে এল আলমোড়ায়। মহারাজা তার ওপর বেজায় খুশি। তিনি তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলেন। বললেন—লেখাপড়া শেখাবেন, মানুষ করে দেবেন। কিন্তু নির্বোধ শের সিং। এমন প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করল।

কিছুদিন পরেই শের সিং একটা ভাল চাকরি পেয়ে গেল। একেবারে পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে। পঞ্চায়েত অফিসার শ্রীকৈলাশ চন্দ্রর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে হত। গাছ লাগাতে হত।

সাত বছর এই বন্মহোৎসব করে বেড়িয়েছে শের সিং। তারপর একদিন নিতান্ত আকস্মিক ভাবেই এই কাজে ইস্তফা দিয়েছে—দিতে বাধ্য হয়েছে। সেবারে শ্রীচন্দ্রর সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে শের সিং এল জৌলজিবির বিখ্যাত মেলায়। বৃশ্চিক সংক্রান্তিতে গৌরী গঙ্গা ও কালী গঙ্গার সঙ্গমে ন দিন ধরে এই মেলা হয়। অবসর সময় রোজই শের সিং মেলা দেখে কাটায়।

সেদিন মেলার তৃতীয় দিন। যথারীতি শের সিং মেলা দেখে বেড়াচ্ছে। দেখছে—থুলমা, চুটকি, পংখি। হঠাৎ...এক জোড়া আঁখি। শের সিং চমকে ওঠে। এ দুদিন মেয়েটি

কোথায় ছিল লুকিয়ে? সে তো কতবার গেছে এই দোকানের সামনে দিয়ে। শের সিং আবার ভাল করে তাকাল। লছমীও তাকাল তার দিকে। চোখে চোখে কথা হল।

পরদিন। আবার দেখা হল দুজনে। অতি সাবধানে শের সিং লছমীর সব খবর নিল। ভাল খবর। লছমীরা চন্দ্র রাজপুত। পালটি ঘর। শের সিং সাহসে বুক বাঁধল।

পরের দিন ভোর না হতেই সে ছুটল লছমীর তাঁবুর সামনে। অবাক হয়ে দেখল লছমীও সেখানে দাঁড়িয়ে। তবে কি সেও তারই পথ চেয়ে আছে?...নিঃশব্দে তারা পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করল। আম বনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এল মহাদেবের মন্দিরে। মহেশ্বরকে সাক্ষী রেখে তারা প্রথম কথা কইল। দুজনে দুজনকে বরণ করল। তারপর হাত ধরাধরি করে শুরু করল পথ চলা—জীবনের পথ।

পালিয়ে এল আলমোড়ায়। কিছুদিন সেখানে বাস করে, এল রাণীক্ষেতে। সেখানেই স্থায়ী হল তারা।

রাণীক্ষেতেই বিখ্যাত পর্বতারোহী এইচ. ডাবলু. টিলম্যানের সঙ্গে শের সিংয়ের পরিচয় হয়। সেই থেকে টিলম্যান আছেন অথচ শের সিং নেই, এমনটি আর হয় নি। শুধু টিলম্যানের সঙ্গেই নয়, গাড়োয়াল ও কুমায়ুনে ছোট-বড় বহু অভিযানে অংশ নিয়েছে শের সিং। মার্তোলি ও পিণ্ডারী হিমবাহ অভিযানে সে আমেরিকানদের সঙ্গে ছিল। একদল ইংরেজ হরিণশিকারীর সঙ্গে সে পূর্ব দ্রোণগিরি অঞ্চলে বহুদিন ঘুরে বেড়িয়েছে। একবার এক ইংরেজের সঙ্গে যখন লোকপালের ওপর দিয়ে হাতি পর্বতের দিকে যাচ্ছিল তখন সে বায়নোকুলার দিয়ে একটা ইয়েতি দেখেছে। ইয়েতিটা বসে বসে শেকড়জাতীয় কি যেন খাচ্ছিল। ইয়েতি সম্বন্ধে একটা মজার গল্প বলে শের সিং। প্রায় বিশ বছর আগে ন জন কুমায়ুনী শিকারী নটি ভুটিয়া কুকুর নিয়ে পশ্চিম নেপালে সুরমা পর্বতে যায়। সেখানে একা একটি ইয়েতি দেখতে পেয়ে তারা তাকে মেরে ফেলে। মারা যাবার আগে ইয়েতিটা ভীষণ চিৎকার করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই একদল ইয়েতি সেখানে ছুটে আসে। ভয় পেয়ে শিকারীরা তাদের কুকুরসহ পাথরের আড়ালে লুকিয়ে তাকে। ইয়েতিরা তাদের নিহত স্বজাতির মৃতদেহ নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছে দেখে বাধা দিয়ে বলি, "ইয়েতির কথা থাক শের সিং, তোমার নিজের কথা বলো।"

"সে কথার কি শেষ আছে সাব। সারাটা জীবন তো ঘুরে ঘুরেই কাটিয়ে দিলাম। এই ভবঘুরে জীবনে কত লোকের সঙ্গে মোলাকাত হল। কত সাব-মেম, রাজা-রাণী। আচ্ছা, তাদের কথাই বলি। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা দ্বিতীয়বার বিয়ে করে তাঁর নতুন রাণীকে নিয়ে এলেন কেদার-বদ্রী দর্শনে। সঙ্গে রাজসিক লটবহর। টিলমন্ সাব্ ১৯৩৬ সালে তাঁর নন্দাদেবী অভিযানেও এত জিনিস নিয়ে যান নি। মহারাজার সঙ্গে তিনশ কুলি, সত্তরটা খচ্চর। তীর্থে এসেও তাঁরা সোনা বা রূপার বাসন ছাড়া ভোজন করেন নি। আর কেউ যাতে এই সোনা রূপা নিয়ে সটকে না পড়ে তা দেখাই ছিল আমার কাজ।

"আরেকবার ভবনগরের যুবরাজের সঙ্গে গিয়েছিলাম কেদার-বদ্রী। তাঁর যদিও লটবহর ছিল অনেক কম—মাত্র ছত্রিশ জন কুলি, আঠারোটি ডাণ্ডি ও আঠারোটি খচ্চর, কিন্তু আমি মজুরি পেয়েছিলাম অনেক বেশি। চব্বিশ দিনে আড়াই হাজার টাকা—আমার জীবনের সবচেয়ে বড় রোজগার! এর মধ্যে পাঁচশ টাকা পুরস্কার পেয়েছিলাম ছোট্ট এক

টুকরো হীরে খুঁজে দিয়ে। রামওয়াড়ার কাছে যুবরাজের আংটি থেকে খসে পড়েছিল। যুবরাজ শেঠজীর মতো নাস্তিক ছিলেন না। কিছু না বলতেই তিনি কালীমঠে মহাপূজার হুকুম দিলেন—আঠারোটি পাঁঠা বলি দেওয়া হয়েছিল। শুধু তাই নয়। তিনি পিপলকোঠিতে যে দেওয়ালী করে গেছেন, তা যারা দেখেছে তারা ভাগ্যবান। অমন দেওয়ালী এ এলাকায় আর হয় নি।"

শেঠজী (শৈলেশদা) কিন্তু নির্বিকার। তিনি মুচকি হেসে বলেন, "যুবরাজের কথা নয় শের সিং, লছমীর কথা বলো।"

ইচ্ছে করেই শের সিং লছমীর প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। সংসারে সুখের চেয়ে দুঃখ বেশি। দুঃখের কথা বলে আরও বেশি দুঃখ পেয়ে লাভ কি? কিন্তু শৈলেশদার তাগিদে শের সিংকে শেষ পর্যন্ত সে কথা বলতে হল—লছমীকে নিয়ে বারো বছর ঘর করেছে সে। সুখের ঘর। শের সিংয়ের জীবনে যা কিছু উন্নতি, তা হয়েছে এই বারো বছরে। বকরিওয়ালা থেকে মেট। তাই বলে লছমী তাকে বকরিগুলো বিক্রি করে ফেলতে দেয় নি। শের সিং যখন সাব্‌দের বা রাজা-রাণীদের সঙ্গে, লছমী তখন বকরি সামলাত। প্রতিবার ঘুরে এসে শের সিং লছমীকে সোনা ও রূপার গহনা গড়িয়ে দিত। শেষ পর্যন্ত লছমীর শুধু সোনার গহনাই হয়েছিল সাড়ে বাইশ ভরি। এত সুখের মাঝেও একটি দুঃখ ছিল—বহু মানত করেও ওদের কোন সন্তান হয় নি।

পিতা হবার সব আশা শের সিং যখন প্রায় ছেড়ে দিয়েছে, এমনি সময় একদিন লছমী তাকে সুসংবাদটা দিল—তার ছেলে হবে।

উত্তেজনায় ও আবেশে আকুল হল শের সিং। আনন্দে প্রায় পাগল হল। কয়েকদিন বসে কেবল ভাবল। সেবারে আর সে পাহাড়ে গেল না। যাদের সঙ্গে যাবার কথা ছিল, তাদের অন্য লোক ঠিক করে দিল। আর এই না যাওয়াটাই কাল হল। বাড়ি না থাকলে তো আর সামান্য গরম জল নিয়ে সেই দশেরার সকালে লছমীর সঙ্গে ঝগড়া হত না, সেও তাকে চড় মারত না আর এমনভাবে জীবনের বোঝাপড়াটাও শেষ হয়ে যেত না।

ন মাসের অন্তসত্ত্বা লছমী যে সত্যি চলে যাবে, তা শের সিং কল্পনাও করতে পারে নি। তাই সে নিশ্চিন্তে বকরি চরাতে চলে গিয়েছিল। ফিরে এসে দেখে লছমী নেই। গহনাগাঁটি ও টাকা পয়সা কিছুই নেই। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শুনল—লছমী চলে গেছে আসকোটে। তার বাপের বাড়িতে।

শের সিংও আর ফিরিয়ে আনে নি তাকে। লছমীর ভাইরা ছুটে এসেছে। সে তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে। লছমী চিঠি লিখেছে। শের সিং নিরুত্তর রয়েছে। যে ঘরণী একবার ঘর ছেড়ে যায়, তাকে আর ঘরে নিতে নেই।

"ধন বাহাদুর কি তোমার সেই ছেলে?" জিজ্ঞেস করি শের সিংকে।

"না সাব্। সে ছেলেকে আমি কোনদিন দেখি নি। শুনেছি সে এখন কলেজে পড়ে।" শের সিং চুপ করে। তাকিয়ে থাকে নন্দাবতীর দিকে। আমরা তাকিয়ে থাকি তার করুণ চোখ দুটির দিকে। একটু বাদে সে আবার নিজেই বলতে থাকে, "ধন আমার এ পক্ষের ছেলে। আমি আবার বিয়ে করেছি। সেও আজ বাইশ বছর হয়ে গেল।"

লছমী চলে যাবার পর কেমন যেন সব ফাঁকা ফাঁকা মনে হতে থাকল তার। সেই

সঙ্গে একটা রুদ্ধ আক্রোশে অস্থির হয়ে উঠল সে। চলল দেশে। সেই দেশ, যার সঙ্গে বিশ বছর কোন যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু নিজের বাড়িতেও জায়গা হল না তার। এতদিন বাদে উড়ে এসে জুড়ে বসাটা তার সৎ ভাইরা মোটেই সুনজরে দেখল না। তাই সে চলে গেল পাশের গাঁয়ে—তার পিসীর বাড়ি। আর সেখানেই একদিন নদীতে স্নান করতে গিয়ে দেখা হল চম্পার সঙ্গে। এই মিষ্টি মেয়েটিকে শের সিং আগেও দেখেছে। কিন্তু তখন তো এত ভাল লাগে নি। তাই সেই সিক্ত বসনা সুন্দরী ষোড়শীর সঙ্গে শের সিং সেদিন সেধে আলাপ করল। আর আলাপের পরেই প্রলাপ। কিন্তু বেঁকে দাঁড়াল চম্পা। একদিন তার মুখের ওপর শুনিয়ে দিল যে ছত্রিশ বছরের বুড়োর গলায় মালা দেবে না সে। তার পৌরুষে আঘাত লাগল। শের সিং রাজপুত।

কিন্তু বীরভোগ্যা বসুন্ধরার কাল গত হয়েছে। এ যুগে বুদ্ধি যস্য, বলং তস্য। শের সিং কৌশলের আশ্রয় নিল। চম্পার বৌদিকে হাত করল। কিন্তু দাদা বসল বেঁকে। সে কাজ করত নেপাল রাজ সরকারে। বহু অভিযান-অভিজ্ঞ শের সিং কিন্তু ঘাবড়াল না। সে আরেকটি অভিযানের পরিকল্পনা প্রস্তুত করল। নিজের গাঁয়ে জমি কিনল, বাড়ি করল। তারপর এক আঁধারে ছাওয়া আষাঢ়ে রাতে বৌদির সাহায্যে চম্পাকে নিয়ে এল সেই বাড়িতে। প্রতিষ্ঠা করল গৃহকর্ত্রীরূপে।

বড় অভিযানে বাধা আসবেই। চম্পার দাদা হাবিলদারকে বলে হুলিয়া বের করল শের সিংয়ের নামে—ন বছরের জেল। পুলিশ এল। গুড় ও মধু দিয়ে শের সিং সেবা করল তাদের। তারা ফিরে গেল।

চম্পার দাদা এত সহজে হাল ছাড়ল না। আবার নতুন একদল পুলিশ এল। শের সিং ততদিনে প্রায় নিঃস্ব। বাড়ি করতে বহু টাকা বেরিয়ে গেছে। তার ওপর চম্পার নিত্য নতুন বায়না। বাধ্য হয়ে ধরা দিল শের সিং। হাজির হল সুবেদারের সামনে। চম্পার দাদাও ছিল সেখানে। শের সিং তার প্রতি কোন কটাক্ষ না করে এগিয়ে গেল সুবেদারের সামনে। নির্ভীক ভাবে নিঃসঙ্কোচে তাকে সব কথা খুলে বলল। সুবেদার তার সত্যবাদিতায় মুগ্ধ হলেন। ডাকালেন চম্পাকে। চম্পাও অকম্পিত কণ্ঠে বলল—'শের সিং আমার স্বামী।'

সুবেদার হুলিযা তুলে নিলেন। চম্পার দাদাকে হুকুম দিলেন তাদের বিয়ে দিয়ে দিতে। বললেন—তিনি নিজে উপস্থিত থাকবেন এই বিয়েতে। খুব ধুমধাম করে বিয়ে হল ওদের। এমন বিয়ে আর হয় নি সে গাঁয়ে।

বাইশ বছর বেশ সুখেই সংসার করছে শের সিং। কিন্তু লছমীর কথা মনে পড়লে তার মনটা এখনও যেমন কেমন হয়ে যায়। বার বার কেবলই মনে হয়, "গুস্‌সেমে এক থাপ্পড় লাগায়া। ওহি সির্ফ দেখি। বারাহ্ সালকা পেয়ার নেহী দেখি।"

॥ ২৬ ॥

নুনহীন খিচুড়ির ওপরে ভিটামিন সি ট্যাবলেটের গুঁড়ো ছড়িয়ে আমরা তাই গলাধঃকরণে ব্যস্ত। চামচের ঠুং ঠাং শব্দ হচ্ছে কিন্তু খিচুড়ি নিঃশেষ হচ্ছে না। অথচ 'আর খাব না' এ কথাও কেউ বলতে পারছি না। পেট ভরা খিদে, মহামূল্যবান এই খিচুড়ি। এমন সময়

জোশীমঠ থেকে মেহেরবান সিং এল। আমরা সবাই আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। সে চিনি এনেছে, গুঁড়ো দুধ এনেছে, তেল এনেছে, নুন এনেছে। তার চেয়ে বড় কথা, সে ডাক এনেছে। এনেছে খবরের কাগজ, চিঠি ও তার। খবরে কাগজে আমাদের খবর ও ছবি বেরিয়েছে। সবার নামেই চিঠি এসেছে আজ। সব চিঠির এক সুর—'তোমাদের জন্য দুশ্চিন্তায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছি। শীঘ্র ফিরিয়া আইস।'

কিন্তু কোন চিঠিতেই যুদ্ধের খবর নেই। যুদ্ধের কথা আছে মিঃ ডয়েগের তারে—'BORDER SITUATION GRAVE STOP WELCOME HOME–DESMOND.'

মেহেরবান সিংয়ের মেহেরবানিতে লড়াইয়ের খবরটা কুলিদের মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেল। ফলে একটু বাদেই শের সিং তার দলবল নিয়ে চড়াও হল। নাঃ ভয় পায় নি তারা। ওরা পাহাড়ী মরদ। লড়াইকে পরোয়া করে না। তবে মেহেরবান সিংয়ের কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না ওদের। চীন কি সত্যই ভারত আক্রমণ করেছে?

সব শুনে শের সিং গর্জে ওঠে, "বেইমান।" তার রাজপুত রক্ত বোধহয় টগবগ করে ফুটছে "আমার বয়স হয়েছে সাব। আমাকে আর নেবে না। কিন্তু জোশীমঠে ফিরে গিয়েই আমি ধনবাহাদুরকে ভর্তি করে দেব পল্টনে। বেইমানীর বদলা নেবে সে।"

কেউ কিছু বলার আগেই চৈৎ সিং তাঁবুতে ঢোকে। সে এসেছে ওপর থেকে—ওপরওয়ালাদের চিঠি নিয়ে। নিচের চিঠির চেয়ে ওপরের চিঠির দাম এখন অনেক বেশি। তিনখানি চিঠি এনেছে সে। প্রথমখানি লিখেছেন বীরেন—

অ্যাডভান্স বেস ক্যাম্প
২০.১০.৬২.

'পিনাকীদা / ডাক্তার / দেবীবাবু,

আমি প্রাণেশ ও জাজিম সিং এখানে রয়েছি। কাল সকাল থেকে আমরা বেকার। কাল শেষ মাল ফেলে এসেছি খুলিয়াঘাটায়।

আকাশ পরিষ্কার। কোথাও মেঘের চিহ্ন নেই। ঘোড়ীপর্বতকে এখন ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।

কাল রাতে আমাদের ঘুম হয় নি। প্রথমত ঠাণ্ডা, দ্বিতীয়ত খিদে। দুদিন ধরে পচা আলু-সেদ্ধ খেয়ে আছি।

নিচের জিনিসগুলো এখানে আছে—
আটা (যৎকিঞ্চিৎ), পচা আলু (যথেষ্ট), চা (দুধ চিনি নেই),
সিগারেট (খাই না), ওষুধ (সবাই সুস্থ)।
নিচের জিনিসগুলো এখানে নেই—
চাল, ডাল, নুন, তেল, গুঁড়ো দুধ, মধু, চিনি ও চিঠি।

বীরেন'

দ্বিতীয়খানি লিখেছে চঞ্চল—

এক নম্বর শিবির
১৯.১০.৬২

'শৈলেশদা,

আজ সাত দিন হল বরফের ওপরে রয়েছি। এ এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। সাদা ছাড়া যে আর কোন রং আছে তা মনে হয় না। হাঁটু এবং সময় সময় বুক-বরফে চলাফেরা করতে হচ্ছে।

সাড়ে আঠারো হাজার ফুট উঁচুতে আমাদের দু নম্বর শিবির স্থাপিত হয়েছে। কুলি কম বলে মাল পাঠাবার জন্যে অনেক সময় ও শ্রমের অপচয় হচ্ছে। আমি দু দিন ধরে দু নম্বরে মাল রেখে আসছি। মাল বয়ে বয়ে শেরপারাও ক্লান্ত।

জলের কথা ভুলে যেতে বসেছি। এক গেলাস জল গলাতে এক ঘণ্টা স্টোভ জ্বালাতে হয়। কেরোসিন ফুরিয়ে আসছে। আলু জমে পচে গেছে। রাতে তাপমাত্রা মাইনাস ২৩ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। সারারাত তাঁবুর ওপর থেকে বরফ ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলতে হয়। পর্বতাভিযানে যতরকম বাধা মানুষ কল্পনা করতে পারে, তা প্রায় সবই পেলাম।

তিন নম্বর শিবির করতে না পারলে নীলগিরি-জয় সম্ভব নয়। এখন পর্যন্ত তিন নম্বরের জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় নি। তবে পাঁচ ছ দিনের মধ্যেই চূড়ান্ত ফয়সালা হয়ে যাবে।

প্রার্থনা করুন যেন সফল হই। বাংলার মুখ রাখতে পারি।

চঞ্চল'

তৃতীয়খানি লিখেছে অমূল্য—

দু নম্বর শিবির
১৮.১০.৬২

'সবার মন মেজাজ ও শরীর ভাল আছে। মা কালীর কৃপায় আবহাওয়াও ভাল হচ্ছে. জয় সুনিশ্চিত।

কুলি কম। কাজেই বেস ক্যাম্পে যে সব মাল এখন আর কোন কাজে আসছে না, বিশেষ করে উপেনদার জিনিসপত্র, কয়েকজন কুলি দিয়ে জোশীমঠে পাঠিয়ে দিন। সে সব কুলিরা বেস ক্যাম্পে ফিরে আসার আগেই আমরা জয়ী হয়ে ফিরে আসব।

সব ঠিক আছে তো?

অমূল্য'

এত প্রতিকূলতার মধ্যেও অমূল্য মনোবল হারিয়ে ফেলে নি। জয়লাভের আগেই ভাবছে জয়লাভের পরে কেমন করে নির্বিঘ্নে ফিরে যাবে। এই না হলে নেতা!

কিন্তু কে কুলিদের সঙ্গে জোশীমঠ যাবে? যে যাবে সে তো আর ফিরে আসতে পারবে না। তাকে মাল আগলে পড়ে থাকতে হবে জোশীমঠে। এত কষ্ট করে যে পরম-মুহূর্তের প্রতীক্ষায় আমরা এতদিন এখানে বসে আছি, সেই শুভক্ষণে তাকে নির্বান্ধব অবস্থায় থাকতে হবে বহুদূরে। এ কি সম্ভব? কে নিজেকে স্বেচ্ছায় বঞ্চিত করবে

জীবনের এই অনির্বচনীয় আনন্দ থেকে। কত আশা। জয় হলে আমরা সবাই একসঙ্গে বদ্রীনাথ যাব। ভাগ্য যদি বিরূপ হয়, তাহলেও তো সেই মিলন-লগ্ন মহামূল্যবান। পরাজয়ের বেদনা সমান ভাগে ভাগ করে নিয়ে সবাই একসঙ্গে ঘরে ফিরে যাব। কত কল্পনা করেছি এতদিন ধরে।

ডাক্তার ও শৈলেশদার যাবার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। পিনাকী চলে গেলে এদিক অচল হবে। বাকি রইলাম আমি ও দেবীদাস।

দেবীদাসের দিকে তাকাই। সেও আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখে চোখ পড়তেই বলে ওঠে "আপনি নয়, আমিই যাব জোশীমঠ।"

চট করে কোন জবাব দিতে পারি না। দেবীদাস বেস ক্যাম্পে আসার পর থেকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছে। খেতে যে এত ভালবাসে, সে নিজে না খেয়ে, নিজ হাতে সব ভাল ভাল খাবার প্যাক্ করে ওপরে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ওর যে বড়ই আশা, কাগজ কেটে 'Successful' শব্দটা লিখে 'Nilgiri (Garhwal) Expedition 1962' ফেস্টুনটায় লাগিয়ে দেবে। তারপর সেই ফেস্টুন হাতে বদ্রীনাথ যাবে, জোশীমঠ ফিরবে। না না। ওর এত সাধের আশায় আমি বাদ সাধব না। বলি, "তা হয় না। আপনি থাকুন। আমিই কুলিদের নিয়ে জোশীমঠ যাচ্ছি।"

"আপনি তো জানেন, আমি একবার যখন সঙ্কল্প করেছি, তখন আমাকে সঙ্কল্পচ্যুত করতে পারবেন না। তার চেয়ে আসুন আমরা মাল ঠিক করে ফেলি। কুলিদের বলে দিন, আমি কাল সকালেই রওনা হব।"

॥ ২৭ ॥

যা দেখতে পাই না তা যেমন নেই বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তেমনি যাকে আসতে দেখি নি সে যে আসে নি, এ কথাই বা বলি কেমন করে? কে এসেছিল জানি না, কিন্তু কখন এসেছিল তা বলতে পারি। প্রথম দিন রাত পৌনে তিনটায়, পরদিন দেড়টায়, শেষদিন সোয়া বারোটায়। তৃতীয় দিনে ট্র্যানজিস্টার খুলে আমরা দিল্লীর রেডিও সঙ্গীত সম্মেলন শুনছিলাম। গান তখন খুব জমে উঠেছে। উপেনবাবু তালে তালে স্লিপিং ব্যাগ নাড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁবুটা নড়ে উঠল—নড়তে থাকল। অন্য দিনের চেয়ে জোরে—বেশ জোরে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সেদিন বেরিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু তার সাক্ষাৎ পাই নি।

অনেক ভেবেছি, কিছুতেই বুঝতে পারি নি—কেন সে এসেছিল। সেই মাইনাস বিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড শীতে কেউ রসিকতা করার জন্য তাঁবু নাড়িয়েছে, তাই বা বিশ্বাস করি কেমন করে? আবার তুষার মানব যদি এসেই থাকে, সে অদৃশ্য হল কোন্ পথে? তার তো পাখা নেই। তাঁবুর আশে-পাশে কোথাও কোন পদচিহ্ন পাই নি। তবে পদচিহ্ন পাওয়া গেছে অনেক দূরে—এই ক্যাম্প ওয়ানের পথে। যেন ছোট একটি ছেলে খালি পায়ে বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে গেছে। বিরাট একখানি পাথরের ধারে গিয়ে পদচিহ্ন শেষ হয়ে গেছে। সেই পদচিহ্ন কার? এ রহস্যের সমাধান করতে পারি নি। পারে নি অমূল্য।

অমূল্যকে খবরটা দিয়েছেন শৈলেশদা। উপেনবাবুর সঙ্গে শৈলেশদা এখানে

এসেছিলেন। শুনে অমূল্য হেসেছে। ভাবটা যেন কিছুই নয়। কিন্তু মনে মনে চিন্তিত না হয়ে পারে নি। চিন্তা নিজের জন্য নয়, নিজেদের জন্যও নয়। চিন্তা বেস ক্যাম্পের সহযাত্রীদের জন্য। তাদের ত্যাগ ও শ্রমের ফলেই আজ অমূল্য এখানে—এই এক নম্বর শিবিরে। ভানু গতকাল নিতাই টোপগে আং দাওয়া ও ছুতারকে নিয়ে দু নম্বর শিবিরে চলে গেছে। একটু বাদে নিরাপদ আজীবা আং টেম্বা ও ছান্দুকে নিয়ে বাকি মালপত্রসহ অমূল্য সেখানে রওনা হচ্ছে। চঞ্চল আপাতত এখানেই থাকবে।

যুদ্ধের কথাও শৈলেশদা তাকে বলেছেন। কিন্তু অমূল্য তাতে একটুও বিচলিত হয় নি। চৌ এন লাই নয়, ইয়েতি-ই অমূল্যকে ভাবনায় ফেলেছে।

'চলো এবারে বাইরে যাওয়া যাক।" নিরাপদর কথায় অমূল্যর চমক ভাঙে।

বলে, "বেশ চলো।"

ওরা বেরিয়ে আসে বাইরে। বেলা নটা। নীলগিরির ওপার থেকে যে সোনালী আভা কিছুক্ষণ ধরে উঁকি মারছিল তা এতক্ষণে হাজির হয়েছে এখানে। এ জায়গাটা নিরাপদর বড় প্রিয়। অবসর পেলেই সে সবাইকে নিয়ে এখান এসে দাঁড়িয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে কেমন করে রুপোর চাদরে মোড়া সারা অঞ্চলে সূর্য থেকে সোনা গলে পড়ে। নীলগিরির গায়ে সোনা রুপোর খেলা চলে। তারপর এক সময় সূর্য ওঠে মাথার ওপরে। পশ্চিমের পাহাড়ে পাহাড়ে তুষারগলা জলের ধারা ঝরে। ওরা ছুটে গেছে সেদিকে কিন্তু কাছে যাওয়া সহজ নয়। বড় বড় ফাটল আছে পথে। পাহাড়ের গা থেকে জলের সঙ্গে বরফ আর পাথর পড়ে গড়িয়ে। তবু ওরা গিয়েছে। জলের যে বড়ই অভাব এখানে। জলধারা যখন গড়িয়ে এসে কোন ফাটলের মধ্যে পড়ে, তখন সে আর জল থাকে না, পড়তে পড়তে জমে যায়। ফাটলের মুখে সাদা সুতোর মতো ঝুলতে থাকে। আইস এক্স দিয়ে আঘাত করলে ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ে। ওরা আরও এগিয়ে গেছে। মনে হয়েছে, যেন তুষার-ঝরা জলের ধারা নয়, তানপুরার মূর্ছনা। হঠাৎ একটা বিকট শব্দে সেই তাল ভঙ্গ হয়েছে। কোথাও কোন বিরাট পাথর পড়েছে গড়িয়ে। আসর গেছে ভেঙে। ওরা এসেছে নেমে—সেই মৃত্যুপুরী থেকে।

কিন্তু আজ ওদের সময় বড় কম। আজ ওখানে যাবার অবসর নেই। পরিজ নিয়ে ছান্দু এসে হাজির হল। খেয়েই রওনা হতে হবে। বাঁধাছাঁদা শেষ। খেতে খেতে নিরাপদ অমূল্যকে বলে, "চঞ্চলদা বলছেন, যে কুলিরা র‍্যাশন নিয়ে আসবে তাদের তিনি এখানেই রেখে দেবেন।"

"তাহলে আর এ তাঁবুটা ওপরে নিয়ে যাবে না?" অমূল্য চঞ্চলকে জিজ্ঞেস করে।

"না।"

"ভালই হবে। বলা তো যায় না কখন কি দরকার পড়ে। অ্যাক্সিডেন্টই তো মাউন্টেনিয়ারিংয়ের সাসপেন্স।"

আর কথা না বাড়িয়ে নিরাপদ সব কাজ শেষ করে ফেলে। তারপর রুকস্যাক পিঠে করে জুতোয় ক্র্যাম্পন বেঁধে অমূল্যকে বলে, "চলো, এবারে বেরিয়ে পড়া যাক।"

চঞ্চল খানিকদূর পর্যন্ত ওদের এগিয়ে দিয়ে তাঁবুতে ফিরে যায়। আজ ওকে একা রাত কাটাতে হবে এক নম্বর শিবিরে। তুষার-মানবের পদচিহ্ন সেও দেখেছে। কিন্তু ভয় থাকতে জয় নয়।

সেই হিম-প্রপাত না পেরিয়ে তার পাশ দিয়ে পথ তৈরি করা হয়েছে। চারদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে এ জন্য। প্রপাতের পরেই শুরু হল পাহাড়ে ওঠা—নীলগিরিতে ওঠা। গত পঁচিশ বছর ধরে যে নীলগিরির স্বপ্ন দেখেছেন পর্বতারোহীরা—তারই গা বেয়ে ওপরে উঠছে ওরা। মাঝে মাঝে অত্যন্ত কঠিন চড়াই। সবই বরফে ঢাকা—কোথাও কম, কোথাও বেশি। কিন্তু বরফ ছাড়া কি আর কিছু নেই নীলগিরিতে? আছে। তবে না থাকলেই ভাল হত। আছে ফাটল—অসংখ্য অতিকায় ফাটল। বিরাট বিরাট হাঙ্গরের মতো হাঁ করে রয়েছে। যেন গিলতে চাইছে।

ওরা সব নীলগিরির রক্ষী। নীলগিরি শিখরকে আর মনুষ্য পদচিহ্নে কলঙ্কিত হতে দেবে না। তাই যেতে দেয় নি জগদীশ নানাবতীকে—বম্বে মাউন্টেনিয়ারিং কমিটির (১৯৬১) অভিযানের নেতা। গৌরাঙ্গ চৌধুরী ও শেরপা গোম্বু তাঁর দলে ছিল। যেতে দেয় নি ক্যাপ্টেন জগজীৎ সিংকে—অল আর্মি (১৯৬২) অভিযানের নেতা। আমাদের টোপগে তাঁর দলে ছিল।

ওরা কিন্তু মনের আনন্দে এইসব ফাটল পেরিয়ে ওপরে উঠছে। কখনও লাফ দিতে হচ্ছে, কখনও বা ফাটলের একদিক থেকে ভেতরে নেমে আরেক দিকের দেয়াল বেয়ে ওপরে উঠে আসতে হচ্ছে। সাধারণত ফাটলের মুখটা হয় চওড়া, নিচের দিকটা ক্রমেই সরু হয়ে আসে। কাজেই যে-সব ফাটল লাফ দিয়ে পার হওয়া সম্ভব নয়, আজীবার নির্দেশে আং টেম্বা ও ছান্দু সেই সব ফাটলের দেয়ালে স্টেপ কাটিং করছে। ওরা এক দেয়াল দিয়ে নিচে নেমে আরেক দেয়াল দিয়ে ওপরে উঠে আসছে। কিন্তু কোন কোন ফাটল এত চওড়া যে তা এড়াবার জন্যে অনেকটা ঘুরে যেতে হচ্ছে। তাহলেও অমূল্য ও নিরাপদ অবিচলিত। শঙ্কাহীন চিত্তেই এগিয়ে চলেছে তারা। নীলগিরির ঐ রজতশুভ্র শিরে ভারতের জাতীয় পতাকা প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত তারা থামবে না।

বাঁদিকে নাম-না-জানা অগণিত তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গ। ডাইনে নীলগিরি শিখর—সব সময়েই চোখের সামনে। পথ ক্রমেই দুর্গমতর হচ্ছে। শিখর ধীরে ধীরে বিশালতর হচ্ছে।

এত কষ্ট করে তৈরি করা পথ বুঝি বা বন্ধ হয়ে গেছে। বাঁদিকের পাহাড় থেকে বরফের ধস নেমেছে। পথ গেছে মুছে। এখন উপায়?

"উপায় আর কি? ওর ওপর দিয়েই যেতে হবে। নরম বরফ। স্টেপ কাটার কোন প্রশ্নই ওঠে না।" নির্ভীক কণ্ঠে নিরাপদ বলে।

ওরা সেই সুবিরাট বরফের স্তূপের ওপর দিয়েই চলল এগিয়ে। এ যেন পায়ে হেঁটে নদী পার হওয়া। তবে জলের নয়, বরফের নদী। কখনও কোমর অবধি তলিয়ে যাচ্ছে, কখনও বা বুক। আইস এক্স ও ক্র্যাম্পন কোন কাজেই লাগছে না। যদি এর নিচে কোন ফাটল থাকে, তাহলে তো অতল সমাধি।

এ যাত্রায় ওরা কিন্তু বেঁচে গেল। নির্বিঘ্নেই সেই বরফের স্তূপ পেরিয়ে এল। তবে এখনও অতি সাবধানে পথ চলতে হচ্ছে। বাঁদিকে পাহাড়, ডান দিকে খাদ। পা ফস্‌কালেই গড়িয়ে পড়বে নিচে।

একটু বাদেই শুরু হল চড়াই—আজকের শেষ চড়াই। মারাত্মক চড়াই। ধস নেমে নেমে বাঁদিকের পাহাড়গুলোর কালোরূপ মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়েছে। নিরাপদ কবি

নয়। তাহলেও এই অনন্ত সাদার মাঝে কালো তার বড়ই ভাল লাগে।

কালো শুধু বাঁদিকে নয়, কালো দেখা দিয়েছে সামনে। ঐ কালো গত চারদিন ধরে ওদের জীবনের আলো হয়ে আছে। দু নম্বর শিবির তৈরি হয়েছে ওখানে—১৮,৫০০ ফুট উঁচুতে। বেশ বড় বরফাবৃত প্রায় সমতল একটা প্রান্তর পাওয়া গেছে। সেই প্রান্তরের খানিকটা অংশ তুষারাবৃত নয়—কালো পাথর বেরিয়ে রয়েছে। এই কালো আমাদের দু নম্বর শিবিরের নিশানা।

অবশেষে ওরা এসে পৌঁছল সেখানে। তাঁবুর সামনে বসে পড়ল সবাই। সহ্যশক্তিরও একটা সীমা আছে। ছুতার বেরিয়ে এল কিচেন থেকে। জানাল—ভানু ও নিতাই শেরপাদের নিয়ে সামনে ঐ খাড়া বরফের দেয়াল পেরিয়ে তিন নম্বরের জায়গা খুঁজতে গেছে। ভালই করেছে। নষ্ট করার মতো সময় নেই হাতে। অক্টোবর শেষ হয়ে এল। শীত ক্রমেই জাঁকিয়ে বসেছে। এখান থেকে শিখরের উচ্চতা সোজাসুজি ২৭৬৪ ফুট। বম্বের অভিযাত্রীরা এই উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে সোজাসুজি উঠতে গিয়েই বিফল হয়েছেন। আমরা চেষ্টা করব উত্তর-পূর্ব দিক থেকে। অর্থাৎ নীলগিরির এই পশ্চিম প্রান্ত থেকে ওদের এখন পৌঁছতে হবে পূর্ব প্রান্তে। সেখানে হাজার দেড়েক ফুট ওপরে কোন মতে যদি তিন নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে জয় সুনিশ্চিত। তিন নম্বর শিবির প্রতিষ্ঠার ওপরই অভিযানের সাফল্য নির্ভর করছে।

ছুতারকে ড্রিঙ্কিং চকোলেট তৈরি করতে বলে অমূল্য। শেরপাদের নিয়ে ছুতার চলে যায় কিচেনে। পর্বতাভিযানে কিচেন টেন্টই হল স্বর্গ। সেখানে আগুন জ্বলে।

রুকস্যাকের পকেট থেকে চামচ বের করে অমূল্য ও নিরাপদ জুতোর বরফ পরিষ্কার করতে থাকে। বেশ জোরে হাওয়া বইছে। তবে আজ এখনও আবহাওয়া খারাপ হয় নি। সাধারণত সকালে আকাশ পরিষ্কার থাকে। দুপুরেই দুর্যোগ ঘনিয়ে আসে। আজ আকাশ এখনও ঘন নীল। নীল আকাশের নিচে নীলগিরিতে বসে আছে ওরা।

এখান থেকে এক নম্বর শিবির স্পষ্ট দেখা যায়। প্রায় পুরো খুলিয়াগার্ভিয়া গ্রাবরেখাটিই দেখা যায়। সাদায় কালো মেশানো সরু এক ফালি প্রান্তর—খুলিয়াঘাটার প্রান্তে গিয়ে শেষ হয়েছে। দেখা যায় বানকুণ্ড হিমবাহ। তার কোথাও কালো নেই, সবই সাদা। আর দেখা যায় মহাসমুদ্রে ঊর্মিমালার মতো অগণিত পর্বতশৃঙ্গ। অপরিচিতের ভিড়ে পরিচিতরা পর্যন্ত হারিয়ে গেছে। তাহলেও চেনা যায় কামেট। অমূল্যর চোখ দুটি সজল হয়ে ওঠে। মেজর জয়াল জয় করেছিলেন ঐ শৃঙ্গ। অমূল্য যখন দার্জিলিংয়ে ট্রেনিং নিয়েছে, জয়াল তখন হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের অধ্যক্ষ। বীরের মৃত্যু নেই। তাঁর অমর স্মৃতি রক্ষার্থে যে ভাণ্ডার গড়ে উঠছে, তা থেকেই আমরা এ অভিযানের সাজ-সরঞ্জাম পেয়েছি। অমূল্য ও নিরাপদ যে পোশাক পরে আছে তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে মেজর জয়ালের অক্ষয় স্মৃতি।

॥ ২৮ ॥

এক সূত্রে বাঁধা থাকে একটি জীবন। সবাইকে এক করে নেয় এই সূত্র। সূত্রধারকেরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে, এক কথা ভেবে, এক লক্ষ্যে এগিয়ে চলে। পৃথিবীতে এমন কোন

স্পোর্টস্ নেই যাতে এতখানি একতা, সংযম ও ত্যাগের প্রয়োজন। এই এক-প্রাণ হয়ে যাওয়ার মূলে হল ঐ সূত্র, যাকে পর্বতারোহণের ভাষায় বলে রোপ্ বা দড়ি। এ দড়ি শুধু পর্বতারোহীর জীবন নয়, পর্বতারোহণেরও জীবন। কোমরে দড়ি বেঁধে, জীবন পণ করে এগিয়ে যেতে হয়। তবেই সাফল্য এসে জয়মাল্য দেয় পরিয়ে।

গত দুদিন দড়ি বেঁধে অনেক ঘুরেছে ওরা। অনেক পরিশ্রম করেছে। কিন্তু এগোতে পারে নি বেশি দূর। তিন নম্বর শিবিরের জায়গা পাওয়া যায় নি।

সেদিন সন্ধের একটু আগে ভানু ও নিতাই ফিরে এল দু নম্বর শিবিরে। হতাশ কণ্ঠে নিতাই অমূল্যকে জানাল, "নাঃ, ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড পাওয়া গেল না।"

"এত সহজে পাওয়া যাবে জানলে কি আমরা এখানে আসতাম নিতাই? হাল ছেড়ে দিয়ো না। আজ পাও নি, কাল পাবে।"

পরদিন চা ও পরিজ খেয়ে আবার ওরা বেরিয়ে পড়ল। দু নম্বর শিবিরের পুবে যে বিরাট বরফের দেয়াল রয়েছে, সেই দেয়াল পেরিয়েই ওপরে ওঠার পথ। দেয়ালটা বেশ উঁচু আর খুবই খাড়া। তাছাড়া বরফ নরম বলে স্টেপ্ কাটা যায় নি। ফিক্সড্ রোপ্ বা স্থায়ীভাবে দড়ি খাটানো হয়েছে। এই দড়ি খাটানোর কাজটি বেশ কঠিন। যেমন করেই হোক, কোমরে দড়ি বেঁধে, হাতুড়ি ও পিটন্ নিয়ে দুজনকে ওপরে উঠে যেতে হয়। তারা বরফ পরীক্ষা করে, সুবিধামত জায়গায় পিটন্ পুঁতে দড়ি ঝুলিয়ে দেয়। সেই দড়ি ধরে অন্যান্য অভিযাত্রীরা ওপরে ওঠে। এত ওপরে—যেখানে নিঃশ্বাস নিতে রীতিমত কষ্ট হয়, জুতোর ফিতে খুলতে মানুষ হাঁপিয়ে ওঠে, সেখানে স্বভাবতই পালা করে এই ফিক্সড্ রোপ্ লাগানোর কাজটি করতে হয়। পিটন্ হচ্ছে আংটা লাগানো খুঁটি—কাঠ বা লোহার তৈরি। এখানে বরফ বেশি বলে আমরা বড় বড় কাঠের পিটন্ সঙ্গে এনেছি। সেগুলো এখন খুব কাজে লাগছে।

দু নম্বর শিবির থেকে মনে হয় এই বরফের দেয়ালটার ওপরে উঠতে পারলেই শিখরের সহজ পথ পাওয়া যাবে। মনে তো অনেক কিছুই হয়, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে তার মিল কোথায়? দেয়ালের ওপর উঠে বোঝা যায় শিখর তখনও দূরে, বহুদূরে—অনেক দেয়াল, অনেক ধস, অনেক ফাটল পেরিয়ে।

এ ফাটলগুলো আরও বড়, আরও মারাত্মক।

অমূল্য বলে, 'পাতালের পথ।'

ভানু বলে, 'নরকের দ্বার।'

টোপগে বলে, 'গত জুন মাসে কিন্তু এত ফাটল ছিল না।'

থাকবে কেমন করে? সারা শীতের বরফ জমে ফাটলের মুখ ছিল বুজে। তখনও বরফ গলা শুরু হয় নি। গত চার মাস ধরে সেই বরফ গলেছে, দেখা দিয়েছে এইসব ফাটল।

তাহলেও ওরা গিয়েছিল অনেক দূর। পৌঁছেছিল ঠিক শিখরের নিচে—উত্তর-পশ্চিম দিকে। পুব দক্ষিণ ও পশ্চিম থেকে নীলগিরি শিখর সুন্দর। কিন্তু এখান থেকে যেন আরও সুন্দর। তবে এখান থেকেও সে ধরাছোঁয়ার বাইরে। পথ আটকে রয়েছে বিরাট এক বরফের নদী। নদীটা না থাকলে খুব সহজেই ওপরে উঠে যাওয়া যেত। অনেক চেষ্টা করেও কিন্তু নদীটা পার হওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত ওদের পশ্চাদ্‌পসরণ

করতে হল। ওপরে না উঠে ওরা চলল পুবে। স্মাইথ ঠিকই বলেছেন—উত্তর-পূর্ব দিক দিয়ে কোনাকুনিভাবে ওপরে উঠতে হবে। সেদিকে বরফের অবস্থা কেমন কে জানে?

এ পথে বরফের নদী নেই কিন্তু যা আছে তাই বা কম কিসের? আছে ফাটল আর বরফের দেয়াল—দুর্ভেদ্য দুর্গপ্রাচীরের মতো। আজীবা বলল, "এই প্রাচীর পেরোতে হবে।"

আবার ফিক্সড্ রোপ্ লাগানো শুরু হল। কিন্তু শেষ হল না। তার আগেই পড়ল বাধা। শিখর থেকে প্রহরীর মতো দলে দলে মেঘ ছুটে এল। নীল আকাশ ধূসর হল—কালো হল। দূরের রোদ হারিয়ে গেল, কাছের আলো মিলিয়ে গেল। কোথা থেকে তুষারের প্রবাহ নিয়ে মত্তপবন ছুটে এল। শরীর প্রায় অবশ হয়ে গেল। প্রাণ হাতে করে ওরা কোনরকমে পালিয়ে এল।

দেখতে দেখতে এক মাস কেটে গেল। পুজো গেছে, লক্ষ্মীপুজো গেছে, কালীপুজোও এল বলে। উমাপ্রসাদ নগর থেকে হালুয়া এসেছিল। তা দিয়েই ওরা বিজয়া সেরেছে। এ বছর আর নারকোলের নাড়ু খাওয়া হল না। না হোক, যা হবে বলে ঠিক ছিল, তাও যে হল না। দশমীর দিন শিখরে বসে ওদের বিজয়ার উৎসব পালনের কথা ছিল। অমূল্য মা-দুর্গার একখানি ছবিও সঙ্গে এনেছে। কিন্তু কোথায়? এখনও যে তিন নম্বর শিবিরই প্রতিষ্ঠা করতে পারল না। তাহলেও অমূল্য ভরসা দেয়, "দেয়ালীর আগেই নীলগিরি বিজয় হবে। উমাপ্রসাদ নগরে একসঙ্গে দেয়ালী ও বিজয়োৎসব পালন করব।"

"কিন্তু দেয়ালীর যে আর মোটে পাঁচদিন বাকি!" নিতাই অবাক হয়।

"পাঁচদিন কি কম হল?" নিরাপদ আশ্বাস দেয়।

"তাহলে চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।" ভানু অমূল্যকে তাগিদ দেয়।

"না। আজ আমাদের পূর্ণ বিশ্রাম। আজ শুধু শেরপারাই ফিক্সড্ রোপ করতে যাবে।"

"তাহলে চারদিনে কেমন করে..." নিতাই শেষ করতে পারে না।

নিরাপদ বলে, "যেমন করে আমরা করব।"

শুধু বিশ্রাম নয়, আজ খাওয়াটাও ভাল হল। অ্যাডভান্স বেস ছাড়ার পর খাচ্ছে তো সকালে আধ মগ চা ও বার্লির মতো খানিকটা শেরপা-পরিজ। ব্যাস—'পরিজ খাও, মাল উঠাও, উপার চলো।' পরিজ অখাদ্য, মাল প্রায় তিরিশ সের, উপার মানে—নরম বরফ, গভীর ফাটল আর খাড়া দেয়াল। তাপমাত্রা মাইনাস বিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

নিতাই ছুতারকে ডাকে, "সুতার।" সুতার মানে সুস্বাদু। কিন্তু তার তৈরি পরিজের সঙ্গে তার নামের কোন সম্পর্ক নেই। অথচ এই খেয়েই ওদের সারাদিন মাল বইতে হয়, স্টেপ্ কাটিং ও ফিক্সড্ রোপ্ করতে হয়। বিকেলে ফিরে এসে আধ মগ চা ও কয়েকখানা বৃটানিয়া বিস্কুট। সেই বিস্কুটও ফুরিয়ে গেছে দুদিন হল। সন্ধের সময় আসে খিচুড়ি—সারা দিনের মজুরি। এই খেয়েই বেঁচে আছে ওরা। আজ তার ব্যতিক্রম। আজ দুপুরে ডাল ভাত ও আলুসেদ্ধ হয়েছে। প্রাণভরে খেয়েছে। বহুদিন ভাত খায় নি কিনা!

পরদিন। নিরাপদ ও শেরপাদের নিয়ে অমূল্য বেরিয়ে পড়ল সকালে। যে দেয়ালের গোড়া থেকে পরশুদিন ওরা পালিয়ে গিয়েছিল, ফিক্সড্ রোপ দিয়ে আজ

অনায়াসে তার ওপরে উঠে এল। এগিয়ে চলল উত্তর-পূর্বে—পাহাড়ের গা ঘেঁষে। এদিকে বরফ কম, তবে মাঝে মাঝে ওপর থেকে বরফ গড়িয়ে গায়ে পড়ছে। একটু বাদেই বাঁ দিকে একটা শক্ত বরফ ও পাথর মেশানো খাড়া পাহাড়—আছাড় খাবার ভয়। জুতোয় ক্র্যাম্পন বাঁধা হল। এখানেই আর্মি টিম তাঁদের ক্যাম্প টু বা শেষ শিবির স্থাপিত করে শিখর অভিযান চালিয়েছিলেন।

নিরাপদ থমকে দাঁড়ায়। ওর একপাটি জুতো ছিঁড়ে গেছে—বরফ ঢুকছে পায়ে। অমূল্য চিৎকার করে ওঠে, "সর্বনাশ ফ্রস্ট বাইট হয়ে যাবে যে।" নিজের জুতো নিরাপদকে দিয়ে, নিরাপদর ছেঁড়া জুতো পরে, সে নেমে গেল নিচে। নিরাপদ এগিয়ে চলল শেরপাদের নিয়ে।

আরেকটা দেয়ালের সামনে এসে পৌঁছল ওরা—একেবারে খাড়া দেয়াল। এক এক জায়গায় এত খাড়া যে ফিক্‌সড্ রোপ্ ধরে, প্রায় ঝুলে ওপরে উঠতে হয়। নিচে পাতাল-প্রসারী খাদ। তাকালে ভয় হয়। তাহলেও ওরা শেষ পর্যন্ত সেই দেয়ালের ওপর উঠে এল।

টোপগে থমকে দাঁড়াল। আর আর্মির পথে এগোনো সম্ভব নয়। চার মাস আগের সেই পথ এখন ফাটলে বোঝাই। বাঁ দিকে বরফ ও পাথর মেশানো একটা দেয়াল। আবার জুতোয় ক্র্যাম্পন বাঁধতে হল। শক্ত বরফ, কাজেই আছাড় খাবার ভয়। বরফের চেয়ে পাথরগুলো আরও বিপজ্জনক। ছোঁয়া লাগলেই নড়ে উঠে, নিচে গড়াতে শুরু করে। প্রতি পদক্ষেপে ওদের পর্বতারোহণের কঠিনতম পরীক্ষা দিতে হচ্ছে।

উত্তীর্ণ হয়েছে ওরা। কিন্তু এখনও যে অনেক বাকি। সামনেই আর একটা বরফের দেয়াল। প্রায় আশী ডিগ্রী কোণ করে বান-কুণ্ড হিমবাহের দিকে ঝুঁকে রয়েছে। যেন এখুনি ভেঙে পড়বে। তাহলেও পেরোতে হবে এই বাধা। স্টেপ্ কাটা হল। মাঝে মাঝেই নরম বরফ। পা দিতেই ধসে যাচ্ছে। কোন রকমে দেয়াল আঁকড়ে থেকে আবার স্টেপ্ কাটতে হচ্ছে। এইভাবে প্রায় ঘণ্টা খানেক আপ্রাণ চেষ্টা করে ওরা সবাই উঠে এল সেই দেয়ালের ওপর।

ওপরে, আরও ওপরে। যেতে হবে, যেমন করেই হোক। পেরোতে হবে সামনের ঐ সংকীর্ণ বরফের সেতু। কিন্তু কেমন করে? সেতুটি প্রায় দুশ গজ দীর্ঘ। এত সংকীর্ণ যে একখানি পা কোন রকমে রাখা যায়। পাশে আইস এক্স রাখার জায়গা পর্যন্ত নেই। সার্কাসে যেমন করে তারের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হয়, তেমনি করে ভারসাম্য বজায় রেখে ওরা একে একে এপারে এসে পৌঁছল। তবে সেখানে তারের নিচে থাকে দড়ির জাল। আর এখানে ডান দিকে ছ হাজার ফুট ও বাঁ দিকে দেড় হাজার ফুট গভীর খাদ।

এপারে এসেই সকলের চোখ জুড়িয়ে গেল। ওরা একটা বিরাট বরফাবৃত প্রায় সমতল প্রান্তরে এসে পৌঁছেছে। এই উচ্চতায় এত বড় প্রান্তর বিস্ময়কর। আনন্দে শেরপারা পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল। ওদের শ্রম সার্থক হয়েছে। তিন নম্বর শিবিরের ক্যাম্পিং গ্রাউন্ড পাওয়া গেছে। টোপগে আফসোস করল, "ইস্ একটা ফুটবল আনা হয় নি।"

শখের বলিহারি। মাইনাস পঁচিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে ফুটবল খেলবে।

সামনেই নীলগিরি শিখর। শিখর থেকে একটি সংকীর্ণ গিরিশিরা নেমে এসেছে।

ঐ গিরিশিরাই শিখরের একমাত্র পথ। স্টেপ্ কেটে এই ১১৬৪ ফুট উঠতে হবে। পুবে খাড়া পাহাড়, দক্ষিণে বরফের স্তূপ। দিনরাত হিমানী সম্প্রপাত হচ্ছে। হোক গে, যেখানে পৌঁছনো দরকার ওরা সেইখানে পৌঁছতে পেরেছে। নেহাত প্রাকৃতিক দুর্বিপাক না হলে জয় সুনিশ্চিত।

সাধারণত বিশহাজার ফুট উঠতে পারলেই পর্বতারোহণের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। এই বরফাবৃত প্রান্তরটি খুঁজে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এ অভিযানও স্বীকৃতি পেল। এখানকার উচ্চতা ২০,১০০ ফুট।

এখান থেকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যায়—উত্তরে কামেট (২৫,৪৪৭), মানা (২৩,৮৬০) ও দেওবন (২২,৪৯০), দক্ষিণে ত্রিশুল (২৩,৩৬০) ও নন্দাঘুণ্টি (২০,৭০০) পুবে নন্দাদেবী (২৫,৬৪৫) পশ্চিমে চৌখাম্বা (২৩,৪২০) ও নীলকণ্ঠ (২১,৬৪০)। দেখা যায় জোশীমঠের উপত্যকা।

ওরা মালপত্র পিঠ থেকে নামাল। নিরাপদ ও আজীবা বসে পড়ল। কিন্তু বসল না অন্যান্য শেরাপারা। ওদের আর তর সইছে না। পারলে এখনি গিয়ে শিখরে ওঠে। উপযুক্ত আয়োজন না করে যে শিখরে ওঠা সম্ভব নয়, তা ওরা জানে। তবু ওরা এগিয়ে গেল সেই সংকীর্ণ গিরিশিরার দিকে। একটু ঘুরে আসতে।

ইচ্ছে থাকলেও নিরাপদ ওদের সঙ্গে যেতে পারল না। সে আজকের এই অভিযানের নেতা। নেতাকে আনন্দে অবিচলিত থাকতে হয়। তাছাড়া প্রচণ্ড হাওয়া বইছে। আবহাওয়া কখন খারাপ হয় বলা যায় না। তাঁবু ছাড়া বেশিক্ষণ বসা যাবে না এখানে। ইতিমধ্যে কিভাবে শিখর অভিযান চালাতে হবে, আজীবার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করে ফেলতে হবে। নিরাপদর ইচ্ছা, পরশুদিন অর্থাৎ ২৫শে অক্টোবর চূড়ান্ত সংগ্রামের দিন ধার্য করা হোক। আজীবার কিন্তু তাতে আপত্তি। কারণ কাল কাউকে এক নম্বর শিবিরে যেতে হবে খাবার ও পিটন্ আনতে।

আবার খাবার কম পড়েছে? পিটন্‌গুলোই বা এক নম্বরে রেখে আসার কি কারণ থাকতে পারে? নিরাপদ বিরক্ত হয়। কিন্তু এখন আর কোন উপায় নেই। ভুলের খেসারত দিতেই হবে।

প্রায় ঘণ্টাদেড়েক পরে ওরা মালপত্র সেখানে রেখে ফিরে চলল দু নম্বর শিবিরে। আজ বুক ফুলিয়ে দাঁড়াতে পারবে অমূল্যর সামনে। হাসতে পারবে প্রাণ খুলে—ভাগ্যবান নিরাপদ।

পরদিন। খুব সকালেই পান সিং ও ছুতারকে নিয়ে অমূল্য ও নিরাপদ রওনা হল নিচে—এক নম্বর শিবিরে। চলল চিনি গুঁড়ো দুধ ও আইস পিটন্ আনতে। সাধারণত এ সব কাজ শেরপারাই করে। কিন্তু আজ তারা পরিশ্রান্ত বলে, নেতা নিজেই ট্রেড কর্পোরেশনের লেদার জ্যাকেট পরে বেরিয়ে পড়ল।

এক নম্বরে চঞ্চলের সঙ্গে দেখা হল। সে জানাল—কুলিরা র‍্যাশন্ পৌঁছে দিয়ে নেমে গেছে। অমূল্য নিশ্চিন্ত হল। পরশুদিন চঞ্চলকে দু নম্বরে আসতে বলে, ওরা মাল নিয়ে ওপরে ফিরে এল বিকেলে। এসেই অমূল্য ডেকে পাঠাল আজীবাকে। ভানু নিতাই বেরিয়ে এল তাদের তাঁবু থেকে। সবাই বসল গোল হয়ে। আলোচনা শেষে সাব্যস্ত হল—পরশু (২৬শ অক্টোবর শুক্রবার) প্রথম প্রচেষ্টায় শেরপাদের সঙ্গে দুজন সভ্য যাবে

চূড়ান্ত সংগ্রামে। যদি তারা বিফল হয়, তবে একদিন বিরতির পর বাকি দুজন যাবে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায়। যদি তারাও বিফল হয়?

সেকথা তখন ভাবা যাবে। কিন্তু প্রথম দুজন কে? সবাই চুপ করে আছে। কে বাদ পড়বে? অমূল্যই নীরবতা ভাঙে, "নেতা ও সহনেতার মধ্যে একজন যাবে। সেই একজন ভানু। ভানুই প্রথম শিখর অভিযানের নেতৃত্ব করবে।"

"তুমি?" ভানু বিস্মিত।

"নেতাকে শিখরাভিযাত্রী হতে নেই। তবে প্রয়োজন হলে আমি যাব দ্বিতীয় দলে। কিন্তু সে প্রয়োজন যেন না হয়। তোমরা বিজয়ী হয়ে ফিরে এসো। আমিই তিন নম্বর শিবিরে তোমাদের প্রথম অভিনন্দন জানাব।"

অভিভূত ভানু অমূল্যকে জড়িয়ে ধরে।

একটু বাদে অমূল্য আবার বলে, "নিতাই ও নিরাপদ—তোমরা নিজেরাই ঠিক করে নাও, কে যাবে প্রথম দলে।"

কে যাবে প্রথম দলে? নিতাই না নিরাপদ? নিরাপদ না নিতাই? নিতাইয়ের বড় আশা—মা বাবার নাম লেখা যে কাগজখানি রয়েছে ওর বুক পকেটে, সেখানি সে রেখে আসবে নীলগিরি শিখরে।

আর নিরাপদ? তারই কি কম আশা? সে নীলমণি নীলগিরির শুচিশুভ্র শিখরে একটি চুম্বন দেবে এঁকে। সেই তো এ শিখর নির্বাচিত করেছে। তিন নম্বর শিবিরের জায়গা খুঁজে বার করেছে। সেখানে শিখরাভিযানে মাল বয়ে নিয়ে গেছে। আর সেই যাবে না শিখরে? কিন্তু সে গেলে যে নিতাই বাদ পড়ে। নিতাই তাঁর অনেক দিনের বন্ধু। এক সঙ্গে দার্জিলিংয়ে বেসিক কোর্স করেছে। কলকাতা ছাড়ার পর থেকে এক নম্বর শিবির পর্যন্ত দুজনে সব সময়ে এক সঙ্গে রয়েছে। একই তাঁবুতে রাতের পর রাত কাটিয়েছে। একজনের মাথা ধরলে আরেকজন মাথা টিপে দিয়েছে। ঘুমের ঘোরে টুপি খুলে গেলে টুপি পরিয়ে দিয়েছে। দুর্গম পথে মাল বয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে বসে পড়লে একে অপরের মুখের সামনে জলের বোতল খুলে ধরেছে। তারাই আজ প্রতিদ্বন্দ্বী। কে তার নিজেব দাবি ছেড়ে দেবে? কিন্তু নিরাপদই যে নিতাইকে তেজপুর থেকে আনিয়েছে। আর এখন সে স্বার্থপরের মতো নিতাইকে ফেলে রেখে নিজে এগিয়ে যাবে? কিন্তু না গেলে যে কেউ জানবে না—নিরাপদ একদিন এখানে এসেছিল, গোধূলীর রক্তিম রশ্মিতে রক্তরাঙা নীলগিরিকে সে-ও ভালবেসেছিল।

না জানুক—অজানাই থাক সে কথা। ভালবাসার কত কাহিনীই তো চিরকাল মনের মণিকোঠায় বন্দী থেকে যায়। তবে সে যে স্বার্থপর, বন্ধুকে বঞ্চিত করে নি, এ সত্যটা তো চিরকাল সত্য হয়ে থাকবে। নিতাইয়ের দিকে তাকায় নিরাপদ। নিতাইও কি যেন বলতে চাইছে তাকে। হারিয়ে যাওয়া ভাষা খুঁজে পেল নিরাপদ। গম্ভীরকণ্ঠে বলল, "আমি নয়, তুই যাবি প্রথম দলে।"

॥ ২৯ ॥

'...আর একটু...ব্যাস্। দাস্ ফার্ অ্যান্ড নো ফার্দার্..ভানুদা!' আনন্দে চিৎকার করে ওঠে নিতাই। আবেগে আলিঙ্গন করতে চায় ভানুকে। পারে না। হাত দুখানি কি অবশ হয়ে গেছে? না, ভানুকে আলিঙ্গন করতে হলে হাত বের করতে হবে—স্লিপিং ব্যাগের জিপ্ খুলতে হবে। স্বপ্ন দেখছিল নিতাই। স্বপ্ন দেখছিল, তারা নীলগিরির স্বপ্নশিখরে আরোহণ করেছে। স্বপ্ন তো দেখছে আজ কতদিন ধরেই। ঘুমিয়ে নয়, জেগেই স্বপ্ন দেখেছে সেই প্রতীক্ষিত প্রহরের, যখন তারা বলতে পারবে—'ব্যাস্। এই পর্যন্ত, আর নয়। আরোহণ শেষ হল, এবারে অবরোহণের পালা।'

ভাগ্যিস ভানুর ঘুম ভাঙে নি। নইলে নিতাই বড় লজ্জা পেত। রাত কত বাকি কে জানে? ঘড়ি দেখতে হলেও হাত বের করতে হবে। দরকার নেই রাতের খবর নিয়ে—যা শীত পড়েছে। কাল সন্ধের সময়েই ছিল মাইনাস পঁচিশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। এখন কত? ভাবলেও ভয় করে। তার চেয়ে যতটা পারা যায় ঘুমিয়ে নেওয়া যাক্। রাত ফুরোলেই ২৬শে অক্টোবরের উষা। বহু প্রতীক্ষিত চূড়ান্ত সংগ্রামের মহালগ্ন—এমন লগ্ন সবার জীবনে আসে না।

কিন্তু ভানুদা তো দিব্যি নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে! ওর কি কোন ভয় নেই—ভাবনা নেই! নিতাই যে চোখের পাতা এক করতে পারছে না। নানা ভাবনা এসে ভিড় করছে তার মনে। মনে পড়ছে শুভানুধ্যায়ীদের কথা, মনে পড়ছে অভিযাত্রী বন্ধুদের কথা, মনে পড়ছে অমূল্য নিরাপদর কথা।

নিরাপদ। হ্যাঁ, নিরাপদর কথাই বেশি মনে পড়ছে। বলতে গেলে একরকম জোর করেই সে নিতাইকে শিখরাভিযানে পাঠিয়েছে। ব্যক্তিগত স্বার্থের চেয়ে বন্ধুত্বের দাবি তার কাছে অনেক বড়। বলেছে, "তোর যাওয়া আর আমার যাওয়া একই কথা। কে শিখরে উঠল সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হচ্ছে—আমরা নীলগিরি বিজয় করতে পারলাম কি না? যদি সফল হই, তাহলে জানবি, সে সাফল্য তোর কিংবা আমার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সম্ভব হয় নি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই সেই সাফল্য এনে দিয়েছে।"

কাল সকালে অমূল্য ও নিরাপদ ওদের রুকস্যাক গুছিয়ে দিয়েছে, সামনে বসিয়ে খাইয়েছে, তারপরে তাঁবু গুটিয়ে তিন নম্বর শিবিরে রওনা করিয়ে দিয়েছে। আস্তে আস্তে পথ চলেছে ওরা। অমূল্য ও নিরাপদকে ছেড়ে আসতে হয়েছে বলে, মনের সঙ্গে পাও যেন ভারী হয়ে পড়েছে।

এখানে—তিন নম্বর শিবিরে পৌঁছতে বেলা দেড়টা বেজে গেছে। একটু বিশ্রাম নিয়ে চা খেয়ে কাজ শুরু করেছে। বরফ কেটে সমতল করে কাঠের পিটন্ পুঁতে দুটো তাঁবু খাটিয়েছে। একটা শেরপাদের, একটা নিতাই ও ভানুর। পর্বতাভিযান মানেই নিত্য নতুন সংসার পাতা—এক শিবির গুটিয়ে আর এক শিবির প্রতিষ্ঠা করা।

এয়ার ম্যাট্রেস ফুলিয়ে শয্যা রচনা হল। পট্টি মোজা ও গেইটার রোদে শুকনো হল। বরফ পরিষ্কার করে জুতো স্লিপিং ব্যাগে রেখে দিল। ক্যাম্প শু না আনার জন্য ওরা আর বাইরে বেরুতে পারল না। ততক্ষণে বেলাও গড়িয়ে এসেছে। নীলগিরির শুভ্র শিখরে অস্তগামী সূর্যের অন্তিম রশ্মির পরশ লেগেছে। শিশুর সারল্য নিয়ে খেয়ালী প্রকৃতি

হোলি খেলায় মত্ত হয়ে উঠেছে। শুধু নীলগিরিকে রাঙিয়েই সে ক্ষান্ত হয় নি। চারিদিকের অমল ধবল নিশ্চল শিখরগুলোর কাউকে রেহাই দেয় নি। রেহাই দেয় নি অসীম আকাশকেও। প্রকৃতির ভাণ্ডারে যে রংয়ের অভাব নেই!

ছুতারের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। মাঝরাতে স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেছিল নিতাই। স্বপ্ন দেখেছিল তারা নীলগিরির স্বপ্ন-শিখরে আরোহণ করেছে। তারপরে অনেকক্ষণ জেগে ছিল। ভাবছিল গতকালের কথা। ভাবতে ভাবতে কখন আবার ঘুমিয়ে পড়েছে।

ছুতার চা ও পরিজ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে পড়ে ভানু ও নিতাই। ইস্ নটা বেজে গেছে। খেয়ে নিয়েই পোশাক পরতে শুরু করে—উলের গেঞ্জি, সুতির জামা, সোয়েটার, উইন্ডপ্রুফ ও ফেদার জ্যাকেট, উলের ড্রয়ার, উইন্ডপ্রুফ ও ফেদার প্যান্ট। জুতো পরে ভানু পট্টি বাঁধে পায়ে, নিতাই বাঁধে গেইটার। তারপর বালাক্লাভা টুপি মাথায় দিয়ে, আইস গগ্ল্স্ ও আইস এক্স হাতে দুজনে বেরিয়ে আসে তাঁবুর বাইরে। বাঃ চারিদিকে কি সুন্দর রোদ! গত দু দিনের মতো আজও আকাশ মেঘমুক্ত। নীলে নীলে নীলা হয়ে আছে নীলমণি-নীলগিরির নীলাকাশ।

কিছুক্ষণ বাদে শেরপাদের নিয়ে সর্দার আজীবা বেরিয়ে এল। ক্র্যাম্পন বেঁধে, দড়ি হাতে রুকস্যাক পিঠে নিয়ে প্রস্তুত হয়েই এসেছে ওরা। ঠিক হল প্রথম দড়িতে যাবে আজীবা টোপগে ও ছান্দু। দ্বিতীয় দড়িতে ভানু নিতাই আং দাওয়া ও আং টেম্বা। ওরা রওনা হল ওপরে, যেখানে পঁচিশ বছর আগে ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ গিয়েছিলেন একদিন—সেইখানে। যেতেই হবে, যেমন করেই হোক।

তাঁবু থেকে সিকি মাইল বরফাবৃত প্রায় সমতল প্রান্তরের ওপর দিয়ে হেঁটে ওরা পৌঁছল নরম বরফের একটা হেলে-থাকা দেয়ালের সামনে। প্রান্তরের এখানে ওখানে ফাটল ছিল বলে এ পথটুকু খুব সাবধানে পেরোতে হয়েছে। ফিক্সড্ রোপ করে সবাই একে একে উঠে এল সেই দেয়ালের ওপরে। একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার শুরু হল পথ চলা। জুতো দিয়ে সজোরে লাথি মেরে কিংবা আইস এক্স দিয়ে স্টেপ তৈরি করে, আজীবা চলেছে সবার আগে। চলেছে স্বচ্ছন্দ গতিতে। দেখে মনে হচ্ছে না তার কোন পরিশ্রম হচ্ছে। মনে হচ্ছে না সে এ পথে জীবনে আর কোনদিন আসে নি—যেন সব চেনা, সব জানা।

চলেছে ওরা কোমল তুষারের ওপর দিয়ে। খুব সাবধানে চলতে হচ্ছে। তুষার ক্রমশ কোমলতর হচ্ছে। প্রতি পদক্ষেপে পা তলিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে আজীবার সঙ্গে স্থান পরিবর্তন করল টোপগে। সুইজারল্যান্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত দার্জিলিং হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্সটিটিউটের প্রাক্তন ইন্সট্রাক্টর শেরপা টোপগে। আর্মি টিমের সঙ্গে সে এসেছিল এখানে, কিন্তু হার মেনেছে নীলগিরির কাছে। আজ নীলগিরিকে হার মানতে হবে তার কাছে। আইস এক্স দিয়ে স্টেপ কেটে কেটে অতি সন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে টোপগে। মুহূর্তের জন্যে অসাবধান হলে চলবে না। নীলগিরিকে বিশ্বাস নেই।

নইলে এতক্ষণ যা ছিল না, তা আবার এখানে কেন? বেশ চওড়া ও গভীর একটি ফাটলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা। পথ বন্ধ। কিন্তু ওরা যে পথিকৃৎ। পথ তৈরি করে

পথ চলতে হবে। অভিজ্ঞ টোপগে ফাটলের মধ্যে চওড়া করে স্টেপ কাটল। ছান্দুর সাহায্যে ওপরে উঠে আইস পিটন পুঁতে, নিজের ভারসাম্য বজায় রেখে, হাত ধরে এক এক করে সবাইকে টেনে তুলল।

এবার সবার আগে চলেছে সর্বকনিষ্ঠ শেরপা ছান্দু। তার ওজনও সবচেয়ে কম। আইস পিটন্ নিয়ে সে সহজেই উঠে যেতে পারছে। আবার একটা বরফের দেয়াল। এক জায়গায় ছান্দুর আইস এক্স বরফে ঢুকে গেল। ওপরের ঝুরো বরফ সরিয়ে আইস এক্স খুঁজে বের করতে হল।

দেয়াল পেরিয়ে খানিকটা সমতল জায়গা পাওয়া গেল। একটু বিশ্রাম না নিয়ে আর চলতে পারছে না কেউ। সবাই বসে পড়ল সেখানে। ভানু পকেট থেকে চকলেট বের করে সবাইকে দিল। চকলেট খেয়ে বরফের গোলা পাকিয়ে চুষতে চুষতে ওরা আবার উঠে দাঁড়াল।

পথ দুর্গম। নীলগিরি যে দুর্গম গিরি। সে যে নীল দুর্গম। তবু এতক্ষণ ওদের আরোহণ ব্যাহত হয় নি। সকল বাধাকে জয় করে ওরা ক্রমাগত ওপরে উঠছিল। কিন্তু এবারে বুঝি নিচে নামতে হয়। সামনেই একটা গভীর খাদ—আগের দুটির চেয়ে প্রশস্ততর। পার হবার পথ নেই। খাদের ওপর দু-এক জায়গায় সেতুর মতো বরফের আস্তরণ হয়েছে বটে, কিন্তু তা এত পাতলা যে তার ওপর পা দিলেই পাতাল-প্রবেশ। খাদ এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আর এড়িয়ে যেতে হলে খাড়া দুশ ফুট নেমে গিয়ে, হিমানী সম্প্রপাত স্থান দিয়ে আবার ওপরে উঠতে হবে। পাঁচশ ফুট উঠতে তিন ঘণ্টা লেগেছে। এখন বেলা সাড়ে বারোটা। শিখর এখনও ছশ ফুট ওপরে। এ অবস্থায় দুশ ফুট নেমে যাওয়া...। কিন্তু উপায় কি? তাই করতে হল ওদের।

যেখানে আরোহণে এত বাধা, সেখানে অবরোহণও কি নির্বিঘ্ন হতে পারে? একাধিক জায়গায় ফিক্সড্ রোপ করতে হল। ম্যানিলা রোপ ফুরিয়ে গেল। এর পরে নাইলন রোপ ব্যবহার করা ছাড়া উপায় নেই। ইতিমধ্যে দড়ি বদল হয়েছে। প্রথম দড়িতে নিতাই আজীবা ছান্দু ও আং দাওয়া। ধীর স্থির ও বিচক্ষণ ওস্তাদ আং দাওয়া। কথার চেয়ে কাজ করে বেশি। মুখে তার সব সময়েই হাসি। দুটি ভারতীয় নন্দাদেবী অভিযানে অংশ নিয়েছে সে। আগামী আমেরিকান এভারেস্ট অভিযানেও দলভুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় দড়িতে ভানু টোপগে ও আং টেম্বা। প্রথম দলই পথ তৈরি করছে। দ্বিতীয় দল এক হাঁটু নরম বরফে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা জানে, এ রকম দাঁড়িয়ে থাকলে ফ্রস্ট-বাইট হবার সম্ভাবনা। ঠাণ্ডায় এমনিতেই রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে। তার ওপর চলা বন্ধ করলে তো কথাই নেই। কিন্তু ওদের ফ্রস্ট-বাইট হবে বলে কি নীলগিরিতে বরফ থাকবে না? বরফই যে নীলগিরির বিশেষত্ব। স্মাইথের ভাষায়, 'The finest snow and ice-peak...'

শেষ পর্যন্ত শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করে ওরা উঠে এল ওপরে। একটু বিশ্রাম নিল। ভানু আবার এক টুকরো করে চকলেট দিল সবাইকে। বেলা দেড়টা বাজে।

আকাশের অবস্থা অপরিবর্তিত। উজ্জ্বল সূর্যালোকে জ্বলজ্বল করছে নীলগিরি শিখর, 'Simple, beautiful and serene in the sunlight, the perfect summit of the mountaineers dreams.'

মেঘ আসছে মানার দিক থেকে। সর্বনাশা মেঘ আবার তুষার ঝড় নিয়ে আসছে না তো? তা হলে যে সব শেষ। আবহাওয়ার জন্যই অধিকাংশ অভিযান বিফল হয়।

বেশিক্ষণ বিশ্রাম করার সময় নেই। বেলা দুটো বাজে। শিখর এখনও অনেক দূর। তা ছাড়া যা শীত। ক্ষুধা-তৃষ্ণার কথা না বলাই উচিত। তবে বরফের অবস্থা খুব ভাল। আজীবা বলে—এত উঁচুতে এত ভাল বরফ পাওয়া ভাগ্যের কথা। তাহলে কি আমরা ভাগ্যবান?

ওরা আবার চলতে শুরু করেছে। লাথি মেরে স্টেপ করতে করতে এগিয়ে চলেছে। এখন আর পথে তেমন বড় ফাটল নেই। সহসা একটা দমকা হাওয়া আসায় থমকে দাঁড়াল সবাই। না, দমকা হাওয়া নয়। সব সময়েই এখানে এমনি হাওয়া চলে। তবে এখানে ওদের দাঁড়াতে হতই। যে গিরিশিরা বেয়ে ওরা এখানে এসেছে, সেটি এখান থেকে শ দুয়েক গজ প্রায় সমতল। তারপরে সহসা অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে খাড়া উঠে গিয়ে একটি বিন্দুতে মিশেছে। ঐ বিন্দুই সেই স্বপ্নশিখর।

সমতল জায়গাটুকু সহজেই পেরিয়ে এল ওরা। কিন্তু তারপর গিরিশিরাটি এত সংকীর্ণ যে আর স্টেপ কাটা সম্ভব নয়। সামান্য যা নাইলন রোপ অবশিষ্ট আছে তা দিয়েই ওরা ফিক্সড্ রোপ করতে লাগল। আর তর সইছে না। যেখানে উঠবে বলে দিনে সাধনা করেছে, রাতে স্বপ্ন দেখেছে—সেখানে ওঠার শেষ বাধা অপসারিত হচ্ছে। ...কিন্তু সত্যিই কি সব বাধা সরে যাবে? এখনও যে বিশ্বাস হয় না।

কিন্তু সত্যি সকল বাধা ধীরে ধীরে অপসারিত হল। সত্যি সত্যিই একসময়ে দড়ি ধরে ওরা একে একে উঠে এল ওপরে। স্বপ্নে-দেখা স্বপ্ন শিখরে। নীলগিরি শীর্ষে।

সবার শুভেচ্ছা সার্থক হল। আমাদের প্রচেষ্টা সফল হল। দুর্গম নীল বিজিত হল। ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথের নামের পাশে আরও একটি নাম পর্বতারোহণের ইতিহাসে যুক্ত হল—হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশান। উনিশ শ সাঁইত্রিশের পর উনিশশ বাষট্টি।

ভানু ঘড়ি দেখল—বেলা তিনটে। আজীবা গুঁড়ো দুধ ও মধু দিয়ে পুজো করল নীলগিরিকে—সকল বাধা জয় করে আমরা এসেছি তোমার কাছে। হে সুদূর স্বপ্নশিখর তুমি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করো।

পুজো শেষে ওরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করল—বিজয়া ও দেয়ালীর মিলিত আলিঙ্গন।

সে বিজয়ালিঙ্গনের সাক্ষী রইল ত্রিশূল, নন্দাঘুণ্টি, মানা, কামেট, চৌখাম্বা, নীলকণ্ঠ ও নন্দাদেবী। তবে কাছে কেউ নেই। কয়েক মাইলের মধ্যে আর এত উঁচু কোন শিখর নেই। তিব্বতও দেখা যাচ্ছে—গোলাপী রংয়ের তিব্বত। মানস-কৈলাসের তিব্বত একদিন গোলাপের মতই পবিত্র ছিল। এখন পুণ্যার্থীদের আর সেই পবিত্র-তীর্থ প্রবেশের অধিকার নেই। গোলাপী তিব্বতের পথ আজ রক্ত পিচ্ছিল।

শিখর এতই সংকীর্ণ যে সেখানে কোন রকমে একজন লোক দাঁড়াতে পারে। এক এক করে ওরা সবাই শিখরে উঠে দাঁড়ালো। ভানু ও আং দাওয়া ক্যামেরা খুলল। জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে নিতাই নীলগিরি শিখরে জাতীয় পতাকা প্রোথিত করল। আমাদের অ্যাসোসিয়েশানের পতাকাও স্থান পেল সেই পবিত্র পতাকার পাশে। অবশেষে নীলমণি নীলগিরির শুভ্র শিখরে নিতাই একটি চুম্বন দিল এঁকে।

নীলগিরি আর বহু দূরের স্বপ্ন নয়। স্বপ্ন আজ সত্য হয়েছে। সত্য হয়ে উঠেছে সে সুন্দর ঐ নীলাকাশের মতো, সত্য সে এই উজ্জ্বল দিবালোকের মতো। সত্য হয়েছে সে আমাদের জীবনে—ভারতের পর্বতারোহণের ইতিহাসে।

॥ ৩০ ॥

বেস ক্যাম্প—২৭শে অক্টোবর। আজ কালীপুজো। অমূল্য বলেছিল, একসঙ্গে দেয়ালী ও বিজয়া উৎসব পালন করবে। কিন্তু কোথায়?

চারদিন হল দেবীদাস নেই। সঙ্গে গেছে সাতজন কুলি। আশা করছি আজ বিকেল নাগাদ তারা জোশীমঠ থেকে ফিরে আসবে। দেবীদাস চলে যাবার পর দু দিন খুব ফাঁকা ফাঁকা লেগেছে। পরশুদিন বীরেন ও প্রাণেশ অ্যাডভান্স বেস থেকে নেমে এলে, ফাঁকা ভাব কিছুটা কেটেছে। তবে ওরা দুজনে মিলেও দেবীদাসের অভাব পুরোপুরি পূরণ করতে পারে নি।

কাল বিকেল থেকে আবার তুষারপাত শুরু হয়েছে। ওপরে কি হচ্ছে কে জানে। তিন দিন কোন খবর নেই। তবে আকাশের দিকে তাকিয়ে কাল দুপুরে শের সিং হঠাৎ বলে উঠেছিল, আজ হোগা।' সঙ্গে সঙ্গে সিংহ-পর্বত থেকে একটা ধস নেমেছিল। তার সিংহ-গর্জনে আমরা চমকে উঠেছিলাম আর শৈলেশদা বলেছিলেন, 'সত্যি সত্যি সত্যি।'

কিন্তু এখনও পর্যন্ত যে কোন খবরই নেই। কাল খবর পাঠিয়ে থাকলে এতক্ষণে...। না এখনও সময় হয় নি। সন্ধের আগে খবর আসতে পারে না। ওয়াকি টকি আনতে পারলে এই নিদারুণ উৎকণ্ঠা ভোগ করতে হত না।

বাইরে আকাশ ভেঙে তুষার ঝরছে। আমরা তাঁবুতে বন্দী। ভাল লাগছে না আর কিছু। ডাক্তার গান ভুলেছে। পিনাকী কাজ ভুলেছে। প্রাণেশ ডায়েরি ভুলেছে। উপেনবাবুর হাসি হারিয়ে গেছে। বীরেনের গল্প ফুরিয়ে গেছে, শৈলেশদার হিসেবে গরমিল হয়েছে। আর আমার কিছুই ভাল লাগছে না। তাই একখানি বই নিয়ে বসেছি। কিন্তু পড়ায় মন বসছে না। মন যে এখন আমাতে নেই। কোথায়? যেখানে অমূল্য ভানু নিরাপদ নিতাই—সেই নীলগিরি শিখরে।

"কে?"

"কি হয়েছে?"

টলতে টলতে ধন বাহাদুর তাঁবুতে ঢুকছে। বসে পড়েছে। ভয়ানক হাঁফাচ্ছে। কি হল ওর? এল কোথা থেকে। ও তো ওপরে ছিল। কথা বলছে না কেন? কোন দুঃসংবাদ নেই তো? ধন বাহাদুর শুয়ে পড়েছে। ডাক্তার নাড়ী দেখে কি একটা ওষুধ খাইয়ে দেয়। আমরা সবাই মিলে ওর জামা থেকে বরফ ঝাড়তে থাকি। এইভাবে কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর ধন বাহাদুর চোখ মেলে তাকায়। পকেটে হাত দেয়। এক টুকরো জীর্ণ কাগজ বের করে আমার হাতে দিয়েই বলে ওঠে, "কাম্ ফতে হো গিয়া।"

"হো গিয়া।" সবাই এক সঙ্গে চিৎকার করে উঠি। ধন বাহাদুর মাথা নাড়ে। আমি কাগজখানা খুলে ফেলি। সবাই ঝুঁকে পড়ে। ডট পেন দিয়ে লেখা। সব জায়গায় লেখা পড়ে নি। বোধ হয় ঠাণ্ডায় রিফিল্ জমে গেছে।

দু নম্বর শিবির।
২৭.১০.৬২

আপনাদের শ্রম সার্থক। কাল বেলা তিনটেয়...জয় হয়েছে।
দুঃখের...এ দিকের...ভাল নয়।...তিন জনের ফ্রস্ট-বাইট... নিতাই
আজীবা আং দাওয়া...।
কাল সকালে...রওনা হচ্ছি। কুলি পাঠান।

অমূল্য

স্বপ্নশিখর জয় হয়েছে! আমাদের সকল শ্রম সার্থক হয়েছে! কি আনন্দ! আমরা পাগলের মতো পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে থাকি। ডাক্তার গলা ছেড়ে গান শুরু করে, "তোরা সব জয়ধ্বনি কর! ...অট্টরোলের হট্টগোলে স্তব্ধ চরাচর..."

শৈলেশদা দাঁত হাতে নাচতে শুরু করেছেন। কেন জানি না তিনি তাঁর এক পাটি নকল দাঁত খুলে হাতে নিয়েছিলেন। আনন্দের আতিশয্যে সেটা লাগাতে ভুলে গেছেন।

উপেনবাবু চিৎকার করে উঠলেন, "শৈলেশদা সব ঠিক আছে তো?"

"আছে আছে। সব ঠিক আছে।" শৈলেশদা নেচে চলেছেন।

বীরেন আমার হাত থেকে চিঠিটা নিয়ে আবার পড়তে শুরু করল। প্রাণেশ ঝুঁকে পড়ল তার পিছন থেকে। এক টুকরো জীর্ণ কাগজ, কিন্তু কত মূল্যবান। বার বার পড়েও আশ মিটছে না।

পিনাকী তাঁবুর বাইরে গিয়ে চন্দ্র সিং ও কুলিদের ডাকাডাকি আরম্ভ করেছে। সংযমের বাঁধ ভেঙে গেছে সকলের। জীবনের শ্রেষ্ঠ লগ্ন যে সমাগত। আমাদের মন মুক্ত বিহঙ্গের মতো উড়ে বেড়াতে চাইছে। নীল দুর্গম জয় হয়েছে। আমাদের জয় হয়েছে।

কিন্তু চিঠি তো শুধু আনন্দের সংবাদ বহন করে আনে নি। বিষাদের খবরও এনেছে যে। নিতাই আজীবা ও আং দাওয়ার ফ্রস্ট-বাইট হয়েছে। কেন হল? কোথায় বসে হল? কি করে হল? নিতাইকে আমরা চিঠি লিখে তেজপুর থেকে আনিয়েছি। ওর বাবা মার কাছে আমরা কি কৈফিয়ৎ দেব? যে আজীবা সারাটা জীবন পাহাড়ে কাটাল, বরফ তাকেও দংশন করল? অভিজ্ঞ আং দাওয়ার কত আশা, সে আমেরিকান এভারেস্ট অভিযানে যাবে, তারও এই বিপদ হল? ওরা কেমন আছে? নিজেরা হেঁটে আসতে পারবে কি? যদি না পারে তাহলে...? নানা প্রশ্নে আমাদের মন আলোড়িত হচ্ছে।

ধন বাহাদুর হয়তো এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। কিন্তু কোথায়? কোন্ ফাঁকে সে সরে পড়েছে। নিশ্চয়ই শের সিংয়ের কাছে গেছে। ওকে ডাকা যাক।

চন্দ্র সিং ও শের সিং এদিকেই আসছে। এক সঙ্গে আসছে। অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। শের সিং লাটু দেবীর সেবক, চন্দ্র সিং শিবের পূজারী। সে একখানা অতিকায় শিলাকে শিব বলে ঘোষণা করে নিয়মিত তার পুজোপাঠ করে যাচ্ছে। সে আমাদের পাচক। অতএব তার শিব অভুক্ত থাকেন নি। শের সিংও দমবার পাত্র নয়। সেও পাথর আর ভূজের ডাল দিয়ে একটি মন্দির তৈরি করে লাটু দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সে শৈলেশদাকে লাটুদেবীর পুজো দিতে রাজী করাতে পারে নি, তবে পিনাকীর কাছ থেকে মাঝে মাঝে এক আধ ছটাক চিনি ও মধু আদায় করেছে। চন্দ্র সিং ক্রুদ্ধ

হয়েছে। তার মতে—লাটু দেবীই আমাদের সব চিনি খেয়ে ফেলেছে। ফলে দুজনের বাক্যালাপ বন্ধ। আজ তারাই একসঙ্গে আসছে পরম বন্ধুর মতো সহাস্য বদনে। সামনে এসেই স্যালুট ঠোকে শের সিং। বলে, "কাল বোলা না? লাটু দেবীকী কৃপায়ে আজ হোগা?..."

"কাল শাম্‌কো ম্যায়নে কহা থা, শিউজীকী কৃপাসে ফতে জরুর হো গিয়া হোগা।"

শের সিংয়ের মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। সে কটমট করে চন্দ্র সিংয়ের দিকে তাকায়। পাছে লাটুদেবী ও শিউজীর ভক্তদের মধ্যে এই শুভক্ষণে দাঙ্গা বেধে যায়, তাই ওদের টেনে নিয়ে তাঁবুতে ঢুকি। ওদের দেখে শৈলেশদার নিজের হাতের দিকে নজর পড়ে। তিনি নাচ থামিয়ে দাঁত লাগালেন। এতক্ষণে বোধহয় খেয়াল হল যে তাঁর বয়সটা ঠিক নাচানাচির অনুকূলে নয়। ডাক্তারও গান বন্ধ করে নীরব হল। পিনাকী শের সিংকে জিজ্ঞেস করে, "তোমাকে ধন বাহাদুর সব বলেছে? কে কে উপরে উঠেছে? কার কি রকম ফ্রস্টবাইট হয়েছে?"

"ধন তো সে সব কিছু বলতে পারে না সাব্। সে ছিল দু নম্বরে। আজ সকালে লীডার সাব্ তিন নম্বর থেকে নেমে এসে বলেন—জয় হয়েছে। ঐ চিঠিখানা তিনি তাকে দেন। সে চিঠি নিয়ে সোজা ছুটে এসেছে এখানে। পথে কোথাও বসে নি। বহু তকলিফ করেছে। এখন আর উঠতে পারছে না। ওকে কিছু ইনাম দেয়া উচিত।"

"নিশ্চয়ই। দো রোজকা পথ এক রোজমে নামকে আয়া। লেও এই দশ রুপেয়া। উসকো দে দো।" শৈলেশদা আজ দাতা-কর্ণ।

অমূল্য কুলি পাঠাতে লিখেছে। না পাঠালে ওরা শিবির গুটিয়ে চলে আসতে পারবে না। ফলে কয়েকজনকে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। যে কজন কুলি ওদের সঙ্গে আছে, আহতদের নিয়ে তাদের কালই চলে আসতে হবে এখানে। এদিকে জোশীমঠ থেকে কুলিরা এখনও ফিরে আসছে না। বিজয় সংবাদ যে এত সমস্যার সৃষ্টি করবে, তা কখনও ভাবি নি।

তবে আজ আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। বেশিক্ষণ দুশ্চিন্তার মধ্যে কাটাতে হল না। ঠিক সন্ধের সময় কুলিরা ফিরে এল। দেবীদাস ওদের সঙ্গে কিছু র‍্যাশন ও তিন বান্ডিল মোমবাতি পাঠিয়েছে। দূরদর্শী দেবীদাস।

প্রাণেশ প্যাকিং বাক্স ও কার্ডবোর্ড দিয়ে ছোট্ট একটি মন্দির তৈরি করল। মন্দিরে মা কালীর একখানি ছবি টাঙাল। ডাক্তার পুজোয় বসল। মহাসমারোহে কালীপুজো চলল। মোমবাতি দিয়ে মন্দির ও তাঁবুগুলো সাজানো হল। আশ্চর্য! এখন তুষারপাতও নেই, হাওয়াও নেই। মোমগুলো বেশ জ্বলছে। তাহলেও মোমের মিটমিটে আলোয় দেয়ালী তেমন জমছে না। তাই বরফ ঝেড়ে রুমেক্সের ডাল এনে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। উমাপ্রসাদ নগর আলোয় আলোময় হয়ে উঠল। মূলা সিউচাঁদ কোনদিন এত আলো দেখে নি।

কিন্তু অসম্পূর্ণ এ বিজয় উৎসব। যারা অভিযানকে সার্থক করল, তারাই যে অনুপস্থিত। জানি না কি ভাবে তাদের এখন সময় কাটছে। হয়তো শীতে অস্থির হয়ে পড়েছে। পরিশ্রমে দুর্বল হয়ে গেছে। অন্ধকারে শুয়ে শুয়ে যন্ত্রণায় চিৎকার করছে আর

প্রভাতের প্রহর গুনছে। আমাদের কথা ভাবছে।

মাঝ রাতে উঠতে হবে। সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু কেউই ঘুমোতে পারছি না। যার যা মনে আসছে তাই বলছে। কথার শেষ নেই। সব কথার অর্থ নেই। যার যত কথা ছিল বাকি, তা সবই বুঝি আজই উজাড় করে দেবে।

কথায় কথায় কতক্ষণ কেটে গেছে খেয়াল করি নি। হঠাৎ টাইম পিসটায় অ্যালার্ম বেজে ওঠে। যাক একটা বাজে তা হলে। তাড়াতাড়ি স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসি। চন্দ্র সিংয়ের ঘুম ভাঙাই। উনুন ধরানো হল। রান্না চাপল—রুটি আলু সেদ্ধ ও হালুয়া। ওপরে পাঠানো হবে।

রান্না শেষ হতে চারটে বেজে গেল। বাইরে এখনও বেশ অন্ধকার। তা হলেও পিনাকী প্রাণেশ ও বীরেন কুলিদের নিয়ে খুলিয়াঘাটার পথে রওনা হল। কুলিরা চলে যাবে এক নম্বর শিবিরে। পিনাকীরা খুলিয়াঘাটায় অপেক্ষা করবে বিজয়ী অভিযাত্রীদের নিয়ে আসার জন্য। ডাক্তারও ওদের সঙ্গে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু পিনাকী রাজী হয় নি। সাড়ে ষোল হাজার ফুট উঁচু খুলিয়াঘাটার ওপর বসে চিকিৎসা করার চাইতে আহতদের যত তাড়াতাড়ি এখানে নিয়ে আসতে পারা যায় ততই ভাল। তাছাড়া পথশ্রম ও শীতে ডাক্তার অযথা ক্লান্ত হয়ে পড়লে চিকিৎসার অসুবিধা হবে।

ডাক্তারের সঙ্গে উপেনবাবু ও আমি পড়ে রইলাম উমাপ্রসাদ নগর। কিন্তু সময় যে আর কাটতে চাইছে না। এমন উৎকণ্ঠা, এমন দুশ্চিন্তা, এমন অস্বস্তির মধ্যে আর কখনও দিন কাটে নি।

তাহলেও একসময় সূর্য পালিয়ে গেল রুপিনধরের পেছনে। দিনের আলো মিলিয়ে এল। আর দিন-রাতের সেই সন্ধিক্ষণে, যখন তাঁবুর ভেতর ঘনিয়েছে আঁধার, অথচ বাইরে মানুষ আর পাথরের পার্থক্য বোঝা যায়, তখন হঠাৎ দেখতে পেলাম একটা বিরাট ছায়ামূর্তি নেমে আসছে। মানুষ বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু অত লম্বা কেন? খুব আস্তে আস্তে আসছে। কে? এত লম্বা তো কেউ নেই আমাদের মধ্যে? লম্বা লোকটির পেছনে একজন স্বাভাবিক মানুষ। তার পেছনে আরেকজন। তার পরে আরও। এসেছে, ওরাই এসেছে। আমরা এগিয়ে আসি। লম্বা লোকটি একজন নয়, দুজন। কিন্তু চৈৎ সিংয়ের কাঁধে কে? ভানু না? হ্যাঁ, তাই তো! ভানু কেন কাঁধে উঠেছে। তবে কি ভানুরও ফ্রস্ট-বাইট হয়েছে? অতি কষ্টে সংযত করি নিজেদের। ভানুর একখানি হাত ধরে বলি, "আর ভয় নেই! এবারে ভাল হয়ে যাবে।"

ভানু বোধহয় উত্তেজনায় কোন কথা বলতে পারে না। টলতে টলতে চৈৎ সিং এগিয়ে চলে। আমি হাতখানি ছাড়িয়ে নিই। ভানুর পেছনে পিনাকী বীরেন ও আং দাওয়া। আং দাওয়া তাহলে ভাল আছে? তাদের পেছনে পান সিংয়ের কাঁধে আং টেম্বা। সঙ্গে প্রাণেশ ছান্দু ও ছুতার। আং টেম্বার পিঠে হাত বুলিয়ে ওদের এগিয়ে যেতে বলি।

আবার একটি দীর্ঘমূর্তি। বোধহয় নিতাই কিংবা আজীবা। নাঃ এ তো টোপগে। অমর সিংয়ের কাঁধে টোপগে, সঙ্গে আজীবা। আজীবা ভাল আছে! চিঠি পড়ে আমরা যা ভেবেছিলাম, তার সঙ্গে তো কিছুই মিলছে না। কিন্তু নিতাই? নিতাই কোথায়? সে কেমন আছে?

টোপগের হাত ধরে তাকেও ভরসা দিই। টোপগে কেঁদে ফেলে। কিন্তু সে কান্না

ক্ষণিকের। একটু বাদেই কান্না থামিয়ে বলে, "আমার পা জ্বলে গেছে। কিন্তু নীলগিরি জয় হয়েছে।"

সবার শেষে এল অমূল্য। সফল নীলগিরি অভিযানের সার্থক নেতা অমূল্য সেন। কিন্তু আজ তার চোখেও জল। আইস্ এক্সে বাঁধা বিজয় পতাকাটি আমার হাতে দিয়েই সে আমাকে জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদতে থাকে। উপেনবাবু তাকে শান্ত করার চেষ্টা করে। তাতে সে আরও ভেঙে পড়ে। অবুঝ কণ্ঠে বলে, "আমি কি কৈফিয়ৎ দেব? কি বলব ভানুর মাকে? কি জবাব দেব টোপগের স্ত্রী ও ছেলেমেয়ের কাছে?"

সত্যই তো, আমরা কি কৈফিয়ৎ দেব?

ডাক্তার প্রস্তুতই ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা আরম্ভ করে। আং টেম্বার ক্ষত তেমন মারাত্মক নয়। একপায়ের দুটি আঙুল শুধু জ্বলে গেছে। ভানু ও টোপগের দু পায়েই কামড় লেগেছে। তবে টোপগের অবস্থাই সবচেয়ে খারাপ। কিন্তু ডাক্তার অবিচলিত। সে তার কর্তব্য করে চলেছে। সবাইকে শুইয়ে দিয়েছে। কাউকে বেশি কথা বলতে দিচ্ছে না। প্রত্যেকের পা খুলে কিছুক্ষণ ওষুধ মেশানো গরম জলে ডুবিয়ে রাখল। তারপর নতুন করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল।

তুষারের কামড়ে তিনজন আহত হলেও ওরা সকলেই অল্প বিস্তর কাহিল হয়ে পড়েছে। বরফে প্রতিফলিত সূর্যালোকে সবার মুখ ঝলসে গেছে। অথচ ঠোঁটগুলো সাদা ধবধবে—ফেটে চৌচির। সব মিলিয়ে একটা বীভৎস চেহারা। ডাক্তার ওদের প্রত্যেককেই ওষুধ খাওয়াল।

একটু বাদে চন্দ্র সিং খাবার নিয়ে এল। ওরা উঠে বসল। তারপর গোগ্রাসে গিলতে লাগল—গরম গরম পরোটা, হালুয়া ও চা। বহুদিন ওরা এমন সুস্বাদু খাবার পায় নি। আমরা আর অবাধ্য চোখের জলকে ঠেকিয়ে রাখতে পারি না। অথচ যাদের কথা ভেবে আমাদের চোখ জলে ভরে উঠেছে, তাদের কিন্তু কোন কষ্ট নেই। তাদের আজ পরম আনন্দের দিন।

কথাটা প্রথম মনে হয় ডাক্তারের, "নিতাই কি তোমাদের সঙ্গে আসে নি? সে কেমন আছে?"

"ভালই আছে। সে যে খুলিয়াঘাটা পর্যন্ত আমার সঙ্গেই ছিল। ...তাই তো সে কোথায় গেল?" অমূল্য উদ্বিগ্ন।

কোথায় গেল সে তাহলে? বিপদের ওপর বিপদ। শ্রান্ত দেহ—ছিল সবার পেছনে। কোথাও পড়ে গেল না তো? অথবা ভালুক বা ইয়েতি...। আর ভাবতে পারি না। ডাক্তার ও শৈলেশদাকে ভানুদের কাছে রেখে আমরা চললাম চাকুলঠেলার পথে। অদৃষ্টে কি আছে কে জানে?

টর্চ ও আইস এক্স হাতে, চারিদিকে নজর রেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। বেশিদূর নজরে আসছে না। অমাবস্যার জমাট-বাঁধা আঁধার আমাদের ঘিরে ফেলেছে। তাই আমরা মাঝে মাঝে চিৎকার করছি। যদি সে কাছাকাছি কোথাও থাকে, সাড়া দেবে। যদি তার পথ ভুল হয়ে থাকে? কিন্তু কেন ভুল হবে? এ পথ তো তার অপরিচিত নয়।

হঠাৎ বীরেন বলে ওঠে, "পিনাকীদা একটু নদীর দিকে আলোটা ধরুন তো।"

বীরেন ঠিকই দেখেছে। একজন মানুষ। নন্দাবতীর তীরে একখানি পাথরের ওপর

শুয়ে আছে। হ্যাঁ, নিতাই। কিন্তু কি হয়েছে ওর? এ সময়ে এখানে এভাবে পড়ে আছে কেন? বেঁচে আছে তো? হ্যাঁ, নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

"নিতাই, নিতাই..." সমস্বরে ডাকতে থাকি। পিনাকী তাকে নাড়া দেয়।

"অ্যাঁ।"

সাড়া দিয়েছে। আমরা আবার ডাকি, "নিতাই।"

"কে?" সে উঠে বসে। দু হাতে চোখ রগড়ে নিয়ে বলে, "এ আমি কোথায়? ও, মনে পড়েছে। বহুদিন জল দেখি নি। এখানে এসে তাই বড় জল খেতে ইচ্ছে হল। জল খেয়ে ভাবলাম একটু জিরিয়ে নেই। তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি।"

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকে গেছে। শেরপা ও কুলিরা চলে গেছে তাদের তাঁবুতে। তবে টোপগে যায় নি ওদের সঙ্গে। তার আঘাত গুরুতর বলে ডাক্তার তাকে আমাদের তাঁবুতেই রেখে দিয়েছে। সে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু ঘুমুই নি আমরা। ঘুমোয় নি ভানু ও নিতাই। ভানু বলছে ওরা কেমন করে স্বপ্নশিখর জয় করেছে। বলছে—

ওরা সেদিন প্রায় আধ ঘণ্টা শিখরে ছিল। তারপর নেমে এল তিন নম্বর শিবিরে। খুব তাড়াতাড়ি নেমে আসতে হয়েছে। ভানু টোপগে ও আং টেম্বার পা ভারী হয়ে উঠেছিল। ছুতার ও পান্ সিংকে নিয়ে অমূল্য তিন নম্বর শিবিরে ওদের প্রতীক্ষায় ছিল। সে দূরবীন দিয়ে দেখেছে নীলগিরি বিজয়। দেখেছে কেমন করে ওরা উঠেছে, পতাকা পুঁতেছে, তারপর ওদের নেমে আসার একটু পরেই শিখর কালো মেঘে ঢেকে গেছে। অসীম লজ্জায় নীলগিরি তার শুভ্রসুন্দর মুখে ঘোমটা টেনে নিয়েছে। আর এক ঘণ্টা দেরি হলে স্বপ্নশিখর হয়তো স্বপ্নই থেকে যেত।

শিবিরের সামনে এসে সর্দার আজীবা অমূল্যকে পতাকা দিয়ে অভিবাদন জানায়। আত্মহারা নেতা আলিঙ্গন করে সবাইকে। কিন্তু মিলনের লগ্নকে সংক্ষিপ্ত করতে হয়। ভানু টোপগে ও আং টেম্বার পা ফুলে গেছে—ফ্রস্ট-বাইট হয়েছে। অমূল্য সারা রাত জেগে রইল ওদের শিয়রে। যথাসাধ্য ওদের যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা করল। পরদিন সকালে তুষারপাতের মধ্যেই ওদের নিয়ে আসা হল দু নম্বর শিবিরে। সেখানে নিরাপদ ও চঞ্চলকে শিবির গোটাবার ভার দিয়ে ওরা চলে এল এক নম্বরে। কাল রাত সেখানেই কেটেছে ওদের। আজ খুব সকালে রওনা হয়েছে এখানে। অসাধ্য সাধন করেছে। দু দিনের পথ একদিনে এসেছে।

॥ ৩১ ॥

পরদিন সকালে ডাক্তার ওদের পরীক্ষা করে যেন একটু গম্ভীর হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করতেই বলে, "আর ওদের এখানে ফেলে রাখা ঠিক হবে না। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় হাসপাতালে ভর্তি করা উচিত। আমি আজই ওদের নিয়ে জোশীমঠ রওনা হতে চাই।

ডাক্তার যা চায়, তা করতেই হবে। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা করে ফেলা হল। ভাগ্যিস তিনটি কাণ্ডী সঙ্গে এনেছিলাম। ঠিক হল—পালা করে টোপগেকে নিয়ে যাবে বাবুরাম ও পান সিং, টেম্বাকে অমর ও ধন বাহাদুর আর ভানুকে? চৈৎ সিং ছাড়া যে আর কেউ নেই এখানে। কাল ভানুকে বয়ে আনার সময় সে স্নো-ব্লাইন্ড হয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার

তাকে ওষুধ দিয়েছে। কিন্তু এখনও সে ভাল করে দেখতে পারছে না। এ অবস্থায়...

ডাকা হল চৈৎ সিংকে। সামনে এসে সেলাম করে সে। ছোটখাটো হাসি খুশি ছেলেটি। মোটেই মোটাসোটা নয় বরং রোগাই বলা চলে। আমরা আদর করে চৈতা বলে ডাকি। গতকালের ধকল এখনও যেন কাটিয়ে উঠতে পারে নি। কাল সে অবিশ্বাস্য কাজ করেছে। ভানুর ওজন ওর নিজের ওজনের চেয়ে বেশি। সেই ভানুকে কাঁধে নিয়ে এই দুর্গম পথ পেরিয়ে সে কেমন করে এখানে এল, তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।

আমাদের প্রস্তাব শুনে চৈতা সহাস্যে বলে, "তবিয়ৎ আমার ঠিক আছে সাব্। নিয়ে যাব ডিপটি সাব্‌কে। চোখটার জন্যই যা একটু ভাবনা।"

"চোখের জন্যে ভেবো না। অসুবিধে হলেই বোলো, আমি ওষুধ লাগিয়ে দেব।" ডাক্তার আশ্বাস দেয়।

"যো হুকুম সাব্।"

টোপগে ও টেম্বাকে নিয়ে ওরা রওনা হয়ে গেছে। শের সিং গেছে সঙ্গে। বেলা ঠিক নটার সময় রওনা হল চৈৎ সিং। ডাক্তার বীরেন ও প্রাণেশ যাচ্ছে সঙ্গে। আমরা নন্দনকাননের প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম ওদের। দিন সাতেক বাদেই জোশীমঠে আবার দেখা হবে। তাহলেও এ বিচ্ছেদ বড় বেশি ব্যথা দিচ্ছে। কারও মুখে কথা নেই। কোনদিন ভানুর চোখে জল দেখি নি। কাল সারারাত সে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করেছে, কিন্তু কাঁদে নি। সেই ভানুর দু চোখেও নেমেছে আজ অশ্রুধারা।

চৈৎ সিং রওনা হল। চলল এগিয়ে—পাথর ডিঙিয়ে, নন্দাবতীর তীর দিয়ে। ভানু মাঝে মাঝে পেছন ফিরে হাত নাড়ছে। আমরাও হাত নেড়ে উত্তর দিচ্ছি। তারপর বাঁকের মুখে ওরা অদৃশ্য হয়ে গেল।

আজও রোদ ওঠে নি। তবে এতক্ষণ আবহাওয়া মোটামুটি ভাল ছিল। নন্দনকানন ছাড়িয়েই শুরু হল তুষারপাত। উৎরাই পথ। কয়েক হাত দূরেও কিছু দেখা যাচ্ছে না। তার ওপর চৈতার চোখ দুটি আবার লাল হয়ে উঠেছে। সে ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছে না। আন্দাজে আন্দাজে চলেছে। তাই পা দুটো কাঁপছে। ভানুর ভয় করছে। কেবলই মনে হচ্ছে, এই বুঝি চৈতার পা ফস্‌কে গেল, আর দুজনে একসঙ্গে গড়িয়ে পড়ল নন্দাবতীতে।

গুহার মতো একটা জায়গা দেখতে পেয়ে ডাক্তার চৈতাকে থামতে বলল। ওরা সেখানে আশ্রয় নিলে ডাক্তার চৈতার চোখে ওষুধ দিল। তারপর তুষারপাত একটু কমলে আবার চলা শুরু করল।

দেড়টা বাজে। ওরা ভেবেছিল এতক্ষণে ঘাংরিয়া পৌঁছে যাবে। সেখানে খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করে সন্ধ্যার আগেই গোবিন্দঘাট যেতে পারবে। কিন্তু তুষারপাত আর চৈতার চোখের জন্য দেরি হয়ে যাচ্ছে।

ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে বেলা তিনটের সময় ওরা ঘাংরিয়া এল। জনহীন ঘাংরিয়া। ডাকবাংলো ও গুরুদ্বারকে প্রেতপুরীর মতো মনে হচ্ছে। চৈতা পেছন দিকে ঝুঁকে ডাক-বাংলোর সিঁড়ির ওপর আস্তে আস্তে বসে পড়ল। প্রাণেশ ও বীরেনের কাঁধে ভর দিয়ে, গোড়ালি দুটো মাটিতে ঠেকিয়ে ভানু একটু দাঁড়াল। এই ফাঁকে চৈতা সরে গেল। ওরা ধরাধরি করে ভানুকে শুইয়ে দিল। চৈতাও শুয়ে পড়ল। বাহক ও সওয়ার দুজনেই সমান

কাহিল। কাণ্ডীতে বসে থেকে থেকে ভানুর কোমরে ব্যথা হয়ে গেছে। ডাক্তার দুজনের চিকিৎসায় লেগে গেল। বীরেন বলে, "প্রাণেশ, খাবারগুলো বের করে ফেলো।"

প্রাণেশ বীরেনের রুকস্যাকে হাত ঢোকাতে যায়। বীরেন বাধা দেয়, "না, না। আমার রুকস্যাকে নেই। তোমার কাছেই তো দেবার কথা ছিল।"

"আমাকে?" প্রাণেশ বিস্মিত, "আমাকে তো কেউ খাবার দেয় নি। বিমলদা, আপনাকে দিয়েছে কি?"

"না তো।"

খাবার তৈরি হল আর সেই খাবার সঙ্গে দিল না। তাও কি কখনও হয়। প্রাণেশ প্রতিটি রুকস্যাক পরীক্ষা করে। তারপর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে। এতগুলো লোকের এত বড় একটা ভুল হয়ে গেল। এই হয়। বিপদে এমনি ভাবেই মতিভ্রম হয়, কিন্তু খিদেয় যে পেট জ্বলে যাচ্ছে।

অনেক খোঁজাখুঁজি করে প্রাণেশের রুকস্যাকে এক শিশি জেলি পাওয়া গেল। তাই প্রসাদের মতো ভাগ করা হল। জেলি ও জল খেয়ে ওরা আবার রওনা দিল।

তুষারপাত থেমে গেছে। দিনের আলো মিলিয়ে এসেছে। সন্ধের একটু আগে ওরা ভুইন্দার পৌঁছল। ভুইন্দার এখন প্রাণহীন পাহাড়ী গ্রাম। কুকুরগুলো পর্যন্ত নেমে গেছে। হয়তো বা ভালুকরাও। নিষ্প্রাণ বাড়িগুলো শুধু নিঃশব্দে ওদের দেখছে। যাবার সময় গমগম করছিল এই গ্রাম। দেবীদাস নাচের স্কুল ও ডাক্তার দাতব্য চিকিৎসালয় খুলেছিল। এখন শীতের ভয়ে ছাত্র-ছাত্রী ও রুগীরা পালিয়ে গেছে পুনগাঁয়ে।

ভানুকে নামানো হল। চৈতার চোখে আবার ওষুধ দেওয়া হল। একটু সুস্থ হলে, সে পেটের দায়ে সারা গ্রাম চষে ফেলে। দরজা খুলে খুলে দেখে, যদি কেউ কোন খাবার ফেলে গিয়ে থাকে। কিন্তু তার খাদ্য-অভিযান বিফল হল। কিছুই পাওয়া গেল না। নিরুপায় অভিযাত্রীরা খালি পেটে খানিকটা জল খেয়ে নিয়ে আবার উৎরাই ভাঙা শুরু করে।

আঁধার বেশ ঘন হয়ে আসছে। চৈতা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তবু সে আস্তে আস্তে পথ চলেছে। না চলে উপায় নেই। ওরা এখন সেই ভালুকের জঙ্গল বাগডোরে। হঠাৎ চৈতা চিৎকার করে ওঠে, "সাব্। আর পারছি না। পড়ে যাচ্ছি। আমাকে ধরুন।"

তাড়াতাড়ি ভানুকে নামানো হল। চৈতা পথের ওপরই শুয়ে পড়ে। অভুক্ত ও অসুস্থ দেহে আর কতক্ষণ পারে—মানুষ তো। ডাক্তার তাকে ওষুধ খাইয়ে দিল। কিন্তু সে ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। ওষুধ আর কত করবে? কিন্তু এখানে এভাবে সারারাত বসে থাকলে যে প্রাণ যাবে। ভালুক যদিও বা দয়া করে, শীত ছেড়ে দেবে না। ওরা সবাই থরথর করে কাঁপছে। বীরেন ভানুকে বলে, "প্রাণেশ ও চৈতার সঙ্গে একটু অপেক্ষা করুন এখানে। আমি ও ডাক্তার এগিয়ে দেখি, যদি কোনও আস্তানা পাওয়া যায়।"

আহত ভানু ও অজ্ঞান চৈতাকে নিয়ে সেই অন্ধকারময় শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্যে প্রাণেশ একা বসে রইল। বাতাসের গর্জন ও ঝিঁঝি পোকার বিরামহীন গুঞ্জনকে ছাপিয়ে সশব্দে প্রবাহিত হচ্ছে নন্দাবতী। যে শব্দকে এতদিন জীবনের জয়গান বলে মনে হয়েছে। তাকে এখন মনে হচ্ছে মরণের আহ্বান। কাছেই একটা কাঁকর মৃগ ডেকে ওঠে। ...ভানু ও প্রাণেশ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বসে থাকে। টর্চ জ্বালাতে সাহস করে না, কথা বলতে ভরসা

পায় না, পাছে ভালুকের নেক নজরে পড়ে যায়।

বীরেন ও ডাক্তার আশ্রয়ের অণ্বেষণে বর্ষণ-সিক্ত পিচ্ছিল পথে ছুটে চলে। বীরেনের হাতে আইস এক্স, ডাক্তারের হাতে ছাতা। আমরা বলি রাজছত্র। অমূল্য বলে চেম্বারলেনের ছাতা। ছত্রহীন ডাক্তার কল্পনাতীত। ঐ ছাতা তার ঘোমটার কাজ করেছে, তুষারপাতে মাথা বাঁচিয়েছে, আইস এক্সের অভাব পূরণ করেছে। কিন্তু আজ বোধহয় সেই ছাতা তার কোন কাজেই এল না। পিচ্ছিল উৎরাই। ডাক্তার ছাতার সাহায্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারছে না, প্রায়ই বেসামাল হয়ে পড়ছে। অথচ বীরেন ক্রমেই চলার বেগ বাড়িয়ে দিচ্ছে। বাধ্য হয়ে ডাক্তার বলে ওঠে, "একটু আস্তে চলো।"

"সময় নেই ডাক্তার, ভানুদের ভালুকের হাতে রেখে..."

বীরেন শেষ করার আগেই ডাক্তার তাকে জড়িয়ে ধরে। কম্পিত কণ্ঠে কোনমতে বলে, "বী...রে...ন। ওটা কি?"

অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছে দু জোড়া চোখ। যেন এদিকেই আসছে। বোধহয় লাফিয়ে পড়ল ঘাড়ে। ডাক্তার থরথর করে কাঁপছে, আর কথা বলছে না। বীরেনেরও বুক ধড়ফড় করছে। তবু সে ডাক্তারকে সজোরে একটা ঝাঁকুনি দেয়। বলে, "যাই হোক আমরা তো কাপুরুষ নই। এসো রুখে দাঁড়াই।"

"কিন্তু আমরা যে নিরস্ত্র!" ডাক্তার কম্পিত কণ্ঠে বলে।

"মোটেই নিরস্ত্র নই। এই নাও আমার আইস এক্স।"

"তুমি?"

"আমাকে টর্চটা দাও।" ডাক্তার শিথিল হাতে আইস এক্সটা ধরে। বীরেন আবার বলে, "আমি টর্চ জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে গলা ছেড়ে চেঁচাতে থাকবে।"

বীরেন দু হাতে দুটি টর্চ নিয়ে একসঙ্গে বোতাম টেপে।

আর ডাক্তার, "কোই হায়? হামলোগ মর গিয়া। ভালু, মর গিয়া..."

হাতে হাতে ফল ফলে। লোমশ জন্তু দুটি থমকে দাঁড়ায়। আলো তাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে, তারা সেখানে দাঁড়িয়েই গর্জে ওঠে, "ঘেউ ঘেউ ঘেউ।"

"বীরেন—কুকুর, ভালুক নয়। কুকুর।"

"ঠিক আছে। তুমি থেমো না। চালিয়ে যাও।"

ডাক্তারের প্রাণে বল এসেছে। বুকে বল পেয়েছে। গলার জোর বেড়েছে। তার গানের গলা। রীতিমত রেওয়াজী কণ্ঠ। অমূল্য বলে—দগ্ধ কোকিলাহারী। ভুটিয়া কুকুর তার সঙ্গে পারবে কেন?

ডাক্তার ও কুকুরের এই বাদ প্রতিবাদের প্রতিযোগিতা ক্রমে চরমে ওঠে। এবং ডাক্তারের জয় যখন সুনিশ্চিত, তখন তৃতীয় পক্ষের আকস্মিক আবির্ভাবে অকস্মাৎ প্রতিযোগিতা থেমে গেল। টর্চের আলোয় দেখা গেল দুজন লোক এদিকে ছুটে আসছে। থেমে যাওয়া কাঁপুনিটা আবার ডাক্তারের দেহে দেখা দেয়। 'পাদমেকম্ ন গচ্ছামি' পণ করে যারা এতক্ষণ ডাক্তারের পথ আগলে দাঁড়িয়ে ছিল, তারাও আগন্তুকদের পথ ছেড়ে দিল।

আরে! এ যে বাবুরাম আর পান সিং। ডাক্তার হাতে স্বর্গ পেল। আইস এক্স, এমন কি তার চিরসাথী ছাতাটি পর্যন্ত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বাবুরামকে জড়িয়ে ধরল। পান সিং

বলে, "সামনেই একটা বকরীওয়ালার ঝোপড়ি আছে। টোপগেকে রেখে আমরা সেখানেই আপনাদের অপেক্ষায় ছিলাম। আর সব কোথায়।"

"ওরা পেছনে রয়েছে।"

"সে কী, এই জঙ্গলের মধ্যে বসে আছে?"

"হ্যাঁ। ওদের নিয়ে আসতে হবে।"

"তাহলে আর দেরি নয়। চলুন আমরা ঝোপড়িতে যাই। তারপর ওদের নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতে হবে।"

জঙ্গলের শেষে ছোট্ট একটি কুঁড়ে। পেছনে একফালি ক্ষেত। কুঁড়েটি মানুষের জন্য নয়। ভেতরে গোটা বিশেক ভেড়া। বাইরে পথের ওপর টোপগেকে শুইয়ে রাখা হয়েছে। পাশেই লাঠি হাতে বকরীওয়ালা ও তার দুটি ছোট ছোট ছেলে ভেড়া পাহারা দিচ্ছে। একটু বাদেই সেই কুকুর দুটি এসে বকরীওয়ালার গা ঘেঁষে বসল। এখনও ডাক্তারের রাগ পড়ে নি, 'এ দোনো তোমারা কুত্তা হায়?"

"জী হাঁ। বকরীওয়ালা জবাব দেয়।

"ছোড়কে কাহে রাখ্‌তা হায়?"

"ভালুকে লিয়ে।"

"আর ভালু নহী মিলনে সে তো আদমীকো পাকড়তা হায়।"

"জী হাঁ, কভী কভী।"

পাছে ডাক্তার কিছু বেফাঁস বলে বকরীওয়ালাকে বিগড়ে দেয়, তাই বীরেন তাকে বাধা দিয়ে কাজের কথা পাড়ে। অনেক অনুরোধের পর বিশ টাকার বিনিময়ে সেই বকরী-নিবাসের একাংশে রাত্রিবাসের অনুমতি মেলে। টোপগেকে ভেতরে নিয়ে আসা হল। বকরীওয়ালা কিছু কাঠ দেয়। পান সিং আগুন জ্বালে। বাবুরাম ও বকরীওয়ালা ওদের আনতে চলে যায়। পান সিংয়ের কাছে কিছু আলু ছিল। বকরীওয়ালার ছেলেদের কাছ থেকে বাসন ও জল নিয়ে, পান সিং তাই সেদ্ধ চাপিয়ে দেয়। ডাক্তার টোপগের চিকিৎসায় মনোনিবেশ করে। বীরেন বকরী-নিবাসের খানিকটা অংশ ভেড়ামুক্ত করে পরিষ্কার করে এয়ার ম্যাট্রেস বিছিয়ে শয্যা রচনা করল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে ওরা ফিরে আসে। বাবুরাম ভানুকে ও বকরীওয়ালা চৈতাকে বয়ে এনেছে। আগুনের ধারে বসিয়ে দেওয়া হল ওদের।

আলুর পরিমাণ খুবই কম। তারও বেশির ভাগ খেয়ে ফেলল পান সিং ও বাবুরাম। বাবুরাম অ্যাডভান্স বেসে পাচকের কাজ করেছে। সে সাব্‌দের না খাইয়ে কোনদিন নিজে খায় নি। কিন্তু আজ খিদের জ্বালায় বোধহয় তার সাব্‌দের কথা খেয়ালই নেই। তবে খাওয়ার পরই খেয়াল হয়। লজ্জা পেয়ে ছুটে গেল বাইরে। বকরীওয়ালাকে বলে তার ক্ষেত থেকে আলু তুলে আনল, কিছু রামদানাও জোগাড় করল। রামদানা দেখে প্রাণেশ বলে, "বিমলদা, যাবার সময় অসুখ হবে বলে রামদানার লাড্ডু খেতে দেন নি। এখন বোধহয় আর খেতে বাধা নেই। কি বলেন? আমরা তো জোশীমঠের মিলিটারি হাসপাতালেই যাচ্ছি।"

"না না। তুমি কিচ্ছু ভেবো না প্রাণেশ। আমি এমন ওষুধ দিয়ে দেব যে খাওয়া মাত্র হজম হয়ে যাবে।"

"সে ওষুধটা কি যাবার সময় তোমার কাছে ছিল না ডাক্তার?" বীরেন হাসতে হাসতে বলে।

ডাক্তারও দমবার পাত্র নয়। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, "Good digestion waits on appetite–শেক্সপিয়ারের বাণী, বুঝলে হে! খিদের নাম বাবাজী, রোগ পালায় যার ভয়ে।"

রামদানার রুটি যে এত সুস্বাদু, শরীরকে এমন গরম করে, তা জানলে কি ডাক্তার সেদিন অমন গরম হত? না হয় আজকের মতই একটি করে বড়ি খাইয়ে দিত সবাইকে। সারাদিন অভুক্ত থেকে নেহাত দৈবের কৃপায় খাওয়া বড়ই ভাল হল। ওরা নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ল। নিশ্চিন্ত হতে পারল না কেবল ডাক্তার। কারণ তার হিসেবে একটু ভুল হয়ে গেছে। তার হিসেব মত এখন ওদের গোবিন্দঘাটে থাকার কথা। তাই সে মেহনত বাঁচাতে স্লিপিং ব্যাগ ও এয়ার ম্যাট্রেস আনে নি। ভেবেছিল—জশবীর সিংয়ের একখানি কার্পেট ও কয়েকখানি কম্বল দখল করে 'সঘন ঘুমে মগন' হবে। হায়! কোথায় সেই গোবিন্দঘাটের যাত্রীনিবাস আর এই বাগডোরের বকরীনিবাস।

অগত্যা বীরেন ও প্রাণেশের মাঝে শুয়ে পড়ল ডাক্তার। ওরা দুজনে দুদিন থেকে স্লিপিং ব্যাগ দিয়ে চাপা দিল তাকে। কিন্তু ঘুম আসে না কারও চোখে। ভেড়ার পাল এই অনধিকার প্রবেশকারীদের বিশেষ পছন্দ করল না বোধ হয়। সমস্বরে সারারাত ধরে প্রতিবাদ জানিয়ে চলল। সেই স্বরলহরীর সঙ্গে তাদের গায়ের গন্ধ মিলিত হয়ে এমন একটি উৎকট পরিবেশের সৃষ্টি করল যে নিদ্রাদেবী আপন প্রাণের মায়ায় পালিয়ে গেলেন সেখান থেকে।

সব মিলিয়ে বকরীওয়ালা চল্লিশটাকায় রফা করে। ভেড়ার আস্তানায় রাত্রিবাস ও রামদানার রুটির জন্য মাথা পিছু পাঁচ টাকা প্রণামী দিতে হল। কিন্তু এই প্রণামী ওদের মাথা বাঁচিয়েছে। এ আশ্রয়টুকু না পেলে আজ সকালে ওদের ধড়ে প্রাণটুকু টিকে থাকত কিনা সন্দেহ।

মাইল খানেক হেঁটে বেলা আটটার সময় ওরা পুনগাঁয়ে এল। ওদের দেখে গ্রামবাসীরা হৈ চৈ আরম্ভ করে দেয়। একজন চায়ের দোকানদার পরম সমাদরে ওদের ডেকে বসাল। একটু বাদেই ছুটে এল শের সিং। ওরাও তাহলে গোবিন্দঘাট পৌছতে পারে নি। টেম্বাকে নিয়ে এখানেই রাত কাটিয়েছে। স্যালুট ঠুকেই শের সিং আলিঙ্গন করে ভানুকে। আবেগ ভরা স্বরে বলল, "সাব্ আপনারা বেঁচে আছেন! আমরা তো আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। কাল অনেক রাতে লোকজন নিয়ে আপনাদের খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। না পেয়ে ভাবলাম, আর এ জীবনে আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে না। সারারাত লাটু দেবীকে ডেকেছি। তাঁর কৃপায় ভালু আপনাদের কিছুই করতে পারে নি।"

সামনেই কয়েকটা ভেড়া চরছে। টাকাপয়সার টানাটানি। পাছে আবার পুজোর প্রসঙ্গ ওঠে, তাই ভয় পেয়ে বীরেন বলে, "টেম্বাকে নিয়ে এসো। চা খেয়ে তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া যাক।"

খবর পেয়ে স্বামী অরূপকৃষ্ণ ছুটে এলেন। তিনি ভানু ও টোপগেকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিলেন। জোর করে ওদের চা-বিস্কুটের দাম দিয়ে দিলেন। তারপর ওদের সঙ্গেই রওনা হলেন জোশীমঠ।

বেলা ঠিক বারোটার সময় ওরা গোবিন্দঘাট এল। জশবীর সিং ওদের দেখে ভারি খুশি। গুরুদ্বারে আশ্রয় ও ভাণ্ডারা দিলেন। স্বামীজী ভাত ডাল ও সব্জী রান্না করলেন। খেতে বসে ওরা পরিমাণবোধ হারিয়ে ফেলল। কিন্তু খাবারে টান পড়ল না। স্বামীজী হিসেবে ভুল করেন নি।

বিকেল চারটেয় ওরা বিষ্ণুপ্রয়াগ পৌঁছল। তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার বলে স্বামীজী এগিয়ে গেলেন। বিষ্ণুগঙ্গার পুল পেরিয়ে বীরেন ওদের বিশ্রাম করতে বলে নিজে এগিয়ে যায়। কাল উমাপ্রসাদ নগর থেকে যে উৎরাই শুরু হয়েছিল, তা আজ এখানে এসে শেষ হল। যেমন করেই হোক কুলিরা আহতদের পিঠে নিয়ে এই উৎরাই পথ পেরিয়ে এসেছে। এবারে শুরু হবে চড়াই। পিঠে মানুষ নিয়ে এই চড়াই ভাঙা মানুষের অসাধ্য। তাই বীরেন ছুটে চলল জোশীমঠ। যাত্রীদের পথ দিয়ে গেলে সময় বেশি লাগবে। সে পাকদণ্ডী বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। কিন্তু যত সাধ ছিল—সাধ্য ছিল না। কিছুদূর উঠেই দম ফুরিয়ে এল। তার ওপর পিপাসা। এত পিপাসা কোনদিন পায় নি তার।

কিন্তু কোথায় জল? জল পেতে হলে হয় নামতে হবে বিষ্ণুপ্রয়াগে, নয় উঠতে হবে জোশীমঠে। তাই যদি পারব তাহলে আর এখানে বসে পড়ল কেন?

একটু জিরিয়ে নিয়ে বীরেন উঠে দাঁড়ায়। আবার চলতে শুরু করে। ঐ তো একটা ঝরনা। কিন্তু জলটা বড্ড নোংরা। তা হলেও তো জল। জল মাত্রই জীবন। জীবনের আবার বাছবিচার কি?

॥ ৩২ ॥

এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার পাণ্ডেজী অফিসেই ছিলেন। সব কথা শুনে তিনি বীরেনকে তাঁর জীপটি দিয়ে দিলেন। জীপ নিয়ে এসে বীরেন দেখে ওরা সেখানে নেই। তার দেরি দেখে ওরা সেই চড়াই পথ বেয়েই শম্বুক গতিতে ওপরে উঠছে। বীরেনের হাঁক ডাকে তারা পেছনে ফিরে তাকায়। তারপর মহানন্দে নেমে আসে নিচে। ধরাধরি করে আহতদেব জীপে তোলা হল। চৌত্রিশ দিন বাদে ওরা আজ গাড়িতে চেপেছে। ঠিক একমাস পরে জোশীমঠ ফিরে চলেছে।

মানুষ সৃষ্টি করেছে যন্ত্র। সে যন্ত্র তার স্রষ্টাকে কৃতজ্ঞতার নাগপাশে আবদ্ধ করে রেখেছে। চড়াই বেয়ে জীপ ছুটে চলেছে জোশীমঠ। কৃতজ্ঞ কুলিরা মনে মনে বীরেনকে ধন্যবাদ জানায়।

জীপ এসে থামল মিলিটারি হাসপাতালের সামনে। বীরেন তাড়াতাড়ি ছুটে আসে মেজর উবেরয়ের কোয়ার্টারে। পর্বতারোহণের পোশাক পরিহিত পরিশ্রান্ত অস্নাত অভুক্ত বীরেনকে চিনতে একটু দেরি হয় তার। কিন্তু চিনতে পেরেই চিৎকার করে ওঠেন, "সরকার! হোয়াট্ নিউজ? সাক্সেসফুল?"

"ইয়েস। বাট্..."

"মাই বয়!" তিনি সজোরে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। দাড়ি গোঁফময় বীরেনকে চুম্বনে অধীর করে তোলেন। বলতে থাকেন, "আমি জানতাম সরকার, আমি জানতাম তোমার পারবে। আমি জানতাম, নীলগিরিকে এবার পরাজয় স্বীকার করতেই হবে।"

তাঁর উচ্ছ্বাস একটু স্তিমিত হলে বীরেন তাঁকে ভানুদের কথা জানায়। মেজর

তাড়াতাড়ি বীরেনকে ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, "তারা কোথায়?"

"হাসপাতালের সামনে জীপে বসে আছে।"

"আর আমরা এখনও এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি?" চলো শিগ্‌গির চলো।" বীরেনের হাত ধরে তিনি ছুটতে থাকেন।

মেজরকে দেখেই ওদের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তিনি কাছে এসে ভানু টোপগে ও আং টেম্বার পিঠে হাত বুলিয়ে বলতে থাকেন, "ওয়েল-ডান্ মাই বয়েজ, ওয়েল্ ডান্। ডোন্ট ওয়ারি। সব ঠিক হো যায়গা।" পরক্ষণেই চিৎকারে হাসপাতাল কাঁপিয়ে তোলেন। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ক্যাপ্টেন (ডাক্তার) রায় তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে ছুটে আসেন সেখানে। তাঁকে দেখে মেজর আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন, "রয়, আমি বলি নি? এরা পারবে। তবে নীলগিরিও মরণ কামড় দিয়েছে। তিন জনের ফ্রস্ট-বাইট। তুমি তাড়াতাড়ি চিকিৎসার ব্যবস্থা করো।" তারপরেই ক্যাপ্টেন রায়ের সহকর্মীদের ধমক দেন, "এই, তোমরা হাঁ করে কি দেখছ! স্ট্রেচার নিয়ে এসো।"

স্ট্রেচার নিয়ে আসা হল। মেজর নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারক করলেন। পরে ক্যাপ্টেন রায়কে বললেন, "তুমি চিকিৎসা আরম্ভ করো, আমি আসছি।" বলেই তিনি হন্তদন্ত হয়ে কোথায় যেন বেরিয়ে গেলেন।

বিমলের সহযোগিতায় ক্যাপ্টেন রায় ওদের পরীক্ষা শুরু করেন। মেজরও ফিরে এলেন। সঙ্গে খাবারসহ দুজন আর্দালী। ক্যাপ্টেন তাঁর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন, "তুমি তো শুধু রোগের খবর নিয়েই খুশি থাকবে, পেটের খবর নেবে না। তাই আমি ওদের জন্য খাবার নিয়ে এলাম।" তারপরেই বীরেনকে বলেন, "এসো সরকার। আমরা ওদের খাইয়ে দিই।"

"একটু সবুর করুন। আমি আগে পরীক্ষাটা সেরে নিই।" ক্যাপ্টেন অনুরোধ করেন।

"বেশ তো তুমি তোমার কাজ করে যাও। আমরা আমাদের কাজ করতে থাকি। পরীক্ষা ও খাওয়া দুটোই এক সঙ্গে চলুক। ওদের মুখ দেখে বুঝতে পারছ না—ওরা খিদেয় অস্থির হয়ে পড়েছে?"

বিমল ক্যাপ্টেন রায়ের সঙ্গে হাসপাতালেই থাকল। বীরেন ও প্রাণেশ এল বিড়লা রেস্ট হাউসে। গভীর রাত। নিঝুম রেস্ট হাউস। বহু কষ্টে ওরা দেবীদাসের ঘর খুঁজে পেল। দেবীদাস ঘুমিয়ে পড়েছে। বেশ কয়েকবার দরজায় ধাক্কা দেবার পর তার নাসিকা গর্জন স্তব্ধ হল। সাড়া পাওয়া গেল, "কৌন হায়?"

"বীরেন হায়। দরজা খুলুন।"

"অ্যাঁ। কে?"

"দরজা খুলুন দেবীদা। আমি প্রাণেশ।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খোলে দেবীদাস, "তোমরা এ সময়? কি খবর?"

"কেল্লা ফতে।" বীরেন বলে।

"অ্যাঁ...? সাক্‌সেসফুল...?"

"হ্যাঁ।"

"সাক্‌সেস্‌ফুল। জয় হয়েছে, আমাদের জয় হয়েছে, জয় হয়েছে রে...।" দেবীদাস

সঙ্গীত সহযোগে নৃত্য শুরু করে। নিস্তব্ধ রেস্টহাউস সেই প্রলয় নাচনে চমকে ওঠে। পাচ্ছে রেস্টহাউসবাসী জওয়ানরা দেবীদাসের মস্তিকের সুস্থতা সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু হয়ে বন্দুক হাতে ছুটে আসে, তাই বীরেন তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দেয়।

মিনিট দশেক দ্রুত লয়ে নেচে ও গেয়ে ক্লান্ত হয়ে দেবীদাস হাঁফাতে হাঁফাতে প্রশ্ন করে, "কি করে হল? কবে হল? আরে সব খুলে বল না ছাই।"

সব শুনে গম্ভীর হয়ে যায় দেবীদাস। বলে, "চলো তাহলে এখনই একবার হাসপাতাল থেকে ঘুরে আসি।"

"এত রাতে!" প্রাণেশ বিস্মিত হয়।

"কি আর এমন রাত হয়েছে।" ঘড়ি দেখে দেবীদাস, "মোটে তো এগারোটা। কতক্ষণ লাগবে ঘুরে আসতে?"

"কিন্তু ক্যাপ্টেন রায় ওদের বিরক্ত করতে নিষেধ করেছেন। ঘুমের ওষুধ দিয়েছেন।" বীরেন বলে।

"ও!" দেবীদাস মুষড়ে পড়ে।

"আমরা বড় পরিশ্রান্ত দেবীদা। আর খিদেও পেয়েছে খুব।"

"কেন, তোমরা কিছু খাও নি?"

"না, মেজর তাঁর কোয়ার্টারে নেমন্তন্ন করেছিলেন। কিন্তু এই অসময়ে আমরা আর তাঁকে বিরক্ত করিনি।"

"তা সে কথা আগে বলতে হয়। যাও তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে নাও।"

"আছে নাকি কিছু?" প্রাণেশ আশান্বিত হয়।

"আছে হে আছে। দেবীদা আছে অথচ খাবার নেই, এ কোনদিন হয়েছে?"

দেবীদাস তার রাজকোষ উন্মুক্ত করে দেয়। একে একে বের করে বিস্কুট জেলি আপেল কমলালেবু কলা চিঁড়ে চিনি—যখের ধন। অন্য সময় তার এই গুপ্তভাণ্ডারের দিকে তাকালেও সে ক্ষেপে যেত। কিন্তু আজ? আজ দেবীদাস গৌরী সেন, "যেটা ইচ্ছে, যত ইচ্ছে—খেয়ে নাও। আরও লাগে আরও দেব।"

বীরেন ও প্রাণেশের রুকস্যাক থেকে এয়ার ম্যাট্রেস ও স্লিপিং ব্যাগ বের করে ঠিকঠাক করে ফেলে দেবীদাস। তারপর ওদের খাওয়া হলে বলে, "এবারে শুয়ে পড়ো। কষে ঘুম দাও।"

ওরা দ্বিরুক্তি না করে স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে পড়ে। কিন্তু দেবীদাস থালা ও মগ গুছিয়ে রেখে হাত ধুয়ে আলোর কাছে গিয়ে বসে। বীরেন জিজ্ঞেস করে, "আপনি শোবেন না?"

"শোব বইকি। তবে একটু দেরি হবে। আমার একটা কাজ আছে। আপনারা ঘুমিয়ে পড়ুন।"

"এত রাতে আবার কি কাজ দেবীদা? কাল করবেন এখন।"

"না না প্রাণেশ। তুমি বুঝতে পারছ না। এখনই শেষ করে ফেলতে হবে।"

"কি এমন জরুরি কাজ?" প্রাণেশ চিন্তিত।

দেবীদাস কথা না বাড়িয়ে কতগুলো কাটা কাগজ, আঠার শিশি ও 'Nilgiri (Garhwal) Expedition 1962, ফেস্টুনটা বের করে। বীরেন বলে, "এত রাতে আবার

ওগুলো নিয়ে বসলেন কেন?"

"বাঃ। সাক্‌সেস হয়েছে আর Successful শব্দটা ফেস্টুনে লাগাব না?"

"কিন্তু ওটা তো কাল সকালে করলেও চলত।"

"চলত না প্রাণেশ! চলত না। কাল সকালে হাসপাতালে যাবার আগেই ফেস্টুনটা রেস্ট হাউসের গেটে টাঙিয়ে দিতে হবে।"

দেবীদাসকে তার জরুরি কাজ থেকে নিরস্ত করা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে বীরেন ও প্রাণেশ পাশ ফিরে শোয়। চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করতে থাকে। আর দেবীদাস তার কাঁচা ঘুমের মায়া পরিত্যাগ করে, প্রচণ্ড শীতকে উপেক্ষা করে, সেই নিশুতি রাতে, মোমের মৃদু আলোয়, নিঃশব্দে তার জরুরি কাজ সারতে থাকে। তার 'Successful'-এর এক একটি বর্ণে আঠা লাগিয়ে পরম যত্ন-সহকারে ফেস্টুনে সাঁটতে থাকে। প্রতিবার অপত্য স্নেহে অপলক নয়নে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তার চোখ-মুখ খুশির আলোয় ঝলমল করে ওঠে। উজ্জ্বল সূর্যালোকে নীলগিরি শিখরও বোধ করি এত ঝলমল করে নি কোনদিন।

দেবীদাসের ডাকে বীরেন ও প্রাণেশের ঘুম ভেঙে যায়। তার এক হাতে দুধ আর এক হাতে চা। সে ইতিমধ্যে ফেস্টুন টাঙিয়ে নিজের জন্য দুধ ও ওদের জন্য চা নিয়ে এসেছে।

তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে ওরা পথে বেরিয়ে পড়ে। কিন্তু দেবীদাসের জন্য কি তাড়াতাড়ি চলার জো আছে? লোক দেখলেই সে চিৎকার করে উঠছে, 'কেল্লা ফতে হো গিয়া। হুর্‌ রো হো! হুর্‌ রো হো!' মুখ চেনা কাউকে পেলে তো কথাই নেই। নিজেদের গৌরবের কথা গোড়া থেকে বর্ণনা করছে। বাধ্য হয়ে বিনীত কণ্ঠে প্রাণেশ বলে, "দেবীদা, ওদিকে ওরা আমাদের পথ চেয়ে বসে আছেন।"

"ওঃ হ্যাঁ। ভুলেই গিয়েছিলাম। চলো, তাড়াতাড়ি চলো।" তারপর তার মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতাদের আশ্বাস দেয়, "দুপুরে রেস্ট হাউসে আসুন, ডিটেল্‌স শুনে যাবেন।"

হাসপাতালের গেটে বিমলের সঙ্গে দেখা। সে ওদেরই অপেক্ষায় পায়চারি করছিল। দেখে মনে হচ্ছে এখনও হিমরেখার ওপরে। আজও সে পর্বতারোহণের পোশাক ছাড়ে নি। অদূর ভবিষ্যতে বোধ করি ছাড়ার কোন ইচ্ছেও নেই। কাছে আসতেই বলে ওঠে, "আজই কলকাতা রওনা হতে হবে।"

"কেন?" দেবীদাস চমকে ওঠে।

"টোপগের পায়ের অবস্থা খুব খারাপ। আমি ওকে কলকাতায় নিয়ে যেতে চাই। ভানুও কলকাতায় যেতে চাইছে।"

"ক্যাপ্টেন রায় কি বলছেন?" বীরেন জিজ্ঞেস করে।

"তাকে আমি রাজী করিয়েছি।"

"কিন্তু কেমন করে যাবে? আমাকে যে শৈলেশদা মোটে একশ টাকা দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই তো পঞ্চাশ টাকার বেশি খরচ হয়ে গেছে।" টেলিগ্রাম ও চিঠি তো এখনও পাঠানো হয় নি। বীরেন চিন্তিত।

"এত কম টাকা দিলেন কেন?" দেবীদাস বিরক্ত।

"তাড়াতাড়িতে তখন কি দিয়ে কি হবে কিছুই খেয়াল ছিল না। তাছাড়া শৈলেশদা ও পিনাকীদা তো ক্যাম্প গুটিয়ে দু তিন দিনের মধ্যেই এখানে চলে আসবেন। তখন তো বোঝেন নি যে আমাদের আজই কলকাতা রওনা হতে হবে।"

"কিন্তু এখন কি করবেন? আমার কাছে যা আছে তাতে বড় জোর টেলিগ্রাম ও চিঠিগুলো পাঠানো যেতে পারে। ওঁদের নিয়ে যাওয়া তো চাট্টিখানি কথা নয়। বাস রিজার্ভ করতে হবে। সে তো বহু টাকার ব্যাপার।"

"যোগাড় করতে হবে।" প্রাণেশের কণ্ঠে আত্মপ্রত্যয়।

"কে এখানে তোমাকে টাকা দেবে?"

"কেন? মেজরের কাছ থেকে ধার নেব। শৈলেশদা এলে শোধ করে দেবেন।"

শেষ পর্যন্ত কিন্তু ধার করতে হল না। ভানু বীরেনকে বলল, "আমার কাছে কিছু টাকা ও দুখানা রেলের টিকিট আছে। আপনারও পাশ আছে। মেজর একখানি গাড়ি দিতে চেয়েছেন।"

"গাড়ি?"

"হ্যাঁ। মিলিটারি ট্রাক। তিনি সেই খোঁজেই বেরিয়েছেন।"

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝড়ের বেগে মেজর হাজির হলেন। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললেন, "তোমরা ভাগ্যবান। একখানা বাড়তি গাড়ি পাওয়া গেছে। তোমাদের একেবারে ঋষিকেশ পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নাও। ঠিক এগারোটার সময় গাড়ি চলে আসবে।"

গাড়ি সময় মতই এল। কিন্তু ওরা তখন সবে খেতে বসেছে। ওদের ব্যস্ত হতে দেখে মেজর তিরস্কার করেন, "অত তাড়াহুড়ো করছ কেন? পেট ভরে খেয়ে নাও। এর পরে আবার কোথায় খেতে পাবে কে জানে?"

সহকর্মীদের সঙ্গে মেজর নিজ হাতে মালপত্র তুলে দিলেন, কোলে করে আহতদের এনে গাড়িতে শুইয়ে দিলেন। বার বার বললেন, পথে কোন অসুবিধায় পড়লে তারা যেন তাঁকে ফোন করে। ড্রাইভারকে আদেশ দিলেন, "সাহেবরা যখন চালাতে বলবেন, তখনই গাড়ি চালাবে। যেমন করে হোক, কাল বিকেলে এঁদের ঋষিকেশ পৌঁছে দেবেই। দরকার হলে গেটের নিয়ম অমান্য করবে।"

বিদায়ী অভিযাত্রীদের সঙ্গে একে একে করমর্দন করলেন মেজর, ক্যাপ্টেন রায়, দেবীদাস, প্রাণেশ ও উপস্থিত শুভানুধ্যায়ীরা। করমর্দন করল শের সিং, চৈৎ সিং, পান সিং, ধন বাহাদুর, বাবুরাম ও অমর। নিজেদের জীবন বিপন্ন করে, বিপদসঙ্কুল পথ পেরিয়ে, যাদের নিরাপদে নিয়ে এসেছে—তারা আজ চিরতরে বিদায় নিচ্ছে। দুর্গম পথে যারা ওদের হাতে নিজেদের সঁপে দেয়, তারা সবাই এমনি ভাবেই একদিন বিদায় নেয়। এই তো নিয়ম। তাহলে ওদের চোখে জল কেন? তবে কি টাকাপয়সার সম্পর্ক ছাড়িয়ে ওদের মাঝে অন্য কোন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল? একুট মায়া, একটু মমতা একটু ভালবাসা অঙ্কুরিত হয়েছিল মনে?

গাড়ি গর্জে ওঠে। প্রাণেশ ও দেবীদাসের চোখে জল ঝরে। মেজর সান্ত্বনা দেন, "তোমরা কাঁদছ কেন? তোমাদের সঙ্গে তো কদিন পরেই দেখা হবে। আমাদের কথা ভাবো তো। তবু দেখো আমি কেমন হাসিমুখে ওদের বিদায় দিচ্ছি।" বলেই টের পেলেন

অবাধ্য অশ্রু তাঁরও গাল বেয়ে নেমে এসেছে। তাড়াতাড়ি চোখ দুটি মুছে, মেজর মুখে একটু ম্লান হাসি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেন।

আর যারা বিজয় গৌরবে ফিরে চলেছে ঘরে? তাদেরও মনের আকাশে বর্ষা নেমে এসেছে। কখন কান্না এসে জুড়ে বসবে, তা কি কেউ আগের থেকে বুঝতে পারে?

অনেক স্মৃতিই নাকি বিস্মৃতির অতলান্ত অন্ধকারে হারিয়ে যায়। কিন্তু এই বেদনা-মধুর বিদায় লগ্নটি? আর ঐ অনাত্মীয় মানুষ কটি? ওরা কি কোনদিন বিস্মৃত হবে?

না, এই স্মৃতি যে ওদের অন্তরের অন্তস্থলে অক্ষয় আসন পেতে নিল।

॥ ৩৩ ॥

বেলাকুচীতে এসে গাড়ি অচল হল। ধস নেমেছে। দু ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়ে গেল। ফলে চামোলী পৌঁছুতে রাত দশটা বাজল। কিন্তু ওদের ভাগ্য ভাল। একটি হোটেল তখনও বন্ধ হয়নি। সেখানে খেয়ে নিয়ে গাড়িতে বসেই রাত কাটাল ওরা।

সকালে খবর পেল এগারোটায় গেট। সর্বনাশ! তাহলে তো আজও ঋষিকেশে পৌঁছতে পারবে না! ডাক্তার তার বিচিত্র পোশাক পরেই গেটম্যানের কাছে ছোটে। পাছে গেটম্যান ঘাবড়ে যায়, তাই বীরেনও তার পিছু নেয়। মেজরের হুকুম শুনে গেটম্যান সভয়ে গেট খুলে দেয়। আটটার সময় গাড়ি ছাড়ে।

রাস্তা খুবই খারাপ। ঘণ্টায় পাঁচ মাইল বেগে গাড়ি চলেছে। কর্ণপ্রয়াগ পৌঁছুতে দুপুর গড়িয়ে গেল। একটু জিরিয়ে নিয়ে ক্রমবর্ধমান জনতাকে অসীম কৌতূহলের মধ্যে নিমজ্জিত রেখে ওরা আবার রওনা হল।

সন্ধ্যার একটু আগে এল রুদ্রপ্রয়াগ। চায়ের আশায় বীরেন ও ডাক্তার গাড়ি থেকে নেমে পড়ে। ডাক্তার কিন্তু এখনও পর্বতারোহণের পোশাক ছাড়ে নি। তেরো হাজার সাতশ থেকে দু হাজার ফুটে নেমে এসেও তার নাকি শীত কমে নি। ফলে ডাক্তার বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। একদল লোক গাড়িখানাকে ঘিরে ফেলেছে। ডাক্তার ক্ষেপে গিয়ে বলে, "এই তোমলোগ্ কা দেখতা হায়? সার্কাস মিলা?"

"জরুর। ইসি লিয়ে তো আয়া। তুম্হি তো জোকার হো।" জনতার মধ্য থেকে জনৈক সবজান্তা মন্তব্য করে। ডাক্তার আরও রেগে যায়। সে তার চিরসাথী ছাতা নিতে হাত বাড়ায়। বীরেন বাধা দিলে ডাক্তার গজরাতে থাকে।

এমন সময় একজন পুলিস এসে সেলাম ঠোকে। সসম্ভ্রমে বলে, "মেহেরবানি করে যদি আপনারা আমার সঙ্গে আসেন, তাহলে বড় ভালো হয়। দারোগা সাহেব আপনাদের সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাইছেন।"

ডাক্তারের বুক ফুলে উঠে। উষ্মা অন্তর্হিত হয়। প্রফুল্ল চিত্তে বীরেনকে বলে, "চলো ঘুরে আসা যাক। একটু খাতির-টাতির করবে আর কি। সুবিধেই হবে।" পুলিসের বদলে ডাক্তারই চিন্তিত বীরেনকে ফাঁড়ির পথে টেনে নিয়ে চলে।

সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই গম্ভীর স্বরে দারোগা বলেন, 'আপনাদের পরিচয়পত্র দেখি।"

"পরিচয়-পত্র!" বীরেন বিস্মিত হয়, "আমরা ভারতীয়। আমাদের তো কোন

পরিচয়-পত্রের প্রয়োজন নেই।"

"প্রয়োজন আছে কি না, তা কি আপনাদের কাছে শিখতে হবে নাকি?" দারোগা রেগে যান, "আছে কিনা তাই বলুন।"

"নেই।" বীরেন বিরক্ত হয়।

"তাহলে আমি আপনাদের অ্যারেস্ট করতে বাধ্য হলাম।"

"অ্যারেস্ট!" ডাক্তারের গলা সপ্তমে চড়ে, "অ্যারেস্ট করবেন কেন? আমরা কি চোর না ডাকাত?"

"আপনারা স্পাই।"

"স্পাই! আপনার স্ক্রু ঢিলে আছে।"

"কি বলছেন?" দারোগা বুঝতে পারেন না।

"আপনাকে কে চাকরি দিল?"

"তা জেনে আপনার লাভ?"

এভাবে চললে কোথাকার জল কোথায় গড়ায় ঠিক নেই বুঝতে পেরে, বীরেন শান্ত কণ্ঠে দারোগাকে জিজ্ঞেস করে, "আমরা স্পাই, এ খবর আপনি কোথায় পেলেন?"

"আমার চোখকে ফাঁকি দেয়া? তখনই জানতাম তোমাদের এই পথেই সটকাতে হবে। তাই তো খবর পেয়েও নিশ্চিন্তে বসে আছি।"

"কি খবর পেয়েছেন?"

"একদল চীনে গুপ্তচর সীমান্ত পেরোবার সময় জওয়ানদের নজরে পড়ে যায়। তাঁরা গুলি করে তিনজন গুপ্তচরকে আহত করেন, কিন্তু ধরতে পারেন না। তোমরা সেই ফেরারী চর।"

"কিন্তু আমরা তো ভারতীয় সেনাবাহিনীর গাড়িতে করে যাচ্ছি।"

"হ্যাঁ! গাড়ি চুরির খবরটা এখনও এসে পৌঁছয় নি। তবে এসে যাবে।" দারোগা তার সিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহ।

"কিন্তু আমাদের সঙ্গে তো কোন চীনে নেই!" বীরেন শেষ চেষ্টা করে।

"নেই, না?" দারোগা একটু হাসেন, "ঐ যে তিনটা লোক গাড়িতে শুয়ে আছে তার দুটোই তো চীনে। আর এই লোকটা?" দারোগা ডাক্তারকে দেখিয়ে দেয়।

"আমি চীনে?" ডাক্তার আর কিছু বলতে পারে না। সে রাগে কাঁপছে।

বীরেন বলে, "আপনার এখানে টেলিফোন আছে? আমি একবার জোশীমঠের বেস কমান্ডার মেজর উবেরয়ের সঙ্গে কথা বলব।"

"মেজর উবেরয়!" দারোগা অবাক হয়

"হ্যাঁ তিনিই আমাদের এই গাড়ি দিয়েছেন। আপনি জানেন আমরা কে?" ডাক্তার প্রশ্ন করে।

"কে?" দারোগা যেন নিজের সিদ্ধান্তে সন্দিহান হয়ে উঠছেন।

"আমরা নীলগিরি পর্বত বিজয়ী। খবরের কাগজ টাগজ পড়েন? নীলগিরি অভিযানের কথা শুনেছেন?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ। শুনেছি। আপনারা..."

"আমরাই তারা। আমি ডক্টর বিমল ঘোষাল এম বি বি এস। হাউস সার্জন,

শম্ভুনাথ পণ্ডিত হসপিট্যাল, ভবানীপুর, ক্যালকাটা। আর ইনি বিখ্যাত মাউন্টেনিয়ার বীরেন সরকার। অথার...”

“ছেড়ে দাও ডাক্তার। উনি সন্দেহ বশে আমাদের ডাকিয়ে এনেছিলেন। আমাদের মাতৃভূমির নিরাপত্তার জন্যই ওঁকে এসব করতে হয়েছে।”

“ঠিকই বলেছেন মিস্টার সরকার। আমি সত্যিই বড় লজ্জিত।”

“আচ্ছা, আমরা তাহলে চলি।” বীরেন পেছনে ফেরে।

“না না, সেকি? বসুন। আরে তাই তো—আপনাদের যে বসতেই বলা হয় নি। এই হাবিলদার! ছে গেলাস্ চায়। তিন গেলাস গাড়িতে দেবে, তিন গেলাস এখানে। আর সাহেবদের গাড়ির কাছে ভিড় সরাতে একজন কন্সটেবল পাঠিয়ে দাও।”

“তাহলে খবরটা বেশ রটেই গেছে। আর তাই বোধ হয় কর্ণপ্রয়াগ থেকেই আমাদের পেছনে লোক লেগেছে।”

“জী। তবে হয়তো এতটা হত না।” দারোগা ডাক্তারের দিকে তাকান।

“কেন এতটা হল?” ডাক্তার কৌতূহলী হয়ে পড়েছে। দারোগা কি যেন বলতে গিয়েও চুপ করে থাকেন। ডাক্তার আবার জিজ্ঞেস করে, “বলতে কোন বাধা আছে কি?”

“মানে, আপনি কিছু মনে না করলে...”

“আরে মশাই মনে করার কি আছে? বলেই ফেলুন না।” ডাক্তার দিলদরিয়া ভাবে অনুমতি দেয়।

“মানে, আপনার এই পোশাকটাই যত গোলমাল বাধিয়েছে।” প্রাণখুলে হাসতে থাকেন দারোগা। বীরেন তার সঙ্গে যোগ দেয়। ডাক্তার লজ্জায় মুখ লুকোতে পারলে বাঁচে। কিন্তু হায়, চিরসাথী সেই ছাতা এখন কোথায়?

কাল রাতে রুদ্রপ্রয়াগেই থাকতে হয়েছিল ওদের। তবে কোন অসুবিধে হয় নি। পুলিশি ব্যবস্থায় রাতটা ওদের বেশ আরামেই কেটেছে। গেটের নিয়ম না মেনে, খুব সকালে ওরা রুদ্রপ্রয়াগ থেকে গাড়ি ছেড়েছে। কিন্তু এগোতে পারে নি বেশি দূর। রাস্তা খারাপ বলে ধীরে ধীরে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। এভাবে চললে আজও ঋষিকেশ পৌঁছনো যাবে কিনা সন্দেহ। ড্রাইভার যদিও ভরসা দিচ্ছে—সে আজ ওদের রেলে চাপিয়ে দেবেই।

শ্রীনগর থেকে ভাল রাস্তা পাওয়া গেল। আর পেয়েই ড্রাইভার অ্যাকসিলেটারে জোর চাপ দিল। তীব্র বেগে গাড়ি ছুটল। গাড়ির গতি বাড়াবার জন্য, সকাল থেকে ডাক্তার কি না করেছে? রাগারাগি থেকে খোশামুদি করেছে ড্রাইভারকে। এখনও তাই করছে। তবে গতি বাড়াবার জন্য নয়, কমাবার জন্য। পাছে এই গতি দুর্গতির কারণ হয়, তাই বলছে, “এত্না জোরসে মাত্ চালাইয়ে ড্রাইভার সাব্। গিরনেসে...।” দুর্জ্ঞেয় বিমলশ্চরিত্রম।

ধর্মপ্রাণ ডাক্তারের নিবেদনে ড্রাইভার কর্ণপাত করে নি। কিন্তু ভগবান তাঁর ভক্তের আবেদন মঞ্জুর না করে পারলেন না। ব্যাসীর কাছে এসে গাড়ির গতিরুদ্ধ হল। পথ বন্ধ।

সামনে একটি মিলিটারি ট্রাক বিকল হয়েছে। ডাক্তার কপালে করাঘাত করে। সে তো একেবারে অচল হতে চায় নি। তাই অস্থিরভাবে বার বার ঘড়ি দেখে আর ঈশ্বরের শরণ নেয়।

দেড়ঘণ্টা অধীর প্রতীক্ষার পর মিলিটারি ট্রাক সচল হয়। ওরাও রওনা হল। আবার তেমনি জোরে গাড়ি চলে। এবারে কিন্তু ডাক্তার নির্বাক। সে নিমীলিত নয়নে ধ্যান-মগ্ন হয়ে রইল।

বাহাদুর ড্রাইভার। তার জবান রেখেছে। ওরা ঋষিকেশ স্টেশনে পৌঁছে গেছে। এখনও আধ ঘণ্টা হাতে আছে। বীরেন ও ডাক্তার নিজেরাই ধরাধরি করে ভানুদের গাড়িতে ওঠায়। ড্রাইভার তাদের সাহায্য করে। তারপর রেল ছাড়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল প্ল্যাটফর্মে। হাত নেড়ে পরম স্নেহে ওদের বিদায় দিল। ওরা চলল হরিদ্বার।

হরিদ্বারেও রিজার্ভেশান পাওয়া গেল না। বীরেন ও ডাক্তার চিন্তায় পড়ে। স্টেশনে যা ভিড়, তাতে সাধারণ কামরায় বসবার জায়গায়ই পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। ভানু টোপগে ও টেম্বা পা ঝুলিয়ে বসতে পারছে না। শোবার জায়গা না পেলে ওদের পক্ষে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করা সম্ভব নয়। ঠিক হল রিজার্ভেশান ছাড়াই ওরা স্লিপার কোচে উঠে পড়বে। তারপরে যা হয় হবে।

ট্রেন আসতেই মরীয়া হয়ে ভিড় ঠেলে ওরা উঠে পড়ল স্লিপার কোচে। ভানুদের পায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা দেখে কন্ডাক্টার বাধা দিলেন না। তবে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনাদের রিজার্ভেশান আছে তো?"

ডাক্তার ইশারায় বীরেনকে দেখিয়ে দেয়। আর বীরেন মালপত্র তোলার অছিলায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ওরা নির্বিঘ্নে গাড়িতে উঠল। তারপর ধীরে সুস্থে বীরেন কন্ডাক্টারকে জানাল, "আমাদের কোন রিজার্ভেশান নেই। আমরা নীলগিরি পর্বত জয় করে ফিরছি। সঙ্গে তিনজন তুষারাহত অভিযাত্রী।"

চিন্তিত কন্ডাক্টার চুপ করে থাকেন। আশে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কয়েকজন যাত্রীর কানে কথাটা যায়। তাঁদের মধ্য থেকে একজন কন্ডাক্টারকে বলেন, "আমি এস. রানা। আমার তিনটি বার্থ আছে। তার দুটি আপনি এদের দিয়ে দিন।"

বীরেন অবাক বিস্ময়ে নেপালী ভদ্রলোকের দিকে তাকায়। ভদ্রলোক তাকে বলেন, "আসুন আমরা এঁদের বার্থে শুইয়ে দিই।"

কৃতজ্ঞ ডাক্তার ভদ্রলোকের একখানি হাত দু হাতে চেপে ধরে অভিভূত কণ্ঠে বলে, 'ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।"

কিন্তু মিস্টার রানা কিছু বলতে পারার আগেই, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বলে ওঠেন, "আমি মিস্টার সিং। আমার দুটি বার্থের একটি এঁদের দিয়ে দিচ্ছি।"

"আমিও একটা বার্থ ছেড়ে দিলাম। আমার নাম বি. পাণ্ডে।"

"কিন্তু আপনাদের যে কষ্ট হবে।" বীরেন লজ্জিত হয়।

"আপনারা অনেক কষ্ট করেছেন। আমরা না হয় এটুকু কষ্ট করলাম।" মিস্টার রানা বীরেনের লজ্জা ভাঙতে চান।

পাণ্ডেজী বলেন, 'আপনাদের কথা কাগজে পড়েছি! আমাদের সৌভাগ্য যে

আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।"

"আর দেরি নয়। ওঁদের এভাবে বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। চলুন আমরা ওঁদের জায়গামত নিয়ে যাই।" মিস্টার সিং ভানুদের কাছে এগিয়ে আসেন। পাণ্ডেজী ও মিস্টার রানা তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে যান।

বাধা দেন কন্ডাক্টার, "আপনারা একুট অপেক্ষা করুন স্যার। দেখি আমি কি করতে পারি।" তিনি কাগজপত্র খুলে বসলেন। একটু বাদে বীরেনকে বলেন, "দেখি আপনাদের টিকিটগুলো।" বীরেনের হাত থেকে সেগুলো নিয়েই কন্ডাক্টার বলে ওঠেন, "এই পাশটা কার?"

"আমার।" বীরেন বলে।

"আপনি রেলের কর্মচারী?"

অনেক অনুনয় বিনয় ও অদল বদল করে কন্ডাক্টার এক জায়গাতেই পাঁচখানি বার্থ খালি করে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত মিস্টার রানা, মিস্টার সিং ও পাণ্ডেজীকে আর নিজেদের বার্থ ছাড়তে হল না। তবে যত ভাবে সম্ভব তাঁরা ওদের সাহায্য করে চলেছেন। ভানুদের ধরাধরি করে নিয়ে এসেছেন, বিছানা করে শুইয়ে দিয়েছেন, খাবার কিনে খাইয়েছেন। কন্ডাক্টারও কম করেন নি। বীরেন রিজার্ভেশানের চার্জ দিতে গেলে হাত জোড় করে বলেছে, "আমি সামান্য মানুষ। আপনাদের সাহায্য করার সামর্থ্য বা সাহস কোনটাই আমার নেই। তবু এই সামান্য কটা পয়সা আমি নিজেই দিয়ে দিয়েছি। ওটা ফেরত দিয়ে আমাকে আর লজ্জা দেবেন না।"

পরদিন লখ্‌নউ স্টেশনে খবরের কাগজ পাওয়া গেল। নিয়ে এলেন মিস্টার রানা। আজও কাগজে নীলগিরি বিজয়ের কথা বেরিয়েছে। ওদের তিনজনের তুষারাহত হবার খবরও আছে। পাণ্ডেজী পরমানন্দে সেই সংবাদ পড়ে শোনালেন। আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে ওরা। ওদের গৌরবে আজ সারা ভারত গর্বিত। ওরা সকল কষ্ট ভুলে গেল। ওদের সকল যন্ত্রণার অবসান হল।

আর এই ফাঁকে কথাটা রটে গেল সারা কামরায়। এ কামরায় বাঙালীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু এ পর্যন্ত তাঁরা বড় একটা এদিকে আসেন নি। রেলে চেপে যতটা কালা ও বোবা সেজে থাকা যায়, ততই ভাল। তাছাড়া কি না কি রোগ হয়েছে কে জানে? স্বভাবতই তাঁরা এতক্ষণ ওদের হাওয়া বাঁচিয়ে চলছিলেন। খবরের কাগজ ও পাণ্ডেজীদের দৌলতে এতক্ষণে এদিকে আকৃষ্ট হলেন। চারিদিক থেকে ছেঁকে ধরলেন ওদের। রানাদের আসন টলে উঠল। তাঁরা পালিয়ে বাঁচলেন। আর বঙ্গ-সন্তানগণের গর্বে গর্বিত বঙ্গ-সন্তানগণ মন্তব্য করলেন—'দেখতে হবে তো, কোন্ দেশের ছেলে'। তারপরে প্রশ্নের প্রবাহে ভাসিয়ে দিতে চাইলেন বীরেনকে। অতি উৎসাহীরা আবার ডাক্তারের কাছে ডাক্তারির পাঠ নিতে বসে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন—"ফ্রস্ট-বাইট দেখতে কেমন?"

ডাক্তার সাফ জবাব দিল, "দেখানো সম্ভব নয়।"

"কেমন করে হয়?"

"পর্বতাভিযানে বা চীনেদের সঙ্গে লড়াই করতে গেলেই জানতে পারবেন।"

"কেন হয়?"

বাধ্য হয়ে ডাক্তারকে বলতে হয়, "যেখানে প্রচণ্ড শীত ও প্রবল হাওয়া বয়, সেখানে শরীরের উত্তাপ খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়ে যায়। শিরাগুলি সঙ্কুচিত হয়ে মোমের মতো শক্ত হয়। ফলে নাক কান কিংবা পায়ে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কারণ শরীরের এই অংশগুলিও অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত থাকে। কিন্তু তখন রোগী টেরই পায় না। ব্যথা হয় না কিনা?"

"কেন ব্যথা হয় না স্যার?"

নাঃ ডাক্তার আজ জব্বর পাল্লায় পড়েছে। নিরুপায় ডাক্তার বলে চলে, "রক্ত চলাচল বন্ধ হবার ফলে শরীরের ঐ অংশগুলো মরে যায়—বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে। আহত অংশগুলো কুঁচকে প্রথমে লাল ও পরে কালো হয়। তা থেকে আলসার বা গ্যাংরীন হয়ে যায়। তখন কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই থাকে না।"

ওদের এই উৎসাহ ও উদ্দীপনাকে বীরেনের কাছে একটা প্রচণ্ড প্রহসন বলে মনে হয়। সে আর চুপ করে থাকতে পারে না। বলে ফেলে, "মাফ করবেন। এঁরা অসুস্থ, বিশ্রামের প্রয়োজন। আপনারা যদি দয়া করে আমাদের বিরক্ত না করেন, বাধিত হব।"

॥ ৩৪ ॥

এক মাস বিশ দিন বাদে ১১ই নভেম্বর দুন এক্সপ্রেস আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে এল কলকাতায়। ভানুরা এসেছে ঠিক সাতদিন আগে। স্টেশন থেকেই ওদের নার্সিং হোমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ওরা সেখানেই আছে। বেস ক্যাম্প থেকে রওনা হবার পর ওদের চিন্তাই আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। অথচ এই মানসিক অবস্থার মধ্যেও আমাদের বদ্রীনাথ যেতে হয়েছিল। মানত, না মেনে উপায় নেই। গোবিন্দঘাট থেকে আমরা ধরেছি বদ্রীনাথের পথ। যাত্রীশূন্য যাত্রাপথ। নভেম্বর মাস। এ সময় এমনিতেই যাত্রী খুব কম থাকেন। বদ্রীনাথে তুষারপাত আরম্ভ হয়ে যায়। তাহলেও মন্দির বন্ধ হবার উৎসব উপলক্ষে কিছু কিছু যাত্রী প্রতি বছরই এ সময় বদ্রীনাথ যান। এবারে তাদের সংখ্যা নেহাতই নগণ্য। মাও-সে তুংয়ের শত পুষ্পের মহিমায় ('letting a hundred flowers blossom, and a hundred schools of thought contend') বাবা বদ্রীনাথ এবারে ভক্তশূন্য হয়েছেন।

আমরা বদ্রীনাথ যাচ্ছি শুনে গোবিন্দঘাটে সবাই বিস্মিত হয়েছিলেন—'বলেন কি! লোক পালিয়ে আসছে। কবে চীনেরা আক্রমণ করে ঠিক নেই। আর আপনারা সেই সীমান্তের দিকেই চললেন?"

বিস্মিত হিতাকাঙ্ক্ষীদের সকল উপদেশ অমান্য করে, আমরা বীর জওয়ানদের সঙ্গে মার্চ করে গিয়েছি অলকাপুরীতে। করুণাময় বদ্রীনারায়ণের কাছে করজোড়ে ভানু টোপগে ও আং টেম্বার আশু আরোগ্য কামনা করেছি। সেই শান্ত সমাহিত অলকাপুরীতে আমরা নিঃসন্দেহে বদ্রীনারায়ণের পুণ্যস্পর্শ পেয়েছি, যেমন পেয়েছেন বীর জওয়ানরা—যাঁরা মন্দিরের সিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে মিলিটারি স্যালুট ঠুকে, সীমান্তের পথে এগিয়ে চলেছেন। মনে মনে তাঁদেরও প্রণাম করে আমরা বিদায় নিয়েছি বদ্রীনাথ থেকে।

নির্বিঘ্নেই ফিরে এসেছি কলকাতা। ইতিমধ্যে 'যুগান্তর'-এ ধারাবাহিক ভাবে 'নীলগিরি অভিযান' প্রকাশ শুরু হয়ে গেছে, 'স্টেট্‌স্‌ম্যান'-এ আমাদের আগমন সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। স্বভাবতই অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী আজ হাওড়া স্টেশনে আমাদের সম্বর্ধনা জানাতে এসেছেন। তাঁরা আমাদের আলিঙ্গন করছেন, মালা দিচ্ছেন, ছবি তুলছেন। কিন্তু এই স্বতস্ফূর্ত অভিনন্দনে আমরা ঠিক সাড়া দিতে পারছি না। ভানুদের কথাই বার বার মনে পড়েছে। মিস্টার ডয়েগ বললেন, "ওরা ভাল আছে। এখন তোমরা পরিশ্রান্ত। বাড়ি গিয়ে বিশ্রাম করে বিকেলে নার্সিং হোমে এসো।"

আমাদের মন কিঞ্চিৎ শান্ত হল। কিন্তু শান্ত হল না অমূল্য। সে তার চারুচন্দ্র কলেজের ডায়না ছাত্র সংঘের কয়েকটি বন্ধুকে নিয়ে স্টেশন থেকে সোজা নার্সিং হোমে চলে গেল।

আমরা নার্সিং হোমে এলাম বিকেলে। এরা আমাদের দেখতে পেয়েই বিছানায় উঠে বসে। পারলে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরে। আমরাই এগিয়ে গিয়ে ওদের জড়িয়ে ধরলাম।

আং টেম্বার অবস্থা অনেকটা ভাল। হয়তো অপারেশান করতে হবে না। ভানুর অবস্থা খুব খারাপ নয়। কিন্তু টোপগে? টোপগের চোখে জল—মুছে দিতে গিয়ে দেখি নিজের চোখও সজল হয়ে উঠেছে। তবু বাষ্পারুদ্ধ কণ্ঠে বলি, "চিন্তা কোরো না। তোমাকে আমরা ভাল করে তুলবই।"

ডাক্তারের নির্দেশে আমরা বেশিক্ষণ থাকতে পারলাম না ওদের কাছে। পাছে ওরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে তাই আমাদের বেরিয়ে আসতে হল কেবিন থেকে। চিন্তাকুল মনে নেমে এলাম নিচে।

অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ এই চিকিৎসা। কোথা থেকে জোগাড় হবে টাকা? বহু টাকা। অন্তত হাজার দশেক টাকার প্রয়োজন। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি মোটেই এই অর্থ সংগ্রহের অনুকূলে নয়। সারা দেশ প্রতিরক্ষা তহবিল নিয়ে ব্যস্ত। এ সময় কে দেবে আমাদের এত টাকা? তাই বলে তো নার্সিং হোম ছেড়ে দেবে না। যে ভাবেই হোক যোগাড় করতে হবে। ঠিক হল—কাগজে দশ হাজার টাকা তোলার আবেদন জানানো হবে। আমরা চীনেদের রুখি নি, কিন্তু তাদের আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়েও দুর্গম নীলগিরি শিখরে জাতীয় পতাকা প্রোথিত করেছি। আসমুদ্র-হিমাচল এই বিরাট দেশের বিশাল জনসাধারণ যদি সাড়া দেন, তবে দশ হাজার টাকা উঠতে কতক্ষণ?

নার্সিং হোমের সামনের প্রাঙ্গণে এসে জড়ো হলাম সবাই। আঁধার নেমে এসেছে শহরের বুকে। বাতাসে একটা স্নিগ্ধ শীতের পরশ। পাখিরা কুলায় গেছে ফিরে। আমরাও ফিরে যেতে পারি ঘরে। কিন্তু ঘরমুখো হচ্ছে না মন। মন আমাদের অশান্ত।

"এক ভদ্রমহিলা আপনাকে ডাকছেন।"

প্রাণেশের কথায় ফিরে তাকাই। জিজ্ঞেস করি, "কোথায়?"

"ঐ যে, গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন।"

এগিয়ে আসি। সাহেব পাড়ার নির্জন রাস্তার অপর্যাপ্ত আলোয় দেখতে পাই—সাদা থান পরিহিতা বছর বিশেক বয়সের নিরাভরণা একটি মেয়ে বিষণ্ন নয়নে তাকিয়ে আছে।

সাধারণ বাঙালী মেয়েদের মতই গড়ন। কিন্তু গায়ের রং খুবই ফর্সা। ঘোমটাটি খসে পড়েছে পিঠে। কোঁকড়ানো কালো কেশ—অনাদরে অবিন্যস্ত। আহা এমন মেয়ের এমন বেশ!

কাছে আসতেই দু হাত জোর করে স্নিগ্ধ স্বরে মেয়েটি বলে, "নমস্কার। আপনি আমাকে চিনবেন না। কিন্তু আমি আপনাকে জানি।"

"আপনার পরিচয়টা..."

"পরিচয়?" গলাটা হঠাৎ ভারী হয়ে ওঠে মেয়েটির। একটু থেমে আবার বলে, 'আপনাদের গৌরবে যারা গৌরবান্বিত, আমি তাদেরই একজন।"

"গৌরব যদি কিছু অর্জিত হয়ে থাকে, তার সবটাই আপনাদের প্রাপ্য। আপনাদের অকুণ্ঠ সাহায্য ও সহানুভূতির জন্যই আমরা সফলকাম হতে পেরেছি।"

"এ আপনার বিনয়। যাই হোক, আমার একটি আবেদন আছে।"

"বলুন কি করতে পারি।"

"আহত অভিযাত্রীদের চিকিৎসার জন্য আমি সামান্য কিছু নিবেদন করতে চাই।"

"নিবেদন বলছেন কেন? বলুন দান। আমরা সকৃতজ্ঞচিত্তে সে দান গ্রহণ করব।"

মেয়েটি এক টুকরো কাগজ আমার হাতে দেয়। খুলে দেখি একখানি পঁচিশ টাকার চেক। নিচে সুন্দর মেয়েলি ছাঁদের স্বাক্ষর—অনীতা ভৌমিক। চমকে উঠি। অনীতা? মনে করার চেষ্টা করি। অনীতা ভৌমিক...বিকাশ—? "আপনি লেফটেনান্ট বিকাশ ভৌমিকের...?" আর বলতে পারি না। তাই যদি হয় তবে অনীতার এ বেশ কেন? তাহলে কি বিকাশ...? মেয়েটির দিকে তাকাই। হ্যাঁ, আমার অনুমান মিথ্যে নয়। অনীতা মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। তার দু গাল বেয়ে অঝোরে জল ঝরছে। কি বলব? সান্ত্বনা, সহানুভূতি, উপদেশ? না, সে সবই যে মিথ্যে। বাসি-বিয়ের দিন স্বামীকে সীমান্তে রওনা করে দিয়েছে। আর সে ফিরে আসে নি। সহসা একদিন সংবাদ এসেছে। শাঁখা ভেঙে ফেলতে হয়েছে, সিঁদুর মুছে ফেলতে হয়েছে, অলঙ্কার খুলে ফেলতে হয়েছে। একে আমি কি সান্ত্বনা দেব?

আমারই কি কিছু সান্ত্বনার প্রয়োজন নেই?...মনের মধ্যে এ কিসের একটা গ্লানি এমন করে ঠেলে ঠেলে উঠছে!...সেদিনের সেই মনোভাবের জন্য অনুশোচনাই কি? বিকাশ ভৌমিক ভাবী অমঙ্গলের আভাস পেয়েছিল তার মনে—কিন্তু সেটা আমরা বিশ্বাস করতে পারি নি। তার সেই বিষণ্ণতা নিয়ে উপহাস করেছি মনে মনে, আতিশয্য মনে করেছি! কবির উক্তি স্মরণ করিয়ে ব্যাপারটা লঘু করে দেবারও চেষ্টা করেছি। 'জল ভরা মেঘ রয় না, রয় না চিরকাল।' কিন্তু কবির সে আশ্বাস সত্য হয় নি বিকাশের জীবনে।

কতক্ষণই বা চুপ করে থাকা যায়? কিছু তো বলতে হবে। জিজ্ঞেস করি, "কবে এ রকম হল?"

ক্ষীণকণ্ঠে অনীতা বলে, "টেলিগ্রাম এসেছে আজ বিশ দিন।'" একটু থেমে সামলে নিয়ে আবার বলে, "বিয়ের রাতে সেই টেলিগ্রাম পেয়েই মন আমার অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠেছিল। তাই আমি যেতে চেয়েছিলাম ওর সঙ্গে। কিন্তু আমার অসুবিধে হবে বলে কিছুতেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেল না জোশীমঠে।"

"সেখানে তো তিনি মাত্র মাস দেড়েক ছিলেন।"

"তবু সেই দেড় মাসের স্মৃতিকে সম্বল করে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারতাম।"

কি উত্তর দেব? যে মেয়ে জীবনে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য স্বামীর সান্নিধ্যে এসেছে, তার কাছে দেড় মাস সুদীর্ঘ কাল বইকি!

অনীতাই আবার বলল, "কত করে বললাম—ও কিছুতেই রাজী হল না। কেবলই সেই এক কথা—চারটে তো মাস। নভেম্বরেই হাই-অলটিচুড্ টার্ম শেষ হয়ে যাবে। আর রিনিউ করবে না। নেমে আসবে কোন ভাল ফ্যামিলি স্টেশনে। সংসার পাতবে...যে নভেম্বরের আশায় বুক বেঁধেছিলাম, সেই নভেম্বরেই এল শেষ সংবাদ। এ জীবনে আর সংসার পাতা হল না। আমার।"

"আপনি তাঁর শেষ চিঠি কবে পেয়েছিলেন?"

"হট্‌স্প্রিংয়ে যাবার পথে চুশুল থেকে ডাকে দিয়েছিল। সেই চিঠিতেই ও আপনাদের কথা লিখেছিল। ওর বিশ্বাস ছিল জয় আপনাদের হবেই। লিখেছিল—আমি যেন ওঁর হয়ে আপনাদের অভিনন্দন জানিয়ে যাই। তাই আমি আপনাদের অপেক্ষায় বসে ছিলাম কলকাতায়। আজ তার শেষ আদেশ পালন করলাম। কাল চলে যাচ্ছি।"

"কোথায়?"

"দিল্লী। আমি মিলিটারি নার্সিং সার্ভিসে যোগ দিয়েছি।"

"বড় পরিশ্রমের কাজ। আপনি লেখাপড়া শিখেছেন। অন্য কোন ভাবেও তো দেশের সেবা করতে পারতেন।"

"সে সেবায় আমার মন ভরবে না। তাকে সেবা করতে পারি নি। জানি না কিভাবে কি অবস্থায় সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছে। তার চিকিৎসা হয়েছে কিনা। শেষ সময় কেউ তার মুখে একটু জল ঢেলে দিয়েছে কিনা। কিন্তু তার মতো যাঁরা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই করছেন, তাঁদের যদি সেবা করতে পারি, তবে তার অতৃপ্ত আত্মা তৃপ্ত হবে আমিও শান্তি পাব।"

কোনমতে একটি নমস্কার করে অনীতা তাড়াতাড়ি চলে যায়। বোধ হয় পালিয়ে যায়। আমি চেয়ে থাকি ব্যথার ভারে নুয়ে পড়া সেই চলমান মেয়েটির দিকে। ওর মতো দুঃখিনী সংসারে খুব বেশি জন্মায় না। অথচ ওর সকল দুঃখের মূলে যে দেশের মাটি, সে দেশের মানুষ বিকাশদের কথা বড় একটা ভেবে দেখে নি কোনদিন।

কিন্তু চিরকাল তো এ বিস্মৃতির পালা চলতে পারে না। বিকাশের মতো যারা তাদের সকল প্রিয়জনের অগোচরে, নিজেদের বুকের রক্ত ঢেলে, দেশের মান বাঁচিয়ে গেল, তাদের কথা একদিন লেখা হবে ইতিহাসে। অনীতাদের নামও লেখা থাকবে তাদের পাশে।

* * *

সেদিন সন্ধ্যায় অনীতা যে ভাণ্ডার খুলে দিয়ে গেছে, আজ আমাদের সে ভাণ্ডার ভরে উঠেছে। ব্যক্তিগত জীবনে অনীতা যত বড় ভাগ্যহীনাই হোক, আমাদের কাছে সে পরম সৌভাগ্যের প্রতীক। দু সপ্তাহে দশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে। তাছাড়া কলকাতার একজন বিখ্যাত ইংরেজ সার্জেন বিনা পারিশ্রমিকে ভানু ও টোপগের

অপারেশান করে আমাদের অন্তত দু হাজার টাকার সাশ্রয় করেছেন।

রাজসিক ব্যয়ের কথা জেনেও আমরা ওদের নার্সিং হোমে ভর্তি করেছিলাম। কারণ আমরা চেয়েছিলাম ওরা তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠুক। ভানু ও টোপগে প্রায় দু মাসের মতো বন্দী ছিল সেখানে। জলের মতো টাকাও খরচ হয়েছে। কিন্তু লাভ হয় নি কিছু। টোপগে তার দু পায়ের সাতটি ও ভানু এক পায়ের দুটি আঙুল হারিয়েছে জীবনের মতো। আং টেম্বা ভাগ্যবান! তার কোন অঙ্গহানি হয় নি।

ভানু অচল হয় নি, তবে তাকে একটু খুঁড়িয়ে হাঁটতে হয়। তাই বলে তার পর্বতাভিযানের নেশা কাটে নি, বরং বেড়েছে। আগামী গ্রীষ্মে (১৯৬৩) সে স্যার এডমান্ড হিলারী ও শ্রীডেসমন্ড ডয়েগের সঙ্গে 'স্কুল হাউস' অভিযানে অংশ গ্রহণ করছে।

সুইজারল্যান্ড ট্রেন্‌ড্‌ পেশাদার শের্‌পা টোপগে আর কোন দিন শিখরাভিযানে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না। দুর্গমগিরি নীলগিরি শিখরে ভারতের জাতীয় পতাকা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সত্য, কিন্তু ভারতকে হারাতে হয়েছে তার একজন শ্রেষ্ঠ পর্বতারোহী।

গঙ্গা-যমুনার দেশে

শ্রীমান অমূল্য সেন

অনুজপ্রতিমেষু

'নদী, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ'...

ভাবছে কুমার। ভাবছে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'ভাগীরথীর উৎস-সন্ধানে'-র কথা। ভাবছে ঋষিকেশের গঙ্গাতীরে বসে।

সামনে অনন্তকালের গঙ্গা। ওপারে পরমার্থ-নিকেতন, গীতা-ভবন আর স্বর্গাশ্রম। দূরে লছমনঝুলা। তারপরেই পাহাড়ের আঁকা-বাঁকা রেখা—হিমালয়। দেবতাত্মা হিমালয়।

গঙ্গা ওদিক থেকেই আসছে। কুমারও ওদিকেই যাবে। যাবে গোমুখী ও যমুনোত্রী—গঙ্গা যমুনার উৎস দর্শনে। শৈশবের স্মৃতিকে যৌবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মাঝে সার্থক করে তুলতে সে যাত্রা করেছে সেই সুদুর্গম পথে।

গতকাল বিকেলে কুমার কলকাতা থেকে এসেছে ঋষিকেশ। একটু আগে এসে বসেছে এই নির্জন গঙ্গাতীরে। বসে বসে ভাবছে গঙ্গার কথা আর নিজের কথা—অবিশ্বাসী মন নিয়ে সে চলেছে দুর্গম গিরিতীর্থে। পুণ্য সঞ্চয় তার উদ্দেশ্য নয়। চক্ষু-কর্ণের তৃপ্তির জন্যই সে এই অজানা পথে পা বাড়িয়েছে।

তাই সে নির্জন গঙ্গাতীরে বসে সেকালের বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে একালের অবিশ্বাসী মন দিয়ে যাচাই করে নিচ্ছে। ভেবে চলেছে আচার্য জগদীশচন্দ্রের সেই কথা—

"আমাদের বাড়ির নিম্নেই গঙ্গা প্রবাহিত। বাল্যকাল হইতেই নদীর সহিত আমার সখ্য জন্মিয়াছিল।...কখনও মনে হইত, এই যে অজস্র জলধারা প্রতিদিন চলিয়া যাইতেছে, ইহা তো কখনও ফিরে না; তবে এই অনন্ত স্রোত কোথা হইতে আসিতেছে? ইহার কি শেষ নাই? নদীকে জিজ্ঞাসা করিতাম, 'তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?' নদী উত্তর করিত, 'মহাদেবের জটা হইতে'।..."

—দাদা...দাদা...দা...দা... দূর থেকে কিশোরী-কণ্ঠের আকুল আহ্বান ভেসে আসে।

—কে? কুমারের ভাবনা থেমে যায়। সে তাড়াতাড়ি পেছনে তাকায়। হ্যাঁ, যা ভেবেছে তাই। বেলাভূমির বালি আর পাথরের ওপর দিয়ে ছুটতে ছুটতে অঞ্জলি এদিকে আসছে। কুমার তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়।

"কাট" হীরেনবাবু চিৎকার করে ওঠেন।

বন্ধ হয় বিশুবাবুর ক্যামেরা, শুভাশিসের সাউন্ড মেশিন 'নাগ্রা'। শান্তি ও বাহাদুর রিফ্লেক্টার নামিয়ে রাখে। আর শুভেন্দু...

হ্যাঁ, কুমার নয়, শুভেন্দু—ডাক্তার শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়। 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা'-র নায়করূপী কুমার সাবধানে পাথর ডিঙিয়ে এসে পৌঁছয় আমাদের কাছে। বলে, "বিশুদা, কেমন হল?"

"ভাল। বেশ ভাল হয়েছে।" ক্যামেরাম্যান বিশু চক্রবর্তী উত্তর দেন।

"পাণ্ডে!" পরিচালক হীরেন নাগ ডাক দেন।

"জী, হীরেন দা..." সহকারী পরিচালক হৃদয়েশ পাণ্ডে 'ক্ল্যাপ্‌স্টিক' বা তালিফলক হাতে এগিয়ে আসেন হীরেনবাবুর কাছে।

হীরেনবাবু বলেন, "তুমি মালাকে 'নেক্‌সট্ সীন্'টা, বুঝিয়ে দিয়ে 'ডায়লগ্' মুখস্থ

করাও।”

কিশোরী অভিনেত্রী মালা দাশ এবারে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেবে। বাবার সঙ্গে সে এসেছে এখানে। এসেছে কুমারের পাতানো বোন অঞ্জলির চরিত্রে অভিনয় করতে। ছবিতে এই তার প্রথম অভিনয়।

সাধারণত অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিজ নিজ সংলাপ আগেই দিয়ে দেওয়া হয়। সেটি তারা দেখে আসেন। কিন্তু তাহলেও গ্রহণের আগে পরিচালককে প্রত্যেকটি দৃশ্য বুঝিয়ে দিতে হয়। পাত্র-পাত্রীদের মানসিক অবস্থা, কথা বলার ভঙ্গি ও হাবভাব—সবই বলে দিতে হয়। সহকারীরা এ ব্যাপারে পরিচালককে সাহায্য করেন। তবে দৃশ্য গ্রহণের আগে পরিচালক অভিনয় দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে নেন। আর একথা কেবল অভিনয় সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়। ছবি, কথা ও অভিনয়—এই তিনের সমন্বয়ে চলচ্চিত্র। ছবির জন্য রয়েছেন ক্যামেরাম্যান, কথার জন্য রয়েছেন শব্দযন্ত্রী আর অভিনয়ের জন্য অভিনেতা-অভিনেত্রী। কিন্তু সবার ওপরে রয়েছেন পরিচালক। গল্প নির্বাচন থেকে ‘এডিটিং’ পর্যন্ত ছবির প্রত্যেকটি ব্যাপার তাঁরই নির্দেশে সম্পন্ন হয়। কিন্তু অন্যকথা থাক্, বহির্দৃশ্য গ্রহণের কথাই বলা যাক্।

পরিচালক প্রথমে দৃশ্যটিকে ভাগ করে নেন। মঞ্চাভিনয়ের সময় কিন্তু পরিচালকের এ কাজটি করতে হয় না। কারণ মঞ্চাভিনয়ে রঙ্গমঞ্চ ও দর্শক স্থির। কিন্তু চলচ্চিত্র চলমান। দর্শক থিয়েটার দেখেন নিজের চোখ দিয়ে, আর সিনেমা দেখেন ক্যামেরার ‘লেন্‌স’-এর ভেতর দিয়ে। এক কথায় ক্যামেরার লেন্‌সই হচ্ছে দর্শকের চোখ। কাজেই দর্শকের অবস্থান অনুমান করে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ক্যামেরা বসিয়ে কখনও এগিয়ে, কখনও পেছিয়ে, এক একটি দৃশ্য গ্রহণ করতে হয়! কাজেই ক্যামেরাম্যান পরিচালকের নির্দেশানুযায়ী ক্যামেরা বসাবেন। জেনে নেবেন—দিনের দৃশ্য কি রাতের দৃশ্য। স্টুডিওতে ছবি তোলার সময় আলোর সমস্যা থাকে না। কিন্তু বহির্দৃশ্য গ্রহণের সময় সূর্যই আলোর উৎস। রিফ্লেক্টার ধরে আলো ঠিক করে নিতে হয়।

বহির্দৃশ্য গ্রহণের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে অকুস্থল বা লোকেশান নির্বাচন। গল্প ও দৃশ্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সমতা রেখে লোকেশান ঠিক করতে হয়। এবং এটিও করেন পরিচালক। তাই হীরেনবাবু সহকারী দিলীপ মিত্র ও শিল্প নির্দেশক কার্তিক বসুকে নিয়ে গতবছর গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী ঘুরে গেছেন।

শব্দগ্রহণের ব্যাপারেও পরিচালকের দায়িত্ব রয়েছে বৈকি। শব্দযন্ত্রীকে তাঁর বলে দিতে হয় যে আলোচ্য দৃশ্যে কি রকম শব্দের প্রয়োজন—জোরে কি আস্তে। শব্দযন্ত্রী সেই ভাবে ‘মাইক’ বসিয়ে শব্দগ্রহণ করে থাকেন।

কাজেই পরিচালককে হতে হবে নাট্যকার, অভিনেতা, আলোকচিত্রশিল্পী, শব্দযন্ত্রী, সঙ্গীতজ্ঞ ও সম্পাদক। এই ছবির জন্য আরও একটি গুণের প্রয়োজন—তাঁকে হতে হবে হিমালয় প্রেমিক। আনন্দের কথা হীরেনবাবুর এর সব কয়টি গুণই রয়েছে।

যাক্ গে, যে কথা বলছিলাম। ‘ফার্স্টসীন’-এর ‘ফার্স্ট শট’-এর ‘ফার্স্ট টেক্’ শেষ হল। এ সীন্‌টা আর টেক্ করার দরকার নেই। কারণ, পরিচালক ক্যামেরাম্যান ও সাউন্ড রেকর্ডিস্ট তিনজনই একমত হলেন যে দৃশ্যটা ঠিক হয়েছে। ওঁরা একমত না হলে আবার দৃশ্যটা গ্রহণ করতে হত। অতএব শুভ সূচনা। না হয়ে পারে—আজ যে মহালয়া।

মহালয়ার পুণ্যতিথিতে পুণ্যভূমি ঋষিকেশের গঙ্গাতীরে 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা'র বহির্দৃশ্য গ্রহণের কাজ শুরু হল।

কিন্তু এজন্য ওঁদের খুবই তাড়াহুড়া করতে হয়েছে। কারণ ওঁরা আজই ঋষিকেশে এসেছেন। সবাই আসেন নি। যাঁদের কথা বলেছি, তাঁরা ছাড়া আর এসেছেন অতিরিক্ত ক্যামেরাম্যান দীপক দাস ও বিশুবাবুর সহকারী কানাই দাস। স্টিল ক্যামেরাম্যান পি. প্রভু, শব্দযন্ত্রী শুভাশিস চৌধুরী ও তার সহকারী কেষ্ট দাস, মেক্‌আপ-ম্যান প্রাণানন্দ গোস্বামী ও তাঁর সহকারী কেষ্ট হালদার, প্রোডাকশন ম্যানেজার শান্তি চৌধুরী ও তাঁর সহকারী শান্তি দাস। অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোক মিত্র ও দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। কালীবাবুর স্ত্রী শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায়ও এসেছেন।

শুধু আমি আর সহকারী পরিচালক নারায়ণবাবু এসেছি দিন কয়েক আগে। না, লেখক হিসেবে নয়। কারণ চলচ্চিত্র প্রযোজনার মহোৎসবে লেখক হচ্ছে একেবারেই অপাঙ্‌ক্তেয়। গল্প নিয়ে নেবার চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হবার পরে তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি। কারণ হীরেনবাবুর ধারণা আমার সক্রিয় সাহায্য ছাড়া নাকি তাঁর পক্ষে এই বহির্দৃশ্য গ্রহণ সম্ভব নয়। তাই আমি এসেছি হীরেনবাবুকে সাহায্য করতে। এসেছি হিমালয়ে এসে তোলা হিমালয়ের প্রথম প্রকৃত পূর্ণচিত্র-গ্রহণ গৌরবের অংশীদার হতে। এসেছি এই অভিনব প্রচেষ্টায় সক্রিয় সহযোগিতা করতে।

প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য আমরা দুজন অগ্রবর্তী দল হিসাবে সাতাশে সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে ঋষিকেশ এসেছি। পরদিন চলে গিয়েছি উত্তরকাশী। পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ লেঃ কর্নেল জে. সি. যোশীর সঙ্গে দেখা করে প্রয়োজনীয় পর্বতারোহণের পোশাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করেছি। যোগীন (২১,২১০) পর্বতাভিযানের নেতা অমূল্য সেনও আমাদের সঙ্গে যাবে; উত্তরকাশী শিক্ষাকেন্দ্রের 'রেজিস্ট্রার' শ্রী কে. পি. শর্মাকে বলে এসেছি, পোষাক-পরিচ্ছদ ও কয়েকজন 'হাইঅলটিচ্যুড' কুলিসহ অমূল্যকে কুতনৌর পাঠিয়ে দিতে। গতকাল রাতে আমরা ঋষিকেশ ফিরে এসেছি।

কথা ছিল, এই দৃশ্যটা গঙ্গার ওপারে গীতা-ভবনের সামনে তোলা হবে। তাই সেদিন এখানকার 'টুরিস্ট অফিসার, শ্রী এ. কে. রাজদান ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বন্ধুবর সুধীর কুমারকে নিয়ে গিয়েছিলাম ওপারে। দেখা করেছিলাম গীতাভবনের জনৈক কর্মকর্তার সঙ্গে। সব শুনে তিনি আমাদের আবেদন নামঞ্জুর করে দিলেন। কারণ সিনেমা নাকি সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে।

অনেক বোঝালাম তাঁকে। বললাম আমাদের এ ছবি তেমন নয়। এ ছবি গোমুখী-যমুনোত্রী যাত্রাকে জনপ্রিয় করে তুলবে, ঋষিকেশ আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে।

কিন্তু বৃথাই বাক্যব্যয়। বরং তিনি আমাদের ভয় দেখালেন, তাঁর নিষেধ অমান্য করে আমরা যদি ওপারে গিয়ে সিনেমার ছবি তুলি, তাহলে তাঁরা সর্বশক্তি দিয়ে বাধা দেবেন। অর্থাৎ তাঁর শক্তিধর দারোয়ানদের হাতে ব্যাপারটা ছেড়ে দেবেন।

অগত্যা আমরা এপারে বসেই শুটিং করছি। কিন্তু তা করছি গীতা-ভবনের ঠিক বিপরীত দিকে। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট—শক্তিশালী ক্যামেরায় যাতে গীতা-ভবন পেছনে থাকে। অর্থাৎ কাজটা মিটল, কিন্তু মার খেতে হল না।

ইতিমধ্যে বিশুবাবু ক্যামেরা সরিয়ে এনেছেন। শুভাশিস পজিশন নিয়েছে। বাহাদুর ও শান্তি রিফ্লেক্টার হাতে নিয়ে প্রস্তুত। শুভেন্দু ও মালা অকুস্থলে হাজির। বিশুবাবু রেডি। হীরেনবাবু তৎপর। তিনি হেঁকে ওঠেন, "টেক্।"

পাণ্ডে ক্ল্যাপস্টিক্ দিল। অর্থাৎ দ্বিধাবিভক্ত কাঠের ফলকের ওপর দৃশ্যাংশের ক্রমিক সংখ্যা লিখে ক্যামেরার সামনে তুলে একবার তালি বাজাল এবং তারপরে মাইক্রোফোনের সামনে সংখ্যাটা ঘোষণা করল। সম্পাদনার সময় এটি অপরিহার্য। তারপরে পাণ্ডে সরে এল দূরে।

ব্যস, দ্বিতীয় দৃশ্য গ্রহণ শুরু হল। সেই বালি আর পাথরের বেলাভূমির ওপর দিয়ে ছুটে অঞ্জলি এসে দাঁড়ায় কুমারের কাছে। কুমার জিজ্ঞেস করে—কিরে অঞ্জলি, অমন ছুটছিস কেন?

অভিমানী অঞ্জলি পাল্টা প্রশ্ন করে—কেন তুমি ঋষিকেশে আসো? মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকার জন্য?

—তুই থাকতে মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকবে, এমন সাধ্যি কোন্ দাদার আছে?

—থাক্ থাক্, তাও যদি পাতানো বোন না হতাম। তা নাহলে পারতে এমন করে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে?

—পাতানোই হোস, আর যাই হোস। এখানে তোর চেয়ে আপনজন আমার আর কে আছে বল? সেবারে যখন কেদার-বদ্রী দর্শন সেরে ফিরে এলাম, জ্বরে বেহুঁশ হয়ে তিনটে দিন পড়েছিলাম ভরত-মন্দিরের বাইরে। কৈ কেউ তো ডেকেও জিজ্ঞেস করে নি, বেঁচে আছি কি মরে গেছি? তুই আমাকে আশ্রয় দিলি। তোর সেবাতেই ভাল হয়ে দেশে ফিরে গেলাম। একবার থামে কুমার। কি যেন একটু ভাবে। তারপরে একহাতে অঞ্জলিকে কাছে টেনে নিয়ে বলে—চল, তোকে নিয়ে আজ সারাদিন ঘুরে বেড়াব।

"কাট্" হীরেনবাবু বলে ওঠেন। ক্যামেরা বন্ধ হয়ে যায়। শুভেন্দু মালাকে ছেড়ে দেয়।

পরবর্তী দৃশ্য গ্রহণের পরে হীরেনবাবু বলেন, "প্যাক আপ্।"

বিশুবাবু জিজ্ঞেস করেন, "ফর দ্য ডে?"

"নো।" হীরেনবাবু উত্তর দেন, "ফর দিস্ লোকেশান। নেক্স্ট লোকেশান লছমনঝুলা। তবে সাইলেন্ট শট্স। কুমার ও অঞ্জলি বেড়াতে বেরিয়েছে।"

"হীরেনদা, আমি তাহলে চলে যেতে পারি?" শব্দযন্ত্রী শুভাশিস জিজ্ঞেস করে।

একটু ভেবে নিয়ে হীরেনবাবু বলে, "হ্যাঁ, তোমার আর নতুন লোকেশানে যাবার দরকার নেই। তবে তোমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে এখানে। গাড়ি আগে আমাদের লছমনঝুলায় পৌঁছে দিয়ে আসবে।"

হীরেনবাবু আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "আপনি কি লছমনঝুলায় যাবেন?"

"কোন দরকার আছে কি?"

"না।"

"তাহলে আর গিয়ে কি হবে?"

"আমিও তাই বলছিলাম।" হীরেনবাবু বলেন, "তার চেয়ে আপনি বরং শুভাশিসের সঙ্গেই গেস্ট-হাউসে ফিরে যান। মোহন্ত মহারাজের সঙ্গে একবার দেখা করুন। তিনি

বলেছিলেন, দেরাদুন থেকে ফটো-ফ্লাড ল্যাম্প আনিয়ে দেবেন। আমাদের ল্যাম্প পরশু-দিন কার্তিকবাবুর সঙ্গে আসবে।"

"কেন রাতে কি আবার শুটিং আছে নাকি?"

"হ্যাঁ। ভরত-মন্দিরের আরতি টেক্ করব।"

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে গাড়ি ফিরে এল। না, ট্যাকশি নয় তো, সুধীরবাবু তাঁর গাড়ি নিয়ে এসেছেন। আমরা তিন দিনের জন্য মাত্র একখানি ট্যাক্সি ভাড়া করেছি। কারণ সুধীরবাবু নাকি গাড়িসহ এ তিন দিনই আমাদের সঙ্গে থাকবেন। তাঁর গাড়িটাও বেশ বড়। এবং আজ সকাল থেকেই সে গাড়ি আমাদের প্রয়োজনে ছুটোছুটি করছে। বলাবাহুল্য তেলের দামটাও মালিকের পকেট থেকেই যাচ্ছে।

সত্যই সুধীরবাবু আর তাঁর বাবার কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। বছর তিনেক হল তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচয়। সেটি ১৯৬৭ সালের কথা। কেদারনাথ পর্বতাভিযানের (২২,৭৭০) সময় যথারীতি 'ইম্পিরিয়াল টোবাকো কোম্পানীর' কাছে আমরা সিগারেট চেয়েছিলাম। আবেদন মঞ্জুর করে তাঁরা লিখলেন, 'আমাদের ঋষিকেশের এজেন্ট সুধীর-কুমার অ্যান্ড কোম্পানীর কাছ থেকে আপনাদের সিগারেট নিয়ে নেবেন। কবে আপনারা ঋষিকেশ পৌঁছবেন, জানিয়ে দিলে, তাঁরা আপনাদের সিগারেট ঠিক করে রাখবেন।'

ঋষিকেশে ট্রেন থেকে নামতেই একজন সুদর্শন যুবা এসে নমস্কার করলেন আমাদের। বললেন, "আমি সুধীর কুমার, আর উনি এখানকার ট্যুরিস্ট অফিসার শ্রী. এ. কে. রাজদান। আপনাদের নিয়ে যাবার জন্য আমার গাড়ি নিয়ে এসেছি।"

সেই শুরু। তারপর থেকে যতবার আমরা অথবা আমাদের চিঠি-পত্র নিয়ে যে কেউ ঋষিকেশ এসেছে, সুধীরবাবু, তাঁর বাবা এবং শ্রীরাজদান তাদের সর্বপ্রকার সাহায্য করেছেন। এবারেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। বরং প্রয়োজনবোধে সাহায্যের পরিমাণটা প্রসারিত হয়েছে। প্রতিবারের মতো এবারেও তাঁরা আমাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। পার্থক্য শুধু এই যে এবারকার আশ্রয় অর্থাৎ ভরত-টেম্পল গেস্ট হাউসের চেয়ে ভাল আশ্রয় ঋষিকেশে আর কিছু হতে পারে বলে আমার জানা নেই। দুখানি করে ঘর ও বাথরুম নিয়ে তিনটি স্যুইট। প্রত্যেক ঘরে প্রচুর আসবাবপত্র। সামনে সুপ্রশস্ত বারান্দা। তারপরেই খানিকটা ফাঁকা জায়গা ও গঙ্গা। গঙ্গার ওপারে পাহাড়। আর এই রমণীয় অতিথিশালার জন্য আমাদের কোন ভাড়া দিতে হবে না—যেমন ভাড়া দিতে হচ্ছে না এই গাড়ি চড়ার জন্য।

আমরা ফিরে চলেছি ভরত-মন্দিরে—ঋষিকেশের প্রধান মন্দির। মোহন্ত এখানকার সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। তিনিও আমাদের খুবই সাহায্য করছেন। ওঁরা লছমনঝুলার শুটিং সেরে ফিরে এলে ভরত-মন্দিরের আরতি টেক্ করা হবে। অঞ্জলিকে নিয়ে কুমার ঘুরতে বেরিয়েছে ঋষিকেশের পথে পথে। গিয়েছে লছমনঝুলায়। সেখান থেকে আসবে ভরত-মন্দিরে—আরতি দর্শন করবে। তারপরে...

না, সে দৃশ্যটা তোলা হবে 'ইন্-ডোর'-এ অর্থাৎ কলকাতার কোন স্টুডিওতে। তাহলেও দৃশ্যটার কথা একটু ভেবে নেওয়া যাক্।

তারপরে অঞ্জলি কুমারকে নিয়ে যাবে তার বাড়িতে। কুমার খেতে বসবে! অঞ্জলি

এসে বসবে তার পাশটিতে। শঙ্কা মেশানো স্বরে কুমারকে অনুরোধ করবে—নাই বা গেলে, ঐ দুর্গম পথে। কি হবে গিয়ে, এত বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে?

কুমার মুখ তুলে তাকাবে অঞ্জলির দিকে। বলবে—তুই যদি এমনি করে আমাকে বাধা দিস, তাহলে যে সত্যি সত্যি আমার যাওয়া হবে না। কিন্তু দেখ, এ আমার বহুকালের স্বপ্ন। গঙ্গা-যমুনার উৎস দেখব। আমরা গঙ্গার তীরে জন্ম নিই, শেষশয্যা নিই এই গঙ্গারই তীরে। এই গঙ্গাকেই আমি দেখতে চাই তার জন্ম মুহূর্তে, তার শৈশবে, তার কৈশোরে...

অঞ্জলি মাথা নত করবে। গোমুখীর পথ দুর্গম জেনেও সে আর তার দাদাকে কিছু বলতে পারবে না। শুধু অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে কুমারের দিকে।

হীরেনবাবু বলে উঠবেন, "কাট্"।

দুই

পরদিন—পয়লা অক্টোবর, উনিশশো সত্তর। সকাল সাড়ে চারটা থেকে সাজ সাজ রব শুরু হয়ে গেছে। ঘুম থেকে টেনে তুলে নীলম হোটেলের বেয়ারা চা দিয়ে গেছে। তারপরে পরিচালকের হাঁকডাক, "গোস্বামীদা, মেকআপ্ শুরু করে দাও, ছ'টায় রওনা দিতে হবে। সাতটায় গেট।"

যাঁরা কয়েক বছর আগেও দুর্গম হিমালয়ে গেছেন, তাঁরা জানেন—অপ্রশস্ত বলে অধিকাংশ পথেই একসঙ্গে গাড়ি যাওয়া-আসা করতে পারত না। তাই প্রত্যেক পথে কতকগুলি নির্দিষ্ট স্থান থেকে নির্দিষ্ট সময়ে গাড়িগুলিকে ওপরে যেতে কিংবা নিচে নামতে দেওয়া হত। কিন্তু এখন হিমালয়ের অধিকাংশ পথের মতো গঙ্গোত্রীর পথকেও প্রশস্ত করা হয়েছে। ফলে গত বছর থেকে এপথে গেট উঠে গেছে। অর্থাৎ এখন এ পথে কোথাও থামবার দরকার হয় না। সোজা চলে যাওয়া যায়। তাই আগে যেখানে ঋষিকেশ থেকে উত্তরকাশী যেতে বারো-তেরো ঘণ্টা সময় লাগত, এখন সেখানে মাত্র আট-ন'ঘণ্টা লাগছে। পথের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সময়সীমা আরও সঙ্কুচিত হবে।

গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী যাত্রাপথ আলোচ্য কাহিনীর পটভূমিকা। কিন্তু যখনকার এই কাহিনী, তখন এপথে গেটের নিয়ম ছিল এবং সেই গেট নিয়ে কিছু ঘটনাও ঘটেছিল। কাজেই হীরেনবাবুর গেটের ছবি দরকার। সৌভাগ্যবশত কাল খবর পাওয়া গেছে যে কেদার-বদ্রী পথে আজ পর্যন্ত গেটের নিয়ম চালু আছে। আগামীকাল অর্থাৎ ২রা অক্টোবর (১৯৭০) থেকে সেপথেও গেট উঠে যাচ্ছে। অতএব হীরেনবাবু শেষ গেটের ছবি নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

কোন রকমে 'মেক-আপ'-এর ঝামেলা মিটিয়ে সোয়া ছ'টায় অতিথি নিবাস থেকে রওনা হওয়া গেল। সাড়ে ছ'টার সময় লছমনঝুলার কাছে সেই গেটের সামনে পৌঁছলাম আমরা। শ্রীরাজদান গেট-এর জমাদারের সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফেললেন। একে একে বাস ট্রাক ও গাড়ি এসে জমতে শুরু করল। আমাদের ট্যাকশি ও সুধীরবাবুর গাড়ি তো রয়েছেই।

বিশুবাবু ক্যামেরা ঠিক করছেন, দীপক ও কানাই তাঁকে সাহায্য করছে। শুভাশিস সাউন্ড মেশিন ঠিক করছে। কেউ সাহায্য করছে তাকে। হীরেনবাবু অভিনেতাদের দৃশ্যটি

বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

হীরেনবাবু বলে চলেছেন—কুমার বাসে করে যমুনোত্রীর পথে রওনা হয়েছে। নরেন্দ্রনগরে গেটের সামনে এসে বাস থামল। সুযোগ পেয়ে হাত-পায়ের জড়তা ভাঙতে কুমার নেমে আসে বাস থেকে। নেমেই দেখে পথের পাশে চায়ের দোকান। এক গ্লাস চা নিয়ে সামনের হিমালয়কে দেখতে থাকে।

একটু বাদে জনৈক সহযাত্রী বাস থেকে নেমে তার সামনে আসেন। আপন মনে বলে ওঠেন— Horrible route. তারপরেই নজর পড়ে কুমারের দিকে। নমস্কার করে বলেন—I am...Aurora from Delhi.

কুমার তাড়াতাড়ি প্রতি-নমস্কার করে উত্তর দেয়— I am Kumar Roy from Calcutta. একটু থেমে সে জিজ্ঞেস করে You are also going to Jamunotri?

—Yes, just to oblige my Mrs.

—জ্যরা শুনিয়ে তো...বাসের ভেতর থেকে কর্কশ নারীকণ্ঠের নির্দেশ ভেসে আসে। সঙ্গে সঙ্গে অরোরাজী যেন কেমন হয়ে যান। তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন,

—আতা হ্যায় ডার্লিং...কুমারের দিকে একবার অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি ত্রস্ত পদক্ষেপে চলে যান বাসের দিকে। একটু হেসে চায়ে চুমুক দিয়ে কুমার আবার হিমালয়কে দেখতে থাকে।

—এ গাড়িতে কেউ বাঙালী আছেন...বাঙালী...

কুমার চমকে পেছন ফেরে। ঢিলে-ঢালা প্যান্ট-কোট পরিহিত একজন ভদ্রলোক চিৎকার করতে করতে এই দিকে আসছেন। কুমার একটু এগিয়ে আসতেই তিনি ছুটে আসেন তার কাছে। প্রশ্ন করেন—আপনি?

—বাঙালী।

অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন তিনি। তারপরে বলেন—দেখুন ঠিক ধরতে পেরেছি। আবার খানিকটা হেসে নিজের পরিচয় দেন—আমি এখানকার মেডিক্যাল অফিসার।

হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে ওঠেন—ইস কুড়ি মিনিটের ছ'মিনিট কেটে গেল, আর মাত্র চোদ্দ মিনিট আমি আপনার সঙ্গে একটু বাংলায় কথা বলতে পারব। এপথে বাঙালী খুব কম যায়। যারা যায় তাদের সঙ্গেও যোগাযোগ বড় একটা হয় না। আজ যে আমার কি আনন্দ হচ্ছে! প্রবাসী বাঙালী ডাক্তার আনন্দে আত্মহারা।

—কেন এখানে কি আর কোন বাঙালী নেই? কুমার প্রশ্ন করে।

ডাক্তার উত্তর দেন—না। ছিলেন একজন ইঞ্জিনিয়ার। এই বাসস্ট্যান্ড, ডাকবাংলো, স্টাফ-কোয়ার্টার্স, পার্ক, মার্কেট সবই তাঁর তৈরি। তিনি বদলী হয়ে গেছেন।

—ঋষিকেশ গেলে তো বাঙালীদের সঙ্গে মিশতে পারেন।

—ঋষিকেশের বাঙালী ও আপনাদের মধ্যে তফাৎ অনেক। ওরা এখানে থেকে বাঙালীত্ব হারিয়ে ফেলেছে। আর বাংলার ধুলো এখনও আপনার পায়ে জড়িয়ে আছে। যাক্‌গে কলকাতার কথা বলুন...কলকাতায় নাকি মস্ত মস্ত সব স্কাই-স্ক্র্যাপার উঠছে? ঠিক কথা, বাস্তুহারারা কি এখনও শেয়ালদা স্টেশনে আছেন? রাসবিহারী অ্যাভেন্যুতে নাকি নিয়ন লাইট লাগানো হয়েছে?

কুমার বিস্মিত হয়ে ডাক্তারের দিকে তাকায়। ডাক্তার আবার বলেন—দেখলেন

তো! কি রকম কারেন্ট খবর রাখি। ব্যাপারটা কি জানেন, মাঝে মাঝে আমার কম্পাউন্ডার ওষুধ আনতে দেরাদুন যায়। সে বাংলা কাগজ নিয়ে আসে। বড় ভাল লাগে দাদা বাংলা পড়তে, বাংলার কথা জানতে। আমি বার বার পড়ি। প্রায় মুখস্থ হয়ে যায়।

সহসা একটু হুইসিল বেজে ওঠে। ডাক্তার আঁতকে ওঠেন। তারপরে হতাশ স্বরে বলে ওঠেন—ঐ যা!

হুইসিলটা হল গেট খোলার। অর্থাৎ এবার কুমারের গাড়ি ছাড়বে। তাঁর বাংলায় কথা বলার সময় শেষ হয়ে গেছে। তবু তিনি সামলে নেন নিজেকে। বলেন—চলুন, আপনাকে বাস পর্যন্ত এগিয়ে দিই।

ওরা দুজনে এগিয়ে চলে। বাসের কাছে এসে ডাক্তার হঠাৎ বলে ওঠে—যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলি।

—বেশ তো বলুন।

—কলকাতায় ফিরে যদি 'বাঙালীর ইতিহাস' বইখানা ভি. পি. করে পাঠিয়ে দেন।

—এ আর একটা কঠিন কাজ কি? ফিরে গিয়েই পাঠিয়ে দেব।

—ভারি খুশি হলাম। সকৃতজ্ঞ স্বরে ডাক্তার বলে ওঠেন। তিনি দু'হাত জোড় করে নমস্কার করেন। কুমার প্রতি-নমস্কার করে গিয়ে গাড়িতে ওঠে। গাড়ি ছেড়ে দেয়। ডাক্তার সজল চোখে তাকিয়ে থাকেন। যেন তাঁর কতকালের চেনা আপনজন আজ চিরকালের মতো বিদায় নিল।

মিস্টার ও মিসেস অরোরার চরিত্রে অভিনয় করছেন অশোক মিত্র ও পদ্মাদেবী। আর তাঁদের মেয়ে মুন্নার চরিত্রে ছ'বছরের স্বর্ণালী গাঙ্গুলি। আমাদের দলের কনিষ্ঠতম সদস্যা।

ডাক্তারের চরিত্রে অভিনয় করলেন স্বনামধন্য কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। অপূর্ব অভিনয়। আমি নাট্যকার কিংবা অভিনেতা নই, তবু বলব—হৃদয়বান আধপাগলা প্রবাসী ডাক্তারের আনন্দ ও বেদনাকে তিনি মুহূর্তে জীবন্ত করে তুললেন।

নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী সব কয়টি দৃশ্যই গ্রহণ করা হল। কিন্তু এ প্রসঙ্গে দুটি ঘটনার উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। কত সামান্য জিনিস যে চিত্রগ্রহণ কালে কত বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিতে পারে, তার পরিচয় পেলাম আজ।

কুমার ও অরোরার দৃশ্যটি তোলা হচ্ছিল তখন। স্বাভাবিকভাবেই ভিড় জমে গেছে। পাণ্ডে উৎসাহী দর্শকদের কোনমতে ক্যামেরার পেছনে জমা করেছে। বার বার বুঝিয়ে-সুজিয়ে তাদের কথা-বার্তা বন্ধ করেছে।

এই সময় হঠাৎ কালীবাবুর নজর পড়ে জনৈক দর্শকের দিকে। তার মাথায় একটি কুলু-ক্যাপ। কালীবাবু তার মাথা থেকে টুপিটা খুলে অশোকবাবুর মাথায় পরিয়ে দিলেন। আর আশ্চর্য! টুপিটা অশোকবাবুর ঠিক লেগে গেল। কালীবাবু হীরেনবাবুকে বললেন, "দেখুন তো ক্যারেক্টারটা আরও ইমপ্রুভ করল কিনা?"

হীরেনবাবু মাথা নেড়ে বললেন, "নিশ্চযই। কিন্তু পরে কন্‌টিনিউইটি বজায় রাখব কেমন করে?

"কেন টুপিটা কিনে নিন লোকটার কাছ থেকে।"

হীরেনবাবু আমার ওপরই সেই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করলেন। আমি টুপির মালিকের পাশে এসে দাঁড়ালাম। তাকে হিন্দীতে জিজ্ঞেস করলাম, 'টুপিটা তোমার?"

"জী, হ্যাঁ।"

"কত দিয়ে কিনেছ?"

"এক রুপেয়া।"

পকেট থেকে একটি টাকা বের করে তার দিকে এগিয়ে ধরে বলি, "ঐ টুপিটা আমরা নিয়ে নিচ্ছি, তুমি আর একটা টুপি কিনে নাও।"

"না-না, আমি টোপি বেচব না আর তার দরকারই বা কি। আমি তো রয়েছি এখানে। আপনাদের ছবি তোলা শেষ হলে টোপি ফেরৎ দিয়ে দেবেন।"

সবিনয়ে বললাম, "ভাই, এখানেই তো ছবি তোলা শেষ হচ্ছে না। পথে ছবি তুলতে হবে, কলকাতায় গিয়ে ছবি তুলতে হবে।"

"তা হোক্ গে, এক টাকায় ও টোপি বেচব না আমি।"

সুবিধা বুঝে সে দাম চড়াচ্ছে। কিন্তু আমরা নিরুপায়। তাই পকেট থেকে আর একটি টাকা বের করে বলি, "বেশ এই দু'টাকাই নাও, টুপিটা আমাদের দাও।"

"না, না সাব্, এ আমার সখের টোপি। দু'টাকায় বেচতে পারব না।"

"বেশ তিন টাকা নাও।" আমি আর একটি টাকা বের করি।

"নহী সাব্।" সে সম্মত হয় না। না লোকটা বড়ই চালাক। সে বুঝতে পেরেছে যে-কোন মূল্যে আমরা ওর টুপিটা কিনে নেব। কি আর করি? এবারে চার টাকা বলা যাক্। আমি আবার পকেটে হাত দিই।

"আর টাকা বের কববেন না সাব্।" পাশ থেকে গেটের কনস্টেবল বলে ওঠে। সে এতক্ষণ আমাদের কথোপকথন শুনছিল নিঃশব্দে।

আমি তার দিকে তাকাই। সে টুপির মালিককে বলে, "তুই কি ভেবেছিস বল তো? ঋষিকেশ কি জুলুমেব মুলুক হয়ে গেছে? আমরা সবাই কি মরে গেছি?" একবার থেমে সে আবার বলে, "তোর সরম লাগছে না? সাব্রা আমাদের দেশের ছবি তুলতে এসেছেন। তোর টোপিটার দরকার পড়েছে তাঁদের। আর তুই এক টাকার টোপি তিন টাকায়ও দিতে চাইছিস না।"

লোকটি ভীতকণ্ঠে বলে ওঠে, "না, না সেপাইসাব্ কসুর মাফ করবেন। আমি সাবকে টোপি দেব বৈকি, জরুর দেব।"

"দিয়ে দে তাহলে।" সেপাইজী তাকে আদেশ করেন। তারপরে তিনি আমাকে বলেন, "সাব একে দুটো টাকা দিয়ে দিন। বেশি দেবেন না।"

ইচ্ছে থাকলেও বেশি দিতে পারি না। কারণ ঋষিকেশ এখনও জুলুমের মুলুক হয়ে যায় নি। এবং এখানে দাঁড়িয়ে সেপাইজীর নির্দেশ অমান্য করা সম্ভব নয়। আর দুটি টাকা হাতে নিয়েই টুপিওয়ালা সেলাম করে আমাকে!

দ্বিতীয় ঘটনাটিও ঐ 'কন্‌টিনিউইটি' মানে ধারাবাহিকতাকে কেন্দ্র করেই। ধারাবাহিকতা রক্ষা করা চলচ্চিত্র নির্মাণকালের একটি প্রধান বিষয়। সিনেমা থিয়েটারের মতো নয়। সিনেমায় গল্প অনুযায়ী দৃশ্যগুলি পর পর গ্রহণ করা হয় না। ধরুন একই দৃশ্যের চারটি শট্-এর দুটি আউট-ডোর তোলা হবে দুটি ইন্‌ডোর বা স্টুডিওতে। আর নানা কারণে দৃশ্যগুলি আগে ও পরে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। কাজেই পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে বাচন-ভঙ্গি পর্যন্ত প্রত্যেকটা জিনিসের বিশদ বিবরণ লিখে এবং

স্থিরচিত্রে তুলে রাখতে হয় দৃশ্যগ্রহণের সময়।

আজকের শুটিং-এ প্রথম তোলা হল কুমার ও অরোরার কথোপকথন। তারপরে গেট ছেড়ে দেবার দৃশ্য। অবশেষে কুমার ও ডাক্তারের কথাবার্তা।

কুমার বাস থেকে নেমে দোকান থেকে একগ্লাস চা নিয়ে চুমুক দিতে দিতে হিমালয়ের দৃশ্য দেখছিল। এই সময় অরোরা এলেন ও চলে গেলেন। তারপরে ডাক্তার এলেন। কুমারের হাতে তখনও চায়ের গ্লাস।

এই গ্লাস নিয়েই সমস্যা দেখা দিল। আমরা যেখানে শুটিং করছিলাম, সেখানে সত্যি একটি চায়ের দোকান ছিল। অরোরার সঙ্গে অভিনয় করবার সময় সেই দোকান থেকে এক গ্লাস চা এনে শুভেন্দুকে দেওয়া হয়েছিল। দৃশ্যটি গ্রহণ করা হলে চায়ের গ্লাসটি দোকানদারকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তারপরে আমরা গেটের দৃশ্য নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম। চায়ের দোকানদারের দিকে কারও নজর ছিল না। কিন্তু ডাক্তার ও কুমারের দৃশ্যটা তুলতে গিয়েই হীরেনবাবুর চায়ের গ্লাসের কথা মনে পড়ল। কিন্তু কোথায় গ্লাস? দোকানদার ইতিমধ্যে দোকান গুটিয়ে চলে গেছে। গেট চলে যাবার পরে তার আর কোন খদ্দের হয় না। বিকেলে গেট আসবে। তখন সে আবার এসে দোকান খুলবে।

কিন্তু আমরা এখন কি করি? আধ গ্লাস চা না হলে শুটিং হয় না। গেটরক্ষক পুলিশদের শরণ নেওয়া হল। তাঁরা চা দিতে পারেন কিন্তু ওরকম গ্লাস পাওয়া গেল না। কাছাকাছি এখন কোথাও নাকি চায়ের দোকান খোলা নেই।

অতএব গাড়ি নিয়ে পাণ্ডে ও সুধীরবাবুকে ছুটতে হল ঋষিকেশ। আমরা তাদের পথ চেয়ে বসে রইলাম।

আধঘণ্টা বাদে আধগ্লাস চা নিয়ে তারা ফিরে এল। ঠিকই করেছে। একগ্লাস আনলে আধগ্লাস ফেলে দিয়ে কন্‌টিনিউইটি বজায় রাখতে হত। কারণ আগের দৃশ্যে শুভেন্দু অর্ধেকটা চা খেয়ে ফেলেছিল।

এখন অবশ্য আর খাবার প্রশ্ন ওঠে না। কারণ আসার পথে চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। তা যাক্ গে, এ তো আর খাবার জন্য আনা হয় নি, আনা হয়েছে কন্‌টিনিউইটি বজায় রাখার জন্য।

দেরি হলেও ভালভাবেই এখানকার শুটিং শেষ হল। কালীবাবুর শুটিং শেষ হয়ে গেছে। তিনি কাল সকালে দিল্লী চলে যাবেন। সেখান থেকে কলকাতা।

অশোকবাবুর আজকের মতো কাজ শেষ। শুভাশিসেরও এখনকার মতো ছুটি। কারণ এর পরে যে শুটিং করা হবে, সেটা 'সাইলেন্ট শট্'। ওঁদের সঙ্গে আমিও ফিরে আসি ভরত-মন্দিরে।

এসে দেখি মালা তৈরি হয়ে বসে আছে। এর পরের শট্ নেওয়া হবে গঙ্গার তীরে। মালা ও শুভেন্দুর শুটিং। কুমারের কল্যাণ কামনায় অঞ্জলি গঙ্গায় প্রদীপ ভাসিয়ে দেবে! বলাবাহুল্য ঘটনাটা সন্ধেবেলার, কিন্তু শুটিং করা হচ্ছে দুপুর বেলা। তাই নাকি নিয়ম। বিচিত্র নিয়ম।

যাক্ গে, ট্যাকশি ড্রাইভার মালাকে নিয়ে চলে গেল নতুন লোকেশানে। ইতিমধ্যে সুধীরবাবুর গাড়িতে ওঁরাও এসে যাবেন সেখানে।

শুটিং শেষ করে হীরেনবাবু তাঁর দলবল নিয়ে ফিরে এলেন বেলা প্রায় দুটোর সময়। স্নান সেরে নিয়ে ওঁদের নীলম হোটেল থেকে খেয়ে আসতে চারটে বেজে গেল।

খানিকক্ষণ বিশ্রাম অর্থাৎ আড্ডা দেবার পরে বৈকালী চা খেয়ে আমরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। উদ্দেশ্য শহর দেখা ও কেনা-কাটা। গতকাল এখানে আসার পর থেকে তো হীরেনবাবু কাউকে হাঁফ ছাড়ার সময় দেন নি। শুটিং আর তার আয়োজন করতেই সবার সব সময় কেটে গিয়েছে। আজ রাতে শুটিং নেই। হীরেনবাবু ছাড়া ওঁদের আর কেউ কখনও এমন পথের পথিক হন নি। কাজেই শীত সম্পর্কে সবাই সন্ত্রস্ত। গরম পোশাকের যার যেটুকু বাকি আছে আজ কিনে নিতে হবে। কাল শুটিং করতে যেতে হবে নরেন্দ্রনগর, আগরখাল ও চাম্বা এখান থেকে গঙ্গোত্রীর পথে ৩৯ মাইল। ফিরে আসতে সন্ধ্যা গড়িয়ে যাবে। সারাদিন পরিশ্রমের পরে আর মার্কেটিং করা হয়ে উঠবে না। তার ওপর কাল আবার দলের বাকি সদস্য-সদস্যাদের নিয়ে কার্তিকবাবু এখানে এসে পৌঁছবেন। অতএব কাল আর কেনা-কাটা হয়ে উঠবে না। তাই আজ ওরা বেরিয়ে পড়েছেন পথে—পুণ্যভূমি ঋষিকেশের পথে।

কেবল হীরেনবাবু, শুভেন্দু, মালা ও তার বাবা বেরুতে পারলেন না। হঠাৎ মোহন্ত মহারাজের বাড়ির মেয়েরা আলাপ করতে এলেন। অবশ্য 'হিরোইন' আসে নি শুনে তাঁরা একটু নিরাশ হলেন। তাহলেও মালাকে তাঁদের খুব ভাল লাগল। কিন্তু একে তো মালা এ লাইনে একেবারে নতুন, তার ওপর বয়সে ছোট। কাজেই সামলাবার জন্য নায়ক ও পরিচালককে কাছে থাকতে হল।

আমি বেরিয়েছি বিশুবাবু, দীপক, কালীবাবু ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। ওঁরা পূর্ব পরিচিত। কেবল আমিই নতুন। কিন্তু বিগত চব্বিশ ঘণ্টায় ওঁরা সবাই আমাকে এমন আপন করে নিয়েছেন, যে আমি নিজেই সেই অপরিচয়ের কথা ভুলতে বসেছি। আশ্চর্য একটা আন্তরিকতা ও প্রাণশক্তিতে পরিপূর্ণ এঁদের হৃদয়।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা প্রথমে এলাম গাড়োয়াল মোটর ওনার্স ইউনিয়নের অফিসে। কেদার-বদ্রী ও যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রীর পথে কেবল এঁরাই বাস এবং ট্রাক চালিয়ে থাকেন। গত কয়েক বছর পর্বতাভিযানের প্রয়োজনে ক্রমাগত পত্রবিনিময় করা ও আসা-যাওয়ার ফলে, মোটামুটি আমি এঁদের পরিচিত। তাই অফিসে প্রবেশ করতেই বড়বাবু নমস্কার করে বসতে বললেন।

আসন গ্রহণ করে কালীবাবু ও অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলাম। তারপরে আসার কারণ বললাম—আগামীকাল প্রথম বাসে কুতনৌরের দুখানি আপার ও একখানি লোয়ার টিকেট চাই। পরশু সকালে একটি পুরো বাস চাই। কালীবাবুর দিল্লী যাবার ব্যাপারটাও বললাম তাঁকে।

সব ব্যবস্থা হয়ে যাবার পরে চা খেয়ে আমরা নেমে আসি পথে। কালীবাবু জিজ্ঞেস করেন, "কাল আপনি কাকে নিয়ে কুতনৌর যাচ্ছেন?"

"পাণ্ডে ও একজন কুলি।" উত্তর দিই।

"আপনি আগে যাচ্ছেন কেন?" বৌদি মানে কালীবাবুর স্ত্রী প্রশ্ন করেন।

কালীবাবু হেসে বলেন, "যাবেন না, উনি যে 'অনারারী কন্ট্রোলার অব্

প্রোডাক্‌শান'। ওঁকে আগে গিয়ে সব ব্যবস্থা করে রাখতে হবে না?"

"সত্যি" বৌদি বলেন, "কোন লেখক তাঁর গল্পের ছবির জন্য এমন করেছেন বলে শুনি নি।"

আত্মপ্রশংসায় একটু লজ্জা পাই। তাড়াতাড়ি বলে উঠি, "এমন কি আর করছি। তবে যেটুকু করতে পারছি, তা কিন্তু লেখক হিসেবে করছি না।

"করছি একজন হিমালয় প্রেমিক হিসেবে। আপনারা তো 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় পড়েছেন—'যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী-গোমুখীর পথ ভারতের সুন্দরতম, দীর্ঘতম, ও দুর্গমতম তীর্থপথ। দু'শ সাতান্ন মাইল চড়াই উৎরাই ভেঙে এ পরিক্রমা পূর্ণ করতে হয়েছে। অনেকে বলেন পথকষ্টের জন্যই এ পথে বাঙালী যাত্রীর সংখ্যা সবচেয়ে কম। আমার কিন্তু মনে হয় এ পথের কথা তেমন করে কেউ বাঙালীর কাছে বলে নি বলেই এমনটি হয়েছে।

"তারপর থেকেই এ-পথে বাঙালী যাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে। এবং বলতে গৌরব বোধ করছি যে বাঙালী যাত্রীরা প্রায় প্রত্যেকেই এই বই পড়ে এ-পথে এসেছেন।

"আমার আশা, এই ছবি মুক্তি পাবার পরে যেমন এ-পথের জনপ্রিয়তা কয়েক গুণ বেড়ে যাবে, তেমনি হিমালয় আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠবে। তাই আমি ওঁদের সাধ্যমত সাহায্য করছি।"

রাত প্রায় ন'টা নাগাদ আমরা ফিরে এলাম অতিথিশালায়, আর এসেই দেখি শর্মাজী বসে আছেন। শর্মা মানে শ্রী কে. পি. শর্মা। তিনি একজন প্রখ্যাত পর্বতারোহী। আমাদের পুরনো বন্ধু। দীর্ঘকাল দার্জিলিং হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইন্‌স্টিটিউটে ইকুইপমেন্ট অফিসার ছিলেন। গত কয়েক বছর যাবৎ উত্তরকাশীর নেহরু ইনসিটিউট অব্ মাউন্টেনিয়ারিংয়ের রেজিস্ট্রার। সেদিন উত্তরকাশীতে দেখা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। বলেছিলেন, আজ দেরাদুনে যাবার পথে এখানে দেখা করবেন আমার সঙ্গে। কিন্তু কথাটা বেমালুম ভুলে গেছি। না জানি কতক্ষণ থেকে এসে বসে আছেন। ভারি অন্যায় হয়েছে।

ভেতরে ঢুকে সেই কথাই বলি তাঁকে। তিনি হীরেনবাবু ও শুভেন্দুকে দেখিয়ে বলেন, "কিন্তু ওঁরা যে আমাকে আপনার অনুপস্থিতি একদম বুঝতে দেন নি।"

কথায় কথায় শর্মাজী বলেন, "অমূল্য আসে নি, কিন্তু তার দলের কয়েকটি ছেলে আজ উত্তরকাশী এসেছে। তারা বলল, মালপত্র সহ আগামীকাল অমূল্য উত্তরকাশী পৌঁছবে। আমি সব ব্যবস্থা করে এসেছি, পরশু সকালের প্রথম বাসে অমূল্য সাজ-সরঞ্জাম ও চারজন হাই অলটিচ্যুড পোর্টার নিয়ে বারকোট রওনা হবে। ঠিক কথা, স্লিপিং ব্যাগ এবং ফেদার জ্যাকেটগুলো কিন্তু ধোবার সময় পাওয়া গেল না।"

"ঠিক আছে। ওতেই চলে যাবে." আমি বলি।

শর্মাজী বলেন, "না, এক্‌সপিডিশান থেকে আসছে তো, খুবই নোংরা হয়ে যাবে। কিন্তু কি করব বলুন, ওরা বড্ড দেরি করে ফেলল। দুটো দিন সময় পেলেই ধুয়ে দিতে পারতাম?"

"আপনি চিন্তা করবেন না। আমরা ঠিক কাজ চালিয়ে নেব। এবার বলুন, যমুনোত্রীর পথে কার কার কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে?"

"কি ব্যাপারে?" শর্মাজী জিজ্ঞেস করেন।

"এই ধরুন, কুলি, খচ্চর ও ডাণ্ডিওয়ালার জন্য।"

একটু ভেবে নিয়ে শর্মাজী বলে ওঠেন, "ঠিক কথা, আমাদের প্রাক্তন ইনস্ট্রাকটার কুন্দন সিং ফুলচটিতে রয়েছে। আপনি তো তাকে চেনেন।"

"কুন্দন সিং।" আমি মনে করবার চেষ্টা করি।

শর্মাজী বলেন, "আরে সেই যে, আপনাদের কেদারনাথ পর্বত এক্সপিডিশানের সময় নন্দনবনে গিয়েছিল। আপনাকে বলেছিল, "ভাইস প্রিন্সিপ্যাল পারমিশান দিলে সে তখুনি শিবলিঙ্গ শিখরে আরোহণ করতে পারে।"

হ্যাঁ, কথাটা মনে পড়ে আমার।

শর্মাজী আবার বলেন, "এখন বিয়ে করে ঘরজামাই হয়েছে। শ্বশুরের পয়সায় ঘোড়া কিনে ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা করছে। ছেলেটা খুবই কাজের। তাকে যদি একটু সিনেমায় নামার সুযোগ দেন, তাহলে আর দেখতে হবে না।"

"নিশ্চয়ই দেব," হীরেনবাবু মাঝখান থেকে বলে ওঠেন, "আমার তো, ডাণ্ডিয়ালার একটা রোল রয়েছেই।"

"ব্যস! সেটাই দিয়ে দেবেন ওকে, দেখবেন সে যোগ্যতার সঙ্গে ট্রান্সপোর্ট অফিসারের দায়িত্ব পালন করবে।"

তিন

ভোর চারটের সময় চৌকিদার ঘুম ভাঙিয়ে দিল। তৈরি হয়ে নিতে ঘণ্টাখানেক লাগল। পাঁচটার একটু পরে পাণ্ডে ও দিল্ বাহাদুরকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে। হীরেনবাবু এগিয়ে দিলেন সদর দরজা পর্যন্ত। কি কি করা দরকার আর একবার সংক্ষেপে আলোচনা করে নিলাম তাঁর সঙ্গে। তারপরে এগিয়ে চললাম বাসস্ট্যান্ডের দিকে।

পাণ্ডের কথা আগেই বলেছি। বলিষ্ঠকায় সুপুরুষ যুবক। হিন্দীর এম. এ. এবং সাহিত্যরত্ন কিন্তু চমৎকার বাংলা লিখতে-পড়তে জানে। শ্রী অজয় কর সহ বহু বিশিষ্ট পরিচালকের সহকারী রূপে কাজ করেছে। এটাই প্রধান পেশা। দ্বিতীয় পেশা প্রাইভেট ট্যুশনি। তার নেশা কবিতা লেখা।

শ্রীমান্ দিল বাহাদুর আমার 'রিক্রুট'।

হীরেনবাবু আমাকে জন ছয়েক ভাল কুলি যোগাড় করতে বলেছিলেন। তারা সারা পথের সঙ্গে থাকবে। যন্ত্রপাতি বইবে এবং রান্না থেকে শুরু করে পথ চলা পর্যন্ত সর্বপ্রকারে আমাদের সাহায্য করবে। সেদিন উত্তরকাশী থেকে আমি তাই দুজন নেপালী কুলি নিয়ে এসেছি। দিল বাহাদুর তাদেরই একজন। বাকি চারজন যোগাড় করবে অমূল্য।

কিন্তু দিল বাহাদুরের আরেকটু পরিচয় আছে। সে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে সর্বদা ফিট-ফাট থাকে, যেটি ওদের মধ্যে প্রায়ই পাওয়া যায় না।

বাসস্ট্যান্ডে এসে শুনলাম এখনও আমাদের বাস আসে নি, অতএব একটা চায়ের দোকানে এসে বসি। ভুটিয়া মেয়েরা সোয়েটার বিক্রি করছে। পাণ্ডে তাদের একজনকে ডেকে দরদস্তুর শুরু করে দিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই কিনল না।

একটু পরেই বাস এল। তাড়াতাড়ি উঠে পাণ্ডে ড্রাইভারের বাঁ পাশের সিঙ্গল সীটটি দখল করে নিল। ওখান থেকে সবচেয়ে ভাল দেখা যাবে।

একজন গেরুয়াধারী সোজা উঠে আসেন বাসে। এসে দাঁড়ান আমার সামনে। ছোট-খাটো মানুষটি—ক্ষীণ দেহ। মাথায় এক রাশ চুল। মুখে কাঁচা-পাকা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। পরনে বহির্বাস, গায়ে একখানি ছিন্ন নামাবলী।

সহসা বিশুদ্ধ বাংলায় প্রশ্ন করেন, "তুই কোথা থেকে এসেছিস?"

আশ্চর্য হলেও উত্তর দিই, "কলকাতা থেকে।"

"কোথায় চলেছিস, যমুনোত্রী?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ভাল, যা দেখে আয়, বড় ভাল জায়গা।" একবার থামেন তিনি। তারপরে বলেন, "আমাকে কিছু দিয়ে যা।"

পকেট থেকে একটি টাকা বের করে তাঁর হাতে দিতেই, আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন তিনি। সস্নেহ স্বরে আশীর্বাদ করেন, "মা-যমুনা তোর যাত্রা সফল করবেন। মা-গঙ্গা তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।"

দু'হাত জড়ো করে আমি তাঁকে নমস্কার করি। তিনি বারবার ঐ একই আশীর্বাদ করতে করতে বাস থেকে নেমে যান। আমি তাকিয়ে থাকি তাঁর দিকে। জানি না তিনি কেমন সাধু কিংবা সত্যিকারের সন্ন্যাসী কিনা! এমনও হতে পারে যে রোজগারের জন্য তিনি গেরুয়া ধারণ করেছেন। কিন্তু তাহলেও জানি তাঁর আশীর্বাদ বিফল হবে না।

সওয়া ছ'টার সময় বাস ছাড়ল। আবার সেই পথ। আমার অতি পরিচিত পথ। তবে এবারে আমার সাথীরা প্রায় সবাই এপথে অপরিচিত। দুর্গম পথ দুঃখ-কষ্টের পথ। অনভিজ্ঞ ও অপরিচিতদের সঙ্গে অনেকগুলি দিন আমাকে কাটাতে হবে এই পথে। স্বভাবতই নানা ভয় ও ভাবনা এসে মনকে আচ্ছন্ন করে তুলতে চাইছে।

তাড়াতাড়ি বাইরের দিকে তাকাই। দূরে হিমালয়ের সীমাহীন আঁকাবাঁকা রেখা। আমি শিবালয় হিমালয় চলেছি। ভরসা আছে তাঁর অসীম করুণায় আমার সব ভয় কেটে যাবে, ভাবনা দূর হবে। মনে মনে প্রণাম করি দেবতাত্মা হিমালয়কে।

সকাল সাতটায় নরেন্দ্রনগর পৌঁছন গেল। বাজারের সামনে এসে বাস থামল। নেহাতই যাত্রীদের ওঠা-নামার জন্য এই যাত্রা-বিরতি। আগে কিন্তু গেটের জন্য প্রত্যেক গাড়িকে থামতেই হত এখানে। তাই বাস থেকে তাড়াতাড়ি পথে নেমে আসি। নরেন্দ্রনগরের নানা স্মৃতি যে নাড়া দিচ্ছে আমার মনকে। মনে পড়ছে বিজয়লাল ও সুতারুর কথা আর সেই সহৃদয় বাঙালী ডাক্তারের কথা। গতকাল কালীবাবু তাঁর অনবদ্য অভিনয়ের ভেতর দিয়ে যাকে রূপদান করলেন।

মনে পড়ছে ১৯৬৭ সালের কেদারনাথ পর্বতাভিযানের কথা। সেবারে ধস নেমে এখানে পথের খানিকটা ভেঙে গিয়েছিল। অনেক কষ্টে রিজার্ভড্ বাস দু'খানিকে ঋষিকেশ থেকে এখানে নিয়ে আসতে পেরেছিলাম আমরা। সেদিন এখানে আসতে পেরে আমাদের সে কি আনন্দ!

বাস এগিয়ে চলেছে। সেই পরিচিত পথ আর পরিচিত দৃশ্য। পাহাড়ের পাশ দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ; নিচে দুন উপত্যকা। ঋষিকেশ ক্রমেই দূরে সরে চলে যাচ্ছে।

পৌনে আটটায় বাস আগরখাল এল। আমরা ঋষিকেশ থেকে বিশ ও নরেন্দ্রনগর থেকে দশ মাইল এলাম। হীরেনবাবু আজ দলবল নিয়ে শুটিং করতে আসবেন এই

পথে। শুটিং শেষে আবার ফিরে যাবেন ঋষিকেশ।

এই বাড়তি হাঙ্গামাটুকুর কোন প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু অনিবার্য কারণে সেই শুটিং অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। 'বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা'য় কার্ল উল্‌রিখ নামে জনৈক জার্মানের একটি চরিত্র আছে। এইচ. ও লেহ্‌ম্যান নামে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক জার্মান অধ্যাপক এই চরিত্রে অভিনয় করেছেন। বহু লেখালেখি করেও আমরা তাঁকে নিয়ে যমুনোত্রী যাবার অনুমতি পাই নি। কারণ কোন বিদেশী উত্তরকাশী জেলায় অর্থাৎ নাগুনের ওপাশে যেতে পারেন না। কাজেই তাঁর শুটিংটা আজ নরেন্দ্রনগর আগরখাল ও চাম্বায় বসে সেরে নিতে হচ্ছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও হীরেনবাবুকে আজ এ কাজ করতে হচ্ছে। এই ছবিতে অভিনেতা নির্বাচন ও দৃশ্য গ্রহণের ব্যাপারে কোন রকম চাতুরী করার তিনি ঘোরতর বিরোধী। তাই বইতে পাত্র-পাত্রীর যে বয়স ও চেহারার বর্ণনা আছে, তিনি তার সঙ্গে মিলিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন করেছেন। যে বহির্দৃশ্যটি যেখানকার, সেই দৃশ্যটি সেখানেই গ্রহণ করা সাব্যস্ত করেছেন। তাই তিনি জার্মান কার্লের চরিত্রে পূর্ব-জার্মানীর একজন যুবক শিক্ষাবিদকে নির্বাচিত করেছেন। কিন্তু আমরা সে ভদ্রলোককে যমুনোত্রী নিয়ে যাবার অনুমতি পাই নি। যমুনোত্রী কোন সীমান্ত নয়। যেহেতু যমুনোত্রী উত্তরকাশী জেলায় অবস্থিত এবং যেহেতু এটি সীমান্ত জেলা, সেইহেতু বিদেশী লেহ্‌ম্যান যমুনোত্রী যাবার অনুমতি পেলেন না। কি বিচিত্র অর্থহীন বিধান!

বেলা সাড়ে আটটার সময় ৩৯ মাইল পথ পেরিয়ে নাগনী এসে বাস থামল। তাড়াতাড়ি নেমে পড়ি। কেদারনাথ পর্বতাভিযানের সঙ্গে এখানকার স্মৃতি অক্ষয় হয়ে জড়িয়ে আছে। সেবারে ঋষিকেশ থেকে এখানে আসতেই সারাদিন কেটে গিয়েছিল। পথে ধস নেমেছিল। ঘণ্টা দশেক চেষ্টার পরে সেই ধস পরিষ্কার করে সন্ধ্যার সময়ে কোন মতে বাস দু'খানিকে নিয়ে এসেছিলাম এখানে। বড় আশা ছিল সেদিন অন্তত টিহ্‌রী পর্যন্ত যেতে পারব। টিহ্‌রী বড় শহর। রাত্রিবাসটা সুখের হবে।

কিন্তু হায়, এখানে এসে দেখি গেট বন্ধ। হাবিলদার সাহেবকে বহু অনুরোধ করেও গেট খোলানো গেল না। ফলে এই বাজার থেকে ফুলকা আর ডাল খেয়ে প্রায় মাইল খানেক বনপথ পেরিয়ে 'ফরেস্ট হাট'-এ গিয়ে রাত্রিবাস করেছিলাম।

কষ্ট হয়েছিল, সময় নষ্ট হয়েছিল, কিন্তু আনন্দ পেয়েছিলাম প্রচুর। আর তাই তিন বছর আগের সে স্মৃতি আজও আমার মানসপটে এমন উজ্জ্বল হয়ে আছে।

নাগনী থেকে পনেরো মিনিটে পাঁচ মাইল একটানা চড়াই ভেঙে উঠে এলাম চাম্বা। জায়গাটি একটি পর্বতচূড়া—উচ্চতা ৫৪০০ ফুট। আজ আকাশ পরিষ্কার। কাজেই কেদারনাথ শৃঙ্গ চমৎকার দেখা যাচ্ছে। ২২,৭৭০ ফুট উঁচু ঐ শিখরে আরোহণ করবার জন্য আয়োজিত হয়েছিল আমাদের সেবারকার অভিযান। প্রবল তুষারঝঞ্ঝার জন্য শিখরের মাত্র ৯৭০ ফুট নিচ থেকে অভিযাত্রী সুজয় মুখোপাধ্যায় ও প্রাণেশ চক্রবর্তীকে নেমে আসতে হয়েছিল। তাই বলে আমাদের সে অভিযান ব্যর্থ হয় নি। ওদের শিখরাভিযানের তিন দিন আগে নেতা অমূল্য সেন ও করুণাময় দাস কেদারনাথ ডোম (২২,৪১০) শীর্ষে ভারতের জাতীয় পতাকা প্রোথিত করেছিল। তার আগে আর কোন ভারতীয় অভিযাত্রীদল কেদারনাথ ডোমে আরোহণ করতে পারেন নি।

এখান থেকে কিন্তু কেবল কেদারনাথ শৃঙ্গটি দেখা যাচ্ছে। ডোম রয়েছে শৃঙ্গের পেছনে অর্থাৎ গঙ্গোত্রী হিমবাহের দিকে। যে হিমবাহ অঞ্চলে তুষার বিগলিত ধারা থেকে সৃষ্ট হয়েছে ভাগীরথী এবং যে ভাগীরথীর উৎসকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী যমুনা'।

চাম্বা এপথের একটি জংশন স্টেশন। ঋষিকেশ টিহ্‌রী ও মুসৌরীর পথ এসে মিলিত হয়েছে এখানে। মুসৌরী এখান থেকে মাত্র ৩৮ মাইল।

বেলা ১১টার সময় আমাদের বাস টিহ্‌রী পৌঁছুল। এখানে বাস আধঘণ্টা দাঁড়াবে। কাজেই পাণ্ডেকে নিয়ে নেমে এলাম পথে। টিহ্‌রী আমার পরিচিত শহর। ১৯৬৮ সালে 'সতপন্থ' (২৩,২১৩) ও 'রাধানাথ' (২১,৭১০) পর্বতাভিযান শেষে ফেরার পথে আমরা এখানে রাত কাটিয়েছি।*

প্রাক্তন দেশীয় রাজ্য টিহ্‌রী গাড়োয়ালের প্রাচীন রাজধানী ছিল এই শহর। ভারত স্বাধীন হবার কিছুকাল আগে অবশ্য রাজধানী নরেন্দ্রনগরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ঘৃত, ভীলগঙ্গা ও ভাগীরথীর সঙ্গমে অবস্থিত এই শহর। টিহ্‌রী ভাগীরথীর বৃহত্তম উপত্যকা। এখান থেকে একটি পথ চলে গেছে শ্রীনগর। যাঁরা একসঙ্গে যমুনোত্রী-গঙ্গোত্রী ও কেদার-বদ্রী দর্শন করতে চান, তারা গঙ্গোত্রী থেকে এখানে এসে সোজা শ্রীনগর চলে যান। সেকালে শ্রীনগর ছিল ব্রিটিশ গাড়োয়ালের জেলা সদর। তখন কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ এই জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আগেই বলেছি টিহ্‌রী সুবিশাল ও সমতল উপত্যকা। উচ্চতা মাত্র ১৭০০ ফুট। কিন্তু টিহ্‌রী কেবল সমতলই নয় শস্যশ্যামলও বটে। তাই টিহ্‌রী নিয়ে যুগে যুগে এত যুদ্ধ-বিগ্রহ। কিন্তু সে-সব কথা বলা হয়েছে 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা'য়। কাজেই যুদ্ধের কথা থাক্, যাত্রীদের কথাই বলা যাক্।

টিহ্‌রী ঋষিকেশ থেকে ৫০ মাইল। আর এখান থেকে শ্রীনগরের দূরত্বও প্রায় তাই। গঙ্গোত্রীর যাত্রীরা এখান থেকে যে সময়ে ঋষিকেশ ফিরে যাবেন, সেই সময়ে তাঁরা অনায়াসে চলে যাবেন শ্রীনগর। অর্থাৎ তাঁরা কেদার-বদ্রীর পথে ঋষিকেশ থেকে ৬৭ মাইল এগিয়ে যাবেন। শ্রীনগর থেকে রুদ্রপ্রয়াগ মাত্র ২১ মাইল। আর সেখান থেকে কেদারনাথ ও বদ্রীনাথ যথাক্রমে ৫৮ ও ৯৭ মাইল। এখন কেদার-বদ্রী যাত্রীদের কেবল কেদারনাথের পথে গৌরীকুণ্ড থেকে মাত্র ৯ মাইল পথ হাঁটতে হয়।

গাড়োয়ালের প্রধান তিনটি নদী ভাগীরথী, অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর মিলিতধারাই গঙ্গা। একটু আগেই বলেছি, ঘৃত ও ভীলগঙ্গা টিহ্‌রীতে এসে মিলিত হয়েছে ভাগীরথীর সঙ্গে। তারপরে ভাগীরথী প্রবাহিত হয়েছে দক্ষিণ-পূর্বে। দেবপ্রয়াগে গিয়ে মিশেছে মন্দাকিনী ও অলকানন্দার মিলিত ধারার সঙ্গে। সেই মিলিত ধারাই গঙ্গা অর্থাৎ গঙ্গার জন্মভূমি দেবপ্রয়াগ, গোমুখী নয়। তাহলেও গঙ্গার জন্মভূমি বলতে সাধারণত গোমুখীকেই বোঝায়। সেই গোমুখীতে চলেছি আমরা। চলেছি ছবি তুলতে।

কিন্তু ছবির কথা নয়, পথের কথা বলা যাক্। গোমুখীর নয়, যমুনোত্রীর পথ। এখনও অবশ্য দুটি পথ একই রয়েছে। ধরাসুর পর থেকে পথ পৃথক হবে।

---

* 'চতুরঙ্গীর অঙ্গনে' দ্রষ্টব্য।

ভাগীরথীর দু'তীরেই টিহরী উপত্যকা। কিন্তু টিহরী শহর হল অপর তীরে অর্থাৎ নদীর বাঁ তীরে। পুল পেরিয়ে শহরে এসেছিলাম, আবার পুল পেরিয়ে ফিরে চলেছি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলাম আগের জায়গায় অর্থাৎ ঋষিকেশ টিহরী ও ধরাসুর পথের সঙ্গমে। তারপরে সমতল উপত্যকার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললাম উত্তর-পশ্চিমে। দু'পাশেই শস্যক্ষেত্র। বাঁয়ে ক্ষেতের পরে পাহাড়। ঐ পর্বতশ্রেণী পেরিয়ে আমরা ঋষিকেশ থেকে এখানে এসেছি। ডাইনে ক্ষেতের পরে নদী—ভাগীরথী। নদীর ওপারেও ক্ষেত। ভাগীরথীর পাশে পাশে পথ চলেছি। আমরা যে গঙ্গা-যমুনার দেশে এসেছি—এসেছি তাদের আপন দেশে।

সোয়া বারোটা নাগাদ ভলদিয়ান এলাম। ভলদিয়ান টিহরী থেকে ১২ মাইল। ছোট বাজার কিন্তু আমিষাশী যাত্রীদের কাছে বড়ই প্রিয়। এখানে খুব সস্তায় বেশ বড় বড় ট্রাউটমাছ ভাজা পাওয়া যায়।

আধঘণ্টা বাদে নাগুন পৌঁছলাম। ছোট জায়গা কিন্তু একটি কারণে উল্লেখযোগ্য। এখান থেকেই উত্তরকাশী জেলা আরম্ভ হল। নাগুন ঋষিকেশ থেকে ৭৭ মাইল এবং এখান থেকে ধরাসু ও উত্তরকাশী যথাক্রমে ৫ ও ২৩ মাইল।

নাগুন থেকে বাস ছাড়ার মিনিট দশেকের মধ্যেই ধরাসু এলাম। সেই খুর্সোলা বা মূলগঙ্গা ও ভাগীরথীর সঙ্গমে অবস্থিত সেকালের সুবিখ্যাত স্থান। এখানে এসেই গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীর যাত্রীরা পায়ে-চলা পথে যাত্রা করতেন। ধরাসু ছিল বাসপথের প্রান্তসীমা। স্বভাবতই সর্বদা গমগম করত। যাত্রীর ভিড়ে ভরে থাকত ধর্মশালা। স্থানাভাবে যাত্রীরা মূলগঙ্গা ও ভাগীরথীর বেলাভূমিতে চট আর কাপড় টাঙিয়ে অস্থায়ী আবাস বানিয়ে রাত্রিবাস করতেন।

প্রবল বাতাস আর দুঃসহ শীতকে উপেক্ষা করে ধর্মশালার উঠোনে বসে তাঁরা পাঠ শুনতেন। দলনেতা জীর্ণ তুলট কাগজের একখানি বই মেলে বলতে থাকতেন—"রাজা রোহিত বেরিয়েছিলেন বিশ্বের মুক্তিপথে। বহুকাল তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন পথে পথে। তারপরে একদিন ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে যখন ঘরের দিকে পা বাড়িয়েছেন, তখন দেবতা ব্রাহ্মণের বেশে এসে তাকে বাধা দিয়ে বললেন—

'চরণ্ বৈ মধু বিন্দতি চরণ্ স্বাদুমৃদুস্বরম্ ।
সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রয়তে চরণ ॥
চরৈবেতি চরৈবেতি—'

চলাটাই তো পরম মধু। চলাই তো স্বাদু ফল। চেয়ে দেখ সূর্যের কি অতুলনীয় আলোক-ঐশ্বর্য। চলতে আরম্ভ করে সদাই সে জেগে আছে। কখনই ঘুমিয়ে পড়ছে না। অতএব হে রাজা! গৃহপথ প্রত্যাশী না হয়ে চল, এগিয়ে চল।"

এই দৃশ্যটিকে হীরেনবাবু চিত্রনাট্যে রেখেছেন। দলনেতা সন্ন্যাসীর চরিত্রে অভিনয় করছেন স্বনামধন্য শিল্পী সবিতাব্রত দত্ত। সম্পূর্ণ শ্লোকটিকে সঙ্গীত রূপ দেওয়া হয়েছে। সঙ্গীত পরিচালক পঙ্কজকুমার মল্লিক গেয়েছেন গানখানি।

কিন্তু সে শুটিং এখানে করা হবে না, করা হবে যমুনা চটিতে। কারণ এখন বাসপথ এগিয়ে গেছে কুতনৌর পর্যন্ত। কুতনৌর থেকে যমুনা চটি মাত্র দেড় মাইল।

ধরাসু আজ তাই অবহেলিত—পরিত্যক্ত। সেদিনকার সেই জনপ্রিয় ধর্মশালার

সামান্য একটা অংশই কেবল কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে সেকালের সাক্ষীরূপে। এই ভগ্নাংশটুকু এখন আর পুণ্যার্থীর পরমাশ্রয় নয়, গরু-ভেড়ার খোঁয়াড়ে পরিণত। যাত্রীরা ভুলেও আর তার দিকে ফিরে তাকায় না। তবু আমি অপলক নয়নে তাকিয়ে রয়েছি ঐ ভগ্নপ্রায় ধর্মশালার দিকে। তাকে ঘিরে যে অসংখ্য স্মৃতি—'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা'র অনেক কাহিনী।

চার

বাস মূলগঙ্গার পুল পেরিয়ে এল। টিহ্‌রীতে দেখা হয়েছে ভাগীরথীর সঙ্গে। সেই থেকে সঙ্গে রয়েছে সে। ভাগীরথীর তীর দিয়ে এগিয়ে চলেছে বাস। ডানদিকে ভাগীরথীর বাঁ-দিকে পাহাড়। এই পাহাড়ের ওপরে উঠতে হবে আমাদের।

কয়েক মিনিট বাদেই পথ পরিবর্তিত হল। মূল-পথটি চলে গেল ভাগীরথীর তীর দিয়ে উত্তরকাশী অর্থাৎ গঙ্গোত্রীর দিকে। আমাদের বাস বাঁয়ে বাঁক নিয়ে পাহাড়ে উঠতে শুরু করল। বেশ কয়েকদিন আর ভাগীরথীর সঙ্গে দেখা হবে না। যমুনোত্রী থেকে উত্তরকাশী যাবার সময় এখানে এসে আবার মিলিত হব তার সঙ্গে। এখন আমরা চলেছি যমুনার দেশে। চলেছি গিরিতীর্থ যমুনোত্রীতে।

অনেকটা ওপরে উঠে এসেছি। নিচে ধরাসুকে ছবির মতো মনে হচ্ছে। ভারি সুন্দর লাগছে। দু'দিক থেকে এসে ভাগীরথী ও মূলগঙ্গা মিলেছে ওখানে—সেই ভগ্ন-প্রায় ধর্মশালার সামনে।

মিনিট বিশেক বাদে আমরা কল্যাণী এলাম। ধরাসু থেকে বাসপথে ৬ মাইল। বাস থামল না। পাহাড়ী পথ বেয়ে চলল এগিয়ে। ধরাসু থেকে ১১ মাইল এসে গেঁওলাতে বাস থামল। জায়গাটা বেশ জম-জমাট। পথের দু'পাশে খানিকটা সমতল জায়গা, তাতে দোকানপাট। ডানদিকে নিচু পাহাড়ের গায়ে বাড়ি-ঘর ও ক্ষেত-খামার। চারদিকে পাহাড়। কোনটির মাথায় পাইনবন আবার কোনটির গায়ে ধাপে ধাপে ক্ষেত। পাশেই বয়ে চলেছে ছোট নদী হীরা—হীরার মতোই উজ্জ্বল তার ধবলধারা।

আট-দশটি দোকান আর দশ-পনেরোটি বাড়ি নিয়ে গেঁওলা বাজার মানে এই বাসস্ট্যান্ড। দোকানে দোকানে রেডিও চলছে। সামনেই পুলিশ ফাঁড়ি। অর্থাৎ নাগরিক সভ্যতার সবকিছু রয়েছে এখানে। রেস্তোরাঁ, রেডিও আর পুলিশ না থাকলে যে জনপদ হয় না আজকাল।

আমরা ঋষিকেশ থেকে ৮৩ মাইল এসেছি। সময় লেগেছে সাতঘণ্টার মতো।

পাঁচ মাইল পথ পেরিয়ে বাস সিলিকিয়ারী পৌঁছল। স্থানীয় লোকেরা কিন্তু বলছে সিলিকিয়ারা। সেকালে ধরাসু থেকে হাঁটা শুরু করে যমুনোত্রী যাত্রীদের এখানে এসে প্রথম রাত কাটাতে হত। পথ অবশ্য ছিল নিচু দিয়ে মূলগঙ্গার কূল ঘেঁষে। সেই পথে সিলকিয়ারীর দূরত্ব ছিল ৯/১০ মাইল। আর এখন ১৬ মাইল । বাসপথ এসেছে অনেকটা ঘুরে—পাহাড়ের ওপর দিয়ে।

পথ পরিবর্তিত হয়েছে। সেই সঙ্গে পথিকদের কাছেও সিলকিয়ারীর প্রয়োজন ফুরিয়েছে। কিন্তু জায়গাটা এখনও তেমনি সুন্দর। ৫৪০০ ফুট উঁচু ক্ষুদ্র জনপদটি আজও তেমনি মনোরম। তেমনি তাকে ঘিরে পাইন বনের সমারোহ আর তাদের শাখায় শাখায়

পাখিদের কাকলি।

পথের পাশে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে একদল ছেলে-মেয়ে আমাদের অভিনন্দিত করছে। চলন্ত বাসের জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমরা তাদের অভিনন্দনে সাড়া দিচ্ছি। আমরা যে ওদের দেশে এসেছি—এসেছি গঙ্গা-যমুনার দেশে।

বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল, এই মোটর পথ তৈরি হয়েছে, কিন্তু এখনও পথের স্থায়িত্ব আসে নি। বর্ষার ঢলে পথে ভাঙন ধরেছে। তাই ভাঙা পথ জোড়া দেবার চেষ্টা চলেছে অবিরত। ফলে দুর্গমপথ দুর্গমতর হয়ে উঠেছে।

তারই ওপর দিয়ে অক্লেশে বাস নিয়ে চলেছেন আমাদের বাহাদুর পাইলট। পাণ্ডের সঙ্গে বেশ জমে উঠেছে তাঁর। পথের দিকে নজর রেখেও তিনি পাণ্ডের প্রত্যেক প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন।

চড়াই শুরু হল। পাইন বনে ছাওয়া চড়াই। দু'দিকেই পাইনের সারি। শুধু বনের বিস্তার সীমাহীন নয়, সীমাহীন সৌন্দর্য বিস্তার করে দাঁড়িয়ে আছে তারা। বনময় হিমালয় সর্বত্রই সুন্দর। কিন্তু এমন সৌন্দর্য হিমালয়েও সচরাচর চোখে পড়ে।

একসময় চড়াই পথ ফুরিয়ে গেল। আমরা রাঢ়ী (৭২০০´) পৌঁছলাম। রাঢ়ী এই বাসপথের উচ্চতম স্থান। রাঢ়ীর পরে শুরু হল নেমে যাবার পালা। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে পাইলট বাস ছুটিয়ে নিয়ে চলেছেন। পাণ্ডে পুলকিত।

বিকেল চারটের সময় আমাদের বাস বারকোট পৌঁছল। বারকোট উত্তরকাশী জেলার মহকুমা শহর। হাসপাতাল-স্কুল-ডাকবাংলো-বাজার-পোস্ট অফিস প্রভৃতি সবই রয়েছে এখানে। এখান থেকে উত্তরকাশী ৫৪ মাইল। আমরা ঋষিকেশ থেকে ১১৫ মাইল এসেছি। দশ ঘণ্টার মতো সময় লেগেছে।

বাস প্রায় খালি হয়ে গেল এখানে। কয়েকজন নতুন যাত্রী অবশ্য উঠলেন! কিন্তু তাঁদের সংখ্যা সামান্য। নতুন যাত্রীদের অধিকাংশই উত্তরকাশী থেকে এসেছেন। দৈনিক দু'বেলা দু'খানি করে বাস যাতায়াত করে উত্তরকাশী ও বারকোটের মধ্যে। কিন্তু বারকোট থেকে কুতনৌর যাবার মাত্র এই একখানি বাস সারা দিনে। এই বাস আজ রাতে কুতনৌর থাকবে। কাল সকালে কুতনৌর থেকে ঋষিকেশ যাবার পথে আবার আসবে এখানে। ব্যস, সারাদিনে আর কোন বাস নেই। কুতনৌর থেকে ঋষিকেশ কিংবা উত্তরকাশী যাবার পথে প্রত্যেক গাড়িকে বারকোট এসে পুলিশের অনুমতিপত্র নিতে হয়। আর এজন্য তাদের মাইল দুয়েক পথ বাড়তি পাড়ি দিতে হয়। বাসস্ট্যান্ড থেকে মাইলখানেক আগে, মূলপথ থেকে বেরিয়ে গেছে কুতনৌরের পথ।

বারকোট থেকে আরেকটি বাসপথ গিয়েছে পুরৌলা—রমণীয় তমসা উপত্যকার প্রবেশ তোরণ, রূপতীর্থ হরকিদুনের সিংহদ্বার। *

বারকোট বড় জায়গা, মালপত্র ওঠা-নামা করতে সময় লাগবে। এই ফাঁকে আর এক গ্লাস চা খেয়ে নিলে মন্দ হত না। পাণ্ডেও সমর্থন করে আমাকে। অতএব পথের পাশের চায়ের দোকানের দিকে এগিয়ে চলি।

"সাব আপলোগ যমুনোত্রী যায়েঙ্গে?"

---

* 'তমসার তীরে তীরে' দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন শুনে পেছনে তাকাই। দেখি একজন স্বাস্থ্যবান নেপালী। সে-ই প্রশ্ন করছে। কিন্তু উত্তর দেবার সুযোগ পাই না। দিল বাহাদুর দেশওয়ালী আদমী পেয়ে নিজের ভাষায় কি যেন বলছে তাকে। সে ইশারা করে দেখিয়ে দেয় আমাকে। লোকটি আরও কাছে এগিয়ে এসে হিন্দীতে বলে, "সাব, শুনলাম আপনাদের কুলির দরকার। আমাকে সঙ্গে নিন। আমি আট বছর এখানে আছি। হামেশাই যমুনোত্রী যাচ্ছি। এ অঞ্চলের সবকিছু আমার জানা।"

কুলির প্রয়োজন রয়েছে আমাদের। তাছাড়া এ অঞ্চলের সঙ্গে পরিচিত লোকের প্রয়োজন আরও বেশি। কাজেই পাণ্ডেকে বাংলায় বলি, "কথা বল, ওর সঙ্গে। দিল বাহাদুরকে যে রেট দিচ্ছি, তাতে রাজী থাকলে নিয়ে নাও। কিন্তু কাল থেকে মজুরী হবে। আজ খাওয়া পাবে এবং বাস ভাড়া দিয়ে আমরা ওকে কুতনৌর নিয়ে যাব।"

কয়েক মিনিট কথা বলে, পাণ্ডে আমাকে জানায়, "শঙ্কুদা, এ রাজী আছে!"

"বেশ নিয়ে নাও। বিছানাপত্র নিয়ে বাসে আসতে বল। ওর নাম কি?"

"সাব, মণিরাম।" পাণ্ডে উত্তর দেবার আগেই সে বলে ওঠে।

"তুমি বাংলা বোঝ?" বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করি তাকে।

সে জবাব দেয়, "থোরা, থোরা সাব!"

"ক্যায়সে?" পাণ্ডে প্রশ্ন করে।

সে উত্তর দেয়, "বাঙ্গাল মুলুকের যাত্রীদের সঙ্গে হামেশাই থাকতে হয় আমাকে।"

খুশি হয়ে বলি, "Panday, Probably not a bad selection."

"I also think so, Soncuda!"

মণিরাম মৃদু হাসছে। তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করি, "আরে তুমি কি ইংরেজীও বোঝ নাকি?"

"থোরা, থোরা সাব।"

এ যে গভীর গাড্ডায় পড়া গেল দেখছি। ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী কোন ভাষাতেই গোপন কথা বলা যাবে না ওর সামনে। কিন্তু লোকটা ইংরেজী শিখল কেমন করে? হয়তো কোন ইংরেজ যাত্রীর মাল বয়ে থাকবে।

তবু প্রশ্নটা না করে পারি না। সে হেসে উত্তর দেয়, "সাব, ম্যায় পল্টনমে থা।"

বাস ছাড়ল; যে পথে বারকোট এসেছি সেই পথেই মাইলখানেক পেছনে এসে বাস ডানদিকের উৎরাই পথ ধরল। একটা পাহাড় পেরিয়েই দেখা হল যমুনার সঙ্গে। এই প্রথম দেখা। ভাগীরথীর চেয়ে সংকীর্ণ ধারা। সংকীর্ণ তার উপত্যকা। কিন্তু অসামান্য তার সৌন্দর্য। যতদূর দেখা যায়, শুধুই সবুজের সমারোহ।

যমুনার তীরে তীরে আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে বাস এল গঙ্গানী—বারকোট থেকে ৪ মাইল। হারানো স্মৃতি ফিরে এসে আবার মনের বদ্ধ-দুয়ারে আঘাত করে। এই সেই গঙ্গানী—সেকালে যাত্রীরা সবাই এখানে রাত্রিবাস করতেন। বারবার লালাজীর কথা মনে পড়ছে। এখানেই তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা। তিনি এখন কোথায়? বেঁচে আছেন কি?

জানি না। জানি না সেদিনের সহযাত্রীদের কে কোথায় কি ভাবে আছেন? শুধু জানি, তাঁরা সবাই অক্ষয় হয়ে রয়েছেন আমার মনের মণিকোঠায়, 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা'র পাতায় পাতায়। তবে তাঁরা কেউ জানলেন না সে কথা। তাতেই বা কি

এসে যাচ্ছে? জগতের অনেক কথাই তো আমাদের অজানা থেকে যায়।

ধর্মশালাটি আজও রয়ে গেছে। এবং অক্ষতই রয়েছে। কয়েক বছর আগেও যে গঙ্গানী ছিল বাসপথের প্রান্তসীমা। এখন গঙ্গানীর মূল্য কিছু কমে গিয়েছে। তবে শুনেছি এখনও আলু রপ্তানীর জন্য গঙ্গানী বিখ্যাত। এখন বাসপথ প্রসারিত হয়েছে কুতনৌর পর্যন্ত—আরও ৬ মাইল। সেই পথে এগিয়ে চলে আমাদের বাস।

বারকোট থেকে ১০ মাইল পথ আসতে মাত্র আধ ঘণ্টা লাগল। বেলা ঠিক পাঁচটার সময় কুতনৌর পৌঁছলাম। ১২৫ মাইল বাসযাত্রার যতি পড়ল।

বাস থেকে নেমে পড়ি। মণিরাম ও দিল বাহাদুর মাল-পত্র নামিয়ে আনে। সেকালের ছোট গ্রাম একালে গঞ্জে পরিণত। বেশ প্রশস্ত পথ। পথের দু'দিকে সারিসারি দোকান ও গুদাম। বছর তিনেক হল এখানে টার্মিনাস হয়েছে। ইতিমধ্যে জায়গাটা বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। কিন্তু হায়, বাসপথ এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার ধরাসুর মতোই পরিত্যক্ত হবে কুতনৌর। এবং সেদিন আর খুব দূরে নয়। যমুনার ওপার দিয়ে স্যানা চটি পর্যন্ত পথ তৈরি হয়ে গেছে। শুধু পুলটি হয়নি বলে গাড়ি যেতে পারছে না। আমাদের এই চলচ্চিত্র—যখন মুক্তি পাবে, তখন যমুনোত্রী যাত্রীরা বাসে করেই স্যানা চলে যাবেন। তাদের আর নামতে হবে না কুতনৌরে, রাত্রিবাস করতে হবে না যমুনা চটিতে। (এখন বাসপথ আরও এগিয়ে হনুমান চটি পর্যন্ত পৌঁছেছে।)

মনিরামকে বলি, "তুমি একটা কাজ কর।"

"ফরমাইয়ে সাব।"

"এখানে কোন কুলি এজেন্সি আছে?"

"জী সাব। দো এজেন্ট বিজয়পাল সিং আউর কাশী দত্।"

"দুজনকেই বল, কাল সকালে যেন যমুনা চটিতে আমার সঙ্গে দেখা করে।"

"জী সাব।" মণিরাম ছুটে চলে যায়।

পাণ্ডে কাছে এসে বলে, "লোকটাকে পেয়ে কিন্তু খুব উপকার হয়েছে শঙ্কুদা!"

হেসে বলি, "হবে বলেই তো ওকে সঙ্গে নিয়েছি।"

"কিন্তু একটা কথা পাণ্ডে!"

"কি?"

"কুলি এবং ডাণ্ডিওয়ালা ঠিক হবার আগে কাউকে বলবে না, আমরা সিনেমা তুলতে এসেছি।"

"কেন বলুন তো?" পাণ্ডে প্রশ্ন করে।

"তাহলে রেট বেড়ে যাবে।"

"ঠিক বলেছেন।"

"তুমি দিল বাহাদুরকেও কথাটা বলে দাও। এমন কি মণিরামকে পর্যন্ত, সে যেন কথাটা না বলে।"

"পাণ্ডে এগিয়ে যায় দিল বাহাদুরের কাছে। সে মালপত্র নিয়ে পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছে।

হাসতে হাসতে ফিরে আসে পাণ্ডে।

জিজ্ঞেস করি, "কি হল?"

"দিল বাহাদুর মণিরামকে বলে দিয়েছে কথাটা।"

মিনিট পনেরো বাদে মণিরাম ফিরে আসে। বলে, "সাব, কেউ ঘরে নেই। আমি তাদের জেনানাদের বলে এসেছি।"

"কি বলেছ?" পাণ্ডে তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করে।

"বলেছি, আপনাদের অনেক লোকের দরকার। কাল সকালে তারা যেন যমুনা চটিতে আপনার সঙ্গে ভেট করেন।"

"আর কিছু বলোনি তো?" পাণ্ডে আবার প্রশ্ন করে।

"নহী সাব।" মণিরাম সন্ত্রস্ত।

আমি বলি, "দেখ মণিরাম, আমরা যে সিনেমা বানাতে যমুনোত্রী যাচ্ছি, এ কথাটা তুমি কাউকে বলবে না।"

"জী সাব।"

"নমস্তে সাব।"

চমকে পেছনে তাকাই। দেখি একজন মধ্যবয়সী লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। সর্বনাশ হল, লোকটা বোধহয় শুনতে পেয়েছে আমাদের কথা। কিন্তু সেকথা ভাবার সময় নেই। তাড়াতাড়ি বলি, "নমস্তে।"

"মহারাজ, ম্যায় জগৎরাম—যমুনোত্রীকা পাণ্ডা।" একবার থামে সে। তারপরে জিজ্ঞেস করে, "আপ্ কলকাত্তাসে আয়া?"

"জী।" পাণ্ডে উত্তর দেয়।

"আমি বাংলা মুলুকের বহু আদমীকে সেবা করেছি। বাঙালীরা বড় ভাল লোক। তাঁরা আমাকে খুব প্যার করেন। আমি আপনাদের সেবা করব মহারাজ!"

"বেশ তো," আমি বলি, "আগামীকাল যমুনা চটিতে আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। আমাদের দলের অন্যান্যরা কাল বিকেলে এখানে আসবে। তারপরেও আমরা দু'দিন যমুনা চটিতে থাকব।"

"কেন?" প্রশ্ন করেন জগৎরাম। কিন্তু আমি কিছু বলতে পারার আগেই তিনি আবার বলেন, "সিনেমা বানাবেন?"

আমি ও পাণ্ডে চমকে উঠি। কোন উত্তর দিতে পারি না।

জগৎরাম আস্তে আস্তে বলে, "আমি কাউকে বলব না, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি সর্বপ্রকারের সেবা করব আপনাদের। এখন চলুন, আপনাদের পৌঁছে গিয়ে আসি যমুনা চটিতে।"

নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, এর হাত থেকে নিস্তার পাওয়া অসম্ভব। কাজেই আর কথা না বাড়িয়ে বলি, "চলুন, তাহলে যাওয়া যাক। চলো পাণ্ডে। দিল বাহাদুর সামান উঠাও।"

কুতনৌর থেকে যমুনা চটি মাত্র দেড় মাইল। উচ্চতাও কম—কুতনৌর ৭০০০ ফুট উঁচু আর যমুনা চটি ৫০০০ ফুট। কিন্তু পথটি মোটেই একটানা উৎরাই নয়। মাঝে মাঝেই চড়াই। ফলে যমুনা চটি আসতে প্রায় একঘণ্টা লেগে গেল।

যমুনা চটি কিন্তু একই রকম রয়ে গেছে: বলতে গেলে কোন পরিবর্তনই হয়নি। সেই আঁকাবাঁকা পায়ে চলা চড়াই-উৎরাই পথ দিয়ে ধর্মশালার উঠোনে মিশেছে। পাথর

বাঁধানো উঠোন কিন্তু খচ্চরের বিষ্ঠায় মাখা-মাখি।

তবে ধর্মশালার সামনে পথের পাশে দুটি নতুন দোকান হয়েছে। আমরা দেখছি দোকান কিন্তু মণিরাম বলছে 'হোটেল'। এ-সব দোকানে যেমন চাল-ডাল, আলু-আটা থেকে জুতো-লাঠি পর্যন্ত প্রয়োজনীয় বহু জিনিস পাওয়া যায়, তেমনি অর্ডার দিলে দুপুরে ও সন্ধ্যায় ডাল রুটি ও সবজি পেতেও অসুবিধা নেই কোন।

ধর্মশালার সঙ্গে সেই লালাজীর দোকানটি কিন্তু এখনও আছে। দোকানটি তেমন একটা পালটায় নি। কিন্তু পালটে গেছেন দোকানদার। চোদ্দ বছরে বয়সটা যেমন বেড়েছে তেমনি বাড়িয়েছেন কারবার। মুদি দোকানের সঙ্গে ট্রান্সপোর্ট বিজনেস শুরু করেছেন। দুর্গম পাহাড়ী পথে খচ্চরই একমাত্র মালবাহক। বৃদ্ধ লালা এখন চারটি খচ্চরের মালিক।

ধর্মশালারও কোন পরিবর্তন হয়নি। সেই মাটির দোতলা বাড়ি। নিচের তলা দরজি, চৌকিদার, জমাদার ও লালাজীর দখলে আর দোতলা যাত্রীদের জন্য।

সেই খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলাম। এক সারিতে চারখানি ঘর। সামনে লম্বা বারান্দা। ঘরগুলিও একই রয়ে গেছে। একটি করে দরজা ও জানলা। কোনটিই বন্ধ করা যায় না। তাহলে কি ছারপোকাও আগের মতন রয়ে গেছে?

প্রশ্ন শুনে মণিরাম মুচকি হাসে। উত্তর দেয়, "না সাব"।

"নেই!" আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠি।

অপ্রস্তুত কণ্ঠে কোনমতে মণিরাম বলে, "আগের চেয়ে খটমল অনেক বেড়ে গেছে সাব্! ওরা যে খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে।"

ঠিকই বলেছে মণিরাম। ছারপোকার শুনেছি খুব তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি হয়। কাজেই যমুনা চটির অন্য কোন পরিবর্তন না হলেও পরিবর্তন এসেছে এখানকার ছারপোকা সমাজে। তারা আগের চেয়ে সংখ্যায় বেড়েছে। সুতরাং মানুষের রক্তপানে আরও বেশি তৎপর হয়েছে।

পাণ্ডের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে। সে তো আর আমার মতো অ্যামেচার নয়, প্রফেশ্যনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর। তার দায়িত্ব অনেক বেশি। তাই সে হতাশ স্বরে জিজ্ঞেস করে, "তাহলে কি উপায় হবে শঙ্কুদা? আর্টিস্টদের থাকতে হবে এখানে? হিরোইন আসছে!

হেসে বলি, "তাহলেও উপায় নেই ভাই! এখানে তো এই ধর্মশালা ছাড়া আর কোন বাসস্থান নেই।"

"কিন্তু এত ছারপোকার মধ্যে..."

পাণ্ডে শেষ করতে পারে না। মণিরাম বলে ওঠে, "সাব, জমাদারকো পাস ডি. ডি. টি. হোগা।"

মণিরাম জমাদারকে ডেকে আনে। সে-জানায় তার কাছে ডি. ডি. টি. আছে, তবে সেটা তার পার্সোন্যাল স্টক। কাজেই...

তার হাতে দুটি টাকা গুঁজে দিয়ে বলি, "আপাতত এটা রাখো, পরে আরও পাবে। আজ রাতের মতো একটা ঘর পরিষ্কার করে দাও। কাল সকালে সব ঘরে ও বারান্দায় ডি. ডি. টি. দেবে, বাথরুম ও পায়খানা ফিনাইল দিয়ে পরিষ্কার করবে।"

"কিন্তু সাব, আমার কাছে যেটুকু ডি.ডি.টি. ও ফিনাইল আছে, তাতে তো এত হবে না।" সে উত্তর দেয়। বলে, "এখানে পাওয়াই যায় না।"

"কোথায় পাওয়া যাবে?" প্রশ্ন করি।

মণিরাম উত্তর দেয়, "বারকোটে।"

"অমি চৌকিদারকে বলি, "তোমার কাছে যেটুকু আছে, তা দিয়ে কাল সকালে যতটা পারো পরিষ্কার করে দিয়ো। আমরা বিকেলে তোমাকে ফিনাইল এবং ডি. ডি. টি. এনে দেব।"

চৌকিদার সেলাম করে ঘর সাফ করতে চলে যায়। পাণ্ডে বিস্মিত স্বরে আমাকে বলে, "কোথা থেকে আনবেন?"

"বারকোট থেকে। কাল সকালে আমবা বাবকোট যাব?"

পাঁচ

"গুড্ মর্নিং শঙ্কুদা!"

"গুড মর্নিং পাণ্ডে। তাহলে তোমার ঘুম ভাঙল?"

"আপনার?"

'অনেকক্ষণ।"

"ওঠেন নি যে?"

"শুয়ে শুয়ে যমুনার গান শুনছিলাম।"

"সত্যি শোনার মতো।" পাণ্ডে বলে, "কাল রাতে আপনি ঘুমিয়ে পড়ার পরে আমি মোমের আলোয় ডায়েরি নিয়ে বসেছিলাম, কিন্তু লেখা আর হয়ে ওঠেনি। বসে বসে যমুনার কলগান শুনেছি। শুনতে শুনতে একসময় শুয়ে পড়েছি—কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই।"

"তারপরে চা-টা খেতে হবে কি?"

"জরুর।" পাণ্ডে যেন লাফিয়ে ওঠে। কথাটা বোধ হয় ভুলেই গিয়েছিল সে।

"তাহলে চল, মুখ-হাত ধুয়ে দোকানে যাওয়া যাক্। ওদেরও ডাকো।"

"মণিরাম এবং দিল বাহাদুর এ ঘরেই ঘুমিয়েছে। কাল জমাদার শুধু এই একটা ঘরে ডি. ডি. টি দিতে পেরেছিল। কাজেই আপত্তি করা সত্ত্বেও আমবা ওদের অন্য ঘরে যেতে দিইনি—ছারপোকারা তো আর কুলি বলে ওদের ছেড়ে দিত না। তাদের কাছে সব মানুষের রক্তই সমান মিঠে।

ধর্মশালার পেছনেই যমুনা। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে কয়েক পা হাঁটলেই যমুনা। যমুনার জলে মুখ-হাত ধুয়ে নিই। জল খুবই ঠাণ্ডা লাগছে। লাগবেই তো, আমরা সবে সমতল থেকে এসেছি।

চা খেয়ে জমাদারকে তার কর্তব্য সম্পর্কে আর একবার সজাগ করে দিলাম। বললাম, "দেখ বাপু, যাঁরা আসছেন, তাঁরা সবাই কলকাতার লোক। আর এখন আসছেন ঋষিকেশের ভরত-মন্দির অতিথিশালা থেকে। কাজেই এমনভাবে সব পরিষ্কার করবে, যাতে যমুনা চটির কোন দুর্নাম না হয়।"

"নহী হোনে দেগা সাব।" সে সেলাম ঠুকে কাজে চলে যায়। আর আমরা রওনা

হই কুতনৌরের পথে।

কুতনৌর বাসস্ট্যান্ডে এসে শুনলাম বারকোটের বাস চলে গিয়েছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল. তাহলে কি বারকোট যাওয়া হবে না? ফিনাইল এবং ডি. ডি. টি আনা হবে না? মহা বিপদ হবে যে। তার ওপর পর্বতারোহণের সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে অমূল্যর আজ উত্তরকাশী থেকে এখানে আসার কথা। সকালের বাসে এলে, তাকে সারাদিন বারকোটে বসে থাকতে হবে। আমার জন্য সে বাড়ি না ফিরে এখানে আসছে। কাজেই এগিয়ে গিয়ে আমার তাকে নিয়ে আসা উচিত।

কিন্তু যাব কেমন করে? দশ মাইল পথ তো হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়। সঙ্গে পাণ্ডে রয়েছে। ওর এমন পথ পাড়ি দেবার অভ্যেস নেই।

শেষ পর্যন্ত মণিরাম কিন্তু সমস্যার সমাধান করে ফেলে। আলু বোঝাই একটা ট্রাক দেখিয়ে বলে, "সাব, ঐ গাড়িটা আমাদের বারকোট নিয়ে যেতে রাজী হয়েছে। তবে এক টাকা করে ভাড়া চাইছে।"

"দেব, দেব। যা চায়, তাই দেব।" পাণ্ডে পুলকিত।

আমরা মণিরামের সঙ্গে এসে ট্রাকে চেপে বসি। আমার ও পাণ্ডের স্থান হল পাইলটের পাশে আর দিল বাহাদুর ও মণিরামের আলুর বস্তার ওপরে।

"নমস্তে সাব।" ষোলো-সতেরো বছরের একটি ছেলে এসে সেলাম করে। বলে, "আমি বিজয়পাল সিং—কুলির ঠিকাদার।"

তাই তো। ওর কথা যে ভুলেই বসে আছি! ওকে তো আজ সকালে যমুনা চটিতে গিয়ে দেখা করতে বলেছিলাম।

সে আবার বলে, "আপানারা চলে যাচ্ছেন!" তার স্বরে অভিযোগ।

তাড়াতাড়ি বলি, "হ্যাঁ, একটা জরুরি কাজে যাচ্ছি। বিকেলে ফিরে আসব। তুমি বিকেলে এই বাসস্ট্যান্ডে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।"

ট্রাক চলতে শুরু করে। আমরা এগিয়ে চলি বারকোটের পথে। এই পথে কাল এসেছিলাম এখানে। এই পথ দিয়ে আজ হীরেনবাবু তাঁর শিল্পী ও কলা-কুশলীদের নিয়ে আসবেন কুতনৌরে—আসবেন সিনেমার ছবি তুলতে। এর আগে কোন চিত্র-নির্মাতা এত বড় পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য দুর্গম হিমালয়ে আসেননি।

সেই কথাই ভাবতে থাকি—'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা'-কে চিত্রায়িত করার জন্য হীরেনবাবু ও কার্তিকবাবু যে নিরলস পরিশ্রম করেছেন, সেই কথা। এই ছবি করবেন বলে দু'বছর অন্য কোনও কাজ হাতে নেননি। অথচ তাঁরা গুণী হলেও ধনী নন। তাঁরা এই ছবি করছেন কারণ তাঁদের বইখানি ভাল লেগেছে এবং তাঁরা হিমালয়কে ভালবাসেন।

বইখানি ভাল লেগেছিল আরও জন চারেক পরিচালকের। তাঁদের মধ্যে দুজন চিত্রনাট্যও রচনা করেছিলেন। বোধ হয় হিমালয়ের প্রতি তাঁদের ভালবাসার কিছু অভাব থাকার জন্যই তাঁরা পারলেন না। কিন্তু পারলেন হীরেনবাবু। গত দু'বছর তিনি বহু প্রযোজক ও পরিবেশকের দুয়ারে-দুয়ারে ধরনা দিয়েছেন। অনেকেই তাঁকে আশার ছলনায় ভুলিয়েছেন কিন্তু কেউ শেষরক্ষা করেননি। ভদ্রলোকের দুরবস্থা দেখে কষ্ট হয়েছে আমার। বলেছি, 'ছেড়ে দিন মশাই! এ ছবি করার মতো প্রডিউসার এখানে নেই।"

হীরেনবাবু হেসে বলেছেন, 'তাহলে আমি ও কার্তিকবাবু প্রডিউস করব।'

'টাকা কোথায় পাবেন?" প্রশ্ন করেছি।

হীরেনবাবু তেমনি অম্লানবদনে উত্তর দিয়েছেন, 'যোগাড় করার চেষ্টা করছি। গিরীনদাকে ধরেছি, দেখি কি হয়?'

শেষ পর্যন্ত হয়েছে। গিরীনদা অর্থাৎ গিরীন্দ্র সিংহ প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়েছেন। আর তার ফলে আমরা আজ আসতে পেরেছি এখানে।

জানি না এ ছবি কবে মুক্তি পাবে! জানি না এ ছবি দর্শকমনকে কতখানি নাড়া দেবে! তবে দুঃসাহসিক প্রচেষ্টার স্বীকৃতি হিসেবে ভারতের চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাসে এর একটা স্থান পাওয়া উচিত হবে।

আলুর ট্রাক এগিয়ে চলেছে চড়াই-উৎরাই পথে। দুলতে-দুলতে আমরা চলেছি বারকোট। আর ভাবনার পর ভাবনা এসে ভরে তুলছে আমার মন।

সত্যি ভাবতে অবাক লাগছে। কতবার তো কত কারণে হিমালয়ে এসেছি। এসেছি প্রমোদ-ভ্রমণে, এসেছি তীর্থদর্শনে, এসেছি পর্বতারোহণে। কিন্তু তার সঙ্গে আজকের এই আসার কত প্রভেদ। কত লেখকের কত বই তো চিত্রায়িত হয়েছে। কিন্তু ক'জনে এমন বহির্দৃশ্য গ্রহণের সঙ্গী হয়েছেন? সেই কথাই সেদিন বলেছিলাম হীরেনবাবুকে। কিন্তু তিনি শোনেননি। বলেছেন, 'আপনাকে যেতেই হবে আমাদের সঙ্গে। ব্যবস্থাপনার ভার আপনি না নিলে, আমার পক্ষে সবদিক সামলানো সম্ভব নয়। তাছাড়া হিমালয়ের ওপরে এতগুলো বই লিখলেন, আর আজ আমি যখন হিমালয়ের ছবি তুলতে যাচ্ছি, তখন আপনি আমার সঙ্গী হবেন না।'

তাঁর দাবীকে অবহেলা করতে পারিনি। হিমালয়ের ছবি তোলায় সাহায্য করতে আমি এবারে হিমালয়ে এসেছি। কিন্তু আমার কথা যাক্, ছবির কথাই ভাবা যাক্। ছবি মানে বাংলা চলচ্চিত্র। আমি তাই ভেবে চলি—

১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর প্যারিসে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। আনন্দের কথা তার মাত্র দু'বছরের মধ্যেই কলকাতার মানুষ চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ লাভ করেন। মিঃ স্টিফেন্‌স নামে একজন ইংরেজ ব্যবসায়ী এবং ফাদার লাঁফো নামে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের জনৈক অধ্যাপক ১৮৯৬-'৯৭ সালে পৃথক পৃথক ভাবে প্রথম কলকাতায় চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। স্টিফেন্‌স-এর যন্ত্রটির নাম ছিল বায়োস্কোপ আর ফাদার লাঁফোর সিনেমাটোগ্রাফ।

সেই ছবি দেখে কলকাতা হাইকোর্টের বিশিষ্ট আইনবিদ চন্দ্রমোহন সেনের দুই ছেলে হীরালাল ও মতিলাল মুগ্ধ হলেন। তাঁরা তখন আই. এস. সি. ক্লাসের ছাত্র। হীরালাল সেন চলচ্চিত্র প্রদর্শক হতে চাইলেন। ছুটে এলেন স্টিফেন্‌স-এর কাছে। কিন্তু তিনি উৎসাহী বাঙালী তরুণকে কোন সাহায্যই করলেন না।

হীরালাল কিন্তু মোটেই নিরুৎসাহী হলেন না। তিনি দেখা করলেন ফাদার লাঁফোর সঙ্গে। প্রাণময় পাদরী তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করলেন। আর তারই ফলে হীরালাল সেন ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে ভোলার (বরিশাল) এস. ডি. ও. বাংলোতে চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। এর আগে আর কোন ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেননি।

অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিরলস সাধনা দিয়ে হীরালালবাবু 'রয়েল বায়োস্কোপ'

কোম্পানি গড়ে তুললেন। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে মিনার্ভা থিয়েটারে তিনি প্রথম প্রদর্শনী করলেন। অল্প সময়ে তাঁর প্রদর্শনী সারা দেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

কিন্তু হীরালালবাবু এতে সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না। বিলেতে তৈরি ছবি দেখিয়ে কি লাভ? তাই ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি ক্যামেরা আনালেন। সেই বছরই নির্মাণ করলেন প্রথম ভারতীয় ছবি। গড়লেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের বুনিয়াদ। কাজেই হীরালাল সেন ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা তাঁকে সে সম্মান থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে!

১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে মানিক ডি-শেথনা নামে বম্বের জনৈক ব্যবসায়ী ভারতে প্রথম স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করেন। ১৯১২-১৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতে প্রথম পূর্ণাঙ্গ নির্বাক চিত্র নির্মিত হয়। ছবিটির নাম 'হরিশ্চন্দ্র'। নির্মাতা বম্বের দাদাভাই ফালকে।

বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নির্বাক চিত্র 'বিল্বমঙ্গল'। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ৮ই নভেম্বর 'কর্নওয়ালিশ থিয়েটারে' এই ছবিখানি মুক্তিলাভ করে। ছবিখানির নির্মাতা ম্যাডান কোম্পানি। পরিচালক রুস্তমজী দোতিয়ালা।

বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাসে হীরালাল সেনের পরবর্তীকালে ম্যাডান কোম্পানির যুগ। ১৯১৮ থেকে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই যুগ। এই তেরো বছরে ম্যাডান কোম্পানি শতাধিক পূর্ণ নির্বাক চিত্র নির্মাণ করেছেন।

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের সবাক যুগ শুরু হয়েছে। কিন্তু বিদেশী সবাক চিত্র প্রদর্শিত হয় তার তিন বছর আগে। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে মার্চ 'গ্লোব' থিয়েটারে সেই প্রদর্শনী আয়োজিত হয়েছিল।

ভারতের প্রথম সবাক চিত্র 'আলম আরা'। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে বম্বের ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানি এই ছবিখানি নির্মাণ করেন। জনৈক মিঃ চৌধুরী এই ছবির পরিচালক। জানি না তিনি বাঙালী কিনা?

হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দ থেকেই বহু বাঙালীর মনে সবাক চলচ্চিত্র নির্মাণের পরিকল্পনা দানা বেঁধে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস' বইতে একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে 'এই ঘটনাটি শুধু বাংলা বা ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পকেই মর্যাদাভিষিক্ত করেনি—সমগ্র পৃথিবীর চলচ্চিত্র শিল্পকে এক সুমহান গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে...

'১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের ২রা মার্চ, কবিগুরু কলকাতা থেকে তাঁর একাদশ বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করে ১১ই জুলাই কবিগুরু বার্লিনে উপস্থিত হন...জার্মানী পরিভ্রমণ কালে কবিগুরু 'প্যাসান প্লে' দেখে অভিভূত হন। এই যাত্রায়ই জার্মানীর ইউফা স্টুডিও পরিদর্শন করেন এবং ইউফা স্টুডিওর অনুরোধে চিত্ররূপের জন্য "দি চাইল্ড" (শিশুতীর্থ) কবিতাটি প্রথমে সরাসরি ইংরাজীতে রচনা করেন। ইউফা স্টুডিওতে কবিগুরুর গান আবৃত্তির সবাক চিত্রগ্রহণ করা হয়। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের কলিকাতায় কবিগুরুর সবাক চিত্রটি দেখানো হয়। ...সবাক চিত্রের সঙ্গে কবিগুরুর সর্বপ্রথম যোগ সংঘটিত হয়।'

১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ থেকে বাংলাদেশে সবাক চিত্রের যুগ শুরু হয়েছে। মুন্নি বাঈয়ের 'জয় জয় ভবানীপতি' গানটি চিত্রায়িত করার ভেতর দিয়ে সে যুগের সূচনা। ১৯৩১

খ্রীস্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারি ম্যাডান কোম্পানির এই খণ্ড সবাক চিত্রটি ক্রাউন সিনেমায় মুক্তিলাভ করে।

ঐ বছরই ম্যাডান কোম্পানি বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ সবাক চিত্র নির্মাণ করেন। ছবিটির নাম 'জামাই ষষ্ঠী।' অমর চৌধুরী এই ছবির কাহিনীকার ও পরিচালক। চিত্রগ্রহণ করেছিলেন টি. মার্কনী। বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন,—অমর চৌধুরী, ক্ষীরোদগোপাল মুখোপাধ্যায়, রাণী সুন্দরী, যতীন সিংহ, কার্তিক রায় ও শ্রীমতী গোলেলা। ছবিটি ১১ই এপ্রিল (১৯৩১) ক্রাউন সিনেমায় মুক্তিলাভ করে।

এই একই বছরে বীরেন্দ্রনাথ সরকার বাংলার চলচ্চিত্র জগতে আত্মপ্রকাশ করেন। তিনখানি নির্বাক চিত্র নির্মাণের পরে তিনি নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করলেন। শরৎচন্দ্রের 'দেনাপাওনা' তাঁর প্রথম সবাক চিত্র। ছবিখানি ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে ডিসেম্বর 'চিত্রা'য় মুক্তিলাভ করে। প্রেমাঙ্কুর আতর্থী এই ছবির পরিচালক এবং নীতীন বসু চিত্রশিল্পী। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নিভাননী, জহর গাঙ্গুলী, অমর মল্লিক, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন রায়, শিশুবালা, অনুপমা, উমাশশী ও আভাবতী এই ছবিতে অভিনয় করেছেন।

তারপর থেকে বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে নিউ থিয়েটার্সের জয়যাত্রার ইতিহাস। আর সে ইতিহাস সর্বভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পকে প্রভাবিত করেছে।

'দেনাপাওনার' পরে 'নটীর পূজা'। শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে কবিগুরু এই ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। ছবিখানি ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ২২শে মার্চ 'চিত্রা' সিনেমায় মুক্তিলাভ করে। তারপরে চিরকুমার সভা, পল্লীসমাজ, চণ্ডীদাস, মীরাবাঈ, এক্সকিউজ মি স্যার, দেবদাস, গৃহদাহ, মুক্তি, দিদি, বিদ্যাপতি, সাথী, রজত-জয়ন্তী, সাপুড়ে, জীবণ মরণ, ডাক্তার, প্রতিশ্রুতি, মীনাক্ষী, কাশীনাথ, প্রিয়বান্ধবী, উদয়ের পথে, অঞ্জনগড়, দুই পুরুষ আর মহাপ্রস্থানের পথে প্রভৃতি।

এই সব চিত্রকে কেন্দ্র করে সারা দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, কলাকুশলী, কাহিনীকার গাতিকার ও পরিচালকবৃন্দ এসে সমবেত হয়েছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের আঙ্গিনায়। এসেছিলেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলাম, প্রেমেন্দ্রকুমার মিত্র, অজয় ভট্টাচার্য, প্রণব রায়, রাইচাঁদ বড়াল, তিমিরবরণ, শচীনদেব বর্মন প্রভৃতি।

এসেছেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অহীন্দ্র চৌধুরী, প্রমথেশ বড়ুয়া, কুন্দনলাল সায়গল, পঙ্কজকুমার মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে, ইন্দু মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রকাশ, অসিতবরণ, জহর গাঙ্গুলী ও ছবি বিশ্বাস প্রভৃতি।

এসেছেন ধীরেন গাঙ্গুলী (ডি.জি), দেবকী বসু, প্রফুল্ল রায়, ফণি মজুমদার, মধু বসু, সুশীল মজুমদার, বিমল রায়, সুবোধ মিত্র, বীরেন নাগ ও কার্তিক চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। এসেছেন প্রভাদেবী, কঙ্কাবতী, উমাশশী, কাননদেবী, চন্দ্রাবতী, মলিনাদেবী, যমুনাদেবী, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীদেবী, রাধামোহন ভট্টাচার্য, বসন্ত চৌধুরী ও অরুন্ধতীদেবী প্রভৃতি।

নিউ থিয়েটার্সের শেষ উল্লেখযোগ্য ছবি 'মহাপ্রস্থানের পথে'। সেই ছবি দেখেই হিমালয়ের প্রতি প্রথম আকর্ষণ অনুভব করেছিলাম। কেবল আমার নয়, বর্তমান বাংলাদেশের হিমালয়-প্রীতির মূলে এই ছবিটি। সেদিন যদি মহাপ্রস্থানের পথে চিত্রায়িত

না হত, তাহলে হয়তো 'হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশান' প্রতিষ্ঠিত হত না, আয়োজিত হত না 'নন্দাঘুণ্টি অভিযান' আর লেখা হত না 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা।'

তাই মনে হয়, আমাদের এই ছবিও ভবিষ্যতের বহু পর্বতারোহী এবং কাহিনীকারকে সৃষ্টি করবে। তাদের সকলের জন্যই রইল আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

বারকোটে পৌঁছান গেল। মণিরাম গিয়ে খবর নিয়ে এল একটু বাদেই উত্তরকাশীর বাস আসছে। কাজেই এখন আর বাজারে যাওয়া হল না। অমূল্য আসুক, তারপরে একসঙ্গে যাওয়া যাবে।

বাস এল। অমূল্য নামল বাস থেকে। এখানে আমাকে দেখতে পাবার প্রত্যাশা করেনি সে। সুতরাং অমূল্য পুলকিত—আমিও তাই। একমাস পরে ওর সঙ্গে দেখা। আজ ৩রা অক্টোবর আর গত ২রা সেপ্টেম্বর সে পর্বতারোহণ সংস্থা 'দূতাগার'-এর নবীন অভিযাত্রীদলকে নিয়ে হিমালয়ে এসেছে। গিয়েছিল ২০,২০৮ ফুট উঁচু অপরাজিত যোগীন-২ পর্বতশৃঙ্গ অভিযানে। পারেনি। প্রবল তুষারঝড়ের জন্য শিখরের মাত্র একহাজার ফুট নিচের থেকে ফিরে আসতে হয়েছে। এটি অমূল্যর জীবনে সপ্তম পর্বতাভিযান কিন্তু প্রথম পরাজয়। স্বভাবতই তার মন ভাল নয়। তবু সে আমার আহ্বান উপেক্ষা করেনি। উত্তরকাশী থেকে সহযাত্রীদের ঘরে রওনা করে দিয়ে নিজে চলে এসেছে এখানে।

কিন্তু অমূল্যর একখানা হাত বাঁধা কেন? চমকে উঠি! সে কি কোন দুর্ঘটনায় পড়েছিল? তার কি হাত ভেঙেছে? নইলে অমন করে হাতখানি বেঁধে রাখবে কেন?

তাড়াতাড়ি কাছে আসি। অমূল্য একহাতে জড়িয়ে ধরে আমাকে ছোট ছেলেটির মতো আমার বুকে মুখ লুকোয়। ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে বলে, "পারলাম না শঙ্কুদা, আমি পারলাম না সফল হতে।"

নীরব কিছুক্ষণ। তারপরে শান্ত স্বরে বলি, "তাতে কি হয়েছে। যোগীন তো চলে যাচ্ছে না কোথাও, সে ওখানেই থাকবে। সামনের বছর আবার যাবি—জয়গৌরবে ফিরে আসবি।"

অমূল্য মুখ তোলে। আমি তার চোখ মুছিয়ে দিই। সে কথা বলে, "আমরাও তাই ঠিক করেছি। আগামী বছর আবার আসব যোগীন-২ অভিযানে। তার শুভ্র শিখরে জাতীয় পতাকা প্রোথিত করবই।"*

"সাবাস, এই তো পর্বতারোহীর মতো কথা। কিন্তু তোর হাতে কি হল?"

---

* অমূল্য তার কথা রেখেছে। ১৯৭১ সালের ১১ই অক্টোবর তার নেতৃত্বে বিজিত হয়েছে এই অপরাজিত পর্বতশিখর যোগীন-২। শেরপা আজীবা, নিম দোরজি ও আঙ ছুতারকে নিয়ে বেলা তিনটায় অসিত মৈত্র শিখরে আরোহণ করেছে। দলের অন্যান্য সদস্যরা হল—বিভাস দাস (সহ নেতা), বিনীত দাশগুপ্ত, জগন্নাথ দত্ত, বঙ্কিম মল্লিক, সুভাষ রায়, নির্মল চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার গৌতমগোপাল চক্রবর্তী ও রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিত। দুর্ভাগ্যের কথা গত ২৬শে সেপ্টেম্বর (১৯৮৫) গাড়োয়ালের শ্যামাবরণ হিমবাহে ২০,১২৫ ফুট একটি অনামী শৃঙ্গ আরোহণের পরে নামার পথে প্রায় দু হাজার ফুট নিচে গড়িয়ে পড়ে অসিত দেহত্যাগ করেছে। বিনীতও আর নেই এ জগতে। তাদের আত্মার শান্তিকামনা করি।

"ও কিছু নয়। গ্লিসেড করে নামার সময় উলটে গিয়েছিলাম। মনে হচ্ছে হাতটা মচকে গেছে, একটু আধটু ভেঙ্গে যেতেও বা পারে।"

তার কথা ও কণ্ঠস্বর থেকে মনে হওয়া উচিত, কিছুই হয়নি। তাহলেও জিজ্ঞেস করি, "ব্যথা নেই?"

"আছে। তবে এখন আর খুব বেশি একটা ব্যথা করছে না। প্রথম দু'রাত শুধু ঘুমাতে পারি নি।"

"ডাক্তার দেখিয়েছিস?"

"হ্যাঁ, আমাদের অভিযানের ডাক্তার দেখেছে।"

"কি বলেছে?"

"এক্স-রে না করলে তো ঠিক বোঝা যাবে না।"

"তা উত্তরকাশী এসে এক্স-রে করালি না কেন?"

"বা রে সময় পেলাম কখন? কাল রাতে পৌঁছলাম। আজ সকালেই তো আবার বাস ধরতে হল।"

"না হয়, কাল এসে যমুনা চটিতে দেখা করতিস আমাদের সঙ্গে।"

এবারে মুশকিলে পড়ে অমূল্য। আমতা আমতা করে বলে, "মানে ঐ তোমার চিঠিটা পেলাম কিনা। ভাবলাম তোমাদের আবার ইকুইপমেন্ট দরকার। দেরি করা উচিত হবে না। তাই চলে এলাম আর কি।" একবার থামে সে। একটু হেসে ব্যাপারটা হালকা করতে চায়। কিন্তু আমাকে গম্ভীর থাকতে দেখে আবার বলে, "তোমার আবার সবকিছুতেই বেশি চিন্তা। কি হয়েছে আমার হাতে? সামান্য একটু চোট লেগেছে। ও কলকাতায় গিয়ে এক্স-রে করালেই হবে।"

তাছাড়া এখন আর কি-ই বা করার আছে? কিন্তু আমরা তো কলকাতায় ফিরব একমাস পরে। এতদিন ওকে বিনা চিকিৎসায় রাখা উচিত হবে কি? যাক গে, শুভেন্দু এসে যাচ্ছে বিকেলে। তার সঙ্গে পরামর্শ করেই যা হোক্ করা যাবে।

কিন্তু অমূল্যর কথা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই। আমি আসতে বলেছি বলে চলে এসেছে। নিজের কথা একবারও ভাবেনি। বিস্ময়কর ওর ভালবাসা। আর তাই সে সফল পর্বতাভিযাত্রী—সার্থক নেতা।

"গুড্ মর্ণিং ম্যানেজার সাব।"

কণ্ঠস্বরটা পরিচিত মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি পেছনে তাকাই। বলে উঠি, "কে সেতীরাম না?"

"হ্যাঁ।" অমূল্য বলে। "তুমি চারজন কুলি আনতে বলেছ, আমি সেতীরামকে বললাম সে কথা। তোমার সঙ্গে দেখা হবে বলে মাউন্টেনিয়ারিং ইন্স্টিটিউটের কোর্সের সঙ্গে না গিয়ে সেতী নিজেও চলে এল।"

সেতীরাম মুচকি হাসছে। ওর একখানা হাত হাতে নিয়ে বলি, "কেমন আছিস?"

"আচ্ছা, বহুৎ অচ্ছা ম্যান্জার সাব।"

হেসে বলি, "ওরে আমি আর এবার দলের ম্যানেজার নই। তুই আমাকে বরং ঘোষসাব বলে ডাকিস।"

"নহী।" সেতীরাম মাথা নাড়ে। বলে, "ম্যাঁয় ম্যান্জার সাব বোলুঙ্গা।"

"তুমি ওকে বোঝাতে পারবে না শঙ্কুদা!" অমূল্য বলে, "ও এখন পোর্টার থেকে মেট্ হয়েছে, কিন্তু সেই 'ব্লাডি ফুল' রয়ে গেছে।"

"জী সাব" সেতীরাম মাঝখান থেকে বলে ওঠে, "ম্যাঁয় ব্লাডি-ফুল। ম্যাঁয় ম্যান্জার সাব কহুঙ্গা।"

আমরা সবাই হেসে উঠি। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয় ওরা মূর্খ মানুষ। নিজেরা যেমন ভোল পালটায় না, তেমনি অন্যের পরিবর্তনও পছন্দ করে না! সেতীরাম আমাদের কেদারনাথ পর্বত ও সতপন্থ অভিযানে কুলির কাজ করেছে। দু'বারেই দেখেছে আমি দলের ম্যানেজার। কাজেই আমাকে সে আজও ম্যানেজার ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারছে না।

অমূল্য বলে, "তুমি চারজন কুলি আনতে বলেছিলে, আমি কিন্তু একজন লোক বেশি এনেছি। বিজিন্দর সিং!"

"জী সাব।" একজন গাড়োয়ালী যুবক এগিয়ে আসে। ভারি সুন্দর চেহারা। সে সেলাম করে আমাকে।

অমূল্য বলে, "মুখীমঠের লোক। আমার অভিযানে ডাক-রানার-এর কাজ করেছে। গঙ্গোত্রী থেকে একদিনে মূল-শিবিরে চলে যেত—আমাদের তিন দিনের পথ।"

হেসে বলি, "এনে ভালই করেছিস, অনেক কাজে আসবে। আর কাকে এনেছিস?"

"এ যে বাসের ওপর থেকে মাল নামাচ্ছে—সুর বাহাদুর, ভক্তিরাম আর হরিলাল। সকলেই নেপালী এবং হাই অলটিচ্যুড পোর্টার।"

"ইকুইপমেন্ট কি কি এনেছিস?"

"শর্মাজীকে যে লিস্ট দিয়ে এসেছিলে—দশটা এয়ার ম্যাট্রেস, দশটা স্লিপিং ব্যাগ, দশটা উইন্ড প্রুফ আর দশটা ফেদার জ্যাকেট।"

"সাব, আপকে লিয়ে শর্মা সাবনে এক আলাগ স্লিপিং ব্যাগ দিয়া। বহুৎ অচ্ছা চীজ।" সেতীরাম যোগ করে।

"তার মানে এগারোটা স্লীপিং ব্যাগ এনেছিস?"

"না, বারোটা। আমার একটা আছে।" অমূল্য উত্তর দেয়।

"ম্যাঁয় হিসাব রাখুঙ্গা সাব, ফিকর মত্ করনা।" সেতীরাম ভরসা দেয়।

"লেকিন ব্লাডি ফুল, আভি তুম সামানকো হিসাব কাহে নহী করতা?" অমূল্য ধমক লাগায়।

সেতীরাম হাসিমুখে বলে, "সরি লীডার সাব, ম্যাঁয় আভি যাতা হুঁ।" সে এগিয়ে যায় মালের কাছে।

আমরাও তার সঙ্গে সেখানে আসি। সেতীরাম মাল গুনতি করে। বলে, "ঠিক হ্যায় লীডার সাব। আভি সামান কিধর রাখেগা?"

আমি রাস্তার ওপারে চায়ের দোকানটা দেখিয়ে দিই। শুধু চা নয়, ভাত-ডাল রুটি-সবজিও পাওয়া যায় সেখানে। আমরা আজ দুপুরে ওখানেই খাব। অতএব মাল রাখতে আপত্তি করবে না দোকানদার।

মাল নিয়ে আসার পরে চা খাওয়া হল। কুলিরা রইল মালের পাহারায়। আমরা

মণিরামকে নিয়ে বাজারে চললাম—ডি. ডি. টি এবং ফিনাইল কিনতে হবে।

বেশ বড় বাজার। ফিনাইল পাওয়া গেল কিন্তু ডি. ডি. টি. নেই। এখন উপায়।

উপায় বাতলে দিলেন একজন প্রবীণ দোকানদার। বললেন, "উত্তরকাশী ছাড়া আর কোথাও ডি. ডি. টি. পাবেন না। তার চেয়ে একটিন 'ডাল্‌ফ' নিয়ে যান। সঙ্গে অবশ্য একটা 'স্প্রে' নিতে হবে। সবসুদ্ধ চার টাকা দাম পড়বে।"

"তা পড়ুক গে। কিন্তু ওতে ছারপোকা মরবে কি?"

"নিশ্চয়ই।" দোকানদার বলেন।

অতএব ডাল্‌ফ ও স্প্রে নিয়ে আমরা ফিরে চলি বাসস্ট্যান্ডে।

এসে দেখি ওরা সবাই স্নান করে নিয়েছে। নেবেই তো, ওরা যে অনেক ওপর থেকে নেমে এসেছে। স্বভাবতই গরম লাগছে। অমূল্যরও একই ব্যবস্থা। কিন্তু ভাঙা হাত নিয়ে তার পক্ষে ভাল করে স্নান করা হয়ে উঠল না।

চারটের সময় ঋষিকেশ থেকে বাস এল। আমরা এই বাসে কুতনৌর ফিরব। কুলিদের মালপত্র নিয়ে আসতে বলে, অমূল্য ও পাণ্ডের সঙ্গে বাসের কাছে আসি।

আর এসেই অবাক হয়ে যাই। তরুণ স্টীল ফটোগ্রাফার পি. প্রভু, প্রবীণ ড্রেসার গণেশ দাস, মেক্‌-আপ অ্যাসিস্ট্যান্ট ও অভিনেতা কেষ্ট, প্রোডাকশন অ্যাসিস্ট্যান্ট সুশীল দে ও শব্দযন্ত্রী শুভাশিস চৌধুরী রয়েছে এই বাসে।

"কি ব্যাপার, তোমরা!"

শুভাশিস বলে, "রিজার্ভড্ বাসে সকলের জায়গা হল না, তাই আমরা লাইনের বাসে চলে এলাম।"

"রিজার্ভড্ বাস কখন আসবে?"

"দেরি হবে। ওনারা শুটিং করতে করতে আসছেন। আমাদের বাস যখন টিহ্‌রী থেকে ছাড়ছে, তখন ওঁরা টিহ্‌রীতে পৌঁছলেন। তারপরে আর দেখা হয়নি।"

আবার এক প্রস্থ চা খেয়ে সবাইকে নিয়ে বাসে উঠলাম। একটু বাদে বাস ছেড়ে দিল। যে পথে সকালে এসেছি, সে পথেই ফিরে চলেছি কুতনৌর। আসার সময় শুধু পাণ্ডে ছিল সঙ্গে। এখন আরও কয়েকজন চলচ্চিত্র কলাকুশলী আমার সঙ্গী। এরা সঙ্গে না থাকলে, চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্ভব নয়। কিন্তু নির্মিত ছবির মুনাফার কোন অধিকার নেই এদের। সারাজীবনের সাধনা দিয়ে এরা আজ এক একজন সার্থক শিল্পী! কিন্তু এদের জীবনের অধিকাংশ দিন কাটে অর্ধাহারে ও অনাহারে। রুপোলি পর্দার সোনালি স্মৃতিটুকুই শুধু সম্বল এদের। আশ্চর্য! তারই জন্য এরা অম্লান বদনে সকল অবিচারকে মাথা পেতে নিচ্ছে। কি জানি, এই হয়তো শিল্পী-জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি।

কিন্তু কেন? হলিউডের কথা ছেড়ে দিলাম। বম্বে, এমনকি ভারতীয় চলচ্চিত্রের সর্বকনিষ্ঠ কেন্দ্র মাদ্রাজেও তো কলাকুশলীরা এমন দুরবস্থার সম্মুখীন নন।

শুনেছি—সত্যজিৎবাবু ও তপনবাবুর ইউনিট ছাড়া কলকাতার আর কোন প্রোডাকশন ইউনিটের সদস্যরা স্থায়ী চাকুরে নন। প্রত্যেক ছবির জন্য তাঁদের পৃথক পৃথক চাকরি। একটি ছবির জন্যে তাঁরা ছয় থেকে আট মাসের মাইনে পান। যেখানে ১৯৫৫ সালে ৪৯ খানি বাংলা চিত্র নির্মিত হয়েছিল, সেখানে ১৯৬৫ সালে নির্মিত

হয়েছে মাত্র ৩১ খানি। এবং বিগত পাঁচ বছরে এ সংখ্যা বাড়ে নি। অথচ ইতিমধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই কলাকুশলীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বৎসরাধিককাল বেকার থাকার পর তাঁরা একটি ছবিতে কাজ পাচ্ছেন। সে ছবি শেষ হলে আবার বেকার হচ্ছেন।

অনেকের ধারণা এর জন্য দায়ি বঙ্গ-বিভাগ—যার ফলে বাংলা ছবির বাজার সীমিত হয়ে গেছে। ধারণাটা সত্য নয়। কারণ তাই যদি হবে, তাহলে ১৯৫০ সালে পশ্চিমবাংলায় কেন ৪৩খানি ছবি নির্মিত হল? আর বছর বছর সেই সংখ্যা বেড়ে কেনই বা ১৯৫৫ সালে হল উনপঞ্চাশ?

বাংলা ছবির এই দুরবস্থা শুরু হয়েছে ষাট শতকের গোড়া থেকে অর্থাৎ বঙ্গ-বিভাগের একযুগ পর থেকে। আর তার কারণ বলিউড মার্কা ছবি। তাই বলে দর্শকদের রুচিজ্ঞানকে দোষ দেওয়া অযৌক্তিক। ভাল ছবির প্রতি পশ্চিমবঙ্গের দর্শকরাও যে আজও সমান শ্রদ্ধাশীল ইদানীংকালে আমরা বহুবার তার প্রমাণ পেয়েছি।

বাংলা ছবির বর্তমান দুরবস্থার জন্য দায়ি প্রযোজকদের ব্যবসায়ী মনোভাব ও সরকারী উদাসীনতা। প্রযোজকরা সস্তা আনন্দের খোরাক যুগিয়ে সহজে বাজিমাৎ করতে চাইছেন। কিন্তু হিন্দী ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হচ্ছেন পরাজিত। আর যে সব বাংলা ছবি সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃতি হচ্ছে, সরকার সে সব ছবিকে শুধু পুরস্কার প্রদান করেই তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করছেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়েছে আমার। নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায় ১৯৫২ সালের ৯ই মে চিত্রা, প্রাচী ও ইন্দিরা চিত্রগৃহে 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবিখানি মুক্তিলাভ করেছিল। তারপর থেকে বিগত আঠারো বছরে বাংলার জনমানসে হিমালয়ের প্রতি আকর্ষণ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইতিমধ্যে হিমালয়ের বিভিন্ন গিরিতীর্থ ও গিরিশৃঙ্গ নিয়ে বহু বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে, প্রত্যেক বছর হাজার হাজার বাঙালী হিমালয়ে যাচ্ছেন। এই সুদীর্ঘকালে প্রায় শ'সাতেক বাংলা ছবি নির্মিত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের কথা হিমালয় নিয়ে কোন ছবি তৈরি হয়নি। শুধু তাই নয়, 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬১ সালে। এবং প্রকাশিত হবার পরেই বইখানি চলচ্চিত্র-জগতের নজরে পড়েছে কিন্তু চিত্রায়িত হতে বছর দশেক সময় লেগে গেল। আর গিরীনবাবুর মতো মানুষ চলচ্চিত্র জগতে না থাকলে, হয়তো এ বই কোনদিন চিত্রায়িত হত না।*

কিন্তু এমনটি হওয়া উচিত ছিল না। কারণ 'মহাপ্রস্থানের পথে' প্রযোজিত করে নিউ থিয়েটার্স লাভবান হয়েছে, পরিচালক ও নায়ক-নায়িকা হয়েছেন খ্যাতিমান। তবু যে এই ছবি তৈরি হতে দশ বছর সময় লাগল তার কারণ অন্য কোন প্রযোজক ঝুঁকি নিতে রাজী হন নি এবং অন্য কোন পরিচালক এত দুঃখ কষ্ট সইতে সম্মত হন নি। অথচ দুঃখ-কষ্টের ভেতর দিয়েই যে কেবল সার্থক-সৃষ্টি জন্মলাভ করে, এই সহজ সত্যটি

---

* দুর্ভাগ্যের কথা শ্রদ্ধেয় শ্রীগিরীন্দ্র সিং এ ছবি দেখে যেতে পারলেন না। ছবি মুক্তি পাবার আগেই তাঁর ওপারের ডাক এলো। তিনি চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে। তাঁর আত্মার শান্তিকামনা করি। ১৯৭২ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা' চিত্রটি মিনার, বিজলী ও ছবিঘরে মুক্তিলাভ করে।

তাঁদের কারও অজানা থাকার কথা নয়।

পাঁচটার সময় কুতনৌর পৌঁছে শুনি হীরেনবাবুদের বাস আসেনি। পাণ্ডের সঙ্গে কুলিদের পাঠিয়ে দিলাম যমুনা চটিতে। অমূল্য রইল আমার সঙ্গে। পাণ্ডে গিয়ে ডালফ্‌য়ের সদ্ব্যবহার এবং খাবারের বন্দোবস্ত করবে। আজ আর নিজেদের রান্না করা সম্ভব হবে না। দোকানেই খেতে হবে। সব মিলিয়ে পঞ্চাশ জন লোক। আগে থেকে না বললে, দোকানদারের পক্ষে ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া কুলিদেরও মাল রেখে তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে হবে।

ঠিক সাড়ে-ছ'টার সময় বাস কুতনৌর এল। গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ হতেই সামনের সিট থেকে শুভেন্দুর চিৎকার শুনতে পেলাম, "শঙ্কুদার শাস্তি চাই, শাস্তি না হলে শান্তি নাই।"

তাড়াতাড়ি দরজা খুলে হাতজোড় করে বলি, "আমার অপরাধ?"

শুভেন্দু হাঁক দেয়, "শমিতা!"

"কি বলছিস্?" তার পেছনের সিট থেকে শমিতা অর্থাৎ অভিনেত্রী শ্রীমতী শমিতা বিশ্বাস সাড়া দেয়।

"শঙ্কুদা জিজ্ঞেস করছেন, তার কি অপরাধ? তুই একটু বলে দে তো।" শুভেন্দু শমিতাকে বলে।

"কিন্তু আমার সঙ্গে যে শঙ্কুদার এখনও আলাপই হয় নি, আমি বলব?" শমিতা ইতস্তত করে।

"হ্যাঁ, হ্যাঁ বলুন না।" আরেকটি নারীকণ্ঠ, "আলাপ পরে হবে'খন। এখন কথাটা বলে দিন তো।"

হীরেনবাবু যোগ করেন, "মধু ঠিকই বলেছে শমিতা, তুমি শঙ্কুদাকে কথাটা বলে দাও।"

"তাহলে শুনুন শঙ্কুদা", শমিতা শুরু করে। "আপনার শাস্তি হওয়া উচিত—অত্যন্ত কঠিন শাস্তি।"

"আমার অপরাধ?" আবার সবিনয়ে বলি।

শমিতা উত্তর দেয়, "আপনার অপরাধ, আপনি এই বই লিখেছেন। বইটা না লিখলে সারাদিন আমাদের এই বাসের ধকল সইতে হত না?"

"কিন্তু আপনারা ভুল করছেন।"

"ভুল!"

"হ্যাঁ, আমি আপনাদের এই কষ্টের কারণ নই।"

"কে তাহলে?" নারী-পুরুষের সমবেত কণ্ঠের প্রশ্ন।

মৃদু হেসে উত্তর দিই, "বাজারে এত বই থাকতে যিনি এই বইয়ের ছবি করার জন্য দু'বছর বসে আছেন, সেই পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার শ্রীহীরেন নাগ।"

"ঠিক বলেছেন শঙ্কুদা", বিশুবাবু সমর্থন করেন আমাকে, "তোমাদের এই কষ্টের জন্য কারও যদি শাস্তি পাওয়া উচিত, তাহলে তা হীরেনেরই প্রাপ্য।"

"কিন্তু" আমি বলি, "এখনই ভদ্রলোককে শাস্তি দেবেন না। কারণ আপনাদের কষ্ট কেবল শুরু হল। আর আগামীদিনের কষ্টের তুলনায় আজকের এ কষ্টটুকু কিছুই নয়।

কাজেই শাস্তিটা এখন মুলতুবি রেখে তাড়াতাড়ি বাস থেকে নেমে আসুন। গরম চা-বিস্কুট রেডি হয়ে আছে।"

"থ্রি চিয়ার্স ফর শঙ্কুদা" শুভেন্দু বলে ওঠে।

তার সহযাত্রীরা সাড়া দেয়, "হিপ্ হিপ হুররে, হিপ..."

ওরা বাস থেকে নেমে চায়ের দোকানে ঢোকে। একে একে পরিচয় হয় শিল্পনির্দেশক ও প্রযোজক কার্তিক বসুর সঙ্গে, নায়িকা মধুছন্দা চক্রবর্তী ও তার মায়ের সঙ্গে, সহ-নায়িকা শমিতা বিশ্বাস, অভিনেতা পান্নালাল চক্রবর্তী ও ছোট মেয়ে স্বর্ণালীর সঙ্গে এবং আরও অনেকের সঙ্গে।

তবে সবার সঙ্গে নয়, কারণ তার আগেই মুষলধারায় বৃষ্টি নামল। এখন উপায়? সহ-পরিচালক দিলীপ মিত্র, হীরেনবাবু ও কার্তিকবাবু ছাড়া এঁদের আর কেউ কখনও দুর্গম হিমালয়ে আসেননি। মাত্র বারো ঘণ্টায় ওঁরা আজ প্রায় ছ'হাজার ফুট ওপরে উঠে এসেছেন। স্বভাবতই সবার শীত লাগছে। অন্ধকার ও অচেনা দুর্গম পথ, তার ওপর আবার বৃষ্টি শুরু হল।

অথচ কুতনৌরে এত লোকের রাত্রি বাসের ব্যবস্থা করা অসম্ভব। যে ভাবেই হোক্, ওঁদের যেতে হবে যমুনা চটি। কষ্ট করে বৃষ্টিতে ভিজে যদিও বা যেতে পারে, বিছানাপত্রের কি হবে? পথে সব ভিজে যাবে যে। আর তাই বা নিয়ে যাব কেমন করে? এত মাল আর মাত্র দশ-বারোজন কুলি। এই দুর্যোগের রাতে একবারের বেশি মাল বইতে রাজী হবে না কেউ।

আমাদের কুলিরা ফিরে আসে। ওরা বর্ষাতি এবং টর্চ নিয়ে এসেছে। সেতীরাম সেলাম করে বলে, "চলিয়ে সাব।"

"ভারি মজার লোক তো!" শুভেন্দু হেসে ওঠে, "এই বৃষ্টির মধ্যেও বলছে, চলিয়ে সাব।"

আমি বলি, "ও যে হাই অলটিচ্যুড পোর্টার, ওর কাছে এ বৃষ্টি কিছুই নয়।" তারপরে সেতীরামকে বলি, "সেতী, ডগদার সাব। সেলাম দো!"

সেতী আমার আদেশ পালন করে। অনেকেই তার ভঙ্গি দেখে হেসে ওঠেন। বলা বাহুল্য আলোর স্বল্পতার জন্য সবাই তার ভঙ্গিটা ঠিকমত দেখতে পারেন না।

আলোর অভাবটাই বোধহয় এঁদের সবচেয়ে পীড়াদায়ক ঠেকেছে। এঁরা কলকাতার মানুষ এমন মিটমিটে আলোযুক্ত বাজার ভাবতেই পারেন না। তাও যতক্ষণ বাসের আলো জ্বালানো ছিল, ততক্ষণ হয়তো তেমন অসুবিধে হয় নি।

কিন্তু আলোর কথা থাক্, অন্ধকারের কথাই বলা যাক্। দোকানের স্বল্প আলোয় অনেকেরই ঠিকমত মুখ দেখতে পাচ্ছি না। তবে বেশ বুঝতে পারছি ওদের মনের অবস্থা ভাল নয়। শুধু যমুনা চটিতে যাবার ভাবনা নয়, সেই সঙ্গে শীতে কাতর হয়ে পড়েছেন। প্রায় প্রত্যেকেই গরম জামাকাপড় বাক্স কিংবা ব্যাগ বাসের ছাদে রেখে দিয়েছেন। এই বৃষ্টির মধ্যে নামিয়ে আনা সম্ভব নয়।

হীরেনবাবু আমাকে একপাশে নিয়ে এসে কানে কানে জিজ্ঞেস করেন, "কি করি বলুন তো? বৃষ্টি থামার যে নাম নেই। এরা নার্ভাস হয়ে পড়ছে।"

"পান্নাবাবু, স্বর্ণালী আর মহিলাদের আমি রেনকোট দিচ্ছি। বৃষ্টিটা একটু কমেছে।

আপনি ওদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন।" আমি পরামর্শ দিই।

"কিন্তু মালপত্র পাঠাবার কি করবেন?" হীরেনবাবু প্রশ্ন করেন।

"বিছানা ও হ্যান্ডব্যাগগুলো পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি।" শান্তিবাবু বলেন। তিনি যেন কখন এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন।

"বাকি মাল?" হীরেনবাবু জিজ্ঞেস করেন।

"কাল সকালে যাবে।" শান্তিবাবু বলেন, "আপনি ওদের নিয়ে চলে যান। বৃষ্টিটা আর একটু কমলে আমি বিছানা ও পার্সোন্যাল কিট্ নামিয়ে কুলিদের দিচ্ছি। শঙ্কুদা কুলিদের নিয়ে যাবেন। দিলীপবাবু, কানাই, কেষ্ট, টোপ বাহাদুর ও আমি বাসেই থাকব।"

হীরেনবাবু বলেন, "প্রস্তাবটা মন্দ নয়। কারণ কাল সকালের প্রথম লোকেশান এই বাসস্ট্যান্ড।"

"তাহলে তো ভালই হল। আমি আজ রাতে মেক-আপ ও ড্রেস-এর ট্রাঙ্ক দুটিও পাঠিয়ে দিচ্ছি। কাল সকালে আপনি আর্টিস্টদের একেবারে মেক-আপ করিয়ে এখানে নিয়ে আসবেন। ক্যামেরা, ফিল্ম ও সাউন্ড রেকর্ডার তো এখানেই রইল।"

হীরেনবাবু প্রোডাকশন ম্যানেজার শান্তি চৌধুরীর সে পরামর্শ মেনে নেন। কুলিরা তাদের গা থেকে রেনকোট খুলে দেয়। বৃদ্ধ, শিশু ও মহিলারা সেই ভিজে বর্ষাতি গায়ে দিয়ে বৃষ্টিঝরা আঁধার রাতে অচেনা পিচ্ছিল পথ পাড়ি দিতে বেরিয়ে পড়ে। আর যুবক ও প্রবীণরা বৃষ্টি মাথায় করেই তাদের সাথী হয়। শুভেন্দু চলতে চলতে গলা ছেড়ে গান ধরে—

'দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!'

ছয়

ঘুম ভাঙে সুশীলের ডাকে। চোখ মেলে দেখি, সে আমার পাশে এসে বসেছে। বলে, "আসুন, আপনার গা হাত-পা একটু ম্যাসাজ করে দিচ্ছি।"

"না, না, তার কোন দরকার নেই।" আমি প্রতিবাদ করি। কিন্তু সুশীল তার কাজ শুরু করে দেয়।

"আপত্তি করে কোন লাভ নেই শঙ্কুদা", কার্তিকদা পরামর্শ দেন। "সুশীল প্রোডাকশনের লোক। দলাই-মালাই করে আর্টিস্ট ও টেক্‌নিশিয়ানদের ঘুম থেকে তুলে দেওয়া ওর অ্যাডিশনাল ডিউটি।"

"কিন্তু আমার ওপরে এ আক্রমণ কেন? আমি তো আর্টিস্ট কিংবা টেক্‌নিশিয়ান নই।"

কার্তিকদা কিছু বলতে পারার আগেই শুভাশিস বলে ওঠে, "আপনি কন্ট্রোলার অব্ প্রোডাকশন।"

হেসে বলি, "তার চেয়ে বল কুলির সর্দার।"

"বেশ তাই হল।" অমূল্য বলে, "আর তাই তো সুশীল তোমাকে নিয়ে পড়েছে। ও জানে, তুমি তাড়াতাড়ি উঠে কুলিদের তাড়া না লাগালে সময়মতো মালপত্র এসে পৌঁছবে না বাসস্ট্যান্ড থেকে।"

"গুড্ মর্নিং ডিরেকটার, আর্ট ডিরেকটার, অথার, মাউন্টেনিয়ার—" শুভেন্দু সুপ্রভাত জানাতে আমাদের ঘরে আসে।

"গুড্ মর্নিং হিরো—" আমরা সমস্বরে বলে উঠি।

শুভেন্দু ভেতরে এসে বসে। আর তার পরেই সুশীলের দিকে নজর পড়ে তার। বলে, "তুই আবার এখানে এসে জ্বালাতন শুরু করেছিস।"

আমাকে মর্দন করতে করতে সুশীল জবাব দেয়, "এই জ্বালাতন করবার জন্যই যে গিরীনদা আমাকে আপনাদের সঙ্গে পাঠিয়েছেন।"

"তা আর বুঝতে পারছি না, বেশ বুঝতে পারছি। পড়েছি যবনের হাতে—"

"কে যবন শুভেন্দু?" বিশুবাবু ঘরে আসেন। কিন্তু শুভেন্দু কিছু বলতে পারার আগেই তিনি আবার বলেন, "ও সুশীলের কথা বলছ বোধহয়? ঠিকই বলেছ, ম্যাসাজ করার নাম করে আমার হাড়-গোড় সব ভেঙে দিয়েছে রে বাপু!"

"তা যার শরীর হাড়-সর্বস্ব, তার হাড় ছাড়া আর কি ম্যাসাজ করব?" সুশীল অম্লান বদনে উত্তর দেয়।

"তা তোমাকে কে ম্যাসাজ করতে বলেছে বাপু?"

"গিরীনদা। বলেছেন, হিমালয়ে যাচ্ছিস, ভীষণ শীত সেখানে। এরা কেউ সকালে বিছানা ছাড়তে চাইবে না। তুই দলাই-মালাই করে বিছানা থেকে তুলে দিবি।" সুশীল সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়।

শুভেন্দু বলে, "গিরীনদা শুধু দলাই-মালাই করতেই বলেছেন, বেড-টি দেবার কথা বলেন নি?"

"বলেছেন।"

"তাহলে বেড-টি দিলি না যে বড়?"

"আজ একটু দেরি হয়ে গেল, দোকান থেকে আনা হচ্ছে কিনা। দুপুরে কিচেন খুলে যাচ্ছে। কাল সকালে বিছানায় বসেই বেড-টি পেয়ে যাবেন!"

হীরেনবাবু জিজ্ঞেস করেন, "মেয়েদের কি খবর? ওরা উঠেছে?"

"না ঠিক ওঠে নি, তবে সবারই ঘুম ভাঙিয়েছি। চা পেলেই উঠে পড়বেন। পাণ্ডেদা চা আনতে চলে গিয়েছেন, এখুনি এসে যাবেন।"

সুশীল থামতেই শুভেন্দু জিজ্ঞেস করে, "তা মেয়েদের কি করে ঘুম ভাঙালি, ম্যাসাজ করে?"

তার প্রশ্ন শুনে আমরা সবাই হো হো করে হেসে উঠলাম। সুশীল নীরব।

শুভেন্দু আবার বলে, "কি রে জবাব দিচ্ছিস না যে?"

"কি করে আবার? ওদের ডেকে তুললাম ঘুম থেকে।" সুশীল কোনমতে জবাব দেয়।

"তাহলে আমাদের মতো মেয়েদের আর ম্যাসাজ করিস নি?"

"কি যে বলেন শুভেন্দুদা? তা কি করা যায় নাকি?"

"কেন যাবে না? শুভেন্দু গম্ভীর স্বরে বলে, "বলবি, গিরীনদা বলে দিয়েছেন।"

আমরা আবার হেসে উঠি। আর ঠিক তখনই পাণ্ডে ও মণিরাম চা নিয়ে ঘরে ঢোকে। সঙ্গে সঙ্গে শুভাশিস চিৎকার করে ওঠে, "থ্রি চিয়ার্স ফর পাণ্ডেজী—"

কিন্তু আমরা 'হিপ্ হিপ্ হুররে' বলতে পারি না। শুভেন্দু বাধা দিয়ে বলে ওঠে। "না না, মোটেই হল না। বোলো কবিবর শ্রীহৃদয়েশ পাণ্ডে কী—"

"জয়।" এবারে জয়ধ্বনি দিই আমরা।

তারপরেই অমূল্য জিজ্ঞেস করে, "কবিবর বলার কারণ?"

"তুমি পাণ্ডের সঙ্গে বারকোট থেকে এতটা পথ এলে, কিন্তু সে তোমাকে কিছুই বলেনি দেখতে পাচ্ছি।" বলতে বলতে দীপক ঘরে আসে।

আমরা তার দিকে তাকাই। দীপক আবার বলে, "পাণ্ডে শুধু একজন সহকারী পরিচালক নয়, সে একজন সুকবি। ওর কবিতার বই ছাপা হয়েছে।"

"নাম কি?" অমূল্য প্রশ্ন করে।

দীপক উত্তর দেয়, "সুজাতাকে লিয়ে। শ্রীমতী সুজাতা বর্তমানে ছাত্রী এবং ভবিষ্যতের স্ত্রী!"

যথাসময়ে আমরা বাসস্ট্যান্ডে এলাম। শান্তিবাবু, দিলীপ, কানাই, কেষ্ট ও বাহাদুর আমাদের স্বাগত জানায়। কাল ওরা বড়ই কষ্ট করেছে। বাসে রাত কাটাতে হয়েছে।

হীরেনবাবু শুটিংয়ের আয়োজন করেন। দৃশ্যটা বুঝিয়ে দেন—

একদল যাত্রী ঋষিকেশ থেকে এই মাত্র বাসে এসে নামলেন। তাঁরা এসেছেন ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। মিস্টার ও মিসেস অরোরা এবং তাঁদের মেয়ে মুন্না আসছে দিল্লী থেকে। বান্ধবী সুমন ও দাদাকে নিয়ে সাবিত্রী এসেছে পুণা থেকে, বেঁটে ও লম্বা দুই দেহরক্ষীকে নিয়ে লালাজী এসেছেন আগ্রা থেকে। দুই বোষ্টমীকে নিয়ে বৃদ্ধ বৈষ্ণব আসছেন বৃন্দাবন থেকে আর কুমার এসেছে কলকাতা থেকে, এসেছেন আরও অনেকে। কিন্তু তাঁদের সবাইকে দরকার নেই আমাদের। দরকার শুধু দুজনকে—একজন—নেংটি পরা দীর্ঘদেহী সন্ন্যাসী আর একজন স্বজনহীন জার্মান দার্শনিক কার্ল উলরিখ্। সে এসেছে ব্যাভেরিয়ার ওবেরামার্গো থেকে। কিন্তু আজ তাকেও আমরা পাব না এখানে। কারণ লেহ্ম্যানকে এখানে আসার অনুমতি দেওয়া হয়নি। অতএব তাঁর জায়গায় 'ডামি' অর্থাৎ দিলীপকে কার্লের পোশাক পরিয়ে পেছনে থেকে ছবি নিতে হবে।

হীরেনবাবু এবারে কোথায় কোথায় ক্যামেরা বসাতে হবে বিশুবাবুকে বুঝিয়ে দিলেন। শুভাশিস তার জায়গা নিল। আরম্ভ হল শুটিং। একটার পরে একটা দৃশ্য গ্রহণ করা হতে থাকল।

প্রথম দৃশ্য—বাস এসে থামল।

দ্বিতীয় দৃশ্য—একে একে বাস থেকে নামল কুমার, সাবিত্রী, সুমন, দাদা, লালাজী, কার্ল, অরোরা পরিবার, বৈরাগী পরিবার ও সন্ন্যাসী। এই সন্ন্যাসীর একটু ইতিহাস আছে। কিন্তু তা পরে বলছি। আগে শুটিংয়ের কথা বলে নিই।

তৃতীয় দৃশ্য—কুমার বাস থেকে নেমে মাল নিয়ে পথের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কি করবে, কোথায় যাবে, তাই ভাবছে। এমন সময় দেখতে পেল, সাবিত্রীর কাঁধে ভর করে লাঠি হাতে সুমন চলে যাচ্ছে। কুমার সুমনকে দেখল, সুমনও তার দিকে একবার তাকাল। দুজনে চোখা-চোখি হল। সুমন কি ভাবল কুমার জানে না। কিন্তু কুমার ভাবে, 'আহা, এমন সুন্দর মেয়েটি খোঁড়া হল কেমন করে? আর এই খোঁড়া পা নিয়ে সে

কেনই বা চলেছে এই দুর্গম পথে?' কিন্তু তার পরেই সে বাস্তবে ফিরে আসে। তার মনে পড়ে, দুর্গম তীর্থের পথে ভাবনা-চিন্তার অবকাশ নেই। এখানে শুধুই চলা। চলতে চলতে যদি পারো পথের সাথীকে সাহায্য করো। কিন্তু চলার পথে থম্‌কে থেকো না। চলো, এগিয়ে চলো, চরৈবেতি।

চতুর্থ দৃশ্য—যাত্রীরা প্রায় প্রত্যেকেই বাসের ছাদ থেকে যে যার মাল নিয়ে আশ্রয়ের অন্বেষণে চলে গেছেন। কেবল দাদা এখনও চটির পথে রওনা হতে পারেননি। তিনি সুখী মানুষ। সাবিত্রী তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে এসেছে এই দুর্গম পথে। তিনি তো আর মাল বইতে পারেন না। তাই সমানে চেঁচিয়ে যাচ্ছেন, 'কুলি, এই কুলি, কুলি—"

কোথায় কুলি? কুলির পাত্তা নেই। তার বদলে এগিয়ে আসেন জটাজূটধারী একজন নেংটি পরা সন্ন্যাসী। তার একহাতে একখানি কম্বল ও কমণ্ডলু। আর একহাতে একটি চিমটা ও একখানি পুঁথি। তিনি দাদাকে জিজ্ঞেস করেন—কুলি কুলি কেঁও চিল্লাতে হো? কুলিকা কেয়া জরুরত?

—কেয়া? দাদা ঢোক গেলেন।

চড়া স্বরে সন্ন্যাসী আবার বলেন—কুলিকা কেয়া জরুরত? আপনা হাত জগন্নাথ। আপনা সমান আপনে লেও, প্রেমসে চলে চলো।

এখানকার শুটিং শেষ হল। পরবর্তী লোকেশান যমুনা চটি—ধর্মশালার সামনে। কিন্তু তার আগে আমি সন্ন্যাসীর ইতিহাসটুকু বলে নিতে চাই।

সন্ন্যাসী সিনেমা আর্টিস্ট নন, তিনি একজন সত্যিকারের সন্ন্যাসী। আজ সকালে ধর্মশালার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা যখন এখানে আসার আয়েজন করছি, তখন তিনি হঠাৎ উপস্থিত হলেন সেখানে। জিজ্ঞেস করলেন, "তুমলোগ সিন্‌মা পার্টি হো?"

আমরা মাথা নাড়ি।

তিনি আবার বললেন, "ডিরেকটার কৌন হ্যাঁয়?"

আমরা হীরেনবাবুকে দেখিয়ে দিয়েছি। তিনি তাঁর সামনে গিয়ে গম্ভীর স্বরে বলেছেন, "মুঝে একঠো কম্বল দো। ম্যাঁয় যমুনোত্রী যাউঙ্গা।"

আমরা বিস্মিত হয়েছি কিন্তু শান্তস্বরে তাঁকে হীরেনবাবু বলেছেন, "বেশ তো কম্বল পেয়ে যাবেন। তবে আপনাকে একটা কাজ করে দিতে হবে।"

"কেয়া কাম?" সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করেছেন।

"আপকা থোরা শুটিং করনে পড়েগা।"

কি একটু ভেবে নিয়ে সন্ন্যাসী উত্তর দিয়েছেন, "ঠিক হ্যায় করুঙ্গা, লেকিন কিতনে সীন?"

"সির্ফ এক।"

"বহুৎ অচ্ছা। লেকিন শুটিং যব করেঙ্গে তো কম্বলকে সাথ কুছ রূপেয়া ভি মিলনা চাহিয়ে।"

"আপ তো পাক্কি আর্টিস্ট হ্যায়।" হীরেনবাবু হেসে বলেছেন, "অচ্ছা, দেখা যায়গা।" তারপরে তিনি সন্ন্যাসীকে বাসস্ট্যান্ডে চলে আসতে বলেছেন—এখানেই শুটিং হবে, এখানেই কম্বল পাওয়া যাবে।

বিনা বাক্যব্যয়ে সন্ন্যাসী চলে এসেছেন কৃতনৌর বাসস্ট্যান্ডে। আমরা এখানে এসে দেখি, তিনি ততক্ষণে গায়ে ভস্ম মেখে তিলকসেবা শেষ করে ফেলেছেন। তাঁকে কিন্তু কেউ সে-সব করতে বলে নি।

হীরেনবাবুকে দেখতে পেয়েই সন্ন্যাসী এগিয়ে এসেছেন সামনে। স্বহস্তে রচিত মেক-আপ দেখিয়ে বলছেন, "ক্যায়সে হুয়া?"

"বহুত অচ্ছা হুয়া স্বামীজী।' পরিচালককে বলতে হয়েছে।

অভিনেতা জানিয়েছেন, "ম্যাঁয় সব জানতা হুঁ। লেকিন মেরা কম্বল?"

"শুটিংকা বাদ মিল যায়েগী।" হীরেনবাবু উত্তর দিয়েছেন।

"নহী, শুটিংকে আগে মিলনা চাহিয়ে।"

সন্ন্যাসীর কথায় হীরেনবাবু একটু বিরক্ত বোধ করেছেন। তীক্ষ্ণকণ্ঠে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছেন, "স্বামীজী আপ্ হাম্‌কো বিশ্বাস নহী করতে?"

সন্ন্যাসী সহাস্যে বলেছেন, "বিশ্বাসকো বাত নহী বেটা, সির্ফ তুমহারা শুটিংকো লিয়েহি ম্যাঁয় শুটিংকে আগে কম্বল মাংতা হুঁ। শুটিংকা টাইমমে মেরে পাসমে কম্বল রহেগা তো তুমহারা ইয়ে সীন্ ন্যাচারল হোগা।"

অখণ্ডনীয় যুক্তি। কাজেই হীরেনবাবু সন্ন্যাসীকে দোকানে নিয়ে গেছেন।

কম্বল কিনে দেবার পরে কিন্তু তিনি আর একবার 'ডিরেকশান' দিলেন ডিরেকটারকে। দোকানের সো কেসে সাজিয়ে রাখা শ্রীমদ্ভাগবত-গীতাখানি দেখিয়ে বলেছেন, "উহ্ কিতাব ভি মেরে হাথমে রহনী চাহিয়ে।"

দোকানদার তাড়াতাড়ি হীরেনবাবুকে বলেছেন, "বেশ তা, নিয়ে যান না। শুটিং শেষ হলে ফেরৎ দিয়ে দেবেন।"

সন্ন্যাসী সেই কম্বল এবং গীতাসহ এইমাত্র শুটিং শেষ করলেন। বিশুবাবু ও শুভাশিস বলল, ভালই নাকি হয়েছে। হীরেনবাবুরও তাই ধারণা। তিনি কার্তিকদাকে বলেন, "স্বামীজীকে দোকান থেকে চা খাইয়ে, দশটা টাকা দিয়ে দিন।"

"কেয়া বোলা? দশ রূপেয়া?" সন্ন্যাসী বলে ওঠেন। হীরেনবাবু বাংলায় বললেও, তিনি ঠিক বুঝতে পেরেছেন।

হীরেনবাবু ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলেন, "জী"।

"নহী"। গর্জে উঠলেন সন্ন্যাসী, "কভী নহী। এতনা রুপেয়া খরচা করকে তোম সিন্‌মা বানাতে, আউর মুঝকো দশ রুপেয়া দেতে হো!"

এই ভাবে পাকা অভিনেতার মতো বেশ কিছুক্ষণ দরাদরি করার পর শেষ পর্যন্ত পঁচিশ টাকায় রফা করতে রাজী হলেন সন্ন্যাসী, তবে একটি শর্তে—গীতাখানির দামটাও দিয়ে দিতে হবে দোকানদারকে। সম্মত হলেন কার্তিকদা। টাকা ও গীতা নিয়ে কম্বল কাঁধে সন্ন্যাসী আমাদের আগে আগে এগিয়ে চললেন চড়াই-উৎরাই পথে—গিরিতীর্থ যমুনোত্রীর পথে।

আমরা চটিতে ফিরে চলেছি। মালপত্র আনার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে।

চটিতে পৌঁছবার আগেই শুরু হল শুটিং। এবারে লোকেশান চটির প্রবেশ পথ—দোকানের সামনে।

শিল্পী ও কুলাকুশলীদের দৃশ্যটা বুঝিয়ে দিলেন পরিচালক—

অরোরা পরিবার ও কার্লের সঙ্গে কুমার এসে পৌঁছল চটিতে। দেখল ধর্মশালা লোকে লোকারণ্য। চৌকিদার করজোড়ে জানাল কোন ঘর খালি নেই। ব্যর্থ কুমার ফিরে এল অরোরাজীর কাছে। কিন্তু তার ব্যর্থতায় বিচলিত হলেন না অরোরাজী। তিনি অভিজ্ঞ মানুষ। তাই নিজে গিয়ে দেখা করলেন চৌকিদারের সঙ্গে। ঘুষ দিয়ে ঘর পেলেন।

ঘরে মালপত্র রেখে বাইরে এল কুমার। দেখল সুমন ও সাবিত্রীকে নিয়ে দাদা এতক্ষণে আসতে পেরেছেন যমুনা চটিতে। তাঁকে দোষ দেওয়া বৃথা। একে তো কুলির জন্য অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে বাসস্ট্যান্ডে। তার ওপর তিনি মোটা মানুষ। চড়াই-উৎরাই পথ চলা কি তাঁর পোষায়?

সে যাই হোক্। ওদের দেখে কুমার একটু বিচলিত হয়ে পড়ে। ধর্মশালায় ঘর পাওয়া তো দুরের কথা, বারান্দায় পর্যন্ত জায়গা নেই। যে কারনেই হোক্ সুমন সোজা হয়ে চলতে পারে না। সে সাবিত্রীর কাঁধে ভর করে কিংবা লাঠি ঠুকে ঠুকে পথ চলে—সে অসুস্থ। এই শীতে সে বাইরে রাত কাটাবে কেমন করে?

তাই কুমার নিজের জায়গাটা দিয়ে দেয় ওদের। সাবিত্রী ধন্যবাদ জানায় এই মহাপ্রাণ পরদেশী যুবককে। সুমন মুখে কিছু বলে না। শুধু সকৃতজ্ঞ নয়নে একবার তাকায় কুমারের দিকে। দুজনে চোখা-চোখি হয়।

সুমনের চরিত্রে অভিনয় করছে মধুছন্দা চক্রবর্তী। দাদার চরিত্রে অভিনয় করছেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আর সাবিত্রীর চরিত্রে শমিতা বিশ্বাস।

শুটিং শেষ হতে বিকেল গড়িয়ে এল। 'প্যাক্-আপ্' অর্থাৎ কাজ শেষ হবার পরে সবাই আত্মসেবায় লেগে গেলেন। কেউ নিজের সুটকেস কিংবা ব্যাগ খুঁজে বের করে গোছগাছ শুরু করলেন। কেউ চায়ের দোকানে গিয়ে আড্ডা জমালেন। কেউ তাস কিংবা দাবা নিয়ে বসলেন। আর কেউ বা কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। কাল রাতে ভাল ঘুম হয়নি কিনা।

আর আমরা ধর্মশালার সামনে বসে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করছি। আগামীকাল আমরা এখানেই থাকছি। কাল তিন-চারটে লোকেশানে শুটিং আছে। পরশু সকালের খাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়ব হনুমান চটির পথে—পথে পথে শুটিং করে এগিয়ে যাব। রান্নার জিনিসপত্রসহ ঠাকুর সোজা হনুমান চটিতে চলে যাবে। সে আমাদের আগেই পৌঁছে যাবে। গিয়েই রান্না চড়িয়ে দেবে।

সবই তো বুঝলাম, কিন্তু যাব কেমন করে? কুলি এজেন্টদের যে এখনও পাত্তা নেই। অপ্রয়োজনীয় বহু জিনিস এখানে রেখে যাওয়া হচ্ছে। তবু যন্ত্রপাতি, ব্যক্তিগত জিনিস ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় মালপত্রের ওজন প্রায় টন দেড়েক। কম করেও চল্লিশ জন কুলির দরকার। তার ওপরে মেয়েদের নিয়ে যাবার জন্য পাঁচটা ডাণ্ডি অর্থাৎ বিশজন বাহকের প্রয়োজন।

মণিরামকে ডেকে কথাটা বলি। সে জানায়, "ঠিকাদাররা তো এসে গেছেন।"

"তাড়াতাড়ি ডেকে আনো তাদের।" আমরা উৎকণ্ঠিত।

মণিরাম ডেকে আনে। তারা সবিনয়ে সামনে এসে সেলাম করে আমাদের। আমরা প্রয়োজন পেশ করি। একটু ভেবে নিয়ে কাশী দত্ বলে, "লোক পেয়ে যাবেন। কিন্তু

প্রত্যেক কুলির জন্য একশ' টাকা ও ডাণ্ডির জন্য চারশ' টাকা করে দিতে হবে।"

কার্তিকদা আঁতকে ওঠেন, "তার মানে ছ' হাজার টাকা কুলি ও ডাণ্ডিভাড়া দিতে হবে!"

হেসে বলি, "সেই সঙ্গে অন্তত ছ'শ টাকার ওষুধ।"

"মানে?" তিনি বিস্মিত।

আমি বলি, "প্রতিদিন এই ষাটটি লোকের কোথাও না কোথাও 'দরদ' হবে। কাজেই সন্ধ্যাবেলা তারা চড়াও হবে শুভেন্দুর ওপর। কাঁদো কাঁদো স্বরে বলবে—ডগদার সাব, দাওয়াই দিজীয়ে।"

"তাহলে যে শুভেন্দুর অভিনয় মাথায় উঠবে।" হীরেনবাবু বলে ওঠেন।

"তা উঠতে পারে।"

"তাহলে উপায়?" অসহায় পরিচালক জিজ্ঞেস করেন।

"উপায় নেই। উত্তর দিই, কুলি ছাড়া যখন যাওয়া সম্ভব নয়, তখন ওদের দাবি মেনে নিতে হবে।"

"তাই বলে জন প্রতি একশ' টাকা?" কার্তিকদা বলেন, "কিন্তু এত টাকা ওদের দিতে হলে যে আমরা শুটিং শেষ করতে পারব না শঙ্কুদা, টাকায় কুলোবে না।"

"দেখি কি করা যায়।" বলে আমি ঠিকাদারদের জিজ্ঞেস করি, "তোমরা কি ঠিক করেছ, জুলুম করে বেশি টাকা আদায় করবে?"

ওরা তাড়াতাড়ি জিভে কামড় দেয়। বলে, "ছিঃ ছিঃ, এ কি বলছেন সাব? আপনারা আমাদের দেশের সিনিমা বানাতে এসেছেন। এই সিনিমা দেখে আপনাদের দেশ থেকে কত মানুষ আমাদের দেশে আসবেন। আমরা আপনাদের ওপর জুলুম করতে পারি?"

"তাহলে এত বেশি টাকা চাইছ কেন?"

"বেশি তো চাই নি সাব।" ওরা উত্তর দেয়।

আমি বলি, "বেশি বৈ কি, আলবাত্ বেশি চাইছ। যেখানে একজন কুলিকে যমুনোত্রী যাতায়াতের জন্য চল্লিশ টাকা দিতে হয়, সেখানে তোমরা চাইছ একশ টাকা।"

আমার কথায় ঠিকাদারদ্বয় একটু বিচলিত হয়ে পড়ে। কিন্তু তা সাময়িক। তারপরেই বলে, "সাব যমুনোত্রী যেতে আসতে যাত্রীদের যেখানে চারদিন লাগে, আপনাদের লাগবে দশ দিন।"

"দশ নয়, আট দিন।" আমি তার ভুল শুধরে দিতে চাই।

কিন্তু সে বলে, "একই কথা।"

হীরেনবাবু, কার্তিকদা ও অমূল্য হেসে ওঠে। আমি সহাস্যে বলি, "দশ দিন আর আট দিন যদি এক কথা হয়, তাহলে আট দিন আর চার দিন কেন এক কথা হচ্ছে না ঠিকাদার?"

ওরা আবার হাসে। হাসে ঠিকাদারদ্বয়। হেসে জিজ্ঞাসা করে, "তা কেমন করে হয় সাব?"

"যেমন করে আট দিনটা দশ দিন হয়েছিল।" একটু থেমে গম্ভীর স্বরে বলি, "যাক্ গে, তর্ক করে কোন লাভ নেই। এবারে কাজের কথা শোন, আমরা প্রত্যেক কুলিকে

পঁচাত্তর টাকা ও প্রত্যেক ডাণ্ডির জন্য তিন শ' টাকা করে দিতে পারি।"

"পারব না সাব্!"

"আমাদের পক্ষেও আর বেশি দেওয়া সম্ভব নয়।" আমি উঠে দাঁড়াই।

"এই আপনার শেষ কথা?"

"হ্যাঁ।" আমি ধর্মশালায় সিঁড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করি। অমূল্যরা আমার সঙ্গী হয়।

কিন্তু থামতে হয় আমাদের। কেউ পেছনে থেকে গাড়োয়ালী ভাষায় প্রশ্ন করে, "এখানে শঙ্কুদা কার নাম?"

তাড়াতাড়ি পেছন ফিরি। দেখি কোটপ্যান্ট পরা একজন সুদর্শন যুবক দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি তার দিকে তাকাতেই সে বলে, "বারে, এই তো আপনি, এখানেই রয়েছেন দেখছি।" সে তাড়াতাড়ি আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। আমি করমর্দন করি কিন্তু ঠিক চিনতে পারি না। সে বুঝতে পারে। সহাস্যে বলে, "দাদা, তিন বছরেই ভুলে গেলেন আমাকে? আমি কুন্দন সিং।"

আমি আনন্দে দিশেহারা। দুহাতে জড়িয়ে ধরি তাকে। তারপরে বলি, "শর্মাজী বলেছিলেন তোমার কথা। তবে তুমি তো শুনেছি ফুল চটিতে থাকো?"

"থাকলেও আমাকে মাল নিয়ে হামেশাই আসতে হয় যমুনা চটিতে। তবে আজ আসছি শর্মাসাহেবের চিঠি পেয়ে। তিনি আমার গাঁয়ের একজন লোকের সঙ্গে চিঠি পাঠিয়েছেন উত্তরকাশী থেকে। বলেছেন আপনাদের 'মদত্' দিতে হবে।"

কুন্দন সিং ও আমার কথাবার্তা শুনে ঠিকাদাররা বোধহয় বিচলিত হয়ে পড়েছে। তাই কাশী দত্ তাড়াতাড়ি বলে, "সাব, আর কিছু বাড়িয়ে দিন, আমি লোকের যোগাড়ে গ্রামে চলে যাই।"

"কিসের লোক?" কুন্দন প্রশ্ন করে।

আমি তাকে সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলি। সব শুনে সে ঠিকাদারদের বলে, "দেখ, কুলির কোন দরকার হবে না। তুমি যোলজন ডাণ্ডিবাহকের বন্দোবস্ত কর।"

তার উক্তিতে আমরাও বিস্মিত। তবে আমরা চুপ করে থাকি।

মর্মাহত বিজয় পাল প্রশ্ন করে, "মাত্র যোলজন ডাণ্ডিওয়ালা!"

"হ্যাঁ।" কুন্দন শান্ত স্বরে জবাব দেয়।

"তাহলে এত মাল কেমন করে ওপরে নিয়ে যাবে?" কাশী দত্ প্রশ্ন করে।

"খচ্চরের পিঠে।" কুন্দন উত্তর দেয়।

ঠিকাদারদ্বয় বাক্যহীন। কারণ কুন্দনের নিজেরই অনেকগুলি খচ্চর আছে। তার ওপর খচ্চরওয়ালারা প্রায় প্রত্যেকেই তার পরিচিত। অতএব তার পক্ষে খচ্চর সংগ্রহ করা খুবই সহজ।

একটু বাদে ঢোক গিলে বিজয়পাল প্রশ্ন করে, "সাব্রা তো এক এক জায়গায় দুদিন করে থাকবেন, তখন কি খচ্চর বসিয়ে রাখবে তুমি?"

"সে সব আমার ভাবনা। তোমরা আমাকে যোলজন ডাণ্ডিওয়ালা দাও, বল কত করে নেবে?" কুন্দন সোজা কথার মানুষ।

"বলে দিয়েছি—প্রত্যেক ডাণ্ডির জন্য চারশ' টাকা।" কাশী দত্ বলে।

"সাব কত বলেছেন?" কুন্দন জিজ্ঞেস করে।

"তিন শ' টাকা।" বিজয়পাল উত্তর দেয়।

"তোমরা কি বলেছ?"

"আমরা চারশ' টাকার কমে পারব না।"

"একটা কথা বলব?"

"বল।"

"সাড়ে-তিন শ' টাকা করে পাবে। চার ডাণ্ডির জন্য চোদ্দশ' রুপেয়া, ব্যস।"

ওরা একটুকাল চুপ করে থাকে। তারপরে বলে, "ঠিক আছে। কিন্তু সাব বলেছিলেন পাঁচটা ডাণ্ডির জন্য বিশজন লোক লাগবে।"

"সাব ভুল বলেছিলেন। চারটা ডাণ্ডি হলেই চলে যাবে।"

আমরা চুপ করে থাকি।

অগত্যা ঠিকাদারদ্বয় সেলাম করে বিদায় নেয়! যাবার সময় বলে যায়, কাল বিকেলের মধ্যে ডাণ্ডিওয়ালারা চলে আসবে এখানে।

কুন্দনকে নিয়ে আমরা উঠে আসি ওপরে। আমাদের ঘরে এসে বসি। সেতীরাম তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসে। সে ওস্তাদজীর কুশল জিজ্ঞেস করে। কুন্দন উত্তরকাশীর পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের ইন্সস্ট্রাক্টার ছিল। সেতী সেখানকার পুরনো পোর্টার। ওরা ইন্‌স্ট্রাকটারদের ওস্তাদজী বলে ডাকে।

কুন্দন কিন্তু অমূল্যকেও চিনতে পারে। পারবেই তো। ওর সঙ্গে আমার পরিচয় কেদারনাথ পর্বতাভিযানের সময়। অমূল্য সেই অভিযানের নেতৃত্ব করেছে। অভিযানের শেষে উত্তরকাশীতে পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জ্ঞান সিং আমাদের অভিনন্দিত করেছিলেন। তৎকালীন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীওয়াই. বি. চ্যবন সেই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেছেন। কুন্দন সেখানে আমাদের সবাইকে দেখেছে।

আলাপ-পরিচয়ের পালা শেষ হলে কুন্দনকে বলি, "খচ্চর যোগাড় করতে পারবে তো?"

"জরুর।" একবার থামে সে। তারপরে বলে, "সাব আপনাদের আশীর্বাদে ট্রান্সপোর্টের লাইনে এ অঞ্চলে আমার কিছু ইজ্জৎ হয়েছে। ঠিকাদাররা চার হাজার টাকা শুধু কুলি ভাড়া চেয়েছিল, আমি হাজার দুয়েক টাকার মধ্যে আপনাদের মাল পরিবহনের কাজ করে দেব। তাছাড়া একটা ডাণ্ডিও কমিয়ে দিলাম।"

"কিন্তু ডাণ্ডি কমিয়ে দিলে কেন?" জিজ্ঞেস করি।

"ঐ চারটে ডাণ্ডিতেই চলে যাবে।" কুন্দন বলে, "মাঈজীলোক ভাগ ভাগ করে চড়বেন। তীর্থের পথে এসেছেন, একুট-আধটু না হাঁটলে ভাল লাগবে না তাঁদের।"

প্রস্তাবটা ভাল লাগে না আমার। আমাদের সঙ্গে পাঁচজন ভদ্রমহিলা ও একটি ছ বছরের মেয়ে—মধুছন্দা ও তার মা, শমিতা, পদ্মাদেবী, অনুভাদি ও তাঁর মেয়ে স্বর্ণালী। ভেবেছিলাম স্বর্ণালীকে ভাগ ভাগ করে ওঁদের সঙ্গে দেব। কিন্তু এখন যে তার মাকেও অপরের ডাণ্ডির ভাগীদার হতে হবে।

কিন্তু সেকথা বলতে পারি না কুন্দনকে। আমাদের পয়সা বাঁচাবার জন্যই সে এই ব্যবস্থা করেছে। সে পাহাড়ী মানুষ। এরা বড়ই সেন্টিমেন্টাল হয়। তার চেয়ে দেখাই যাক্

না, কুন্দন কি ব্যবস্থা করে! সে যখন নিজের থেকে এত বড় দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছে, তখন তার ওপরে নির্ভর করাই ভাল।

সাত

না, একদিনের মধ্যেই দেখছি কার্তিকদার ডিপার্টমেন্ট বেশ 'অ্যাক্টিভ' হয়ে উঠেছে। ঠিক সাড়ে পাঁচটার সময় ঘুম ভাঙিয়ে শান্তি বেড-টি দিয়ে গেল।

কার্তিকদা এই ছবির অন্যতম প্রযোজক ও শিল্পনির্দেশক। কিন্তু প্রযোজনা নয়, শিল্পনির্দেশনাই তাঁর পেশা—নেশাও বটে। কলকাতার আর্ট স্কুল থেকে পাশ করে তিনি ছবির জগতে প্রবেশ করেন। সে আজ প্রায় ত্রিশ বছর আগেকার কথা। হীরেনবাবুর দাদা স্বনামধন্য বীরেন নাগের কাছে তাঁর হাতে-খড়ি। সেই থেকে কত শিল্পী ও কলা-কুশলী ছবির জগতে এলেন। তাদের কেউ খ্যাতিমান হলেন, ধনী হলেন আবার কেউ বা অখ্যাতি ও দারিদ্র্যের বোঝা বইতে না পেরে পালিয়ে গেলেন। কিন্তু কার্তিক বোস আজও রয়ে গেছেন এবং শেষ দিনটি পর্যন্ত থেকে যাবেন। পেশাটা যে তাঁর নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে।

কার্তিকদা শুধু আর্ট ডিরেকটার নয়, তিনি একজন সুগায়ক এবং ভাল তবলচি। আগে নাকি প্রায় প্রত্যেক উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত সম্মেলনের নিয়মিত শ্রোতা ছিলেন।

এখন গান-বাজনা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন কিন্তু শিল্পচর্চা ছাড়তে পারেননি। আর তা পারেননি বলেই হিমালয়ের প্রতি তাঁর অফুরন্ত ভালবাসা—অসীম শ্রদ্ধা। এবং সেই কারণেই এই ছবির জন্য দুবছর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। গতবছর ঘুরে গেছেন গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী থেকে। এবারেও সঙ্গে এসেছেন। কেবল আর্ট-ডিরেকটার হিসেবে নয়, সেই সঙ্গে 'কোয়ার্টার মাস্টার' মানে রান্নাঘরের ম্যানেজার। এবং যথাসময়ে বেড-টি পাবার পরে বলতেই হবে, 'আর্ট ডিরেকটার কার্তিক বোস ইজ এ গুড কোয়ার্টার মাস্টার টু-উ।'

হিমালয়ে বেড-টি পাবার পরে আর শুয়ে থাকার রেওয়াজ নেই। কাজেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। বারান্দায় এসেই অবাক হতে হয়—গোস্বামীদা শুভেন্দুর মেক-আপ্ শুরু করে দিয়েছেন। তিনি নির্দয়ের মতো শুভেন্দুর মুখে ঠাণ্ডা জল স্প্রে করছেন। আমাকে সুপ্রভাত জানিয়ে শুভেন্দু বলে, "কি ভাবছেন শঙ্কুদা?"

একটু হেসে বলি, "তোমার কথা। এই শীতে গালে ঠাণ্ডা জল লাগাতে হচ্ছে।"

"কি করব বলুন? ডিরেকটারের হুকুম, আটটায় শুটিং শুরু হবে।" একবার থামে শুভেন্দু। তারপরে বলে, "আপনাদের ধারণা, সিনেমা অ্যাক্টরের জীবনে কত প্রাচুর্য, কত বৈচিত্র্য! কিন্তু সেই বৈচিত্র্যের জন্য যে আমাদের কত বিচিত্র দুঃখ সইতে হয়, এ যাত্রায় আপনি তার কিছু পরিচয় পাবেন। তবে কি জানেন সৃষ্টির আনন্দ আমাদের সব দুঃখ-কষ্ট ভুলিয়ে দেয়।"

আমি কিছু বলতে পারার আগেই গোস্বামীদা বলে ওঠেন, "ওদের তো তবু জীবনে প্রাচুর্য রয়েছে। কিন্তু আমাদের কথা ভাবুন তো—আমরা এই কলা-কুশলীরা, যারা চিরকাল রুপোলি-পর্দার পেছনেই রয়ে গেলাম। দুঃখটা ঠিক তার জন্যও নয়। অনেক সৃষ্টিতেই তো স্রষ্টাকে অদৃশ্য হয়ে থাকতে হয়। কিন্তু দুঃখ হল, যে লক্ষ লক্ষ

টাকা আসছে যে ছবি থেকে, সেই ছবির কলাকুশলীদের উপোস করতে হয়।" থামেন গোস্বামীদা।

আমিও আর কোন আলোচনা না করে নেমে আসি নিচে। ধর্মশালার উঠোনের অপরদিকে একখানি খালি চালাঘর আছে, সেখানেই আমাদের রান্না হচ্ছে। ঠাকুরের সহকারী আটা মাখতে বসে গেছে। ঠাকুর জলখাবারের আয়োজন করছে। ওরা পাহাড়ী না হলেও পাহাড়ে অভিজ্ঞ। বন্ধুবর ফকির কুণ্ডু (কুণ্ডু স্পেশাল) তাঁর এই দুজন কর্মচারীকে ধার দিয়েছেন আমাদের। এরা তাঁদের সঙ্গে কয়েকবার গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী এসেছে। কাজেই শীতকে উপেক্ষা করে, সমস্ত অসুবিধেকে অগ্রাহ্য করে, যথাসময়ে কাজে লেগে গেছে। ফকিরবাবুকে ধন্যবাদ।

আমি যমুনার দিকে এগিয়ে চলি। চলতে চলতে আবার গোস্বামীদার ভাবনাটাই এসে মনকে নাড়া দেয়। কলাকুশলীদের মধ্যে তিনি প্রবীণতম। বয়স ৫৬ বছর। স্বাস্থ্যও খুব একটা ভাল নয়, অন্তত চেহারা দেখে তো তাই মনে হয়। প্রায় চল্লিশ বছর এ লাইনে আছেন। অসংখ্য ছবিতে কাজ করেছেন। কিন্তু আজও স্বচ্ছলতার মুখ দেখলেন না।

ধর্মশালা ও লালাজীর দোকানের মাঝখান দিয়ে সরু পথ। কয়েক পা এগিয়েই সিঁড়ি—বেলাভূমিতে নেমে গেছে। যমুনা অবশ্য খানিকটা দূরে।

ঘাটে এসে দেখি আমার আগেই পৌঁছে গেছেন অনেকে। কে বলবে ওঁরা এর আগে আর কখনও হিমালয়ে আসেননি? হিমশীতল জলে হাত-মুখ ধুয়ে নিচ্ছেন।

একটু বাদেই ডিরেকটার ও ক্যামেরাম্যান লোকেশানে উপস্থিত হলেন। যমুনার জল ছুঁয়ে তীরে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড একখানি পাথর—প্রায় আট/দশ হাত উঁচু। তার ঠিক সামনে জলে ডুবে থাকা একখানি পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে অভিনয় করতে হবে মধুকে—নায়িকা মধুছন্দা চক্রবর্তীকে।

এই ছবির জন্য হীরেনবাবুকে নানা বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথম বাধা ছিল অর্থের। দুবছর দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াবার পর গিরীনবাবুর সহায়তায় তিনি সে বাধা অতিক্রম করেছেন। দ্বিতীয় বাধা ছিল প্রয়োজনীয় ক্যামেরা পারমিটের—উত্তরকাশী থেকে গোমুখী পর্যন্ত অঞ্চলে ফটো তোলা নিষেধ। কলকাতার হিমালয়ান ফেডারেশান ও দিল্লীর ইণ্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউণ্ডেশানের সহায়তায় সে বাধা দূর হয়েছে। তৃতীয় বাধা ছিল সঙ্গীত পরিচালকের। পঙ্কজবাবু এই বৃদ্ধ বয়সে সে দায়িত্ব নিতে সম্মত হচ্ছিলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গল্প শুনিয়ে হীরেনবাবু তাঁকে রাজী করিয়েছেন।

চতুর্থ বাধাটা দেখা দেয় নায়িকা নির্বাচন নিয়ে। এমন কি রওনা হবার দশদিন আগেও হীরেনবাবু মনের মতো নায়িকা পান নি। এই সময় তিনি একদিন মধুছন্দার প্রথম হিন্দী ছবি 'সারা আকাশ' দেখার সুযোগ পেলেন। নায়িকার চরিত্রে মধুর অভিনয় ভাল লাগল তাঁর। পরদিন বম্বেতে ফোন করে মধুর সঙ্গে যোগাযোগ করা হল। সৌভাগ্যক্রমে সময় ছিল তার হাতে। সে সম্মত হল। গিরীনবাবু নিজে বম্বে চলে গেলেন। কথাবার্তা পাকা করে তাকে নিয়ে এলেন কলকাতায়।

কর্নেল অনিলকুমার চক্রবর্তীর কনিষ্ঠা-কন্যা মধু। বছর দুয়েক আগে তার বাবা মারা গিয়েছেন। ওরা চার বোন এবং দু ভাই। মধু পিতা-মাতার পঞ্চম সন্তান। বড় বোনদের বিয়ে হয়ে গেছে। বড়দি মনীষা ও ছোড়দি শর্মিষ্ঠা ছবিতে অভিনয় করেছেন।

বড় জামাইবাবু সমীর চৌধুরী বিখ্যাত চিত্র পরিচালক হৃষিকেশ মুখার্জির প্রথম সহকারী। তাই হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে সে মায়ের সঙ্গে বম্বে চলে গিয়েছে। তবে ছবিতে কিন্তু তার হাতেখড়ি হয়েছে অনেক আগে। আর তার মূলে ওর বাবলিদা—বাবলি সরকার। তারই আগ্রহে মধু 'দেড়শো খোকার কাণ্ড' ছবিতে প্রথম অভিনয় করে। তখন তার বয়স ১০/১১ বছর। তারপরে সে আরও তিনখানি বাংলা ছবিতে অভিনয় করে—'মধ্যরাতের তারা', 'স্বয়ম্বরা' ও 'দোলনা'। এর প্রত্যেক ছবিতেই সে ফ্রক পরে অভিনয় করেছে। অর্থাৎ নায়িকার চরিত্রে এই তার প্রথম বাংলা ছবি।

যাক্ গে, যে কথা বলছিলাম। তীর থেকে একটু দূরে ফুটখানেক জলের নিচে পড়ে থাকা একখানি পাথরে দাঁড়িয়ে সুমন মা-যমুনার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানাবে—হে যম্‌নামাঈ, মেরে পাপকো ক্ষমা করো, মেরে কষ্টকো দূর করো। আর কুমার খানিকটা দূরে একখানি পাথরের উপর বসে সুমনের সেই আকুল প্রার্থনা শুনবে। দেখবে সুমন দুহাতে জল তুলে যমুনাকে অঞ্জলি দিচ্ছে।

কিন্তু কেন? ভাববে কুমার—কেন এই মারাঠী খঞ্জ যুবতী গভীর নিশীথে লাঠি ঠুকে ঠুকে ধর্মশালা থেকে একাকী নেমে এসেছে? এই হিমশীতল জলে দাঁড়িয়ে নিজের পাপের জন্য যমুনার কাছে করজোড়ে ক্ষমা চাইছে? কেনই বা যমুনাকে তার কষ্ট দূর করে দিতে বলছে? কি তার কষ্ট? কি তার পাপ?

কুমার নিজের জায়গা ছেড়ে দিয়েছে ওদের। দিয়েছে এই মেয়েটির বয়োজ্যেষ্ঠা বান্ধবী সাবিত্রীর অনুরোধে। সুমন অসুস্থ বলেই সাবিত্রী সে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু কুমার জানে না সুমনের কি অসুখ। সে কথা সে জিজ্ঞেস করেনি। সে কখনও কথা বলেনি সুমনের সঙ্গে। শুধু শুনেছে তারা পুণা থেকে এসেছে। আর দেখেছে লাঠি ভর করে একখানি পা টেনে টেনে অতিকষ্টে পথ চলে সে।

কুমার ভেবেছে—এই পা নিয়ে কেন সে এমন দুর্গম পথে চলেছে? কিন্তু অবাক হয়নি। কারণ তীর্থের পথে এমন দু-চারজন যাত্রীর সঙ্গে তার ইতিপূর্বে বহুবার দেখা হয়েছে। সে অবাক হল মেয়েটির ঐ প্রার্থনা শুনে। যে কারণেই হোক্ মেয়েটি খঞ্জ। কিন্তু তার জন্য ডাক্তার রয়েছে, হাসপাতাল রয়েছে। পুণাতে পায়ের চিকিৎসা না করে মেয়েটি চলেছে যমুনোত্রী! যমুনা চটিতে জলে দাঁড়িয়ে যমুনার কাছে আরোগ্য কামনা করছে। বিস্ময়কর বিশ্বাস এদের—অন্ধ বিশ্বাস। হাসি পেয়েছে তার। কিন্তু হাসতে পারে নি। তাহলে যে সুমন তার উপস্থিতি টের পেয়ে যাবে।

কিছুক্ষণের মধ্যে কলাকুশলী ও শিল্পীরা এসে পৌঁছলেন অকুস্থলে। শুরু হল শুটিং। শুভেন্দুর পক্ষে মোটেই কষ্টকর নয়। সে একখানি পাথরের ওপর বসে শুধু মধুকে দেখছে আর ভাবছে। এমন কি কোন কথা পর্যন্ত বলছে না। কিন্তু মধুর পক্ষে দৃশ্যটা বড়ই কষ্টকর। হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে অভিনয় করতে হল তাকে। তুষার শীতল জল। বম্বের নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার মেয়ে সে। তার ওপর জল তো শুধুই শীতল নয়, সেই সঙ্গে জলে প্রবল স্রোত। একটু অসাবধান হলেই পড়ে যাবে। অমূল্য অবশ্য সেতীরামকে বড় পাথরখানির পেছনে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। মধু পড়ে গেলে সে তাকে ধরে ফেলবে।

কিন্তু মধু অমূল্যর সে আশঙ্কাকে বৃথা প্রমাণ করে চমৎকার অভিনয় করল।

অভিনয় শেষে তীরে উঠে আসতেই পাণ্ডে তাড়াতাড়ি শুকনো তোয়ালে দিয়ে তার পা মুছিয়ে দিল। সে যে সহকারী পরিচালক।

মাসিমা মানে মধুর মা মেয়েকে নিয়ে ধর্মশালায় চলে গেলেন। কার্তিকদা গরম জলের ব্যাগ প্রস্তুত করে রেখেছেন। *এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা জলে দাঁড়িয়েছিল* মধু। পায়ে একটু গরম সেক না দিলে অসুখ-বিসুখ হয়ে যাবে। আর নায়িকার অসুস্থ হয়ে পড়া মানে সর্বনাশ।

পরবর্তী লোকেশান ধর্মশালার সামনে। কলাকুশলী ও অভিনেতাদের দৃশ্যটা বুঝিয়ে দিলেন হীরেনবাবু—

কোন কাজে কুমার ধর্মশালার বাইরে যাচ্ছিল। সহসা একটা চিৎকার তার কানে আসে। সে তাড়াতাড়ি একটি ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। দেখে একজন বৃদ্ধ খাবার নিয়ে বসে চিৎকার করছেন তাঁর দুই পরিচারকদের উদ্দেশ্যে। দুজনের একজন লম্বা ও একজন বেঁটে। লম্বার মাথায় একটি নীল টুপি। দুজনেই ভয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে। বৃদ্ধ বলছেন—দেখ্ হারামী দেখ্।

বলেই তিনি প্রকাণ্ড হাঁ করলেন। অনুচর দুজন তাঁর মুখের ভেতরে কি যেন দেখছে? একটু বাদে বৃদ্ধ মুখ বন্ধ করে জিজ্ঞেস করলেন,—দেখা?

—জী । লম্বা ও বেঁটে কম্পিত কণ্ঠে একযোগে উত্তর দেয়।

বৃদ্ধ পুনরায় প্রশ্ন করেন—কেয়া দেখা?

—নহী হ্যাঁয় জী।

—কেয়া নহী হ্যাঁয়?

—জী দাঁত।

—তব এত্‌না শুখি রোটি কিউ পাকায়া?

—আউর কভি নহী হোগা জী।

—কভি নহী হোগা জী। বৃদ্ধ ভেংচি কাটেন,—আভি কেয়া খায়গা?

অনুচরদ্বয় বৃদ্ধ লালাজীর এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না।

ব্যাপারটা বুঝতে পারে কুমার। খিটখিটে লালাজী এই দুজন পরিচারক নিয়ে যমুনোত্রী চলেছেন। এরাই তাঁর মাল বয়, রান্না করে এবং প্রয়োজন হলে তাঁকে পিঠে করে দুর্গম পথ অতিক্রম করে। যে কোন কারণেই হোক আজকের রুটিটা একটু শক্ত হয়ে গেছে। লালাজীর দাঁত নেই। তিনি চিবুতে পারছেন না। তাই লম্বা ও বেঁটের পিণ্ডি চটকাচ্ছেন।

কুমার লালাজীর কাছে এগিয়ে আসে। তাকে দেখতে পেয়েই তিনি ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন—তোম কৌন হ্যাঁয়?

কুমার নিজের পরিচয় দেয়। লালাজী আবার প্রশ্ন করেন—তুই ইঁহা কিউ আয়া হো?

কুমার উত্তর দেয়—আমি বলছিলাম, একটু দুধ এনে দেব কি? বাইরে দুধ পাওয়া যাচ্ছে।

—দুধ! দুধসে কেয়া হোগা? এবারে বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর অনেকটা কোমল শোনাচ্ছে।

কুমার উৎসাহিত হয়ে বলে—দুধ দিয়ে ভিজিয়ে নিলে হয়তো ঐ শক্ত রুটি

আপনি খেয়ে নিতে পারতেন।

বৃদ্ধ খুশি হন।

কুমার বলে—আমাকে তাহলে একটা পাত্র দিন, আমি দুধ নিয়ে আসছি।

বৃদ্ধ আবার ক্ষেপে ওঠেন। বলেন—তুমি কেন দুধ নিয়ে আসবে? তাহলে আমি এই দুই আপদকে অযথাই এত খরচা করে সঙ্গে নিয়ে এলাম কেন? অতএব তিনি তাদের দুধ নিয়ে আসার আদেশ করেন।

তারা চলে যায়, কুমারও চলে আসতে চায়। লালাজী বাধা দিয়ে তাকে বসতে বলেন। কুমার বসে পড়ে। লালাজী তার দিকে একটা কৌটা এগিয়ে দেন।

কুমার কৌটা খুলে দেখে ভেতরে চুরণ মানে মুখরোচক হজমী গুঁড়ো রয়েছে।

বৃদ্ধ বলেন—আগ্রার খোদ মনোহর পরসাদের দোকান থেকে এই চুরণ নিয়ে এসেছি। খেয়ে নাও খানিকটা!

কুমার ইতস্তত করে। বৃদ্ধ ক্ষেপে যান। বলেন,—এই হচ্ছে আজকালকার ছেলেদের দোষ। আর তোমাকে বলা বৃথা। নিজের ছেলে, যাকে এত কষ্ট করে মানুষ করলাম, সেই কথা শুনল না। একটু থেমে বৃদ্ধ ঘটনাটা বলে যান—মা-মরা ছেলেকে তিনি পিতা-মাতার যৌথ স্নেহে মানুষ করেছেন। ক্ষত্রিয় লালাজীর সেই এম. এ. পাশ ছেলে কিনা শেষ পর্যন্ত একটি ব্রাহ্মণের মেয়েকে বিয়ে করে বসল। ছেলের সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই বৃদ্ধ লালাজী যমুনোত্রী চলেছেন। ছেলেকে তো বটেই, বৌমাকেও কিন্তু তিনি বলেননি কথাটা। বললে কি আর তাঁরা আসতে দিত তাঁকে। ছেলে-বৌকে ঠকিয়ে আসতে পারার আনন্দে মশগুল হয়ে উঠলেন লালাজী।

আর কুমার? খিট্‌খিটে বৃদ্ধের অপরূপ বাৎসল্যের পরিচয় পেয়ে বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে তার মন।

লালাজীর চরিত্রে অভিনয় করছেন পান্নালাল চক্রবর্তী। দানীবাবুর পরবর্তী যুগের বিখ্যাত মঞ্চাভিনেতা ৺কুঞ্জলাল চক্রবর্তীর পুত্র পান্নাবাবু। তিনি মার্টিন অ্যান্ড বার্ন কোম্পানিতে চাকরি করতেন। সারাজীবন সখের অভিনয় করেছেন। বহু ছবিতে নেমেছেন। বয়স বাহাত্তর বছর। আমাদের দলের প্রবীণতম সদস্য। বড় ভাল লোক। সেদিন বাসস্ট্যান্ডে পরিচয় হবার পরেই আমার হাত দুখানি মুঠোয় ভরে নিয়ে বলেছিলেন, "বড় আনন্দ হল আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে। আপনি লেখক হয়েও আমাদের জন্য এত কষ্ট করছেন। ভগবান আপনার ভাল করবেন।"

লম্বা ও বেঁটের চরিত্রে অভিনয় করছে সহকারী পরিচালক ও সহকারী রূপসজ্জাকর হৃদয়েশ পাণ্ডে ও কেষ্ট দাস। হীরেনবাবু এ ছবিতে চিরাচরিত পদ্ধতির আশ্রয় নেননি। তিনি নামের বিচারে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নির্বাচিত করেননি। চরিত্রের সঙ্গে চেহারা ও বয়সের মিলটাই প্রথম বিচার করেছেন। অথচ এজন্য তাঁকে প্রচুর ঝুঁকি নিতে হয়েছে। মধুছন্দার কথাই ধরা যাক। মধু বাংলা চলচ্চিত্রে মোটামুটি অপরিচিতা। তবু হীরেনবাবু বাংলার কোন জনপ্রিয় অভিনেত্রীকে না নিয়ে তাকে নায়িকার চরিত্রে নির্বাচিত করেছেন। কারণ হীরেনবাবুর স্থির বিশ্বাস সুমনের চরিত্রের সঙ্গে তার চেহারা হাব-ভাব ও কথাবার্তার একটা সাদৃশ্য আছে।

শুটিং আরম্ভ হল। পান্নাবাবু, পাণ্ডে ও কেষ্ট ভালই অভিনয় করছে। কিন্তু একটা

সমস্যা দেখা দিল। সমস্যাটা অভিনয়ের নয়, পোশাকে—পাণ্ডের পোশাক।

প্রথম দৃশ্য থেকে পাণ্ডে একটা নীল গাড়োয়ালী টুপি মাথায় পরে নিয়েছিল। টুপিটায় তাকে মানিয়েছিল বেশ। কেউ জিজ্ঞেস করেনি টুপিটা কার। গুটি তিনেক দৃশ্য গ্রহণের পর হঠাৎ জনৈক অপরিচিত দর্শক এক ছোঁ মেরে পাণ্ডের মাথা থেকে টুপিটা তুলে নিল।

হীরেনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "কাট্।" তারপরে বিরক্তকণ্ঠে পাণ্ডেকে প্রশ্ন করলেন, "ওকি, লোকটা তোমার টুপি নিল কেন?"

"ওটা যে ওর টুপি।" পাণ্ডে বিনীত কণ্ঠে বলে।

"তাহলে ওকে দাম দিয়ে টুপিটা কিনে নাও। ওটা না হলে যে কন্টিনিউটি নষ্ট হয়ে যাবে। আগের তিনটে শট্ রি-টেক্ করতে হবে।"

পাণ্ডে অপরাধীর কণ্ঠে বলে, "তাই ভেবেই টুপিটা খুলে নিয়েছিলাম ওর মাথা থেকে। কিন্তু লোকটা কিছুতেই টুপি বেচতে রাজী হচ্ছে না। বলছে—এই টুপি পরে ও যাত্রায় গিয়েছে, যমুনোত্রীর মন্দিরে পুজো দিয়েছে, এই টুপি পরেই তাকে ঘরে ফিরতে হবে।"

বিরক্ত হীরেনবাবু আমাকে বলে, "দেখুন তো লোকটাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজী করাতে পারেন কিনা? পাঁচ-দশ টাকা যা হয় দিয়ে টুপিটা কিনে নিন।"

আমি কুন্দনকে নিয়ে বেরিয়ে আসি ধর্মশালা থেকে। সেই হোটেলের সামনে এসে দেখি লোকটি তার সহযাত্রীদের সঙ্গে রওনা হবার আয়োজন করছে।

কুন্দন বলে, "এরা গঙ্গানীর লোক। যাত্রায় এসেছিল এখন গাঁয়ে ফিরছে।"

বলি, "দেখ না, একটু বলে-কয়ে। সাধারণ কাপড়ের টুপি বড় জোর দেড়-দু'টাকা দাম হবে। আমরা দশ টাকা দিতে প্রস্তুত আছি!"

কুন্দন বলে, "টাকার তো প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা হচ্ছে বিশ্বাসের। এরা বিশ্বাস করে, এই টুপি পরে ঘরে না ফিরতে পারলে যাত্রা বিফল হবে। কাজেই ওকে রাজী করানো যাবে বলে মনে হচ্ছে না।

কুন্দনের কথা সত্য হয়। বহু চেষ্টা করেও রাজী করানো গেল না লোকটিকে। শেষ পর্যন্ত সে তার সঙ্গীদের সঙ্গে ঘরের পথে পা বাড়াল।

আমরা পা বাড়াই ধর্মশালার দিকে। আমাদের 'মিশন আনসাকসেসফুল'। কিন্তু এই ব্যর্থতার জন্য যে বড় বেশি মূল্য দিতে হবে। তিন-তিনটা দৃশ্য আবার রি-টেক্ করতে হবে। অনেকগুলি টাকা এবং অনেকখানি সময় নষ্ট হল। আজ আরও একটা লোকেশানে কাজ করার কথা ছিল। তা আর হয়ে উঠবে না।

রাগ হচ্ছে পাণ্ডের ওপর। সেদিন সে দেখেছে লছমনঝুলার অশোকবাবুর অর্থাৎ অরোরাজীর টুপির জন্য কি ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল। তবু সেদিন আমরা আগে টুপির মালিককে 'ম্যানেজ' করে, পরে কাজ শুরু করেছিলাম। আর আজ সে লোকটার সঙ্গে কথাবার্তা না বলেই টুপি মাথায় দিয়ে অভিনয় শুরু করে দিল। অথচ তার কোন প্রয়োজন ছিল না। লম্বার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য পুরো পোশাক নিয়ে আসা হয়েছে। না হয় ঐ টুপিটায় তাকে একটু ভাল মানিয়েছিল।

সব শুনে হীরেনবাবু বলেন, "কি আর করা যাবে? বিশু! শুভাশিস! রি-টেক্ কর।

অন্য কোন লোকেশানে আজ সুটিং করা হয়ে উঠবে না। কাল সেই শুটিং করতে হবে। কাল আমরা আর হনুমান চটি রওনা হতে পারব না!"

"সাব টোপিকা লিয়ে ফিকর মত্ কিজীয়ে।" হঠাৎ দিল বাহাদুর বলে ওঠে। সে কাছে আসে আমার। তার সঙ্গে মণিরাম। বুঝলাম আমরা বাংলায় আলোচনা করলেও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে ওরা। এবং দুজনে একটা কিছু পরামর্শ করে এখানে এসেছে। আমি ওদের দিকে তাকাই।

দিল বাহাদুর আবার বলে, "সাব টোপি আভি মিল জায়েগী।"

"কিধর?" আমি উচ্ছ্বসিত স্বরে প্রশ্ন করি।

"ইধর সাব।" মণিরাম ধর্মশালার সেই দর্জির দোকানটা দেখিয়ে দেয়।

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি, "এখানে ঐ টুপি বানাতে পারবে?"

"কেন পারবে না। এই দর্জির কাছ থেকেই তো ঐ লোকটা যমুনোত্রী যাবার সময় ঐ টুপিটা কিনে নিয়ে গেছে। দিল বাহাদুর উত্তর দেয়।

তাড়াতাড়ি পাণ্ডেকে নিয়ে দিল বাহাদূরের সঙ্গে এসে দর্জির দোকানে ঢুকি।

সত্যই পাওয়া যায়। ঐ ধরনের কয়েকটা তৈরি টুপি ছিল। তারই একটা লেগে গেল পাণ্ডের মাথায়। টুপি পেয়ে পাণ্ডের প্রেস্টিজ বাঁচল। বাঁচল কয়েক শ' ফুট ফিল্‌ম এবং কয়েক ঘণ্টা সময়, হয়তো বা একটা দিন। আর তা বাঁচালো দিল বাহাদুর। না, সে সত্যই বাহাদুর।

দুপুরে খাওয়ার পরে কিন্তু আমরা বিশ্রামের অবকাশ পেলাম না। ছুটতে হল নতুন লোকেশানে—ধর্মশালা থেকে যমুনোত্রীর পথে প্রায় মাইলখানেক দূরে। পথে কাঠের পুলের ওপর দিয়ে যমুনা পার হতে হল। তবে লোকেশান যমুনারই তীরে—তাই তো হবে। গঙ্গা-যমুনার দেশে এসেছি। গঙ্গা ও যমুনাকে নিয়ে ছবি। হীরেনবাবু কি তাদের বাদ দিয়ে লোকেশান সিলেক্ট করতে পারেন? গত বছর শরৎকাল কার্তিকদা ও দিলীপকে নিয়ে হীরেনবাবু যখন এ অঞ্চলে এসেছিলেন, তখনই তিনি লোকেশান সিলেক্ট করে গেছেন।

লোকেশানটি চমৎকার। অনেক নিচে যমুনার আঁকাবাঁকা রুপোলী ধারা। যমুনা এখানে অনেকটা ইংরেজী 'ইউ' অক্ষরের মতো একটি বাঁক নিয়েছে। পায়ে-চলা প্রশস্ত পথটিও আঁকাবাঁকা। পথের দুদিকেই গাছ-পালা লতা-পাতা ও জানা-অজানা ফুলের সমারোহ। পথের ডান দিকে গভীর খাদ—একেবারে যমুনার বেলাভূমি পর্যন্ত। আর বাঁদিকে পাহাড়—নিচু পাহাড়। পাহাড়ের গা দিয়ে একটি সরু পথ নেমে এসে মিশেছে মূল-পথে।

পরিচালক দৃশ্যটা বুঝিয়ে দিলেন সবাইকে। যাত্রীদল যমুনা চটি থেকে যাত্রা করেছে যমুনোত্রীর পথে—চলেছে হনুমান চটির দিকে। পরিচিতদের পেছনে ফেলে কুমার একাকী আগে আগে পথ চলেছে। সহসা তার নজর পড়ে পাশের পাকদণ্ডীর দিকে—পাহাড়ীদের সংক্ষিপ্ত দুর্গম পথ। দেখে লম্বা ও বেঁটের কাঁধে ভর করে লালাজী চলেছেন চড়াই পথে।

কুমার থমকে দাঁড়ায়। চিৎকার করে ডাকতে থাকে—লালাজী, লা...লা..জী, লা...লা...

লালাজী শুনতে পান। তিনি লম্বা ও বেঁটের কাঁধ ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ান, পেছন ফেরেন—দেখতে পান কুমারকে। কয়েক ধাপ নিচে নেমে আসেন। ইতিমধ্যে কুমারও অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। সে জিজ্ঞাসা করে—ওদিকে কোথায় চলেছেন?

—কেঁও হনুমান চটি। সিধা রাস্তা। সোজা উত্তর দেন লালাজী।

কুমার প্রতিবাদ করে—কিন্তু এ তো পাকদণ্ডীর পথ, যমুনা চটিতে সবাই নিষেধ করেছেন ও পথে যেতে।

লালাজী অসন্তুষ্ট হন কুমারের কথায়। তিনি কখনও কোন প্রতিবাদ সহ্য করতে পারেন না। তাই কর্কশ স্বরে বলেন—খোকা, আমি পাহাড়ী মানুষ। হামার জনম সিমলামে। হামি পাহাড়ী পথ জানে। হামি যাবে হনুমান চটি। যো পথ নজদীগ হোবে, হামি সো পথে যাবে। একবার থামেন তিনি। তারপরে একটু হেসে আবার বলেন—চল চল। তোমভি হামরা সাথমে চল। হামলোগ জলদি জলদি হনুমান চটি চলা যাবে।

—না লালাজী। কুমার রাজী হয় না। বলে—আমি অচেনা পথে যাব না।

ক্ষেপে যান লালাজী। তিনি পেছন ফিরে আবার তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের কাঁধে ভর করেন। চল্, লম্বু চল্।

কুমার আর কিছু বলতে পারেন না। শুধু নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে আর চেয়ে চেয়ে দেখতে থাকে লালাজীর অপসৃয়মাণ দেহটিকে। এক সময় পাইনের পেছনে আর পাথরের আড়ালে লালাজী তার দুই দেহরক্ষী নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

সন্ধ্যার একটু আগে আমরা শুটিং শেষ করে ফিরে এলাম ধর্মশালায়। এসে দেখি উঠোনে মেলা মিলেছে। ডাণ্ডিবাহকরা এসে গেছে। এসেছে ঘোড়াওয়ালা আর গ্রামবাসিরা। তারা এসেছে দর্শনার্থী হিসেবে। এসেছে আমাদের দর্শন করতে। ওদের অনেকেই সিনেমা দেখেনি কিন্তু প্রায় প্রত্যেকেই সিনেমার গল্প শুনেছে। সেই সিনেমার লোক আমরা। অতএব আমরা দর্শনীয়।

কিন্তু আমাদের চাইতেও যে দর্শনীয় বস্তু শান্তিবাবুর কাছে রয়েছে, এটি তখনও জানা ছিল না তাদের। জানতে পেরেই তারা আমাদের ছেড়ে ভিড় জমালো শান্তিবাবুর সামনে। শান্তিবাবু জেনারেটার চালিয়েছেন—ক্যামেরার ব্যাটারি চার্জ করতে হবে। আর জেনারেটার যখন চালাতেই হচ্ছে, তখন মোমের আলোয় থাকা কেন? শান্তিবাবু রান্নাঘরে ও ধর্মশালায় বারান্দায় দুটি বাল্‌ব-এর ব্যবস্থা করেছেন। তার উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়েছে ধর্মশালার উঠোনে।

এ বস্তুটি দেখবার প্রত্যাশা করেনি দর্শনার্থীরা। অতএব তারা বিস্মিত। হবারই কথা। এর আগে আর কোনদিন যে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলেনি যমুনা চটিতে।

কুন্দন সিং তার কাজ প্রায় শেষ করে ফেলেছে। ঠিকাদার ও ঘোড়াওয়ালাদের কাকে কত টাকা করে অগ্রিম দিতে হবে, তার হিসেব হয়ে গেছে। ভাগ্যিস এ লোকটিকে পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু লোকটা নিজের কাজ-কর্ম ফেলে কেন আমাদের এত সাহায্য করছে? এর পিছনে তার কি কোন স্বার্থ আছে?

সম্ভবত নেই। কারণ নিঃস্বার্থ পরোপকার বস্তুটি এখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি হিমালয় থেকে। এরা দরিদ্র ও অশিক্ষিত হতে পারে কিন্তু অসৎ নয়।

খাওয়ার পরে আলোচনা শুরু হয়। আর কুন্দন সিং সে আলোচনার অন্যতম

অংশীদার। আলোচনা কালকের কর্মসূচী নিয়ে। কাল বেড-টির পরে আর্টিস্টরা মেক-আপ্ সেরে নেবেন। ব্রেক-ফাস্ট করে আমরা রওনা হব হনুমান চটি—যমুনা চটি থেকে ১০ মাইল। পথে পথে শুটিং করে পাঁচ মাইল হেঁটে স্যানা চটিতে পৌঁছব দুপুরবেলা। সেখানে দোকান-পাট আছে। 'লাঞ্চ' পাওয়া যাবে।

স্যানাতে ঘণ্টাখানেক থেমে আমরা রওনা হব রাণা—স্যানা থেকে আড়াই মাইল। চড়াই বলে এই পথটুকুকে আর কোন শুটিং করা হবে না। কিন্তু রাণাতে খানিকটা শুটিং আছে। সেইখানেই বৈকালী চায়ের আসর বসবে।

রাণা থেকে হনুমান চটি আড়াই মাইল। পথ খারাপ নয়! ঘণ্টাখানেক সময় লাগবে। আমরা সন্ধ্যার আগেই পৌঁছে যাব হনুমান চটি। মালপত্র ঘোড়ার পিঠে যাচ্ছে—আমাদের আগেই চলে যাবে। আর সেজন্য কুন্দন রয়েছে, শান্তিবাবু সাহায্য করবেন তাকে। অতএব আমরা নিশ্চিন্ত।

"তা তো বুঝলাম।" বিশুবাবু মাঝখান থেকে বলে ওঠেন। "কিন্তু আমি তো পাণ্ডের জন্য চিন্তা না করে পারছি না।"

বিশুবাবুর দিকে তাকাই। বিশুবাবু কিন্তু তাকিয়ে রয়েছেন পাণ্ডের দিকে। তিনি আবার বলেন, "বুঝলে পাণ্ডে, তোমার জন্য আমার বড়ই দুশ্চিন্তা হচ্ছে।"

"কেন বিশুদা।" পাণ্ডে মুখ তুলে তাকায়। সে ডায়েরি লিখছিল। রোজই কাজের শেষে পাণ্ডে ডায়েরি লিখতে বসে।

বিশুবাবু বলেন, "পাণ্ডে তুমি অজয়বাবুর অ্যাসিস্টান্ট। হীরেন একদিন তোমারই মতো তাঁর অ্যাসিস্টান্ট ছিল, আর সে কিনা আজ ডিরেকটার হয়ে তোমাকে এমন একটা ল্যাং মারল?"

শুধু পাণ্ডে নয় আমরাও অবাক হচ্ছি বিশুবাবুর কথায়। তিনি কোন্ লাইন নেবেন ঠিক ধরতে পারছিল না। হীবেনবাবু কিন্তু হাসছেন। তিনি বিশুবাবুর বহুদিনের বন্ধু। বোধহয় বুঝতেই পেরেছেন ব্যাপারটা।

পাণ্ডেও হাসছে। হাসতে হাসতে বলে, "এ কি বোলছেন বিশুদা, হীরেনদা আমাকে ল্যাং মারবেন কেন? হীরেনদা আমাকে খুব প্যার করেন।"

"পেয়ার করে?" চেঁচিয়ে ওঠেন বিশুবাবু।

আর সঙ্গে সঙ্গে হেসে ওঠে দীপক। একটু বাদে সে হাসি থামিয়ে বলে, "আমি আপনাকে তখুনি বলেছি বিশুদা, পাণ্ডে ব্যাপারটা মোটেই বুঝতে পারেনি।"

বুঝতে পারছি ব্যাপারটা নিয়ে দুই ক্যামেরাম্যানের আলোচনা হয়ে গেছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি?

পাণ্ডেও বুঝতে পারেনি। তবু সে আবার বলে, "হীরেনদা আমাকে বহুৎ প্যার করেন।"

"তা না হলে আর পান্নাবাবুকে দিয়ে তোমাকে হারামী বলিয়ে নিলে।" এতক্ষণে বিশুবাবু ব্যাপারটা খুলে বলেন।

আমরা হেসে উঠি। হীরেনবাবুও বাদ যায় না।

পাণ্ডে কিন্তু হাসিতে যোগ দেয় না। আমাদের হাসি থামলে বলে, "এ আপনি কি বোলছেন বিশুদা? ও ডায়লগ্ তো বইতে আছে।"

"বইতে আছে?" দীপক বলে, "তুমি বই পড়েছ?"

"না।" পাণ্ডে জবাব দেয়।

"আচ্ছা এই তো শঙ্কুদা রয়েছেন, তাঁকেই জিজ্ঞেস কর না। আচ্ছা শঙ্কুদা, বইতে কি ঐ ডায়লগ্ আছে?"

"না"। আমি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিই।

"কি আছে?" বিশুবাবু জিজ্ঞেস করেন।

"আছে—দেখ্, বুদ্ধু দেখ্!"

"তাহলেই বুঝতে পারছ পাণ্ডে, হীরেন তোমাকে কেমন ল্যাং মেরেছে, তোমাকে হারামী বানিয়ে দিয়েছে।" বিশুবাবু মন্তব্য করেন।

পাণ্ডে কিন্তু ঘাবড়ায় না। বলে, "আমাকে ল্যাং মারবেন কেন? সীনটাকে ন্যাচারাল করবার জন্য সীনারিওতে অমন একটু-আধটু চেঞ্জ করতে হয়। আপনারা ক্যামের‍্যামান ক্যামেরা নিয়ে থাকুন, সীনারিও-র আপনারা কি বুঝবেন?"

"সাবাস পাণ্ডে, সাবাস"! হীরেনবাবু তাঁর সুযোগ্য সহকারীকে বাহবা দেন।

প্রবল অট্টহাসিতে ফেটে পড়ি আমরা। এবারে স্বল্পভাষী এবং গম্ভীর কার্তিকদাও আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

আট

পাণ্ডা জগৎরাম যেন কোথা থেকে এসে হাজির হলেন। সেদিন বাসস্ট্যান্ডে সেই যে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তারপরে আর তাঁর দেখা পাইনি। জগৎরাম এসেই জিজ্ঞেস করলেন, "বাবুজী আজ হনুমান চটি রওনা হচ্ছেন তো?"

"হ্যাঁ।" আমি উত্তর দিই।

"চলুন, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি। একটা বিয়ের ব্যাপারে আটকে পড়েছিলাম, তাই এ দু'দিন আপনাদের খোঁজখবর নিতে পারিনি। সবাই ভাল তো?"

"হ্যাঁ।"

"কখন রওনা হচ্ছেন?"

"সকালের জলখাবার খেয়ে নিয়েই।"

"খুব ভাল। বিকেলে রোজই বৃষ্টি হচ্ছে। যত সকালে রওনা হতে পারেন, ততই ভাল।" হীরেনবাবু জিজ্ঞেস করেন, "আচ্ছা পাণ্ডাজী, যমুনোত্রী মন্দিরের মধ্যে ছবি তুলতে পারব তো?"

"কেন পারবেন না? তবে মন্দিরের ভেতরটা অন্ধকার, ছবি উঠবে না বোধ হয়।"

হীরেনবাবু হেসে বলেন, "আমরা আলো সঙ্গে নিয়ে যাব।"

বিস্মিত জগৎরাম জিজ্ঞেস করেন, "আলো! কিসের আলো বাবুজি?"

"ইলেকট্রিক লাইট। আমাদের সঙ্গে জেনারেটার রয়েছে।" হীরেনবাবু বলেন।

"আপনারা যমুনোত্রীর মন্দিরে লাইট জ্বালাবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ বাবুজি! মা যমুনা আপনাদের আশীর্বাদ করবেন। এই প্রথম তাঁর মন্দিরে ইলেকট্রিক লাইট জ্বলবে।" পাণ্ডাজীর চোখে মুখে কৃতজ্ঞতা যেন উপছে পড়ছে।

মধু, তার মা ও পদ্মাদেবীর ডাণ্ডি রওনা হয়ে গেল। আর একটি ডাণ্ডি রয়েছে।

শমিতা ও অনুভাদি পালা করে সেটিতে উঠবে, সঙ্গে থাকবে স্বর্ণালী।

শমিতা বলে, "এখন অনুভাদি উঠুন, আমি পরে উঠব।"

স্বর্ণালী আগের থেকেই ডাণ্ডিতে বসে আছে। সে মাকে তাগিদ দেয়, "মা, তাড়াতাড়ি এসো, মধুমাসি বহুদূর চলে গেলেন এতক্ষণে।"

কিন্তু মা ডাণ্ডির ভেতরে পা বাড়াতেই ডাণ্ডিওয়ালারা হেঁকে উঠল, "দুজনকে তো নিতে পারব না।"

দুজন! আমরা বিস্মিত। দুজন কোথায়? ছ' বছরের স্বর্ণালী আর তার ছোট-খাটো মা—ওরা দুজন হলেন কেমন করে? জিজ্ঞেস করি ঠিকাদারকে। সে দেখে শুনে রায় দেয়—ডাণ্ডিবাহকরাই ঠিক বলছে, ওরা দুজনই হয়ে গেছেন এবং এক ডাণ্ডিতে দুজনকে নেওয়া যাবে না।

তাহলে উপায়? এখন তো আর ডাণ্ডি পাওয়া যাবে না। কুন্দন লজ্জিত। সেই আমাদের অর্থ সাশ্রয় করবার জন্য পাঁচটার জায়গায় চারটে ডাণ্ডির ব্যবস্থা করেছিল। বহু চেষ্টা করে এমন কি বেশি টাকা দেবার লোভ দেখিয়েও স্বর্ণালী ও তার মাকে একজন করা গেল না। তাহলে উপায়?

ঠিকাদার উপায় বাতলায়—"মাতাজী হেঁটে যান আপনাদের সঙ্গে।"

'খুবই সহজ উপায় আর তাতে ডাণ্ডিবাহকদের কাজটাও সহজ হয়ে যাবে। তারা ঝড়ের বেগে ছোট্ট স্বর্ণালীকে হনুমান চটি নিয়ে যেতে পারবে।

ছোট্ট হলেও স্বর্ণালী বুঝতে পারে ব্যাপারটা। সেও ঠিকাদারের দলে। তাই তাড়াতাড়ি বলে, "মা, তাই ভাল। তুমি শঙ্কুমামুদের সঙ্গে এসো। এই ডাণ্ডিওয়ালা চল না, মধুমাসি কখন চলে গেছেন।" তার আর তর সইছে না।

আমরা তার আগ্রহ দেখে হেসে উঠি। কিন্তু কোন সমাধান খুঁজে পাই না।

সমাধান করে দেন অনুভাদি। তিনি বলেন, "আর যখন ডাণ্ডি পাওয়া যাবে না, তখন চলুন, রওনা দেওয়া যাক্।"

"কিন্তু আপনি এতটা রাস্তা হেঁটে যেতে পারবেন কি?" আমি বলি।

"পারতেই হবে শঙ্কুদা! অনুভাদি বলেন। "তাছাড়া শমিতা পারলে, আমি পারব না কেন?" একবার থামেন তিনি। তারপরে ডাণ্ডিবাহকদের বলেন, "তোমরা রওনা হও, আমি হেঁটেই যাচ্ছি।"

তারা খুশি হয়। তাড়াতাড়ি ডাণ্ডি ওঠায়। খুশি হয় স্বর্ণালী। সে তার ছোট্ট একখানি হাত নাড়তে নাড়তে বলে ওঠে, "মা! টা টা...।"

লজ্জিত কুন্দন অনুভাদিকে বলে, "মা, সব মালপত্র যাবার আগে আমি রওনা হতে পারছি না, তবে পথে ধরে ফেলব আপনাদের, তখন খুকিকে আমি কাঁধে নিয়ে নেব, আপনারা দুজন পালা করে ডাণ্ডিতে যাবেন।"

"না না, তার দরকার নেই।" শমিতা ও অনুভাদি একযোগে বলে ওঠেন, "আমরা ঠিক হেঁটে যেতে পারব।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো পারবেনই।" কুন্দন বলে, "পথ খুবই ভাল। তবে আপনারা কলকাতার মানুষ, একটু কষ্ট হবে।" কুন্দন বিনীতভাবে বলে, "তাই বলছিলাম, আপনারা ধীরে ধীরে চলুন। আমি এসে ব্যবস্থা করছি।"

আমরা বেরিয়ে পড়ি! ওরা অনেকেই এগিয়ে গেছেন। হীরেনবাবুও আগের দলে। তাঁকে একটু তাড়াতাড়ি হাঁটতে হবে আজ—লোকেশানগুলো খুঁজে বার করতে হবে। হীরেনবাবুর সঙ্গে রয়েছেন বিশুবাবু, দীপক ও দিলীপ। তরুণ সহকারী পরিচালক দিলীপ মিত্র। সত্যজিৎবাবুর সঙ্গে একাধিক ছবি করেছে। হিমালয়ের প্রতি তার রয়েছে একটা দুর্নিবার আকর্ষণ। গত বছর হীরেনবাবু ও কার্তিকদার সঙ্গে গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী ঘুরে গেছে। সে বেশ ভাল হাঁটে।

অমূল্যও এগিয়ে গেছে। সে রয়েছে শুভেন্দু, অশোকবাবু ও দুর্গাবাবুর সঙ্গে। শুভেন্দু সুন্দর হাঁটে। তবু সে ছবির নায়ক। তার প্রতি সর্বদা নজর রাখা দরকার। আর অশোকবাবু এবং দুর্গাবাবু দুজনেই কিঞ্চিৎ ভারী। তাঁরাও অভিনেতা এবং এমন পথে অনভিজ্ঞ। কাজেই অমূল্য তাঁদের সঙ্গে করে নিয়ে যাচ্ছে।

শুভাশিস ও কার্তিকদা রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। শমিতা ও অনুভাদিকে নিয়ে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি।

আধঘণ্টার মধ্যে কালকের সেই লোকেশান ছাড়িয়ে আসি—কাল যেখানে শুভেন্দু ও লালাজীর দৃশ্যটা গ্রহণ করা হয়েছে।

লোকেশান ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে যমুনা চটি থেকে আসা আমাদের এই পায়ে চলা পথটি ওপরের বড় রাস্তার সঙ্গে মিলিত হল। বড় রাস্তাটি এসেছে কুতনৌর বাসস্ট্যান্ডের অপর তীর থেকে। পথ তৈরি হয়ে গেছে স্যানা চটি পর্যন্ত। কিন্তু কুতনৌর-যমুনার ওপরে পুলটি তৈরি হয় নি বলে বাস যেতে পারছে না। *

কুন্দন ঠিকই বলেছিল, পথ সত্যই ভাল। সুপ্রশস্ত প্রায় সমতল পথ। আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি আর চলতে চলতে চেয়ে দেখি চারিদিক। পথের বাঁ দিকে পাহাড়, ডানদিকে অনেক নিচে যমুনার আঁকা বাঁকা রুপোলি রেখা। পথের দুপাশেই—পাহাড় আর ঢালের গায়ে গাছ-পালা।

শমিতা, শুভাশিস ও অনুভাদি আনন্দে আত্মহারা—অক্লেশে এগিয়ে চলেছে। অথচ এমন পথে চলবার অভ্যাস নেই ওদের। কথায় কথায় শমিতা বলে, "জানেন শঙ্কুদা, আমার একদম হাঁটবার অভ্যাস নেই। কলকাতায় গাড়ি ছাড়া বাড়ির বাইরে বের হই না। অথচ কি আশ্চর্য, আজ আমার একটুও কষ্ট হচ্ছে না জানেন।"

অনুভাদি বলে, "আমারও বড় ভাল লাগছে হাঁটতে। মনে হচ্ছে ভাগ্যিস ডাণ্ডিবাহকরা আমাকে নিতে রাজী হয় নি।"

সত্যই সুন্দর পথ। আর তাই এত তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ সামনে তাকিয়ে দেখি একটি পথ নেমে গেছে নিচে—দুই পথের মিলনবিন্দুতে হিন্দী সাইনবোর্ড 'ওয়াজিরী'। তার মানে যমুনা চটি থেকে তিন মাইল পথ পেরিয়ে এলাম। নিচে যমুনার তীরে ছোট গ্রাম ওয়াজিরী—উচ্চতা ৫৬৬০ ফুট।

কার্তিকদাকে প্রশ্ন করি, "এই গ্রামটার ছবি নিলেন না কেন?"

"নেওয়া হবে।" কার্তিকদা বলেন, "বাঁকের ওপরে একটা জায়গা আছে, যেখান থেকে গ্রামটিকে আরও সুন্দর দেখায়।"

---

* এখন বাসপথ প্রসারিত হয়েছে হনুমান চটির পুল পর্যন্ত।

"কিন্তু যাঁরা ছবি নেবেন, তাঁরা কোথায়?" অনুভাদি জিজ্ঞেস করেন।

কার্তিকদা হেসে বলেন, "সেখানেই বসে আছে, চলুন তাড়াতাড়ি পা চালানো যাক। ওরা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে।"

কার্তিকদার অনুমান মিথ্যে নয়। খানিকটা এগিয়ে বড় বাঁকটা ঘুরতেই দেখতে পেলাম তাঁদের। আমরা কাছে আসতেই শুভেন্দু বলে ওঠে, "ছিঃ ছিঃ শঙ্কুদা, এই 'স্পীড্' নিয়ে আপনি 'মাউন্টেনিয়ারিং' করেন?"

আমি হাসতে থাকি। দীপক গম্ভীর স্বরে শুভেন্দুকে জিজ্ঞেস করে, "শঙ্কুদা মাউন্টেনিয়ারিং করেন, একথা তোকে কে বললে শুভু!"

"কেন, এতগুলো বই লিখলেন হিমালয়ের ওপরে?"

"ওগুলো সব গুল—ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বসে লেখা। শঙ্কুদা আমাদেরই মতো এই প্রথম হিমালয়ে এলেন।" দীপক শুভেন্দুকে বলে।

আমি নীরবে হাসতে থাকি। কিন্তু নীরব থাকতে পারে না শমিতা। সে প্রতিবাদ করে, "তোদের কথা আর বলিস না, লীডার অমূল্য সেনকে নিয়ে সটকে পড়েছিস। ভাগ্যিস শঙ্কুদা ছিলেন, তাই তো আমরা এত পথ আসতে পারলাম।"

"তা তুই নিয়ে নে না তোর লীডারকে, শঙ্কুদাকে দিয়ে দে আমাদের।" শুভেন্দু শমিতাকে বলে।

"সেটি হবে না। শঙ্কুদাকে ছাড়ব না আমরা। কি বলেন অনুভাদি।"

"নিশ্চয়ই।"

"আমরাও ছাড়ব না শঙ্কুদাকে। আমাদের দাবি।"

"মানতে হবে।" শুভেন্দুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে দীপক ও বিশুবাবু বলে ওঠেন।

"সবার সব দাবি মানা হবে, আগে শুটিংটা সেরে নাও।" হীরেনবাবু হাসতে হাসতে বলেন।

"ও সব শুধু কথায় চিড়ে ভিজবে না হীরেন!" বিশুবাবু নেতৃসুলভস্বরে ঘোষণা করেন, "তুমি প্রডিউসার ডিরেকটার অর্থাৎ মালিক আর আমরা টেক্‌নিশিয়ান ও আর্টিস্ট অর্থাৎ শ্রমিক। কি শর্তে তুমি আমাদের দাবিটা মেনে নেবে, সেটা জানতে চাই আমরা।"

"ঠিক বলেছেন বিশুদা"—শুভেন্দু বলে, "আগে টার্মস্ অ্যান্ড কন্‌ডিশান জানাতে হবে।"

"নিশ্চয় জানাব।" হীরেনবাবু বলেন, "টার্মস্ অ্যান্ড কন্‌ডিশান হল—এখন থেকে আমরা সবাই একসঙ্গে হাঁটব।"

"বল, হীরেনদা কি..."

"জয়।" শুভেন্দুর সঙ্গে সবাই হীরেনবাবুর জয়ধ্বনিতে সাড়া দেয়, এমন কি হীরেনবাবু নিজেও।

বেলা একটা নাগাদ আমরা স্যানা চটিতে পৌঁছলাম। অর্থাৎ যমুনা চটি থেকে এই পাঁচ মাইল পথ আসতে চার ঘণ্টা সময় লাগল। কিন্তু এর মধ্যে কম করে দেড় ঘণ্টা সময় গেছে শুটিং করতে। অনেকগুলি 'পাসিং শট্' অর্থাৎ চলমান যাত্রীদের দৃশ্য গ্রহণ করা হয়েছে।

কাজেই আমার সহযাত্রীরা ভালই হেঁটেছেন, বিশেষ করে জীবনের প্রথম

পদযাত্রার দিনে। কিন্তু কুন্দন সিং ধরে ফেলেছে আমাদের। শুধু সে নয় তার সঙ্গে সুশীল এবং শান্তিবাবুও আছেন। ওরা দুজন বেশ ভাল হাঁটে দেখতে পাচ্ছি।

নব-নির্মিত মোটর পথটি এসে শেষ হয়েছে স্যানা চটির অপর পারে। যমুনা চটি থেকে বেরিয়ে একটা কাঠের সাঁকো পেরিয়ে আমরা যমুনার ডান তীরে এসেছিলাম। এবারে আবার বাঁ তীরে যেতে হবে। এখানেও তৈরি হচ্ছে বড় পুল। কিন্তু এখনও সম্বল সেই পুরনো কাঠের সাঁকোটি।

আমরা সাঁকো পেরিয়ে এলাম। স্যানা চটির অনেক উন্নতি হয়েছে দেখতে পাচ্ছি। হবেই তো, অনেকখানি প্রায় সমতল জায়গা আছে এখানে। বেশ বড় বড় কয়েকটি পাথর আর টিনের বাড়ি তৈরি হয়েছে। নির্মিত হয়েছে একটি নতুন চটি। আর পাশের পাহাড়ের ওপরে প্রাচীন ডাকবাংলো ও ধর্মশালা তো রয়েছেই। রয়েছে গুটি তিনেক চায়ের দোকান-কাম-হোটেল। এরই কোনটিতে আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পাণ্ডে ও দিলীপ এগিয়ে এসেছে।

তাদের দেখতে পাচ্ছি না। নিশ্চয়ই কোন দোকানে রয়েছে। এগিয়ে চলি। স্যানার আরও দুটি নাম আছে দণ্ডোতী ও কুসালা। উচ্চতা ৬০০০ ফুট।

আমাদের অনুমান মিথ্যে নয়, দিলীপ ও পাণ্ডে দোকানের ভেতরেই ছিল—চা খাচ্ছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে ওরা বেরিয়ে আসে। দোকানটি বেশ বড়। আট-দশজন লোক ডাল-ভাত ও সবজি খাচ্ছে। ভালই হল—চারটি ভাত খেতে পাওয়া যাবে। সকালের সুজি ও রুটি অনেকক্ষণ হজম হয়ে গেছে।

কিন্তু দিলীপ দুঃসংবাদ দেয়, "সামান্য কিছু ঝুরিভাজা ও চা ছাড়া আর কিছু পাওয়া যাবে না এখানে!"

"কেন, ঐ যে ওরা ভাত খাচ্ছে!" হীরেনবাবু বলে ওঠেন।

"ওরা সবাই মাসিক খদ্দের। দোকানী আমাদের এত লোককে ভাত দিতে পারবে না, ডাল আলুসিদ্ধ ও রুটি করে দিতে পারে কিন্তু অন্তত ঘণ্টা দুয়েক সময় চাই।"

"না না, তা সম্ভব নয়। একটা বেজে গেছে। এখনও পাঁচ মাইল পথ যেতে হবে, তার মধ্যে আড়াই মাইল খাড়া চড়াই। পথে খানিকটা শুটিং আছে।" হীরেনাবাবু দিলীপের প্রস্তাব নাকচ করে দেন।

"কিন্তু পথে তো আর কোথাও খাবার পাওয়া যাবে না।" আমি বলি।

"না পেলে কি করা যাবে, ঝুরিভাজা আর চা খেয়েই রওনা দেওয়া যাক্।"

অনেকেই চা ছাড়া আর কিছু পেলেন না। পাবেন কেমন করে—আমরা বিয়াল্লিশ জন, কুলিরা আটজন, ডাণ্ডি ও ঘোড়াওয়ালারা বিশ জন। স্যানা চটির দোকানদারের সাধ্য কি যে সত্তর জন যাত্রীকে ঝুরিভাজা খাওয়ায়!

অতএব লাঞ্চ ছাড়াই লাঞ্চ-ব্রেক শেষ করে আমরা আবার পথ চলা শুরু করি। এবারে আর প্রায় সমতল প্রশস্ত পথ নয়, সংকীর্ণ ও পিচ্ছিল চড়াই। এঁকেবেঁকে পাশের পাহাড়ে উঠে গেছে। পাহাড়টা গাছে ছাওয়া বলে পথ স্যাঁতসেঁতে। তার ওপর রোজ বিকেলে বৃষ্টি হচ্ছে। আজও হবে কি?

আকাশের দিকে তাকিয়ে তো তাই মনে হচ্ছে, ইতিমধ্যেই মেঘে ছেয়ে গেছে। সূর্য অদৃশ্য হয়েছে। হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে আমার। জিজ্ঞেস করি, "আপনারা ওয়াটার-

প্রুফ ও টর্চ সঙ্গে রেখেছেন কি?"

"না তো!" প্রায় সকলেই একযোগে বলে ওঠেন, "মালের সঙ্গে ঘোড়ার পিঠে দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু ওয়াটারপ্রুফ ও টর্চ দিয়ে কি হবে? বৃষ্টি নামবে কি? আর আমরা নাকি সন্ধের আগেই হনুমান চটিতে পৌঁছে যাচ্ছি।"

কেমন করে ওদের বোঝাব যে স্ত্রী-চরিত্রের মতই হিমালয়ের প্রকৃতি দুর্জ্ঞেয়। আর হিমালয়ের পথে গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার আগে কেউ সময় ঠিক করতে পারে না। এদের সঙ্গে সে আলোচনা করে কোন লাভ নেই। কাজেই চুপ করে থাকি। ঘোড়াগুলো মাল নিয়ে আগে কিংবা পেছনে রয়েছে। আর কোন ঘোড়ায় কার মাল আছে, তা বলাও শক্ত। কাল বার বার বলে দিয়েছিলাম, ওয়াটারপ্রুফ ও টর্চ সঙ্গে রাখতে। কিন্তু সোনালি সকাল দেখে প্রায় প্রত্যেকেই ঐ বাড়তি বোঝা বওয়ার ঝামেলা করেনি, ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে। শুধু হীরেনবাবু, দিলীপ ও কার্তিকদা আমার অনুরোধ রেখেছেন। আর শমিতা ও অনুভাদির ওয়াটারপ্রুফ রয়েছে আমার হ্যাভারস্যাকে।

একে অভুক্ত তার ওপর চড়াই। সবারই কষ্ট হচ্ছে। খুব আস্তে পথ চলছে।

বেশ কয়েকবার জিরিয়ে নিয়ে অবশেষে প্রথম পাহাড়টির ওপরে উঠে এলাম। ওরা সকলেই শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তবে দুর্গাবাবু একটু বেশি কাহিল হয়েছেন। খুবই স্বাভাবিক—একে মোটা মানুষ, তার ওপর কস্টিউম্ পরে নিয়েছেন—ঢোলা পায়জামা লম্বা কুর্তা ও চটি। চটি জোড়া নিয়েই ভদ্রলোক বিপদে পড়েছেন। পড়ারই কথা। তবে ভদ্রলোক কিন্তু থামছেন না কোথাও আস্তে হলেও ঠিক পথ চলেছেন।

অমূল্যকে কাছে ডেকে বলি, "তুই দুর্গাবাবুর সঙ্গে থাক্।"

অমূল্য ঘাড় নাড়ে। আমরা আবার চলা শুরু করি। এবারে পথটা আর আগের মতো খাড়া চড়াই নয়। কিন্তু বড়ই পিচ্ছিল। হবেই তো, পথটা যে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে, একদম রোদ পড়ে না এখানে।

ওয়াজিরী থেকে আমরা এতক্ষণ একসঙ্গে পথ চলেছি। কিন্তু এখন আর তা সম্ভব হচ্ছে না—ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছে। হীরেনবাবু ও কার্তিকদা কয়েকজনকে নিয়ে আগে চলে গেছেন। আমরা চলেছি পরের দলে। আমাদের পেছনে রয়েছে শুভেন্দু, দিলীপ, অমূল্য ও অশোকবাবু। সবার শেষে দুর্গাবাবু ও পাণ্ডে।

গতকালের বৃষ্টির জল এখনও পাহাড়র গা বেয়ে নামছে। সিক্ত ও কর্দমাক্ত পথের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি। শমিতা ও অনুভাদির খুবই কষ্ট কিন্তু তারা হাসি মুখেই পথ চলেছে।

পথটা আবার ওপরে উঠে গেছে। পথে পাথরের চেয়ে মাটির পরিমাণ বেশি। কাজেই অত্যন্ত পিচ্ছিল। পা টিপে টিপে চলতে হচ্ছে।

হঠাৎ পাশের দিকে নজর পড়তেই চমকে উঠি। মাটির ঢিপিটা যেন গলে গলে পড়ছে। পথটা সেই ঢিপির পাশ দিয়ে কয়েক ফুট সামনে এগিয়ে ডাইনে বাঁক নিয়ে ঢিপির পেছনে অদৃশ্য হয়েছে। সমস্ত জায়গাটা যেন পাহাড়ের গায়ে ঝুলে আছে। অনেক নিচে, বয়ে যাচ্ছে যমুনা। মাঝখানে কয়েক শ' ফুট গভীর খাদ।

ধস নামছে কি? থমকে দাঁড়াই। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগেই মাটির ঢিপির খানিকটা ধসে পড়েছে পথের ওপর—এখন সেখানে ঐ কাদার স্তূপ। এবং বাকিটাও যে

কোন সময় ধসে পড়তে পারে। তাছাড়া ঢিপির ওপাশে পথ আছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। সুতরাং সামনে এগিয়ে যেতে ভরসা পাই না।

শমিতা, অনুভাদি ও শুভাশিসকে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে যেতে বলি। আমিও নেমে আসি খানিকটা। এখানে পথের মাটি মোটামুটি শক্ত—দাঁড়ানো যেতে পারে।

চড়াইয়ের শেষ প্রান্তে একটা বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা। এখান থেকে ফেলে-আসা পথের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে দুজন কুলি মাল নিয়ে আসছে। সম্ভবত আমাদেরই কুলি—সেতীরামের লোক।

সত্যই তাই। ওরা আমাদের এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাড়াতাড়ি মাল রেখে ছুটে আসে। জায়গাটা দেখিয়ে দিয়ে বলি, "এগিয়ে গিয়ে দেখ তো রাস্তা আছে কিনা? সাবধানে যেয়ো।"

ওরা উত্তরকাশী পর্বতারোহণ শিক্ষা কেন্দ্রের কুলি—হাই অলটিচ্যুড পোর্টার। দেখলেই পথের প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারবে।

একটা চিৎকার কানে আসে। পেছনে তাকিয়ে দেখি অনেক দূর থেকে অমূল্য ছুটে আসছে। তার পিঠে রুকস্যাক্। একহাতে আইস এক্স আর একটা হাত গলার সঙ্গে বাঁধা—শুভেন্দু তার ভাঙা হাত বেঁধে দিয়েছে। কিন্তু অমূল্য এমন করে ছুটে আসছে কেন?

কুলিরা জায়গাটা দেখে ফিরে আসে। বলে—"রাস্তা নেই, তবে ঐ ঢিপির গা দিয়ে কাদা ভেঙে কোনমতে যাওয়া যাবে।"

আমি বলি, "চলুন তাহলে।"

অনুভাদি, শমিতা ও শুভাশিস উঠে দাঁড়ায়। আমরা এগিয়ে চলি।

অমূল্যর চিৎকার কানে আসে, "শঙ্কুদা, একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।"

অতএব থামতে হয়। হিমালয়ের পথে ওর আদেশ অমান্য করা উচিত হবে না।

অমূল্য এসে পৌঁছয়। সে রীতিমত হাঁফাচ্ছে। অনেকটা ছুটে আসতে হয়েছে। সব শুনে অমূল্য বলে, "তোমরা দাঁড়াও, আমি একবার দেখে আসছি।"

দেখে এসে অমূল্য কুলিদের বলে, "তোমরা এখানে থাকো। বাবুরা পেছনে আসছেন। তাঁদের হাত ধরে ধরে পার করিয়ে দেবে। সবার শেষে তোমরা আসবে। আমি এদের নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি।"

অমূল্যর সঙ্গে আমরা একে একে পার হয়ে আসি সেই মরণ-ফাঁদ। আর পেরিয়েই পুলকিত হয়ে উঠি। পথটা নেমে গিয়ে সমতলে মিশেছে এবং সেখানেই রাণা গ্রামের চায়ের দোকান। কত কাছে অথচ কত দূরে...

রাণাতে এসে দেখি হীরেনবাবু শুটিংয়ের জন্য প্রস্তুত। বিশুবাবু ক্যামেরা ঠিক করে শুভেন্দুর প্রতীক্ষায় বসে আছেন।

শুভেন্দুরা এসে পৌঁছায় একটু বাদে। শুটিং শেষে আমরা চায়ের দোকানের সামনে বসি। আনন্দের কথা চায়ের সঙ্গে দুটি করে আলু-সিদ্ধ পাওয়া গেল। প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। তবু নাই-মামার চেয়ে কানা-মামা ভাল।

আকাশের অবস্থা খুবই খারাপ—যে কোন সময়ে বৃষ্টি নামতে পারে। কিন্তু বৃষ্টির চেয়ে বড় চিন্তা দুর্গাবাবু—তিনি এখনও এসে পৌঁছলো না। এদিকে কুলি দুজনও চলে

এসেছে। ওরা জানেই না যে পেছনে আর কেউ আছেন।

অমূল্য অবশ্য বলছে, "পাণ্ডে সঙ্গে রয়েছে। সে ঠিক নিয়ে আসবে দুর্গাদাকে।"

কুন্দনের অনুমান কিন্তু বৃথা হয়েছে। সে স্বর্ণালীর ডাণ্ডিকে ধরতে পারেনি। একে তো মালপত্র বেঁধে ঘোড়ার পিঠে চাপাতে অনেকটা সময় চলে গেছে, তার ওপরে ছোট্ট সওয়ারী পেয়ে ডাণ্ডিওয়ালারা জোর কদমে পা চালিয়েছে। স্বর্ণালীরা বোধহয় এতক্ষণে পৌঁছে গেছে হনুমান চটিতে। হীরেনবাবু দিলীপকে নিয়ে রওনা হলেন জগৎরামের সঙ্গে। জায়গা ও রান্নার বন্দোবস্ত করতে হবে। আমরা দুর্গাবাবুর পথ চেয়ে বসে রইলাম।

"ঐ যে আসছেন!" অমূল্য চেঁচিয়ে ওঠে।

আমরা ওপরের দিকে তাকাই। হ্যাঁ, অমূল্য ঠিকই দেখেছে। দুর্গাবাবুই আসছেন ধীর পদক্ষেপে। পেছনে পাণ্ডে।

আস্তে আস্তে তিনি নেমে এলেন আমাদের কাছে। ভদ্রলোকের বড়ই কষ্ট হয়েছে। একে তো দুর্গম পথ, তার ওপর কষ্টিউম্। অবশ্যি তিনি চটির ভারমুক্ত হয়েছেন। এক হাতে জুতো আর একহাতে লাঠি নিয়ে নির্বিঘ্নে ধস পেরিয়ে এসেছেন দুর্গাবাবু। আমরা বৃথাই তাঁর চিন্তা করছিলাম।

তবে দুর্গাবাবু কিন্তু বুঝতেই পারেননি ওটা ধস। অমূল্যর প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "ধস কোথায়? দেখলাম তো শুধু কাদা।"

তিনি আমাদের একটা নতুন সংবাদ দিলেন—মর্মান্তিক সংবাদ। মেক-আপ-এর বাক্স সমেত একটা ঘোড়া খাদে পড়ে গেছে। তবে মালপত্রের তেমন ক্ষতি হয়নি, শুধু ঘোড়াটার একটা ঠ্যাং ভেঙে গেছে এই যা।

কার্তিকদা আঁতকে ওঠেন, "মেক-আপ-এর বাক্স তাহলে আসবে কেমন করে?"

"আজ আসবে না।" দুর্গাবাবু নির্বিকার স্বরে উত্তর দেন।

"কে বলল আপনাকে?"

"কুন্দন সিং। সে আমাদের সঙ্গেই ছিল। ঘোড়াটা পড়ে যাবার পরে আমাকে ধীরে ধীরে এগোতে বলল।" দুর্গাবাবু উত্তর দেন।

"আর তাই আপনি ধস পেরিয়ে চলে এলেন?" শুভেন্দু জিজ্ঞেস করে।

দুর্গাবাবু উত্তর দেন, "হ্যাঁ, এলাম বৈকি। কারণ আমি জানতাম, ঘোড়া পড়ে গেলেও আমরা হারামীরা ঠিক পৌঁছে যাব।"

দুর্গাবাবুর চা খাওয়া হলে হনুমান চটির পথে রওনা দেওয়া গেল। এখনও আড়াই মাইল। পথ ভালই, প্রায় সমতল। তবে স্যাঁতস্যাঁতে, জায়গায় জায়গায় পিচ্ছিল। তাহলেও মোটামুটি জোরেই চলছিলাম আমরা। কিন্তু ভাগ্যদেবী সেটুকুও বরদাস্ত করতে পারলেন না। হঠাৎ আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল।

তাড়াতাড়ি পিঠ থেকে ব্যাগ নামিয়ে শমিতা ও অনুভাদিকে ওয়াটারপ্রুফ দিলাম। নিজেও বর্ষাতি গায়ে দিয়ে নিলাম। শুভেন্দু, শুভাশিস ও দীপকের ওয়াটারপ্রুফ সঙ্গে নেই। ওদের বলি, "তাড়াতাড়ি এগিয়ে সামনে কোন ঝুপরি কিংবা বড় পাথর পেলে তার নিচে আশ্রয় নাও।"

ওরা এগিয়ে যায়। আমি অনুভাদি ও শমিতার সঙ্গে ধীরে ধীরে পথ চলি। উঁচু-নিচু পিচ্ছিল পথ—বর্ষাতি গায়ে দিয়ে এমন পথ চলা আরও কষ্টকর। এক-পা দু-পা করে

এগোতে হচ্ছে। অথচ ক্রমেই দিনের আলো কমে আসছে। আমার এবং শুভেন্দুর সঙ্গে যদিও টর্চ রয়েছে, কিন্তু এতগুলো লোকের জন্য দুটো টর্চ কিছুই নয়।

খানিকটা এগোবার পরে একখানি পরিত্যক্ত চালা দেখতে পাই। শমিতা বলে, "শঙ্কুদা, চলুন ওখানে গিয়ে একটু দাঁড়ানো যাক।" সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

অনুভাদির অবস্থাও ভাল নয়। তবু বলি, "সামান্য দূর। রাণা থেকে হনুমান চটি আড়াই মাইল। মনে হয় মাইলখানেক পথ পেরিয়ে এসেছি আমরা।

"কিন্তু আমি যে আর পারছি না।" কাতর কণ্ঠে শমিতা বলে।

না পারারই কথা। সেই সকাল থেকে হাঁটছে, সারাদিনে খাওয়া নেই। জীবনে কখনও সে এমন চড়াই-উৎরাই পথ পাড়ি দেয় নি, প্রচণ্ড শীত তার ওপর বৃষ্টি। আর আপত্তি না করে আমি ওদের নিয়ে সেই চালার নিচে আসি।

আরে! শুভেন্দুরাও যে এখানে রয়েছে দেখছি। বেচারিরা একেবারে ভিজে গেছে। খুবই শীত লাগছে নিশ্চয়। আর তাই বোধ হয় দীপক বলে, "শঙ্কুদা, এখানে দেরি করে কোন লাভ নেই। আপনার হিমালয়ের এ বৃষ্টি সহজে কমছে না। মাঝখান থেকে সন্ধে হয়ে গেলে পথ চলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।"

আমারও তাই ধারণা। কিন্তু শমিতা আপত্তি করে। বলে, "একটু দেখ না ভাই, বৃষ্টি কমতেও পারে!"

বলি, "আপনারা এগিয়ে চলুন, আমি ওদের নিয়ে পরে আসছি। আমাদের সঙ্গে বর্ষাতি ও টর্চ রয়েছে।"

দীপক ও শুভাশিস উঠে দাঁড়ায়। শুভেন্দু বলে, "আমিও ওদের সঙ্গে চলে যাচ্ছি।"

দীপকের কথাই সত্য হয়। বৃষ্টি থামে না কিন্তু সন্ধে হয়ে যায়—ঘন অন্ধকার নেমে আসে পথের বুকে। আর অপেক্ষা করে লাভ নেই এবং তা করাও উচিত হবে না। জায়গাটা মোটেই ভাল নয়—খুবই ভালুকের উৎপাত।

তবে সে কথা বলি না ওদের। শুধু বলি, "চলুন বেরিয়ে পড়া যাক্। হনুমান চটি আর বেশিদূর নয়। একটু কষ্ট করে চলুন, সেখানে গিয়েই বিশ্রাম করবেন।"

এবারে আর শমিতা আপত্তি করে না। আমরা ঝুপরি থেকে বেরিয়ে আসি। বৃষ্টির বেগ একটুও কমেনি। টর্চের আলোয় পথের সামান্যই দেখতে পাচ্ছি। অনুমানে পথ চলতে হচ্ছে। সংকীর্ণ পিচ্ছিল পথ। পথের পাশে খাদ। একটু এদিক-ওদিক হলে নির্ঘাৎ মৃত্যু। তার ওপর আবার পেছনের দিকে নজর রাখতে হচ্ছে। ভালুকরা সাধারণত পেছন থেকে আক্রমণ করে।

শমিতা সহসা জিজ্ঞেস করে, "আপনি বার বার পেছনে কি দেখছেন?"

"দেখছি, অমূল্যরা আসছে কিনা।"

শমিতা কোন কথা বলে না। সে আমার কথা বিশ্বাস করেছে।

অনুভাদি জিজ্ঞেস করেন, "আর কতদূর?"

"এই তো এসে পড়েছি। খানিকটা এগোলেই চটির আলো দেখতে পাবেন।"

আশায় বুক বেঁধে ওরা এগিয়ে চলে।

কেটে যায় কিছুক্ষণ। তারপরে শমিতা একই প্রশ্ন করে, "আর কতদূর?"

"সামান্য। একটু কষ্ট করে চলো, কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবে চটিতে।"

"আর যে পারছি না, শীতে সারা শরীর অবশ হয়ে গেছে। দম নিতে কষ্ট হচ্ছে।"

তবু সে থামে না, এগিয়ে চলে। হিমালয়ের পথে অনভিজ্ঞা হলেও, শমিতা অভিজ্ঞা শিল্পী। সে জানে পথে নেমে চলা বন্ধ করতে নেই। আর জানে—পথ যতই দুর্গম হোক, তার শেষ আছে।

তাই একসময় আমরা পৌঁছলাম হনুমান চটিতে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আঁতকে উঠল শমিতা, "সেকি, ন'টা বাজে। তার মানে তিন ঘণ্টা বৃষ্টিতে ভিজেছি।"

তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে বৃষ্টিতে ভেজার চেয়ে, ঘড়ি দেখাটা কষ্টকর।

নয়

ঘুম ভাঙল জলের কলধ্বনিতে। যমুনা নয়-গঙ্গা—হনুমান চটির হনুমানগঙ্গা। সে গিয়ে যমুনায় মিশেছে। যমুনা বয়ে গেছে খানিকটা দূর দিয়ে। হনুমানগঙ্গার পুল পেরিয়ে কাল রাতে এখানে এসেছি। আজ তারই কলগানে ঘুম ভাঙল।

আজ আর সুশীল আসেনি। আজ যে সকালে শুটিং নেই—মেক-আপ-এর বাক্স রয়ে গেছে স্যানা চটিতে। তিনজন কুলি নিয়ে ভোরে সেতীরাম সেখানে চলে গিয়েছে। একটা ঘোড়া সাধারণত আড়াইজন মানুষের মাল বয়। তবু ওদের চারজনকে পাঠিয়েছি, যাতে তাড়াতাড়ি মালগুলো নিয়ে আসতে পারে। এজন্য ওদের প্রত্যেককে পাঁচ টাকা করে বকশিস দেওয়া হয়েছে। ওরা ফিরে না এলে শুটিং আরম্ভ হবে না। অতএব আজ সুশীল আসেনি দলাই-মালাই করতে।

বেড-টিও আসে নি। সুযোগ পেয়ে পরিচালক থেকে পাচক পর্যন্ত সবাই একটু বেশি বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়ে নিচ্ছে। এমন সুযোগ হয়তো আর পাওয়া যাবে না। ভাগ্যিস কাল ঘোড়াটা পড়ে গিয়েছিল।

আমরা শুয়েছি চটির বারান্দায়। চমৎকার অবস্থান এই কাঠের দোতলা বাড়িটির। নিচের তলায় আস্তাবল ওপর তলায় যাত্রীনিবাস। তিনখানি ঘর ও একটি বারান্দা নিয়ে দোতলা। সামনের দিকটা খোলা। সেদিকেই প্রায় চটির গা ঘেঁষে বয়ে চলেছে হনুমান-গঙ্গা। তার দু'তীরেই পথ। পারাপারের জন্য একটি কাঠের সাঁকো রয়েছে।

তিনখানি ঘরের একখানিতে শুভেন্দু, অশোকবাবু ও দুর্গাবাবু। ওঁরা অভিনেতা, ওঁদের বাইরে শুতে দেওয়া হয়নি—ঠাণ্ডা লেগে গলা বসে যাবে। আর দু'খানি ঘরে রয়েছেন মেয়েরা। হীরেনবাবু, শুভাশিস, অমূল্য, দিলীপ ও আমি শুয়েছি বারান্দায়। আমাদের প্রত্যেকের স্লিপিং-ব্যাগ ও এয়ার-ম্যাট্রেস রয়েছে। ঠাণ্ডা লাগার কোন সম্ভাবনা নেই। কাজেই হিমালয়ের এমন কোলের মধ্যে শোবার সুযোগ পেয়ে চার-দেওয়ালে বন্দী হবার মতো বে-রসিক আমরা নই।

অন্যান্য কলা-কুশলী ও কর্মচারীদের নিয়ে কার্তিকদা রয়েছে ধর্মশালায়—সেই পুরনো ধর্মশালা। পাথর আর মাটি দিয়ে তৈরি একটি মাঝারি আকারের দোতলা বাড়ি। হনুমান চটি বদলে গেছে অনেক। নির্মিত হয়েছে এই নতুন চটি। বসেছে দুটি দোকান। প্রশস্ত হয়েছে পথ। কিন্তু ধর্মশালা যেমন ছিল, তেমনি আছে।

সেই ধর্মশালাতেই ঠাই নিয়েছেন কার্তিকদা ও-তাঁর সহকর্মীরা। দোতলার

তিনখানি ঘরে রয়েছেন তাঁরা। নিচের তলায় দুখানি ঘরে রয়েছে কুলি ও ডাণ্ডিবাহকরা। ধর্মশালাতেই আমাদের রান্নার বন্দোবস্ত হয়েছে।

না, কার্তিকদার ডিপার্টমেন্ট আমাদের চেয়ে অ্যাক্‌টিভ। বেড-টি এসে গেল। অতএব আর শুয়ে থাকা সমীচীন নয়, উঠে বসতে হয়। চায়ের মগ হাতে নিই।

শুভেন্দু তার রুম মেটদের নিয়ে বেরিয়ে আসে বারান্দায়। বেরিয়ে আসে মধু ও শমিতা। শুরু হয় আড্ডা। আজ শুটিংয়ের তাড়া নেই, তাই হীরেনবাবুও যোগ দিয়েছেন আমাদের সঙ্গে।

আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু—গতকালের পদযাত্রা। সবাই আপন আপন অভিজ্ঞতার কথা বলছে। হঠাৎ শুভেন্দু বলে ওঠে, "শমিতা, কাল আমরা যেখানে সেই চালার নিচে বসেছিলাম না, পরশু সন্ধ্যায় সেখানে একজন লোককে ভালুকে ধরেছিল।"

"মা গো!" শমিতা প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে। তারপরে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, "ওখানে ভালুক আছে নাকি?"

"কেবল ওখানে নয়, এখানেও আছে।" শুভেন্দু গম্ভীরস্বরে জবাব দেয়।

"যাঃ, তুই ঠাট্টা করছিস।" শমিতা বিশ্বাস করতে চাইছে না।

"ঠাট্ট করছি," শুভেন্দু বলে, "আচ্ছা অমূল্যকে জিজ্ঞেস কর।"

"অমূল্যবাবু তোর দলে, আমি ওঁকেও বিশ্বাস করি না।"

"বেশ শঙ্কুদাকে জিজ্ঞেস কর।" শুভেন্দু সত্য প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর।

শমিতা আমার দিকে তাকায়। আমি সহাস্যে বলি, "এ অঞ্চলে খুবই ভালুকের উৎপাত।"

"কাল তো বলেননি?" শমিতা আমাকে জেরা করে।

"বললে কি কোন লাভ হত?" আমি পালটা প্রশ্ন করি।

"না, মানে আমরা একটু সাবধান হতে পারতাম।" শমিতা উত্তর দেয়।

"সাবধান হতে পারতাম" শুভেন্দু শমিতাকে ভেংচি কাটে। বলে, "এমনিতেই তো কাঁপছিলি, ভালুকের কথা বললে আর হনুমান চটিতে পৌঁছতে পারতিস না।"

সংসারে সব বস্তুর মতো আড্ডারও শেষ আছে। অতএব এক সময় আমাদের প্রভাতী আড্ডা শেষ হল। যমুনার বেলাভূমিতে রোদ পড়েছে। রোদ পড়েছে হনুমানগঙ্গার জলে। সে চিক্‌চিক্‌ করছে। আমরা নেমে এলাম নিচে।

কার্তিকদা জমাদারকে দিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করাচ্ছেন। আমরা কাছে আসতে বলেন, "কাল রাতে তো সময় পাইনি, বড্ড নোংরা হয়ে আছে।"

হেসে বলি, "হ্যাঁ, আর্ট ডিরেকটারের কাজই বটে।"

কার্তিকদা সে প্রসঙ্গে কিছু না বলে ফিনাইলের বোতল খুলে জমাদারের হাতে দেন। তারপর বলেন, "মুখ ধুয়ে সবাইকে নিয়ে ধর্মশালার সামনে চলে যান, ব্রেক-ফাস্ট রেডি। হীরেন বলেছে, কুলিরা ফিরে এলেই মেক-আপে বসে যাবে, শুটিং শুরু হবে। কালকের মধ্যে এখানকার কাজ শেষ করে, পরশু সকালে ফুল চটি চলে যেতে হবে।"

হেসে বলি, "আগে কুলিরা আসুক তো!"

"কেন ওদের দেরি হবে কি?" কার্তিকদা শঙ্কিত।

"না, সেতীরাম সঙ্গে গিয়েছে, ইচ্ছে করে দেরি করার লোক নয় সে। তবে পাঁচ

মাইল রাস্তা। যেতে দু'ঘণ্টা, এক ঘণ্টা বিশ্রাম ও খাওয়া আর আসতে তিন ঘণ্টা—বেলা বারোটার আগে ওরা আসতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না।"

"তাহলে যে আজকের শুটিংয়ের বারোটা বাজবে।" কার্তিকদা মন্তব্য করেন, "অন্তত ঘণ্টাখানেক লাগবে মেক্-আপ করতে—তার মানে 'রেডি' হতেই একটা বেজে যাবে। এ জায়গাটা যেরকম চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা, তাতে তিনটের পরে আলো থাকবে বলে মনে হচ্ছে না।"

কার্তিকদার অনুমান সত্য। আমার কথাও মিথ্যে হয় না। সেতীরাম ও তার বাহিনী যখন মাল নিয়ে ফিরে এল, তখন বেলা সাড়ে বারোটা বেজে গেছে—আমরা দুপুরের খাবার নিয়ে বসেছি। তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে শিল্পীরা মেক-আপে বসে গেলেন। টেক্‌নিশিয়ানরা ছুটলেন লোকেশানে—তাঁদের সঙ্গে পরিচালক। সময়ের অভাবে তিনি পোশাক পালটাতে পারলেন না, লুঙ্গি পরেই চলে গেলেন পুলের ধারে—হনুমানগঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে। চটি থেকে শ'খানেক গজ, সেখানেই লোকেশান।

আমরাও এসে পৌঁছলাম। এক সময় শিল্পীরাও এলেন। কিন্তু শুটিং শুরু হল না। শুরু হল বৃষ্টি। মাথা বাঁচাতে ফিরে আসতে হল চটিতে।

বিষণ্ণ হীরেনবাবু বলেন, "ঘোড়ার জন্য একটা দিনই মাটি হয়ে গেল।"

"না", শুভেন্দু বলে ওঠে, "ঘোড়ার জন্য নয়, আপনার জন্য।"

"আমার জন্য!" হীরেনবাবু বিস্মিত।

"হ্যাঁ, আপনাব জন্য বৈকি। আপনি দেবতাত্মা হিমালয়কে অপমান করেছেন।"

শুভেন্দু কোন্ লাইনে যাবে, বুঝতে পারছেন না হীরেনবাবু। তাই তিনি চুপ করে থাকেন। আমরাও শেষ কথাটি শোনবার প্রতীক্ষা করছি।

শুভেন্দু বলে, "আপনি লুঙ্গি পরে ডিরেক্‌শান দিচ্ছিলেন বলে হিমালয় আপনার ওপরে রুষ্ট হয়েছে।"

আমরা হো হো করে হেসে উঠি। বাইরে মুষলধরায় বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির শব্দে হনুমানগঙ্গার কলগান গেছে হারিয়ে।

পরদিন ৮ই অক্টোবর ১৯৭০ সাল। চমৎকার সোনালি সকাল। ব্রেক-ফাস্ট করে সবাই লোকশানে চলে এলাম। শুরু হল শুটিং। হীরেনবাবু আজ আর লুঙ্গি পরেননি প্যান্ট পরে নিয়েছেন।

আজকের বিষয়বস্তু—কুমার আপন মনে পথ চলেছে। চলেছে একা একা। হঠাৎ পেছন থেকে কেউ তাকে প্রশ্ন করে—সাব, আপ সুই দেনে শক্‌তা?

তাকিয়ে দেখে সুমনের ডাণ্ডির একজন বাহক। সে কুমারকে আবার বলে—মাঈজী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি বলেছেন, ইঞ্জেকশান দিলে নাকি তাঁর যন্ত্রণা কমে যাবে। ওষুধ এবং সিরিঞ্জ তাঁর কাছেই আছে।

কুমার ভাল ইঞ্জেকশান দিতে পারে না। তবু সে ডাণ্ডিওয়ালার সঙ্গে ছুটে চলে। পেরিয়ে আসে হনুমানগঙ্গার পুল। পুলের গোড়ায়, পথের পাশে ডাণ্ডিতে শুয়ে আছে সুমন। রোগপাণ্ডুর মুখশ্রী। যন্ত্রণায় সর্বশরীর সংকুচিত।

কুমার জিজ্ঞেস করে— কি হয়েছে আপনার?

—বড় যন্ত্রণা, এই ইঞ্জেকশানটা দিয়ে আমাকে বাঁচান।

কুমার হাত বাড়িয়ে ইঞ্জেকসান ও সিরিঞ্জ নেয়। কম্পিত হাতে কোনমতে ইঞ্জেকশান দেয় সুমনকে। সঙ্গে সঙ্গে নিস্তেজ হয়ে পড়ে মেয়েটি। চিন্তিত কুমার তাড়াতাড়ি তার একখানি হাত হাতে তুলে নেয়। না, নাড়ীর অবস্থা খারাপ নয়।

কেটে যায় কিছুক্ষণ। একুট বাদে সুমন বলে ওঠে—জল, একটু জল।

কুমার তাড়াতাড়ি ওয়াটার বট্‌ল থেকে সুমনকে এক গ্লাস জল খাইয়ে দেয়।

জল নিঃশেষ করে সুমন উঠে বসতে চায়। কিন্তু পারে না। কুমার দু'হাতে তাকে ধরে বসিয়ে দেয়।

সুমন সকৃতজ্ঞ নয়নে কুমারের দিকে তাকায়। দুজনে চোখা-চোখি হয়।

চোখ নামিয়ে নেয় সুমন। তারপরে ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করে—চটি আর কতদূর?

—মাইল দুইয়ের বেশি হবে না।

—দু... মাইল!

—চড়াই বোধকরি শেষ হয়ে গেছে। কতক্ষণ আর লাগবে? অল্পের জন্য ধৈর্য হারাবেন না।

ডাগর চোখ দুটি মেলে সুমন বলে—ধৈর্য আমি হারাইনি। আমাকে যমুনোত্রী যেতে হবে...যেতেই হবে। ডাণ্ডি ওঠাও। চলো, জলদি চলো।

যে ডাণ্ডিবাহক কুমারকে ডেকে আনবে, তার চরিত্রে অভিনয় করছে কুন্দন সিং। সেদিন ঋষিকেশে শর্মাজী বলেছিলেন—ছেলেটা খুব কাজের। তার ওপর যদি তাকে একটু সিনেমায় নামার সুযোগ দেন, তাহলে আর দেখতে হবে না।

হীরেনবাবু সে প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। কুন্দনকেই নির্বাচিত করেছেন ডাণ্ডিওয়ালার চরিত্রে। এবং সুপুরুষ কুন্দনকুমার বেশ ভালই অভিনয় করেছে। দুঃখের কথা, নিজের এমন অভিনয় বোধহয় কুন্দন দেখতে পাবে না কখনও। এ অঞ্চলে কোন সিনেমা 'হল' নেই। থাকলেও সেখানে এই বাংলা ছবি আসত না।

দুজন যাত্রী আসছেন যমুনা চটি থেকে। তাঁরা পুল পেরিয়ে আসেন। দেখে মনে হচ্ছে বাঙালী। স্বভাবতই আমরা কৌতূহলী।

আমাদের অনুমান মিথ্যে নয়। কাছে এসে তাঁদের একজন বাংলায় প্রশ্ন করেন, 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা'র শুটিং করছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আপনাদের সঙ্গে ডাণ্ডি আছে?"

"আছে।" আমি বলি।

ভদ্রলোক অনুরোধ করেন, "একটা ডাণ্ডি ধার দেবেন? আমাদের একজন সহযাত্রী রাণাতে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাকে একটু নিয়ে আসবে। আমরা এজন্য ডাণ্ডিওয়ালাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেব।"

ওরা ডাণ্ডি নিয়ে চলে গেলেন।

ফিরে এলেন প্রায় ঘণ্টাদুয়েক বাদে। তখনও পুলের গোড়াতেই শুটিং চলছে।

আমি ওদের সঙ্গে ধর্মশালায় ফিরে চলি। ভদ্রলোকের জায়গা করে দিতে হবে। ধর্মশালার সব কয়খানি ঘরই এখন আমাদের দখলে।

সেতীরামকে বলে নিচে তলায় একখানি ঘর পরিষ্কার করে দিলাম। অসুস্থ

ভদ্রলোককে ধরাধরি করে শুইয়ে দেওয়া হল। অজ্ঞান না হয়ে পড়লেও তিনি ঠিক সজ্ঞানে নেই। সাধারণ স্বাস্থ্য—বয়স বছর পঞ্চাশেক। তার সহযাত্রীরা বলছেন, তিনি পেটের গোলমালের জন্য অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে। যাক গে, এ ব্যাপার নিয়ে অযথা মাথা ঘামাবার দরকার নেই। শুভেন্দু রয়েছে, সে-ই যা হোক করবে। আমি আবার লোকেশানে ফিরে চলি।

বিশুবাবু ক্যামেরা ঠিক করছেন। শুভেন্দু নদীর ধারে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছিল—হয়তো বা পরবর্তী দৃশ্যের কথা ভাবছিল। আমাকে দেখেই সে এগিয়ে আসে কাছে। জিজ্ঞেস করে, "ভদ্রলোকের কি হয়েছে?"

বুঝতে পারি শুটিংয়ে ব্যস্ত থাকলেও ব্যাপারটা তার দৃষ্টি এড়ায়নি। বলি, "ভদ্রলোক খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছেন। পুরো জ্ঞান আছে বলেও মনে হল না। বলছেন, পেটের অসুখের জন্য হয়েছে। কিন্তু..."

হীরেনবাবু হাঁক দেন, "শুভেন্দু রেডি..."

আমি তাড়াতাড়ি ক্যামেরার পেছনে চলে আসি।

'শট্'টা 'টেক্' হয়ে যাবার পরেই শুভেন্দু হীরেনবাবুকে জিজ্ঞেস করে, "এবারে মধুর টেক করবেন তো?"

"হ্যাঁ।" হীরেনবাবু উত্তর দেন।

"তাহলে আমাকে পনেরো মিনিট ছুটি দিন।"

"কেন বল তো?"

"একবার ঐ অসুস্থ ভদ্রলোককে দেখে আসতাম।"

"তোমার আর একটা শট্ নেবার পরেই তো এ লোকেশান প্যাক-আপ। আমরা সবাই চটিতে ফিরব।"

"হীরেনদা, আমি ডাক্তার—প্লিজ আমাকে পনেরো মিনিট ছুটি দিন।"

"বেশ—যাও।"

খুশি হয়ে শুভেন্দু বলে, "চলুন শঙ্কুদা, ভদ্রলোককে দেখে আসি।"

ধর্মশালায় এসে দেখি ভদ্রলোক অনেকটা সুস্থ হয়েছেন। শুভেন্দু পরীক্ষা করে তাঁকে। বলে "পেটের অসুখের জন্য দুর্বল হয়ে পড়লেও আসল রোগ হচ্ছে রক্তশূন্যতা। এ রকম স্বাস্থ্য নিয়ে হাই-অলটিচ্যুডে আসা উচিত হয়নি। আপনারা যত তাড়াতাড়ি পারেন এঁকে নিচে নামিয়ে নিয়ে যান—উত্তরকাশী চলে যান। সেখানে ওষুধের দোকান ও হাসপাতাল আছে। ভদ্রলোককে আপনারা আর উঁচুতে নিয়ে যাবেন না!"

"আপনার কাছে কোন ওষুধ আছে?" ভদ্রলোকের জনৈক সহযাত্রী শুভেন্দুকে জিজ্ঞাসা করেন।

শুভেন্দু একটু ভাবে। তারপরে বলে, "ঠিক এ রোগের ওষুধ তো আমি সঙ্গে নিয়ে আসিনি। তবু একটা ওষুধ দিচ্ছি। ভদ্রলোককে নিয়ে যমুনোত্রী কিংবা গঙ্গোত্রী যাবেন না, উত্তরকাশীতে ডাক্তার দেখিয়ে কলকাতায় পাঠিয়ে দেবেন!"

ভদ্রলোকের সহযাত্রীরা মাথা নাড়েন। আমরা ফিরে আসি লোকেশানে।

আজকের আবহাওয়া চমৎকার। ঝকঝকে রোদে ছেয়ে আছে চারিদিক। ঘন নীল আকাশ। কোথাও মেঘের চিহ্ন নেই।

হীরেনবাবু হেসে বলেন, "এ রকম আবহাওয়া থাকলে চারটে পর্যন্ত কাজ করা যাবে। অবশ্য হিমালয়ের প্রকৃতিকে বিশ্বাস নেই। যে কোন সময় আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামতে পারে।"

"নামবে না।" শুভেন্দু প্রতিবাদ করে।

"কেমন করে বুঝলে?" হীরেনবাবু জিজ্ঞেস করেন।

"খুব সহজ ব্যাপার—আজ আপনি লুঙ্গি পরেননি।"

আমরা উচ্চস্বরে হেসে উঠি। হীরেনবাবুও যোগ দেন আমাদের সঙ্গে।

সত্যিই বৃষ্টি নামল না আজ। আর তার ফলে তিনটে লোকেশানেই শুটিং করতে পারা গেল। অর্থাৎ এখানকার শুটিং শেষ হল।

দ্বিতীয় লোকেশান ছিল যমুনোত্রীর পথ। বিষয় কুমার সুমনের সাক্ষাৎকার। যেদিন সুমনকে কুমার ইঞ্জেকশান দেয়, তার পরদিন সকালের ঘটনা।

পথের পাশে দাঁড়িয়ে শ্রান্ত কুমার নিজের ওয়াটার বট্‌ল থেকে জল খাচ্ছিল। হঠাৎ পেছন থেকে নারীকণ্ঠ ভেসে এল—নমস্তে, চিনতে পারছেন আমাকে?

চমকে পেছন ফেরে সে। দেখে ডাণ্ডিবাহকরা দাঁড়িয়ে রয়েছে তার পেছনে। সুমন বসে আছে ডাণ্ডিতে। সে তার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছে।

সুমন কুমারের অপরিচিত নয়। তাকে সে দেখেছে কুতনৌর বাসস্ট্যান্ডে, যমুনা চটিতে। তাকে সে ইঞ্জেকশান দিয়েছে, জল খাইয়েছে। কিন্তু কখনও এমন স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে একাকী তার মুখোমুখি হয়নি। তার ওপর কালও সুমন হিন্দীতে কথা বলেছে। তাই আজ তার মুখে ভাঙা-বাংলা শুনে সে বিস্মিত হয়। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করে—একি আপনি বাঙালী!

—কেন বাঙালী না হলে বুঝি বাংলা বলা যায় না?

—না না তা কেন? তবে সেটা নিয়মের ব্যতিক্রম।

—ব্যতিক্রম হবে কেন? আমার পিতাজী তো কত বাংলা কাহানি মারাঠীতে ট্রানস্লেট করে গেছেন।

—ও তাহলে আপনি মারাঠী?

—হ্যাঁ, সুমন পলুসকর। আসছি পুণা থেকে।

—আমি কুমার রায়, আসছি কলকাতা থেকে।

—এবং আমাদের দুজনের গন্তব্যস্থল নিশ্চয়ই এক—পহলে যমুনোত্রী, ফির গঙ্গোত্রী?

—আমার ক্ষেত্রে আর একটু এগিয়ে—গোমুখী।

—গোমুখী! আপনি গোমুখী যাচ্ছেন?

—ইচ্ছে তো সেই রকমই আছে।

—কিন্তু সবাই যে বলে, ওখানে গেলে কেউ আর ফিরে আসে না।

কি বলবে কুমার? অঞ্জলিও তাকে এই একই প্রশ্ন করেছে। সে শুধু হাসে।

—নমস্কার করে সুমন। ডাণ্ডিবাহকরা চলতে শুরু করে। কুমার কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে সুমনের দিকে। সামনের বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যান সুমন। ওয়াটার বট্‌লটা কাঁধে নিয়ে কুমারও চলা শুরু করে।

পরের দৃশ্যটা গ্রহণ করা হল ধর্মশালার সামনে। কুমার দেখে পথের পাশে বসে আছে সুমন। সে কাছে এসে কথা বলে তার সঙ্গে। সুমন জানায় সাবিত্রী ও দাদা ধর্মশালায় ভেতরে গেছেন ঘর ঠিক করতে। অনেকক্ষণ হয়ে গেল কিন্তু এখনও ফিরে আসছেন না। বাধ্য হয়ে বাইরে বসে আছে সুমন। কেউ না ধরলে যে সে উঠে দাঁড়াতে পারবে না—যেতে পারবে না ধর্মশালায়।

কি একটু ভেবে নিয়ে কুমার হাত বাড়ায় সুমনের দিকে। সুমন তাকায় কুমারের দিকে। কুমার বলে—বন্ধুত্বের হাত।

হাত বাড়ায় সুমন। সে কুমারের হাতখানি ধরে উঠে দাঁড়ায়। কুমার সুমনকে নিয়ে চলে ধর্মশালায়।

চলতে চলতে কথা বলে দুজনে। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করে কুমার—সুমন কি পাপ করেছে যে রাতের অন্ধকারে একা একা যমুনার জলে দাঁড়িয়ে করুণ কণ্ঠে প্রার্থনা জানায়,—হে মাতা, ম্যাঁয়ী পাপী হুঁ, মেরী পাপ নাস করো মাতাজী। মুঝে ক্ষমা করো, মুঝে আরাম করো, মুঝে বচা দেও।

কুমার আবার সুমনকে জিজ্ঞেস করে—কি তার পাপ?

সুমন কোন উত্তর দেয় না। শুধু অসহায় দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে কুমারের দিকে।

হীরেনবাবু ও কার্তিকদা খুবই খুশি—দুদিনের কাজ একদিনে হয়ে গেছে। তার মানে গতকালের দিনটা নষ্ট হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমাদের যাত্রাসূচী অপরিবর্তিত রইল। অতএব আগামীকাল সকালেই আমরা রওনা হচ্ছি ফুল চটি—এখান থেকে মাত্র তিন মাইল। ভাল রাস্তা। পথে সামান্য শুটিং আছে। তাহলেও ঘণ্টা চারেকের বেশি লাগার কথা নয়।

হীরেনবাবু বলেন, "সকালে ব্রেক-ফাস্ট হয়ে যাবার পরেই 'কিচেন' চলে যাচ্ছে। সঙ্গে যাবেন কার্তিকবাবু ও শান্তিবাবু। আমরা পৌঁছবার আগেই রান্না হয়ে যাবে। গিয়েই খেয়ে নেব সবাই। তারপরে আবার শুটিং—মাত্র দুটি লোকেশান। আজকের মতো আবহাওয়া পেলে কালই ফুল চটির কাজ শেষ হয়ে যাবে। কারণ ফুল চটি উপত্যকাটি এখানকার চেয়ে অনেক বেশি উন্মুক্ত, ওখানে আলো থাকবে প্রায় পাঁচটা পর্যন্ত।"

"আলোর অসুবিধে হবে না। তবে একটা কন্‌ডিশান..." শুভেন্দু বলে।

"কি?" হীরেনবাবু হেসে জিজ্ঞেস করেন, "ডিরেক্‌শান দেবার সময় লুঙ্গি পরা চলবে না, এই তো।"

"হ্যাঁ, জী।" শুভেন্দুর হয়ে শমিতা জবাব দেয়।

হীরেনবাবু সম্মতি দান করেন, "বেশ তবে তাই হোক্।"

কিন্তু সে সম্পর্কে আর কেউ কোন মন্তব্য করতে পারার আগে ওঁদের দিকে নজর পড়ে আমাদের—সেই অসুস্থ ভদ্রলোকের দুজন সহযাত্রী। তাঁরা সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছেন চটির বারান্দায়—আমাদের আড্ডা দেবার লোকেশানে।

"আসুন, আসুন..." আমরা তাঁদের স্বাগত জানাই।

ওঁদের একজন আমাকে বলেন, "দেখুন, ধর্মশালার নিচের তলার যে ঘরটা আপনি আমাদের দিয়েছেন বড্ড ঠাণ্ডা, অসুবিধে হচ্ছে।" তিনিই দলনেতা।

"কেন আমি তো বলে দিয়েছি, সন্ধের আগেই আপনাদের ওপরের একটা ঘর

ছেড়ে দেওয়া হবে। শান্তি বোধহয় এতক্ষণে সে ঘর থেকে মালপত্র সরাচ্ছে।"

"হ্যাঁ", দলনেতা বলেন, "কিন্তু আমরা তাঁকে নিষেধ করেছি।"

"কেন।" কার্তিকদা বিস্মিত। "ঘরটা পছন্দ হয়নি আপনাদের?"

"না। মানে এখানকার ধর্মশালাটা বড্ড অস্বাস্থ্যকর।"

"তা বটে।" শুভেন্দু গম্ভীর স্বরে বলে।

"তা আপনারা কি করতে চাইছেন।" আমি জিজ্ঞেস করি।

"আমরা আপনার কাছে একটা ডাণ্ডি ধার চাইছি।"

"কেন, স্যানা চটিতে ফিরে যাবেন?"

"না।" চৌকিদার বলল, "ফুল চটি জায়গাটা নাকি এখানকার চাইতে ভাল। তাছাড়া সেখানে চমৎকার চটি আছে।"

"ঠিকই বলেছে!" আমি বলি।

দলনেতা উৎসাহিত হন। বলেন, "তাই আপনারা যদি আমাদের একটা ডাণ্ডি দিতেন, আমরা ওকে নিয়ে আজ চলে যেতাম ফুল চটি। ডাণ্ডিওয়ালাদের সঙ্গে কথা হয়েছে, তারা আজই ফিরে আসবে এখানে।"

"রাত হয়ে যাবে যে!" হীরেনবাবু বলেন।

"তাহলেও আসতে পারবে বলেছে।"

"রাতে ফিরে এলে আমাদের আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে! আমাদের তো আজ ডাণ্ডির কোন দরকার নেই। কিন্তু ঐ অসুস্থ ভদ্রলোককে আজই আরও উঁচুতে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে কি? শুভেন্দু কি বল?"

"আমি আর কি বলব? ওনারা তো ঠিক করেই এসেছেন।" শুভেন্দু গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়।

"না। মানে, উনি বেশ ভাল আছেন এখন। বলেছেন যেতে পারবেন।"

শুভেন্দু তাঁর কথার উত্তর দেয় না।

"তাছাড়া ওনাকে আমরা যমুনোত্রী নিয়ে যাব না। উনি কাল ফুল চটিতেই বিশ্রাম করবেন। আমরা ঘুরে আসব যমুনোত্রী থেকে।"

শুভেন্দু ঠিকই বলেছে, প্রতিবাদ করা বৃথা। তাই আমি হীরেনবাবুকে ইশারা করি। হীরেনবাবু বলেন,"বেশ নিয়ে যান একটা ডাণ্ডি, তবে দেখবেন যাতে তারা আজ রাতেই ফিরে আসে এখানে।"

"নিশ্চয়ই। ধন্যবাদ, অশেষ ধন্যবাদ।" ওঁরা নমস্কার করে বিদায় নেন।

আমরা নির্বাক। বোঝা যাচ্ছে, প্রস্তাবটা ঠিক পছন্দ হয়নি কারও; হবার কথাও নয়—ঐ ভদ্রলোক হিমালয়ের উচ্চতাজনিত রোগে ভুগছেন। এ অবস্থায় শুধু একটা ভাল ঘরের জন্য তাঁকে আজই আবার তিন মাইল দূরে আরও উঁচুতে নিয়ে যাওয়া কোন মতেই উচিত নয়।

সহসা শুভেন্দু বলে ওঠে, "হীরেনদা অযথা উপদেশ দিচ্ছিলেন। আমি তখুনি বলেছি ভদ্রলোককে আপনারা আর উঁচুতে নিয়ে যাবেন না।" একবার থামে শুভেন্দু, তারপর আবার বলে, "আমার ধারণা, এঁরা ঐ ভদ্রলোককে যমুনোত্রী না নিয়ে গেলেও, গঙ্গোত্রী ও গোমুখীতে নিয়ে যাবেন। আর তাহলে, সে যাত্রা ভদ্রলোকের শেষযাত্রায়

পরিণত হবে।”

ডাক্তার শুভেন্দু চ্যাটার্জির সে ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হয় নি। কিন্তু সে কথা আজ নয়।

দশ

ঠিক সময়ই পৌঁছনো গেল ফুল চটি! তবে এর জন্য অনেকখানি কৃতিত্ব কুন্দনের। সে শেষরাত থেকেই মালপত্র বাঁধা-ছাঁদা শুরু করে দিয়েছিল। শুধু কি তাই, আজ সে স্বর্ণালী ও তার মাকে এক ডাণ্ডিতে পাঠিয়ে দিয়েছে। ঠিক হয়েছে এখন থেকে তারা দুজনকেই বইবে। বলাবাহুল্য এজন্য তাদের পঞ্চাশটি টাকা বেশি দিতে হবে। এবং সেকথা ঠিকাদারকে বলা চলবে না।

শমিতা কিন্তু আজও ডাণ্ডিতে চাপেনি। হনুমান চটি থেকে সে আমাদের সঙ্গে হেঁটেই ফুল চটি এসেছে। তবে আজকের পথ অনেক ভাল—সামান্য চড়াই-উৎরাই। আমরা বেশ আনন্দেই এসেছি।

পথে দুটি লোকেশানে শুটিং হয়েছে। হনুমান চটি থেকে বেরিয়েই বড় বাঁকের মুখে—সেখান থেকে বান্দরপুঁছ পর্বতশ্রেণী (২০,৭২০) ভারি চমৎকার দেখায়। আকাশ আজও কালকের মতই পরিষ্কার। বিশুবাবু বান্দরপুঁছ পর্বতশ্রেণীর ছবি তুলে খুবই খুশি।

দ্বিতীয়বার শুটিং করা হয়েছে ফুল চটি উপত্যকার প্রবেশপথে। কুন্দন সিং-এর অবশ্য ইচ্ছে ছিল আমরা তার ‘বনাস’ গ্রামে একটু শুটিং করি। কিন্তু লজ্জায় সে কথাটা বলতে পারেনি আগে। যখন বলল, তখন কুলিরা ক্যামেরা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। বিশুবাবু কথা দিয়েছেন, সম্ভব হলে ফেরার পথে তিনি কুন্দনের শ্বশুরবাড়ির ছবি তুলবেন। কুন্দন ঘর-জামাই।

হনুমান চটি থেকে ফুল চটির পথটি এসেছে যমুনার বাঁ তীর দিয়ে। পথের তিন মাইল। দুই চটির মাঝামাঝি জায়গায় যমুনার অপর তীরে ছোট গ্রাম বনাস। পারাপারের জন্য একটি সাঁকো রয়েছে। তবে সেটি একেবারে জলের কাছে। পথটি এসেছে অনেক উঁচু দিয়ে—পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে। তার মানে ওদের গাঁয়ে যেতে হলে কম করেও হাজার খানেক ফুট খাড়া নিচে নেমে সাঁকো পেরিয়ে আবার শ’ পাঁচেক ফুট ওপরে উঠতে হত। কাজটি আমাদের কাছে কঠিন হলেও ওরা প্রতিদিন একাধিক বার যাওয়া-আসা করছে।

কুন্দন দূর থেকে তার বাড়ি আর ক্ষেত দেখিয়েছে। তারপরেই বলেছে, “আমার, মানে আমার জেনানার বাড়ি। সে তার বাপ-মায়ের বড় মেয়ে। শ্বশুর-শাশুড়ি বুড়ো হয়ে গেছেন। আমিই সব দেখা-শোনা করি।”

“তাই তো করতে হবে।” আমি বলেছি।

কুন্দন আমাকে বলেছে, “সাব আমার একটা কথা আপনাকে শুনতেই হবে।”

“বেশ, বল।”

“ফেরার পথে একবার আপনাকে আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিতে হবে।”

যাব বলে আমি তাকে কথা দিয়েছি। হিমালয়ের সহজ-সরল মানুষ এরা—অতিশয় অতিথিপরায়ণ। নিঃস্বার্থ ভাবে সাহায্য করে চলেছে আমাদের। তার এ আমন্ত্রণ উপেক্ষা

করি কেমন করে?

কিন্তু কুন্দনের কথা এখন থাক্। ফুল চটির কথাই বলা যাক্। যমুনার বাঁ তীরে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়। এপারে উপত্যকার বুক চিরে চলে গেছে পথ। পথের পাশে বাড়ি-ঘর ক্ষেত-খামার আর দোকান-পাট।

উপত্যকার প্রায় প্রান্তসীমায় যমুনার তীরে দাঁড়িয়ে আছে দুটি বেশ বড় বড় দোতলা চটি—জোতি ভবন ও গোপাল ভবন। তারই একটিতে আশ্রয় নেব আমরা।

চটির সামনে কালকের সেই অসুস্থ ভদ্রলোক এসে নমস্কার করেন। চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে ভালই আছেন। তিনি সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলেন, "কাল আপনারা আমার জন্য যা করেছেন, তার তুলনা হয় না। সফল হবে আপনাদের মনোবাসনা।"

জিজ্ঞেস করি, "আপনার সঙ্গীবা কি যমুনোত্রী চলে গেছেন?"

"হ্যাঁ। ওরা বিকেলে ফিরে আসবে। কাল আমরা নেমে যাব স্যানা চটি।"

"উত্তরকাশী পৌঁছে যে ওষুধটা লিখে দিয়েছি কিনে নেবেন। কিংবা হাসপাতালে গিয়ে কোন ভাল ডাক্তারকে দেখিয়ে নেবেন একবার। আপনি কিন্তু আর ওপরে যাবেন না, উত্তরকাশী থেকেই ফিরে যাবেন কলকাতায়।" শুভেন্দু পরামর্শ দেয়।

"তাই করব। আপনার উপকার জীবনে ভুলব না। আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। শুভেন্দুকে আবার নমস্কার করেন তিনি। তারপরে আমার একখানি হাত হাতে তুলে নিয়ে বলেন, "আপনাকে আর কি বলব? আপনার বই পড়েই এপথে এসেছি। যমুনোত্রী যেতে পারলাম না, গঙ্গোত্রীও হয়তো যাওয়া হবে না। তবু যা দেখে গেলাম, তার তুলনা নেই। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন।"

আমরা ধর্মশালায় এলাম। দোতলায় চারখানা ও একতলায় দুখানা ঘর নেওয়া হয়েছে। কার্তিকদা ইতিমধ্যেই বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন। খাবারও প্রস্তুত। কে বলবে ভদ্রলোক আর্ট ডিরেকটার এবং হোটেল ম্যানেজার নয়?

হীরেনবাবু ও বিশুবাবু দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। অমূল্য, অনুভাদি ও আমি অর্থাৎ আমরা অকাজের মানুষরাও রওনা হই লোকেশানের উদ্দেশ্যে।

কাছেই লোকেশান। ধর্মশালার পেছনেই পথটা পাহাড়ের গা বেয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে গেছে। তারই উচ্চতম স্থানে ক্যামেরা বসিয়ে বিশুবাবু ফুল চটি উপত্যকার ছবি নিচ্ছেন। আমরা কাছে আসতেই হীরেনবাবু বলেন, "বিশু ছবি নেওয়া শেষ হলে একবার শঙ্কুদাকে ফ্রেমটা দেখাও তো!"

হীরেনবাবু আমাকে বাবু বলেই ডাকেন কিন্তু হিমালয়ে এসে সবার সঙ্গে আমি তাঁরও শঙ্কুদা হয়ে গিয়েছি। আর তাঁকেই বা বলি কেন, কার্তিকদা পর্যন্ত আমাকে শঙ্কুদা ডাকছেন।

যাক্ গে, যে কথা বলছিলাম। বিশুবাবুর ছবি নেওয়া শেষ হল। হীরেনবাবু আমাকে বলেন, "যান তো ফ্রেমটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিন। তারপরে বলুন, এ আপনার গাড়োয়াল না আপনাদের প্রফেসারের সুইজারল্যান্ড?" *

---

* প্রফেসর ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়। প্রেসিডেন্সি কলেজের জিওলজির অধ্যাপক। সে একটি সুইস মেয়েকে বিয়ে করেছে বলে আমরা ঠাট্টা করে সুইজারল্যান্ডের জামাই বলি। লেখকের 'চতুরঙ্গীর অঙ্গনে', দ্রষ্টব্য।

"সত্যই সুন্দর", আমি দেখতে দেখতে বলে উঠি, "চমৎকার লোকেশান সিলেক্ট করেছেন।"

পরবর্তী লোকেশান হল যমুনার বেলাভূমিতে একটি কাঠের সাঁকোর ধারে। অর্থাৎ যমুনোত্রীর পথ থেকে, পাহাড়ের গা বেয়ে আমাদের প্রায় পাঁচ শ' ফুট নেমে আসতে হল। শুটিং করা হবে কিন্তু পাত্র পাত্রীদের একজন উপস্থিত নেই—সে কার্ল। দিলীপ কার্লের 'ডামি' বা নকল সেজে কাজটা চালিয়ে দেবে। লেহ্‌ম্যানের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে দুঃখ পাচ্ছি। এমন স্বর্গীয় পরিবেশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলতে পারলেন না—দেখতে পেলেন না হিমালয়ের এই অনন্ত সুন্দর রূপ।

হীরেনবাবু দৃশ্যটা বুঝিয়ে দেন—কার্ল উলবিখ্ ব্যাভেরিয়ার ওবেরামের্গো গ্রামের ছেলে। বিগত বিশ্বযুদ্ধে সে তার বাবাকে হারিয়েছে—হারিয়েছে তার কৈশোরের সাথী ও যৌবনের সাক্ষী পলিনকে। যুদ্ধ শেষ হবার পরে কার্ল তার পুরনো ব্যবসার মধ্যে ভুলতে চাইল তার ব্যথা আর বেদনাকে, বাবা আর পলিনকে—তার জন্মভূমির দুর্দশার কথাকে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও নিজের মানসিক দৈন্য কিছুতেই তাকে সুস্থ মনে ব্যবসা করতে দিল না। একদিন দোকান বেচে ফিরে এল নিজের গ্রামে। সেখানে আরও অশান্তি। বোমা-বিধ্বস্ত বাড়িখানার দিকে তাকালে কেবলই বাবার কথা মনে হয়। ওবেরামের্গোর পাহাড়ী পথে চলতে গেলে কেবলই সে পলিনের পায়ের শব্দ পায়।

গ্রামেও টিকতে পারল না কার্ল। জলের দরে জোতজমা বেচে দিয়ে বেরিয়ে পড়ল শান্তির আশায়। দুবছর ঘুরে বেড়াল য়ুরোপ ও মধ্য প্রাচ্যের পথে পথে। তারপরে আবার ফিরে গেল জার্মানীতে—মিউনিখে। দর্শন নিয়ে পড়াশুনা শুরু করল—ডক্টরেট্ পেল। চাকরির আমন্ত্রণও পেয়েছে। কিন্তু সে তা গ্রহণ করেনি। কারণ স্বাভাবিক জীবনের প্রতি সব মোহ তার ঘুচে গেছে। সে বিশ্বপর্যটনে বেরিয়েছে। জর্মনি থেকে ভারতে এসেছে—এসেছে বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ, বিবেকানন্দ, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের দেশে।

কিন্তু এসে একটা বিপদে পড়েছে। কার্ল ইংরেজী জানে না। তার ধারণা ছিল সংস্কৃত জানলে ভারতে তার কোন অসুবিধে হবে না। কিন্তু ধারণাটা যখন ভাঙল, তখন বড্ড দেরি হয়ে গেছে। তাহলেও কার্ল হাল ছেড়ে দেয়নি। আকার ও ইঙ্গিতের সাহায্যেই সে মনের ভাব প্রকাশ করে ভারত পর্যটন করছে।

যমুনোত্রীর পথে বাসে উঠে তার পরিচয় হয়েছে কুমার ও অরোরা পরিবারের সঙ্গে। তাদেরই সঙ্গে পথ চলছে সে। চলতে চলতে পথের সাথীরা পরিণত হয়েছে আপনজনে। ভাষা এই আত্মীয়তায় বাদ সাধেনি। সবচেয়ে তার বেশি বন্ধুত্ব হয়েছে ছ'বছরের মুন্নার সঙ্গে। মুন্নাকে সে চোখের আড়াল করতে পারে না। মুন্নাও তার কার্ল চাচাকে ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে চায় না।

আজ তাই ফুল চটিতে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পরে কার্ল ও মুন্না বেড়াতে বেড়িয়েছিল। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে যাবার পরেও তাদের ফিরে আসার নাম নেই দেখে মিসেস অরোরা অস্থির হয়ে পড়লেন। এদিকে তখন প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

তবু কুমারকে সেই বৃষ্টি মাথায় করেই তাদের খুঁজতে বেরোতে হল। খুঁজতে খুঁজতে সে এসে উপস্থিত হল এই কাঠের সাঁকোটির কাছে। আর তখন টর্চের আলোয় দেখতে পেল মুন্নাকে কোলে নিয়ে কার্ল আসছে ওপার থেকে। কিন্তু প্রবল জলস্রোতে

সাঁকোটার খানিকটা অংশ ভেঙে গেছে যে। কুমার চেঁচিয়ে ওঠে। কার্লকে সাবধান করে। তাকে ওপারেই দাঁড়িয়ে থাকতে বলে। তারপরে সে পুল পেরিয়ে তার হাত ধরে কোনমতে নিয়ে আসে এপারে।

এই দৃশ্যটাই তোলা হচ্ছে এখন। কিন্তু আজ কার্ল তথা লেহ্‌ম্যান অনুপস্থিত এখানে। মুন্নাকে কোলে নিয়ে দিলীপ তার 'ডামি' সেজেছে।

সন্ধ্যায় ধর্মশালার দোতলায় বসে যথারীতি আড্ডা শুরু হল। বলা বাহুল্য প্রায় সবারই হাতে চায়ের মগ। শুভেন্দু এসে হাজির হল। দীপক তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, "আজ তোকে খুব খুশি খুশি মনে হচ্ছে। ব্যাপার কি বৌমার চিঠি পেয়েছিস নাকি?"

"এই তো দীপকদা, কথাটা আবার মনে করিয়ে দিয়ে এমন সুন্দর সন্ধ্যাটা মাটি করে দিলে তো?" শুভেন্দু যেন সত্যই বিষণ্ণ!

দীপক কিন্তু মোটেই অনুতপ্ত নয়। সে বলে, 'আমরাই শুধু বৌয়ের কথা ভাবব, আর তুই হিমালয়ের পথে পথে সমানে সুমনের সঙ্গে প্রেম করে বেড়াবি।"

আমরা হেসে উঠি। বলা বাহুল্য সুমন তথা মধুও সে হাসিতে অংশ নেয়।

শুভেন্দু সহসা গম্ভীর হয়ে যায়। গম্ভীর স্বরে আমাকে বলে, "শঙ্কুদা, আমরা যারা বায়োস্কোপে অভিনয় করি, তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি কি জানেন?"

"কি?" আমি জিজ্ঞেস করি।

শুভেন্দু বলে, "আমাদের প্রতিদিন প্রচণ্ডভাবে প্রেম করতে হয়।"

আবার হেসে উঠি আমরা। হাসি থামলে শুভেন্দু প্রশ্ন করে, "আর আমাদের এই দুর্দশার জন্য কারা দায়ী জানেন?"

"কারা?"

"আপনারা, মানে লেখকরা।" শুভেন্দু উত্তর দেয়। তারপরে জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, প্রেম বাদ দিয়ে গল্প লিখতে পারেন না আপনারা?"

হেসে বলি, "না। কারণ গল্প তো জীবনকে নিয়ে। প্রেমকে বাদ দিলে যে জীবন অসম্পূর্ণ।"

"কথাটা মেনে নিলাম। কিন্তু আমাদের অবস্থাটা একবার ভেবে দেখুন তো। ধরুন একসঙ্গে তিনটে ছবিতে শুটিং করছি অর্থাৎ তিনজন নায়িকার সঙ্গে একযোগে প্রেম করতে হচ্ছে। ফলে কি হয় জানেন?"

"কি?"

"নিজের বৌয়ের সঙ্গেই আর প্রেম করা হয়ে ওঠে না।"

"তুই একথা বলিস না শুভু!" শমিতা প্রতিবাদ করে ওঠে, "অঞ্জলির সঙ্গে তোর খুবই ভাব।"

"আহা তা থাকবে না কেন? বৌয়ের সঙ্গে ভাব থাকবে না কি তোর সঙ্গে ভাব থাকবে?" শুভেন্দু শমিতাকে প্রশ্ন করে।

কিন্তু শমিতা তার উত্তর না দিয়ে আমাকে বলে, "আপনি অঞ্জলিকে দেখেননি শঙ্কুদা। কলকাতায় ফিরে অবশ্যই একদিন গিয়ে আলাপ করবেন তার সঙ্গে। দেখবেন কি লক্ষ্মী মেয়ে—দেখতে যেমন সুন্দর, তেমনি সুন্দর তার স্বভাব।"

শমিতা থামতেই শুভেন্দু আবার বলে, "আজকের জগতে চলচ্চিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা বোধহয় সবচেয়ে বেশি আলোচিত ব্যক্তি। কিন্তু আমাদেরও যে একটা ব্যক্তিগত জীবন আছে এবং সেটা যে সমাজের আর দশজন মানুষের মতই সহজ সুন্দর ও স্বাভাবিক হতে পারে, এ ধারণা কিন্তু অনেকেরই নেই।

"তবু তো তোদের কথা সবাই ভাবে, তোদের জীবনে খ্যাতি আছে, প্রাচুর্য আছে। কিন্তু আমাদের? আমাদের যে কিছুই নেই।" একবার থামে দীপক। তারপরে আমাকে জিজ্ঞেস করে, "ভাবতে পারেন, পনেরো বছর প্রাণান্তকর পরিশ্রমের পরে আমি ক্যামেরাম্যান হয়েছি। অথচ কাজ পাচ্ছি না, গত দুবছর বসে আছি। নেহাত স্ত্রী চাকরি করে বলে চাট্টি খেতে পাচ্ছি।"

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করা প্রয়োজন। তাই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করি, "আপনার স্ত্রী চাকরি করেন বুঝি?"

"হ্যাঁ।" শমিতা উত্তর দেয়, "কটক রেডিও স্টেশনে—ভাল চাকরি।"

"সে ভারি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার শঙ্কুদা," শুভেন্দু শুরু করে, "দীপকদার স্ত্রী মানে আমাদের বৌদি নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করছিলেন অর্থাৎ আমার মতো জনৈক হতভাগ্যের সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করছিলেন। দীপকদা ছিলেন সেই ছবির ক্যামেরাম্যান।" শুভেন্দু একটু থেমে একটি কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে আবার বলে, "শঙ্কুদা! আমরা হিরো হয়ে যা পারলাম না, দীপকদা ক্যামেরাম্যান হয়ে তাই করে নিল। হিরোইনকে বিয়ে করে ফেলল!"

দীপক হেসে বলে, "হিংসে করিস না শুভু, হিংসে করিস না। সেই কয়েক বছরের স্মৃতিটুকু ছাড়া যে রোমন্থন করবার মতো আর কিছু নেই রে এ জীবনে।"

"দীপকদা তুমি বড্ড সেন্টিমেন্টাল হয়ে পড়ছ।" শুভেন্দু ধমক লাগায়। বলে, "তার চেয়ে বরং তুমি শঙ্কুদাকে সেই স্মৃতিকথা বলে দাও না" একবার থামে সে। তারপরে আমার দিকে ফিরে বলে, "সে কাহিনী দিয়ে আপনি অনায়াসে একখানি রোমান্টিক উপন্যাস লিখে ফেলতে পারবেন।"

কিন্তু দীপকের সংগ্রামী জীবনের সেই রোমান্স আর শোনা হয়ে ওঠে না। সহসা মধু বলে উঠল, "নারায়ণদা ও পরেশদা এসে গেছেন।"

আমরা রাস্তার দিকে তাকাই। মধু ঠিকই বলেছে—ওঁরাই আসছেন। সহকারী পরিচালক নারায়ণ দাশগুপ্ত ও প্রোডাকশন ম্যানেজার পরেশ চক্রবর্তী। তাঁরা এই ছবি সংক্রান্ত একটা জরুরি কাজে ঋষিকেশ থেকে কলকাতা চলে গিয়েছিলেন। কথা ছিল কাজ সেরে এখানে এসে মিলিত হবেন আমাদের সঙ্গে। তাই করেছেন। বাহাদুর বলতে হবে। কিন্তু নারায়ণবাবু অমন খোঁড়াচ্ছেন কেন? পড়ে-টড়ে যাননি তো। আমরা তাড়াতাড়ি নেমে আসি নিচে।

ওঁরা কাছে আসেন। একি নারায়ণবাবুর পায়ে চামড়ার জুতো কেন? শুধু তাই নয় নতুন জুতো, রীতিমত মচ্‌মচ্ শব্দ করছে। তিনি তো হান্টার সু পরে আমার সঙ্গে কলকাতা থেকে ঋষিকেশ এসেছিলেন!

কথাটা জিজ্ঞেস করি তাঁকে। তিনি বলেন, "সে জুতোটা একটু ছোট ছোট মনে হচ্ছিল। তাই কলকাতায় গিয়ে একজোড়া নতুন জুতো কিনে নিলাম।"

"আর তাই পরে এই পাহাড়ী পথে চলা শুরু করে দিলেন?"

"হ্যাঁ, বড্ড ভুল হয়ে গেছে। পায়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ফোস্কা পড়ে ফেটে গেছে।"

শুভেন্দু বলে, 'যাক্ গে, যা হবার হয়ে গেছে। এখন ওপরে চলুন, জুতো খুলে গরম জল দিয়ে পা ধুয়ে নিন। আমি ওষুধ দিচ্ছি।"

আমরা ওঁদের নিয়ে ধর্মশালার দিকে এগিয়ে চলি। আমি কিন্তু সিঁড়ি পর্যন্ত যেতে পারি না। সিঁড়ির সামনে দুখানি চেয়ারে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে ওরা—পাণ্ডে এবং ডাক্তারসাব। না শুভেন্দু নয়, ফুল চটির ডাক্তার। নাম জানি না, হয়তো এখানে কেউ তার নাম জানেন না। সবার কাছেই তিনি ডাক্তারসাব।

সত্যই ডাক্তার। বয়স বছর পঞ্চাশেক। রোগা ও বেঁটে মানুষটি। এখানে একটা সরকারী আয়ুর্বেদিক দাতব্য চিকিৎসালয় আছে, তিনি তার ডাক্তার। ধর্মশালার কর্তৃপক্ষ তাঁকে একখানি ঘর ছেড়ে দিয়েছেন। পাণ্ডের দেশওয়ালী আদমী। তাই এখানে আসার পর থেকেই পাণ্ডের সঙ্গে তিনি জমাবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু পেরে ওঠেন নি। কারণ পাণ্ডে এতক্ষণ শুটিং নিয়ে ব্যস্ত ছিল। এবারে তিনি তাকে পাকড়াও করে নিঃসঙ্গ প্রবাস বাসের দুঃখমোচন করছেন।

আমি কিন্তু ওদের সঙ্গে আড্ডা দেবার জন্য দাঁড়িয়ে পড়িনি, দাঁড়িয়েছি ডাক্তারসাবের কথা শুনে। মানে, তাঁদের আলোচনার বিষয়বস্তু শুনে আমার পক্ষে এখান থেকে চলে যাওয়া সম্ভব নয়। তাঁরা পর্বতারোহণ নিয়ে আলোচনা করছেন। যা বলছেন, তার বাংলা করলে এই দাঁড়ায়—ডাক্তারসাব পাণ্ডেকে বলছেন, "এভারেস্ট'! এভারেস্ট আর কতই বা উঁচু?"

"উনত্রিশ হাজার ফুটের মতো।" পাণ্ডে উত্তর দেয়

ডাক্তার পুনরায় প্রশ্ন করেন, "তব্, কেয়া? যমুনোত্রীও তো এগারো হাজার ফুট। আর কতই বা বেশি উঁচু। বিশ হাজার ভি নহী হ্যায়।"

পাণ্ডে মাথা নাড়ে।

ডাক্তার উৎসাহিত হয়ে বলতে থাকেন, "দেখো জী, সাজ-সরঞ্জাম পেলে আমি, কেবল আমি কেন আপনিও অনায়াসে এভারেস্ট শিখরে উঠতে পারেন।"

পাণ্ডে চুপ করে আছে। এবং ডাক্তার নিঃসন্দেহে তার নীরবতাকে তাঁর প্রতি অবিচল আনুগত্য বলে ধরে নিয়ে আবার শুরু করেন। "সব সাজ-সরঞ্জামেরও দরকার নেই। শুধু একটু শোবার আর খাবার জিনিস পেলেই আমি হাসতে হাসতে এভারেস্ট শিখরে উঠে যাব।"

এগারো

আজ বিজয়া দশমী। মহালয়ার পুণ্যতিথিতে পুণ্যতোয়া গঙ্গার তীরে এই ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের কাজ শুরু হয়েছিল। আর আজ বিজয়া দশমীর শুভ-সন্ধ্যায় সহযাত্রীরা যমুনোত্রীর মন্দিরে আরতি দর্শন করবেন।

হীরেনবাবু আজ অধিকাংশ সদস্যদের নিয়ে যমুনোত্রী চলে যাচ্ছেন। ফুল চটি থেকে যমুনোত্রী ৬ মাইল। আজকাল যাত্রীরা কেউ বড় একটা যমুনোত্রীতে রাত্রিবাস করেন না। সকালে ফুল চটি থেকে রওনা হয়ে যমুনোত্রী দর্শন করে সন্ধ্যার আগেই

আবার ফুল চটিতে ফিরে আসেন। সব মিলিয়ে বডজোব ৮/৯ ঘণ্টা সময় লাগে। *

হীরেনবাবুদের রাত্রিবাস করতে হবে। তাঁরা যাচ্ছেন ছবি তুলতে। অনেকগুলি লোকেশানে শুটিং করতে হবে।

আজ রাতে আর ফুল চটিতে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলবে না। হীরেনবাবু জেনারেটোর সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন। আজ যমুনোত্রীর মন্দিরে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলেনি। আমার অনেক দিনের আশা পূর্ণ হবে আজ।

তবে আমরা যারা অকাজের মানুষ, তারা আজ যমুনোত্রী যাচ্ছি না। আমরা যাব কাল সকালে। দর্শন এ স্নান করে আবার ফিরে আসব বিকেলে।

তার মানে এই নয় যে আমরা আজ সারাদিন ফুল চটিতে বসে থাকব। আমরাও যাব ওদের সঙ্গে, জান্‌কীবাঈ চটি ছাড়িয়ে মূল-চড়াইয়ের পাদদেশ পর্যন্ত। শুটিং দেখে ফিরে আসব এখানে। অতএব আমিও বেরিয়ে পড়ি পথে—যমুনোত্রীর পথে।

আজকের পথ সত্যই দুর্গম। অবশ্য সবচেয়ে দুর্গম অংশ হচ্ছে সেই চড়াইয়ের পাদদেশ থেকে। আমি সে পথটুকু পাড়ি দেব কাল। কাজেই সেকথা আজ থাক্।

ফুল চটি উপত্যকার প্রশস্ত পথটি ধর্মশালার পেছনে এসে সহসা সংকীর্ণ আকার ধারণ করেছে। সামান্য কিছুদূর ওপরে উঠে দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছে। একটি ভাগ গিয়েছে নদীর দিকে, আরেকটি পাহাড়ের ওপরে। নদীর দিকের পথটি মোটামুটি সমতল। কিন্তু পাহাড়ের দিকেরটি বেশ চড়াই। এটিই সেকালের পথ।

এই পাহাড়টির ওপারেই একটি বেশ বিস্তৃত উপত্যকা। তারই একাংশে খারশালী গ্রাম আর বাকিটা জুড়ে চাষের জমি।

ঘন বনে ছাওয়া খারশালী যমুনোত্রীর পথে শেষ বড় গ্রাম। প্রাচীনও বটে। ফুল চটি থেকে দেড় মাইল। উচ্চতা ৮১০০ ফুট। সেই বর্ধিষ্ণু গ্রামেই যমুনোত্রীর পাণ্ডারা বাস করেন। আমাদের পাণ্ডা জগৎরামও ঐ গ্রামের মানুষ। তিনি কাল চলে গিয়েছেন। গেছেন যমুনোত্রী বনবিশ্রাম গৃহের চৌকিদারের কাছ থেকে চাবি সংগ্রহ করতে।

আগে খারশালী হয়েই যমুনোত্রী যেতে হত। অর্থাৎ যাত্রীদের হাজার খানেক ফুট করে চড়াই ও উৎরাই ভাঙতে হত। তাই কয়েক বছর আগে ওপার দিয়ে নতুন পথ তৈরি হয়েছে জান্‌কীবাঈ চটি পর্যন্ত। যমুনার ওপরে নির্মিত হয়েছে নতুন পুল। ফুল চটি থেকে মূল-পথের যে অংশটা নদীর ধার দিয়ে প্রসারিত হয়েছে, সেই পথটি দিয়ে মিশেছে ঐ পুলের গোড়ায়। আমরা এই পথেই চলেছি।

এটিও নতুন পথ। হামেশাই ধস নামছে। পুলের আগে খানিকটা জায়গা একটি গিলা বা কাচা পাহাড়ের ওপর দিয়ে। সেখানে ঝুরো মাটি আর ছোট-বড় পাথরের ছড়াছড়ি। জায়গাট খুব সাবধানে পেরিয়ে আসতে হল আমাদের।

পুল পেরিয়েই কিন্তু থমকে দাঁড়াতে হয়। এখান থেকে পথটা এঁকেবেঁকে উঠে গিয়েছিল ওপরে—গিয়ে মিশেছিল জান্‌কীবাঈ চটির প্রায় সমতল নতুন পথে। কিন্তু সেই আঁকাবাঁকা পথটির কোন চিহ্ন এখন অবশিষ্ট নেই। সমস্ত পথটাই ধসে গেছে। পড়ে

---

* এখন ফুল চটিতেও থাকার দরকার হয় না। জানকীবাঈ চটিতে যাত্রীনিবাস তৈরি হয়ে গিয়েছে! সেখান থেকে যমুনোত্রী মোটে সাড়ে চার মাইল।

আছে ভিজে একটা মাটির স্তূপ। যে কোন সময় সমস্ত স্তূপটা যমুনায় পড়ে যেতে পারে।

পুল থেকে মূল-পথের দূরত্ব প্রায় শ'দুয়েক ফুট। নির্মাণ বিভাগের কর্মীরা অবশ্য দুরমুশ করে একটি রেখার মতো এঁকে দিয়েছে। কিন্তু ঐ রেখা বেয়ে ওপরে ওঠা সহজ কাজ নয়। একটু অসাবধান হলেই সোজা প্রস্তর পরিপূর্ণ উত্তাল যমুনায়—মৃত্যু অবধারিত। এর চেয়ে যে খারশালীর চড়াই-উৎরাই ঢের ভাল ছিল।

কিন্তু এখন সে আপসোস করা বৃথা। আবার অতটা ঘুরে খারশালী হয়ে যাওয়া আর সম্ভব নয় এখন। মেয়েরা নেমে পড়ে ডাণ্ডি থেকে। ডাণ্ডিবাহক ও কুলিদের সাহায্যে এক এক করে খুব সাবধানে সবাই উঠে আসে ওপরে। পথের প্রথম বাধা অতিক্রম করি নির্বিঘ্নে। তবে ঠিক হয় ফেরার সময় আর এপথে নয়, খারশালী হয়েই আসতে হবে। এমন সমতলের চেয়ে চড়াই-উৎরাই অনেক ভাল।

পুলের পর থেকে পথটা কিন্তু সত্যিই ভাল। প্রায় সমতল ও প্রশস্ত পথ। মাঝখানে ছোট একটি গ্রাম। গ্রামের ধারে কিছুক্ষণ শুটিং করা হল—"সাইলেন্ট শট্"—যাত্রীরা যমুনোত্রী চলেছেন।

আমরা জান্‌কীবাঈ চটিতে পৌঁছলাম। ৮০০০ ফুট উঁচু একটি ছোট গ্রাম। পথের ডানদিকে যমুনার তীরে আর বাঁ দিকে পাহাড়ের গায়ে বাড়ি ঘর ও ক্ষেতখামার। উপত্যকাটি সংকীর্ণ। পাহাড়ের ওপরে গ্রামের সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে মন্দির—শ্রীনারায়ণের মন্দির। পথের ওপর থেকে বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

বাঁ পাশে পথের ধারে ডাকবাংলো আর ডানপাশে যমুনার তীরে তৈরি হচ্ছে সরকারী যাত্রীনিবাস। এটি নির্মিত হবার পরে যাত্রীদের যমুনোত্রী দর্শন সহজতর হবে। মাত্র ৯ মাইল হেঁটে যমুনোত্রী দর্শন করে ফিরে আসবেন এখানে। আর মনে হচ্ছে আগামী বছরই এই যাত্রীনিবাস নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। স্যানা চটি পর্যন্ত বাস চললে তাঁরা অনায়াসে প্রথম দিনেই এখানে চলে আসবেন। দ্বিতীয় দিনে যমুনোত্রী দর্শন করে আবার ফিরে আসবেন এখানে। তৃতীয় দিনে চলে যাবেন স্যানা।

অদূর ভবিষ্যতে বাসপথ প্রসারিত হবে এই জান্‌কীবাঈ চটি পর্যন্ত। তখন এটাই হবে যমুনোত্রী যাত্রার বেস-ক্যাম্প বা মূল-শিবির। কারণ যমুনোত্রী পর্যন্ত বাসপথ প্রসারিত করা খুবই কষ্টকর। আর তা কারও কাম্যও নয়। যমুনোত্রী দার্জিলিং হলে যে তীর্থদেবতা অসন্তুষ্ট হবেন—তীর্থযাত্রীরা তো বটেই।

জান্‌কীবাঈ চটি ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে ছোট-বড় গাছে ছাওয়া একফালি প্রায় সমতল প্রান্তর। জায়গাটুকু ভারি সুন্দর—যেন একটি 'পিক্‌নিক স্পট'। বার বার গোমুখীর পথে চিরবাসার কথা মনে পড়ছে আমার। কেবল ঝরনা নেই এখানে। তবে যমুনার কলগান কানে আসছে। এমন সুন্দর জায়গায় শুটিং না করার পাত্র নন হীরেন নাগ, বিশু চক্রবর্তী তো নয়ই। অতএব শুটিং।

শুটিং শেষে আবার এগিয়ে চলি। চড়াই শুরু হয়ে গেছে—যমুনোত্রীর বিখ্যাত চড়াই। হিমালয়ের সর্বত্র পথের উন্নতি হয়েছে, কিন্তু যমুনোত্রীর এই প্রাণান্তকর চড়াই দেখছি একই রকম রয়ে গেছে।

থাক। এই চড়াই পথটুকু যদি সেকালের তীর্থপথের সাক্ষীস্বরূপ থেকে যায়, তাহলে মন্দ কি? অতীতকে মুছে ফেলার মোহ থেকে না হয় যমুনোত্রীকে নিষ্কৃতি

দেওয়া হল। তাতে মা-যমুনা খুশিই হবেন—আশীর্বাদ করবেন কর্তৃপক্ষকে।

বেশ কয়েকটা বাঁক ওপরে উঠে লোকেশানে পৌঁছন গেল। শুরু হল শুটিং—দুর্গম তীর্থপথ পার হবার শুটিং। দুটি দলের ছবি নেওয়া হল। একদলে সুমন, সাবিত্রী ও দাদা। আর এক দলে মুন্না, অরোরাজী ও মিসেস অরোরা। দেহ চাইছে না, দম বন্ধ হয়ে আসছে, তবু যাত্রীরা চলেছেন এগিয়ে—চলেছেন যমুনোত্রীর দুর্গম পথে। দাদা কিন্তু বিগড়ে বসেছেন—কি দরকার ছিল এই বিদেশ বিভুঁইয়ে এসে প্রাণটা খোয়াবার? কিন্তু সাবিত্রী তাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে নিয়ে চলেছে এগিয়ে। শমিতা ও দুর্গাবাবু বেশ অভিনয় করেছেন ভাই-বোনের চরিত্রে।

অরোরা পরিবারেরও সেই একই অবস্থা। মুন্না গুটি গুটি পা ফেলে দিব্যি চড়াই ভাঙছে। অরোরাজীও কষ্ট করে এগিয়ে চলেছেন। কিন্তু মাঝে মাঝেই পথের ওপর বসে পড়তে চাইছেন মিসেস। মিস্টার অতিকষ্টে ধরে রাখছেন তাঁর বিপুলা দেহখানিকে। নানা স্তোকবাক্যে উৎসাহিত করে কোনক্রমে তাঁকে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন।

স্বর্ণালী বেশ অভিনয় করছে মুন্নার চরিত্রে। কিন্তু শুটিং শেষ হবার পরে তাকে বলতেই সে ক্ষেপে গেল। ছোট ছোট ঠোঁট-দুটি ফুলিয়ে অভিমানভরা স্বরে বলল, "ইস ভারি তো শুটিং, ডায়লগ্ নেই, কিছু নেই, কেবল সাইলেন্ট শট্।"

হীরেনবাবু তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে সান্ত্বনা দেন, "ডায়লগ্ দেব রে মা, ডায়লগ্ দেব। কলকাতায় ফিরে গিয়ে যখন স্টুডিওতে শুটিং করবে, তখন অনেক ডায়লগ্ দেব। এখন তো শুনতে পাচ্ছ না—কি রকম নদীর শব্দ, এর মধ্যে কি ডায়লগ্ ভাল হয়?

"অশোকমামা ও পদ্মামাসি যে ডায়লগ্ বলল?" স্বর্ণালী পালটা প্রশ্ন করে।

হীরেনবাবু বিপদে পড়েন। তবু বলেন, "তোমার তো প্রায় সব ডায়লগ্ই কার্ল মানে কার্ল চাচার সঙ্গে কিনা, তিনিও আসেননি আমাদের সঙ্গে।"

"তা কার্ল চাচা আমাদের সঙ্গে এল না যে বড়?" স্বর্ণালী প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে।

হীরেনবাবু হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। আমরাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ি।

কিন্তু ক্ষুদে অভিনেত্রী পরিচালককে ছেড়ে দেবার পাত্রী নয়। সে ছোট্ট হাত দুটি দিয়ে হীরেনবাবুর মুখখানি ধরে তাঁর চোখে-চোখ রেখে বলে ওঠে, "ও হীরেনমামু, বল না গো কার্ল চাচা আমাদের সঙ্গে এল না কেন?"

"তাঁকে যে এখানে আসতে দিল না।" হীরেনাবু উত্তর দেন।

সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণালীর পালটা প্রশ্ন, "কেন আসতে দিল না?"

"আমরা চীন দেশের কাছে এসেছি কিনা, তাই এখানে অন্য দেশের মানুষদের আসতে দেওয়া হয় না।"

"আমরা চীন দেশের কাছে এসেছি!" স্বর্ণালীর চোখে বিস্ময় ও আনন্দ।

"হ্যাঁ।"

"যে চীনদেশ থেকে য়ুয়ান চোয়ঙ আমাদের দেশে এসেছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"আমাদের দেশ থেকে অতীশ দীপঙ্কর যে দেশে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"আমি চীনদেশে যাব।"

ওঁরা চলে গেলেন যমুনোত্রী, আমরা ফিরে এলাম ফুল চটি। বিদায় বেলায় মনটা যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। জানি, এ বিদায় চির-বিদায় নয়। কালই আবার দেখা হবে সবার সঙ্গে। তবু তো বিচ্ছেদ। এতদিন পাশাপাশি পথ চলেছি, একাসনে বসে খেয়েছি, একসঙ্গে হেসেছি গল্প করেছি, দুঃখ-কষ্ট সমানভাবে ভাগ করে নিয়েছি। আজ ওরা চলে গেল ওপরে, আমরা নেমে এলাম নিচে।

ধর্মশালায় ফিরে এসেই খেয়ে নিলাম। তারপরে বারান্দায় বসে গল্প জুড়ে দিলাম। আমরা প্রায় দশজন। তাহলেও যেন কেমন একা একা মনে হচ্ছে। অমূল্যটাও চলে গেছে ওদের সঙ্গে। ওরা সবাই পাহাড়ে অনভিজ্ঞ। অমূল্যর সঙ্গে থাকা দরকার।

কাজেই কথার মাঝে ভুলে থাকতে হবে এই সাময়িক বিচ্ছেদের ব্যথা। তাই আমরা কথা খুঁজে বেড়াচ্ছি। কথায় কথায় কার্তিকদাকে প্রশ্ন করি, "আচ্ছা, আপনি এই গল্পটির প্রতি এমন আকৃষ্ট হলেন কেন?"

একটু ভেবে নিয়ে কার্তিকদা বলতে থাকেন, "এক কথায় এর উত্তর দেওয়া খুব শক্ত। তবু দেবার চেষ্টা করছি—আমি পেশায় শিল্প-নির্দেশক। গল্প আর চিত্রনাট্যের দাবি অনুযায়ী ঘর-বাড়ি বাগান ইত্যাদি তৈরি করে দেওয়াই আমার কাজ। ফরমাশ মতো গরিবের কুঁড়ে থেকে রাজপ্রসাদ পর্যন্ত সবই তৈরি করেছি।

"বছর কয়েক আগে নিছক বেড়াবার তাগিদেই হীরেনের সঙ্গে গিয়েছিলাম হিমালয়ের হিমতীর্থ কেদারনাথে। সেই প্রথম হিমালয়ের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ পরিচয়। সীমাহীন পর্বতশ্রেণীর কোলে বসে থাকা পাথরের মন্দিরগুলো, ছবির মতো সাজানো পাহাড়ী গ্রাম, খরস্রোতা নদীর ওপরে কাঠের সাঁকো, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ধান কাটা ক্ষেত—মনে বড় লোভ হয়েছিল। ভেবেছিলাম—কুঁড়ে ঘর আর প্রাসাদ তো অনেক তৈরি করেছি, আমার এই তিরিশ বছরের কর্মজীবনে। এই অপরূপ সৌন্দর্যের কিছুটাও কি গড়ে তুলতে পারব না স্টুডিওর ফ্লোরে।

"তাই 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা' পড়েই বইখানির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, এই গল্পটির ছবি করতে পারলে তো সে সুযোগ হতে পারে..."

"এই যে দাদা, শুনতে পাচ্ছেন? ও দাদা?"

থামতে হয় কার্তিকদাকে। তাকিয়ে দেখি ধর্মশালার আঙ্গিনায় দুটি তরুণ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তারাই পরিষ্কার বাংলায় ডাকছে আমাদের।

কার্তিকদা তাড়াতাড়ি উত্তর দেন, "আমাদের বলছেন?"

"আর কাকে বলব দাদা? এখানে আমরা আর আপনারা ছাড়া তো আর কেউ নেই দাদা।" দুজনের একজন বলে ওঠে। তার কণ্ঠস্বর ও ভঙ্গিমা আপত্তিকর।

তবু কার্তিকদা শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করেন, "কি বলতে চাইছেন, বলুন।"

"আপনারা কি সিনেমা পার্টি?"

"হ্যাঁ।" কার্তিকদার কণ্ঠস্বর তেমনি শান্ত।

"শুনুন আমরা কলকাতা থেকে আসছি। ঐ পাশের ধর্মশালায় উঠেছি। আজ বিজয়া দশমী, রাতে আমরা আপনাদের এখানে খাব।"

"কিন্তু আমাদের তো ভাই আজ মেন-কিচেন, ওপরে চলে গেছে। আমরা মাত্র

কয়েকজন এখানে রয়েছি। নিজেরাই কি খাব, ঠিক নেই। কার্তিকদা ভদ্রভাষায় তাদের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন।

ক্ষেপে যায় ওরা। চড়া স্বরে বলে, "ও-সব বাত ছোড়িয়ে দিন দাদা। হ্যামলোগ ছে আদমী আছি। সামকো টাইমমে আয়গা, খানা—বড়িয়া খানা মিলনা চাহিয়ে।"

হিন্দী বলেই কেসটা খারাপ করে দিল ছেলেটি। কুন্দন সিং এতক্ষণ ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি। এবারে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করে, "নহী মিলেগা তব্?"

"জুলুম হোগা", একটি ছেলে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে উত্তর দেয়।

"জুলুম?" কুন্দন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করে। "কৌন করেগা?" সে উঠে দাঁড়ায়।

আমি তাড়াতাড়ি তার একখানি হাত ধরি। বলি, "ওরা এমনি ও-কথা বলেছে কুন্দন, তুমি কিছু মনে করো না—ওরা আমার পরিচিত, ভাল ছেলে।"

কুন্দন শান্ত হয়। সে আবার বসে পড়ে নিজের জায়গায়, তবে তাকিয়ে থাকে ছেলে দুটির দিকে।

তার সে দৃষ্টি সইতে পারে না তরুণ তীর্থযাত্রীদ্বয়। তাই তারা রণে ভঙ্গ দেয়। নত-মস্তকে ফিরে চলে নিজেদের আস্তানায়। ওরা কি গাড়োয়ালী কুন্দন সিংয়ের কাছে চিরদিনের মতো আমাদের—বাঙালীদের মাথা নত করে রেখে গেল?

বারো

পরদিন সকালে সুশীল ও পাণ্ডেকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম পথে—গিরিতীর্থ যমুনোত্রীর পথে।

আমরা খারশালীর পথ ধরেছি। ঘন বনে ছাওয়া চড়াই পথ—সুপ্রাচীন পথ। কয়েক বছর আগেও কেবল এই পথেই যাত্রীরা যমুনোত্রী যাওয়া-আসা করতেন।

এক সময় চড়াই পথ ফুরিয়ে গেল। অর্থাৎ আমরা ফুল চটির পরের পাহাড়টির ওপরেই উঠে এলাম। এবারে থামতে হবে—ভাঙতে হবে উৎরাই।

উৎরাই পথ এসে শেষ হল একটি পাহাড়ী নদীর তীরে। ছোট নদী, নাম উন্টা। ছোট হলেও প্রবল তার জলোচ্ছ্বাস, খানিকটা দূরে গিয়ে যমুনায় মিশেছে।

উত্তাল উন্টার ওপরে একটি কাঠের সাঁকো। তারই ওপর দিয়ে অপর পারে এলাম। পায়ে-চলা পথটি আবার এঁকে বেঁকে উঠে গেছে ওপরে—মনে হয় যেন একটি পাহাড়ে। কিন্তু ওপরে উঠলেই দেখা যাবে পাহাড় নয়, মালভূমিসদৃশ সুবিশাল প্রায় সমতল খারশালী গ্রাম।

ছবির মতো সুন্দর গ্রাম খারশালী। পাথর বাঁধানো প্রশস্ত পথ। পথের দুধারে সারি সারি দোতলা কাঠের বাড়ি। আর রয়েছে মন্দির—কাশ্মীরী কারুকার্যময় কাঠের সুউচ্চ মন্দির। যমরাজার মন্দির এবং গঙ্গা যমুনা ও সরস্বতীর মন্দির।

শীতকালে যমুনোত্রীর বিগ্রহ এনে রাখা হয় এই মন্দিরে।

খারশালী থেকে একটি পায়ে-চলা পথ গিয়েছে ঝালা—গঙ্গোত্রীর ১৮ মাইল আগে একটি জনপদ। সেই পথে এখান থেকে ঝালার দূরত্ব মাত্র ৩০ মাইল। অর্থাৎ খারশালী থেকে গঙ্গোত্রী মোটে ৪৮ মাইল। কিন্তু সে পথ সাধারণ যাত্রীর অগম্য। সুতরাং আমরা ১৫৩ মাইল ঘুরে গঙ্গোত্রী পৌঁছব।

মন্দির দর্শন করে গ্রামের সেই পাথর-বাঁধানো আঙ্গিনার ওপর দিয়েই হেঁটে চলেছি আমরা। ছেলে-মেয়েরা খেলা করছে। মা ও দিদিরা রামদানা কিংবা গেঁও শুকোতে দিচ্ছেন আর বাপ-ঠাকুর্দারা বিড়ি ফুঁকছেন। তবে সবাই আমাদের দেখছেন।

তাঁদেরই মধ্যে একজন মধ্যবয়সী মানুষ হঠাৎ এগিয়ে আসেন আমার সামনে। দু'হাত জোড় করে বলে ওঠেন, "নমস্তে মহারাজ।"

"নমস্তে।" প্রতি নমস্কার করি।

"আপনারা কি কলকাতা থেকে এসেছেন, সিনেমা পার্টির লোক?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" উত্তর দিই।

"তা আজ যমুনোত্রী যাচ্ছেন যে, আপনাদের দলের লোকেরা তো কালই চলে গেছেন?"

"সংক্ষেপে কারণটা বলি তাঁকে। আর সেই ফাঁকে নারী-পুরুষ ও শিশুর দল ঘেরাও করে ফেলে আমাদের। তাঁদের নানা জনের নানা প্রশ্ন—কেউ জিজ্ঞেস করে ছবির কথা, কেউ কলকাতার কথা আবার কেউ বা আমার কথা।

কথায় কথায় কেটে যায়। এক সময় বাধ্য হয়ে বিদায় চাইতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জেগে ওঠে। জনৈক বৃদ্ধ বলেন "আপনারা আমাদের গাঁয়ে এসেছেন। একটু কিছু মুখে না দিয়ে তো যেতে পারবেন না।"

কয়েক মিনিটের মধ্যেই চা ও নুন-লঙ্কা মাখা আলুসিদ্ধ চলে আসে।

খাওয়া হলে বিদায় নিই গ্রামবাসীদের কাছ থেকে। ফেরার পথে সবাইকে এই পথে ফিরে যাবার নেমন্তন্ন করেন তাঁরা। আমরা এগিয়ে চলি। জনবসতির শেষে সমতল ক্ষেত। ফসল উঠে গেছে, এখন উন্মুখ প্রান্তর। প্রান্তরের শেষে যমুনা—যমুনার উৎসে চলেছি আমরা।

কিন্তু সে বয়ে যাচ্ছে অনেক নিচু দিয়ে। আগেই বলেছি, খারশালী মালভূমিসদৃশ। কাজেই পায়ে-চলা পথটি দিয়ে আমরা নেমে আসি যমুনার কূলে। এখানেই রয়েছে একটি কাঠের সাঁকো। সাঁকোর ওপরে জান্‌কীবাঈ চটি।

আমরা জান্‌কীবাঈ চটিতে পৌঁছলাম। উঠে এলাম মূল-পথে। ছাড়িয়ে এলাম নির্মীয়মাণ যাত্রীনিবাস আর ডাকবাংলো। পেরিয়ে এলাম কালকের সেই 'পিক্‌নিক স্পট্'—শুরু হল চড়াই।

কালকের মতো ধীরে ধীরে পথ চললে চলবে না আজ। আজই আমাদের ফিরে যেতে হবে ফুল চটি। জঙ্গলের পথ—দিনের আলো থাকতেই ফুল চটিতে পৌঁছন দরকার। কাজেই আজ তাড়াতাড়ি চড়াই পেরোতে হচ্ছে। কালও পাণ্ডে এসেছিল আমাদের সঙ্গে। কিন্তু ধীরে ধীরে পথ-চলার জন্য চড়াইয়ের চেহারাটা ঠিক মালুম করতে পারেনি। আজ তাই মাঝে মাঝেই বলে উঠছে, "শঙ্কুদা, আস্তে চলুন।"

হেসে বলি, "আস্তেই তো চলেছি ভাই। তুমি একটু সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটো, দেখবে কষ্ট কম হবে।"

সুশীলও পাণ্ডের মতো অনভিজ্ঞ। কিন্তু সে বেশ ভাল হাঁটছে। মাঝে মাঝে আবার পাণ্ডেকে উপদেশ দিচ্ছে। এবং নিরুপায় পাণ্ডে বাধ্য হয়ে সে উপদেশ মেনে নিচ্ছে। না নেবার কোন কারণ নেই। অনভিজ্ঞ হলেও পাহাড়ী পথ চলার একটা সহজাত শক্তি

রয়েছে সুশীলের।

এক সময় আমরা কালকের সেই লোকেশানে পৌঁছলাম। পথটা এখানে একই রকম কিন্তু পথের পাশে একফালি ঘাসে ছাওয়া জমি আছে। পাণ্ডে গিয়ে বসে পড়ল সেখানে। তাড়াতাড়ি জলের বোতলটা এগিয়ে ধরি তার সামনে।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার চলা শুরু করা গেল। গাছে ছাওয়া পাহাড়ের গা বেয়ে সংকীর্ণ চড়াই পথ। চড়াই ক্রমেই বাড়ছে। কোথাও কোথাও ধস নেমে পথ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এই জায়গাগুলো পেরোবার সময় মেয়েদের নিশ্চয়ই ডাণ্ডি থেকে নামতে হয়েছে কাল।

না, বাস্তবিকই এই চার মাইল পথের কোন পরিবর্তন হয়নি—যেমন ছিল, তেমনি আছে। সবাই হাঁপিয়ে উঠেছি। তবে পাণ্ডেরই কষ্ট হচ্ছে বেশি। একে তো ভারী শরীর তার ওপর অভ্যেস নেই। সে 'হাঁটি-হাঁটি পা-পা' করে এগোচ্ছে। দু'তিনটি পদক্ষেপের পরেই জিরিয়ে নিচ্ছে। দোষ দেবার কিছুই নেই। এপথে প্রায় প্রত্যেক যাত্রীকেই এইভাবে এগোতে হয়। প্রাণপণ লড়াই করে পেরোতে হয় যমুনোত্রীর চড়াই।

তাই পাণ্ডেকে বলি, "তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ধীরে ধীরে চল, আমরা লাঞ্চের আগে ঠিক পৌঁছে যাব যমুনোত্রী।"

হাঁফাতে হাঁফাতে পাণ্ডে বলে, "আমার শরম লাগচে শঙ্কুদা, আমি দেরি করিয়ে দিচ্ছি আপনাদের।"

"না, না, দেরি কোথায় পাণ্ডেজী, সুশীল সান্ত্বনা দেয়, মোটে তো দশটা বেজেছে।

আবার এগিয়ে চলেছি। ভিজে মাটির ওপর দিয়ে পথ, বেশ পিচ্ছিল। খুবই সাবধানে চলতে হচ্ছে। একটু এধার-ওধার হলে গড়িয়ে পড়ব নিচে। সংকীর্ণ পথের পাশে গভীর খাদ। মাঝে মাঝে যমুনাকে দেখতে পাচ্ছি, মাঝে মাঝে পাচ্ছি না। পাহাড়ের বাঁকে আর গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার কলগান সর্বদা শুনতে পাচ্ছি।

দীর্ঘ সংগ্রামের পর আমরা ভৈরবঘাটিতে পৌঁছলাম। অর্থাৎ চার মাইল চড়াই পথের আড়াই মাইল পেরিয়ে এসেছি। আর ফুল চটি থেকে সাড়ে চার মাইল পথ পেরোলাম। সবসুদ্ধ চার ঘণ্টা সময় লেগেছে এই পথটুকু আসতে। এর মধ্যে তিন ঘণ্টাই গিয়েছে চড়াই পার হতে।

"তিন ঘণ্টায় আড়াই মাইল!" পাণ্ডে হাসে।

বলি, "না, না, মোটেই বেশি লাগে নি। তুমি বেশ তাড়াতাড়ি হেঁটেছ। এর পরে আর তেমন চড়াই নেই। এক ঘণ্টাও লাগবে না যমুনোত্রী পৌঁছতে।"

"তাহলে একটু বসি।"

"নিশ্চয়ই।"

পাণ্ডে ভৈরবনাথের মন্দিরের সামনে একখানি পাথরের ওপরে বসে পড়ে। পথের পাশে একটু উঁচুতে ছোট মন্দির—ভৈরবনাথের মন্দির।' ভৈরব শিবক্ষেত্রের রক্ষক। তাই একটি করে ভৈরবঘাটি আছে প্রত্যেক শিবতীর্থে। তবে গঙ্গোত্রীর ভৈরবঘাটিই সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও সুবিশাল। কিন্তু সে কথা এখন নয়।

বারো/চোদ্দ বছরের একটি গাড়োয়ালী ছেলে অনেকক্ষণ থেকেই আমাদের সঙ্গে

সঙ্গে পথ চলছিল। ইচ্ছে করলেই সে আমাদের ছাড়িয়ে যেতে পারত, হয়তো বা এতক্ষণে পৌঁছে যেত যমুনোত্রী। তবু সে থেমে থেমে আমাদের সঙ্গে রয়েছে। মাঝে মাঝে পথ-চলার নির্দেশ দিয়েছে। আমরা তার অযাচিত সাহায্যে খুশি হয়েছি। তার পরিচয় জানতে চেয়েছি। সে বলেছে, "খারশালীতে আমার ঘর। যমুনোত্রীতে দোকান আছে আমার বাবার, তারই মাল নিয়ে যাচ্ছি।" পিঠের বোঁচকাটা দেখিয়ে দিয়েছে সে।

তার বাবার কিসের দোকান জানি না। মুদি-মনোহারী, দশকর্মা ভাণ্ডার কিংবা চা ও খাবারের দোকান? এখানে অবশ্য সাধারণত সব মিলিয়েই একটি দোকান হয়—যে দোকানে চা ও চাপাটি পাওয়া যায় সেই দোকানেই পুজোর প্রসাদ থেকে পোস্টকার্ড পেতে অসুবিধে নেই কোন।

কাজেই ছেলেটির ঝোলায় কি আছে বলা শক্ত। তবে ঝোলাটি যে মোটেই হালকা নয়, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। আর সেই ভারী ঝোলাটি পিঠে চাপিয়ে পরমানন্দে পথ চলেছে ছেলেটি। একবারও কোথাও বসে নি। আমাদের বসতে দেখেও দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমরা চলা শুরু করলে চলতে আরম্ভ করেছে। মনে মনে ওর প্রতি ঈর্ষা বোধ করেছি, ঐটুকু ছেলে যা পারছে আমরা তা পারছি না।

কিন্তু লজ্জা পাই নি। ও তো পারবেই। আমি জন্মেছি নিম্নবঙ্গের পলিময় ব-দ্বীপ বরিশালের বুকে, আর এই ছেলেটি জন্মেছে উচ্চ-হিমালয়ের খারশালীতে। যমুনোত্রীর চড়াই পথে ওর সঙ্গে আমার তুলনা করতে যাওয়া অর্থহীন।

অথচ আশ্চর্য ভৈরবনাথ মন্দিরের সামনে ছেলেটিও বসে পড়ল আমাদের সঙ্গে। বলতে থাকল, "বাবা ভৈরবনাথ যমুনোত্রী তীর্থক্ষেত্রের রক্ষক, তাই প্রত্যেক তীর্থযাত্রীর এই মন্দিরে কিছু দান করা কর্তব্য।"

"কিন্তু এখানে তো পূজারী নেই, দান গ্রহণ করবেন কে?"

"কেন, আমি।" গম্ভীর স্বরে ছেলেটি বলে। জানায়, "আমি খারশালীর পাণ্ডা পরিবারের ছেলে। পুরুষানুক্রমে আমরা ভৈরবনাথের পূজারী।"

"তাহলে তোমার বাবা যমুনোত্রীতে দোকান দিয়েছেন কেন?" সুশীল প্রশ্ন করে ছেলেটিকে।

ছেলেটির মুখখানি সহসা মলিন হয়ে যায়। একটুকাল চুপ করে থাকে সে। তারপরে বলে, "কি করব মহারাজ, পরিবার বড় হয়ে গিয়েছে অথচ না বেড়েছে চাষের জমি, না বেড়েছে যজমানের সংখ্যা—পেট চালাতে হবে তো।" আর কিছু বলতে পারে না সে।

আমি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একটি টাকা বের করে ভৈরবনাথের পায়ের কাছে রাখি। পাণ্ডে এবং সুশীলও দুটি টাকা হাতে নেয়। ছেলেটির মুখে হাসি ফুটে ওঠে।

মনে পড়েছে কেদারনাথ পর্বতাভিযানের কথা। ফেরার পথে আমরা মুখীমঠের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা করেছিলাম। ধরালীর বিপরীত দিকের ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত মুখীমঠ। স্থানীয় অধিবাসীরা বলে মুখাওয়া। এটি একটি প্রাচীন ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম। দূরত্ব উত্তরকাশী থেকে ৫০ মাইল ও গঙ্গোত্রী থেকে ১৫ মাইল। গঙ্গোত্রীর পাণ্ডারা এই গ্রামের অধিবাসী। তাঁরা শীতকালে গঙ্গোত্রীর বিগ্রহকে সেখানে নিয়ে আসেন। কাজেই মুখীমঠ হিমালয়ের একটি মোটামুটি উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। কিন্তু

সমীক্ষার সময়ে আমরা সেই গ্রামের অধিবাসীদের যে দুর্দশা দেখেছি, তেমনি বোধ হয় সমতলের কোন গ্রামে গেলে দেখা যাবে না।

প্রায় সতেরো শ' একর জমি নিয়ে মুখীমঠ। উচ্চতা ৯০০০ ফুট। জনসংখ্যা ১৩০০ জন। তাঁরা ১৭৫টি কাঁচা বাড়িতে বাস করেন। শিক্ষিতের সংখ্যা ৯৬ জন। তাঁদের মধ্যে ৩ জন গ্রাজুয়েট ও ৪ জন ম্যাট্রিকুলেট। গ্রামের পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত একটি স্কুল আছে—ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৫০ জন মাত্র। কল-কারখানা তো দূরের কথা গ্রামে কোন কুটিরশিল্প পর্যন্ত নেই। কেবল ১৬ জন লোক বাইরে চাকরি করেন। বাকি সকলেই গ্রামে থেকে নিজ নিজ ক্ষেতে চাষ, কাঠ কাটা ও রাস্তা তৈরিতে মজুরের কাজ কিংবা গঙ্গোত্রী মন্দিরে পাণ্ডাগিরি করেন। ৪/৫ জনের একটি পরিবারের বার্ষিক আয় বড়জোর শ' তিনেক টাকা। ফলে প্রায় সকলেই পুষ্টিহীনতা, গলগণ্ড এবং আমাশয় প্রভৃতি রোগে ভুগছেন।

ইদানীং একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাই, হিমালয়ের নাকি প্রচুর উন্নতি হয়েছে এবং হচ্ছে। জানি না, হিমালয়ের উন্নতি বলতে তাঁরা কি বুঝিয়ে থাকেন? তবে এ কথা বাস্তব সত্য যে বিগত কয়েক বছরে হিমালয়ের যে উন্নতি হয়েছে, তা মূলত পথ তৈরি ও যানবাহন চলাচলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। হিমালয়ের মানুষেরা সে উন্নতির অংশীদার হতে পারেননি। অথচ হিমালয়ের মানুষদের জীবনকে উন্নত না করলে যে ভারতের উন্নতি সম্ভব নয়।

টাকা তিনটি সযত্নে কোটের পকেটে রেখে ছেলেটি হাসিমুখে বলে, "বাবুজি, আর তেমন চড়াই নেই। চলুন এবারে রওনা হওয়া যাক্।"

আমরা উঠে দাঁড়াই। তার সঙ্গে চলা শুরু করি। ক্ষুদে পাণ্ডা ঠিকই বলেছে। সামনে পথের অনেকখানি অংশ সমতল। আমরা স্বচ্ছন্দে সে পথটুকু পেরিয়ে এলাম।

এবারে পথটা খানিকটা নেমে গিয়ে আবার ওপরে উঠেছে। তবে আগের মতো চড়াই নয়। যমুনার তীর ঘেঁষে পথ। কে বলবে এই ক্ষীণধারাটাই কুরুক্ষেত্র, দিল্লী, বৃন্দাবন অথবা প্রয়াগের যমুনা?

এবারে সারা উপত্যকাটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে যমুনোত্রীর মন্দির—যমুনার ওপারে। দু'হাত তুলে প্রণাম জানাই মা-যমুনাকে।

"ওখানে অত লোক কেন?" পাণ্ডে বলে ওঠে।

তাই তো! বাঁক ঘুরতেই দেখতে পেলাম। অনেক লোক। কয়েকজনের গায়ে রঙিন পোশাক। মনে হচ্ছে ফেদার-জ্যাকেট। তাহলে তো আমাদেরই লোক। শুটিং হচ্ছে কি? আমরা ছুটে চলি।

হ্যাঁ, যা ভেবেছিলাম তাই! ঐ তো হীরেনবাবু, বিশুবাবু, দীপক, দিলীপ, শুভাশিস ও প্রভু। ঐ যে শুভেন্দু ও মধু। কিন্তু মধু অমন করে হামাগুড়ি দিয়ে চড়াই ভাঙছে কেন? তাহলে কি সেই দৃশ্যটা তোলা হচ্ছে!

হ্যাঁ, তাই। নিঃশব্দে ক্যামেরার পেছনে এসে দাঁড়াই। ভাবতে থাকি দৃশ্যটার কথা—

সুমনের সঙ্গে কুমারের আরও আলাপ হয়েছে ইতিমধ্যে। কুমার শুনেছে সুমনের যমুনোত্রী আসার কারণ।

গতবছর সাবিত্রী ও তার স্বামীর সঙ্গে সুমন বেড়াতে গিয়েছিল এলাহাবাদে। সাতদিন সেখানে থেকেও ওরা গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম দর্শন করেনি। ব্যাপারটা ভাল লাগত না সাবিত্রীর। তাই সে সঙ্গমে গিয়ে পুজো দেবার জন্য প্রায়ই স্বামীকে তাগিদ দিত। স্বামী হেসে বলতেন—'আমি তো তীর্থ করতে আসিনি। তোমার গঙ্গা-যমুনার পুজোর জন্য নষ্ট করার মতো সময় নেই আমাদের। কি বল সুমন?"

"—আমরা বেড়াতে এসেছি, এর মধ্যে আবার পুজোর ঝামেলা কেন?"

সুমনের কথা শুনে হেসে উঠতেন সাবিত্রীর স্বামী। সঙ্গে গলা মেলাতো সুমন।

তবু সাবিত্রী একদিন তাদের জানাল, একজন সাধু নাকি তাকে বলেছেন—প্রয়াগে এসে গঙ্গা-যমুনার পুজো না করে অন্যায় করেছিস তোরা। যদি ভাল চাস, কাল সকালে সঙ্গমে গিয়ে নারকেল দিয়ে পুজো দিবি।

আবার হেসে উঠেছেন সাবিত্রীর স্বামী ও সুমন। স্বামী বলেছেন,—"এই যে সাধুর নামে গল্পটা শোনালে সেজন্য তোমার কল্পনাকে অভিনন্দন না জানিয়ে পারছি না।"

অসন্তুষ্ট সাবিত্রী বলেছে, "বেশ। আমার কথা যদি মিথ্যে হয়, তাহলে আমি যেন পুণায় ফিরে যেতে পারি না। আর সত্যি হলে মা-গঙ্গা ও মা-যমুনা যেন তোমাদের উপযুক্ত প্রমাণ দেন।"

সাবিত্রীর স্বামী ও সুমন এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। তারা কেল্লার ওপর দাঁড়িয়ে সঙ্গম দেখেছে। কিন্তু নারকেল অঞ্জলি দেয়নি গঙ্গা-যমুনাকে।

ওরা কিন্তু এলাহাবাদ থেকে নির্বিঘ্নেই ফিরে গিয়েছিল ভি. টি.। বম্বেতে গাড়ি রেখে গিয়েছিলেন সাবিত্রীর স্বামী। সেই গাড়িতে করে পরদিন রওনা হয়েছিল পুণা। এ পথে বহুবার যাতায়াত করেছে সুমন। তাহলেও পথের সৌন্দর্য দেখে আশ মেটে না। তাই সে তাকিয়েছিল বাইরের দিকে।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে কাত হয়ে পড়েছে সুমন। তার চোখের সামনের সব কিছু অন্ধকার হয়ে গেছে। আর কিছুই মনে করতে পারে না সে। প্রায় চল্লিশ ঘণ্টা পরে হাসপাতালে জ্ঞান ফিরে এসেছে সুমনের। তারপর থেকেই এই হাঁটুর ব্যথা। অনেক চিকিৎসা করেও কোন ফল হয়নি।

তবু সুমন লাঠিতে ভর করে ধীরে ধীরে চলতে পারে। কিন্তু সাবিত্রীর স্বামী একেবারেই অচল হয়ে গেছেন। অথচ সে দুর্ঘটনায় সাবিত্রীর কোন আঘাত লাগেনি।

কিছুদিন আগে সাবিত্রী স্বপ্ন দেখেছে—গঙ্গোত্রী গিয়ে স্বামীর নামে পুজো দিলে মা-গঙ্গা তার স্বামীকে ভাল করে দেবেন।

কথাটা শোনার পর সুমনের মনে হয়েছে—গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী নিয়ে গঙ্গা-যমুনার পুজো দিলে সেও নিশ্চয়ই ভাল হয়ে যাবে। আর তাই সুমন সাবিত্রীর সঙ্গে গঙ্গা-যমুনার দেশে এসেছে। এসেছে গঙ্গা-যমুনার কাছে ক্ষমা চাইতে, তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। সে অনুতপ্ত। সারাপথেই সেকথা সে জানিয়েছে মা-যমুনাকে। তাহলে এখনও তার পায়ের ব্যথা কমে যাচ্ছে না কেন? কেন সে ভাল হয়ে উঠছে না? যমুনা কি এতই নিষ্ঠুর! যমুনার প্রতি অভিমানে ভরে ওঠে তার মন। সে ডাণ্ডি ছেড়ে দেয়। হামাগুড়ি দিয়ে চড়াইপথে এগিয়ে চলে। কারও সাহায্য নিয়ে সে মন্দিরে যাবে না। যাবে আপন শক্তিতে। যদি সে পৌঁছতে পারে ভাল, নইলে যাবে না মন্দিরে—দর্শন করবে না

মা-যমুনাকে।

কিন্তু সুস্থ সবল যাত্রীর পক্ষে যে পথ পাড়ি দেওয়া কষ্টকর, সুমনের সাধ্য কি পৌঁছোয় সেখানে? সে পারে না। হতাশায় ভেঙে পড়ে। পথের বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ওঠে।

কুমার দেখতে পায় তাকে। কাছে এসে হাত বাড়িয়ে সুমনকে তুলতে চায়। সুমন প্রত্যাখ্যান করে—সারাজীবন পরের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকতে চায় না সে।

সুমন দর্শন করে না মন্দির। রাতে ধর্মশালার ঘরে শুয়ে শুয়ে ভাবতে থাকে নিজের কথা—তার অভিশপ্ত জীবনের কথা। কি হবে এ ব্যর্থ জীবন বয়ে?

ধর্মশালার বিরাট ঘরে শুয়ে আছে অনেক যাত্রী। সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। আনন্দে বিশ্রাম করছে। তারা দর্শন করেছে যমুনোত্রীর মন্দির—পুজো দিয়েছে মা-যমুনাকে। পেয়েছে ঈপ্সিতকে।

সুমন? আর ভাবতে পারে না। সে আস্তে আস্তে উঠে বসে। পাশে সাবিত্রী ঘুমোচ্ছে। তার পাশে দাদা। অনেক দূরে কুমার। সবাই ঘুমোচ্ছে। এই তো উপযুক্ত সময়।

হামাগুড়ি দিয়ে সুমন বেরিয়ে আসে ধর্মশালা থেকে। এগিয়ে চলে যমুনার দিকে—তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে। নিষ্ঠুর যমুনার উচ্ছ্বসিত ধারায় নিজেকে বিসর্জন দিয়ে সে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে। যমুনায় ঝাঁপ দিতে যায় সুমন।

পারে না। পেছন থেকে কার দুখানি শক্ত বাহু এসে বেষ্টন করে ফেলে তাকে।

বিস্মিত সুমন পেছনে ফিরে দেখে কুমার। তাহলে কি কুমার জেগে ছিল? সে-ও তার পেছন পেছন ধর্মশালা থেকে বেরিয়ে এসেছে। তা হোক্, না না, আজ কারও কথা শুনবে না সুমন। সে তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে।

সর্বশক্তি দিয়ে সুমন কুমারের বন্ধনমুক্ত হতে চায়।

পারে না। ক্ষিপ্ত সুমন চিৎকার করে ওঠে—ছেড়ে দিন আমাকে। আমি পাপী।

—না। দৃঢ়স্বরে কুমার জবাব দেয়। সে আরও জোরে জড়িয়ে ধরে সুমনকে। বলে—আপনি এক্ষুনি যা করতে যাচ্ছিলেন, সেটাই পাপ।

সুমন জিজ্ঞেস করে—কি হবে এই ব্যর্থ জীবন বয়ে। চিরকাল পরের গলগ্রহ হয়ে—ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন আমাকে।

—কারুর জীবন ব্যর্থ নয় জানবেন। প্রত্যেকেরই জীবনের কিছু না কিছু দাম আছে। তাকে নষ্ট করবার কোন অধিকার আপনার আমার, কারও নেই। কুমার একটু থামে। সে ছেড়ে দেয় সুমনকে। তারপরে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে—ভেবে দেখুন তো, এই পৃথিবীতে কত লক্ষ লক্ষ অক্ষম ও অশক্ত মানুষ বেঁচে রয়েছে। তাদের জীবনেও হাসি আছে গান আছে বেঁচে থাকবার সখ আছে। তাদের কেউ কেউ হয়তো শিল্পী, কবি, বৈজ্ঞানিক। কই তাদের জীবন তো ব্যর্থ হয়ে যায়নি! তারা তো কেউ এভাবে নিজের জীবন নষ্ট করে দিতে ছুটে আসেনি। কুমার আবার একটু থামে। তারপরে দৃঢ়কণ্ঠে প্রেরণা দেয় সুমনকে—মনে সাহস আনুন, ভরসা আনুন, আপনিও ঠিক বেঁচে উঠবেন। যে জীবনটাকে আপনি নষ্ট করে দিতে ছুটে এসেছিলেন, সেই জীবনের সমস্ত শক্তি এক করে, আরেকবার চেষ্টা করে দেখুন, আপনি পারেন কিনা! You try to walk, for

God's sake, you try to walk, try to walk, walk, walk..."

কোথা থেকে যেন একটা আশ্চর্য শক্তি এসে ভর করে সুমনের মনে, তার দেহে, তার অবশ পায়ে। সে হাঁটতে চেষ্টা করে। হ্যাঁ, সে পা ফেলতে পারছে, এক পা, দু'পা, তিন পা। সে হাঁটতে পারছে। সুমন হাঁটতে পারছে—কারও সাহায্য না নিয়ে, লাঠি ছাড়াই হাঁটতে পারছে সে।

সুমন আনন্দে চিৎকার করে ওঠে—কুমার! কুমার, আমার পায়ে কোন কষ্ট নেই, কোন ব্যথা নেই—এই দেখ আমি হাঁটতে পারছি!

বিস্মিত কুমার তাকায় সুমনের দিকে, তাকায় যমুনোত্রীর জনহীন মন্দিরের দিকে। আর ভাবে—

"কাট্।" হীরেনবাবু চিৎকার করে ওঠেন। বিশুবাবু ক্যামেরা বন্ধ করতেই তিনি ছুটে এসে জড়িয়ে ধরেন শুভেন্দুকে। বলে, "ওয়েল ডান্। চমৎকার অভিনয় হয়েছে।"

শুভেন্দুকে ছেড়ে দিয়ে মধুর দিকে একখানি হাত বাড়িয়ে দেন হীরেনবাবু। করমর্দন করতে করতে বলেন, "তুমিও খুব ভাল করেছ, সত্যি ভাল।"

ওরা খুশি হয়। আমরা খুশি হই। সবাই খুশি হয়েছেন—পরিচালক থেকে মেক্-আপ ম্যান, ক্যামেরাম্যান থেকে সাউন্ড-ইঞ্জিনিয়ার। এ তো কোন ব্যক্তি বিশেষের সাফল্য নয়, সকলের সমবেত প্রচেষ্টার অবদান।

এই যাঃ, শুটিংয়ের কথা বলতে গিয়ে নিজের কথাই বলা হয়নি। বলিনি সেই লোকেশান থেকে এই লোকেশানে অর্থাৎ যমুনোত্রী মন্দিরের সামনে এলাম কেমন করে? বলার মতো তেমন কিছু নেই অবশ্য। সেই লোকেশানে শুটিং হবার পরে আমরা গুটি দুয়েক বাঁক পেরিয়ে পৌঁছেছি সংকীর্ণ উপত্যকার প্রশস্ততম অংশে। উপত্যকার বুক চিরে বয়ে যাচ্ছে যমুনা। তার দু'তীরে দু'ফালি প্রায়-সমতল প্রস্তরাবৃত প্রান্তর। এপারে দুটি দোকান আর নির্মীয়মাণ ধর্মশালা। তারপরে যমুনার বেলাভূমিতে নেমে একটি কাঠের সাঁকো। ওপারে একটুকরো পাথুরে জায়গা। তারই একপ্রান্ত দিয়ে উঠে গেছে মন্দিরের সিঁড়ি। পাহাড়ের গায়ে বেশ খানিকটা উঁচুতে মন্দির।

সেই পাথুরে জায়গাটিতে যমুনার তীরে দাঁড়িয়ে শুটিং করল শুভেন্দু ও মধু।

হীরেনবাবু জিজ্ঞেস করেন আমাকে, "আপনারা কি চলে যাবেন আজ?"

বলি, "তাই তো ইচ্ছে আছে।"

হীরেনবাবু ডাক দেন "নারায়ণবাবু—"

"কি বলছেন?" সহকারী পরিচালক নারায়ণ দাশগুপ্ত কাছে আসেন। "শঙ্কুদারা চলে যাবেন আজই, ওঁদের খাবার ব্যবস্থা করুন।"

"কিন্তু রান্না হতে যে এখনও দেরি আছে।" নারায়ণবাবু জানান।

হীরেনবাবু তবু বলেন, "একবার 'ফরেস্ট হাট'-এ গিয়ে দেখুন না, কোনভাবে একটা ব্যবস্থা করা যায় কিনা?"

"না। এখন কোন ব্যবস্থাই করা যাবে না।"

করা সম্ভবও নয়। কারণ নারায়ণবাবু মেয়েদের সঙ্গে গল্প করতে করতে রোদ পোয়াচ্ছেন। যমুনোত্রীতে যে রোদের বড়ই অভাব। তাই হীরেনবাবু কিছু বলতে পারার আগেই আমি বলে উঠি, "দরকার নেই হীরেনবাবু। আমরা দোকানে খেয়ে নেব।" সুশীল

ও পাণ্ডেকে বলি, "এসো দর্শন ও স্নান সেরে নেওয়া যাক। দেরি করলে অসুবিধেয় পড়বে।"

সুশীল উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে যায় মন্দিরের সিঁড়ির দিকে। কিন্তু পাণ্ডে আস্তে-আস্তে আমার কাছে আসে। করুণস্বরে বলে, "শঙ্কুদা, আমার সারা শরীর ব্যথায় টন্‌টন্ করছে।"

"বেশ তো, তুমি আজ এখানে থেকে যাও, কাল সবার সঙ্গে এসো।"

পাণ্ডে খুশি হয়। সে ফিরে যায় ক্যামেরার কাছে।

সুশীলকে নিয়ে আমি সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি। পাহাড়ের গায়ে দুটি ধাপে মন্দির। প্রথম ধাপে কুণ্ড—উষ্ণকুণ্ড। তারপরে আবার কয়েক ধাপ সিঁড়ির পরে মন্দির। ছোট মন্দির! মন্দির না বলে পাথর, টিন আর কাঠের একটি ছোট ঘর বললেই যেন ঠিক বলা হয়। সামনে খোলা বারান্দা—টিনের চাল, কাঠের খুঁটি। বারান্দার মেঝে বাঁধানো নয়। কিন্তু মন্দিরের মেঝে পাথর বাঁধানো। নিচু মেঝে, এক ধাপ সিঁড়ি পেরিয়েই মন্দিরের দুটি অংশ—মাঝখানে বড় দরজা। সামনের অংশটা ছোট। অর্থাৎ নাট-মন্দিরের চেয়ে গর্ভমন্দির বড়। মন্দিরের মূল-বিগ্রহ মা-যমুনার, পাশে মা-গঙ্গা। প্রায় কোমরসমান উঁচু পাথরের বেদির ওপর দণ্ডায়মান মূর্তি। যমুনার মূর্তিটি কালো পাথরের এবং গঙ্গার মূর্তিটি শ্বেতপাথরের। যমুনার মূর্তিটি বড়। মূর্তিদ্বয়ের ঠিক মাথার ওপরে কারুকার্যময় দুটি রুপোর ছাতা। ওপরে চন্দ্রাতপ ও সামনে পুজোর উপকরণ।

সশ্রদ্ধচিত্তে প্রণাম করি। পূজারী চরণামৃত, আশীর্বাদ ও প্রসাদ বিতরণ করেন। আবার প্রণাম করি পরমারাধ্যা গঙ্গা ও যমুনাকে। মনে মনে বলি—হে করুণাময়ী, তোমার বিগলিত করুণাধারায় সঞ্জীবিত করেছ যে উপ-মহাদেশকে, আমরা সেখানকার মানুষ। তোমাদের কথা দেশবাসীকে জানাতে দীর্ঘ ও দুর্গম পথ অতিক্রম করে আমরা এসেছি তোমাদের দেশে। তোমরা আশীর্বাদ করো, আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ করো।

মন্দিবের ঠিক পেছনেই পাহাড়ের ধারে উষ্ণকুণ্ডের উৎস। ঝলকে ঝলকে গরম জল উঠে আসছে নিচের থেকে—জল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। এই জায়গাটিকে বলে মুখারবিন্দ বা গোরখকুণ্ড। যমুনা নাকি তপস্যা করেছিলেন এখানে আর তারই ফলে হিমশীতল এই তীর্থে ঐ উষ্ণপ্রস্রবণের সৃষ্টি। প্রত্যেক পুণ্যার্থীকে পুজো দিতে হয় এখানে। আমরাও পুজো দিলাম।

তারপরে নেমে এলাম কুণ্ডের তীরে। পরপর দুটি কুণ্ড। প্রথমটি ছোট, দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত বড়। মুখারবিন্দ থেকে উষ্ণধারা এসে পড়েছে প্রথম কুণ্ডে। তার নাম সূর্যকুণ্ড। কিন্তু সেটিতে স্নান করা যায় না, জল ভীষণ গরম—১৯৪.৭ ডিগ্রী ফারেনহিট। গামছায় চাল অথবা আলু বেঁধে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখলে সিদ্ধ হয়ে যায়। সেই ভাত কিংবা আলু সেদ্ধ প্রসাদ হিসেবে নিয়ে যান অনেকে।

আমি ও সুশীল দ্বিতীয় কুণ্ডের জলে নেমে পড়ি। বড়ই আরাম লাগছে। একে তো ঋষিকেশ ছাড়ার পরে আর স্নান করা হয়নি, তার ওপর গরম জল। খুবই গরম—গায়ে সইয়ে সইয়ে আস্তে আস্তে জলে নামতে হয়েছে।

যমুনোত্রীর প্রত্যেক যাত্রী এই কুণ্ডে অবগাহন করেন। যাত্রীদের অনেকেরই অতিরিক্ত জামা-কাপড় থাকে না। কাজেই তারা প্রায়-বিবসনা হয়ে কুণ্ডের জলে নামেন।

বলা বাহুল্য মেয়েদের বেলাও কথাটা সত্য। সুতরাং হীরেনবাবু সুমন ও সাবিত্রীকে সংক্ষিপ্ত কস্টিউম্ পরিয়ে এখানে একটি সুদীর্ঘ স্নানের দৃশ্য গ্রহণ করতে পারতেন। এমন কি নায়ক-নায়িকার যৌথ-স্নানের দৃশ্য গ্রহণ করলেও আপত্তির কোন কারণ ছিল না। বরং দৃশ্যটি সাধারণ দর্শকদের চিত্ত-বিনোদনে সমর্থ হত। কিন্তু হীরেনবাবু সে সুযোগ গ্রহণ করলেন না। তিনি সস্তা জনপ্রিয়তার মোহে গল্পের বিষয়-বস্তুকে অগ্রাহ্য করলেন না। তাঁকে ধন্যবাদ।

কুণ্ডের জলে থাকতে খুবই ভাল লাগছে। তবু খানিকক্ষণ বাদে উঠে আসি। সুশীলকেও উঠতে বলি—বেশিক্ষণ জলে থাকলে মাথার যন্ত্রণায় ভুগতে হবে।

গা মুছে পোশাক পরে নেমে আসি নিচে অর্থাৎ লোকেশানে। শুটিং চলছে, তবু তারই ফাঁকে একটু কথাবার্তা বলে বিদায় নিই ওদের কাছ থেকে। স্থির আলোকচিত্রশিল্পী পি. প্রভু এবং অমূল্য সঙ্গী হয় আমাদের।

কাঠের সাঁকো পেরিয়ে আমরা যমুনার অপর তীরে আসি—উঠে আসি দোকানের সামনে। দেখা হয় কালকের সেই ছেলে দুটির সঙ্গে—যারা ধর্মশালায় এসে জুলুমের ভয় দেখিয়েছিল আমাদের। বেচারিরা যেন লজ্জা পেয়েছে আমাকে দেখে। কাজেই আর কথা বলি না ওদের সঙ্গে। এগিয়ে আসি দোকানের ভেতরে। তরুণ পদযাত্রী দুজনের বয়োজ্যেষ্ঠ সঙ্গীরা তখনও খাচ্ছিলেন। তাঁদেরই একজন আলাপ করলেন আমার সঙ্গে। তিনি দেখছি আমাদের পূর্ব-পরিচিত। পরিচয় দিতে আমার মনে পড়ল তাঁর কথা। ভদ্রলোক অনুরোধ করলেন, "আসুন, একটা ছবি নেওয়া যাক্। মানে আপনার ও অমূল্যবাবুর সঙ্গে আমরা একটা ছবি নিতে চাইছি।"

হেসে বলি, "বেশ তো, এতে আপত্তির কি থাকতে পারে।"

ভদ্রলোক খুশি হয়ে ক্যামেরাটা প্রভুর হাতে দেন? কিন্তু তারা কোথায় গেল, সেই তরুণ পদযাত্রীদ্বয়। ওরা যে সাঁকো পেরিয়ে ওপারে যাচ্ছে।

সঙ্গীরা ডাক দেয় তাদের। ওরা ইতস্তত করছে। অতএব আমিও হাত নেড়ে কাছে ডাকি। এবারে বোধহয় লজ্জা কাটে, এগোতে শুরু করে ওরা—কাছে আসে। আমি দুজনকে দু'পাশে নিয়ে দাঁড়াই। প্রভু ক্যামেরা ঠিক করে—"রেডি?" সাটারের শব্দ..."থ্যাঙ্ক্ ইউ।" প্রভু ক্যামেরা ফিরিয়ে দেয় ভদ্রলোককে।

সে ফিরে চলে লোকেশানে। ওর যে অনেক কাজ—প্রত্যেক শট্-এর ছবি নিতে হবে। নইলে স্টুডিওতে শুটিং করার সময় কন্‌টিনিউইটি রক্ষা করা যাবে না। তাছাড়া প্রচারের জন্যও তার এইসব স্থিরচিত্র অপরিহার্য।

ছবি নেওয়া শেষ হওয়ামাত্র কিন্তু সেই ছেলে দুটি ফুল চটির পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। বেচারিরা কালকের আচরণের জন্য বোধহয় অনুতপ্ত। কেবলই আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছে।

অমূল্যকে নিয়ে আমি ও সুশীল এসে দোকানে প্রবেশ করি। খাবারের দোকান বলতে এখন যমুনোত্রীতে এই একটি। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে দোকানদার জানায়, ডাল রুটি ও তরকারি পাওয়া যাবে।

তাই দিতে বলে দোকানীর সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিই। দোকানী জানায়—সাধারণত এ সময় আরও দু-তিনটি দোকান থাকে। কিন্তু গতবছর ধস নেমেছিল বলে, এ বছর

যাত্রীসংখ্যা বড়ই কম। অন্য দোকানীরা চলে গিয়েছেন। সে-ও যেত, কেবল আমরা আসছি শুনে রয়ে গেছে। আগামীকাল সে-ও নিচে চলে যাবে।

খাওয়ার পরে বিদায় নিই অমূল্যর কাছ থেকে—বিদাই নিই যমুনোত্রীর কাছ থেকে। জানি না আর কোনদিন আসতে পারব কিনা এই পরমতীর্থে।

তাই আবার প্রণাম করি মন্দিরকে—প্রণাম করি জননী যমুনাকে। মনে মনে বলি, এবারেও তোমার উৎস দর্শন হয়ে উঠল না, তুমি ক্ষমা কোরো আমাকে।

উৎসের কথাই ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলেছি। যমুনোত্রীর মন্দির থেকে চার মাইল দূরে চম্পাসর হিমবাহ।—হিমবাহের তিন জায়গা থেকে সৃষ্ট হয়েছে তিনটি ধারা। খানিকটা দূরে এসে তিনধারা পরিণত হয়েছে একধারায়। সেই তুষার বিগলিত ধারাই এই যমুনা—'যমস্য ভগিনী জাতা যমুনা তেন সা মাতা'। নানা নামে অবহিতা সে—কালিন্দী, সূর্যতনয়া, তপনতনুজা, শ্যামা, তাপী ও যমী প্রভৃতি।

কিন্তু না যমুনার কথা নয়, আমি ভাবছি তার উৎসের কথা। বান্দরপুঁছ পর্বতমালার (২০,৭২০') উত্তর-পশ্চিমাংশে ৩১° ৩' উঃ অক্ষাংশ ও ৭৮° ৩০' পঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত এই উৎস। যমনোত্রী থেকে দূরত্ব মাত্র চার মাইল কিন্তু অত্যন্ত দুর্গম। তাহলেও হীরেনবাবুও তাঁর দলবল নিয়ে কাল সেই পথে কিছুদূর যাবেন। ঐ দুর্গম পথের ওপরই তিনি একটি লোকেশান নির্বাচিত করেছেন। সেখানেই হবে কালকের শুটিং। সেই শুটিং শেষ করে ওঁরা কাল ফিরে যাবেন ফুল চটি। আর আজ সেই দৃশ্যটির কথা ভাবতে ভাবতে আমি ফিরে চলেছি ফুল চটিতে।

সুমন ভাল হয়ে গেছে। এবং ভাল হওয়ার ভিতর দিয়ে সুমন ও কুমার অনেকটা কাছাকাছি এসেছে। তাই আজ ওরা দুজন হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলেছে যমুনার উৎসের দিকে। কাল পর্যন্ত যে হাঁটতে পারত না, সে আজ অক্লেশে এগিয়ে চলেছে দুর্গমতর পথে। ব্যাপারটা বিস্ময়কর হলেও কঠিন বাস্তব। তবু কুমারের বিস্ময় কাটে না।

চলতে চলতে তারা পথের পাশের একখানি পাথরের ওপর বসে। কুমার কোন কথা বলে না। কেবল চেয়ে চেয়ে বার বার সুমনকে দেখতে থাকে।

সুমন হেসে বলে—কি দেখছেন অমন করে?

কুমার উত্তর দেয়—ভাবছি, কাল আর আজ মাত্র তো একটি দিনের তফাৎ। অথচ আপনার জীবনটা কিভাবে বদলে গেল? কি করে এটা সম্ভব হল? শুধুই কি বিশ্বাসের জোরে— just by miracle! দেবতার মহিমায়? আজকের যুগের ছেলে আমি। কোন কিছুকে সহজ বিশ্বাসে আঁকড়ে ধরা আমার যুগের ধর্ম নয়। পুরনো যুগের বাতিল হওয়া যা কিছু মূল্যবোধ, তাকে ভেঙে চুরে গুঁড়িয়ে দিতে চাই। কিন্তু আজ নিজেকে বড় অসহায় বলে মনে হচ্ছে। বুঝতে পারছি, একটা বিরাট শক্তির মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি। তর্ক দিয়ে যাঁর নাগাল পাওয়া যায় না। যুক্তি দিয়ে যাঁকে হারাতে পারছি না—অথচ তাঁর অস্তিত্বকে অস্বীকার করি, এমন শক্তিই বা আমার কোথায়?

সুমন এতক্ষণ অবাক হয়ে শুনেছিল কুমারের কথা। এবারে সে স্নিগ্ধস্বরে জিজ্ঞেস করে—এই প্রশ্নের জবাব পেতেই কি আপনি এখান এসেছেন? আপনি নিশ্চয়ই কবি, তাই সত্য জানতে চান—তাই না?

—না, না, না। আমি ও-সব কিছু নই। না কবি, না শিল্পী। তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা তো

অনেক দূরের কথা। আমি এসেছি শুধু দেখতে। আপনার মতো এই যে শত শত তীর্থযাত্রী—অমানুষিক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে এসে মিলিত হয়েছেন এখানে—তাঁদের দেখতে, জানতে ও একান্ত আপনার করে পেতে।

—আপনার সেই চাওয়া আর পাওয়া সার্থক হয়েছে কি?

...অন্তত একজনকে তো খুব কাছে পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। পূর্বাচলের কুমার, পশ্চিমঘাটের সুমনের সঙ্গে বসে আছে একাসনে—উত্তরতম প্রান্তের এই পাথরখানির ওপরে।

তেরো

অবশেষে উত্তরকাশী পৌঁছন গেল। জেলা সদর উত্তরকাশী। ভাগীরথী বিধৌত ৩৮০০ ফুট উঁচু একটি সুবৃহৎ ও সুন্দর উপত্যকা। ঋষিকেশ থেকে ৯৫ মাইল।

আজ ১৪ই অক্টোবর। অর্থাৎ ঋষিকেশ ছাড়ার বারোদিন বাদে আমরা আবার নাগরিক সভ্যতার মাঝে ফিরে এলাম। না, পথে কোন কষ্ট হয় নি। গতকাল বিকেলে আমরা হনুমান চটি থেকে যমুনা চটি ফিরে এসেছি। কথামত বাস অপেক্ষা করছিল। অবশ্য এই কথা রাখার জন্য পরশুদিন অর্থাৎ আমি যেদিন যমুনোত্রী গিয়েছিলাম তার পরদিন হীরেনবাবুদের প্রাণান্তকর পরিশ্রম করতে হয়েছে। তাঁরা সেদিন সারা সকাল যমুনোত্রীতে শুটিং করে একটানা নয় মাইল হেঁটে রাত ন'টার সময় হনুমান চটি পৌঁছেছেন। না পৌঁছে উপায় ছিল না। সেদিন হনুমান চটি না এলে কাল আমরা যমুনা চটি আসতে পারতাম না। বাস বসে থাকত কুতনৌরে। হয় অযথা শ'দুয়েক টাকা বেরিয়ে যেত, নয়তো আমাদের না পেয়ে ড্রাইভার ফিরে যেত ঋষিকেশ। মহা মুশকিলে পড়তে হত তাহলে।

কুতনৌর থেকে বাসপথে উত্তরকাশী ৪৬ মাইল। পথে বারকোট ও গেঁওলাতে চা খেয়েছি। ধীরে-সুস্থে এসেছি। তাতেও মাত্র ঘণ্টা চারেক সময় লেগেছে।

উত্তরকাশীর নবনির্মিত যাত্রী নিবাসে আশ্রয় নিয়েছি আমরা। ছ'খানি ঘর ভাড়া নিয়েছি। অতএব অসুবিধার কোন কারণ নেই। ভাণ্ডারী হোটেলে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এখানে আমরা নিজেরা রান্না করব না। বিগত ও আগামী দিনগুলির থাকা-খাওয়ার কষ্টকে যতটা সম্ভব পুষিয়ে নেওয়া হবে। কার্তিকদা বলে দিয়েছেন—মাছ-মাংস, দুধ-ডিম—যার যা ইচ্ছে খেতে পার।

স্নান-খাওয়ার পরে হীরেনবাবু তাঁর দলবল নিয়ে শুটিং করতে বেরিয়ে গেলেন। অনেকগুলি লোকেশান আছে এখানে। বিশ্বনাথ, শক্তি, পরশুরাম, অন্নপূর্ণা, কালী, একাদশী, রুদ্র ও কালভৈরব প্রভৃতি মন্দিরে শুটিং করা হবে। এ ছাড়া বিড়লা ধর্মশালা ও পথে অরোরা পরিবারের ফিরে যাবার দৃশ্যটি গ্রহণ করতে হবে।

হ্যাঁ, মুন্নাকে নিয়ে মিস্টার ও মিসেস অরোরা দিল্লী ফিরে যাচ্ছেন। সেদিন কার্লের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে মুন্নার জ্বর হয়েছে। এ অবস্থায় মিসেস তাকে নিয়ে আর গঙ্গোত্রী যেতে রাজী নন। কিন্তু মুশকিল হয়েছে মুন্নাকে নিয়ে। সে কিছুতেই তার কার্ল চাচাকে কাছছাড়া করতে চাইছে না। জ্বরের ঘোরে এমনকি ঘুমের মধ্যেও কার্লের একখানি হাত নিজের মুঠোয় পুরে রেখেছে।

আর কার্লও হয়েছে ঠিক তেমনি। খাওয়া-দাওয়া ভুলে সে তার 'মুন্নির' শিয়রে বসে আছে। সারাক্ষণ সেবা করছে। এবং বোধহয় নিঃশব্দে নিজের জীবনদেবতার কাছে তার মুন্নিকে ভাল করে দেবার জন্য প্রার্থনা করে চলেছে।

তবু মুন্নাকে নিয়ে মিসেস অরোরা আজ চলে যাবেন। কার্ল পথে বেরিয়ে বিদায় দিতে পারবে না মুন্নাকে। তাই সে ধর্মশালার নির্জন ঘরে বসে নীরবে অশ্রুপাত করবে। আর মুন্না?

সে কিছুতেই যেতে চাইবে না তার কার্ল চাচাকে ছেড়ে। তাই সে চিৎকার করে কাঁদতে থাকবে, ডাকতে থাকবে তার কার্ল চাচাকে। সেই আকুল আহ্বানে উত্তরকাশীর পথ ও প্রান্তর উদ্বেল হবে, আকাশ ও বাতাস বিহ্বল হয়ে উঠবে কিন্তু কার্ল সাড়া দিতে পারবে না।

গাড়ি গর্জে উঠবে। চলতে শুরু করবে। কুমার বিড়লা ধর্মশালার সামনে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে সজল চোখে বিদায় জানাবে তাঁদের। মুন্নার আকুল আহ্বান ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে একসময় মিলিয়ে যাবে। অবশেষে তাঁদের গাড়িটা অদৃশ্য হয়ে যাবে পথের বাঁকে।

উত্তরকাশী পর্বতারোহণ শিক্ষায়তনের অধ্যক্ষ লেঃ কর্নেল জে. সি. যোশী একখানি গাড়ি দিয়েছেন আমাদের। তাতে চড়েই শুটিং করবেন অশোকবাবু, পদ্মাদেবী ও স্বর্ণালী।

কিন্তু ওঁদের কথা থাক্, আমাদের কথা বলে নিই। আমরা মানে আমি, অমূল্য, দিলীপ ও কুন্দন। ঠিক কথা কুন্দনের কথা তো বলাই হয়নি। পরশুদিন সকালে সে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল বনাস গ্রামে অর্থাৎ শ্বশুরবাড়ি-কাম-নিজের বাড়িতে। দুধ ও ফলের রস খাইয়ে বাড়ি-ঘর ও ক্ষেত খামার দেখিয়েছে। আলাপ করিয়ে দিয়েছে তার স্ত্রী, শ্বশুর-শাশুড়ি ও শালীর সঙ্গে। তারপরে নিজের জামাকাপড় নিয়ে আমার সঙ্গে চলে এসেছে ফুল চটি, সেখান থেকে উত্তরকাশী।

যাক্ গে, যে কথা বলছিলাম—ওঁরা শুটিং করতে চলে যাবার পরে আমরা রওনা হলাম পর্বতারোহণ শিক্ষায়তনে— যাত্রী নিবাস থেকে মাইল খানেক দূরে।

এসে কিন্তু দেখা পেলাম না অধ্যক্ষ লেঃ কর্নেল যোশীর। ২/৩ দিন বাদেই মেয়েদের কোর্স নিয়ে গঙ্গোত্রী যাবেন কাজেই তিনি খুব ব্যস্ত আছেন। তবে দেখা হল মিসেস যোশীর সঙ্গে। ক'দিন আগে যখন সাজ-সরঞ্জাম ও অন্যান্য ব্যবস্থা করার জন্য উত্তরকাশী এসেছিলাম তখন আলাপ হয়েছিল তাঁর সঙ্গে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই আমাদের যথেষ্ট আদর-যত্ন করেছিলেন। বলেছিলেন, শিক্ষায়তনের অতিথিশালাটি ছেড়ে দেবেন। আমাদের শিল্পীরা সেখানে থাকবেন।

মিসেস জানালেন, মিঃ যোশী জরুরি কাজে বেরিয়ে গেলেও তিনি সব ব্যবস্থা করে রেখে গেছেন। এমন কি অতিথিশালায় টেলিফোন পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

সবিনয়ে বললাম, আমাদের শিল্পীরা যাত্রী নিবাসেই থাকবে। কারণ তারা শহর থেকে এত দূরে থাকলে কাজের অসুবিধে।

অনেক কষ্টে মিসেস যোশীকে বুঝিয়ে আমরা এলাম শর্মাজীর কোয়ার্টারে। শর্মাজী এই শিক্ষায়তনের রেজিস্ট্রার। শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠা থেকেই তিনি এই গুরুদায়িত্ব

বহন করে চলেছেন। তিনি দেরাদুন থেকে ফিরে এসেছেন। শর্মাজী শুধু প্রখ্যাত পর্বতারোহী নন তিনি একজন সুদক্ষ সরকারি অফিসার।

আমার প্রশ্নের উত্তরে শর্মাজী জানালেন, যোশীমঠ থেকে কোন সামরিক অফিসার এখনও এসে পৌঁছননি। তবে দিল্লী থেকে চিঠি এসেছে, তিনি আসবেন। হয়তো বিকেলের মধ্যেই এসে যাবেন।

মোটেই আশ্বস্ত হতে পারি না। আমরা তো তাঁকে একদিন আগেই আসতে বলেছিলাম, তাহলে এখনও আসেননি কেন?

অথচ তিনি না এলে তো আমরা আর এগোতে পারব না। উত্তরকাশী শহর ছাড়িয়েই 'ইনার লাইন' বা সংরক্ষিত এলাকা শুরু। এই এলাকায় অনুমতি ছাড়া ফটো তোলা নিষেধ। এবং পর্বতারোহী ছাড়া আর কাউকে 'ক্যামেরা পারমিট' দেওয়া হয় না। পারমিট পেলেও ঝামেলা অনেক। যাবার সময় ডেপুটি কমিশনার অফিসে ফিল্মের হিসেব দিয়ে যেতে হয়। ফেরার পথে এক্সপোজ্‌ড ফিল্ম ও তার ডেভেলপিং চার্জ জমা দিতে হয়। ডেপুটি কমিশনার ফিল্ম ও টাকা পাঠিয়ে দেন দিল্লীতে—ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টে। তাঁরা ফিল্মগুলো ডেভেলপ করে দেখেন, প্রতিরক্ষার দিক থেকে গোপনীয় কোন বস্তুর ছবি নেওয়া হয়েছে কিনা? পরীক্ষার পরে ছবিগুলো পাঠিয়ে দেন পর্বতারোহীদের কাছে।

কিন্তু এই শর্তে আমাদের পারমিট নেওয়া সম্ভব নয়। তাই কলকাতার হিমালয়ান ফেডারেশানের অনুরোধে ও ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশানের সম্পাদক শ্রী আর. এম. চক্রবর্তীর সুপারিশে সাব্যস্ত হয়েছিল, প্রতিরক্ষা দপ্তরের জনৈক অফসার যোশীমঠ থেকে উত্তরকাশী আসবেন। আমাদের সঙ্গে গঙ্গোত্রী ও গোমুখী যাবেন। তিনি লক্ষ্য রাখবেন যাতে আমরা প্রতিরক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় কোন বস্তুর ছবি না নিই। তারপরে তিনি আমাদের একটি সার্টিফিকেট দেবেন। তারই ভিত্তিতে ডেপুটি কমিশনার ফিল্মগুলো দিয়ে দেবেন আমাদের। নির্মিত হবার পরে ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টকে ছবিখানি দেখাতে হবে। তাঁদের 'নো অব্‌জেকশান' সার্টিফিকেট না হলে ছবির সেনসর হবে না।

অতএব প্রতিরক্ষা বিভাগের সেই অফিসারটি না এলে আমরা উত্তরকাশী ছাড়তে পারছি না। শর্মাজী বলছেন, তিনি আসেননি। ঠিকই বলছেন। কারণ উত্তরকাশী পৌঁছে তিনি প্রথম এখানেই আসবেন।

কিন্তু তিনি এলেন না কেন? কলকাতা থেকে রওনা হবার আগেই আমাদের উত্তরকাশী পৌঁছবার আনুমানিক তারিখ জানানো হয়েছিল। সেই অনুযায়ী চক্রবর্তীদা অর্ডার ইস্যু করেছেন যোশীমঠে। তার ওপর আমি হৃষিকেশ থেকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি দিল্লীতে। লেঃ কর্নেল যোশী টেলিফোনে তাগিদ দিয়েছেন। তবু তিনি এখনও এসে পৌঁছলেন না। ব্যাপারটা বিস্ময়কর, দুশ্চিন্তার তো বটেই।

হঠাৎ অমূল্য প্রশ্ন করে শর্মাজীকে, "আচ্ছা কে. পি...." শর্মাজীর পুরো নাম শ্রীকে. পি. শর্মা। তাঁকে আমরা কে. পি. বলেই ডাকি। অমূল্য বলে, "আচ্ছা কে. পি., যদি যোশীমঠ থেকে কোন অফিসার না আসেন, তাহলে কি ডেপুটি কমিশনার তাঁর জায়গায় একজন পুলিশ অফিসার নিয়োগ করতে পারেন না?"

একটু ভেবে নিয়ে শর্মাজী বলেন, "জিজ্ঞেস করা যেতে পারে।" তিনি টেলিফোন

তুললেন। ডেপুটি কমিশনারকে অফিসেই পাওয়া গেল। কথা বলার পরে শর্মাজী টেলিফোন নামিয়ে রেখে হতাশকণ্ঠে বললেন, "না, ডি. সি. ঠিক রাজী হচ্ছেন না। বলছেন—প্রতিরক্ষা দপ্তর থেকে অর্ডার এসেছে, তাঁদের অফিসার যাবে তোমাদের সঙ্গে, এ অবস্থায় তিনি কেমন করে পুলিশ অফিসার নিয়োগ করেন?"

কথাটা যুক্তিসঙ্গত। তবু শর্মাজীকে বলি, "তাহলে আপনি একবার ফোনে দিল্লীতে চক্রবর্তীদার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি যদি ডি. সি.-র সঙ্গে কথা বলেন তাহলে সমস্যাটা মিটে যায়।

"আপনারা এসে গেছেন শুনেই আমি দিল্লীতে লাইন বুক করেছি, তাছাড়া ডি সি. নিজেও মিঃ চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন।"

আর একবার ভাবীজীর চা ও পকোড়া ধ্বংস করে ফিরে এলাম যাত্রী নিবাসে। গেটের সামনে দর্শনার্থীদের ভিড়। বাংলা ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাদের অপরিচিত, তবু তারা ভিড় জমিয়েছে। বাংলা হলেও সিনেমা তো বটেই।

ভিড় ঠেলে ভেতরে এসে দেখি দিনের কাজ শেষ করে ক্লান্ত কলাকুশলী ও শ্রান্ত শিল্পীরা জোর আড্ডা জমিয়েছে। আমরা তাদের সঙ্গে যোগ দিই। মোটে আটটা বেজেছে। সাড়ে নটার আগে ভাণ্ডারী হোটলে খাবার পাওয়া যাবে না।

তাই কথায় কথায় শুভেন্দুকে জিজ্ঞেস করি, "আচ্ছা ভাই, তুমি কেনই বা ডাক্তারি পড়লে, আর কেনই বা ডাক্তারি না করে অভিনয়ে যোগদান করলে? তোমার ছাত্র ও অভিনয় জীবনের কিছু কথা বল।"

আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে শুভেন্দু বলে, "আপনার উত্তর দিতে গেলে তো প্রায় আত্মজীবনী বলা হয়ে যাবে। যাই হোক্ চেষ্টা করছি।" সে বলতে শুরু করে, "আমার ডাক্তারি পড়াটা মোটামুটি আনপ্ল্যান্ড বলতে পারেন। আমাদের দেশের বিদ্যাটা একমাত্র অর্থোপার্জনের রাস্তা বলেই অধিকাংশ লোকের ধারণা। যে কারণে অভিভাবকরা স্কুলে ভর্তি করার সময়—অন্তত আমাদের ছেলেবেলায় তাই হত, ছেলেদের বয়স এক দু-বছর কমিয়ে দিতেন, যাতে করে যেন বেশি বয়স পর্যন্ত পাকাচুল নিয়ে 'হুঁ হুঁ বাবা আমি মহামান্য সরকারের পাকা চাকর' বলে সদর্পে ঘোষণা করে ঘুরে বেড়াতে পারে। আমার বাবা তার চেয়ে একটু বেশি ভেবেছিলেন। তার পেছনে তাঁর নিজের শৈশবের সুখস্মৃতি অনেকটা কাজ করেছে। কারণ আমার ঠাকুর্দামশাই ছিলেন সাহেব আমলের সিভিল সার্জেন।. আর্থিক ও সামাজিক আভিজাত্যে প্রায় রাজত্ব করে গেছেন। শৈশবের সেই প্রাচুর্য আর মর্যাদার স্মৃতিই বোধহয় বাবার মনে ইচ্ছে হয়ে ফুটেছিল—'ছেলেদের কেউ একজন ডাক্তার হোক্।' আর আমার ওপরই সেই দায়িত্ব এসে বর্তেছিল। ছাত্র হিসেবে খারাপ ছিলাম না। পড়াশোনার ধারাটা নিজের খাতেই বয়ে চলল। এক সময় যথারীতি ডাক্তারি পাশ করলাম। ডাক্তার হয়ে গেলাম। ডিগ্রি পেলাম, রেজিস্ট্রেশান পেলাম আর আশ্বাস পেলাম নিদারুণ সরকারি স্বীকৃতির—৩২৫ থেকে ৮০০ টাকা গ্রেডয়ের চাকরি।

"আমার ডাক্তারি না করে অভিনয়ে যোগ দেওয়ার কারণটা অবশ্য অর্থকরী নয়। ওটা একান্তভাবেই মানসিক। এবং মনে মনে সেটা ঠিক করেছিলাম ডাক্তারি পাশ করার অনেক আগেই। সেটা একটা ঘটনা বলতে পারেন। ১৯৫৪/৫৫ সাল হবে, তখন আই. এস. সি. পড়ি। বালী থেকে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করি। মফঃস্বলের মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে।

কাজেই কলকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখা হয়ে ওঠেনি কখনও। হঠাৎ একদিন সুযোগ এসে গেল। শ্রীরঙ্গমে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের 'মাইকেল মধুসূদন' নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। অভিনয় শুরু হল। প্রথম থেকেই মনে হল এরকম অভিনয় তো আগে দেখিনি। কোন উচ্ছ্বাস এল না মনে, কোন করতালির মুখরতা নেই হলে অথচ প্রতি মুহূর্তে অনুভূতিগুলো আনন্দে গুমরে যেন মূক হয়ে গেল। হতবাক হয়ে গেলাম। প্রথম সমুদ্র দেখে যেমন হয়েছিলাম। হিমালয়ের তুষারমৌলির মাঝে প্রথম গিয়ে দাঁড়ালে যেমন হয়। সারারাত্তির ঘুমোতে পারলাম না। কেবলই মনে হতে লাগল, 'অভিনয় দেখেই যদি এত আনন্দ পাওয়া যায়, যিনি করছেন তিনি না জানি কত আনন্দ পাচ্ছেন।' সেই রাতেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম অভিনেতা হব। ডাক্তারি ছাড়ার সিদ্ধান্ত অবশ্য তখন নিতে পারিনি কারণ তখনও ডাক্তারি পড়তে ঢুকিই নি। ডাক্তারি ছাড়ার প্রশ্ন উঠেছিল অনেক পরে।

"এদিকে পড়াশোনার ধারাটা এগিয়ে চলল নিজের খাতেই। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে মেডিকেল কলেজে ঢুকলাম ১৯৫৫ সালে। আমার ছাত্রজীবনে লেখাপড়ার দিকটা মোটামুটিভাবে নিস্তরঙ্গ স্থির বলতে পারেন। সারাদিনের একটা মিনিমাম সময় পড়ার বই নিয়ে বসতাম—যেটুকু না বসলে নয়। কখনও সোনার মেডেল পাইনি, আবার ফেলও করিনি কোন পরীক্ষায়। বেশির ভাগ সময় অবশ্য ব্যয় করেছি কলেজে য়ুনিয়ান করে, ম্যাগাজিন বার করে, জলসা করে, আর প্রত্যেকটি নাটকে অংশ নিয়ে। বিশেষ করে রি-য়ুনিয়ানের সময় মেডিকেল কলেজে তিনদিন ধরে নাট্যোৎসব হত। ছাত্ররা করত, জুনিয়র ডাক্তারগ্রুপ করত, এমন কি পক্ককেশ প্রবীণ মাস্টারমশাই ডাক্তাররাও করতেন। তারপর চতুর্থ দিনে অনুষ্ঠানের অন্তে থাকত রি-য়ুনিয়ান ডিনার। প্রিন্সিপ্যালের বাড়ির পেছন দিকে বিরাট লন জুড়ে টেবিল পড়ত অজস্র। আলো জ্বলত অনেক। বিলিতি বাদ্যযন্ত্রের অর্কেস্ট্রা বাজত। সে বড় ঝল্‌মলে আনন্দময় ব্যাপার। মনে আছে সারাটা বছর আমরা কাটিয়ে দিতাম আগামী রি-য়ুনিয়ানের দিকে তাকিয়ে।

"মেডিকেল কলেজে আমাদের জীবন ছিল বিচিত্র রসে বৈচিত্র্যময়। তার সূক্ষ্ম অনুভবের মুহূর্তগুলোকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে আলাদা উপন্যাস হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই বিরত থাকছি।

"১৯৬০ সালে ফাইন্যাল এম. বি. বি. এস. পরীক্ষায় পাশ করে ডাক্তার হয়ে বেরুলাম। এরপর তিন বছর মেডিকেল কলেজেই ডাক্তার হিসাবে কাজ করেছি বিভিন্ন মর্যাদায়। এরই মধ্যে ঘটল একটা ঘটনা যার থেকে আমার কর্মজীবনের বিরাট পরিবর্তনের সূত্রপাত। সেই কথায় আসা যাক্।

"তখন আমি মেডিকেল কলেজে অর্থোপেডিক ডিপার্টমেন্ট হাউস সার্জেন। একদিন সাকেল আউট-ডোরে বসে রুগী দেখছি। কারুর হাড় ভাঙা, কারুর গাঁট ফোলা—এমন সময় একজন ইয়ংম্যান, আমারই বয়সী হবে, প্রায় অখ্যাত এক ওষুধ কোম্পানির রিপ্রেজেন্টেটিভ, কিছু ওষুধের গুণাগুণ বণর্না করে আমাকে প্রভাবিত করতে এলেন। নাম অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। নানান ওষুধের গুণাগুণ তিনি বুঝিয়ে মিনিট দশেক বাদে বিদায় নিলেন। এ ঘটনাটা দুর্ঘটনায় পর্যবসিত হওয়াই বোধ হয় ভবিতব্য ছিল। দুপুরে কাজের শেষে আবার দেখা অর্ধেন্দুর সঙ্গে। বলল, 'চলুন ডাক্তারবাবু একটু কফি

খেয়ে আসি।' কফি হাউসে—এলবার্ট হলে গিয়ে বসলাম। কথায় কথায় প্রকাশ পেল আমাদের দুজনেরই ইন্টারেস্ট এক জায়গায় মিলেছে—সেটা নাটক ও অভিনয়শিল্প। প্রকাশ পেল অর্ধেন্দু বিগত যুগের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী শেফালিকা দেবীর ছেলে। ততক্ষণে অর্ধেন্দু 'বাবু' হয়ে গেছে। ওর ডাকনাম বাবু। সন্ধ্যেবেলা ওর বাড়িতে নিয়ে গেল আমাকে। কয়েক ঘণ্টায় বন্ধু হয়ে গেলাম আমরা। রাত্তিরে ফেরার সময় আমি বললাম, "তাহলে তুই কাল দুপুর ১টা নাগাদ ডিপার্টমেন্টে আসিস'। ও বলল—'তুই ডিপার্টমেন্টেই থাকবি তো।'

"এই বন্ধুত্ব এখনও চলেছে। এবং এর থেকে বাবুর কি উপকার হয়েছে জানি না, কিন্তু আমার সুপ্ত ইচ্ছেগুলো ঘটনা হয়ে ফোটবার পথ পেয়েছে বাবুর মাধ্যমে, এটা স্বীকার করতে আমার আনন্দই হয়।

"এর ক'দিন বাদেই বাবু আমাকে নিয়ে গিয়েছিল গণনাট্য সঙ্ঘের 'প্রান্তিক' শাখায় জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। জ্ঞানেশদার কাছে আমার অভিনয় শিক্ষার জীবন শুরু হয়। মোটামুটি বর্ণ পরিচয় থেকে স্কুল ফাইন্যাল পর্যন্ত তাঁর কাছেই শিখেছি।

"জ্ঞানেশদা আমার মধ্যে কি দেখেছিলেন জানি না কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে চলতি নাটক রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'তে রমেশের ভূমিকায় নামালেন। প্রসঙ্গত তার আগে এই চরিত্রে জ্ঞানেশদা নিজেই অভিনয় করতেন।

"এরপর চলল একটানা কয়েক বছর গণনাট্য সঙ্ঘের নাট্যপ্রবাহে অবগাহন। বহু জায়গায় অনুষ্ঠান করেছি আমরা। কলকাতার বাঁধানো শীতাতপনিয়ন্ত্রিত মঞ্চ থেকে শুরু করে গ্রামে-গঞ্জে মাঠে ময়দানে বাঁশ পুঁতে মঞ্চ খাড়া করে অবধি। অত কষ্ট সত্ত্বেও তখন একটা জীবন ছিল, যার উত্তাপ-আনন্দ আজ মন খারাপ করে দেয়, সে হারিয়ে গেছে বলে।

"যাই হোক এর মধ্যে আরেকটা মজার ঘটনা ঘটল। আমি তখন অর্থোপেডিক ডিপার্টমেন্টে সিনিয়ার হাউস সার্জেন। হাত ভেঙে ডিপার্টমেন্টে চিকিৎসা নিতে এলেন প্রথিতযশা নাট্যকার শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য। আলাপ হল তার সঙ্গে। এর কয়েক মাস বাদে, আমি তখন হাউস-জব শেষ করে সিভিল ডিফেন্সে কর্মরত। বিধায়কবাবু আহ্বান জানালেন বিশ্বরূপায় তাঁর 'লগ্ন' নাটকে একটি ভাল চরিত্রে অভিনয় করার জন্য। ওখানে গিয়ে আলাপ হল অনেকের সঙ্গে। বিশেষ করে বন্ধুত্ব হল এক জনের সঙ্গে, যার কাছে আমি স্নেহ-ভালবাসা পেয়েছি এবং বহুভাবে ঋণী হয়ে আছি। সে হল তরুণকুমার—আমার 'বুড়োদা'।

"নাটকের মহলা চলল। উদ্বোধনের দিনকয়েক আগে অফিসের নির্দেশ পেলাম—আমাকে সাতদিনের মধ্যে নাগপুরে ট্রেনিং নিতে যেতে হবে, বেশ কয়েক সপ্তাহের জন্য। অনেক চেষ্টা করলাম যাতে বদলিটা কয়েক মাস পেছানো যায়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ ফাইলে চলেন। কাজেই একদিনের চিন্তার পর পদত্যাগ করে একেবারে বেকার হয়ে গেলাম। সরকারি গেজেটেড অফিসার আর থাকা গেল না। তার জন্য কোন দুঃখ অবশ্য আমার সেদিনও ছিল না, আজও নেই।

"মজার কথা, এর সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে আগের ইন্টারভিউ দেওয়া তিনটে চাকুরির নিয়োগপত্র পেয়ে গেলাম ডাকযোগে। তার মধ্যে সব থেকে নিকৃষ্ট চাকুরিটাই

নিলাম—কারণ কলকাতায় থাকা যাবে, থিয়েটার করতে পারব।

"পেশাদার মঞ্চ ও গণনাট্য প্রান্তিক নিয়ে দিন কাটতে লাগলো। মাঝে মাঝে হতাশা আসত। ভাবতাম তাহলে কি সবটাই ভুল। একটা তৈরি কেরিয়ারকে ফেলে অনিশ্চিতকে আঁকড়ে ধরলাম। মনে হত শিল্পী-জীবনটা কোথায় যেন আটকে গেছে, থেমে গেছে। ভাগ্যটা নিতান্তই ঘোলা জলের ডোবা।

"এই সময়ে বুড়োদা আমাকে দিনের পর দিন গঙ্গার ধারে গাড়িতে করে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে প্রেরণা দিয়েছে। তার দাদার মানে উত্তমদার জীবনের লড়াইয়ের কথা বলেছে। বলেছে, নিজের হতাশার দিনগুলো পেরিয়ে আসার কথা। বলেছে—বাংলার জনপ্রিয়তম অভিনেতাকে আমি শৈশব থেকে দেখেছি। আমি বলছি, ভাল অভিনেতা হতে গেলে যা যা গুণ থাকা দরকার, তোর তা সবই আছে।

"মনে জোর পেতাম। আরও জোরে আঁকড়ে ধরতাম আমার বিশ্বাসকে আর মেঘলা দিনের রোদ্দুর, আমার বুড়োদাকে।

"এই ভাবে কাটছিল। হঠাৎ ঘটল অঘটন। আমার পিসী, সবিতা চ্যাটার্জী বম্বে থেকে কলকাতায় এসেছিলেন 'কাঁচ-কাটা-হীরে' বইতে শুটিং করতে। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি এন. টি.-২ স্টুডিওতে। সেখানে দেখা বিখ্যাত পরিচালক মৃণাল সেনের সঙ্গে। গণনাট্য-প্রান্তিকের সূত্রে মৃণালদার সঙ্গে আগেই আলাপ ছিল। আমাকে কি যেন ভাবলেন, তারপর একান্তে ডেকে প্রস্তাব করলেন— আমার পরের ছবি 'আকাশকুসুম।' নায়কের এক বন্ধুর চরিত্র আছে। দারুণ ভাল চরিত্র। ভাবছি আপনাকে নেব। কাল সকালে আসুন না আমার বাড়িতে।

"পরের দিন আমি সিলেক্টেড হলাম। এ ব্যাপারে মৃণালবাবুকে বলেছিলেন আমার অগ্রজপ্রতিম তিনজন শিল্পী—জ্ঞানেশদা, রবিদা (ঘোষ) ও সৌমিত্রদা।

"যথাসময়ে আকাশ কুসুমের শুটিং আরম্ভ হল। প্রথম সেটে কাজ ছিল সৌমিত্রদার সঙ্গে। ওঁর কাছে যে সহযোগিতা পেয়েছি, তার তুলনা হয় না। আপন অনুজের মতই তিনি আমাকে স্নেহের সঙ্গে নানা মূল্যবান উপদেশ দিয়ে অভিনয়ে উত্তরণে সাহায্য করেছেন। তাছাড়া পরিচালক হিসেবে মৃণালবাবুও কিছু অসাধারণ গুণের অধিকারী। তাঁর ব্যবহারে পরিবেশটা এত সহজ হয়ে যায় যে সব শিল্পীরই মনে হয়, সে যেন নিজের বাড়িতে বসে আড্ডা দিচ্ছে। অভিনয় করছে না।

"আকাশ কুসুমের দিন সাতেকের কাজ প্রজেক্শানে দেখে শ্রীঅজয় কর আমাকে 'কাঁচ-কাটা-হীরে' ছবিতে নিলেন।

"শঙ্কুদা, এর পরের ইতিহাস আমার ব্যক্তিগত জীবনযুদ্ধের। তার ভারে আপনাদের ভারাক্রান্ত করতে চাই না। আকাশ কুসুম মুক্তি পেল ১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি। ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ও সাধারণ দর্শক আমাকে সাদরে গ্রহণ করলেন। অনেক ছবির প্রস্তাব এল, কিছু নিলাম। কাজ করতে শুরু করলাম। এক সময় কাজের চাপে ডাক্তারি চাকরিটা ছাড়তে হল। আবিষ্কার করলাম, আমি পুরোপুরি সিনেমার পেশাদার অভিনেতা হয়ে গেছি।" থামল শুভেন্দু।

কিন্তু আমার আরও জানার আছে তার কাছ থেকে। তাই প্রশ্ন করি, "এত দুঃখ-কষ্ট জেনেও তুমি কেন এই ছবির নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করতে সম্মত হলে?"

"বইটা পড়েছিলাম বেশ কয়েক বছর আগেই। একজন নামকরা কলাকুশলী আমাকে বলেছিলেন,—আমরা কয়েকজন টেক্‌নিসিয়ান মিলে ছবিটা করছি। গল্পটা একটু পড়ে রাখবেন। পরে চিত্রনাট্য শোনাব। চিত্রনাট্য আর শোনা হয়ে ওঠেনি, কারণ তাঁদের চেষ্টাটা ফলপ্রসূ হয়নি। কিন্তু এই ফাঁকে আমার বইটা পড়া হয়ে গেল। নতুন জাতের নতুন স্বাদের কাহিনী। নায়কের চরিত্রটা অন্তর্মুখী, সংবেদনশীল। এ ধরনের চরিত্র করতে আমার খুব ভাল লাগে। যেমন 'চৌরঙ্গী'র শংকর। অনেক মানুষের অনেক অনুভূতির পরশ লাগে তার মনে। তারই প্রতিফলন দর্শককে দেখতে হয় প্রায়শ নির্বাক মুখের আয়নায়। কুমারের বেলায় আরেকটা ব্যাপার আছে। অদৃষ্টপূর্বকে দেখবার আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে অনেক দেখা মানুষগুলোকে নতুন ক্যানভাসে নতুন করে দেখবার ও জানবার আগ্রহ তার। এক নিরন্তর 'কেন?'-র মনন থেকে আন্তরিক উপলব্ধির দর্শনে উত্তরণ। অজান্তে কেমন একাত্ম হয়ে গিয়েছিলাম কুমারের সঙ্গে। তারপর হীরেনদা যেদিন চিত্রনাট্য শোনালেন, সেদিন ঠিক করলাম ছবিটা করতেই হবে।" একবার থামে শুভেন্দু। তারপরে আমাকে জিজ্ঞেস করে, "পথের দুঃখ কষ্টের কথা বলছেন? ওটা হীরেনদা মাঝে মাঝেই বাড়িতে গিয়ে শুনিয়ে এসেছেন—অনেক অনেক মাইল হাঁটতে হবে, মাটির দেওয়াল ও মাটির মেঝের চটিতে থাকতে হবে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় পুরো রাস্তাতেই নিরামিষ খেতে হবে। তারও বৈচিত্র্য আলু আর শাকের মধ্যে সীমিত থাকতে পারে। কিন্তু তিনি কিছুতেই দমাতে পারেননি আমাকে। কারণ তখন আমি ঠিকই করে ফেলেছি, ছবিটা আমাকে করতে হবে। কাজেই তার জন্য যা কিছু দরকার সবই করতে হবে। তাছাড়া আমার বিশ্বাস অফিসের রুটিনবাঁধা কলম পেষার কাজ ছাড়া একটু আলাদা কাজ করতে গেলেই, 'দুঃখ কষ্ট আছে' বলে থেমে থাকা চলে না—ফিল্মের কাজে তো নয়ই।"

"এই শুটিং করতে এসে তোমাকে যে দুঃখ-কষ্ট সইতে হচ্ছে, অন্য কোন ছবির আউট-ডোরে গিয়ে তা বোধহয় সইতে হয়নি। তার ওপর আবার অভিনয় করতে করতে ডাক্তারি করতে হচ্ছে। তুমি কি এতে শ্রান্ত বোধ করছ না?"

"না। আউটডোর শুটিং করতে এলে সাধারণত কষ্ট সহ্য করার মনোভাব নিয়েই আসতে হয়। কারণ বড় বড় শহরে ছাড়া কোথাও বাড়ির আরাম পাওয়া দুষ্কর। থাকার জায়গা বা খাওয়ার সামগ্রী যা পাওয়া যায়, তাতেই মানিয়ে নিয়ে কাজ করতে হয়। এখানে কাজটাই মুখ্য বাকি সব গৌণ। সাধারণত ফিল্মের সঙ্গে জড়িত সব শিল্পী ও কলা-কুশলীরাই এটা মন থেকে বিশ্বাস করেন। তার জন্যে কাজ নিয়ে ভুল করেছি ভাবার কোন অবকাশ নেই। এ প্রসঙ্গে একটা কথা উদ্ধৃত করছি। কথাটা আমার অতিপ্রিয় অগ্রজতুল্য অভিনেতা রবি ঘোষের। রবিদা প্রায়ই বলে—'সকাল থেকে খাওয়া আর ঘুমোনো নিয়ে চিন্তা করবে গরু ছাগল ইত্যাদি মনুষ্যেতর প্রাণী। আমরা মানুষ। আমাদের চিন্তাটা কিছু উঁচু পর্যায়ে ব্যয়িত না হলে আমরা মানুষ কিসের?"

"আর আউটডোরে ডাক্তারি করতে গিয়ে আমার পরিশ্রম খানিকটা হচ্ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু মানসিক দিক থেকে আনন্দই পাচ্ছি। এতগুলো অসহায় পাহাড়ী মানুষ দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসছে। যাদের অনেকেরই গায়ে কোন পাশকরা ডাক্তারের হাত পড়েনি, আর আমার সীমিত সাহায্যে কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে 'সালাম ডাগদর সাব' বলে

শ্রদ্ধা জানাচ্ছে। এতে আমি যে পরিমাণ আত্মপ্রসাদ লাভ করছি, তার তুলনায় এইটুকু বাড়তি পরিশ্রম কি? কিছুই না।”

“আচ্ছা শুনেছি এই ছবিতে অভিনয় করার জন্য তোমাকে স্টার থিয়েটারের চাকরি ছেড়ে দিতে হয়েছে? ঘটনাটা একটু বল না।”

“বিগলিত করুণার আউটডোরে আমরা এসেছি ঠিক পুজোর আগে। পুজোটা থিয়েটার পাড়ার পৌষ মাস। মহিষমর্দিনী তখন এঁদের কাছে সাক্ষাৎ ‘রৌপ্যদায়িনী’। তাই ঐ সময়ে বাইরে যাওয়ার ছুটি চাওয়াতে স্টার থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কায় ছুটি মঞ্জুর করতে অসম্মত হলেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে একমত না হতে পেরে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে দিলাম। কারণ তখন তো আমি ঠিকই করে ফেলেছি, এই ছবিটা করতেই হবে।

“আর পাকা চাকরির কথা যদি বলেন তো বলতে হয়, অভিনয়ের জন্য ভারত সরকারের স্থায়ী নথীভুক্ত অফিসারের চাকরিই যখন ছেড়েছি, তখন স্টার থিয়েটার কোন চিন্তার বিষয়ই নয়। আরেকটা কথা কি জানেন শঙ্কুদা, দুকূল ছাপিয়ে উদ্দাম ভাবে ছোটাতেই শিল্পীর আনন্দ, নেশাও বলতে পারেন। অনিশ্চয়তাই তার নিশ্চিত প্রাণস্পন্দন। স্থায়ী চাকরির নিশ্চয়তা এলেই কেমন মরা-মরা লাগে। দু'দিকে নিখুঁত সমান করে কেটে বাঁধিয়ে জাহাজ যাওয়ার মতো বিশাল ও গভীর করা সত্ত্বেও সুয়েজ খাল ‘খালই’ থেকে গেছে, সাগর হয় নি। হিমালয়ের যে কোন নালাও তার তুলনায় অনেক বেশি প্রাণময় নয় কি?”

চোদ্দ

তিনি এলেন না, দুদিন অপেক্ষা করার পরেও না। মাঝখান থেকে দুটি দিন বসে থাকতে হল উত্তরকাশীতে।

বসে থাকা মানে অবশ্য যাত্রী নিবাসে বিশ্রাম করা নয়। সারাদিন ডেপুটি কমিশনারের অফিস আর বাংলো করতে হয়েছে। গতকাল ফোনে চক্রবর্তীদাকে পাওয়া যায়নি বলে কোন কাজ হয়নি। আজ ডি. সি. তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন। সামরিক অফিসার আসেননি শুনে চক্রবর্তীদা বিস্মিত হয়েছেন। তিনি ডি.সি.-কে ক্যামেরা পারমিট দিয়ে দিতে বলেছেন। বলেছেন, একজন পুলিশ অফিসার আমাদের সঙ্গে দিতে। তাঁর রিপোর্টের ভিত্তিতে ডি. সি. এক্সপোজ্‌ড ফিল্ম ছেড়ে দেবেন। আমরা গোমুখী থেকে উত্তরকাশী ফিরে আসার মধ্যে তিনি ডি. সি.-কে প্রয়োজনীয় সরকারি চিঠি পাঠিয়ে দেবেন।

শেষ পর্যন্ত সমস্যাটার সমাধান হল কিন্তু এজন্য আমাদের দুটি মূল্যবান দিন নষ্ট হয়ে গেল। বাসভাড়া ও দুদিনের খাওয়া-খরচ অপব্যয় হল। বাধ্য হয়ে টাকা পাঠাবার জন্য কলকাতায় টেলিগ্রাম করতে হয়েছে। সময়মত টাকা না এলে, ফেরার পথে আবার উত্তরকাশীতে বসে থাকতে হবে।

অথচ এজন্য আমরা দায়ী নই। হিমালয় ফেডারেশান কিংবা ইন্ডিয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশান দায়ী নন। দায়ী সেই কর্তব্যজ্ঞানহীন অফিসার, যিনি কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করলেন। জানি না এজন্য তাঁর কোন শাস্তি হবে কি না?

ক্ষতি আমাদের খুবই হয়েছে তবে লাভের ঘরও শূন্য নয়। লাভও হয়েছে বৈকি। উত্তরকাশীতে দুদিন দেরি করায় দেখা হয়ে গেল ওদের সঙ্গে, যুগল মানা অভিযাত্রীদের সঙ্গে। এই অভিযাত্রী দলটি বৈদ্যনাথ রক্ষিতের নেতৃত্বে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে রওনা হয়েছিল। দলের অন্যান্য সদস্যরা হল—প্রাণেশ চক্রবর্তী, অমিয় মুখোপাধ্যায়, সজল মুখোপাধ্যায়, শান্তি ঘোষ, টি. এস. সুব্রমনিয়ম, অভিমন্যু নিয়োগী ও ডাঃ অমিয়কুমার হাতি। প্রাণেশ ও অমিয় (মুখোপাধ্যায়) শেরপা থুণ্ডু ও ছুঞ্জেকে নিয়ে গত ৮ই অক্টোবর (১৯৭০) মানাপর্বত-১ (২২,২৯০) শিখরে আরোহণ করেছে। কলকাতার মাউন্টেনিয়ার্স ক্লাব এই অভিযানের আয়োজন করে। তারা ১৯৬৬ সালেও সুনীল চৌধুরীর নেতৃত্বে মানাপর্বত আরোহণের চেষ্টা করেছিল, সফলকাম হননি। অসুস্থতার জন্য এবারে সুনীল সঙ্গে আসতে পারেনি!

এবারে ওরা জয়মাল্য নিয়ে এসেছে আমাদের জন্য। তাই কার্তিকদা ওদের আজ রাতে নেমতন্ন করেছিলেন।

আরও একটি সুসংবাদ আছে—প্রাণেশ গোমুখী যাচ্ছে। দেরি হওয়ায় কুন্দন সিং গতকাল চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। একটু দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। অমূল্যর একার পক্ষে গোমুখীর পথে এতগুলি মানুষকে সামলানো কষ্টকর। আর ওপরে অমূল্যর আবার এক হাত ভাঙা। প্রাণেশকে পেয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

অতএব আজ আমাদের বড়ই আনন্দের রাত। সমস্ত চিন্তা-ভাবনার অবসান হয়েছে। দুদিন স্নান করে, ভাল খেয়ে ও অবসর পেয়ে কলাকুশলী ও শিল্পীরা সবাই সতেজ হয়ে উঠেছেন। গানে ও গল্পে নিবাস মুখরিত। তারই মাঝে প্রাণেশ বলতে শুরু করেছে দুর্জয় মানাপর্বত শিখরে জাতীয় পতাকা প্রোথিত করার গৌরবময় কাহিনী। প্রাণেশ বলে চলেছে—

"অভিযানের এক নম্বর শিবির স্থাপিত হয়েছে বিশ হাজার ফুট উঁচুতে। সেদিন অর্থাৎ ৮ই অক্টোবর বেড়িয়েছিলাম দুনম্বর শিবির প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু সেদিনই আমরা মানাপর্বত-১ শিবির আরোহণ করি। সেই কথাই বলছি আপনাদের।

"আমরা মানে অমিয়দা, শেরপা, থুণ্ডু, ছুঞ্জে ও আমি সকাল সাড়ে সাতটার সময় এক নম্বর শিবির থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে কিছু পর্বতারোহণের সাজসরঞ্জাম, খাবার ও একটি তাঁবু। আমরা দুটি দড়িতে এগিয়ে চলেছিলাম। প্রথম দড়িতে অমিয়দা ও থুণ্ডু আর দ্বিতীয় দড়িতে আমি ও ছুঞ্জে।

"কিছুক্ষণ পরেই তুষারপাত শুরু হল। আমরা তারই মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছিলাম। কিন্তু মোটেই তাড়াতাড়ি চলতে পারছিলাম না। কারণ সমস্ত জায়গাটা ছিল নরম তুষারে ঢাকা। প্রতি পদক্ষেপে আমাদের হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছিল।

"মাত্র আধ মাইল লম্বা হিমবাহটি অতিক্রম করতে আমাদের তিন ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হল। বেলা এগারোটা নাগাদ মানা পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হলাম। দুনম্বর শিবিরের স্থান নির্বাচন করে সেখানে মালপত্র নামালাম।

"ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে আমরা শিখরের পথ খোঁজা শুরু করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই পথের হদিস পেলাম। সেখান থেকে মানাপর্বত-১ শিখরটি বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। সে বার বার আমাদের হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকছিল। আমরা তার সে আহ্বান অবহেলা

করতে পারলাম না। এগিয়ে চললাম। ভাবলাম—হাতে প্রচুর সময় আছে। আজই একবার শিখরারোহণের চেষ্টা করে দেখা যাক্ না।

"কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা মানাপর্বতের সংলগ্ন একটি নামহীন শিখরের কাছে পৌঁছলাম। সেখান থেকে মানা-১ শিখরের দুটি পথ। একটি ১৯৬৬ সালের অভিযাত্রীদের পথ। সে পথে শিখরে যেতে হলে, মাঝখানে একটি শিবির স্থাপন করা প্রয়োজন। কাজেই আমরা অন্য পথটি দিয়ে এগিয়ে চললাম।"

"নতুন পথে প্রথম দিকে তেমন কষ্ট হল না। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই নানা সমস্যার সম্মুখীন হলাম—আলগা পাথরের ওপর নরম তুষারের আস্তরণ আর প্রবল বাতাস। আমরা ধাপ কেটে কেটে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলাম। মাঝে মাঝেই তুষারপাত হচ্ছিল। তুষারকণা উড়ে এসে তীরের মতো চোখে-মুখে আঘাত করছিল। যে গিরিশিরাটির ওপর দিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছিলাম, সেটি ক্রমেই সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হচ্ছিল।

"আবহাওয়া বেশ ভালই। চারিদিকে বহুদূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। নীল আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আছে সংখ্যাতীত শৃঙ্গ। তাদের মধ্যে শিবলিঙ্গ (২১,৪৬৬'), ভাগীরথী (২২,৪৯৫'), বাসুকী (২২,২৪৫') সতপন্থ (২৩,২১৩') ও চন্দ্রপর্বত (২২,০৭৩') প্রভৃতি শৃঙ্গগুলি আমার খুবই পরিচিত।

"পায়ের নিচে কঠিন বরফ। বারবার পা পিছলে যাচ্ছিল। তুষার গাঁইতি দিয়ে ধাপ কেটে কেটে অতি সাবধানে এগোতে হচ্ছিল। পিপাসায় কণ্ঠনালি শুকিয়ে আসছে। অক্সিজেনের স্পল্পতাহেতু নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। তবু এগিয়ে চলেছি।

"সহসা অমিয়দা বলল—একটু পশ্চিম দিকে সরে গিয়ে না উঠলে শিখরে আরোহণ করা সম্ভব হবে না।

"তাই করতে হল। প্রবল বাতাস আর হাড়কাঁপানো শীত আমাদের উত্ত্যক্ত করে তুলেছে। বাধ্য হয়ে দাঁড়াতে হয়। কিন্তু কোথায় বসে বিশ্রাম নেব? কোন জায়গা নেই চারপাশে। তাই আবার চলতে হয় এগিয়ে।

"দুপুর দুটো নাগাদ পর্বতগাত্রের শেষ সীমায়, যেটি দূর থেকে একটি শৃঙ্গের মতো দেখাচ্ছিল, আমরা সেখানে পৌঁছলাম। এখান থেকে শিখর মাত্র এক ফার্লং। মুহূর্তে আমাদের সব শ্রান্তি দূর হয়ে গেল। আমরা যেন সারা দেহে মত্তহাতীর বল পেলাম। দুর্বার বেগে মানাপর্বত শিখরের দিকে এগিয়ে চললাম।

"ঘড়িতে তখন বিকেল চারটে। আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হলো—সুনীলদার স্বপ্ন সফল হল। আমরা মানাপর্বত শিখরে আরোহণ করলাম। তার শ্বেত-শুভ্র শিরে ভারতের জাতীয় পতাকা ও মাউন্টেনিয়ার্স ক্লাবের পতাকা প্রতিষ্ঠা করা হল।

"বেশিক্ষণ শিখরে অবস্থান করা যুক্তিযুক্ত মনে হলো না। তাই আমরা চারিদিকের অগণিত পর্বতশৃঙ্গকে প্রণাম করে মানাপর্বত শিখরকে পুজো করলাম। তারপরে ছবি তুলে বিদায় নিলাম শিখর দেবতার কাছ থেকে।

"অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে নামতে শুরু করলাম। বিকেল সাড়ে ছ'টার সময় দু'নম্বর শিবিরের সেই প্রস্তাবিত স্থানে পৌঁছলাম। আর শিবির স্থাপনের প্রয়োজন নেই। তাই সাজ-সরঞ্জাম ও তাঁবুটি আবার পিঠে তুলে নেওয়া গেল। অন্যান্য জিনিসপত্র আর

নেওয়া গেল না। তখন নিজেকে বয়ে নিয়ে যাওয়াই কষ্টকর। শ্রান্ত দেহখানি নিয়ে আমরা কোনমতে এগিয়ে চলি নিচে—এক নম্বর শিবিরে।

"খানিকক্ষণ চলার পর অমিয়দা ও থুগু বলল, তাদের হাতের আঙুলগুলি অসাড় হয়ে আসছে। তাড়াতাড়ি ওদের দস্তানা খুলে ফেলি—চমকে উঠি, তুষারক্ষেতের প্রথমাবস্থা।

"কতক্ষণ চলেছি, খেয়াল নেই। তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। অনুমানে পথ চলেছি। আমাদের সঙ্গে কোন টর্চ ছিল না। হঠাৎ দূরে একটা আলোর রেখা দেখতে পেলাম। আশ্বস্ত হলাম। নিশ্চয়ই নেতা আমাদের দেরি দেখে কাউকে আলো দিয়ে পাঠিয়েছে।

"অবশেষে একসময় চলা শেষ হল। ক্লান্ত ও অবসন্ন দেহে আমরা শিবিরের সামনে পৌঁছলাম। দলনেতা ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল আমাদের—রাত তখন ঠিক সওয়া আটটা।"

থামল প্রাণেশ। আমরাও নির্বাক। একটু বাদে শুভেন্দু কথা বলল। সে অমিয়কে বলে, "দস্তানা খুলুন তো, আঙুলগুলো দেখি একবার।"

"অমিয় ও থুগুর আঙুল পরীক্ষা করে শুভেন্দু স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। বলে, "না, ভয়ের কিছু নেই। কয়েকদিনের মধ্যেই ভাল হয়ে যাবে।"

আমরা আশ্বস্ত হই।

খানিকক্ষণ বাদে প্রাণেশ আবাব বলে, "আচ্ছা শুভেন্দুদা, যমুনোত্রীর পথে কি একদল বাঙালী যাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল আপনাদের?"

"একদল কি বলছ?" শুভেন্দু বলে, "অনেক দল-উপদলের সঙ্গেই তো দেখা হয়েছে।"

"না, যাঁদের সঙ্গে একজন প্রবীণ অসুস্থ যাত্রী ছিলেন, আপনি তাঁকে চিকিৎসা করেছেন?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই যাঁর রক্তশূন্যতার রোগ ছিল?"

"হয়তো হবে।" প্রাণেশ বলে।

"কিন্তু তাঁর সঙ্গে তোদের দেখা হল কেমন করে? তিনি তো উত্তরকাশী থেকে কলকাতায় ফিরে গেছেন!" আমি বিস্মিত।

একটু চুপ করে থেকে প্রাণেশ বলে, "তিনি ফিরে যাননি শঙ্কুদা!"

"তাহলে?" আমরা সমস্বরে বলে উঠি।

প্রাণেশ আবার বলে, "তিনি আর কোনদিন কলকাতায় ফিরে যাবেন না।"

"মানে?"

"তিনি মারা গেছেন।"

"মারা গেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায়?"

"গোমুখীতে।"

"তিনি গোমুখী গিয়েছিলেন?" প্রায় চিৎকার করে উঠি।

শুভেন্দু নির্বাক।

প্রাণেশ উত্তর দেয়, "হ্যাঁ আর সেই পুণ্যতীর্থে পৌঁছেও বোধহয় সন্তুষ্ট হননি। ভদ্রলোক, সহযাত্রীদের দেখাদেখি স্নান করতে গিয়েছিলেন। এক মগ জল মাথায় ঢেলেছিলেন। আর প্রয়োজন হয় নি, সঙ্গে সঙ্গে হার্টফেল করেছেন।"

"পুণ্যাত্মা। এমন মৃত্যু ক'জনের অদৃষ্টে জোটে—পরমতীর্থে এসে চিরমুক্তি।" শিল্পী কার্তিকদা শান্তস্বরে মন্তব্য করেন।

কথাটা মিথ্যে নয়। মরতে তো একদিন হবেই। কিন্তু মনের মতো মৃত্যু ক'জনের অদৃষ্টে জোটে।

নীরব কিছুক্ষণ। তারপর শুভেন্দু বলে, "ভদ্রলোক ভাগ্যবান। সত্যই এমন সুখের মৃত্যু খুব কমই দেখা যায়। তবু ডাক্তার হিসেবে বলব, তাঁর সঙ্গীরা ঠিক করেননি। আমি তাঁদের বার বার বলেছিলাম, ভদ্রলোককে আপনারা আর উঁচুতে নিয়ে যাবেন না।

ভদ্রলোক নাকি তাঁদের কথা শোনেননি, কিছুতেই উত্তরকাশী থেকে কলকাতায় ফিরে যেতে রাজী হননি।" সুজল বলে।

"হয়তো হবে", শুভেন্দু সুজলের কথা বিশ্বাস করে। বলে, "মানুষ নিয়তিকে অস্বীকার করে কেমন করে?" একবার থামে সে। তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, "আপনার সুবিধে হল। সুমনের মৃত্যুটা যে অবাস্তব নয়, তা জোর গলায় জাহির করতে পারবেন সবার কাছে তাই বলে ভাববেন না ভয় পেয়ে আমরা গোমুখী যাত্রা স্থগিত রাখছি। আমরা গোমুখী যাবই। সবাই যাব।"

"নিশ্চয়ই।" তার সতীর্থরা সমস্বরে বলে ওঠে।

আমি ভাবি অন্য কথা। ডাক্তার শুভেন্দু চ্যাটার্জির ভবিষ্যদ্বাণী শেষ পর্যন্ত সত্য হল।

পরদিন। কথা ছিল সকালেই বাস ছাড়া হবে। তাতে কাজের দিক থেকে কোন লাভ হত না। তবে উত্তরকাশীর বন্দীজীবন থেকে সকাল-সকাল মুক্তি পাওয়া যেত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হয়ে উঠল না। ডেপুটি কমিশনার কাল রাতেই আমাদের সঙ্গে একজন পুলিশ অফিসার দেবার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অর্ডার 'ইস্যু' করেছিলেন। কিন্তু রাত বেশি হয়ে যাওয়ায় কাল তাঁরা কোন ব্যবস্থা করে উঠতে পারেননি। আজ সকালে বেশ কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করার পর সেই পুলিশ অফিসারের হদিস পাওয়া গেল। ভদ্রলোকের নাম ভগবান সিং। তার মানে স্বয়ং ভগবান আমাদের সঙ্গে চলেছেন। আমরা নিশ্চিন্ত।

মাল-পত্র বাঁধা-ছাঁদা শেষ করে খেয়ে নিয়ে ভগবানজী যখন বাসে এসে পৌঁছলেন, তখন উত্তরকাশীর ম্রিয়মাণ সূর্য পশ্চিমাচলে ঢলে পড়েছে। বৈদ্যনাথ ও তার সহযাত্রীরা বাসস্ট্যান্ডে এসেছে আমাদের বিদায় জানাতে। প্রাণেশ চলেছে আমাদের সঙ্গে। কিন্তু অমিয়? অমিয় কোথায় গেল?

"পকোড়া ভাজছে।" সুজল জবাব দেয়।

"ঐ হাত নিয়ে পকোড়া ভাজছে? " আমি আঁতকে উঠি।

"হ্যাঁ।" সুজল বলে। "দস্তানা পরে নিয়েছে, ভয়ের কিছু নেই। তাছাড়া ছুঞ্জে সঙ্গে রয়েছে। আপনারা একটু দেরি করুন।"

"কেন?"

"আপনাদের জন্যই যে পকোড়া ভাজা হচ্ছে।"

"আমরা তো একটু আগে ভরপেট ভাত-মাংস খেয়ে নিলাম।"

"তা নিন গে। বাস ছাড়লেই ঝাঁকুনিতে খিদে পেয়ে যাবে। পকোড়া খেতে খেতে এগিয়ে যাবেন আর আমাদের কথা মনে করবেন।" বৈদ্যনাথ বলে।

অতএব ড্রাইভারকে বলতে হয় কথাটা। সে সঙ্গে সঙ্গে সম্মত হয়ে যায়। গরম পকোড়া কে না পছন্দ করে?

কিছুক্ষণের মধ্যেই পকোড়া এসে যায়। নিয়ে আসে ছুঞ্জে ও অমিয়। আমরা মানা-পর্বত অভিযাত্রীদের জয়ধ্বনি করে সানন্দে পকোড়া হাতে তুলে নিই। ওরাও আমাদের জয়ধ্বনি দেয়। ওরা আজ এখানে থাকবে। পর্বতারোহণ শিক্ষায়তনে গিয়ে সাজ-সরঞ্জাম ফেরৎ দেবে। কুলিদের টাকা পয়সা দেবে। ডি. সি.-কে এক্সপোজ্ড ফিল্ম জমা দেবে এবং রাতে ভাল করে ঘুমোবে। বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করতে হয় পর্বতাভিযাত্রীদের।

'গঙ্গামাঈকি জয়' বলে পাইলট গাড়িতে স্টার্ট দেয়। বাস চলতে শুরু করে। অভিযাত্রী বন্ধুরা হাত নেড়ে বিদায় জানায় আমাদের। আমরা এগিয়ে চলি। প্রাণেশ চলেছে আমাদের সঙ্গে—আবার গঙ্গোত্রী ও গোমুখীতে।

উত্তরকাশী থেকে ৩ মাইল এসে গঙ্গোরীতে বাস থামল। এখানেই অসি এসে ভাগীরথীতে মিশেছে। অসির উৎস ডোরিতাল এখান থেকে ১৮ মাইল—একটি পরম রমণীয় স্থান।

যথারীতি দুজন কনস্টেবল বাসে উঠে এলেন। তাঁরা আমাদের ইনার-লাইন ও ক্যামেরা পারমিট পরীক্ষা করার পরে ড্রাইভারকে গাড়ি ছাড়ার অনুমতি দিলেন।

বাস মানেরী ছাড়িয়ে এল। ৪৩৮০ ফুট উঁচু এই জনপদটি বেশ সমৃদ্ধ। এখানে ধর্মশালা ও সিন্ধু-পাঞ্জাব সদাব্রত আছে। সেকালে যাত্রীরা উত্তরকাশী থেকে রওনা হয়ে এই পর্যন্ত হেঁটে আসতেন। এখানে রাত্রিবাস করতেন। বাস-পথে উত্তরকাশী থেকে মানেরীর দূরত্ব সাড়ে দশ মাইল। হাঁটাপথে কিছু কম ছিল।

মানেরী থেকে সাড়ে পাঁচ মাইল এলে মাল্লা। এখান থেকে কেদারনাথ যাবার হাঁটাপথ আছে। যাঁরা পদযাত্রায় উৎসাহী, তাঁরা গোমুখী থেকে এখানে এসে এই পথে কেদারনাথ যেতে পারেন। এখান থেকে ত্রিযুগীনারায়ণ ৬৭ মাইল।*

মাল্লা থেকে ২ মাইল এগিয়ে ভাটোয়ারী—উত্তরকাশী থেকে ১৮ মাইল। উচ্চতা ৫৩০০ ফুট। ভাটোয়ারী উত্তরকাশী জেলার একটি মহকুমা সদর। গঙ্গোত্রী ও গোমুখী এই মহকুমার অন্তর্ভুক্ত। এখানে ডাকবাংলো, বন বিশ্রামগৃহ, ধর্মশালা, স্কুল, ডাকঘর, স্টেট ব্যাঙ্ক ও পশু চিকিৎসালয় প্রভৃতি আছে। ভাটোয়ারীর অপর নাম ভাস্কর-প্রয়াগ। এখানে 'জল' নদী এসে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

আরও ৯ মাইল এসে গাঙ্গনানী। ৭০০০ ফুট উঁচু এই জনপদটি সেকালে পদযাত্রীদের পরমাশ্রয় ছিল। পিলভিতের রাজার সুবিরাট ধর্মশালাটি এখনও কোনমতে দাঁড়িয়ে আছে। ভাগীরথীর ওপারে, মাইল-খানেক দূরে, দুটি উষ্ণকুণ্ড আছে। কেদারনাথ

---

* বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'পঞ্চ-প্রয়াগ' বইখানি দ্রষ্টব্য।

পর্বতাভিযানের সময় ধস নামার জন্য আমাদের মাল্লা থেকে হেঁটে আসতে হয়েছিল এখানে। তখন আমরা কুণ্ডে স্নান করেছি।

গাঙ্গনানী থেকে ৪ মাইল এসে লোহারীনাগ ৭৪০০ ফুট উঁচু। এখানেও একটি ধর্মশালা আছে। লোহারীনাগ ছাড়িয়েই বাস পাহাড়ের ওপর উঠতে আরম্ভ করল। ৩ মাইল চড়াই ভেঙে সুখী পৌঁছলাম। ৮৭০০ ফুট উঁচুতে উঠে এসেছি আমরা।

সুখীর পরে বাস আবার নামতে শুরু করল। হঠাৎ হীরেনবাবু ড্রাইভারকে গাড়ি থামাতে বললেন। ঠিকই করেছেন। এখান থেকে ধরালী উপত্যকার ভাগীরথীকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ ছবি নেবার পরে আবার বাস ছেড়ে দেওয়া হল। সুখী থেকে তিন মাইল নেমে এসে ঝালা। ১৯৬৮ সালেও এই পর্যন্ত বাস আসত। তখন যাত্রীদের এখান থেকেই হাঁটা শুরু করতে হত।

পুল পেরিয়ে বাস ভাগীরথীর বাঁ তীরে এল। আমরা এগিয়ে চললাম হরশিলের দিকে।

আড়াই মাইল এসে হরশিল। ভারি সুন্দর একটি উপত্যকা। অপর নাম গুপ্তপ্রয়াগ বা হরিপ্রয়াগ। এখানে চমৎকার দুটি ডাকবাংলো আছে। আর আছে সরকারি বয়ন-শিল্প কেন্দ্র। এখানে হরিগঙ্গা গঙ্গায় মিশেছে। হরিগঙ্গার তীরে তিব্বতী ও যাযাবর জাডদের গ্রাম।

কিন্তু মূল গ্রাম হল গঙ্গার ওপারে। নাম মুখীমঠ। গঙ্গোত্রীর পাণ্ডাদের বাস। এপার দিয়ে আমাদের বাস এগিয়ে চলল ধরালীর পথে। ধরালী হরশিল থেকে ২ মাইল।

ধরালী এসে বাস থামল। আর থামামাত্র সবাই নেমে পড়লেন। এখানে যে ভাগীরথীর নবরূপ। এতবড় চওড়া নদীখাত হিমালয়ে খুব কমই দেখা যায়। বালি আর কাঁকরে বোঝাই ধবল নদীখাতের ভেতর দিয়ে কয়েকটি ধারায় বিভক্ত হয়ে গঙ্গা বয়ে চলেছে। নদী নয়, যেন অমল ধবল সচল আলপনা।

প্রাণ ভরে দেখে নিলেন সবাই। হীরেনবাবু ও বিশুবাবু কিন্তু কাজ গুছিয়ে নিচ্ছেন—লোকেশান সিলেক্ট করছেন। আগামীকাল এখানেই শুটিং।

কিছু বাড়ি-ঘর আর কয়েকটি দোকান নিয়ে ধরালী। ধর্মশালাটি দাঁড়িয়ে আছে বটে, তবে পরিত্যক্ত। আজকাল কারও বড় একটা থাকতে হয় না এখানে। সবাই গাড়ি চড়ে চলে যান।

ধরালীতে দুধগঙ্গা এসে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সঙ্গমের পাশেই শিবমন্দির। বান্দরপুঁছ পর্বতশ্রেণীকে চমৎকার দেখাচ্ছে। দেখাচ্ছে ভাগীরথীর ওপারে গঙ্গোত্রীর পাণ্ডাদের গ্রাম—মুখীমঠ। মুখীমঠ থেকে ২০,১২০ ফুট উঁচু শ্রীকণ্ঠ শৃঙ্গকে ভারি সুন্দর দেখায়। কয়েক বছর আগে আসানসোলের মাউন্টেন লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন ঐ শৃঙ্গে একটি অভিযান চালিয়েছিলেন। তাঁরা ধরালী থেকেই পদযাত্রা শুরু করেছিলেন।

ধরালী থেকে ৩ মাইল এসে জংলা। বাস পুল পেরিয়ে আবার ভাগীরথীর ডান তীরে এল। বাস চড়াই ভেঙ্গে ওপরে উঠছে। এখান থেকে লঙ্কা মাত্র ৩ মাইল। তার মানে আমাদের বাসযাত্রার যতি আসন্ন।

বিকেল পাঁচটার সময় আমরা লঙ্কা পৌছলাম। উত্তরকাশী থেকে লঙ্কা ৫৫ মাইল।

আসতে প্রায় ঘণ্টাচারেক সময় লাগল। একটা পাহাড়ের উপরিভাগের বৃক্ষাচ্ছাদিত সমতল প্রান্তরে নির্মিত হয়েছে নির্মাণ বিভাগের গুদাম ও কয়েকটি কোয়ার্টার্স, যাত্রী নিবাস ও পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের ছাত্রাবাস। আর বসেছে গুটিতিনেক চা ও খাবারের দোকান। তারই একটি দোকানে চা ও রাতের খাবারের ব্যবস্থা করলেন কার্তিকদা। জায়গাটার উচ্চতা ৯১৫০ ফুট। প্রবল বাতাস বইছে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।

দুবছর আগেও যখন গঙ্গোত্রী এসেছি তখন এর কোন চিহ্ন ছিল না। আমরা নিচের রাস্তা দিয়ে ভৈরবঘাটি চলে গেছি। তখন যে জংলার পুল তৈরি হয়নি। বাস আসতে পারত না এপারে। এখন আমরা ভাগরথীর ডান তীরে অর্থাৎ গঙ্গোত্রীর মন্দির যে তীরে, সেই তীরে এসেছি। উত্তরকাশী ও ভাগীরথীর ডান তীরে। কিন্তু আমরা ঝালার পুল পেরিয়ে ওপারে চলে গিয়েছিলাম। জংলার পুল পেরিয়ে আবার এপারে এসেছি।

এপারে আসার পরেও আমাদের হেঁটে ভৈরবঘাটি যেতে হবে। কারণ লঙ্কা ও ভৈরবঘাটির মাঝখানে রয়েছে জাহ্নবী ও ভাগীরথীর সঙ্গম। ডানদিক থেকে পাহাড় কেটে জাহ্নবী এসে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সেখানে বড় পুল তৈরি করা হচ্ছে। এই পুল তৈরি হবার পরে আর গঙ্গোত্রী যাত্রীদের এক পা-ও হাঁটতে হবে না। ঋষিকেশ থেকে তাঁরা বাসে করেই গঙ্গোত্রী পৌঁছতে পারবেন। আজকের এই জমজমাট লঙ্কা আবার পরিণত হবে পরিত্যক্ত জনপদে।*

লঙ্কার যাত্রী নিবাসটি মাঝারি আকারের। চারিদিকে টিনের বেড়া ও টিনের চাল। সিমেন্ট বাঁধানো মেঝে। পর্বতারোহণ শিক্ষায়তনের ছাত্রাবাসটি আকারে ছোট। তার আবার অনেকটা জুড়ে রয়েছে নানা জিনিস-পত্র। কাজেই সেখানে শুধু ঠাঁই হল শুভেন্দু, বিশুবাবু ও দীপকের। আমরা যাত্রী নিবাসের মেঝেতেই বিছানা বিছিয়ে নিলাম। মেয়েরাও এখানেই থাকবে। মাঝে কোন পার্টিশান নেই বলে, দড়ি টাঙিয়ে চাদর ঝুলিয়ে মেয়ে-মহল বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সবাই গোছ-গাছ সেরে নিলেন। চা খেয়ে নিয়ে আমরা এক জায়গাতে গোল হয়ে বসলাম। হীরেনবাবু আগামীকালের কর্মসূচী বলেন—

কাল সকালে কাজের মানুষদের নিয়ে প্রথম বাসে তিনি নেমে যাবেন ধরালী। সেখানে ভাগীরথীর বেলাভূমিতে গান 'টেক্' করা হবে।

"কার গান?" মধু প্রশ্ন করে।

"তোমার।" হীরেনবাবু উত্তর দেন।

"কি গান?"

"আনন্দধারা বহিছে ভুবনে..."

"গানটা একটু শুনতে পাব কি?" মধু বলে।

"নিশ্চয়ই। এই আলোচনার শেষ হলেই শুভাশিস গান বাজাবে, সে তৈরি হয়ে আছে। তুমি ঠোঁট এবং হাত পায়ের 'মুভমেন্ট' ঠিক করে নাও।"

"থ্যাঙ্ক ইউ হীরেনদা।" মধু কৃতজ্ঞ।

---

* এখন এই পুলের ওপর দিয়ে বাস চলছে, যাত্রীদের আর থামতে হয় না এখানে, তাঁরা বাসে বসে সোজা গঙ্গোত্রী চলে যান।

আমি হীরেনবাবুকে বলি, "তাহলে কালও কি আমরা এখানে থাকছি?"

"কাল ভৈরবঘাটি চলে যেতে পারলে ভাল হয়, কিন্তু তা কি যাওয়া যাবে?"

"কেন যাবে না? সকালের প্রথম বাসে আপনারা ধরালী চলে যাবেন। সেখানেই দোকানে দুপুরের খাওয়া সেরে নেবেন। আমাদের সাতজন কুলি রয়েছে। আরও জন সাতেক কুলি যোগাড় করে আমরা তিনবারে সব মাল ভৈরবঘাটিতে পাঠিয়ে দেব। আপনারা ধরালীর কাজ শেষ করে ছ'টার বাসে ফিরে আসবেন এখানে। চা খেয়ে নিয়ে রওনা হবেন ভৈরবঘাটি, কতক্ষণ আর লাগবে—বড় জোর ঘণ্টাখানেক। আটটার মধ্যে পৌঁছে যাবেন সবাই।"

"তার মানে সেদিন যেভাবে হনুমান চটি পৌঁছেছিলাম, সেইভাবে পৌঁছব তো?" শমিতা সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে।

আমি কিছু বলতে যাবার আগেই শুভেন্দু উত্তর দেয়, 'না ঠিক সেভাবে নয়, সে রাস্তাটার চেয়ে এটা অনেক বেশি চড়াই-উৎরাই।"

হেসে বলি, "দূরত্ব কিন্তু কম—মাত্র দেড় মাইল। আর সেদিনের মতো কাল মোটেই বৃষ্টি হচ্ছে না।"

আমি মধু ও শমিতার দিকে তাকাই। শমিতা নির্বাক! কিন্তু মধু হেসে বলে, "কি দেখছেন অমন করে? আমার কোন আপত্তি নেই। থাকবেই বা কেন? সেদিন আপনাদের সঙ্গে একজন পর্বতারোহী ছিলেন, আগামীকাল আমাদের সঙ্গে দুজন পর্বতারোহী থাকছেন, ভয় পাব কেন? মধু প্রাণেশের দিকে তাকায়।

প্রাণেশ মাথা নিচু করে। এমনিই ওর লাজুক স্বভাব, তার ওপরে এখনও সবার সঙ্গে আলাপ হয় নি ঠিকমত। হীরেনবাবু জিজ্ঞেস করেন, "তাহলে কাল ভৈরবঘাটি চলে যেতে তোমাদের আপত্তি নেই কোন?"

"আপত্তি করে যখন কোন লাভ নেই, তখন কেন অযথা ভদ্রতা করছেন? তার চাইতে গানটা বাজাতে বলুন।" মধু কাজের কথা বলে।

হীরেনবাবু ডাক দেন, "শুভাশিস!"

মুহূর্তে গুঞ্জন থেমে যায়। আর যাত্রী নিবাসের নীরবতা ভেঙে ভেসে ওঠে কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বর—

> 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে,
> দিন রজনী কত অমৃতরস উথলি যায় অনন্ত গগনে।
> পান করে রবি শশী অঞ্জলি ভরিয়া,
> সদা দীপ্ত রহে অক্ষয় জ্যোতি,
> নিত্য পূর্ণ ধরা জীবন কিরণে।"

মনে মনে গান গেয়ে মধু ঠোঁট মেলাচ্ছে গানের সঙ্গে। হাত-পা নাড়ছে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে হীরেনবাবু দেখছেন তাকে।

চাঁদনী রাত। জানলা দিয়ে কয়েকমুঠো জ্যোৎস্না এসে আছাড় খেয়ে পড়েছে যাত্রী নিবাসের ভেতরে। মোমের মৃদু শিখা চাঁদের স্নিগ্ধ আলোকে মোটেই ম্লান করতে পারেনি। আর শোনা যাচ্ছে ভাগীরথীর বিরামহীন কলগান। সেই শাশ্বত সঙ্গীতকে ছাপিয়ে জেগে উঠেছে কবিগুরুর অমরসঙ্গীত—

'বসিয়া আছ কেন আপন-মনে,
স্বার্থনিমগন কী কারণে?
চারি দিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি,
ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি
প্রেম ভরিয়া লহ শূন্য জীবনে।।
আনন্দধারা বহিছে ভুবনে..."

পনেরো

ভৈরবঘাটির ধর্মশালাটি কোনমতে টিকে আছে এখনও। তবে স্থানীয় দু-চারজন বেকার ছাড়া বড় একটা কেউ থাকে না সেখানে। ভৈরবঘাটিতে আজকাল কারও থাকার দরকারও পড়ে না। যাত্রীরা সকালে ঋষিকেশ থেকে রওনা হয়ে বিকেলে উত্তরকাশী পৌঁছান। রাতটা যাত্রী নিবাস কিংবা ধর্মশালায় কাটিয়ে পরদিন সকালের প্রথম বাসে তাঁরা উত্তরকাশী থেকে রওনা হন। দুপুর নাগাদ লঙ্কা পৌঁছান। সেখানে একটু বিশ্রাম করে কিছু খেয়ে নিয়ে দেড়মাইল হেঁটে ভৈরবঘাটিতে চলে আসেন। এখান থেকে বাস কিংবা জীপ ধরে আধ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যান গঙ্গোত্রী। গাড়িতে চড়ার আগে শুধু প্রণাম করেন শিবক্ষেত্র রক্ষক গঙ্গোত্রীর ভৈরবনাথকে। তাঁকে সাধ্যমত প্রণামী দিতেও কার্পণ্য করেন না কেউ।

ফেরার পথে যাত্রীরা সাধারণত সকালেই রওনা হন গঙ্গোত্রী থেকে। তাঁরা সেদিনই সন্ধে নাগাদ পৌঁছে যান উত্তরকাশী। যে-সব যাত্রী সকালে রওনা হতে পারেন না, তাঁরা দুপুরে বাস ধরে গঙ্গোত্রী থেকে এখানে এসে সেদিনই চলে যান লঙ্কা—যাতে পরদিন সকালের বাস ধরতে অসুবিধা না হয়। যাঁরা কোন কারণে ভৈরবঘাটিতে রাত্রিবাস করতে বাধ্য হন, তাঁরাও কেউ ধর্মশালায় থাকেন না। কেনই বা থাকবেন? চমৎকার বন বিশ্রামগৃহ ও নির্মাণ বিভাগের ডাকবাংলো রয়েছে এখানে।

আমরা ডাকবাংলোতে উঠেছি। বেশ আরামে ঘুমিয়েছি। তবে আসার সময় ওঁদের একটু কষ্ট হয়েছে। হবেই তো। ওঁদের যে কাল প্রায় অভুক্ত থাকতে হয়েছে। ঠাণ্ডা পকোড়া ও চা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নি ধরালীতে। সেই খেয়েই মাইল পাঁচেক হেঁটে সারাদিন শুটিং করতে হয়েছে। একদিনে একটি গান 'টেক্' করা নাকি প্রায় অসম্ভব। সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে তুলেছেন হীরেনবাবু। শুভাশিস বলেছে, কলকাতায় স্টুডিওতে বসেও একটি গান 'টেক্' করতে দু-তিন দিন লেগে যায়। আর হিন্দী ছবিতে নাকি দু'তিন মাস। তার কারণটা অবশ্য আলাদা। হিন্দী ছবিতে সাধারণত একটি গান এক জায়গায় 'টেক্' করা হয় না। দেখা যায় হিন্দী ছবির নায়িকা গানের প্রথম দুটি কলি গাইছে নায়কের সঙ্গে কাশ্মীরে ছুটতে-ছুটতে, পরের দুটি কলি গাইছে কন্যাকুমারীকায় দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে, তারপরের দুটি কলি মেরিন ড্রাইভে বসে-বসে। আর শেষ দুটি কলি নেফার অরণ্যে শুয়ে শুয়ে। স্বভাবতই যাতায়াতে বহুদিন লেগে যায়।

কাল হীরেনবাবুরা ছ'টা নাগাদ ফিরে এসেছেন লঙ্কা। চা খেয়েই রওনা হয়েছেন এখানে। দেড় মাইল রাস্তা হলে কি হবে। হাজারখানেক ফুট করে চড়াই ও উৎরাই

ভাঙ্গতে হয়। তার ওপরে অন্ধকার ও সংকীর্ণ পথ। তাহলেও রাত ন'টার আগেই সকলে পৌঁছে গেছেন ডাকবাংলোতে। কার্তিকদা সঙ্গে সঙ্গে গরম কফির মগ তুলে দিয়েছেন হাতে। এগারোটার মধ্যে খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়েছি। আরামেই ঘুমিয়েছি। বেশ ঝরঝরে লাগছে এখন।

ভৈরবঘাটির প্রাকৃতিক দৃশ্য রমণীয়। পাহাড়ের ওপরে অনেকখানি সমতল প্রান্তর। প্রান্তরের চারিদিকে আর পাহাড়ের ঢালে পাইনের সমরোহ। সেই পাইন বনে আর মন্দিরের সামনে শুটিং হল কিছুক্ষণ। মাত্র দুটি দৃশ্য গ্রহণ করা হল। তাতেই দু'ঘণ্টা কেটে গেল। এই শুটিং ব্যাপারটায় বড্ড সময় লাগে। আর তা লাগে আয়োজন করতে। এক কথায় ব্যাপারটা বেশ ঝঞ্ঝাটের।

তাহলেও উপায় নেই, আমরা যে শুটিং করতেই এসেছি।

শুটিং শেষ হবার পরে খেয়ে নিয়ে বাসে ওঠা গেল—ছোট বাস। জন পঁচিশেক যাত্রী বসতে পারে। একখানা জীপও আছে এখানে। সেখানাও নিতে হল আমাদের। আমি চলেছি বাসে।

বাস আগে ছাড়ল। মাত্র মাইল ছ'য়েক পথ। আধঘণ্টার মতো লাগবে। পথ বেশ ভাল। বছর দুয়েক হল তৈরি হয়েছে। আমরা ১৯৬৮ সালেও এই পথ দিয়েই হেঁটে গিয়েছি গঙ্গোত্রী। তখন বাস কিংবা জীপ কিছুই চলত না।

আমার কিন্তু মোটেই ভাল লাগছে না। এমন সুন্দর পথ, অথচ বড্ড তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যাচ্ছে। এরই কোন জায়গায় সেবারে একটা ভাল্লুক প্রাণেশকে লক্ষ্য করে পাথর ছুঁড়ে মেরেছিল। গায়ে লাগেনি কিন্তু বেশ একটা রোমাঞ্চকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন। এবারে আর তেমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে না। আমরা আজ বাসে করে গঙ্গোত্রী যাচ্ছি। গিরিতীর্থ-গঙ্গোত্রী শৈলাবাসে পরিণত হতে চলেছে।

পাহাড়ের গা দিয়ে পথ। পুরনো পায়ে-চলা পথের দু-একফালি এখনও রয়ে গেছে মাঝে মাঝে। আমাদের বাঁয়ে পাহাড়, ডাইনে ভাগীরথী—অনেক নিচে। সে ক্রমেই সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হচ্ছে। আর সেই সঙ্গে গর্জন যাচ্ছে বেড়ে। না, গর্জন নয়, প্রণবধ্বনি—আমরা যে গঙ্গা-যমুনার দেশে এসেছি।

বাস থামল—আমরা গঙ্গোত্রী পৌঁছে গেছি। সামনেই ডাকবাংলোর পথ। তাই বলে নামতে পারলাম না বাস থেকে। চুপ করে বসে থাকতে হল। এই এক অদ্ভুত নিয়ম গাড়োয়াল ও হিমাচলে। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে সংকীর্ণ পথের ওপরই ড্রাইভার আগে গাড়িটি ঘুরিয়ে নেবে। বোধকরি গাড়ি ঘোরাতে গিয়ে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে, তাহলে যাতে যাত্রীরাও তার অংশীদার হয়।

যে দেশের যেমন নিয়ম। না মেনে উপায় কি? পাইলট একবার সামনে ও একবার পেছনে চালিয়ে, সংকীর্ণ পথের ওপরই বাস ঘোরাতে শুরু করে দিয়েছে। আমরা বাসে বসে গঙ্গানাম জপ শুরু করেছি। একটু এদিক-ওদিক হলেই বাস পড়ে যাবে নিচে—উত্তাল ও উদ্দাম ভাগীরথীতে।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য পাইলট নির্বিঘ্নে বাস ঘুরিয়ে ঘোষণা করে, "আভি উৎরাইয়ে।"

নেমে আসি বাস থেকে। কুলিরা মালপত্র নামায়। প্রাণেশ মেয়েদের নিয়ে ডাক-বাংলোয় চলে যায়। আমরা শুভেন্দুদের জন্য অপেক্ষা করব। ওরা জীপে আসছে।

তাছাড়া মন্দিরে গিয়ে মা-গঙ্গাকে দর্শন না করে ডাকবাংলোয় যাব না। কুলিরা মাল ফেরি শুরু করে দিয়েছে। সেতীরাম রয়েছে চিন্তার কিছু নেই।

বাসপথ থেকে একটি পায়ে-চলা পথ নেমে গেছে নিচে। সেই পথের শেষে রয়েছে একটি ছোট পুল। পুলের ওপারে খানিকটা ওপরে উঠলেই সমতল উপত্যকা। পাইন বনের ভেতর দিয়ে প্রশস্ত পথ। মহাদেবের জটা ও দণ্ডীস্বামীর আশ্রম ছাড়িয়ে ডাকবাংলো। একটি নয় দুটি—বন বিশ্রামগৃহ ও নির্মাণ বিভাগের ডাকবাংলো।

ডাকবাংলোর পরে কেদারগঙ্গা। বাঁ দিক থেকে এসে ভাগীরথীর সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। কেদারগঙ্গার তীর দিয়েই কিছুদিন আগে অমূল্য তার অভিযাত্রী দলকে নিয়ে গিয়েছিল যোগীন শৃঙ্গ অভিযানে। আগামী বছর আবার তারা যাবে ঐ পথে।

ডাকবাংলোর নিচে কেদারগঙ্গার পুল। পুল পেরিয়ে ওপারে গেলে মাতাজী (কৃষ্ণা ভারতী) এবং স্বামী কৃষ্ণাশ্রমের আশ্রম। কৃষ্ণাশ্রম দেহরক্ষা করেছেন গত বছর। এই প্রথম গঙ্গোত্রী এসে তাঁকে দর্শন করতে পারলাম না। দুর্ভাগ্য আমাদের।

আরও অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর বাস ওপারে। বলতে গেলে গঙ্গোত্রী উপত্যকার বাঁ তীর সাধুদের দখলে, আর ডান তীর পাণ্ডাদের খাস-মহল।

গঙ্গার দু'তীরেই উপত্যকা—১০,৩০০ ফুট উঁচু গঙ্গোত্রী উপত্যকা। বাসপথ এসেছে ডান তীর দিয়ে। এদিকেই মন্দির, দোকানপাট, ধর্মশালা ও ডাকঘর। অর্থাৎ এদিকটা শহর আর ওদিকটা শহরতলী। মন্দিরের কাছে ভাগীরথীর ওপর রয়েছে আরও একটি পুল। মন্দির থেকে ডাকবাংলোয় যেতে হলে সেই পুল ও কেদারগঙ্গার পুল পেরিয়েই সহজ পথ।

জীপের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ওরাও এসে গেল। পথের দিকে তাকিয়ে থাকি।

কিছুক্ষণের মধ্যে জীপ এসে থামল। শুভেন্দু বলে উঠল, "গঙ্গা মাঈ কি..."

"জয়", আমরা তার সঙ্গে গলা মেলাই।

ওরা নেমে আসার জন্য পা বাড়ায়। ড্রাইভার বাধা দিয়ে বলে, "ঠহড়িয়ে।"

"কেন?"

"আগে গাড়ি ঘুরিয়ে নিই, তারপরে নামবেন।"

শুভেন্দু রাস্তার দিকে তাকায়। সে নিজে গাড়ি চালায়। কাজেই বলে, "আগে আমরা নেমে নিই, তারপরে আপনি গাড়ি ঘুরিয়ে নিন।"

"চুপচাপ বসে থাকুন। আগে গাড়ি ঘুরিয়ে নিই, তারপরে নামবেন।"

"নহী, কভি নহী।" শুভেন্দু গর্জে ওঠে। তাকে সমর্থন করেন বিশুবাবু।

ড্রাইভার ঘাবড়ে যায়। আর সেই ফাঁকে ওরা একে একে লাফিয়ে পড়ে গাড়ি থেকে। এসে আমাদের পাশে দাঁড়ায়। চেয়ে চেয়ে চারদিক দেখে। আর উচ্ছ্বসিত স্বরে বারবার বলতে থাকে—"সত্যিই সুন্দর। এমন সুন্দর জায়গা যে থাকতে পারে কোথাও, তা জানাই ছিল না। আমরা ধন্য, ধন্য আমাদের জীবন।"

খুবই স্বাভাবিক। এখানে এসে সবাই এমনি উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়ে। এমন সুন্দর উপত্যকা যে হিমালয়েও খুব কম আছে। আর ভাগীরথী—সে তুলনাহীনা। এমন নদী আমি কোথাও দেখিনি। কেউ কখনও দেখেছেন বলেও জানা নেই আমার। তাই আমি চুপ করে থাকি। নীরবে ওদের কথা শুনি। শুভেন্দু বলে, "আচ্ছা শঙ্কুদা, এখানে কয়েক

কাঠা জমি পাওয়া যায়?”

“কেন, বল তো?

“একটা ‘হাট’ মানে ছোট একটি কুটির বানাব।”

“কি করবে?”

“সময় পেলেই চলে আসব। কয়েকটা দিন আনন্দে কাটিয়ে যাব।”

ভাবি, তাহলে কি ওকে নেশায় ধরল—হিমালয়ের নেশা। কিন্তু এ যে বড়ই খারাপ নেশা। একবার বাগে পেলে আর সহজে ছাড়ে না।

“কি চুপ করে আছেন কেন?” শুভেন্দু আবার আমাকে বলে।

“জমি পাওয়া যাবে না কেন? একটু তদ্‌বির করতে হবে এই যা।”

“দেবেন একটু ব্যবস্থা করে?” শুভেন্দুর কণ্ঠে অনুরোধ।

কিন্তু আমি কিছু বলতে পারার আগেই একটা প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠি। অমূল্য চেঁচিয়ে ওঠে,“গেল, গেল, পড়ে গেল।”

চেঁচিয়ে উঠি আমরা সকলেই। অমূল্যর পেছনে ছুটে চলি নিচের দিকে।

ঘোরাতে গিয়ে জীপটা পড়ে গেছে নিচে। ভাগ্যিস ওরা জোর করে নেমে এসেছিল। মা-গঙ্গা রক্ষা করেছেন।

কিন্তু ড্রাইভার?

তাড়াতাড়ি ছুটে চলি। এখানে পথটা এঁকেবেঁকে ধাপে ধাপে উঠে এসেছে। ওপরের ধাপ থেকে জীপটা পড়ে গেছে নিচের ধাপে। যদি সেখানে আটকে থাকে তাহলে হয়তো রক্ষা পেয়েছে ড্রাইভার। আর যদি তা না হয়? জীপটা যদি গঙ্গায় গিয়ে পড়ে থাকে?

আর ভাবতে পারছি না। আমরা অমূল্যর সঙ্গে ছুটে চলি নিচে।

বাঁক ফিরতেই দেখতে পাই জীপটাকে। যাক্ বাঁচা গেল, গঙ্গায় পড়েনি।

কিন্তু ড্রাইভার? সে কোথায় গেল?

তাড়াতাড়ি গাড়ির কাছে আসি।

না, আছে। গাড়িতেই পড়ে আছে লোকটি। বেঁচে আছে। যন্ত্রণায় চিৎকার করছে। মাথা ফেটে গেছে, রক্ত ঝরছে। খুবই আঘাত লেগেছে।

ধরাধরি করে লোকটিকে বের করা হল গাড়ি থেকে। খুঁজে খুঁজে ‘ফার্স্ট এইড’ বাক্সটা বার করল শুভেন্দু। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে বাসের ড্রাইভার ও আমাদের কুলিরা তাকে ঘাড়ে করে নিয়ে চলল ধর্মশালায়।

মা-গঙ্গাকে সকৃতজ্ঞ প্রণাম জানিয়ে আমরা তাঁর মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলি। মাকে দর্শন করে ডাকবাংলোয় যাবো। মায়ের কাছে লোকটির আশু আরোগ্য লাভ কামনা করি। বিশ্রামের পরে চা ও জলখাবার খেয়ে আবার আসব মন্দিরে—সন্ধ্যায় মন্দিরের আরতি ও স্তোত্রপাঠের দৃশ্য গ্রহণ করা হবে।

ডাকবাংলোয় এসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম করে ও জলখাবার খেয়ে আবার ফিরে চলেছি মন্দিরে। কেদারগঙ্গার পুল পেরিয়ে সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছি। জীপ দুর্ঘটনার স্মৃতিটা এখনও জেগে রয়েছে সবার মনে। কি ভয়ানক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারত। মা গঙ্গার অসীম করুণা—তাঁকে শতকোটি প্রণাম।

আমি ও হীরেনবাবু পাশাপাশি পথ চলছি। কথায় কথায় হীরেনবাবুকে বলি, "তাহলে আপনার স্বপ্ন সফল হল!"

"হ্যাঁ, আপনাদের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় হতে চলেছে। একবার থামেন তিনি। তারপরে বলেন, "দু' বছর আগে এই স্বপ্ন দেখেছিলাম...কেন জানেন?"

কিন্তু আমি সে প্রশ্নের উত্তর দেবার আগেই হীরেনবাবু আবার বলতে শুরু করেন, "আমি নিজেও নিজেকে বহুবার প্রশ্ন করেছি—'কেন? কেন এত গল্প থাকা সত্ত্বেও আমি এই গল্পটিকে চিত্ররূপ দিতে চাইছি?' মন উত্তর দিয়েছে—তুমি যে হিমালয়কে ভালবাসো। সত্যই তাই—হিমালয়ের প্রতি আমার আকর্ষণ আশৈশব। কিন্তু সে হিমালয় শৈলশহর দার্জিলিং কিংবা নৈনিতাল নয়, সে হিমালয় যুগাতীত কাল থেকে দেবালয়—দেবতাত্মা হিমালয়। বাল্মীকী থেকে বেদব্যাস, কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যাঁর চরণে প্রতিনিয়ত প্রণাম করেছেন। তাই স্বপ্ন দেখেছি, যে হিমালয় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক—যাঁর জনহীন উপত্যকা ও অধিত্যকায় ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য মন্দির, মঠ ও গুম্ফা, সেই হিমালয়ের প্রতি আমার বিনম্র প্রণাম জানাবো চিত্রভাবনার মাধ্যমে। আমি সৌভাগ্যবান, আপনাদের সকলের সাহচর্যে আমার সেই স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। পুণ্যসলিলা গঙ্গা-যমুনার প্রবাহকে অবলম্বন করে আজ আমি এসে দাঁড়িয়েছি নগাধিরাজের চরণতলে।"

ভাগীরথীর পুল পেরিয়ে দোকানপাটের ভেতর দিয়ে উঠে এলাম ধর্মশালার সামনে। আহত ড্রাইভারকে আর একবার পরীক্ষা করল শুভেন্দু। ওষুধ খাওয়াল, পথ্যের ব্যবস্থা করল। তারপরে আমরা নেমে এলাম মন্দির প্রাঙ্গণে—পাথর বাঁধানো প্রাঙ্গণ। এক পাশে পূজারীদের সারি-সারি বাসগৃহ। আর এক পাশে মন্দির। মন্দিরের পাশ দিয়ে সিঁড়ি নেমে গেছে। ভাগীরথীর বেলাভূমিতে—সংকীর্ণা ভাগীরথী। এখানে সে মাত্র ৪৪ ফুট চওড়া ও ৩ ফুট গভীর। কিন্তু সে উত্তাল ও উদ্দাম। সে যে স্বর্গের করুণাবারি নিয়ে দুর্বার বেগে বয়ে চলেছে মর্তলোকে। তাই এখানে তার তীরে রয়েছে—সূর্যকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড ও গৌরীকুণ্ড। মহাদেবের জটার কথা আগেই বলেছি, তারই কাছে রয়েছে ভগীরথশিলা—ভগীরথ সেখানে বসে তপস্যা করেছিলেন।

পাণ্ডা শ্রীধর প্রসাদ এসে নমস্কার করে। তার ভাই কমলেশজী গঙ্গোত্রী মন্দির সমিতির সম্পাদক। তিনি উত্তরকাশী গিয়েছেন। তবে আমাদের যাতে কোন অসুবিধে না হয়, সে ব্যবস্থা করে গেছেন। এঁদের সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য।

আরও একজন নানা পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন—স্বামী সারদানন্দ। সর্বত্যাগী এই সাধকের কথা আমি লিখেছি 'চতুরঙ্গীর অঙ্গনে' বইতে। শুধু বলা দরকার, তিনি একজন উচ্চশিক্ষিত দক্ষিণ ভারতীয় স্নেহপ্রবণ সন্ন্যাসী। আগে দণ্ডীস্বামী আশ্রমের কাছে থাকতেন। এখন মন্দিরের নিচে গঙ্গার বেলাভূমিতে সুন্দর একটি দোতলা কাঠের কুঠিয়ায় বাস করেন।

শান্তিবাবু জেনারেটার চালু করছেন। মন্দিরে, বারান্দায়, উঠোনে ও গর্ভমন্দিরে আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ভাবতে ভাল লাগছে—গঙ্গোত্রীর মন্দিরে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাচ্ছি আমরা। অবশ্য যমুনোত্রীর মতো এ মন্দিরে এই প্রথম বৈদ্যুতিক আলো জ্বালানো হচ্ছে না। কয়েক বছর আগে শ্রী বুদ্ধ বসু ডকুমেন্টারি ছবি তুলতে গঙ্গোত্রী

এসেছিলেন। তিনিও জেনারেটার সঙ্গে এনেছিলেন।

ঐ তো স্বামীজী এসে গিয়েছেন—স্বামী সারদানন্দ। অমূল্য ও প্রাণেশ গিয়েছিল তাঁকে নিয়ে আসতে।

তাড়াতাড়ি কাছে এসে প্রণাম করি। কেবল আমি নয়, আমরা সবাই।

শ্রীধর প্রসাদ একখানা চৌকি ও টেবিল যোগাড় করে দিয়েছে। তারই ওপরে ক্যামেরা বসিয়েছেন বিশুবাবু—মন্দির প্রাঙ্গণে, ঠিক সিঁড়ির সামনে।

দর্শকদের ভিড়ে ভরে গিয়েছে প্রাঙ্গণ—যাত্রী, পাণ্ডা, সেবক, পাচক, দোকানী এমন কি কয়েকজন সাধু পর্যন্ত এসে উপস্থিত হয়েছেন এখানে—এসেছেন শুটিং দেখতে। একসঙ্গে এত লোক বড় একটা দেখা যায় না গঙ্গোত্রীর মন্দিরে। গঙ্গোত্রী আজ উৎসবমুখর—তাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলবার মহোৎসব।

স্বামীজী কিন্তু বিশুবাবু, দীপক ও কানাইয়ের সঙ্গেই বেশি কথা বলছেন। বোধ হয় কিছু পরামর্শ দিচ্ছেন ক্যামেরাম্যানদের। তাঁর সে অধিকার রয়েছে। তিনি একজন সুদক্ষ ফটোগ্রাফার।

ভাগীরথী পর্বতের শুভ্র শিখর থেকে সূর্যের শেষ রশ্মিটুকু গেল মিলিয়ে। সন্ধ্যা নেমে এল গঙ্গোত্রী উপত্যকায়—তার মন্দিরে ও আশ্রমে, ধর্মশালা ও ডাকবাংলোর চারপাশের পাহাড়ে আর ভাগীরথীর বুকে। কিন্তু গঙ্গোত্রীর মন্দির আজ আঁধারের পরশ পেল না। আমরা যে আজ আলো জ্বালিয়েছি মায়ের মন্দিরে।

বেজে উঠল মন্দিরের ঘণ্টা, শুরু হল সন্ধ্যারতি—শুরু হল শুটিং।

কুমার, সুমন, সাবিত্রী একে একে উঠে এল সিঁড়ি বেয়ে। তারা দেবী সুরেশ্বরীকে প্রণাম করল। গর্ভমন্দিরের দ্বারে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে আরতি দেখতে থাকল। পূজারীর সহকারী তাদের আশীর্বাদ, চরণামৃত ও প্রসাদ দান করলেন। তারা ভক্তিভরে সে দান গ্রহণ করল।

আরতির পরে আরম্ভ হল স্তোত্রপাঠ। রঙিন পোশাক পরে পূজারী সেবক ও ভক্তবৃন্দ আবেগকম্পিত কণ্ঠে জননী-জাহ্নবীর করুণা কামনা করছেন। সুমন, সাবিত্রী ও কুমার পরম শ্রদ্ধায় শ্রবণ করছে সেই স্বর্গীয় সঙ্গীত।

শুনছি আমিও। আরও বহুবার শুনেছি। বড় ভাল লাগে শুনতে। ভাষা বুঝি না, তবু এক অনির্বচনীয় আনন্দে মন ভরে ওঠে। মনে হয় এমন গান আর কোনদিন শুনিনি।

কিন্তু আজ আর তেমনটি মনে হচ্ছে না। আজ আমরা শুটিং করতে এসেছি। শুভেন্দু, মধু ও শমিতা অভিনয় করছে। সেই অভিনয়ের চিত্রগ্রহণ করছেন বিশুবাবু। তাঁকে সাহায্য করছে পাণ্ডে, শুভাশিস, বাহাদুর, কানাই, কেষ্ট ও দিলীপ। তারা ক্ল্যাপস্টিক দিয়েছে, কেউ শব্দগ্রহণ করছে, কেউ আলো কিংবা রিফ্লেক্‌টার ধরে আছে। ওরা কেউ স্তোত্র পাঠ শুনছে না, সবাই কাজ করছে।

কিন্তু দিলীপ রিফ্লেক্‌টারটা নামিয়ে রেখেছে কেন? মধুর মুখে যে একদম আলো পড়ছে না! আর সে কেনই বা মন্দিরের দিকে রয়েছে তাকিয়ে?

ক্যামেরা চলছে এখন তার কাছে যাওয়া সম্ভব নয়, চেঁচিয়ে কথা বলারও উপায় নেই। অথচ দিলীপ একবারও তাকাচ্ছে না। অনেক চেষ্টা করেও হীরেনবাবু তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারছেন না।

শুটিং শেষ হল। হীরেনবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "দিলীপ!"

দিলীপ নির্বাক।

এবারে বিশুবাবু ডাকেন, "এই যে সহকারী পরিচালক শ্রীদিলীপ মিত্র..."

"আজ্ঞে" সাড়া দিয়েছে দিলীপ। কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে, সে যেন এইমাত্র সম্বিত ফিরে পেল।

"একবার দয়া করে এদিকে আসবেন।" বিশুবাবু আবার বলেন।

মন্দিরের মেঝে থেকে রিফ্লেক্টারটা তুলে নিয়ে বাহাদুরের হাতে দেয় দিলীপ। তারপরে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসে। বলে, "কি বলছেন বিশুদা?"

"মধুর মুখে আলো ফেলো নি কেন?"

"আজ্ঞে ভুলে গিয়েছিলাম।" অপরাধীর কণ্ঠে উত্তর দেয় দিলীপ।

"রিফ্লেক্টার হাতে নিয়ে আলো ফেলতে ভুলে গিয়েছিলে!"

"আজ্ঞে না, মানে আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম! সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন—আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমরা পুজো দিতে আসি নি, শুটিং করতে এসেছি।"

ষোল

আজ ২০শে অক্টোবর। অর্থাৎ অক্টোবর মাস শেষ হয়ে এল। গঙ্গোত্রী প্রায় সাড়ে দশ হাজার ফুট উঁচু। ভোরের দিকে বেশ শীত। স্বভাবতই শিল্পী ও কলাকুশলীরা শীতে কাতর। সকালে তাঁদের বিছানা ছাড়তে ইচ্ছে করে না। কিন্তু হীরেনবাবু সে-সব কথা শুনতে রাজী নন। সকাল আটটার মধ্যে মেক্-আপ সেরে লোকেশানে পৌঁছবার ঢালাও হুকুম দিয়েছেন। আর নিজে ক্যামেরা ডিভিশান নিয়ে চলে গেছেন সেখানে।

লোকেশান অবশ্য খুবই কাছে—মহাদেবের জটার সামনে। মন্দিরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গা এখানে এসে ছোট একটি জলপ্রপাত সৃষ্টি করেছে—অবতরণ করেছে ভগীরথ শিলার ওপরে। সেখান থেকে একখানি সুবিশাল রঙিন পাথরে—মহাদেবের মণিময় মস্তকে। গঙ্গা শত ধারায় বিভক্ত হয়ে সেই মস্তক পেরিয়ে আবার পরিণত হয়েছে একধারায়। প্রবেশ করেছে একটি প্রস্তর-গহ্বরে। না, গহ্বর বলা ঠিক হবে না। পাথর বাঁধানো সংকীর্ণ নদীখাত বলাই উচিত। কারা যেন একখানি সুদীর্ঘ নিরেট পাথরকে খুদে খুদে তৈরি করেছে এই নদীখাত। আর সেই নদীখাতকেই কল্পনা করা হয়েছে মহাদেবের জটা—মোটেই কষ্ট-কল্পনা নয়।

যথাসময়ে শব্দযন্ত্রী ও শিল্পীরা লোকেশানে পৌঁছলেন। আমরাও তাঁদের পেছনে উপস্থিত হলাম সেখানে। এসেছেন আরও অনেকে—মন্দিরের মানুষ, ধর্মশালার মানুষ আর কুঠিয়ার মানুষ। এসেছেন দণ্ডীস্বামী, তাঁকে প্রণাম করি।

বিশুবাবু প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। একবার মহলার পরেই শুরু হল শুটিং। দৃশ্যটা হল—সুমন, সাবিত্রী ও কুমার গঙ্গোত্রী পৌঁছে গেছে। তারা গঙ্গার তীর দিয়ে মন্দিরের দিকে এগিয়ে চলেছে। সুমন ও সাবিত্রী চলেছে আগে আগে—গল্প করতে করতে। কুমার আসছে একটু পেছনে নিঃশব্দে চারিদিক দেখতে দেখতে। তার মনে সেই আত্মজিজ্ঞাসা—কি পেলাম এই দুর্গম পথের প্রান্তে? আমার প্রশ্নর উত্তর পেলাম কি?

একজন অতিবৃদ্ধা মন্দিরে চলেছেন। তিনি দেহের ভারে নুয়ে পড়েছেন, তাঁর পথ চলতে কষ্ট হচ্ছে তবু তিনি কুমারকে দেখে বলে ওঠেন—গঙ্গা মাঈকি জয়!

—জয়। অন্যমনস্ক কুমার তাড়াতাড়ি সাড়া দেয়।

বৃদ্ধা ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

কুমার ভাবে—এই যে অক্ষম ও অশক্ত বৃদ্ধা ধুঁকতে ধুঁকতে পথ চলেছেন, তিনি কি পেতে এসেছেন এই দুর্গম তীর্থে? আয়ু? অর্থ? স্বর্গে যাবার ছাড়পত্র?

মহাদেবের জটার সামনে এসেই থম্‌কে দাঁড়ায় সুমন ও সাবিত্রী। বিস্ময়ে ও আনন্দে হতবাক হয়ে যায়। অপলক নয়নে তাকিয়ে থাকে সেই ভয়ঙ্কর সুন্দরের দিকে।

কেটে যায় কিছুক্ষণ। তারপরেই সুমনের মনে পড়ে কুমারের কথা। সে পেছন ফিরে তাকায়। কুমার তখনও বেশ খানিকটা পেছনে। সুমন ছুটে যায় কুমারের কাছে। তার একখানি হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসে মহাদেবের জটার সামনে। বলে—ঐ দেখুন, মহাদেবের জটা, তার মাঝখান দিয়ে পথ করে নিয়েছেন মা-গঙ্গা। আর ঐ, ঐ যে ভগীরথ শিলা...

কুমার তাকায় সেই ভয়ঙ্কর ও সুন্দর দৃশ্যের দিকে। জিজ্ঞাসাটা যেন আরও প্রবল হয়ে দেখা দেয় তার মনে—কে তৈরি করল এই সব? কে, কে, কে?

সে দূরের পর্বতশৃঙ্গের দিকে তাকায়, কাছের মন্দির চূড়ার দিকে তাকায়, পাশের সুমনের দিকে তাকায়। তার অবিশ্বাসী মন বার বার হোঁচট খায়, কিন্তু উত্তর দিতে পারে না। সে ভাবে—কেন আমি ওদের মতো ভক্তের দৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি না—আমি, আমি, আমি...

সহসা তার কানে আসে—

'মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকাল-মাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে, ভ্রমি বিস্ময়ে।।
তুমি আছ বিশ্বনাথ, অসীম রহস্য মাঝে,
নীরবে একাকী আপন মহিমানিলয়ে।।'

পেছনে ফেরে কুমার। দেখে যমুনা চটিতে যে বাঙালী সন্ন্যাসী রাজা রোহিতের কাহিনী বলেছিলেন, তিনি গাইতে গাইতে এদিকে আসছেন। গাইছেন—

'অনন্ত এ দেশকালে, অগণ্য এ দীপ্ত লোকে,
তুমি আছ মোরে চাহি—আমি চাহি তোমা-পানে।
স্তব্ধ সর্ব কোলাহল, শান্তিমগ্ন চরাচর—
এক তুমি, তোমা-মাঝে আমি একা নির্ভয়ে।।'

পরবর্তী লোকেশান গঙ্গোত্রীর ধর্মশালা। সাবিত্রী ও দাদার সঙ্গে সুমন আজ যাচ্ছে ঘরে আর কুমার রওনা হচ্ছে গোমুখী। সাবিত্রীদের রওনা হতে এখনও দেরি আছে কিন্তু কুমার রওনা হচ্ছে এখুনি। মালবাহক ও পথপ্রদর্শক মুরলিধর তার সঙ্গে যাচ্ছে।

মুরলিধরের চরিত্রে অভিনয় করছে অমূল্য—নীলগিরি, পঞ্চচুলি, চন্দ্রপর্বত, কেদারনাথ ডোম ও রাধানাথ পর্বতবিজয়ী অমূল্য সেন। আর কোন ভারতীয় পর্বতারোহী এ পর্যন্ত কোন কাহিনীচিত্রে অভিনয় করেছেন বলে জানা নেই আমার। এদিক থেকেও অমূল্য পথিকৃৎ হয়ে রইল।

মুরলিধরের সঙ্গে কুমার এখনই রওনা হচ্ছে গোমুখী, তাই সে সাবিত্রী ও দাদার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুমনের কাছে বিদায় চাইতে এল। সুমন বাইরের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। কুমার তার পাশে এসে দাঁড়ায়। সুমন নির্বাক। একবার দ্বিধা করে কুমার। তারপরে বলে—আমি এবার তাহলে আসি সুমন!

সুমন কুমারের দিকে তাকায়। দুজনে চোখা-চোখি হয়। চোখ নামিয়ে নিয়ে সুমন স্বাভাবিক স্বরে জিজ্ঞেস করে—আপনার জিনিসপত্র সব গোছানো হয়ে গেছে?

—হ্যাঁ।

—আমার জামা-কাপড়ের পুঁটলিটাও আপনার সঙ্গে নিয়ে নিন।

—মানে! কুমার বিস্মিত।

সুমন অকম্পিত স্বরে বলে—মানে, আমি আপনার সঙ্গে গোমুখী যাচ্ছি।

—সুমন! সাবিত্রী চিৎকার করে ওঠে ঘরের অপর প্রান্ত থেকে। সে ছুটে এসে সুমনের সামনে দাঁড়ায়।

কিন্তু সুমন সাবিত্রীর ডাকে সাড়া না দিয়ে কুমারকেই বলে—হ্যাঁ, কাল সারারাত ভেবে আমি মনস্থির করে ফেলেছি, আপনাকে এভাবে ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি কিছুতেই একা ঘরে ফিরে যেতে পারব না।

—কিন্তু এ যে ভয়ঙ্কর কঠিন পথ সুমন! যে কোন মুহূর্তে জীবনসংশয় হতে পারে। আমি তোমাকে এতবড় বিপদের মুখে নিয়ে যাব কোন্ অধিকারে?

—অধিকার? সুমন যেন জ্বলে ওঠে। কিন্তু তা সাময়িক। তারপরেই স্বাভাবিক স্বরে প্রশ্ন করে—আমার কাছে সব কিছু দাবি করার অধিকার যে কেবল তোমারই থাকতে পারে, এটুকু বোঝার বুদ্ধিও কি তোমার নেই?

আজ সকাল পাঁচটায় বেড-টি এল। অর্থাৎ এখুনি বিছানা ছাড়তে হবে। মেক্-আপ করতে বসতে হবে। আর আশ্চর্য মানুষ এই মেক্-আপম্যান গোস্বামীদা! সকালের হাড় কাঁপানো শীতের কথা মনে রেখেও প্রতি রাতে শোবার আগে হীরেনবাবুকে জিজ্ঞেস করবেন,—কাল ক'টার মধ্যে আর্টিস্টদের রেডি করতে হবে?

—আটটা। হীরেনবাবু উত্তর দেবেন।

সঙ্গে সঙ্গে গোস্বামীদা শুভেন্দুর দিকে তাকিয়ে বললেন—কাল ছ'টায় মেক্-আপ-এ বসছি।

বেচারা শুভেন্দু! তাকে বলতে হবে—ঠিক আছে।

অতএব বেড-টি খেয়েই বিছানা ছাড়তে হবে। দাঁত মাজার সরঞ্জাম নিয়ে যেতে হবে কেদারগঙ্গার তীরে। প্রাতঃকৃত্য সেরে এসেই বসতে হবে মেক্-আপ করতে। আজ কিন্তু গঙ্গোত্রীতে কোন শুটিং নেই। গতকাল গঙ্গোত্রীর শুটিং শেষ হয়ে গেছে। আজ ওরা গোমুখীর পথে চিরবাসায় রওনা হচ্ছে। আজকের শুটিং পথে পথে—দুর্গম গোমুখীর পথে।

সুজি ও রুটি দিয়ে ব্রেক্-ফাস্ট সেরে প্রায় ন'টা নাগাদ বেরিয়ে পড়ল শিল্পী ও কলাকুশলীরা। এঁরা কেউ আর কখনও গোমুখী যাননি। অমূল্য, প্রাণেশ ও শ্রীধর প্রসাদ সঙ্গে যাচ্ছে। ওদের অনেক দায়িত্ব। তবে ভরসা করি তারা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে সে দায়িত্ব

পালন করবে।

আগেই বলেছি, অমূল্য আজ মাউন্টেনিয়ার নয়, অভিনেতা। কাজেই তাকেও মেক্-আপ নিতে হয়েছে, কষ্টিউম্ পরতে হয়েছে—গাড়োয়ালী গাইডের কষ্টিউম্। নব বেশে বেশ মানিয়েছে অমূল্যকে।

ডাকবাংলো থেকে বেরিয়ে কেদারগঙ্গা ও ভাগীরথীর পুল পেরিয়ে বাজারে আসা গেল। প্রয়োজনীয় কিছুই পাওয়া গেল না। অথচ ভাঁড়ার প্রায় শূন্য। সামান্য কিছু চাল, আটা, ডাল, নুন ও মসলা ছাড়া সবই ফুরিয়ে গেছে। কয়েক কিলোগ্রাম আলু রয়েছে বটে, কিন্তু তা মুখে দেবার উপায় নেই। সেদিন লঙ্কা থেকে ভৈরবঘাটি আসার পথে একজন কুলি আলুর বস্তার ওপরে কেরোসিন তেল ফেলে দিয়েছিল।

এমনটি যে হবে আশা করিনি কিন্তু। গঙ্গোত্রী এখন বেশ জনপ্রিয় জায়গা। অনেকগুলি দোকান হয়েছে এখানে। জিনিসপত্র আনাও কিছু কঠিন নয়। তবে এখন যাত্রা প্রায় শেষ—শীত এসে গেল! দোকানীরা নতুন করে আর মালপত্র আনছেন না। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁরা দোকান গুটিয়ে নেমে যাবেন নিচে। বিক্রি না হলে, আবার সেই মাল ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

কিন্তু কার্তিকদা যে বিপদে পড়লেন। গঙ্গোত্রীতে জিনিসপত্র পাওয়া যাবে জেনে তিনি উত্তরকাশী থেকে কম কম জিনিসপত্র এনেছিলেন। এখন উপায়?

"যা আছে, তা দিয়েই চালিয়ে দেবেন। এখন চলুন, মন্দির দর্শন করে মা গঙ্গার জয়ধ্বনি দিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক্।" হীরেনবাবু কার্তিকদাকে দুশ্চিন্তামুক্ত করতে চান।

তাই করা হল। মন্দির দর্শনের পরে যাত্রা হল শুরু—গিরিতীর্থ গোমুখীর যাত্রা। মন্দিরের ডান দিকে পাহাড়। সেই পাহাড়ের গা দিয়ে পথ—পায়ে-চলা পথ। ডাণ্ডি চলতে পারে না এপথে। তাই সুমনকেও আজ যেতে হচ্ছে হেঁটে।

বইয়ের সুমন স্ল্যাক্স পরে নিয়েছিল, সিনেমার সুমন শাড়ি পরেই পথ চলেছে। অর্থাৎ হিরোইন্‌কে 'টাইট ফিটিং কস্টিউম্' পরিয়ে বক্স অফিসে ভিড় বাড়াবার শেষ সুযোগটিও হীরেনবাবু হাতছাড়া করলেন। না, ভদ্রলোক দেখছি একেবারে ব্যবসা বোঝেন না!

অমূল্য ও প্রাণেশ ছাড়া ওঁরা সকলেই এপথে নতুন। শুধু তাই নয়, এমন পথ ওঁরা কেউ এর আগে চোখে দেখেননি। পাহাড়ের গা দিয়ে প্রায় খাড়া উঠে গেছে ওপরে। অমূল্যর পেছনে সেই পথরেখা বেয়ে শিল্পী ও কলাকুশলীরা ওপরে উঠছেন। প্রাণেশ রয়েছে সবার পেছনে। হিমালয়ের দুর্গম পথে তাই নিয়ম। দলের অভিজ্ঞ সদস্যরা থাকে সামনে ও পেছনে।

বাঁয়ে পাহাড়, ডাইনে খাদ। অনেক নিচে গঙ্গা। কখনও কাছে আসছে, কখনও দূরে চলে যাচ্ছে। তবে তার বিরামহীন কলগান সর্বদা কানে আসছে। বছর কয়েক হল, গোমুখী যাবার এই পথটি তৈরি হয়েছে। দূরত্ব গঙ্গোত্রী থেকে ১২ মাইল। আগে গোমুখ যাবার পথ ছিল ওপার অর্থাৎ গঙ্গার বাঁ তীর দিয়ে। পথ বলে অবশ্য তখন কিছুই ছিল না। গঙ্গার শব্দকে লক্ষ্য করে পাথর আর মাটির পাহাড়ের ওপর দিয়ে এগিয়ে যেতে হত। তখন গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখীর দূরত্ব ছিল ১৮ মাইল। সে পথের তুলনায় ডান তীরের এই নবনির্মিত পথকে নিঃসন্দেহে রাজপথ বলা যেতে পারে।

মাঝে মাঝে ছোট ছোট ধস নেমেছে। অমূল্য আইস-একস দিয়ে পথ তৈরি করে দিচ্ছে। শ্রীধর প্রসাদ ও সেতীরাম সাহায্য করছে তাকে।

শিল্পী ও কলাকুশলীরা ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এতদিনের অনিয়ম, খাদ্যাভাব ও অত্যধিক পরিশ্রমে প্রায় প্রত্যেকেরই শরীর ভেঙে গেছে। আজকের পথ দুর্গম—অন্তত ওদের কাছে তাই মনে হচ্ছে। তাছাড়া উচ্চতার প্রভাবটা পড়েছে শরীরে। দশ হাজার ফুটের ওপরে পথ চলা সবার কাছেই কষ্টকর।

কিন্তু নির্দয় পরিচালক এসব কথা শুনতে প্রস্তুত নন। সুতরাং শুটিং। পাসিং শট—মানে সুমন ও কুমারকে নিয়ে মুরলীধর গোমুখী চলেছে। কখনও সামনে ক্যামেরা বসিয়ে, কখনও পেছন থেকে ছবি নিচ্ছেন বিশুবাবু। রোগা লিকলিকে দুর্বল মানুষটি। পথ চলতে খুবই কষ্ট হচ্ছে কিন্তু নিজের কাজ করতে কখনও পেছপাও হচ্ছেন না।

সবচেয়ে বিস্ময়কর কিন্তু গোস্বামীদা। ক'দিন থেকেই তিনি আর জুতো পরতে পারছেন না—পায়ে ফোস্কা পড়েছে। তাই আজ খালি মোজা পরেই পথে বেরিয়েছেন এবং চলেছেন সতীর্থদের সবার আগে—ঠিক অমূল্যর পেছনে।

পায়ে ব্যথা বলে কার্তিকদাও এ ক'দিন 'শু' জুতো পরেননি, চপ্পল পরেই গঙ্গোত্রী এসেছেন। কিন্তু আজ প্রাণেশের পরামর্শে হান্টার-শু পরতে হয়েছে তাকে। আর তাই তিনি ধীরে ধীরে পথ চলতে বাধ্য হচ্ছেন।

হীরেনবাবু বেশ তাড়াতাড়ি পথ চলেছেন। চলতে চলতে লোকেশান সিলেক্ট করছেন। শুটিং শেষ হবার পরে আবার এগিয়ে যাচ্ছেন।

আরও একজন ভাল হাঁটছেন—জয়েন্ট প্রোডাকশান ম্যানেজার শান্তি চৌধুরী। সবার খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পরে, কিচেন পাঠিয়ে দিয়ে তিনি রওনা হয়েছেন। অনেকক্ষণ আগেই ধরে ফেলেছেন সহযাত্রীদের।

একটা বড় ধসের সামনে এসে থামতে হল বাঁ দিকে একটি বাঁকের মুখে পাশের মাটির পাহাড় থেকে ধস নেমেছে—পথ নিশ্চিহ্ন। পাহাড়টার খানিকটা অংশ ঝুলে রয়েছে, যে কোন সময় ভেঙে পড়তে পারে, এবং পড়লে নির্ঘাৎ মৃত্যু।

সেই মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়েই বেশ কিছুক্ষণ ধরে শুটিং করতে হল শুভেন্দুকে। ভারতের আর কোন চিত্রাভিনেতাকে কখনও এমন শুটিং করতে হয়েছে বলে জানা নেই আমার।

শুটিং শেষ হবার পরে হীরেনবাবু ঘোষণা করলেন—পথে আর কোন শুটিং নেই। বেলা দুটো বেজে গেছে। চিরবাসা এখনও ৩ মাইল। আর দেরি করা ঠিক হবে না। আমি অমূল্যর সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছি। তোমরা আস্তে আস্তে এসো, প্রাণেশ ও সেতীরাম তোমাদের সঙ্গে রইল। তোমাদের জন্য পথে চা-বিস্কুট পাঠিয়ে দেব। অমূল্যকে নিয়ে জোর কদমে এগিয়ে চললেন পরিচালক।

চিরবাসা—গঙ্গোত্রী থেকে ৭ মাইল। চিরবনে ছাওয়া সংকীর্ণ কিন্তু নয়নাভিরাম একটি উপত্যকা। দুটি কামরাযুক্ত বন বিশ্রামগৃহ আর ভাগীরথীর বেলাভূমিতে একফালি সমতল প্রান্তর নিয়ে চিরবাসা। একটি অনিন্দ্যসুন্দর ঝরনা পেরিয়ে পৌঁছতে হয় চিরবাসা। ঝরনার বনময় তীরভূমি চড়ুইভাতির আদর্শ স্থান। তাই সেদিন যমুনোত্রী যাবার পথে সমতল বনভূমি দেখে চিরবাসার কথা মনে হয়েছিল আমার।

বিকেল চারটে নাগাদ শেষ দলটি এসে পৌঁছলেন বন-বিশ্রামগৃহে। তার মানে সাতমাইল পথ আসতে সাত ঘণ্টা লেগেছে। কিন্তু তার ঘণ্টা দুয়েক গেছে শুটিং করতে। সুতরাং ওঁরা ভালই হেঁটেছেন।

দণ্ডীস্বামীর কাছ থেকে 'প্রেসার কুকার' নিয়ে এসেছেন হীরেনবাবু। উচ্চ হিমালয়ে প্রেসার-কুকার ছাড়া ডাল সিদ্ধ হয় না। ডাল ভাত রান্না হয়েছে।

সময়টা অবশ্য ডাল-ভাত খাবার নয়—সাড়ে ছ'টা বাজে। কিন্তু সারাদিন খাওয়া হয়নি। প্রত্যেককেই প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে পৌঁছতে হয়েছে। তার ওপর চিরবাসার উচ্চতা প্রায় বারো হাজার ফুট। গরম-গরম ডাল ভাত ভালই লাগছে।

খাওয়া-দাওয়ার পরে ঠিক হল ঘরে থাকবে শিল্পী ও ক্যামেরা ডিভিশান। বাকি সকলে বাইরে শোবে। 'মেস-টেন্ট' টাঙানো হল। তাঁবু দেখে শুভেন্দু ও দীপক বলল, "আমরাও বাইরে শোব।"

"না।" হীরেনবাবু আপত্তি করেন। "তোমরা ঘরে শোবে। ঠাণ্ডা লেগে গেলে সব পণ্ড হয়ে যাবে।"

"তাছাড়া", প্রাণেশ বলে, "এখানে ভীষণ ভাল্লুক আছে। আপনারা শঙ্কুদার সেই 'ভূত ও ভালুক' গল্পটা পড়েননি?"

"না।" দীপক বলে, "সে গল্পে বুঝি আছে যে ভাল্লুক চেনা-মানুষকে কিছু বলে না।"

"না, মানে ঠিক তা নয়—" প্রাণেশ অসুবিধায় পড়ে।

"তাহলে ভাল্লুকের ভয় দেখাচ্ছিস কেন?" শুভেন্দু জিজ্ঞেস করে, "তোরা যদি ভাল্লুকময় চিরবাসায় তাঁবুতে ঘুমোতে পারিস আমরা কেন পারব না? আমাদের কি ভাল্লুক বেশি ভালবাসে যে তোদের ছেড়ে আমাদের নিয়ে চলে যাবে?"

শোবার আয়োজন সম্পূর্ণ হবার পরেই শুরু হল ক্যাম্প-ফায়ার। সত্যই আগুন জ্বালিয়েছে সেতীরাম। তার উত্তাপে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে পরিশ্রান্ত ও শীতার্ত শিল্পী এবং কলাকুশলীর দল। গানে গল্পে ও হাসিতে মুখর হয়ে উঠেছে চিরবাসা।

কথায় কথায় অমূল্য জিজ্ঞেস করে হীরেনবাবুকে, "চিত্রনাট্যে চিরবাসার কোন দৃশ্য নেই?"

"আছে বৈকি", হীরেনবাবু বলেন, "সেটি স্টুডিওতে টেক্ করা হবে।"

"দৃশ্যটা কি?"

হীরেনবাবু বলতে শুরু করেন, "মুরলীধরের সঙ্গে কুমার ও সুমন এসে পৌঁছল এখানে—এই চিরবাসায়। মুরলীধর এমনি আগুন জ্বালিয়েছে। সেই আগুনের সামনে পাশাপাসি বসে রয়েছে ওরা দুজন। কথায় কথায় কুমার সুমনকে বলতে থাকে—ঈশ্বর কি জানি না, তাঁর স্বরূপও বুঝি না। তবু এই দেবতাত্মা হিমালয়ে এসে মনে হচ্ছে আমার সেই নিচের পৃথিবীটা যেন কতদূরে চলে গেছে। সেখানকার হিংসা বিদ্বেষ কলহ সব কিছুকেই মিথ্যে বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু আবার তো একদিন ফিরে যেতে হবে সেই নিচের পৃথিবীতে। সেদিন যদি আজকের এই অনুভূতিগুলো একই রকম মিথ্যে বলে মনে হয়? ...তার চেয়ে এসো, আমরা পরস্পর থেকে দূরে সরে যাই, যাতে পরস্পরের কাছে বেঁচে থাকতে পারি এখানকার এই পবিত্র মধুর স্মৃতিতে।"

২৩শে অক্টোবর ১৯৭০। আজ শিল্পী ও কলাকুশলীর দল গোমুখী পৌঁছবেন। গঙ্গোত্রী হিমবাহের 'স্নাউট' তথা হিমবাহ-নাসিকা বা তুষার-বিবর গোমুখী। ভাগীরথীর উৎস গোমুখী। উচ্চতা ১২,৭৭০ ফুট। ৩০° ৫৫' উত্তর অক্ষাংশ ও ৭৯° ৭' পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত এই গিরিতীর্থ—অনাদিকালের পরমতীর্থ। সেই তীর্থে চলেছেন ওঁরা। এর আগে আর কোন শিল্পী ও কলাকুশলীর দল এত উঁচুতে গিয়ে কাহিনীচিত্রের দৃশ্য গ্রহণ করেছেন বলে জানা নেই আমার। এই অভিনব প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক্।

সুজি ও রুটি খেয়ে ওঁরা রওনা হলেন চিরবাসা থেকে। চব্বিশ দিন আগে ঋষিকেশের গঙ্গাতীরে বসে যে বহির্দৃশ্য গ্রহণ পর্ব শুরু হয়েছিল, আজ তার শেষ হবে। আজ ওঁরা গোমুখী দর্শন করবেন। তাই আজ ওঁদের বড় আনন্দের দিন।

গতকাল বিকেলেই ভাগীরথী শৃঙ্গমালা মেঘে ঢাকা ছিল। আজও সে মেঘে ঢাকা। লক্ষণটা ভাল নয়, বিকেলের দিকে আবহাওয়া খারাপ হতে পারে।

কিন্তু আমি তো আজ লুঙ্গি পরিনি, তাহলে আবহাওয়া খারাপ হবে কেন? একটু হেসে হীরেনবাবু হঠাৎ বলে ওঠেন।

"আপনি প্যান্ট পরলে বৃষ্টি হবে না, কিন্তু তুষারপাত হতে তো বাধা নেই কোন।" শুভেন্দু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়।

আবহাওয়ার প্রসঙ্গ নিয়ে আর কেউ কথা বলেন না। তুষারপাতের কথা মনে হওয়ায় ওঁরা ভয় পেলেন কি?

তাই বলে শুটিং কিন্তু সমানে চলেছে। যে কোন মানুষের প্রথম এপথে এলে কষ্ট হয়। কষ্ট ওঁদের প্রত্যেকেরই হচ্ছে! কিন্তু কাজে গাফিলতি করছেন না কেউ। প্রত্যেকেই যথাযথভাবে আপন কর্তব্য সম্পাদন করে পথ চলেছেন।

বিরাট একটা ধস নেমে পথ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন। অমূল্য, শ্রীধর ও সেতীরাম পথ তৈরির চেষ্টা করছে। কিন্তু নরম ঝুরঝুরে মাটি। আইস-এক্স দিয়ে ঠোকা দিলে গড়িয়ে আরও নিচে নেমে যাচ্ছে। কোনমতে একখানি পা ফেলার মতো চওড়া একটি পথরেখা তৈরি করা গেল। সেই পথরেখা বেয়েই শিল্পীরা এগিয়ে চলল। ধীরে ধীরে। বলা বাহুল্য শুটিং চলেছে। বিশুবাবু ধসের এপার থেকে ছবি নিচ্ছেন।

সে কি! শুভেন্দু পড়ে গেল নাকি! হ্যাঁ তাই। তার পা ফস্কে গেছে। পাহাড়ের গা বেয়ে সে গড়িয়ে পড়েছে নিচে—ক্রমে আরও নিচে।

কিন্তু ঐ বড় পাথরগুলোর কোনটাকে আঁকড়ে না ধরতে পারলে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে—সে চলে যাবে খাদের ধারে—একেবারে সোজা গিয়ে পড়বে উত্তাল ভাগীরথীতে, কম করে হাজারখানেক ফুট নিচে।

অমূল্য ছুটে আসছে ঢাল বেয়ে। শুভেন্দুর সঙ্গে তার দূরত্ব কমে যাচ্ছে। সাবাস অমূল্য! এমনিভাবেই তুই একদিন গঙ্গোত্রী হিমবাহে বাঁচিয়েছিলি আমাকে।

কিন্তু আজ সে সুযোগ পেল না অমূল্য। শুভেন্দু নিজেই বাঁচাল নিজেকে। সবেগে জড়িয়ে ধরল অতিকায় একখানি পাথরকে আর ভাগ্যগুণে সে পাথরখানি তার দেহভার সইতে পারল। ঠিক তখুনি অমূল্য গিয়ে ধরে ফেলল শুভেন্দুকে।

একটু বাদে অমূল্যর সাহায্যে শুভেন্দু উঠে দাঁড়াল। তার হাত ধরে লাঠির সাহায্যে

উঠে এল ওপরে।

হীরেনবাবু ছুটে এলেন কাছে। জিজ্ঞেস করলেন, "লেগেছে কোথাও?"

"না, আমার লাগে নি। তবে অমূল্যর ভাঙা-হাতটা কেটে গিয়েছে।"

সত্যই তাই। অমূল্যর হাত দিয়ে রক্ত ঝরছে।

বিশুবাবু এসে পৌঁছলেন ওঁদের কাছে। বললেন, "চমৎকার শট্ হয়েছে শুভেন্দু।"

"শট্!" সবাই বিস্মিত। শট্ তো ছিল ধস পেরোবার। পড়ে যাওয়াটা তো দুর্ঘটনা।

কিন্তু বিশুবাবু বলেন, "হ্যাঁ, শট্। আমি ক্যামেরা বন্ধ করিনি। আমি কি পাগল যে এমন একটা ন্যাচারাল শট মিস্ করব। আর হীরেন আমাকে বলেছিল, এই রকম একটা শটের তার দরকার রয়েছে।"

হেসে শুভেন্দু বলে, "আচ্ছা সীনটা যদি আর একটু ন্যাচারাল হত, মানে আমি যদি ঐ পাথরটা আঁকড়ে ধরতে না পারতাম, যদি গঙ্গায় গিয়ে পড়তাম, তাহলেও কি আপনি ক্যামেরা বন্ধ করতেন না বিশুদা?"

"না, নিশ্চয়ই না। তখন আমরা আর তোমাকে ফিরে পেতাম না, কিন্তু আমার সেই শট্-এর মধ্যে বিশ্বের মানুষ তোমাকে কাছে পেত। তারা জানত অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায় মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও তার কর্তব্যে অবহেলা করেনি।" একটু থেমে বিশুবাবু আবার বলেন, "শুভেন্দু, ক্যামেরার সামনে দাঁড়ালে আমি আর তোমাদের বিশুদা থাকি না, আমি ক্যামেরাম্যান হয়ে যাই।"

আবার যাত্রা হলো শুরু। পথে মাঝে মাঝেই ধস নেমেছে। অমূল্য, প্রাণেশ শ্রীধর ও সেতীরাম হাত ধরে ধরে পার করে দিচ্ছে শিল্পী ও কলাকুশলীদের।

আবার দুর্ঘটনা। না, এবারে আর শুভেন্দু নয়, এবারে তার লাঠি। লাঠিটা পড়ে গেছে হাত ফস্কে। পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে নিচে।

শুভেন্দুর মতই শুভেন্দুর লাঠিটাও অনেক নিচে গিয়ে একখানা পাথরের গায়ে আটকে গেল। আর অমূল্যর মতই পাহাড়ের গা বেয়ে ছুটে নেমে গেল সেতীরাম। কয়েক মিনিটের মধ্যে লাঠি নিয়ে উঠে এল ওপরে।

লাঠিটা হাতে নিয়ে শুভেন্দু বলে, "সাবাস সেতী, তুম্ তো মাস্টার মাউন্টেনিয়ার হ্যাঁয়।"

"নহী সাব।" সেতীরাম সশব্দে স্যালুট ঠুকে বলে, "মাঁয় ব্লাডি ফুল হুঁ।"

চিরবাসা থেকে ২ মাইল এসে ভূজবাসা। এখান থেকে গোমুখী ৩ মাইল। ছোট একটি প্রস্তরময় উপত্যকা ভূজবাসা। পাহাড়ের গায়ে ভূজবন। গঙ্গার বেলাভূমিতে একফালি সমতল জায়গা। সেখানেই আশ্রয় বানিয়েছে স্বামী বিহারীলালজী, সবাই বলেন—লালবাবা। ফলে গোমুখী দর্শন সহজতর হয়েছে। সাধারণত যাত্রীরা প্রথম দিনে গঙ্গোত্রী থেকে ভূজবাসা আসেন। বিহারীলালজীর কুঠিয়ায় রাত্রিবাস করে পরদিন খুব ভোরে রওনা হয়ে গোমুখী দর্শন করেন। বিকেলে আবার ফিরে আসেন এখানে। তৃতীয় দিন সকালে এখান থেকে রওনা হয়ে একেবারে লঙ্কায় চলে যান। দুঃখের কথা গতবছর আগুন লেগে বিহারীলালজীর বড় কুঠিয়াটি ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি একটি তাঁবু যোগাড় করেছেন। এখন যাত্রীদের সেখানেই থাকতে হয়। তবে তিনি এখানে একটি যাত্রীনিবাস

নির্মাণের চেষ্টা করছেন। আশাকরি অদূর ভবিষ্যতে তাঁর সে প্রচেষ্টা সফল হবে।

ভূজবাসা থেকে ভাগীরথী শৃঙ্গমালাকে ভারি সুন্দর দেখায়। কিন্তু আজ তার মুখে মেঘের ঘোমটা। সহসা প্রাণেশ তাড়া লাগায়, "তাড়াতাড়ি পা চালান, যে কোন সময়ে তুষারপাত শুরু হতে পারে।"

"হলে ভালই হয়", হীরেনবাবু বলেন, "আমার যে 'স্নো-ফল'-এর শট্ আছে।"

"হ্যাঁ, স্টুডিও ভাড়াটা বেঁচে যায় আর কি।" শুভেন্দু মন্তব্য করে।

"আর সীনটা যে ন্যাচারাল হয়, সে কথাটা তো বলছ না!"

"সেই আমি পড়ে যাবার পরে যেমন ন্যাচারাল হয়েছে, তেমনি ন্যাচারাল তো?"

দিলীপ বলে, "আচ্ছা, এই পথে একটা রোপওয়ে তৈরি করা যায় না?"

"তাহলে আর এত কষ্ট করতে হতো না, তাই না দিলীপদা?" প্রাণেশ বলে, "রাজগীরের বিশ্বশান্তি স্তূপে যাবার মতো বসে বসে গোমুখী আসা যেত।"

"না, না", শুভেন্দু বলে, "দিলীপ বোধহয় কষ্ট বাঁচাবার জন্য বলছে না। ভাবছে—গঙ্গোত্রী থেকে যদি গোমুখী হয়ে তপোবন ও নন্দনবন পর্যন্ত একটা রোপওয়ে করা যায়, আর এই তিনটি জায়গায় থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে আমরা লক্ষ লক্ষ টাকার বিদেশী মুদ্রা আয় করতে পারি।"

"এবং বিদেশী কোন কোম্পানির সাহায্য নিলে সেটি বিনা পয়সায় করা যেতে পারে।" দিলীপ যোগ করে।

গল্পের মধ্য দিয়ে বেশ খানিকটা পথ পার হওয়া গেল। ওরা পৌঁছল সেই প্রস্তরাবৃত প্রান্তরে। এটি গোমুখীর পথে শেষ বাধা। কম করেও মাইলখানেক জায়গায় পথ বলে কিছু নেই। শুধু পাথর। সেই পাথর ডিঙিয়ে পথ। কখনও দু'খানি পাথরের ফাঁক দিয়ে গলে যেতে হচ্ছে, কখনও বা ওপরে উঠে ডিঙোতে হচ্ছে। এই উচ্চতায় এত পরিশ্রম প্রাণান্তকর। তবু শিল্পী ও কলাকুশলীরা পথ চলেছেন।

কিন্তু আর যে পারছেন না। দু'পা এগোবার পরেই হাঁফ ধরছে, শীতে হাত পা অবশ হয়ে আসছে, পিপাসায় কণ্ঠনালী শুকিয়ে আসছে বার বার। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। সিগারেট খেতেও ইচ্ছে করছে না। এ পথের কি শেষ নেই?

"আছে", অমূল্য ভরসা দেয়, "এই তো আর অল্প একটু এগোলেই পাথর শেষ হয়ে যাবে। তারপরে একেবারে ময়দান।"

এত কষ্টেও হাসি পায় ওঁদের। দীপক হেসে বলে, "তার চেয়ে বল ময়দানব। সত্যি দানব ছাড়া কেউ কি এই পাণ্ডববর্জিত দেশে আসতে পারে?"

"তাহলে তো আপনারা প্রত্যেকেই দানব দীপকদা! আপনারা যে এসে গেছেন।" প্রাণেশ ঘুরিয়ে উৎসাহ দেয়।

'সত্যি?" বিশুবাবু প্রশ্ন করেন।

"হ্যাঁ, বিশুদা।" অমূল্য বলে।

"তাহলে চল একটু তাড়াতাড়ি পা চালানো যাক্, "শান্তি ও বাহাদুর বোধহয় এতক্ষণে পৌঁছে গেছে গোমুখী। নিশ্চয়ই আগুন জ্বালিয়ে ফেলেছে। পৌঁছতে পারলেই গরম কিছু খেতে পাওয়া যাবে।" কার্তিকদা সহযাত্রীদের পরামর্শ দেন।

দিলীপ বলে, "গরম শব্দটা উচ্চারণ করতে ভাল লাগছে, না কার্তিকদা!"

"ও তাই নাকি?" শুভেন্দু কথা বলে এতক্ষণে। তাহলে কাছে আয়, আমি তোকে একটা গরম ধোলাই দিয়ে দিই, দেখবি আরও ভাল লাগবে।"

"পারবেন না শুভেন্দুদা, গরম ধোলাই তো দূরের কথা, কাউকে একটা কিল মারার ক্ষমতাও যে এখন নেই আপনার।"

"ঠিকই বলেছিস ভাই!" শুভেন্দু দিলীপের অভিমত মেনে নেয়। বলে, "এখন কেউ যদি আমাকে মেরেও ফেলে, আমি হাতের লাঠিটা উঁচু পর্যন্ত করতে পারব না।"

এক সময় সত্যই কিন্তু প্রস্তরাবৃত প্রান্তর শেষ হয়ে গেল। ঠিকই বলেছে অমূল্য। এবারে পথ সত্যই ভাল—ময়দান না হলেও ঠিক দুর্গম বলা চলে না।

সামান্য চড়াই-উৎরাই পথটি এসে শেষ হয়েছে এক ফালি প্রায়-সমতল প্রান্তরে। প্রান্তরটি দুটি ভাগে বিভক্ত। এদিকের অংশটি একটু উঁচু, ওদিকেরটি নিচু। এককালে এই প্রান্তরটিও বড় বড় পাথরে বোঝাই ছিল। উত্তরকাশীতে পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হবার পরে পরিষ্কার করা হয়েছে। এখন গোমুখী তাঁদের পর্বতারোহণ শিক্ষাদানের একটি প্রধান কেন্দ্র। এখানে তাঁবু ফেলে দিনের পর দিন বাস করে ছাত্র-ছাত্রীরা। গঙ্গোত্রী হিমবাহ অঞ্চলে যাঁরা পর্বতারোহণ করতে আসেন তাঁদের বেশ কয়েকদিন করে রাত্রিবাস করতে হয় গোমুখীতে। আমিও সব মিলিয়ে চোদ্দটি রাত কাটিয়েছি ভারতের এই দুর্গমতম গিরিতীর্থে। এবং সে কাহিনী লিখেছি 'চতুরঙ্গীর-অঙ্গনে' বইতে।

প্রান্তরের বাঁয়ে পাহাড়, ডাইনে গঙ্গা আর সামনে গঙ্গোত্রী হিমবাহ। হিমবাহের শেষ প্রান্ত থেকে নেমে আসছে গঙ্গা—

'দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে
ত্রিভুবন-তারিণী তরল-তরঙ্গে।
শঙ্কর-মৌলি-বিহারিণি বিমলে।
মম মতিরাস্তাং তব পদ-কমলে।।

*　　*　　*

পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে
খণ্ডিত-গিরিবর-মণ্ডিত-ভঙ্গে।
ভীষ্ম-জননি খলু মুনিবর-কন্যে
পাতক-নিবারিণি ত্রিভুবন-ধন্যে।।

*　　*　　*

রোগং শোকং পাপং তাপং
হর মে ভগবতি কুমতি-কলাপম্।
ত্রিভুবন-সারে বসুধা-হারে।
ত্বমাসি গতির্মম খলু সংসারে।।...'

শিল্পী ও কলাকুশলীদের পথ-চলা শেষ হল। তাঁরা শ্রান্ত ও ক্লান্ত। কিন্তু কেউ বিশ্রাম করলেন না। সবাই ছুটে এলেন গঙ্গার তীরে। এখান থেকে গোমুখী পরিষ্কার দেখা যায়। সামান্য দূরে—বড় পাথরগুলো পেরিয়ে। গঙ্গা এসেছে নেমে। সুবিরাট গুহামুখ থেকে অবিরল ধারায় হিমবাহনিঃসৃত জলরাশি আসছে বেরিয়ে। মাঝে মাঝেই ওপর থেকে পাথর আর বরফ পড়ছে নদীর বুকে—প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠছে চারদিক।

কার্তিকদা কিন্তু এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন ভাগীরথীর দিকে। সহসা তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে গান ধরলেন—

'কেন ভাগীরথী হাসিয়ে হাসিয়ে,
নাচিয়ে নাচিয়ে, চলিয়ে যাও গো।
ঢলিয়ে ঢলিয়ে, সৈকত পুলিনে,
বহি এ ভারতে কি সুখ পাও গো।
নিরখি মা আজ ভারতের দশা,
এ দুখে আনন্দে কি গান গাও গো।
কি সুখে বল মা নীলাম্বর পরি,
হরষিত মনে সাগরে ধাও গো...'

কাতির্কদা থামতেই শুভেন্দু আবৃত্তি করে,

'রূপ-নারায়ণের কূলে
জেগে উঠিলাম;
জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।...'

ওঁরা বোধহয় আর ওঁদের মধ্যে নেই। সম্ভবত ভুলেই গেছেন যে তাঁরা তীর্থযাত্রী নন, চলচ্চিত্র শিল্পী অথবা কলাকুশলী।

না, সবাই ভুলে যাননি। ঐ তো দীপক ও কানাই প্রাণেশের সাহায্যে ক্যামেরা বসাচ্ছে। ঐ যে শান্তিবাবু আগুন জ্বালিয়ে ডাল রান্না করছেন। হ্যাঁ, চা কিংবা কফি নয়, ডাল। যেমন শরীর গরম হবে, তেমনি পেট ভরবে—অভিনব ব্যবস্থা।

আর হীরেনবাবু? না, তিনিও বসে নেই—যথারীতি পরবর্তী লোকেশান সিলেক্ট করছেন। অমূল্য রয়েছে তার সঙ্গে।

ডাল খাওয়া শেষ হওয়ামাত্র শুরু হল শুটিং—

মুরলীধরের সঙ্গে সুমন ও কুমার গোমুখী পৌঁছেছে। তারা বিস্ময়ে ও আনন্দে হতবাক হয়ে গেছে। কেবলই চেয়ে চেয়ে চারদিক দেখছে। এ দেখার যেন শেষ নেই।

পরবর্তী লোকেশান—ফিরে যাবার দৃশ্য। কিন্তু বিশুবাবু আর পারছেন না। দস্তানা খুলে ক্যামেরা চালাতে হচ্ছে। তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হল না। দীপক এগিয়ে এল ক্যামেরার সামনে। আর ঠিক তখুনি শুরু হল তুষারপাত।

কাঁচা পেঁপের বিচির মতো হালকা তুষার পড়ছে। ওঁদের বেশ মজা লাগছে।

হীরেনবাবু হেঁকে ওঠেন, "একি তোমরা বসে রইলে কেন। একটু পরেই হয়তো বেশি বরফ পড়তে শুরু করবে, তখন আর কাজ করা যাবে না। নাও স্টার্ট কর—টেক্।"

দীপকের ক্যামেরা চলতে শুরু করে—শুরু হয় শুটিং। প্রায় তেরো হাজার ফুট উঁচুতে তুষারপাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে কাহিনী-চিত্রের শুটিং—

দর্শন ও স্নান সেরে পথ-প্রদর্শক মুরলীধরের সঙ্গে কুমার ও সুমন গোমুখী থেকে চলেছে ফিরে। কেন যেন ঘরে ফেরার জন্য সুমন বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। সে কেবলই জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে যেতে চাইছে—কিন্তু পারছে না—ক্লান্তি নেমে এসেছে তার সারা শরীরে।

এমন সময় হঠাৎ কোথা থেকে এক ঝলক দমকা হাওয়া ছুটে এল। চমকে উঠল মরলীধর। ভয়ার্ত কণ্ঠে সে বলে—তুফান আতি হ্যায়, আভি বরফ গিরেগী। তুরন্ত লোট্না চাহিয়ে সাব্!

বাতাসের বেগ বেড়ে ওঠে, বরফ পড়তে শুরু করে। সুমনের হাত ধরে কুমার ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে।

আর পারছে না। প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইছে, মুষলধারায় বরফ পড়ছে। চলা তো দূরের কথা, দাঁড়িয়ে থাকা পর্যন্ত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। তবু সুমনের মুখখানি নিজের বুকের মধ্যে নিয়ে কুমার এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে।

শ্রান্তস্বরে সুমন ডাক দেয়—কুমার, কুমার!

—বল। কুমার তাকে আরও কাছে টেন নেয়।

সুমন প্রশ্ন করে—সারাজীবন তুমি যা খুঁজে বেড়িয়েছ, তা কি পেয়েছ?

কুমার উত্তর দেয়—পেয়েছি, তোমার চোখে তোমার স্পর্শে।

—তোমার ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছ, তোমার বিশ্বাসকে?

—পেয়েছি, তোমার অন্তর দিয়ে।